









# রচনা বিচিন্তা

পি. আচার্য

প্রধান অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, হেরাচন্দ্র কলেজ [ সিটি কলেজ, দক্ষিণ কলিকাতা,  
দিবা শাখা ] ও ভূতপূর্ব অধ্যাপক, উদ্যোক্তা কলেজ [ সিটি কলেজ, সূর্য সেন  
কল্ট, প্রভাতী শাখা ] এবং পরীক্ষক,  
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

রবীন্দ্র লাইব্রেরী

১৫/২, ভানাজোড় মে কল্ট  
কলিকাতা : ৭০০ ০১২

প্রকাশক  
শ্রীরবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস  
১৫/২, শ্রীমাচরণ বে স্ট্রীট  
কলিকাতা-৭০০ ০১২

প্রথম সংস্করণ : ১৯৩৯

হৃদয় :  
শ্রীমতী ডলি আচাৰ্য

প্রচ্ছদ :  
শ্রীপ্রভাত কর্মকার

মুদ্রাকর :  
শ্রীবামিনীভূষণ উকিল  
দি মুকুল প্রিন্টিং ওয়ার্কস  
২০২এ, বিধান সরণি  
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

ও

শ্রীনিশীথকুমার ঘোষ  
দি সত্যনারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস  
২০২এ, বিধান সরণি  
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

এবং

শ্রীগদারাম পাল  
মহাবিজ্ঞা প্রেস  
১৫৬, ভারত প্রামাণিক রোড  
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

## মাধ্যমিক রচনা বিচিন্তার বৈশিষ্ট্য

১. পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক পরীক্ষার মাধ্যমিক নবম ও দশম শ্রেণীর নব-বিস্তৃত পাঠ্যসূচী অনুযায়ী লিখিত ও পর্বে কর্তৃক অনুমোদিত।
২. সাতাশটি স্থলিখিত প্রবন্ধ এবং ষাটটি প্রবন্ধ-সংকেত সন্নিবেশিত, যাদের অনুসরণে আরো প্রায় ৪০০টি নতুন প্রবন্ধ স্বাধীনভাবে লেখা যেতে পারে।
৩. প্রতিটি প্রবন্ধের শীর্ষে প্রবন্ধ-সূত্রাকারে প্রবন্ধ-আলোচিত সকল প্রসঙ্গ সন্নিবেশিত; যা পরীক্ষায় দ্রুত-প্রস্তুতির সহায়ক।
৪. প্রতিটি প্রবন্ধ ও প্রবন্ধ-সংকেতের পাঠ-টীকায় প্রবন্ধের অনুসরণে আরো কি কি নতুন প্রবন্ধ রচিত হতে পারে, তার উল্লেখ আছে।
৫. সামান্য পরিপ্রমে প্রবন্ধ-সংকেতগুলি থেকে পূর্ণায়তন প্রবন্ধ রচনা করা যেতে পারে।
৬. প্রবন্ধগুলির মধ্যে \*প্রধানমন্ত্রীর বিশদকা কর্মসূচী, \*বর্তমান জরুরী অবস্থার শুরুত্ব, \*ভারতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ: আৰ্যভট্ট, \*অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী বিষয়ক নানা প্রবন্ধ এবং \*বিদ্যালয়-জীবনের প্রথম দিনের স্মৃতি, বাংলার গ্রাম, রূপসী বাংলা ও তাহার ঋতু-বৈচিত্র্য, ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে বাংলার রূপ-বিস্তার ছাড়াও অতি-সাম্প্রতিক বিষয়াবলী নিয়ে রচিত বহু প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হয়েছে। যেমন: \*ভারতের প্রথম পরমাণু-বোমা, \*নগর-সজ্জা, \*বিদ্যালয়ে শেষদিনের স্মৃতি, \*পরীক্ষার পূর্বরাত্রি, \*পরীক্ষা-মন্দিরের দৃশ্য, \*গৃহ-সজ্জা, ভারতীয় জীবনে রামায়ণের প্রভাব, \*তোমার ভালোলাগা একটি চলচ্চিত্র ইত্যাদি।
৭. \*ভারতের বিভিন্ন দিক-দিগন্ত নিয়ে ১৬টি এবং বাংলার বিভিন্ন দিক-দিগন্ত নিয়ে মোট প্রায় ২০টি প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হয়েছে।
৮. মহাপুরুষগণের জীবনী-বিষয়ক প্রবন্ধ ১৬টি।
৯. উদ্ভৃতি-বাক্য নিয়ে রচিত প্রবন্ধ-সংখ্যা ১২।
১০. তর্কাত্মক বিজ্ঞান, বাণিজ্য, সাহিত্য, অর্থনীতি, ইতিহাস, সংস্কৃতি, সমাজ, মানবচরিত্রের গুণাবলী ও আদর্শমূলক প্রবন্ধ সুপ্রচুর।
১১. বঙ্গানুবাদে হাতে-কলমে অনুবাদ শেখার পদ্ধতিটি কেবলমাত্র এই বইতে পাওয়া যাবে। সেজন্তে বঙ্গানুবাদ অংশটিকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে।
১২. ভাবার্থ ও ভাব-সম্প্রসারণের জন্য স্থানীকৃত রচনাংশ [আলোচনা ও সংকেতসহ] প্রদত্ত হয়েছে।
১৩. সর্ববিষয়ে সহজবোধ্যতা ও সাবলীলতা গ্রন্থটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য।
১৪. ব্যাকরণ প্রতি অধ্যায়ের আলোচনার শেষে স্থিতিত ও স্থিতিস্থিত অনুসরণী [কোথাও কোথাও সংকেত-সহ] প্রদত্ত হয়েছে। তাছাড়া রয়েছে পাঠ্যগ্রন্থের প্রয়োজনীয় ব্যাকরণ।
১৫. অতিরিক্ত সংযোজনে নতুন নতুন প্রবন্ধ, প্রবন্ধ-সংকেত, প্রচুর ভাবার্থ, ভাবসম্প্রসারণ, গল্পরচনা ও অনুবাদ সংযোজিত।

প্রকাশক

# SYLLABUS FOR REORGANISED PATTERN OF SECONDARY EDUCATION [ IX & X ]

## মাতৃভাষা [ প্রথম ভাষা ]

প্রথম পত্র : [ লেখ্য বিষয় ৮০ + মৌখিক ২০ ] = ১০০

১. কাব্য পাঠ্যগ্রন্থ	৩০
২. প্রবন্ধ	২০
৩. ইংরাজী হইতে বঙ্গভাষাবাদ	১০
৪. ভাব-সম্প্রসারণ/সারসংক্ষেপ	১০
৫. সহায়ক পাঠ [ কাব্য ]	১০
৬. মৌখিক	২০
	<hr/> ১০০

দ্বিতীয় পত্র : [ লেখ্য বিষয় ৮০ + মৌখিক ২০ ] = ১০০

১ ক. গল্প পাঠ্যগ্রন্থ	৩০
খ. পাঠ্যবিষয়গত ব্যাকরণগাংল	১০
২. ব্যাকরণ	২৫
৩. সহায়ক পাঠ [ গল্প ]	১৫
৪. মৌখিক	২০
	<hr/> ১০০

নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য পাঠ্যগ্রন্থ পর্বে কর্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত হইবে।

## দ্বিতীয় পত্রের ব্যাকরণের পাঠসূচী :

### **। নবম শ্রেণী ।**

[ সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীতে অধীত বিষয়ের মৌখিক পুনরালোচনা প্রয়োজনীয় । ]

ক. বর্ণের শ্রেণীবিভাগ : বাংলা স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ-স্থান ও উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য, একই বর্ণের বিভিন্ন ধ্বনি, বিভিন্ন বর্ণের একই ধ্বনি, ধ্বনি-বিলোপ ইত্যাদি । বিদেশী শব্দের বাংলা বর্ণীকরণ ।

খ. সাধু ও চলিত ভাবারীতির পূর্ণাঙ্গ আলোচনা । বাঁটি বাংলা শব্দের সন্ধি ।

গ. ক্রিয়াপদ ও ক্রিয়া-বিভক্তি মূহুর্তে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা । ধাতু ও প্রত্যয়—মৌলিক ধাতু, প্রযোজক ধাতু, ধ্বজ্যাক ধাতু, নামধাতু । অকর্মক ও সক্রমক ক্রিয়া । সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া, মৌলিক ক্রিয়া ও ক্রিয়ার কাল [ বিশেষ আলোচনা ], ক্রিয়ার রূপ ।

ঘ. অব্যয়ের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা [ শ্রেণীবিভাগ ও বিভিন্ন শব্দ অর্থে প্রয়োগ ] ।

৬. পূর্ণাঙ্গ কৃৎ-প্রত্যয় : সংস্কৃত—শত্ [ অৎ ], শানচ্ [ শ্যন্ ], নচ্ [ অক্ ],  
জচ্ [ জা ], ইচ্ছ, আনু। বাংলা—অ, অন, আও, উ, উনি, ত [ অত, অতা ], তি  
[ অতি ], না, ত্রি [ আরি, উরি ]।

পূর্ণাঙ্গ তদ্ধিত-প্রত্যয় : সংস্কৃত—ফি [ ই ], ক্ষেয় [ এয় ], ক্ষায়ণ [ আয়ন ], ক্ষী  
[ ক্শী ], ফিক [ ইক ], ইত, ইল, ইন, ঈন, বিন, যয়, যতূপ-বতূপ [ যান-বান ], তন  
ইয়ন, ব, ল। বাংলা—আমি [ মি ], আর, আরি, আরু, ই, ইয়া [ এ ], ঈ, উয়া [ উ ]  
উক, টিয়া [ টে ], পারা, পানা, খানা, বস্ত, মস্ত। বিদেশী—আনা, আনি, ওয়ালা  
ওয়ান, খানা, খোর, গর, চি, দান, দানি, দার, গিরি, নবিশ, বাজ।

৮. পূর্ণাঙ্গ উপসর্গ [ সংস্কৃত, বাংলা ও বিদেশী ]। অহুসর্গ [ হারা, দিয়া, হইতে  
থেকে, চেয়ে, মধ্যে প্রভৃতি ]।

ছ. বিভিন্নার্থে বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের প্রয়োগ। বিশিষ্টার্থে ক্রিয়াপদের প্রয়োগ।  
একই শব্দের বিভিন্নার্থে প্রয়োগ। তিম্মার্থক একশব্দ ও সদৃশ শব্দ।

জ. ইংরাজী হইতে বাংলার অনুবাদ-শিক্ষা [ বাক্য-অনুসারে অনুবাদ দেখাইয়া  
ক্ৰমে অহুচ্ছেদে অভ্যস্ত করাইতে হইবে ]।

## । দশম শ্রেণী ।

ক. সমাস—বিভূততর আলোচনা।

খ. বাংলার শব্দাবলী। বাংলা শব্দের শ্রেণী-বিভাগ [ তৎসম, তদ্ভব, দেশী ও  
বিদেশী ]।

গ. ধ্বজাঙ্কক-শব্দ। শব্দ-বৈভূত।

ঘ. বাক্য সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা। বাক্যের প্রকারভেদ। সরল, জটিল  
যোগিক। অন্ত্যর্থক, নান্ত্যর্থক, নির্দেশক, প্রপঞ্চবোধক। বাক্যান্তরীকরণ।

ঙ. শব্দ ও বাক্যাংশের বিশেষ অর্থে প্রয়োগ। প্রবাদ-প্রবচনাদি।

চ. বাক্য-প্রসারণ। বহুপদের একপদে পরিণতকরণ। শব্দ ও বাক্যগত শুদ্ধি-  
অশুদ্ধি বিচার।

প্রবন্ধ, অনুবাদ, ভাবার্থ, ভাব-সম্প্রসারণ : পাঠ্য-বহিভূত অংশ হইবে  
প্রদর্শ করা হইবে। প্রবন্ধ-পুস্তকে পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধের দৃষ্টান্ত অপেক্ষা পর্যাপ্ত প্রবন্ধের  
সংকেত দেওয়ার উপর গুরুত্ব দিতে হইবে।

সহায়ক পাঠ : আলোচ্য বৎসরে [ ১৯৭৪-৭৫ ] নবম-দশম শ্রেণীর জন্য  
নির্দিষ্ট গল্প ও পদ্যগ্রন্থগুলি নির্বাচিত হইল। আবশ্যক-বোধে পর্যন্ত এই গ্রন্থের  
তালিকা ইচ্ছা করিতে পারিবেন।

## । গল্প ।

১. জীবন-বৃত্তি [ নির্বাচিত অংশ ]—রবীন্দ্রনাথ

২. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—স্বামী বিবেকানন্দ

৬.

৩. রামায়ণী কথা [ নির্বাচিত অংশ ]—দীনেশচন্দ্র সেন ।

১. **পদ্ম** ।

১. কথা ও কাহিনী—ববীন্দ্রনাথ ।

২. কবিতা-সংকলন—পঞ্চ পক্ষে বিশ্বভারতী প্রকাশিত ।

উক্ত তালিকা হইতে মাত্র একখানি গদ্য ও একখানি পদ্য মোট দুইটি গ্রন্থ পাঠ করিতে হইবে । সহায়ক গ্রন্থের আখ্যান, ঘটনাবর্ণনা, ভাববস্তু ইত্যাদি সম্মত ছাত্র-ছাত্রীদের সাধাবণ পরিচয় মাত্র প্রয়োজন ।

**মৌখিক :** কবিতা, নাট্যাংশ ও গদ্যের আবৃত্তি ও পাঠ, বিতর্ক, আলোচনা কথোপকথন, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি ।

West Bengal Board of Secondary  
Education.

77/2, Park Street, Calcutta-16.

## চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা ।

গুণগ্রাহী শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং স্নেহাম্পদ ছাত্র-ছাত্রীদের অভিনন্দন জানিয়ে মাধ্যমিক 'রচনা বিচিন্তা'র চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হলো। নতুন নতুন প্রবন্ধের সংযোজন, পূর্ববর্তী প্রবন্ধগুলির পরিমার্জন এবং কতকগুলির পরিবর্তন গুণগ্রাহী দৃষ্টিতে অবশ্যই ধরা পড়বে। এই সংযোজন, পরিমার্জন এবং পরিবর্তনকর্মে ছাত্র-ছাত্রীদের সর্বাধিক প্রয়োজন-পূরণই হলো অত্যন্ত লক্ষ্য। গ্রন্থখানিকে তার ঐতিহ্য-অনুসারে ছাত্র-ছাত্রীদের সর্বাধিক উপযোগী করে তোলার জন্তে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তা কতখানি সফল হয়েছে, তার বিচারের ভার রইলো সতীর্থ শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের ওপর।

নমস্কারান্তে ॥ ইতি—

হেরখচন্দ্র কলেজ

কলকাতা : ৭০০ ০১১

বিনীত

প্রবন্ধকার

## প্রথম সংস্করণের ভূমিকা ●

বর্তমান লেখকের উচ্চ-মাধ্যমিক ও স্কুল-কাইন্সাল 'রচনা বিচিন্তা' গুণগ্রাহী ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের প্রীতিলাভে সমর্থ হয়েছিল। এবার নতুন পাঠসূচী অনুযায়ী রচিত হলো মাধ্যমিক 'রচনা বিচিন্তা'।

গতানুগতিকতাই যদি লক্ষ্য হতো, তবে এই গ্রন্থ রচিত হতো না। নতুনের সংবাদ যদি বহন করে আনতে না পারে, তবে রচনা-ব্যাকরণের বিশাল গ্রন্থ-সমাজে নতুন গ্রন্থের আবির্ভাবের কি প্রয়োজন? 'রচনা বিচিন্তা' গতানুগতিকতা পরিহার করে সম্পূর্ণ নতুন পদক্ষেপে চলবার চেষ্টা করেছে এবং সেই নতুনত্বের পরিচয় তার সবত্র ছড়ানো রয়েছে, গুণগ্রাহী দৃষ্টিতে তা অবশ্যই পড়বে। কিন্তু তা কতখানি সফল হয়েছে, তার বিচারের ভার গুণগ্রাহী শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের ওপর।

'রচনা বিচিন্তা'র রচনাগুলি সম্পূর্ণভাবে নতুন রীতিতে রচিত। এই নতুন রীতি বর্তমান গ্রন্থকারের প্লাতক প্রণেীর জন্তে রচিত 'বাণিজ্য বিচিন্তা'র সফল হয়েছে। অল্পরূপ সাক্ষ্যের প্রত্যাশায় সেই রীতি 'রচনা বিচিন্তা'রও অনুসৃত হলো। এর রচনা-বিভাগসই বড়ো কথা নয়, প্রবন্ধ-সূত্র বা প্রসঙ্গ-উল্লেখও বড়ো কথা নয়; আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সাম্প্রতিকতম বিষয়ে রচিত প্রবন্ধগুলির অনুসরণে স্বাধীনভাবে অধিক-সংখ্যক প্রবন্ধ রচনায় ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত করার প্রয়াসই এর অত্যন্ত বৈশিষ্ট্য।



এ বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ সহায়ক হবে প্রবন্ধ-সংকেতগুলি। ‘রচনা বিচিন্তা’র বক্তৃতাগুলি প্রবন্ধ পরিবেশিত হয়েছে, তাদের অল্পসরণে অনেক বেশী প্রবন্ধ রচিত হতে পারে। সেজন্যে প্রত্যেক প্রবন্ধের পাদ-টীকায় অল্পসারী প্রবন্ধ-সূচী প্রদত্ত হয়েছে।

ব্যাকরণ-অংশেও নতুনত্ব সকলের চোখে পড়বে। ব্যাকরণ সাধারণতঃ ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে বিভীষিকারূপে পরিগণিত হয়। বিষয়টি নবীনদের কাছে দুর্লভ সন্দেহ নেই ; কিন্তু বিভিন্ন গ্রন্থে ‘দুর্দান্ত পাণ্ডিত্য’ প্রকাশ করতে গিয়ে ব্যাকরণের সূত্রাবলীকে দুর্লভতর করে তোলার অপপ্রয়াস লক্ষিত হয়। তাতে আমাদের শিক্ষার ভোজে ‘মারুপথে অনেকখানি অপচয় হয়ে যায়’। ব্যাকরণ-বিভীষিকা দূর করে তাকে সহজবোধ্য করে তার সবখানি কাজে লাগাবার চেষ্টা করা হয়েছে এই গ্রন্থে। ব্যাকরণের সূত্র-ব্যাখ্যানে এবং দৃষ্টান্ত-চয়নে নতুন রীতি অমূল্য হয়েছে। পাঠ্যগ্রন্থের ব্যাকরণে [ দ্বিতীয় পত্র ] ব্যাকরণের নানা দিক-দিগন্ত প্রদর্শিত হয়েছে। সেই সঙ্গে পরীক্ষার প্রশ্নসমূহের শ্রেষ্ঠ উত্তর-রচনার জন্তেও বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়েছে।

ভাবার্থ-রচনা ও ভাব-সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে কাব্য ও গদ্যাংশ-নির্বাচনে পরীক্ষার প্রশ্নাগমের সম্ভাব্যতার দিকে দৃষ্টি রাখা হয়েছে। অল্পসরণীতে যে কাব্য ও গদ্যাংশগুলি প্রদত্ত হয়েছে, ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার জন্তে তাদেরও সংকেত দেওয়া হয়েছে।

বঙ্গভাষাবাদে বাক্য-বিশ্লেষণের সাহায্যে বিভিন্ন প্রকার বাক্যের অমূল্য হাতে-কলমে শেখাবার চেষ্টা করেছি। তাতে শেষ থেকে শুরু না করে শুরু থেকেই শুরু করেছি। এবং অমূল্য-নির্বাচনে পরীক্ষার প্রশ্নাগমের সম্ভাব্যতার দিকে নজর রেখেছি।

পরিশেষে একটি কথা, গ্রন্থটিকে নিখুঁত এবং মাধ্যমিক ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ উপযোগী করে তোলার জন্তে যত্নের কোন ক্রটি ছিল না। তবু যদি ক্রটি থেকে থাকে পরবর্তী সংস্করণে তার সংশোধন অবশ্যই হবে। সেজন্যে গুণগ্রাহী শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের সহায়ত লাভ করলে এবং যাদের জন্তে গ্রন্থখানি লেখা, তারা উপকৃত হলে আমরা সকল শ্রম সার্থক মনে করবো।

নমস্কারান্তে ॥ ইতি—

হেরমচন্দ্র কলেক্ত

কলিকাতা : ৭০০ ০১১

বিনীত

প্রমুখ্য

# সূচীপত্র

## প্রবন্ধ

### প্রস্তাবনা

১. তোমার বিদ্যালয়-জীবনের প্রথম দিনের স্মৃতি ৩
২. আমার গ্রাম ৬/মা. '৩০
৩. রূপসী বাংলা ও তাহার ঋতু-বৈচিত্র্য ১/ক. প্রা. '৩৫
৪. আমার প্রিয় ঋতু : শরৎ ১২/মা. '৩৬, '৩৭
৫. শীতের সকাল ১৫/উ. মা. '৩৮
৬. বর্ষায় কলিকাতা ১৮
৭. বাংলার সংস্কৃতি ২১/সৌ. প্রা. '৩৯
৮. বাংলার পশুপাখি ২৪/মা. '৪০
৯. গ্রামের হাট ২৭/উ. মা. '৪০
১০. বনভোজন ৩০
১১. ভারতের জাতীয় সংহতি ৩২
১২. সমাজ-জীবনে সংবাদপত্রের প্রভাব ৩৫/ক. প্রা. '৬৪ : উ. মা. '৭১, '৭২
১৩. বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও মানব-সভ্যতা ৩৮/মা. '৬০ : উ. মা. '৬২
১৪. বেতায়-বার্তা ৪১/ক. প্রা. '৬৭
১৫. চন্দ্রলোক-বিজয় ৪৪/উ. মা. '৬০, '৬৩ . [ কম্পার্ট ] '৭০
১৬. টেলিভিশন ৪৭/ক. প্রা. '৬১, '৬৫
১৭. বর্তমান সভ্যতার বিদ্যুতের দান ৫০/ক. প্রা. '৬৫
১৮. স্বাধীন ভারতে শিক্ষা-সংস্কার ও পরীক্ষা-সংস্কার ৫৩/উ. মা. '৭১
১৯. শিক্ষার বাহনরূপে মার্ভিভাষা ৫৬
২০. বৃত্তি-শিক্ষা ও বৃত্তি-নির্বাচন ৫৯
২১. শিক্ষা-বিস্তারে ও সমাজ-জীবনে চলচ্চিত্র ৬২/উ. মা. '৬২
২২. আন্তর্জাতিক নারী-বর্ষ ৬৫
২৩. ছাত্র-জীবনে সাময়িক শিক্ষা ৬৮/উ. মা. '৭৬ : ক. প্রা. '৬৪
২৪. সমাজসেবা ও ছাত্র-সমাজ ৭১/উ. মা. '৬২ : [ কম্পার্ট. ] '৭১
২৫. ছাত্র-সমাজ ও শৃঙ্খলাবোধ ৭৪
২৬. জীবন-চরিত পাঠ ৭৬
২৭. গ্রন্থপাঠ ও গ্রন্থ-নির্বাচন ৭৮
২৮. দেশ-ভ্রমণ ৮০/মা. '৬১, '৬৩

৩০. গ্রন্থাগার ৮৩/সি. প্রা. '৬১
৩১. সময়ের মূল্য ৮৬/মা. '৫৭, '৭০
৩২. পরিভ্রমের মর্যাদা ৮৮/উ. মা. '৬১, '৬৩; সৌ. প্রা. '৬৩; মা. '৭৬
৩৩. খেলার রাজা ক্রিকেট ১০
৩৪. শরীর-চর্চা ও খেলাধুলা ১৩/মা. '৬২
৩৫. স্বদেশ, আমার স্বদেশ ২৫/মা. '৬২
৩৬. একটি ভ্রমণ-কাহিনী ১৮/উ. মা. '৭১
৩৭. একটি বটগাছের আত্মকহিনী ১০১
৩৮. পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ ১০৩
৩৯. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১০৬
৪০. কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ১০৯
৪১. নেতাজী সুভাষচন্দ্র ১১২
৪২. আমার প্রিয় গ্রন্থকার : বঙ্কিমচন্দ্র ১১৫/উ. মা. '৬১
৪৩. আমার প্রিয় কবি : নজরুল ইসলাম ১১৮
৪৪. বিজ্ঞানচর্চা সত্যেন্দ্রনাথ বসু ১২১
৪৫. কুটির-শিল্প ১২৪
৪৬. বহুদিকে সমুদ্রে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ? ১২৭/মা. '৬২, '৬৩
৪৭. সংগ্রামই জীবন ১৩০/উ. মা. '৬৮
৪৮. যে শুইয়া থাকে তাহার ভাগ্যও শুইয়া থাকে ১৩৩/মা. '৫২; উ. মা. '৬১, '৬৩
৪৯. তোমার পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও প্রকৃতি ১৩৫
৫০. ভারতের বেকার-সমস্যা ও তাহার প্রতিকার ১৩৮
৫১. একটি শ্রমগীত ঘটনা ১৪১/ক. প্রা. '৬২; উ. মা. [ কম্পার্ট. ] '৭০
৫২. লক্ষ্যহীন জীবন নোঙরহীন নৌকার মতো ১৪৪/উ. মা. '৬৪; [ কম্পার্ট. ]
৫৩. ফুলের পুরস্কার-বিতরণী সভা ১৪৭/উ. মা. '৬৫; ক. প্রা. '৬১
৫৪. ভারতের প্রথম পরমাণু-বোমা ১৫০

### ১৫-সংকেত

- বর্ষীয় বাংলাদেশ ১৫৩/উ. মা. '৭০, ক. প্রা. '৬১
- বঙ্গী নীতি ১৫৪/উ. মা. '৬০
- একটি বর্ষমুখর সন্ধ্যা ১৫৫
- বাংলার বিচিত্র ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব ১৫৬
- নববর্ষ উৎসব ১৫৭
- শহর ও পল্লীর ব্যবধান অপসারণ ১৫৮/ক. প্রা. '৬০
- একটি গ্রাম্য মেলা ১৫৯/মা. '৭০
- নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য ১৬১

## বইপত্র

৯. জনবৃত্ত গঠন ও প্রকাশ ১৬২/উ. ম. '০০
১০. শিষ্টাচার ও সৌজন্যবোধ ১৬৩
১১. ইতিহাস-পাঠের প্রয়োজনীয়তা ১৬৩
১২. বিতর্ক-সভা ১৬৪/ম. '৭০
১৩. কর্তব্যপরায়ণতা ১৬৫
- ✓ ১৪. অব্যবসায় ১৬৫
১৫. মিতব্যয়িতা ১৬৬
১৬. খেয়ালখুশির মূল্য ১৬৭
১৭. ধর্মঘট ১৬৭
১৮. একটি নদীর আত্মকথা ১৬৮
১৯. তগবান বুদ্ধ ১৬৯/ম. '০০
২০. বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ১৬৯, ক. প্র. '০০
২১. ভগিনী নিবেদিতা ১৭০
২২. আচার্য জগদীশচন্দ্র ১৭১
২৩. মহাত্মা গান্ধী ১৭১
২৪. শান্তির দূত জওহরলাল ১৭২
২৫. দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ১৭৩/উ. ম. '০১
২৬. কবি শ্রীঅরবিন্দ ১৭৪
২৭. আমার প্রিয় উপস্থাপন : পথের পাঁচালী ১৭৫
২৮. বাংলার লোক-সাহিত্য ১৭৬
২৯. বিজ্ঞান-সাধনার বাঙ্গালী ১৭৬
৩০. বাঙ্গালীর বাণিজ্য-সাধনা ১৭৭
৩১. বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের জীবন-সংকট ১৭৮
- ✓ ৩২. জগৎ ছুঁড়িয়া একজাতি শুধু সে জাতির নাম মাহুশ-জাতি ১৭৮, উ. ম. '০৬
৩৩. ব্যক্তি ও জাতির জীবনে আদর্শের ভূমিকা ১৭৯/উ. ম. '০১
৩৪. দশোন্মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ ১৮০
৩৫. যে সহে সে রহে ১৮০
৩৬. এ জগতে হায় সেই বেশী চায়, আছে যার ভুরি ভুরি ১৮০
৩৭. ভারতের কৃষি ও কৃষক ১৮২
৩৮. ভারতের খাদ্য-সংকট ১৮৩/ক. প্র. '০০
৩৯. ভারতে ধরা ও বজ্রা-নিয়ন্ত্রণ ১৮৩
৪০. ভারতের সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা ১৮০
৪১. সাম্প্রতিক গণ্যমূল্য-বৃদ্ধি ও গণ-জীবন ১৮৫
- ✓ ৪২. মূল-ম্যাগাজিন ১৮৬
৪৩. পল্লী-সংগঠনে ছাত্রদের দায়িত্ব ১৮৬

১৪৪. সমস্তা-অর্জব পশ্চিমবঙ্গ ১৮৭
১৪৫. কৃষিকার্ষে বিজ্ঞান ১৮৭
১৪৬. একটি রেল-স্টেশন ১৮৮
১৪৭. তোমার একটি রেল-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ১৮৯
১৪৮. একটি ফুটবল খেলার বর্ণনা ১৮৯/১৯০
১৪৯. তোমার ভালো-লাগা একটি চলচ্চিত্র ১৯০
১৫০. ভারতীয় জীবনে ক্রমায়ণের প্রভাব ১৯০
১৫১. গৃহসজ্জা ১৯১
১৫২. নগর সজ্জা ১৯২

## ব্যাকরণ

### ক. নবম শ্রেণীর জ্ঞান

#### প্রস্তাবনা ১

ভাষা ও ব্যাকরণ/বাংলা ভাষা/বাংলা ব্যাকরণ ১-৩

#### ১. সাধু ও চলিত ভাষা ৪-১৩

ভাষা ও উপভাষা সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য/বাংলা সাধুভাষার দৃষ্টান্ত/বাংলা চলিত ভাষার দৃষ্টান্ত/সাধুভাষা হইতে চলিত ভাষায় রূপান্তর/চলিত ভাষা হইতে সাধু ভাষায় রূপান্তর/গুরুচণ্ডালী শৌর্যগাণ্ঠি বাংলা শব্দের সন্ধি।

#### ২. বর্ণ ও বর্ণের উচ্চারণ ১৩-৩২

বর্ণ/বর্ণ ও অক্ষর/স্ববর্ণ, স্বরবর্ণের উচ্চারণ-স্থান/ব্যঞ্জনবর্ণ/ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ-স্থান/ বাংলা বর্ণসমূহের উচ্চারণ-স্থান অক্ষর-শ্রেণীগত পরিচয়/বাংলা বর্ণের উচ্চারণ-বৈচিত্র্য/ বাংলা যুক্তাক্ষরের উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য। একই বর্ণের বিভিন্ন ধ্বনি/বিভিন্ন বর্ণের একই ধ্বনি/ধ্বনি-বিলোপ/বিলোপী শব্দের বাংলা বর্ণীকরণ।

#### ৩. ক্রিয়াপদ ৩৩-৫৪

ক্রিয়াপদ/ধাতু ও প্রত্যয়/সমাপিকা ক্রিয়া ও অসমাপিকা ক্রিয়া/ক্রিয়া-বিভক্তি/ সিদ্ধ বা মৌলিক ধাতু/সাদিত ধাতু/কৃত্যাত্মক ধাতু/গিহন্ত ধাতু বা প্রেরণার্থক ধাতু বা প্রযোজক ধাতু/কর্মবাচ্যের ধাতু/যৌগিক ধাতু/সংযোগমূলক ধাতু/যৌগিক ক্রিয়া ও সংযোগমূলক ক্রিয়ার পার্থক্য/কৃত্যাত্মক ক্রিয়া ও প্রযোজক বা গিহন্ত ক্রিয়া/অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রকার-ভেদ/ক্রিয়াবাচক বিশেষণ/ক্রিয়াবাচক বিশেষণ গঠনের উপায়/ক্রিয়াবাচক বা ভাববাচক বিশেষ্য/ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বা ভাববাচক বিশেষ্য গঠনের উপায়/পদক্রিয়া বা অসম্পূর্ণ রূপ ক্রিয়া/অর্থক ধাতু/মনস্ত ও যত্ত্ব ধাতু/সকর্মক ও অকর্মক ক্রিয়া/ মৌলিক ক্রিয়া, যৌগিক ক্রিয়া ও সংযোগমূলক ক্রিয়া/ক্রিয়ার কাল/বর্তমান কাল/অতীত কাল/ভবিষ্যৎ কাল/মর্মলিক ও যৌগিক কাল/ক্রিয়ার ভাব/ক্রিয়ার রূপ-বৈচিত্র্য।

## তীপত্র

### ৪. অব্যয় ৫৫-৬১

অব্যয়/অব্যয়ের জ্ঞেয়-বিভাগ/পদাংশী অব্যয়/অন্যশী অব্যয়/সংযোজক অব্যয়/বিশেষক অব্যয়।

### ৫. কৃৎ-প্রত্যয় ও তদ্ধিত-প্রত্যয় ৬২-৭৯

কৃৎ-প্রত্যয় ও তদ্ধিত-প্রত্যয়/প্রত্যয়/কৃদন্ত শব্দ/তদ্ধিতান্ত শব্দ/কৃৎ-প্রত্যয়, ধাতুঘন্য প্রত্যয় ও ধাতু-বিভক্তি/প্রত্যয় ও বিভক্তি/কৃৎ-প্রত্যয় ও তদ্ধিত-প্রত্যয় যোগের বিধি/কৃৎ-প্রত্যয়/সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয়/বাংলা কৃৎ-প্রত্যয়/সংস্কৃত তদ্ধিত-প্রত্যয়, বাংলা তদ্ধিত-প্রত্যয়/বিদেশী তদ্ধিত-প্রত্যয়।

### ৬. উপসর্গ ও অনুসর্গ ৮০-৮৫

উপসর্গ/সংস্কৃত উপসর্গ/উপসর্গরূপে সংস্কৃত অব্যয়, বাংলা উপসর্গ/বিদেশী উপসর্গ, অনুসর্গ।

### ৭. শব্দের বিশিষ্ট প্রয়োগ ৮৬-১০৬

শব্দের বিশিষ্ট প্রয়োগ/বিশেষ্য পদের বিশিষ্ট অর্থে প্রয়োগ/বিশেষণ পদের বিশিষ্ট অর্থে প্রয়োগ/ক্রিয়াপদের বিশিষ্ট অর্থে প্রয়োগ/একই শব্দের বিভিন্ন পদরূপে প্রয়োগ, সম্বোধন/সিদ্ধার্থক শব্দ।

## খ. কশম জ্ঞেয়ীর জ্ঞাত

### ১. সমাস ১০৭-১৩০

সমাস/সন্ধি ও সমাসের পার্থক্য/সমাসের প্রকার-ভেদ/দ্বন্দ্ব সমাস/দ্বন্দ্ব সমাসে কতকগুলি বিশিষ্ট ব্যবহার/তৎপুরুষ সমাস/তৎপুরুষ সমাসের বিবিধ রূপ/তৎপুরুষ সমাসের অতিরিক্ত প্রকার-ভেদ/কর্মধারয় সমাস/কর্মধারয় সমাস সম্পর্কে কতকগুলি বিশেষ সংস্কৃত-বিধি/কর্মধারয় সমাসের প্রকার-ভেদ/দ্বিগু সমাস/বহুব্রীহি সমাস/বহুব্রীহি সমাসের প্রকার-ভেদ/বহুব্রীহি সমাসের কতকগুলি স্মরণীয় নিয়ম/অব্যয়ীভাব সমাস/সমাসান্তর প্রত্যয়/নিত্য সমাস/সমাসজনিত অর্থ-পার্থক্য।

### ২. বাংলা শব্দ-সম্ভার ১৩১-১৩৫

বাংলা শব্দ-সম্ভার/মৌলিক শব্দ ও আগন্তুক শব্দ/তৎসম শব্দ/তদ্ভব শব্দ/অর্থ-তৎসম শব্দ/দেশী শব্দ/বিদেশী শব্দ/খাঁটি বাংলা শব্দ/মিশ্র শব্দ/অপভ্রংশ/ইতর শব্দ/ধণ্ডিত শব্দ।

### ৩. শব্দ-বৈত ও ক্ষতাত্মক শব্দ ১৩৬-১৪৭

ক্ষতাত্মক শব্দ ও শব্দ-বৈত/ক্ষতাত্মক শব্দ বা অক্ষরাত্মক শব্দ/ক্ষতাত্মক শব্দের বিশেষরূপে ব্যবহার/ক্ষতাত্মক শব্দের ক্রিয়াক্রমে ব্যবহার/ক্ষতাত্মক শব্দের বিশেষরূপে ব্যবহার।

## ৪. বাক্য-প্রকরণ ১৪৮-১৫৮

বাক্য: অর্থ ও বাক্যের প্রকার-ভেদ/বাগর্থ/অভিধা/লক্ষণ/ব্যঞ্জনা/যোগ্যতা/আকাজ্জা/আসত্তি/বাক্যের গঠন-ভিত্তিক প্রকার-ভেদ/সরল বাক্য/নিজ বা অপর বাক্য/যৌগিক বাক্য/বাক্যের অর্থ-ভিত্তিক প্রকার-ভেদ/বাক্য-পরিবর্তন/অর্থের ভিত্তিতে বাক্যের রূপান্তর/গঠনের ভিত্তিতে বাক্যের রূপান্তর।

## ৫. বাক্য-প্রসারণ ও বাক্য-সংকোচন ১৫৯-১৬৮

বাক্য-প্রসারণ/উদ্দেশ্য ও বিষয় অংশ প্রসারণ/বাক্য-সংহতি/তদ্বিত-প্রত্যয় যোগে/কৃৎ-প্রত্যয় যোগে/সমাসের দ্বারা।

## ৬. বাগ্‌ধারা, প্রবাদ ও প্রবচনমূলক বাক্য ১৬৯-১৮৮

বাগ্‌ধারা/প্রবাদ ও প্রবচন।

## ৭. অশুদ্ধি সংশোধন ১৮৯-১৯৯

পাঠ্যগ্রন্থের ব্যাকরণ ২০১-২৪২

নবম শ্রেণী—গত্যাংশ/পত্যাংশ

দশম শ্রেণী—গত্যাংশ/পত্যাংশ

## ৮. বঙ্গানুবাদ ১-২৪

ক. বাক্যের ভিত্তিতে অনুবাদ ২

খ. অনুচ্ছেদ—অনুদিত ৮

গ. অনুচ্ছেদ—সংকেত-সহ ১৭

ভাবার্থ-রচনা ও ভাব-সম্প্রসারণ ১-২২

প্রস্তাবনা

১. ভাবার্থ-রচনা

২. ভাব-সম্প্রসারণ।

অতিরিক্ত সংযোজন ২৩-৫৯

## ● প্রবন্ধ

\*৫৪. শরণচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী ২৩ / \*৫৫. বর্তমান ভারতে অক্ষরী ব্যবস্থা ২৬ / \*৫৬. প্রধানমন্ত্রীর বিশদকর্ম কর্মসূচী ও তাহার রূপায়ণ ২৮ / \*৫৭. ভারতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ : আর্ঘট ৩০।

## ● প্রবন্ধ-সংকেত

৫৩. পরীক্ষার পূর্বপ্রাঙ্গি ৩৩ / ৫৪. পরীক্ষা-কক্ষের বর্ণনা ৩৩ / ৫৫. একটি ক্রিকেট ম্যাচ ৩৪ / ৫৬. একটি দুর্ঘটনা ৩৪ / ৫৭. বর্ষায় পরীক্ষায় ৩৫ / ৫৮. বঙ্গপ্রাঙ্গী-সংরক্ষণ ৩৫ / ৫৯. পক্ষীর আগমন ৩৬ / ৬০. বাংলার যে কোন একটি উৎসব ৩৬।

## ● ভাবার্থ ও ভাবসম্প্রসারণ

## ● বঙ্গানুবাদ

## ● প্রবন্ধ/২৭. ১০

# রচনা. বিচিন্তা

## ১ প্রবন্ধ

ওরে, ওই উঠেছে শঙ্খ বেজে, খুলল দ্বার মন্দিরে যে—  
লগ্ন বয়ে যায় পাছে, তাই, কোথায় পূজার অর্ঘ্য ।  
এখন বারু-বা-কিছু আছে ঘরে সাজা পূজার ঝালার 'পরে  
আত্মদানের উৎসাহার মঙ্গলচিহ্ন তবু গো ।'

—রবীন্দ্রনাথ



প্রবন্ধের মূল ভিত্তি মননশীলতা। মননশীলতায় প্রবন্ধের জন্ম, কিন্তু শেষ নয়। মননশীলতার শুষ্ক প্রান্তরে আবেগের বারিবর্ষণও প্রয়োজন। তাতেই প্রবন্ধের বীজ বপন করতে হবে। তবেই সোনার কসলের লগ্ন সমাগত হয়। কিন্তু ভাবাবেগের অতিবর্ষণ আবার শত্রুর পক্ষে হানিকর, তাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ভাবের উন্নত বস্তায় মূল বক্তব্য যেন ভেসে না যায়, সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। কারণ, হৃদয় ও মনের সূষ্ঠ সমাহারেই প্রবন্ধের চরম সফলতা।

তথ্য হচ্ছে প্রবন্ধের কংকাল। তা দিয়ে প্রবন্ধের মোটামুটি একটা কাঠামো [ Structure ] গড়ে তোলা যেতে পারে। কিন্তু তা প্রবন্ধ নয়। তাতে প্রাণ সঞ্চার করতে পারা চাই। তথ্যগুলিকে পরিকল্পনামতো প্রথমে সাজাতে হবে। তারপর পরিবেশনের কাজ। পরিবেশন-নৈপুণ্য আনতে হলে প্রকাশভঙ্গি কোথাও হবে গুরুগম্ভীর, কোথাও হবে লঘু পরিহাস-চটুল; কোথাও বিদ্রূপ-বক্রোক্তির তির্যক কশাঘাত হানতে হবে, কোথাও বা মনস্বী মহাপুরুষদের স্মৃতিষিত বালি-মঞ্জরীর দু' একটি চয়ন করে উপযুক্ত স্থানে সন্নিবেশ করতে হবে। তারপর আছে প্রারম্ভিক-বাক্য ও সমাপ্তি-বাক্য রচনার শিল্প-নৈপুণ্য। এই বাক্য দুটি নিভুল, নিটোল এবং দৃঢ়পিনক হওয়া চাই। বাক্য দুটির শাফল্য প্রবন্ধের সামগ্রিক সাক্ষ্যের দুয়ার খুলে দেবে। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, প্রবন্ধের ভাষা আত্মস্ব হয় সাধু অথবা চলিত ভাষা হওয়া চাই। দুইয়ের সংমিশ্রণে 'গুরুচণ্ডালী' দোষে সমগ্র প্রবন্ধটি দুষ্ট হতে পারে।

'রচনা বিচিন্তা'য় প্রতিটি প্রবন্ধের শীর্ষে প্রবন্ধ-সূত্র প্রদত্ত হয়েছে। তাতে বিষয়টির উপলব্ধি এবং মনে রাখা সহজ হবে এবং দ্রুত পরীক্ষা-প্রস্তুতির সহায়ক হবে। প্রবন্ধ-শেষে পাদ-টীকায় অনুসারী প্রবন্ধ-সূচী প্রদত্ত হয়েছে। তার দ্বারা ছাত্র-ছাত্রীরা এই প্রবন্ধ রচনার ক্ষমতা আয়ত্ত করতে পারবে। তাছাড়া বহু প্রবন্ধের বিস্তারিত প্রবন্ধ-সংকেত দেওয়া হয়েছে, যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা অনায়াসে সম্পূর্ণ প্রবন্ধগুলি রচনা করে নিতে পারবে। আমাদের বিশ্বাস, 'রচনা বিচিন্তা'র সাহায্যে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রবন্ধ-রচনার শক্তি সংগঠন করে আত্মনির্ভর হয়ে উঠবে এবং পরীক্ষা-দিনে বিশেষ সফলতা লাভ করতে পারবে।

প্রবন্ধ-সূত্র : সূচনা । স্থলে ভর্তি । স্থলে  
বাইবার প্রস্তুতি । স্থল সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা ।  
প্রস্তুতির সম্পূর্ণতা । স্থলে যাত্রা । প্রথম দিনের  
অভিজ্ঞতা । উপসংহার ।

## তোমার বিদ্যালয়-জীবনের প্রথম দিনের স্মৃতি

তখন আমি ছিলাম নিতান্তই শিশু—অজ্ঞতার অন্ধকারে বন্দী। আমার জগৎ  
বলিতে ছিল আমাদের বাড়ি, বাড়ির উঠোন এবং বাড়ির সম্মুখের কিছুদূর রাস্তা।  
তাহার বাহিরে যে বিশাল জগৎ, সে সম্পর্কে আমার কোন ধারণাই ছিল না। আমি  
দিনরাত বাড়ির মধ্যে দাপাদাপি করিয়া বেড়াইতাম, বাড়ির উঠোনে নিজের মনে  
খেলিতাম আর স্বেযোগ পাইলে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িতাম। দিদি বলিত, রাস্তায়  
একা বাহির হইলে কাবুলিওয়ালার ধরিয়া লইয়া যাইবে। তাই  
সূচনা

রাস্তায় বেশীদূর যাইতে সাহস হইত না। কিন্তু দূরের মাঠ,  
মাঠের ওপারে গ্রামরেখা এবং সুদূর নীলাকাশ আমাকে হাতছানি দিয়া ডাকিত।  
আমি দূরের দিকে তাকাইয়া থাকিতাম। কুয়াশার মতো রহস্তের এক আশ্চর্য  
মায়াজাল সারা পৃথিবীকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। দাদার এসব দেখিবার কত সুবিধা!  
সে স্থলে যায়। সে প্রাণ ভরিয়া কত কী দেখিতে পায়! আমি বাড়িতে বন্দী—  
অজ্ঞতায় বন্দী। কবে মুক্তি পাইব?

দেখিতে দেখিতে আমার বয়স চার বছর পূর্ণ হইল। বাবা একদিন বাড়ি কিরিয়া  
বলিলেন যে, তিনি আমাকে স্থলে ভর্তি করিয়া দিয়া আসিয়াছেন। আমি মনে মনে  
খুশী হইতে পারিলাম না। কারণ ছোটবেলা হইতে আমার সাধ ছিল, আমি দাদার  
স্থলে ভর্তি হইব, দাদার মতো রোজ রিকুশায় চড়িয়া স্থলে যাইব। কিন্তু আমার  
সে আশা অপরূপ থাকিয়া গেল। বাবা আমাকে আমাদের স্থানীয় স্থলেই ভর্তি  
করিয়া দিয়া আসিয়াছেন। আমি যেন দাদার কাছে চিরদিনের  
স্থলে ভর্তি মতো পরাজিত হইলাম। তাহার উপর দাদা এই স্থল সম্বন্ধে  
নানা অজগুবি বলিয়া আমাকে ভয় পাওয়াইয়া দিয়াছিল। এই স্থলে নাকি  
কারণে-অকারণে কষ্ট শাস্তদানের ব্যবস্থা আছে, সহপাঠীরা শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের  
নিকট নানা মিথ্যা অভিযোগে শাস্তি দেওয়ায়। বাবা আমাকে সেই স্থলেই ভর্তি  
করিয়া দিয়া আসিয়াছেন—সে কথা ভাবিয়া আমি মনে মনে বিপন্ন বোধ করিতে  
লাগিলাম। কিন্তু মুখ ফুটিয়া কাহাকেও কিছু বলিতে পারিলাম না।

বাবা স্থল হইতে একখানা বুকলিস্ট লইয়া আসিয়াছিলেন। সেদিন সন্ধ্যায় দোকান  
হইতে আমার বই খাতা পেন্সিল সব কিনিয়া আনা হইল। বইগুলি দেখিয়া উহাতে  
কি লেখা আছে, তাহা পড়িত আমার খুব ইচ্ছা হইতে লাগিল।  
স্থলে বাইবার প্রস্তুতি কিন্তু পড়িব কি প্রকারে? তখনও তো আমার অক্ষর-জ্ঞান হয়  
নাই। দিদি বইগুলির কিছু অংশ পড়িয়া শুনাইল। শুনিয়া খুব মজা পাইতে

লাগিলাম। বইগুলির ছবি দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা কাটিয়া গেল। আর বইগুলির কী স্বপ্নের গন্ধ! আমি সেই গন্ধ শুঁকিতে শুঁকিতে বৃকের উপর বইগুলি লইয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম।

যেদিন আমি স্কুলে প্রথম আসিয়াছিলাম, সেদিনটির কথা আমার খুব মনে পড়ে। আজ কৈশোরের শেষ প্রান্তে দাঁড়াইয়া আমার শৈশবের সেই রোমাঞ্চকর দিনটির কথা মনে মনে স্মরণ করি। সেই দিনটিই স্কুলে আমার প্রথম দিন—আমার বিদ্যালয়-জীবনের সেই হইল প্রথম দিন। স্কুল সম্বন্ধে তাহার পূর্বে আমার মনে ছিল কত উদ্ভট সব চিন্তা, কত ভয় আর কত উদ্বেগ। সেখানে নাকি খেলাধুলা করিতে দেওয়া হয় না, শুধু হইতে শেষ পর্যন্ত পড়া—কেবল পড়া। লেখাপড়া ছাড়া কোন কথাই নাকি সেখানে নাই, পড়া না পারিলে সেখানে খুব কঠিন শাস্তি দেওয়া হয়। এমনি কত দুশ্চিন্তায় আমার শিশু-হৃদয় সেদিন তারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

পরের দিন আমার নূতন জামা-প্যান্ট আসিল। শাদা জামা—বুক-পকেটে উল্লীয়মান হৃবের ছবি; প্যান্টের রং গাঢ় নীল। এগুলি নাকি আমার স্কুলের ইউনিকর্ম। সেই সঙ্গে আসিল নীলরঙের একটি স্লটকেস, টিকিনের বাক্স এবং ধাবার জলের বোতল। এই সব দেখিয়া মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল। কিন্তু রাতে বিছানায় ঘুমাইতে ঘাইবার সময় দাদা কানের কাছে কিস কিস করিয়া বলিল—‘ঐ স্কুলে কিছ পড়া না পারিলে ঘরে আটকাইয়া রাখার ব্যবস্থা আছে।’ ভয়ে আমার বুক শুকাইয়া গেল। দাদার কথা ভাবিতে ভাবিতে আমি মনে মনে আমার স্কুলের একটি ছবি আঁকিয়া ফেলিলাম। বলা বাহুল্য, সেই ছবির সঙ্গে ভেলধানার ছবির বিশেষ তফাৎ ছিল না।

সকালে ঘুম ভাঙিতেই আমার দাদার কথাটাই বেশী করিয়া মনে পড়িতে লাগিল। স্কুলের কথা যতই ভাবিতেছিলাম, ততই ভয়ে আমার বুক শুকাইয়া আসিতে লাগিল।

দাদি আমাকে জোর করিয়া বিছানা হইতে তুলিয়া আমার স্কুলে ঘাইবার কথা মনে করাইয়া দিল। তখনও ভয় পাইলাম। দাদি আমাকে ঈষদ্রুত স্কুলে নমন করাইয়া পাওয়াইতে বসিল। পাওয়ার দাদি আমাকে আমার স্কুলের ইউনিকর্ম সাধাইয়া দিল। স্লটকেসে বই এবং টিকিনের বাক্স চলিল, কাছে চলিল জলের বোতল। দাদির হাত ধরিয়া ভয়ে ভয়ে স্কুলের পথে পাড়ি দিলাম।

যতই স্কুলের নিকটবর্তী হইতে লাগিলাম, ততই ভয়ে হৃদয়টা আরো জোরে জোরে টিপটিপ করিতে লাগিল। কত বড় স্কুল! কত ছেলেমেয়ে! কত বড় গেট! গেটে কত বড় ঘণ্টা! এক পাশে গোঁকওয়াল কত মোটা ঘারোয়ান! দাদি আমাকে আমাদের ক্লাসের শিক্ষিকার কাছে লইয়া গেল। মীরাদি আমাকে প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার স্মিট ব্যবহারে আমি মুগ্ধ হইলেও আমার অন্তরে ভয় তখনও কাটে নাই। দেখিলাম, আমার বয়সী কত

দাদি বলিল—‘চাটির পর আসিয়া

তোকে ঠিক লইয়া যাইব। মন দিয়া পড়াশুনা করিস।’ আমি মীরাদিকে এবং স্কুলের ছেলেমেয়েদের দেখিতেছিলাম। পিছন কিরিয়া চাহিয়া দেখিলাম, দিদি নাই। আমি কাঁদিয়া কেলিলাম। মীরাদি আমাকে সাহায্য দিয়া সম্মুখে আমার হাতে একটি খেলনা দিয়া একটা সীটে বসাইয়া দিলেন। আমি কান্না ভুলিয়া গেলাম। কিছুক্ষণ পরেই প্রার্থনার ঘণ্টা বাজিল। আমি মীরাদি এবং অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে স্কুলের হলঘরে গিয়া প্রার্থনায় যোগদান করিলাম। প্রার্থনার পর সকলে যে যাহার জায়গায় আসিয়া বসিলাম। আমি চারিদিকে তাকাইলাম। কেহ আমাকে দেখিতেছে না। সেই ফাঁকে আমি স্টুটকেন্স খুলিয়া টিকিনের বাক্স বাহির করিয়া দিদির-দেওয়া টিকিনগুলি শেষ করিয়া কেলিলাম।

তারপর পড়াশুনা আরম্ভ হইল। মীরাদি স্মরণ করিয়া আমাদের ছড়া শিখাইলেন। ছড়ার পর হাতের লেখা। তারপরই খেলাধুলা আরম্ভ হইয়া গেল। কয়েকজনের সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব হইয়া গেল। তাহাদের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া খেলা করিলাম। বিকালে ছুটি হইল। ছুটির পর বন্ধুদের কাছে বিদায় লইতে কষ্ট হইতেছিল। মনে মনে বলিলাম, কাল আবার আসিব। কাল উপসংহার আবার বন্ধুদের সঙ্গে খেলাধুলা হইবে। সেদিন স্কুলে আসিয়া প্রথমে কাঁদিয়া কেলিয়াছিলাম, আর আজ স্কুলে আসিতে না পারিলে আমার কান্না পায়। কিন্তু দাদা যে আমার স্কুল সম্বন্ধে কত বড় মিথ্যা কথা বলিয়াছিল, তাহা পরে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে ॥

প্রবন্ধ-সূত্র : রচনা। গ্রামের নাম  
নিশ্চিন্তপুর। গ্রামের গৌরব বর্ণনা। তাহার  
কর্মব্যবস্থার রূপ। তাহার সামাজিক ও অর্থনৈতিক  
জীবন। তাহার সাংস্কৃতিক জীবন। উপসংহার ॥

## আমার গ্রাম

উ. মা. '৩৯

“বাধিলাম ঘর এই গ্রামা আর খজনার দেশ ভালোবেসে,

ভাসানের গান শুনে কত বার ঘর আর খড় গেল ভেসে

মাথুরের পালা বেঁধে কতবার কাঁকা হ'ল খড় আর ঘর।” — জীবনানন্দ দাশ

বাংলার আম-জাম-কাঁঠালের ছায়াভরা গ্রামেই বাংলার করুণ-সুন্দর মুখ আমি দেখিয়াছি। তাহার জামল-শোভন, ছায়া-সুনিবিড় পথে আমার বাড়িল মন উদাস হইয়া কেঁরে। এইখানে আসিলে আমি যেন চিরন্তন বাংলাদেশের স্পর্শ পাই, পাই তাহার স্নায়ু ভ্রাণ। এখানকার অব্যবহিত প্রসন্ন আকাশ, দিগন্তশায়ী শস্য-প্রান্তর, দোয়েল-খজনা-শালিক-বঁউ-কথা-কণ্ড পান্থির কল-কুজন আমার হৃদয়ে যেন

রচনা

কোন এক স্বপ্নলোকের ইন্দ্রজাল রচনা করিয়া দেয়। তাহার বেণুবনে, বেতস-কুঞ্জ, বনের পত্র-মর্মরে এবং স্নেহশালিনী নদীর কলগুঞ্জে আমার তাপদীর্ঘ হৃদয় চুরি গিয়াছে। মায়ের স্নেহ-সম্ভাষণের মতো, তাহার করুণ মমতাভরা দৃষ্টির মতো গ্রামখানির অঙ্গে যেন জড়াইয়া রহিয়াছে এক মাদাময় শিথল রূপশ্রী।

গ্রামের নাম নিশ্চিন্তপুর। চারিদিকে ধূ-ধূ বিস্তীর্ণ মাঠ, মাঝখানে একটি সবুজ বীপের মতো স্বপ্ননা গ্রামখানি জাগিয়া আছে। মাঠের পূর্বপ্রান্তের কিনারা ঘেঁষিয়া প্রতিদিন প্রভাতে প্রকাণ্ড সূর্য উঠিয়া আসে। বনে বনে পান্থির গলায় বাজিয়া উঠে মধুর-ললিত প্রভাত-কাকলি। মাঠে মাঠে অলস ভঙ্গিতে গ্রামের গোরুগুলি চরিতে থাকে। অব্যবহিত মাঠ এবং প্রসন্ন আকাশ পূর্ণ করিয়া বাজিতে থাকে রাখালের

গ্রামের নাম  
নিশ্চিন্তপুর

মন-উদাস করা বাঁশ। তারপর গ্রামের ছায়াবটের নীচে কর্মহীন রাখাল-বালকদের বসে খেলার আসব। দূরে সৰু আঁকাবাঁকা মেঠোপথ ধরিয়া হাঁটিয়া আসে নিঃসঙ্গ পথিক। বনের শুকনো পাতা, দিঘির কলমী-ঢাক, বনতুলসী-ভাটফুল ইত্যাদি অভ্রান্ত নাম-না-জানা ফুল-ভ্রাণ এবং দোয়েল-শামা-শালিক-খজনার কল-কাকলি তাহাকে গ্রামের অঙ্গের আমন্ত্রণ জানান। আম-কাঁঠাল-নিম-অজুন-শিরিম তাহার মাথার ছায়া ষিছাই দেয়। পথের দুধারের তরুণা হইতে ঝুলন্ত গুলকলতা পেলব বাত দিয়া ঝাঝকের গলা জড়াইয়া ধরিয়া প্রশ্ন শুধায় : ‘হে বন্ধু, আছ তো ভালো?’

বাকালীর সম্মুখে গ্রাম-লক্ষীর রূপময় অন্তর-লোকের অন্তর-ঢা যেন খুলিয়া যায়। তাহার পল্লবঘন আশ্রয়কানন, তাহার রাখালের স্বপ্নময় খেল, তাহার শুক-অতল দিঘিকালো-জলে নিশীথ-শীতল স্নেহ অপূর্ব মাধুর্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। কোথাও কলমীর দাম এবং শাপলা-ফুলে-ভরা দিঘির বিষম জলে, টি হাঁস খেলা করিতেছে, কোথাও সজিনা গাছের ডালে ডানা গুটাইয়া ধ্যানমগ্ন বরষা পরম আরামে রৌদ্রে সেবন করিতেছে, কোথাও লেজঝোলা পাখি পরমানন্দে বাজে ডিগ্বাজি ধাইতেছে, কোথাও প্রচুর হাস খাইয়া একটি গোরু রৌদ্রে হাঁস-পরম পরিতৃপ্তিতে রোমন্থন

করিতেছে, একটি কাক তাহার মেরুদণ্ডের উপর বসিয়া তাহাকে বিরক্ত করিতেছে, গোকটি মাথা ও লেজ নাড়িয়া তাহাতে তীব্র আপত্তি জানাইতেছে। কলসী কাঁধে লইয়া গ্রামের বধু বিজালয়-ভবনের ও-পাশের নলকূপ হইতে জল লইয়া যাইতেছে, কলসের আঁটি মাথায় লইয়া চাষীরা বাড়ি ফিরিতেছে, ছেলেরা বই-বগলে লইয়া বিজালয়ে যাইতেছে। যাইতে যাইতে তাহারা তালগাছের বাকলে বাবুইয়ের ঝুলন্ত বাসার দিকে পরম কোতূহল দৃষ্টিতে তাকাইতেছে। কোথাও গ্রামের কুকুরগুলি নিকরদেশভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সেখানে পুকুরের ধারে হিজল-গাছের ডালে একটি মাছরাঙা এতক্ষণ চূপ করিয়া বসিয়াছিল, হঠাৎ ঝুপ্ করিয়া জলে বাঁপ দিয়া একটি মাছ ধরিয়া লইয়া গেল। দূরে বনাস্তরাল হইতে অত্যন্ত ব্যথা-বিস্মল স্বরে একটি ঘুঘু ডাকিতেছে। একটি শম্ভলি মাথার উপর দিয়া যেন তীব্র নিখাদে আকাশের নির্মল

প্রশান্তি বিদীর্ণ করিয়া দিয়া উড়িয়া গেল। জাল কাঁধে লইয়া গ্রামের সৌন্দর্য বর্ণনা জেলেরা নদীর দিকে চলিয়া গেল। হাটের জনশৃঙ্খলায় টিনের ছোট ছোট চালাঘরগুলি রোঁদে দাঁড়াইয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে। রথতলা বামে রাখিয়া এবং মন্দির ও নদীর গোলা পিছনে ফেলিয়া গ্রামের রাস্তা আঁকিয়া আঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে। তারপর বিশালাঙ্গীর মন্দির ছাড়াইয়া চৌপুরাদের মাটির পাঁচিলের গা বেঁসিয়া, রায়দের প্রপুরির বাগান ডান দিকে রাখিয়া বাগদিদের রাস্তাচিতার বেড়ার পাশ দিয়া এবং মশজিদকে পিছনে ফেলিয়া রাস্তাটি অলসভাবে গিয়া নদীর বাঁধের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িয়াছে। নদীর ঘাটে কয়েকটি ডিঙি-নৌকা বাধা, একটি-কি-দুইটি ডিঙি, রোঁদে পিঠ দিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে, ছেলেমেয়েরা জলে নামিয়া সোন্নাসে স্নান করিতেছে। সমস্ত কিছুর মিলিয়া-মিশিয়া গ্রামের সৌন্দর্যের পাত্রটি যেন কানায় কানায় পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে এবং এইখানে আমার মনটিও চুরি গিয়াছে।

‘তোমরা যেখানে সাধ চলে যাও—আমি এই বাংলার পারে রয়ে যাব।’ নিশ্চিন্ত-পুরের চানীরা তাল-বলদ লইয়া মাঠে চাষ করিতে যায়, তাহারা বীজ বোনে, পাকা ফসল খামারে তোলে। জেলেরা মাছ ধরে, ঘরামিরা ঘর বানায় এবং মেরামত করে, কুঁসরেরা হাঁড়ি-কলসী তৈয়ারী করে, কামারেরা লোহার জিনিসপত্র বানায়, তাঁতী তাঁত

অনুবা ঘানিতে তেল তৈয়ারী করে। কোথাও চাষী বলদ হাঁকিতেছে, কোথাও নদীতে দাঁড়ের ছপছপ শব্দ উঠিতেছে, কোথাও কুমোরের তাহার কর্মব্যস্ততার শব্দ চাকের শব্দ শোনা যাইতেছে, কামারের কামারশালায় কোথাও ‘ঠকা ঠাই ঠাই’ শব্দে নেহাই, কোথাও ‘কলুর ঘানির তীক্ষ্ণকাতর নিখাদ স্বর’ গ্রামের আকাশ পূর্ণ হইয়া তুলিতেছে। তাহাদের বিচিত্র কর্মকোলাহলের কলধ্বনির সহিত তাঁতীর তাঁতবোনা শব্দ, রাখালের বাঁশির স্বর, ঢেঁকির পাড়ের শব্দ ইত্যাদি মিলিয়া-মিশিয়া সৃষ্টি করিতেছে এক অপূর্ব একতান।

এইভাবে গ্রামের জীবনচক্র প্রতিদিন বিচিত্র ভঙ্গিতে বিকশিত হইয়া উঠে। তাহার জীবন খুব সচ্ছল নয়, কিন্তু একটি আশ্চর্য আনন্দভূমির ভাব লাগিয়া আছে গ্রামের অধিবাসীদের চোখে-খুঁ দৈন্ত আছে, অভাব-অনটন আছে, আছে

রোগভাণের জ্বালা। কিন্তু তাহাই সব নয়। আর্থিক অস্বচ্ছন্দ্যের উপর মুখর হইয়া উঠে এক অপরাধের প্রাণ-প্রাচুর্য। হাট তাহার বিনিময়-কেন্দ্র। মহাজন ও বিভিন্ন ব্যবসায়ীরা গ্রামের পণ্য-সম্ভার দূরে শহরে, গঞ্জে কিংবা রেল-স্টেশনে চালান দেয়। গ্রামের সকলের পণ্য-পরিমাণ কমিষ্ণু নাই; আবার, অবস্থাপন্ন সচ্ছল বাহারা, তাহারা প্রয়োজনান্তিরিক্ত জমির মালিক। তাহারা কোঠাবাড়িতে তাহার সাময়িক ও অর্থনৈতিক জীবন বাস করে। তাহাদের মধ্যে কেউ করে মহাজনী কারবার, কেউ করে ব্যবসা-বাণিজ্য, আবার বড় বড় চাকরিও করে কেউ কেউ। কিন্তু বাহারা সন্ততিহীন, তাহারা অগ্রের কাজে মজুর খাটিয়া কিংবা শ্রম-পরিমাণ জমির চাষ করিয়া কারজকে দিনাতিপাত করে। অথচ, তাহাদের কাহারও বিরুদ্ধ নালিশ নাই, বিক্ষোভ নাই।

যুগ যুগ ধরিয়া পূজা-পার্বণ ও উৎসব-অনুষ্ঠান ইত্যাদির মধ্য দিয়া গ্রামের সাংস্কৃতিক জীবন বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। সংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবে হুগী পূজা, কালী পূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা, সরস্বতী পূজা, বিষ্ণুকমা পূজা, কুলন, গাজন, নবদর্শ, দেল, মংরম ইত্যাদি উৎসব তো তাহার বারো মাসের তেরো পার্বণ গ্রামের রপ্তলায় বসে রখের মেলা, বারোয়ারিতলায় হুগী পূজা ও কালী পূজায় আসে শহরের সাকীসের দল, চড়কের সময় গাজন হুগায় বসে চড়কের মেলা। অধুনা তাহাদের সন্ততি মিশিয়াছে পনেরই আগস্ট পাঁচশে বৈশাখ, তেইশে ও ছাব্বিশে জ্যৈষ্ঠারী ইত্যাদি নবযুগের উৎসবসমূহ। তাহা ছাড়া নবান্ন, অন্নপ্রাশন, জামাই-বট, ব্রাহ্ম-দ্বিতীয়া ইত্যাদি তো আছেই।

হাইতো নিশ্চিন্তপুরের 'চায়া-জুনি'দড় শাস্তুর নীড়' আনার বড় ভালো লাগে। ভালো লাগে তাহার কীর্তন-ভাসান-রূপকথা ও ব্যাড়া-পাঁচালীর নরম নিবিড় ছন্দ। কিন্তু তাহার অপরাধের প্রাণরস নিঃশেষে শোষণ করিবার জন্য যেভাবে সদগ্রামী যত্ন-সভাভা ও নাগরিকতার উগ্র অক্রমণ সূচিত হইয়াছে, তাহাতে নিশ্চিন্তপুরের মাছুসগুলি আর বেশীদিন নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবে, বোধ হয় না। সেদি উপসংহার হয়তো আর কুটির কুটিরে সন্ধ্যায় শাঁখ বাজিবে না, বিশাল মন্দিরে আর আরতির ঘণ্টা শোনা যাইবে না, মসজিদে আর সুন্নাহ গাইবে না; সেদিন তাহার পরিবারে হয়তো উচ্চকণ্ঠ লাউন্স স্পীকারে শোনা যাবে শহরে সিনেমার নানা চটকদার গান।

“লেখিব না তেলেকার কোপ থেকে এক ঝড় কেমন  
মিতে যায়;—লেখিব না আর আমি পরিচিত  
কোনো বাগের পাতা-ছাওয়া মাটি হয়ে যাবে তার আধার...”

এই প্রবন্ধের অন্তঃসরণে লেখা যায় :

- বাংলাদেশের তোমার একটি পরিচিত গ্রাম, ড. মা. ৩০
- তোমার গ্রাম
- তোমার দেশ একটি গ্রাম

এবং-সূত্র : মৌনী তাপস গ্রীষ্ম :  
 ধূসর রক্ততা : মঙ্গল বর্ষা : নয়নরঞ্জন রূপশ্রী :  
 শারদ-লক্ষ্মী : দুটির রাগিণী : অমৃগরূপসৌন্দর্য :  
 হেমন্ত-লক্ষ্মী : মমতাময়ী নারী : ঋতুর ধারক :  
 সীমাহীন শূন্যতা : রূপময় ও রসময় বসন্ত : পুষ্প-  
 পর্বাণ্ডি : উপসংহার :

## রূপসী বাংলা ও তাহার ঋতু-বৈচিত্র্য

ক. প্রা. '৩৫

প্রকৃতির ঋতুরূপশালায় চলে রূপসী বাংলার নানা ছন্দ-বিলসিত অমৃগম রূপ-  
 বিস্তার। ঋতু-বিবর্তনের ধারাপথ বাহিয়া চলে তাহার অন্তহীন রূপের খেলা, রঙের  
 খেলা, সুরের খেলা। আফ্রিক গতি ও বার্ষিক গতির প্রেরণায় পৃথিবী তাহার সূর্য-  
 পরিক্রমার পথে অগ্রসর হইয়া চলে। তাহার সঙ্গে ছন্দ মিলাইয়া চলে ঋতুর পর  
 ঋতুর নিরবচ্ছিন্ন বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। ঋতু-বৈচিত্র্যের এমন উজ্জ্বল প্রকাশ বাংলাদেশ

ছাড়া অত কোথাও দেখা যায় না। তাই কবি বাংলাদেশকে  
 ২৮৮ বলিয়াছেন—‘রূপসী বাংলা’। প্রতিটি ঋতু এখানে তাহার আপন  
 বর্ণ-বিলসিত সংগীত-মুখরিত রূপ-স্বাতন্ত্র্য লইয়া আসে, প্রকৃতিকে সাক্ষ্য তাহার  
 বৈচিত্র্য-মণ্ডিত স্বাতন্ত্র্যের অনূপম রূপসজ্জায়, তারপর তাহার রূপ-বিস্তারের সর্বশেষ  
 স্বভিচ্ছিকটুকু নির্ধর হাতে নিঃশেষে মুছিয়া লইয়া আবার বিদায় গ্রহণ করে। নৃত্য-  
 চকল নটরাজের হাতের রক্তাক্ষের মালা ঘুরিয়া চলে। এক ঋতু যায়, আসে অত ঋতু।  
 রূপসী বাংলার রূপ-সাগরে উঠে নতুন ঢেউ।

বাংলাদেশের প্রকৃতির রূপরূপশালায় প্রথম ঋতু গ্রীষ্ম। ধূ-ধূ রক্ত দুইচক্ষে প্রখর  
 বহিঃজ্বালা লইয়া রক্ত আবির্ভাব ঘটে এই মৌনী তাপসের। নিষ্করণ নিষাধ-সূর্য তাহার  
 তাপ-দহনের অসহ জ্বালাময় তীর ছুঁড়িয়া মারেন। ধরিত্রীর বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া যায়,  
 ফুটি-কাটা হইয়া যায় দিগন্তশায়ী প্রান্তর। গ্রীষ্মের মরু-রসনায় মৃত্তিকার প্রাণ-রস  
 শোষিত হইয়া দূর-দিগন্তে অজস্র কম্পিত শিখায় উর্ধ্বে উঠিতে

নো তাপস গ্রীষ্ম : থাকে। কোথাও প্রাণের চিহ্নমাত্র নাই, শ্রামলতার আভাস  
 ধূসর... নাই। সর্বত্রই মরুভূমির ধূ-ধূ বিস্তার। সমগ্র জীবজগৎ ও  
 উদ্ভিদ-জগতে মামিয়া আসে এক প্রাণহীন, রসহীন পাণ্ডুর বিবর্ণতা। ‘ধূলায় ধূসর রক্ত  
 উদ্ভীদ পিঙ্গল-জ্বাল’ লইয়া ‘তপঃক্লিষ্ট, তপ্ততরু ভীষণ ভয়াল’ গ্রীষ্ম অপরাহ্নের দিকে  
 ডাক দেয় কলংকৈব... কে। তাহার সেই রক্ত-সুন্দর মূর্তি, সেই ভীষণ-মধুর রূপ দেখা  
 যায় শুধু বাংলাদেশের... গ্রীষ্ম ফুলের ঋতু নয়, ফুল ফুটাইবার দামিহ তাহার  
 নাই। ফলের ডালা সা... তাই তাহার বেলা কাটিয়া যায়।

দেখিতে দেখিতে আক... নবীন মেঘ জমিয়া উঠে। আসে শ্রামল-সুন্দর বর্ষা।  
 বাংলাদেশের বর্ষা আসে রক্ত-সমারোহে। বসন্ত ধন বিহ্বল-বিকাশ ও গুরুগম্ভীর  
 বজ্রধ্বনির ‘অতি-ভৈরব হরধের’... সূচিত হয় তাহার শুভাগমন। সেই সঙ্গে নিষাধ-  
 দম্ব পৃথিবীতে ঘনাইয়া আসে ‘শ্রা... যোঘন দিন’। আকাশের একপ্রান্ত হইতে অপর



প্রান্ত পর্বত বনকূপ পুঞ্জীভূত মেঘের অপূর্ব স্তর-বিভাগে, নিয়ে ভ্রাম্যমান বন-প্রকৃতির বৃক মেঘ-কঙ্কাল ছায়া-বিস্তারে আগিয়া উঠে পৃথিবীর বহু-প্রতীক্ষিত মর্মর-মুখর মহোন্মাদ। নিঃসীম শূন্য হইতে বন্ধনবিহীন বায়ুপ্রবাহ দ্রুত বেগে ছুটিয়া আসে, শুকনু হয় লীতল ধারাবর্ষণ। বিস্তৃত প্রান্তর, মাঠ-জলাশয়, নদীনালা, খালবিলে বহুদিন পরে ভাগে প্রবল প্রাণোচ্ছ্বাস। মাটির কঠিন শাসন ভেদ করিয়া নব তৃণাকুরের দল বাহির

হইয়া আসে। প্রকৃতির সকল অঙ্গ হইতে গ্রীষ্মের ধূসর ক্রান্তি মজল বধা : নয়নরঞ্জন মুছিয়া গিয়া উদ্ভাসিত হইয়া উঠে মজল বর্ষার নয়নরঞ্জন রূপত্নী।

এক অপূর্ব ভ্রামলিমার মতাসমারোহের মধ্যে ঘনাইয়া আসে বর্ষা-প্রকৃতির পুষ্প-বিকাশের অগ্নি। \* কদম্ব-কেয়া-যুগিকা-গন্ধরাজ-হংসনাহানার বিবিধ বর্ণ ও বিচিত্র গন্ধের উৎসবে সুরভিত বঙ্গ-প্রকৃতির হৃদয়ের দ্বার যেন খুলিয়া যায়। পুষ্প-সৌরভের সম্পদে চারিদিক কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া উঠে। তারপর শেষ-বর্ষণের পাল-গান গাহিয়া, পথে পথে কদম্ব-কেশরের শেষ স্মৃতিচিহ্ন ছুড়াইয়া বাংলাদেশ প্রকৃতিকে হাসাইয়া কাঁদাইয়া সুন্দরী বর্ষা বিদায় গ্রহণ করে।

বর্ষা-বিদায়ের পর আবার বঙ্গ-প্রকৃতির রূপের রঙ্গমঞ্চে ঘটে পট-পরিবর্তন। বর্ষণ-কান্ত লপ্ততার মেল অলস-মুখের ছন্দে নিঃশব্দে ভাসিয়া চলে। বর্ষণ-সৌন্দর্য-সেবিত্ব আকাশের স্বনীল রূপ-কাল্প, আলোছায়ায় লুকাচুপি, শিউলিকুলের মন-উদাস-বদা গন্ধ, নদী তীরে কলকল্লুর অপূর্ব সমারোহ, ভোতা তৃণ-পল্লব নব-শিশিরের আলিঙ্গন ভাঙতে প্রভাত-হৃদয়ের রঙ্গিপাত এবং শুভ্র-ভোঃস্ব-পুণর্জিত রাত্রি—এই অতুল্যম শারদ-লক্ষ্মী : ছুটি রূপটি লইয়া শারদ-লক্ষ্মীর ঘটে আনন্দময় আবির্ভাব। দেখিতে রাত্রি : কলসন দেখিতে রাত্রি : উসে ডুটির রাগিণী। বাত লীর আনন্দ-ধন উৎসব রূপ-লক্ষ্য

দুর্গ পূজার আয়োজনে মুখর হইয়া উঠে গ্রাম ও নগর। বাংলা দেশের আকাশ-বাতাসে দিগন্ত-বিস্তৃত প্রান্তরে ও কানায় কানায় পূর্ণ মন্দির-এবং ভাবপ্রবণ বাঙ্গালীর অন্তরে অন্তরে অতুড়ত হয় শারদ-লক্ষ্মীর মেঘ-মিত্র আবির্ভাব। রূপালি ভোঃস্বার অপরূপ রথে চড়িয়া যেন শারদ-লক্ষ্মীর ঘটে মর্ত্যাবতরণ। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে রূপের ছয়ার খুলিয়া যায়, বাংলাদেশের লাবণ্য যেন কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া উঠে। শরৎকালের মধ্যে যেন বাংলাদেশের হৃদয়ের স্পর্শ পাইয়া

হেমন্ত শরতেরই বিলম্বিত পরিণতি। কিন্তু হেমন্তের নাই শরতেরূপে স্বয়ং, আছে সুন্দর-ব্যাস্ত বৈরাগ্যের সুগভীর বিষমতা। হেমন্ত-লক্ষ্মী ধূমল কৃষ্ণ-এ আবির্ভাবে মুখ ঢাকিয়া নিঃসঙ্গ সাধনায় মগ্ন থাকে। সেই সাধনা তাহার কলাইবার সাধনা।

ফেতে-খামারে হেমন্তের সোনার ধান তে থাকে এক অন্তহীন কর্ম-ব্যস্ততার মধ্যে। হেমন্তের ছু নাই। তাহার ফুলের বাহার নাই, সৌন্দর্যের জলু নাই রূপসজ্জারও নাই অফুরন্ত

প্রাচুর্য; কিন্তু আছে মমতাময়ী নারীর এক অনির্বচনীয়, লাগি রূপত্নী। সে আমাদের ঘর সোনার ধানে ভরিয়া দিয়া যায়, আমাদের কুটির-ভিঁয়ায় রাশি রাশি ঐশ্বর্য রাখিয়া দিয়া শিশিরের নিঃশব্দ চরণে বিদায় গ্রহণ করে।

হেমন্তের প্রৌঢ়ত্বের পর আসে অড়তাগ্রস্ত শীতের নির্মম বার্ষিক্য। তাক কাঠি ও রিক্ততার বিবাদধন প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে শীতের আবির্ভাব। তাহার তাপ-বিরল রূপমূর্তির মধ্যে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তপশ্চরীর হৃকঠোর কুঙ্কসাধন এবং বৈরাগ্যের ধূসর অঙ্গীকার। বিবর্ণ বনভূমির পত্র-গুচ্ছগুলিতে বসিয়া পড়িবার নির্মম ডাক আসিয়া পৌছায়, এক চরম রিক্ততার অসহায় ডালপালাগুলি একদিন হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে। ওদিকে, ধান-কাটা মাঠে কী সীমাহীন শূন্যতা, কি বিশাল কারুণ্য! ত্যাগের কী অপরূপ মহিমা!

ভারপর 'মাঘের সূর্য উত্তরায়ণে পার হয়ে এল চলি।' বসন্তের আবির্ভাবকে সম্ভব করিয়' তুলিবার জগ্গই মৌনী তাপস শীতের এই কঠোর তপশ্চর্য। আসে ঋতুরাজ বসন্ত, আসে পুষ্প-পথাপ্তির লয়। মুদ্রমন্ডল দক্ষিণ-বাতাসের যাতনামর্মে শীতের জরাগ্রস্ত পৃথিবীর অঙ্গে লাগে অপূর্ণ পুলক, বন-ভরুর রিক্ত শাখায় জাগে কচি কিশলয়ের অক্লান্ত

উজ্জল সমারোহ। বসন্তাসের মর্মর-ধ্বনি এবং দূর বনাঞ্চল হইতে আসিয়া-আসি' কোকিলের কুচকীলিত পৃথিবীতে কষ্ট ক' এক অপূর্ণ মাতালোক। স্নিক ত্বিকে লাগে রক্তের চেটে চেটে চেটে। অলোক-পলংকের বট্টন বিহীন-তাহ ও শিখল-কৃষ্ণভার দক্ষিণ উদ্ভাসে, মা' মালতা ও মাদবী-মস্তুরীর আশুর প্রগল্ভতায়—সব আদ্যাতনে এই গন্ধ ও বর্ণে তুমুল কোলাহলে লাগিয়া যায় এক অশ্লষ মাতামাতি। এইভাবে তোলি খেলিয়া, ফল ফুটাইয়া, ফুল অরাইয়া পৃথিবীকে রিক্ত করিয়া দিয়া রূপ-নাহক বসন্ত চলিয়া যায়।

রূপসী বাংলার এই রূপ-নিচিত্র কতু-চক্র নানা বর্ণ-গন্ধ গানের সমারোহ লইয়া নিত্য আবির্ভিত হইয়া চলিয়াছে। এক ঋতু যায়, আসে আর এক কতু; বাংলাদেশের রূপ-শাগরে চেটে লাগে। কিন্তু শহরবাসী ও শহরমুখী বাঙ্গালী আজ আর অন্ধুরে তাহার নিমন্ত্রণ অস্বত্ব করে না। ঋতু-পরিবর্তনের মধ্য দিয়া প্রকৃতি যখন বিবাহের কঙ্কার মত অপরূপ সাজ সাজিয়া উঠিবে, বাঙ্গালী তখন কারখানার যন্ত্র-ধ্বনি ধ্বনি শুনিবে কিংবা সওদাগরী অঙ্গিসে হিসাবের খাতায় অঙ্ক মিল, বত থাকিবে। আজ আমরা প্রকৃতিকে নিবাসিত করিয়া বরণ করিয়া লইতেছি উগ্র না। অয় তপ্ত নিঃশ্বাস। কিন্তু উপেক্ষিত প্রকৃতি একদিন নয় একদিন তাহার চরম প্রতিশোধ লইবে। জানি না, সেই প্রতিশোধের রূপ কেমন হইবে!

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- কতুচক্র ও বাংলার পল্লী-প্রকৃতি রূপবৈচিত্র
- বাংলার ঋতু-পরিণাম
- বাংলাদেশে বিভিন্ন কতুর সৌন্দর্য, ২

এবং-সূত্র : সূচনা। শরৎ-লক্ষীর অমুপম  
রূপশ্রী। শরৎ আমাদের ছুটির ঋতু। শরৎ  
আমাদের উৎসবের ঋতু। শরতের জ্যোৎস্নাবিধৌত  
রাত্রি। শরতের বৈশিষ্ট্য। অর্থনৈতিক পটভূমি।  
উপসংহার।

## আমার প্রিয় ঋতু : শরৎ

মা. '৬৬, '৬৯

বাংলাদেশের হৃদয়ের মণিকোঠায় শরতের প্রতিষ্ঠা। শরৎ কচি-কাঁচা সোনার  
মতো 'অরুণ আলোর অঞ্জলি লইয়া যখন বাংলাদেশের বর্ষণ-কান্ত আকাশের বুকে শালা  
মেঘের পান্সি চড়িয়া অপরূপ রূপকান্তিতে আবির্ভূত হয়, তখন পরিপূর্ণ বর্ষার পর এক  
অনিবচনীয় প্রশান্তিতে আমাদের বুক জুড়াইয়া যায়। আকাশ নীল,—গাঢ় নীল।  
আকাশের ছায়া বাতাসেও এক উদার প্রসন্নতা, উজ্জ্বল আলোর আঙ্গিকে রচিত এক  
স্নিগ্ধ আনন্দঘন পরিবেশের মধুর আগমনী। চারিদিকে সবুজের  
সমারোহ, সোনালি আলোর অফুরন্ত আয়োজন। বাংলাদেশের  
আনন্দময়ী পল্লী-প্রকৃতি যেন গাঢ় সবুজ রঙের পিচ্কারি দিয়া মনের আনন্দে হোলি  
খেলিয়াছে। গাছে-গাছে, লতায়-পাতায় সবুজের আলিঙ্গন। দিগন্ত-বিস্তার ধানের  
ক্ষেতে সবুজের ঢেউ; নদী ও খালের ধারে শুভ্র কাশফুলের লীলায়িত মৃৎ চামর।  
শরতের এই মোহন-সুন্দর নয়ন-জুড়ানো রূপ দেখিয়া বাংলাদেশের কবি আবেগ-বিস্মল  
কণ্ঠে গাহিয়া উঠেন :

‘আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি  
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী !  
ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁধি না ফিরে।  
তোমার দুঃখ আজি খলে গেছে সোনার মন্দিরে ॥’

বর্ষা-বিলম্বের পর শরতের এই উদার আবির্ভাব সত্যিই অনির্বচনীয়। শরৎ-  
লক্ষীর এই অমুপম রূপশ্রী চারিদিকে এক আকুল উজ্জ্বল দিগন্ত ছাপাইয়া যায়। বর্ষণ-  
কান্ত লঘুভার মেঘের অগম-মস্তুর ছন্দে নিরুদ্ধেশ-যাত্রা, বর্ষণ... আকাশের  
সুনীল রূপকান্ত, অলোছায়ার লুকেচুরি, শিউলিফুলের গন্ধ, নদীতীরে কাশফুলের  
অপরূপ সমারোহ, প্রভাতে ভূগ-পল্লবে নব শিশিরের আলিঙ্গন,  
শরৎ-লক্ষীর অমুপম রূপশ্রী  
প্রভাতে প্রভাত-সূর্যের রশ্মিপাত-... শরতের নয়ন-রঞ্জন  
রূপের অনবদ্য প্রকাশ। এই সৌন্দর্য... গিত অপরূপ পটভূমিকায়  
শস্ত্র-পিটিয়া ধরিত্রীর নয়ন-ভেলানে! রূপলাবণ্য এবং বনভূমির স্নিগ্ধ প্রশান্ত গভীর  
বর্ষাভাষা মনকে এক নিরুদ্ধেশ ভাবাবেগে উন্মুখ করি তোলে। এই সঙ্গে নদীর  
ভরা-স্রোতে ভাসমান পাল-তেজা নৌকার সারি, মাঝিদের সারি-গান এবং শুভ্র-  
জ্যোৎস্না-পুলকিত রাত্রি সেই রূপের সহিত যোজন্য দিয়া দেয় এক অতিরিক্ত অনবদ্য  
সৌন্দর্য-হুম্মা।

এই রূপসৌন্দর্য-বিকাশের মাঝখানে দেখিতে দেখিতে ছুটির বাশি বাজিয়া উঠে। 'স্থলে জলে আর গগনে গগনে বাশি বাজে যেন মধুর লগনে।' সেই বাশি যেন ছুটির বাশি, ঘর হইতে বাহির-হইয়া-পড়ার বাশি, অজানার উদ্দেশে ছুটিয়া চলার বাশি। শরৎ

শরৎ আমাদের  
ছুটির ঋতু

আমাদের ছুটির ঋতু, অবকাশের ঋতু। হাতে তাহার অবকাশ-

মঞ্জুরীর চিঠি। তাহার মন-কেমন-করা আকাশের নীলিমা,

প্রাণ-উদাস-করা স্নিগ্ধ শীতল বাতাস, হৃদয়-ভুলানে আলোর রাগিণী আমাদের অন্তরের অন্তঃপুরে পাঠায় ছুটির নিমন্ত্রণ। 'তাই দেখি, শরতের রৌদ্রের দিকে তাকাইয়া মনটা কেবল চলি-চলি করে—বর্ষার মত সে অভিসারে চলা নয়, সে অভিমানের চলা।'

শরৎ আমাদের উৎসবের ঋতুও বটে। জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে মাটির কন্ঠার আগমনী গান বাজিয়া উঠে। মেঘের নন্দী-ভৃঙ্গীর দল শিঙা বাজাইতে বাজাইতে গৌরা শব্দদাকে ধরা-জননীর কোলে রাখিয়া যায়। বাস্তবিকই, কাস্ত-বর্ষণ আকাশের নীল চন্দ্রাতপের তলে, নানা বৃক্ষলতা ও ওষধির অজস্র সফল অভিব্যক্তির মাঝে প্রকৃতি যেন বিশ্বজননীর পূজার

শরৎ আমাদের  
উৎসবের ঋতু

অপূর্ব আয়োজন করিয়া রাখে। বাতাসে ভাসিয়া আসে উৎসবের

বাশির স্বর। পাখি-ডাকা গ্রামগুলির ছায়া-স্থনিবিড় আশ্রিনায় পড়ে

উৎসবের আল্পনা। এ পূজা যেন শরৎ-ঋতুর পূজা। দেখিতে

দেখিতে পূজার আনন্দে মাতিয়া উঠে সমগ্র বাংলাদেশ। নূতন বসন-ভূষণে সাজিবার ধুম পড়িয়া যায়, বাংলাদেশের অন্তরে পড়িয়া যায় এক অভূতপূর্ব প্রাণোচ্ছ্বাসের সাড়া। দুর্গা-পূজা, লক্ষ্মীপূজা, শ্রামাপূজা, ভাতৃ-বিতীয়া—সবই শরৎ-ঋতুর আলোকোজ্জ্বল অবদান।

শরৎকালের জ্যোৎস্না-পুলকিত রাত্রির যেন তুলনাই মেলে না। তাহা অনির্বচনীয় রূপে—হইয়া বাংলাদেশের হৃদয়ের দ্বারে আসিয়া দাঁড়ায়। শস্য-শ্রামলা, বনানী-কুস্তলা, নদী-মে—সবই উপর শুক্লা রজনীতে যখন চন্দ্রোদয় হয়, তখন যেন এক স্বর্গীয় শোভায় চা... ক স্নন্দর, মনোহর ও অনির্বচনীয় হইয়া উঠে। আকাশে ও মাটিতে

শরতের জ্যোৎস্না-  
বিধৌত রাত্রি

এক নিঃশব্দ স্তব্ধতার অপূর্ব সমারোহের মধ্যে যেন শরদ-লক্ষ্মীর

স্বয়ং স্নিগ্ধ স্পর্শ পাওয়া যায়। বিগলিত রজতধারার স্রায়

জে, এর পুলকিত প্রবাহে নান করিয়া বিশালাক্ষীর মন্দিরের

লক্ষ্মীপেচাটি যেন এক গভী যাবেগে ডাকিয়া উঠে। তাহার আনন্দ-বিহ্বল কণ্ঠে মর্ত্যে লক্ষ্মীর আগমনী বিধৌত হ... সেই অনির্বচনীয়তার মধ্যে স্বর্গ পৃথিবীতে নামিয়া আসে, না পৃথিবী স্বর্গে পড়ি হইয়া, ঠিক বোঝা যায় না। তবে স্বর্গ ও মর্ত্য যেন একাকার হইয়া যায়।

আমাদের এই আনন্দময় শরৎ ব অন্তরে আছে অফুরন্ত অশ্রুজলের উৎস। ছুটি ও আনন্দ-উৎসবের কলতান ধীরে ধীরে শাস্ত হইয়া আসে। আসে কর্মের আহ্বান, আসে বিচ্ছেদের শব্দ। 'আমাদের শরতে আগমনীটাই ধূয়া। শরতের বৈশিষ্ট্য সে ধূয়াতেই বিজয়া: গানের মধ্যেও উৎসবের তান লাগিল। আমাদের শরতে বিচ্ছেদ-বেদনার ভিতরে একটা কথা লাগিয়া আছে যে, বারে

বারে নৃতন করিয়া কিরিয়া কিরিয়া আসিবে বলিয়াই চলিয়া যায়—তাই ধরার আঙিনায় আগমনী গানের আর অন্ত নাই। যে লইয়া যায় সেই আবার কিরাইয়া আনে। তাই সকল উৎসবের মধ্যে বড়ো উৎসব এই হারাইয়া কিরিয়া পাওয়ার উৎসব।' তাই শরৎ যখন আসে, তখন আমাদের মনের সমস্তটাই সে অবলীলায় দখল করিয়া বসে। আবার যখন চলিয়া যায়, তখন সমস্তটাই একেবারে শূন্য করিয়া দিয়া চলিয়া যায়। শরতের ঋতু অল্প কোন ঋতুর বিচ্ছেদ-বেদনা আমরা এত গভীর করিয়া অনুভব করি না। শরৎ-বিদায়ের পর আমাদের অন্তরলোক সত্যি বিজ্ঞার গানের মতো বেদনায় শিথিল ও অশ্রুবিধুর হইয়া উঠে। দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ব্যাখ্যাতারাক্ত হৃদয়ে তারপর আমরা কর্ণজগতের দিকে পা বাড়াই। কিন্তু আমাদের ব্যাখ্যাহত মন পড়িয়া থাকে পিছনে, যেখানে শিউলি-বিছানো শিশির-সিক্ত পথে শরৎ তাহার শেষ পদচিহ্ন আঁকিয়া দিয়া বিদায় লইয়া চলিয়া গিয়াছে।

শরৎকালে ফসল পাকে না। শরৎ তাই ফসল কাটে না। ফসল পাকাইবার কাজ তাহার নয়, ফসল কাটিবার তাড়াও তাহার নাই। সে ফসলের উজ্জল সম্ভাবনার বাণী বহন করিয়া লইয়া আসে। বাংলাদেশ বর্ষায় যে ফসল ফলাইয়াছে এবং যাঁহা হেমন্তে পাকিয়া উঠিবে, শরৎ সেই আগামী ফসলের শুভ সম্ভাবনার খবর আনিয়া বাংলাদেশের অন্তরে বহাইয়া দেয় এক আবেগময় আনন্দের বান। দেখিতে দেখিতে সেই আনন্দ তাহার বর্ণাঢ্য উৎসবে মূর্ত হইয়া উঠে। তাই তো বাহিরের এই অর্থনৈতিক পটভূমি বাহিরের এই অর্থনৈতিক পটভূমিকায় তাহার অন্তরলোকে শারদীয় উৎসবের প্রাণোচ্ছল আয়োজন। আর, শরৎ যে ফসলের সম্ভাবনার বাণী বহন করিয়া লইয়া আসে, তাহার স্নগভীর আশ্বাসেই কৃষিমাতৃক বাংলাদেশের সারা বৎসরে আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ রচিত হয়। সেই আশ্বাসের নিবিড় স্পর্শে বাদ্গলীর মুখে ফুটিয়া উঠে উৎসবের অমলিন হাসি। শরৎ বাংলাদেশের আনন্দ-ক-দূত, বাদ্গলীর মুখের হাসির শুভ বার্তাবহ, স্নগভীর আশ্বাসের নিপুণ কারিগর।

তারপর বাংলাদেশকে আগমনী ও বিজ্ঞা গান শুনাইয়া উৎসবের আনন্দে মাতাইয়া হাসাইয়া-কঁাদাইয়া শরৎ বিদায় লইয়া চলিয়া যায়। তাহার পথে পড়িয়া থাকে বিষম করা-কাশের গুচ্ছ, ছিন্ন-শ্রান শের মাল, আর নবীন বানের অজস্র মঞ্জরী। শিশিরাক্রান্ত চাথে বাংলাদেশ তাহার বিদায়-পথের দিকে করুণ বিষম হৃদয়ে চাহিয়া থাকে। বাদ্গলীর প্রিয় পত্নী, কিন্তু শরৎ বাংলাদেশের হৃদয়ের স্নতু। বাংলাদেশের হৃদয়ের নিকোঠায় শরতের প্রতিষ্ঠা ॥

এই প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত লেখা যায় :

- শরৎকালে বাংলাদেশ, মা. '৬৯
- বাংলাদেশে শরৎকালের উৎসব ও আনন্দ, মা. '৬৬
- বাংলার ঐশ্বর্য ঋতু

তাহাকে সাদর স্বাগত জানাইবার জন্ত বনে বনে পাখির কণ্ঠে  
উঠিতেছে মধুর আবাহন-গীতি। তাহাদের শিশির-সিক্ত কণ্ঠে  
আনন্দের অনবত্ত জোয়ার লাগিল। কুয়াশা-জড়িত বনভূমি প্রাবিত করিয়া তাহাদের  
কলমধুর গানের সুর-লহরী ছড়াইয়া পড়িল দিক-দিগন্তে। আর বিলম্ব বড় বেশী নাই।  
স্নানকালের মধ্যেই কুয়াশার ধুমল জাল ছিন্নভিন্ন করিয়া আমাদের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইবে  
একটি পরিপূর্ণ আলো-বলমল সকাল।

লেপের তলা হইতে উঠি-উঠি করিয়াও উঠিতে ইচ্ছা হয় না ; শিয়রে হিংস্র নীত কেশর ফুলাইয়া, খাবা পাতিয়া বসিয়া আছে। গরম বিছানার স্ব-রচিত উত্তাপ ছাড়িয়া উঠিতে গেলে কেমন এক দুর্নিবার আলস্ত সমস্ত চেতনাকে ঘিরিয়া ধরে। ওজ্জ্বল-বিজ্জড়িত চেতনায় দূর বনাস্তরাল হইতে পাখিদের কল-কূজন শোনা যায়, আর শোনা যায় পথচারীদের বাতাসে-ভাসিয়া-আসা দুই একটি বিচ্ছিন্ন সংলাপ ; অথচ চারিদিকে পৃথিবী এক আশ্চর্য নিস্তব্ধতায় মগ্ন।

শীতের সকালে তাই এক নিম্নোন্নত চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রকে আছন্ন করিয়া রাখে। কর্মের আহ্বান সঙ্গেও এক ছাত্র ব্যাপ্ত নৈকবোয়াল শ্রমায় মাছুষ আরামের শয্যায় পড়িয়া থাকে এবং কল্লনা ক্রমেতে পারে, শীতের কুয়াশার কথল গায়ে দিয়া আগুন পোহাইবার জন্য শুকনো পাতা কুড়াইতে বনের ভিতর দিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে চলিয়াছে।

পূর্ব-দিগাঙ্কে ধীরে ধীরে ॥ কুটীতে থাকে। উত্তর দিক হইতে হিমগর্ভ ঠাণ্ডা বাতাস একটি দার্ঘ্যাসের মত ইহাৎ শিবির করিয়া বনের গাছগুলির পাতার ফাঁক দিয়া বহিয়া ॥ পাতাগুলি সহসা কাঁপিয়া উঠে। টুপ্ টাপ্ করিয়া শিশির পড়িয়া পড়ে। বনের পথ শিশিরে সিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। টিনে চালে এবং ঘাসে ঘাসে শিশির-বিন্দু জমিয়া ভোরের আলোয় বলয়ল করিতেছে। দূরে কোথাও খেজুর-রস জাল দেওয়া হইতেছে। বাতাসে তর্জির লোভনীয় টাই গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে। জাল-দেওয়া

খেজুর-রসের গন্ধে বাতাস মো মো করিতেছে। একজন কেরিওয়াল 'নলেন গুড়ের সন্দেশ' হাঁকিয়া গেল। তাহার পর আর একজন কেরিওয়াল 'ফুলকপি' হাঁকিয়া গেল। গ্রামের রাস্তায় কুবাণেরা বলদ হাঁকিয়া মাঠের দিকে চলিয়াছে : মুগ, মসুর, ছোলা, অড়হর ইত্যাদি কলাই বুনিবার জগ্ন সময়মতো ক্ষেত প্রস্তুত করা চাই। এদিকে 'সরিষার ক্ষেতে মৌমাছদের গুঞ্জরণ উঠিতে শুরু করিয়াছে। দূরে গ্রামের পাঠশালায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এক বিচিত্র স্বর করিয়া কবিতা মুখস্থ করিতেছে। চারিদিকে এই কর্ম-প্রবাহের ব্যস্ততার মধ্যে বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া গভীর আলস্তে তন্দ্রাস্থ উপভোগ করা অল্পচিত। তাই অগত্যা সকাতরে গায়ের লেপ সরাইয়া রাখিয়া বিছানা হইতে বাহির হইবার জগ্ন সচেষ্ট হইতে হয়।

ততক্ষণ বাহিরের পৃথিবীর ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। দিকে দিকে কর্মের মুখরতায় শীতের সকাল কর্মবাস্ত হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব-দিগন্তে আলো ছড়াইয়া সূর্যের রথ আকাশ-পরিক্রমায় বাহির হইয়া পড়িয়াছে। একটি নীলকণ্ঠ পাখি রিক্তপত্র বাবলার ডালে বসিয়া রোদ্র পোহাইতেছে। একজোড়া ফিঙে মনের আনন্দে সকালের আলোয় হাড়বু ধাইতেছে। একজোড়া খজনা পাখি ডানায় বাতাস কাটিয়া কুয়াশার ভিতর দিয়া কোথায় উড়িয়া গেল। শীতের সকাল যেন এক প্রোচা কুলবধু। তাহার সলজ্জ

শীতের সকালের  
বৈরাগ্য-মূর্তি

মুখখানি দিগন্ত-বিস্তৃত কুছাটিকার অবগুষ্ঠনে অবগুষ্ঠিত। ধূমল কুয়াশার অবগুষ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া সে দিগন্তের গা বেঁধিয়া ধীর-মন্দের পায়ে চলিতে থাকে। তাহার করুণ বিষণ্ণ চোখ দুইটি দেখা যায় না, তাহার লজ্জাবনত মুখখানিও দেখা যায় না। তাহার আপাদমস্তক কুয়াশার গাঢ় আবরণে ঢাকা। তারপর বেলা বাড়িতে থাকে। শীতের সকালও তাহার কুয়াশার অবগুষ্ঠন ধীরে ধীরে খুলিতে থাকে। তাহার বৈরাগ্য-কঠিন অঙ্গ হইতে শুভ্র-সমৃদ্ধ। ত্যাগের স্তম্ভা বিচ্ছুরিত। সে তাহার সকল সঞ্চয় নিঃশেষে উজ্জাদ কপি, দয়া ধারণ করিয়াছে এক সর্বত্যাগিনী তাপসী-মূর্তি। দুই চোখে তাহার বিষণ্ণ প্রশান্তি, হাতে বরাভয়। সে কুড়াইতে জানে না, সংগ্রহ করিতে জানে না; জানে শুধু ছড়াইয়া দিতে, উড়াইয়া দিতে।

তাহার হাতে বৈরাগিণীর একতারা। সে তাহার সেই চোখের নিঃসঙ্গ তারে হানে নির্মম আশ্রিত। তাহার ফলে বনের শুক বিবর্ণ পাতলি একে একে করিয়া পড়ে। উত্তরের হিমগর্ভ হাওয়া তাহাদের দুই হাতে লুফি লইয়া অবলীলায় উড়াইয়া দেয়। বনের বুকে শুক পাতার জাঁক কবর স্পীকৃত হই: এঠিল। তাহার উপর দিয়া উত্তরের শীতল হাওয়া হাহাকার রেয়া কাঁদিয়া চলে। কোথাও

ত্যাগের মূর্তি

আমের মুকুল চুঁচাইয়া শিরির কান্না করিতেছে, কোথাও বাতাসের বুক চিরিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠি: একটি নিঃসঙ্গ শব্দটি। এদিকে পাকা ধান কাটিয়া দিগন্ত-প্রসারিত মাঠখানিকে মাণেরা রিক্ত করিয়া তুলিল। পাকা ধান নৌকায়, গোবর গাড়িতে কিংবা মাণের ভারে বোঝাই হইয়া গ্রামের রাস্তা তাহার গন্ধে আমোদিত করিয়া চলিয়াছে অলস মন্দের গতিতে। রাস্তায় ও মাঠে

রাশি রাশি কলাই কলিয়া উঠিয়াছে। তাহার সবুজ ভ্রাণ সকালের বাঁতাসকে ভারী করিয়া তুলিয়াছে। কুয়াশার গন্ধ, পাকা ধানের গন্ধ, সবুজ কলাইর গন্ধ, দূর হইতে ভাসিয়া-আসা খেজুর রসের গন্ধ—সমস্ত মিলিয়া ধরণীর মাটির পাত্রটিকে কানায় কানায় পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে।

তারপর বেলা বাড়িতে থাকে। শীতের স্বর্ষ পূর্ব-দিকন্তের কুয়াশার জাল ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া পরম ঔদ্যোগে উপরে উঠিতে থাকে। তাহার রশ্মি-বাণে পযুদন্ত হয় শীতের তীব্রতা। প্রার্থিত রোদ্রে চারিদিক ভাসিয়া যায়। রোদ্রের পাশ্রে শীতের সকাল যেন একবিন্দু শিশিরের মতো টলমল করিয়া কাঁপিতে থাকে।

রূপ-বদল

দূরে রাখাল ছেলে বাঁশি বাজায়। মাঠে লেজ ঢুলাইয়া মনের আনন্দে গোকুলি চরিতে থাকে। ধীরে ধীরে রোদ্রের তাপ বাড়িতে থাকে। উত্তরের বাতাসের ধারও ধীরে ধীরে কমিয়া আসে। গায়ের গরম জামা-কাপড়গুলিকে তখন হালকা করিবার প্রয়োজন অনুভূত হয়।

শহরের শীতের সকালগুলির মূর্তি ভিন্নরূপ। ভোরের কাকের ডাকে শহরের শীতের সকালের ঘুম ভাঙে। সেখানেও শিশির পড়ে, কিন্তু তাহাতে সবুজ ঘাসের গভীর করুণ ভ্রাণ মিশিয়া থাকে না। সেখানেও উত্তরের শীতল হাওয়া বহিয়া আসে; কিন্তু তাহাকে খেজুরের রস কিংবা নলেন গুড়ের মন-মাতানো গন্ধ আমোদিত করিয়া তুলে না।

শহরের শীতের সকাল কেবল কাকের ডাক, কলের শব্দ, কেরোসিন-শহরের শীতের সকাল কয়লার গন্ধ এবং বাস-ট্রামের ঘড়ঘড়ানিই লইয়া আসে। অবশ্য রাত্ৰায় ফেরিওয়ালা খেজুর-রস, ফুলকপি, বাঁধাকপি হাঁকিয়া যায়। কিন্তু শহরের ইট-কার্টি-পাথরের কৃত্রিম কাঠিঘের মধ্যে গ্রাম-বাংলার উদাস-করুণ শীতের সকালের ধ্যান-সমাহিত শ্রদ্ধ-মধুর রূপটিকে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সেখানে সওদাগরী শ্যাকেনার ভিড়ে শীতের সকালও যেন খানিকটা কেতাহুরন্ত হইয়া শহরে ভয়ে ভয়ে প্রবেশ করিয়া যায়।

শ. • ২০-দশ শতকের নিলারূপ চাপে শীতের সকাল তাহার নিজস্ব মূর্তিতে প্রকাশিত হইতে পারে না। এখানে কুয়াশার সেই স্নিগ্ধ জলু নাই। তাহার পরিবর্তে ধূয়াশ; তাহুরের দুধি শ্বাসরোধ হইয়া আসে। তবু কুয়াশার বৃক চিবিয়া যখন ভোরের বান, কিংবা ট্রামটি দুলিতে দুলিতে ভাসিয়া আসে, তখন সত্যিই অপূর্ব

১. । শহরে রাজপথে শীতের রূপ কুণ্ঠিত হইলেও গরম-চা ও উপসংহা

তে, ভাজার গন্ধে তাহাকে সংগোপনে আব্রপ্রকাশ করিতে দেখা যায়। কিন্তু শীতের সকালে: য প্রবান আকর্ষণ—খেজুর-রস কিংবা পায়ের ও পিঠেপুলি, তাহার জন্ত শহর ছাড়িয়া দূরে গ্রাম-বাংলায় যাইতে হইবে। সেইখানেই শীতের সকাল তাহার সৌন্দর্যের ও মাধুর্যের ও সত্ত্ব পসরা সাজাইয়া আজও বসিয়া আছে ॥

এই প্রবন্ধের অন্তঃসরণে লেখা যায় :

- শীতকালের সকাল
- শীতের সকালের বিশিষ্ট রূপ



এবন্ধ-সূত্র : সূচনা । কলিকাতায় প্রকৃতির  
বেশ নিবিড় ॥ কলিকাতায় বর্ষার আগমন ॥ বর্ষার  
কলিকাতার রাস্তার দৃশ্য ॥ শিশুর দল ॥ কলিকাতার  
বায় নাগরিক জীবন ॥ আলোকের পিছনে  
জেকার ॥ অন্ধকারের ইতিকথা ॥ উপসংহার ॥

## বর্ষার কলিকাতা

“রামগিরি হইতে হিমালয় পযন্ত প্রাচীন ভারতবর্ষের সে দীর্ঘ এক খণ্ডের মধ্য দিয়া মেঘদূতের  
মন্দাকিনী ছন্দে জীবন-স্রোত প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে সেখান হইতে, কেবল বর্ষাকাল নহে,  
চিরকালের মতো আমরা নির্বাসিত হইয়াছি।”

—রবীন্দ্রনাথ

নিষ্টির পাখাণ-কায়া কলিকাতা। ঋতুতে ঋতুতে প্রকৃতির যে বর্ণ-বিলাস, যে  
রূপবিস্তার, তাহা এখানে অল্পপস্থিত। বর্ষা-প্রকৃতির মোহিনী মায়া, যুগ্মবন-বিশোভ  
শারদ-প্রকৃতির বিগলিত স্বর্ণ-কান্তি ও অমলিন শিউলি-সুহৃৎ,  
চেন। কীতের বৈদব্য-মূর্তি, মায়াবী বসন্তের রূপাভিসার ও তাহার রক্তম  
প্রগল্ভতার এখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ। এখানে কেবল মরুভূমির ধূধু-বিস্তার, ইট-কাঠ-  
পাথরের জনহীন মরুমায়া! আমরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অলকাপুরী হইতে মরু-  
যন্ত্রণায় রামগিরি-শিখরে প্রত্যাগমনে চির-নির্বাসিত হইয়াছি।

তবু কলিকাতার আকাশে নিম্ন-স্বরের ক্রোধ প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মতো কাটিয়া  
পড়ে, বর্ষায় মেঘের পর মেঘ জমির উত্তিয়া আকাশের বুক করিয়া তোলে সহজ-স্বন্দ,  
আকাশের নিবিড় নীলিমা ঘোষণা করে শরতের আগমন, উত্তরের হিম-শীতল বাতাস  
বহিয়া আসে কীতের অমেঘ, আবার দক্ষিণের শুষ্ক-মন্দ সমীরণ  
কলিকাতায় প্রকৃত  
প্রবেশ নিষিদ্ধ  
জানিয়া দেয় নব-বসন্তের শুভ আগমন-বার্তা। সমস্তই রটিন-  
দক্ষিণে নির্বাসিত আসে; কিন্তু সবই যেন কৃত্রিম, সীমাবদ্ধ  
সংকুচিত। কলিকাতা ঋতুদের অবাধ আবির্ভাব পছন্দ করে না। ঋতু  
সঞ্চিত প্রকৃতিকে সে দ্বারের বাহিরে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া লাভ-ক্ষতির হিসাবের অন্ধ  
কমে কিংবা প্রকৃতির সৌন্দর্য-পুরীর দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া সে ভাঙাটী গর্দভের  
মতো হিসাবের খাতা বহিয়া মরে।

তবু পাখাণ-পুরীর ইট-কাঠ-পাথরের কঠিন নিষেধ অমান্য করিয়া কলিকাতার  
আকাশে আবির্ভাব হয় নববর্ষার! ‘গুরু গুরু মেঘ গুমরি’ গুম গরজে গগনে গগনে।’  
আকাশের বিভ্রান্ত-বিস্মরণে ও বজ্র-নিঃস্বনে কলিকাতায় বর্ষা ভাগমন বিঘোষিত হয়।

গুরু-গম্ভীর পুষ্প পুষ্প মেঘের নবোদয়ে ও দাগরা অক্ষির হিসাব-  
কলিকাতায় বর্ষার  
বাগমন  
রক্তকর হিসাবের অন্ধের ভুল হ’ল কেনা জানি না; কিন্তু গ্রীষ্মের  
প্রথম শাসনের পর বৃষ্টির ধাতু বর্ণে, বাতাসের শীতল স্পর্শে  
কলিকাতার নাগরিক জীবনে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস নামিয়া আসে। ছায়াহীন  
কলিকাতার তাপদহন-ক্রিষ্টে পিচ-গলা দিনগুলির অধঃপাত হয়।

নবম্বোবনা বর্ষা যখন ঘন-গৌরবে অতি-ভৈরব-হরষে কলিকাতার আকাশে আবির্ভূত হয়, তখন তাহার জলসিক্ত ক্ষিতি-সৌরভে নাগরিক হৃদয়ে নামিয়া আসে এক অনবচ্ছিন্ন প্রশান্তি। এখানে বর্ষার অব্যাহত সৌন্দর্য-বিস্তারের ক্ষুদ্র বনভূমি নাই, নদ-নদী নাই। বিস্তার প্রাপ্তির নাই। এখানে দিগন্ত কুণ্ঠিত, বর্ষার আগমনও তাই অবশুষ্টিত। কিন্তু তাই বলিয়া কলিকাতার বর্ষা একেবারে বৈচিত্র্যহীন নয়। গতিঃ মুখে ঘোলা জল থই থই করে, বড় বড় রাজপথ জলে ভাসিতে থাকে, পার্কগুলি যেন

বর্ষায় কলিকাতার  
রাস্তার দৃশ্য

লেকের ক্ষুদ্র সংস্করণে পরিণত হয়। সঙ্গে সঙ্গে ছাতা ও বর্ষাতির ভিড়ে কলিকাতার পথ-বাটের চেহারা যায় বদলাইয়া। পথচারীদের কেহ-বা ভিজিতে ভিজিতে মোপহুস্ত পোশাক-পরিচ্ছদের পাট-ভাঙা আভিজাত্য অক্ষুন্ন রাখিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতে করিতে হাঁটুজল ভাঙ্গিয়া গম্ভব্য-স্থলের দিকে অগ্রসর হয়। বাসগুলি ভারী মাল-বোঝাই জাহাজের মতো রাস্তার জলে তরঙ্গ-সংঘাত সৃষ্টি করিয়া ভীষণ আক্রোশে ছুটিয়া চলে। বিশেষতঃ 'ডবল ডেকার'গুলির জল ভাঙ্গিয়া অগ্রগমনের দৃশ্য সত্যি উপভোগ্য হইয়া উঠে। আর যাহারা আরোহী, তাহাদের তো কথাই নাই। স্বল্প টিকিটে তাহারা কলিকাতার রাস্তায় স্ত্রীমার-ভ্রমণের আনন্দ লাভ করে। বাঁকা জলের তরঙ্গ-রেখা দোকানগুলির উপকূল স্পর্শ করে। পথচারীদের বেশবাস ভিজাইয়া দিয়া প্রকৃতি তাহার প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান।' বর্ষার আগমনে কলিকাতার শিশুদের মনেই আনন্দের জোয়ার আসে বেশী। তাহারা প্রথমে ছড়া কাটিয়া বর্ষার আগমনী গান গাতিয়া উঠে। বৃষ্টিতে ভিজিয়া, রাস্তার ঘোলা জলে সাতার কাটিয়া তাহার আনন্দ আত্মহারা হইয়া যায়। কেহ ভাসায় কাগজের ময়ূরপঙ্খী শিশুর দল কেহ ভাসায় কলার মোচার সপ্তভিঙা, কেহ ভাসায় চটি-জুতার পথকর। ময়ূরপঙ্খী-সপ্তভিঙা-মধুকরের সারি বাঁকা জলের স্রোতে হেলিয়া-তুলিয় স্থূল কান করনা-রাজের উদ্দেশ্যে ভাসিয়া চলে।

সেই সময়েই বর্ষার ঠাকুর। তাহা হইতে চলিয়াছে অবিরল ধারা-বর্ষণ মেঘে মেঘে ধ্রুপদ বেল হইয়া যায়, কেহ জানিতে পারে না। অক্ষিমে কে যাইবে যাহারা যাইবার তাহারা মাঝপথে বিগড়ে পড়িয়াছে কিংবা অক্ষিমে হইতে কিরিবা পথেব দুর্ভাবনায় জল। যাহারা অক্ষিমে যায় নাই, তাহারা বাড়িতে মহানন্দে তাসখেলায় মাতিয়া উঠে। স্থূল-কলেজের আজ বহু-বাহিত 'রেনি-ডে'। ছাত্রদের

কলিকাতার বর্ষায়  
নাগরিক জীবন

অ। অনবধায়। তাহাদের কেহ গিনেমায় লাইন দিয়াছে, কেহ-ব খেল মাঠে ভিড় জমাইয়া তুলিয়াছে। বাড়িতে খিচুড়ি, ইলি মাছ ভ, গর ধুম। দোকানে তেলভাজার গন্ধ। সমস্ত মিলি:

কলিকাতার বর্ষণ-মুখর আকাশ - মাতাইয়া তুলিয়াছে। ঘরে-ঘরে আজ অলস আজ চায়ের দোকানে-দোকানে গল্পের লিস। বাহিরের ধারা-বর্ষণের সঙ্গে পান্না দি চলিয়াছে রাজনীতি-অর্থনীতি-সাহিত্য আলোচনার তুমুল তর্ক। তাহারই মাঝখানে একটি করুণ রাগিনীর মতো বাজিয়া চা-দাছে রাস্তায় রিক্সার হুন্ হুন্ আওয়াজ।

বর্ষার দিনে কলিকাতায় গৃহে প্রত্যাবর্তন এক সমস্তা হইয়া দাঁড়ায়। যানবাহন  
 ক্লান্ত হইয়া যায়। কলে, গৃহমুখী মাহুকে আকাশের ধারাজলে স্নান করিতে করিতে বাড়ি  
 করিতে হয়। পায়ের জুতার পলোয়তি ঘটে; পরনের কাপড়েরই যত দুর্গতি। রাস্তার  
 লে কাপড় যায় ভিজিয়া। মহিলাদের অস্থবিধার অন্ত থাকে না। ধোপহরস্ত বাবুরা  
 স্নান ঠেলাগাড়ি চড়িয়া জলমগ্ন রাস্তা পার হন, তখন একটি কৌতুকপূর্ণ দৃশ্যের  
 সবভারণা হইয়া থাকে। সারাদিন সূর্যের মুখ দেখা যায় না। ঘরে ঘরে ভিজা কাপড়ের

নালোকের পিছনে  
 মজ্জাকার  
 স্তূপ জমিয়া উঠে। নবধারাজলে স্নানের আনন্দে যখন শহর-  
 কলিকাতা পুলকিত, ঠিক তখনই তাহার অন্তরালোকের সংবাদ

কিন্তু আনন্দ-বেদনার মিশ্র অল্পভূতিতে বহুশ্রম। প্রাসাদময়ী  
 কলিকাতার মুখে হাসি ফুটিলেও তাহার দারিদ্র্য ও হাহাকারপূর্ণ বস্তিগুলির চোখে  
 জল আর ধরে না। উপরের চালা ভেদ করিয়া বৃষ্টির জল ঝরিতে থাকে; আর ঠিক  
 তখনই রাস্তার জল ঘরে ঢুকিয়া চারিদিক একাকার করিয়া দেয়। রান্না-খাওয়া  
 মাধায় উঠে। নোংরা জলের আক্রমণ হইতে গৃহস্থালীর দ্রব্যসামগ্রী ও বিছানাপত্র  
 বাঁচাইতে তখন বস্তিবাসীদের হিমসিম পাইতে হয়।

প্রাসাদ-নগরী কলিকাতার জল-নিষ্কাশন-ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয় বলিয়া এই দুর্ক্লম সমস্তা  
 বর্ষাকালের একটি চিরন্তন ব্যাপার। কলিকাতা পৌর নিগমও ইহার সমাধানে যথেষ্ট  
 যত্নশীল নয়। সে যাহাই হউক, কলিকাতা-নগরীতে যাহারা বস্তিবাসী, স্টেশনের প্লাটফর্ম

কিংবা ফুটপাথ যাহাদের একমাত্র আশ্রয় এবং যাহারা রোজ আনে  
 অন্ধকারের ইতিকথা

রোজ খায়, সেই ফেরিওয়ালাদের এই সময় অস্থবিধার অন্ত থাকে  
 না। রিক্সাওয়ালাদের এই সময় কষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহারা এই সময় বেশ দু'পয়সা  
 রোজগার করিতে পায়। ইহাই কলিকাতার অন্ধকারময় জীবনের ইতিকথা।

কলিকাতার বর্ষার মেঘ-সৌন্দর্য নাই, নাই বৃষ্টি-বতীর, পত্র-মর্মর নাই, পক্ষী  
 কাকলি নাই, জলের কলধ্বনিও নাই—পল্লী-বাংলার বর্ষণ-সৌন্দর্যের নিচট।

মেঘের 'পরে মেঘ জমিয়া আকাশ আঁপার করিয়া আদিলে মেঘপুংড় না,  
 দিল্লিমারাও আর বলেন না সেই চির-নূতন রূপকথার গল্প। ছোট ছোট মেঘমেঘেরাও  
 আর আকাশে ঘনায়মান মেঘের দিকে চাহিয়া স্বপ্ন করিয়া ছুড়া টে না—'বিস্ট

পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এলো বান।' শিশু রঙ এখানে আর  
 উপস্থার

বিবাহের সাজে সাজেন না। কলিকাতা 'এদানী পাষণ-কায়া'।  
 তবু বাতায়ন-পথে শোন' যায় রবীন্দ্র-কাব্যের আবৃত্তি কিংবা 'তারে রবীন্দ্র-সংগীতের  
 বর্ষার গান। কেহ আবৃত্তি করে—'স্বপ্ন আমার নাচে রে।' 'জিকে ময়ূরের মত নাচে  
 রে।' কেহ গায়—'আজি বারি ঝরে' ঝর ঝর ভরা বারে।' বর্ষার কলিকাতার  
 তাহাই অনির্বচনীয় সৌন্দর্য!!

এই প্রবন্ধের অন্তঃসরণে লেখা যায় :

- বর্ষায় নাগরিক জীবন
- কলিকাতার বর্ষার রূপ

প্রবন্ধ-সূত্র : হুচনা। সংস্কৃতির প্রকৃত  
 পরিচয়। বাংলার সংস্কৃতির মূল-সূত্র। বঙ্গ-  
 সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র হইল ধর্ম। লোক-সাহিত্য  
 লোক-সংস্কৃতির প্রতিচ্ছবি। কার-শিল্পে বঙ্গ-  
 সংস্কৃতির অঙ্গান স্বাক্ষর। বঙ্গ সংস্কৃতির রূপ-  
 রূপান্তর। বঙ্গ-সংস্কৃতির সংকট। উপসংহার।

## বাংলার সংস্কৃতি

গো. প্রা. '৩৪

সংস্কৃতি হইল জাতির চিং-প্রকর্ষের ব্যঞ্জনাময় প্রকাশের সম্মিলিত যোগফল। জাতির  
 যুগ-যুগান্তের স্বপ্ন ও সাধনা, তাহার ভাব-লোকের গৌরব-সমুন্নতি তিলে তিলে দান  
 করিয়া সৃষ্টি হয় সংস্কৃতির বহমান জীবন্ত ধারা। সমগ্র জাতির চিন্তাধারা, ভাবধারা  
 ও কর্মধারার গৌরবময় প্রতিচ্ছবি হইল তাহার সংস্কৃতি। 'মানবীয় আচার-পদ্ধতি,  
 শিক্ষা-দীক্ষা, মানসিক উন্নতি, পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব—এই সবার সমন্বয়ের এক অপূর্ব  
 মনোভাবই হইতেছে সংস্কৃতি। ১ জাতির সর্ববিধ বিষয়ে সর্বাঙ্গীণ  
 হুচনা

উন্নতির চরমতম পরিণাম-ফল হইতেছে তাহার সংস্কৃতি। ২ কাজেই,  
 সংস্কৃতির সূত্রে ধরা পড়ে জাতির এমন একটি মানস-প্রবণতা, এমন একটি সামাজিক  
 অলুপনাময়তা, শিল্প-সাহিত্যের এমন কাকস্কৃতি, ধর্মের ভাব-প্রেরণা ও ঐতিহ্যের চরম  
 সমুন্নতি, যাহা জাতির আনন্দময় অবচেতন মনের সামগ্রিক প্রয়াস যাহা যুগ-যুগান্তরের  
 নিরবচ্ছিন্ন সাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ ফসল। সংস্কৃতি সমগ্র সমাজের যৌথসৃষ্টি, সম্মিলিত  
 সফলতা, জাতির প্রাণচ্ছন্দের চিহ্ন ও কর্মময় অভিযাজনা। কাজেই, সাংস্কৃতিক  
 ইতিহাসের স্বর্ণ-তারেই বাজিয়া উঠে সমগ্র জাতির কল্লোলিত মর্মবাণী।

‘সংস্কৃতির মধো আছে যেমন সামগ্রিকতার সমানাধিকার, তেমনি আছে তাহার  
 ‘কৃতি’ বা কৃতিত্বময়তার দিক। যে জাতি বাঁচিয়া আছে, সে প্রতিদিনই সৃষ্টি করিয়া  
 চলিয়াছে একটি বহমান সংস্কৃতির ধারা। সংস্কৃতিই জাতীয় প্রাণময়তার সামগ্রিক  
 অভিব্যক্তি। মানুষ তাহার কথাম্ব-বার্তায়, চলনে-বলনে, পোশাকে-  
 পরিচ্ছদে, খেলা-ধুলায়, আমোদ-প্রমোদে প্রতি মুহূর্তে তাহার  
 বিচিত্র সংস্কৃতির ধারা রচনা করিয়া চলিয়াছে, রক্ষা করিয়া  
 চলিয়াছে সংস্কৃতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রবহমানতা। যে জাতির সংস্কৃতির রূপান্তর নাই, নাই  
 ক্রম-বিবর্তন, ‘নাহার সংস্কৃতি মৃত, সেই জাতিও মৃত। কারণ, সংস্কৃতির মধোই নিয়ত  
 ধ্বনিত-প্রতিধ্ব। ৩ য় সমগ্র জাতির প্রাণের জ্বলন্দর।

বাংলার সংস্কৃতি সৃষ্টি ও বিকাশের মূলে রহিয়াছে তাহার অফুরন্ত প্রাণ-প্রাচুর্য  
 এবং তাহার প্রকৃতির বারিত দাক্ষিণ্য। সব-ভারতীয় সংস্কৃতির সহিত তাহার নিবিড়  
 যোগ-বন্ধন থাকিলেও ৬ তাহার স্বতন্ত্র প্রাণ-রসের সফল অভিব্যক্তিতে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত,  
 ‘আপনাতে আপনি বিকা ত’। সর্ব-ভারতীয় প্রাণ-গন্ধা যেমন বাংলাদেশের কোমল  
 যুক্তিকা স্পর্শ করিয়া পদ্মা ও ভাগীরথী নাম পরিগ্রহ করিয়াছে, তেমনি সব-ভারতীয়  
 সাংস্কৃতিক ধারা বাঙালী মনী ৭ বিশিষ্টতায় এবং হৃদয়াভিব্যক্তির অনগ্রতায় স্বতন্ত্র  
 বাঙালী সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। কাজেই, কেবল অঙ্গিক-জাবিড়-গোপ্তিই নয়,

‘খবর হল কল পত্রের যোগে এক দেহ হল লীল’। সর্বশেষে আসিয়াছে ‘প্রবল

বাক্য’। কাব্যেরও ঘুরে সরাইয়া যাবে নাই। সকলকে সে অন্তরে গ্রহণ

লার সংস্কৃতি  
হইল

করিয়াছে। সকলের সংস্কৃতির তিল তিল সোনা সংগ্রহ করিয়া সে

রচনা করিয়াছে তাহার সংস্কৃতির অনবদ্য তিলোত্তমা-মূর্তি। কিন্তু

তাই বলিয়া সে তাহার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যকে বিসর্জন দেয় নাই। সে

স্ব-ভারতীয় সংস্কৃতির কমলমণির উপর তাহার স্বাতন্ত্র্যের ছাতি সংযোজিত করিয়াছে।

জালাই সংস্কৃতি তাই সর্ব-ভারতীয় সংস্কৃতির উপধারা হইয়াও পৃথক, স্বতন্ত্র।

বঙ্গ-সংস্কৃতির প্রাণ-কেন্দ্র হইল তাহার ধর্ম। সেই ধর্ম লৌকিক ও পৌরাণিক  
ঐশ্বাসের সমন্বয়ে রচিত। লৌকিক দেব-দেবী ও পৌরাণিক দেব-দেবী এখানে যুগ যুগ

ধর্ম-সংস্কৃতি প্রাণ-  
কেন্দ্র হইল ধর্ম

ধরিয়া পাশাপাশি বসবাস করিতেছেন। সহাবস্থানের কলে

তাহারা কখনও কখনও অভিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। চণ্ডী, বগী,

মনসা, ধর্মঠাকুর, ওলাবিবি প্রভৃতিকে লইয়া রচিত হইয়াছে নানা

মূর্তি, নানা চিত্র, সৃষ্টি হইয়াছে তাহার বিশাল লোক-সাহিত্যের ধারা। সেই লোক-

সাহিত্যের বিশাল চরণে ধরা পড়িয়াছে সমগ্র সমাজের অব্যর্থ রূপচিত্র।

বাংলার লোক-সাহিত্যের মধ্যে দেখা যায় তাহার লোক-সংস্কৃতির জীবন্ত

প্রতিচ্ছবি। শিবায়ন-মঙ্গলকাব্যে, যাত্রা-পাচালী ও কবিগানে, বাউল-ভাটিয়ালী-

সারি-সারি-মুশলি ও কীর্তনের গানে বাঁচিয়া রহিয়াছে বাঙ্গালীর অফুরন্ত প্রাণসত্তা।

ফুলুরা-খুলনা, বেহুলা-লখিমদর, কালু-লখা, মেনকা-উমা, মহয়া-

লোক-সাহিত্য  
লোক-সংস্কৃতির  
প্রতিচ্ছবি

মলুয়া, লীলা-কঙ্ক, সোনাই-কাজলরেখা—ইহারা আমাদের

প্রাণেরই প্রতিচ্ছবি। ইহাদের মধ্যে রহিয়াছে যেমন বিপুল

বৈচিত্র্যের ব্যাপ্তি, তেমন আছে অশ্রুধারার অফুরন্ত উৎস।

ইহাদের আশ্রয় করিয়া বাঙ্গালী যত কাঁদিয়াছে, তাহার তুলনা আর কোন জাতির

ইতিহাসে নাই। সেই রূপসৃষ্টির অপূর্ব মায়াকাজে অপরূপ চইয়া উঠিয়াছে তাহার

ব্রতকথা, রূপকথা ও ছেলে-ভুলনা ছড়াগুলি।

বঙ্গ-সংস্কৃতির অগ্নান স্বাক্ষর রহিয়াছে তাহার গৃহ-নির্মাণ-পদ্ধতিতে

তা,

ভাস্কর্য ও মৃৎশিল্পে। বাঙ্গালী কারিগরের মতো আটচালা-নির্মাণের চৈন্য আর

লোক-শিল্প

কাটারও নাই। কক্সবাজারের শিল্পীদের হাতের তৈয়ারী মাটির পুতুল,

বঙ্গ-সংস্কৃতির

কালীঘাটের অঙ্কিত পট, বাংলার মেয়েদের হা-শাক আলপনা,

অগ্নান স্বাক্ষর

নক্সী-করা কাঁথা আজিও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তা ছাড়া, হাড়ি-কলসী,

বাসন ও বস্ত্রে সূক্ষ্ম শিল্পকর্ম প্রশংসনীয় গৌরব অর্জন করিয়া

মোড়া ও আসন তৈয়ারীতে বাঙ্গালী সংস্কৃতির রহিয়াছে স্বর্ণ স্বাক্ষর।

বাঙ্গালী সংস্কৃতির জন্ম প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে। ঐন্দক-গোষ্ঠীর মাছুষেরাই

প্রথমে এই সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিল। তারে আসিয়া যুক্ত হইয়াছে

দ্রাবিড় ও ভোট-ব্রহ্ম সংস্কৃতির ধারা। পরবর্তীকালে তাহার সহিত মিলিত হইল সর্ব-

ভারতীয় পৌরাণিক সংস্কৃতির ধারাস্রোত। সেই সময়ে সম্পূর্ণ হইয়াছিল ঐষ্টম শতকের

কাছাকাছি সময়ে। সেই সময় তবুই বাঙ্গালী-সংস্কৃতির বক্ষণ। **ব্রাহ্মণ**  
ডোট-ব্রহ্ম সংস্কৃতির মৌল প্রেরণার এবং হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈনধর্মের প্রভাৱে যে বাঙ্গালী-  
সংস্কৃতির বিকাশ হইয়াছিল, ষাটশ শতকের কাছাকাছি সময়ে তাহার উপর আসিয়া  
পড়িল মুসলমান সংস্কৃতি—বিশেষ করিয়া মুসলী সাধনার প্রভাব। আজ বাংলার লোক-

বঙ্গ-সংস্কৃতির  
রূপ-রূপান্তর

সংস্কৃতি তো হিন্দু-মুসলমানের যৌথ সম্পত্তি। তাহার পর ষাটশ  
শতকে বাংলাদেশে আসিল ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার  
চেউ। বাঙ্গালী তাহাকেও বাঁধিয়াছে নিবিড় যোগ-বন্ধনে। কিন্তু

প্রাচীন বাংলার লোক-সংস্কৃতিতে লাগিল ভাঙ্গনের নির্মম আঘাত। পল্লী-কেন্দ্রিক  
বঙ্গ-সংস্কৃতি সেই রূপান্তরের মধ্য দিয়া হইয়া পড়িল নগর-কেন্দ্রিক এবং তাহার অফুরন্ত  
প্রাণ-উৎস বীরে বীরে আসিল শুকাইয়া।

আজ বঙ্গ-সংস্কৃতি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে চরম সংকটের মুখে। রাজনৈতিক চক্রান্তে  
আজ বাংলাদেশ দ্বিধা-বিতর্ক। দেশ বিতর্ক হইয়াছে; রাজনৈতিক ছুরিকাঘাতে বাংলার  
প্রাণ-প্রবাহিনী পদ্মাও বিতর্ক হইয়াছে। কিন্তু যুগ যুগ ধরিয়া বাঙ্গালী তাহার সম্মিলিত  
সাধনার দ্বারা যে অনবদ্য সংস্কৃতির উপচার সাজাইয়াছে, তাহা কি কখনও বাহিরের  
চক্রান্তে বিতর্ক হইতে পারে? বঙ্গ-প্রেমিকের আজ তাহাই একমাত্র আশা-ভরসা,

তাহাই একমাত্র সাধনা। আজ দেশ-বিভাগের সীমারেখার ওপারে  
বঙ্গ-সংস্কৃতির সংকট  
মহুয়া-মলুয়া-কাজলরেখার দল কাঁদিতেছে, এপারে কাঁদিতেছে  
ফুলুরা-বেহলা-খুলনার দল। ওপারে ভাটিয়ালি, এপারে বাউল। তাহার উপর আজ  
আসিয়া পড়িতেছে প্রবল মার্কিনী প্রভাব। যাহা অবশিষ্ট ছিল, উৎকট ব্যক্তিকতার  
বিষ-নিঃখাসে এবং মার্কিন সংস্কৃতির অগ্নিশিখায় তাহা ভস্মীভূত হইতে চলিয়াছে।  
ভিতরের ও বাহিরের আঘাতে বাংলার সংস্কৃতি আজ ক্ষতবিক্ষত, বিপর্যস্ত।

রবীন্দ্রনাথ তাই একদিন সখেদে বলিয়াছিলেন—“সমস্ত দিনের দুঃখান্দার রিক্তপ্রান্তে  
বিরানন্দ ঘর আলো জ্বলবে না, সেখানে গান উঠবে না আকাশে। ঝিল্লী ডাকবে  
বাঁ নুন, ঝোপঝাড়ের মধ্য থেকে শেয়ালের ডাক উঠবে প্রহরে-প্রহরে, আর সেই সময়ে  
শিক্ষা। নানান দল হতে আলোয় সিনেমা দেখতে ভিড় করবে।” তবু আশা করিব,

বঙ্গ-সংস্কৃতি এই সংকট উত্তীর্ণ হইবে, এই রূপ-রূপান্তরের মধ্য দিয়া  
উপসংহার  
জন্মলাভ করিবে আগামীকালের উজ্জ্বল বঙ্গ-সংস্কৃতি। ভিতরের ও  
বাহিরের দুর্জয় আঘাত আজ বাঙ্গালীর প্রাণ-পুরুষ জাগিয়া উঠিয়াছে। সে আর এপার  
বাংলা-ওপার বাংলার সংস্কৃতির মার্বধানের কৃত্রিম ভেদ-রেখাকে স্বীকার করিবে না।  
সে তিল তিল করিয়া বুকের রক্ত ও ভালোবাসা দিয়া সংস্কৃতির যে স্বর্ণ-প্রতিমা নির্মাণ  
করিয়াছিল, বুকের রক্ত তিল দান করিয়া সে আবার তাহার পুনরভিষেক করিবে।

এই প্রবন্ধের অন্তঃসরণে লেখা যায় :

- বাঙ্গালীর সংস্কৃতির পরিচ
- বাঙ্গালীর সংস্কৃতির রূপ-রূপাং
- বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য, গো. প্রা. ৫

প্রবন্ধ-সূত্র : সূচনা। বাংলার প্রধান গৃহপালিত  
 পশু : গোরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল, গাধা, মোড়া,  
 কুকুর, বিড়াল। বাংলার অরণ্য-পালিত পশু : হাতী,  
 চিতাবাঘ, নেকড়ে বাঘ, দজ্জার, খরগোশ, রয়্যাল  
 বেঙ্গল টাইগার, হরিণ, শিয়াল, নেভেল। বাংলার  
 পাখি : ডাক্তার পাখি : কোয়েল, শ্রাবণ, ফিঙে,  
 পাপিয়া, বুলবুল, কোকিল, বউ-কথা-কণ্ড, ঘুঘু, বাহুড়,  
 লক্ষ্মীপেঁচা। জলের পাখি : পাতিহাঁস, বাজীহাঁস,  
 বক, মাছরাঙা, ভরত পাখি, ধনেং, বেলেহাঁস,  
 কাষাঝোঁচা, ডলপিন, পানকৌড়, চিল, গাঙ-চিল,  
 গাঙ-শালিক। উপসংহার।

## বাংলার পশুপাখি

মা. '৫৬

বাংলাদেশের অপরূপ প্রাকৃতিক রূপসম্ভারের মতে, বাদ্দালী জাতির নিজস্ব বিশিষ্ট  
 মানসিকতা ও হৃদয়-সৌন্দর্যের মতো বাংলাদেশের পশুপাখির রূপ-প্রকৃতিরও আছে এমন  
 এক স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, যাহা অনায়াসে চোখে পড়িবার মতো। বঙ্গ-প্রকৃতি যেন  
 আপন হস্তে তাহার পশুপাখির রূপ-প্রকৃতি রচনা করিয়া দিয়াছেন। বিভিন্ন বর্ণ-  
 বাহারে ও অপরূপ বর্ণ-মণ্ডলে তাহারা দীর্ঘকাল বাদ্দালী জাতির মনোহরণ করিয়া  
 আসিয়াছে। বাংলাদেশের আমলী-ধবলী হইতে আরম্ভ করিয়া  
 নন্দন  
 চন্দন 'বউ-কথা-কণ্ড' পর্যন্ত—বঙ্গ-প্রকৃতির হৃদয়ের সেই সরলতাময়,  
 মাদুরপূর্ণ আভিযাত্রির অন্তিম প্রত্যাক। পূর্ব-দিগন্তে সপ্তাশ্বের বিজয় ঘোষণার পূর্বেই  
 তাহারা সমবেত কলকাকলিতে বাদ্দালীর ঘুম ভাঙায়, সারাদিন সেবা ও সৌন্দর্য্য করে  
 মনোরঞ্জন, দিনান্তে এক অপরূপ বিদায়-রাগিণী সৃষ্টি করিয়া তাহারা ঘরে ফেরে। আবার,  
 রাত্রি-নিশীথে তাহারা বনাস্তরাল হইতে আপন শব্দ-প্রসঙ্গিত দিয়া বাংলাদেশের নৈশ  
 আকাশ প্রাণিত করিয়া দেয়। ইহারা বঙ্গ-প্রকৃতির আত্মার অনবচ্ছিন্ন প্রকাশ। বাস  
 মন-মাদুরী সৃষ্টিতে ইহাদের লান অসামান্য।

বাংলাদেশের গৃহপালিত পশুদের মধ্যে গোরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল, কুকুর, বিড়াল,  
 গাধা ও মোড়ার নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। মোড়া বাংলার পশু-বিশ্ব বহুকাল  
 বাংলায় প্রতিপালিত হইয়া বাংলার ঘরের প্রাণী হইয়া গিয়াছে। একই বাংলাদেশের  
 সর্বাধিক আদরের প্রাণী। গৃহে গৃহে সেও প্রতিপালিত নয়,  
 গাংলার প্রধান  
 গৃহপালিত পশু :  
 গোরু  
 পূজিতও। বহিবৃদ্ধের গোরুদের মতো তাহার দৈহিক বিশেষতা  
 বা মেদ-বাহুল্য না থাকিলেও তাহার শরীরে এমন একটি  
 বিশিষ্ট সৌন্দর্য্য আছে, যাহা বাংলাদেশের জল-হাওয়ার সঙ্গে  
 অ-স্বচ্ছরূপে মিলিয়া যায়। কৃষি-মাতৃক বাংলাদেশে অর্থনীতিকে গোরুই যুগ যুগ  
 ধরিয়া সমৃদ্ধ করিয়া আসিয়াছে এবং আজও করিতেছে। সে লাঙ্গল টানিয়াছে, গাড়ি  
 টানিয়াছে, বোকা বহিয়াছে। আর, মাঠে যখন তাহারা দলবদ্ধভাবে চরিয়া বেড়ায়,

তখন সৃষ্টি করিয়াছে এক তুল্লভ সৌন্দর্য। বাংলাদেশের গোক-চরা মাঠের দৃশ্য সত্যই অপরূপ। বাংলাদেশের আমলী, ধবলী, মঙ্গলা, মহেশকে কে না চেনে ?

গোকর পর মহিষ। 'মোষ নিয়ে পার হয় রাখালের ছেলে।'—ইহা বাংলাদেশের একটি স্থলভ দৃশ্য। মহিষ গোকর মতো ক্ষীর, দুধ, সর, ননী দিয়া, লাঙল ও গাড়ি টানিয়া, বোঝা বহিয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া বাংলাদেশের সেবা করিলেও গোকর মতো জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারে নাই। ভেড়া ও ছাগল বাঙ্গালীকে দুধ দিয়াছে, মাংস দিয়াছে। গাধা ও ঘোড়া বোঝা বহিয়াছে, গাড়ি টানিয়াছে। কুকুর ও বিড়াল দিয়াছে সেবা ও সাহচর্য। এমন-কি, বহু-তিরস্কৃত শূকরও তাহার নীরব আত্মদানের মধ্য দিয়া রাখিয়াছে সেবার চরম স্বাক্ষর।

এ তো গেল গৃহপালিত পশুদের কথা। বাংলার প্রকৃতি-জননীর কোলে যে পশুরা স্বাধীনভাবে বিচরণ করে, তাহাদের কথা বলা হয় নাই। তাহারা অরণ্যের শ্রমল ছায়ায় জন্মায় এবং অরণ্য-জননীর স্নেহে প্রবর্তিত হয়। হিমালয়ের তরাই অঞ্চল, ছোটনাগপুরের অরণ্য-ভূমি এবং দক্ষিণের সুন্দরবন অরণ্যক পশুদের স্বাধীন বিহার-ভূমি। তরাই অঞ্চলে হাতী, চিতাবাঘ ও নেকড়ে বাঘের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ছোটনাগপুরের সন্নিহিত পশ্চিম বাংলা সজার, ভলুক প্রভৃতি পশুর বিচরণ-ভূমি। সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার তো বিশ্ববিখ্যাত। 'সেখানে মানুষ কেউ যায় নাকো— দেখা যায় বাঘিনীর ডেরা বেতের বনের ফাঁকে,—জাফল গাছের তলে রৌদ্র পোহায় রূপসী মৃগীর মুখ দেখা যায়—' সুখ-দর্শন হরিণ ও সুন্দরবনের সৌন্দর্য। তাহা ছাড়া, হায়েনা, চিতাবাঘ তো আছেই। বাংলা-

দেশের শিয়াল তো কাব্য-মর্যাদা লাভ করিয়াছে। 'রাতে ওঠে থেকে থেকে শিয়ালের কঁক।' সারা রাত ধরিয়া গল্পী-বাংলার শিয়ালের দল গ্রহর ঘোষণা করিয়া চলে। অ আছে নেউল। সপসঙ্কল বাংলাদেশে নেউলের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে।

বাংলার পশুদের একটা নিজস্ব সৌন্দর্য আছে। বাংলার কাকের কণ্ঠ প্রথম প্রভাত রাত্রেই বাজিয়া উঠে। তারপর শ্রামা, ফিঙে, দোয়েল, পাপিয়া তাহাদের বিচিত্র কলতারা সৃষ্টি করে অপরূপ একতান। পূর্বাকাশে অরণ্যদয়ের রক্তিমার সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া পশুদের সংগীত পৃথিবীর মৃন্ময় পাত্রটিকে হিরণ্যয় করিয়া তোলে। ১ গ্রাম-বাংলার মুখর গায়ক, উদাসী বাউল। বাঙ্গালী বাংলার পাখি ২ ইহাদের প্রশস্তি রচনা করিয়াছেন। দোয়েল, শ্রামা, ফিঙে তো একান্তভাবে পারই পাখি। বুলবুল একেবারে বাংলার ঘুমপাড়ানী গানে চির-অমরত্ব লাভ কা মা আছে। বসন্তের কোকিল বহু-প্রশংসিত। শিমূল, পলাশ, দাড়িম ও মাধবী-মঞ্জীর রক্তিম প্রগলভতার দিনে কোকিলের পঞ্চম তান এক অনির্বচনীয় সুর-মুছনায় ২ সার আকাশকে প্রাবিত করে। 'তিনটি শালিখ' শুধু রান্নাঘরের চালে বগড়াই কমা না, গানও শোনায়। এবং 'হলুদ নরম পায়ে



খয়েরী শালিখগুলো ডলিছে উঠান।' তাহা ছাড়া আছে বসন্তবোরি ও নীলকণ্ঠ পাখি। ময়না ও কাকাতুয়া শিশুপাঠ্য পুস্তকে স্থান গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের নিজস্ব জনপ্রিয়তার

ডাকার পাখি:

ধোয়েক, থামা,

কিঙে, পালিয়া,

বুলবুল, কোকিল,

বউ-কথা-কণ্ঠ, ঘুঘু,

বাহুড়, লক্ষ্মীপেঁচা

গুণে। চন্দনা টিয়াও বাংলাদেশে বিশেষ জনপ্রিয়। গ্রীষ্মকালে চাতকের বারি-প্রার্থনা, জ্যোৎস্না-নিশীথে নিত্রা-জাগর 'বউ-কথা-কণ্ঠ' পাখির ডাক এক অনবদ্য স্বর-মুহূর্ত্তনায় বাংলাদেশের আকাশকে প্রাবিত করে। বাংলাদেশের 'বউ-কথা-কণ্ঠ' পাখির অনেক নাম। কখনও সে 'বউ-কথা কণ্ঠ', কখনও সে 'চোখ-গেল', কখনও সে 'গৃহস্থের-খোকা-হোক', আবার কখনও সে 'কুটুম-এলো' পাখিও।

ঘুঘুও বাংলার একটি অতি-পরিচিত পাখি। নিস্তরঙ্গ মধ্যাহ্ন তাহার করুণ ডাকে ব্যথিত হইয়া উঠে। তাহা ছাড়া, অন্ধকার রাতে বাহুড়ের চিংকার কে না শুনিয়াছে? আর 'কদমের ডালে আমি শুনেছি যে লক্ষ্মীপেঁচা গেয়ে গেছে গান', সে গান সবার শোনা।

বাংলাদেশ পুকুর-দীঘি, খাল-বিল, নদী-নালায় দেশ। কাজেই, বাংলাদেশ জলচর পাখিদের বিশেষ প্রিয়স্থান। বাংলার পুকুর-দীঘিতে গৃহপালিত পাতিহাঁস-রাজহাঁসের

সারি প্রায়ই চোখে পড়ে, আর চোখে পড়ে মন্তব্য-ধ্যানে নিমগ্ন

জলের পাখি:

পাতিহাঁস, রাজহাঁস,

বক, মাছরাঙা, ভরত

পাখি, ধনেশ, বেলহাঁস,

কাধাখোঁচা, জলপিপি,

পানকৌড়ি, চিল,

গাঙ-চিল,

গাঙ-শালিক

বক ও মাছরাঙা। কালো মেঘের বৃকে উড্ডীয়মান বক-পঙ্ক্তির দৃশ্য অতীব স্তম্ভর। 'সে আকাশ পাখনায় নিঙুড়িয়ে লয়ে/কোথায় ভোরের বক মাছরাঙা উড়ে যায় আশ্বিনের মাসে।' তাহা ছাড়া, চলনবিল-অঞ্চলে, গঙ্গা-পদ্মা-মেঘনায় এবং দক্ষিণের সমুদ্র-উপকূলে দেখা যায় ভরত পাখি, ধনেশ, বেলহাঁস, কাধাখোঁচা, জলপিপি, পানকৌড়ি, চিল, গাঙ-চিল, গাঙ-শালিক ইত্যাদি পাখি।

ইহাদের মধ্যে বক, মাছরাঙা, জলপিপি, পানকৌড়ি, চিল, গাঙ-

চিল, গাঙ-শালিক তো যথারীতি কাব্য-মর্যাদা লাভ করিয়াছে। বাংলাদেশের প্রকৃতির মতো তাহার পাখিগুলিরও রচিয়াছে এক দুর্লভ কমনীয়তা।

বাংলার পশুপাখি বাংলার প্রকৃতির রূপমাদুরীর অবিভাজ্য অঙ্গ। ইংরেজ মলে নির্মমভাবে বাংলার পশুপাখিকে হত্যা করা হইয়াছে। বলাৎকার, -... বাংলার প্রকৃতিক, তাহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে নিষ্ঠুর দাতকের মতো হত্যা করা হইয়াছে।

রূপসী বাংলার এই রূপ-ক্ষয় প্রতিরোধ করার জগৎ জাতীয় উপসংহার সরকার কৃতসংকল্প। বহু পশু-পাখিদের সংরক্ষিত বনভূমি—

'অত্যয় অরণ্য' ও 'পক্ষীর আলয়' রচিত হইয়াছে এবং প্রাণ্য বন-রচনার কাজ চলিয়াছে দ্রুতগতিতে। তাহা ছাড়া, বৃক্ষরোপণ সম্পর্কে প্রায় পশু-সমগ্রই পালনের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। ইহা নিঃসন্দেহে একটি শুভ-সং।

এই প্রবন্ধের অন্তিমসরণে লেখা যায় :

● বাংলাদেশের পশুপাখির পরিচয়

● পশু-সমগ্র

**এবং-স্বয়ং :** স্থচনা ॥ গ্রামগুলির স্বয়ংসম্পূর্ণ-  
তার হাটের ভূমিকা ॥ বাণিজ্যিক ও বণ্টনগত  
ভূমিকা ॥ হাটের স্থান এবং হাট ও বাজারের  
পার্থক্য ॥ হাটের দৃশ্য ॥ ভাবের আদান-প্রদান ও  
যোগাযোগের স্থান ॥ উপসংহার ॥

১.  
**গ্রামের হাট**

উ. মা. ৩০

“দূরে দূরে গ্রাম দশ-বারোখানি মাঝে একখানি হাট।” —যতীন্দ্রনাথ বেনগুপ্ত

দশ-বারোখানি গ্রামের কেন্দ্রস্থলে একখানি হাট—গ্রামীণ জীবনের হৃৎপিণ্ড। ‘ছায়া-  
স্থনিবিড়, শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলির আদান-প্রদান ও পণ্য-বিকিকিনির এক-  
মাত্র কেন্দ্র হইল এই হাট। গ্রাম-ভারতের ব্যস্ততাবিহীন গতানুগতিক জীবনধারায় হাট  
সঞ্চারিত করে এক সহজ গতির জোয়ার। সেই গতি সঞ্চারিত হয় গ্রামগুলির উৎপাদন-  
প্রকরণে, তাহার কুটির-শিল্পে, তাহার কৃষি-প্রান্তরে, সামগ্রিকভাবে তাহার জন-জীবনে।  
সেই গতির প্রেরণায় শহর ও গ্রামের মধ্যে রচিত হয় পণ্য-বিকিকিনি ও আদান-  
প্রদানের এক অদৃশ্য সংযোগের নেতু। কর্মের দোলায় একসঙ্গে দুইয়া উঠে গ্রাম ও  
শহর। দূর-দূরান্তের উৎপাদক-বেপারী ও ক্রেতার দল বাঁধিয়া হাটে আসে। কেহ  
আসে নৌকায়, কেহ আসে গোরুর গাড়িতে, কেহ-বা আসে  
স্থচনা পদব্রজে। নৌকা বোঝাই হইয়া কিংবা গোরুর গাড়ি বোঝাই  
হইয়া আসে পণ্য-সম্ভার; কেহ-বা মাথায় করিয়া, আবার কেহ-বা বাঁকে করিয়া বহিয়া  
লইয়া আসে বিকিকিনির দ্রব্য সামগ্রী। সকলেই হাটে সমবেত হয়। দর-জানাজানি,  
দর-কষাকষি এবং সর্বশেষে ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে এখানে একটি বিশেষ অর্থনৈতিক  
উদ্দেশ্য সাধিত হয়। গ্রাম-গ্রামান্তরের, এমন-কি স্থল শহরের বহু মাছুয়ের সমাগমে,  
তাহাদের কথা-বার্তায় যে উত্তাল কোলাহলের সৃষ্টি হয়, তাহা দূর-দূরান্তের গ্রামেও  
প্রসিদ্ধ হইয়া যায়। গ্রামের হাটে বহু হৃদয়ের সংস্পর্শে ভাবের যে তরঙ্গ উঠে, তাহা  
গ্রামা বর উপকূলকে স্পর্শ করে। হাট তাই স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ জীবনের অর্থনৈতিক  
ও ভাবনৈতিক কেন্দ্র-ভূমি।

গণ্যাহে সংস্রবণতঃ একদিন বা দুইদিন করিয়া হাট বসিয়া থাকে। এই দিনটির  
দিকে তাকাইয়া কৃষক উৎপাদন করে তাহার কৃষিজ দ্রব্য, শিল্পী উৎপাদন করে তাহার  
শিল্প-সামগ্রী, দোকান দ্বারা সাজায় তাহাদের নানা বিচিত্র পণ্যের দোকান ও  
পসর। বাহারা চিত্রাচারিত ক্রেতা, তাহারাও হাটে তাহাদের  
সঞ্চিত দ্রব্য লইয়া এই দিনটির মুখের দিকে তাকাইয়া বসিয়া  
থাকে। এই আদান-প্রদানের সূত্র ধরিয়া গ্রামগুলিতে আসে শ্রী,  
আসে সমৃদ্ধি ও সচ্ছলতা। প্রতিটি গ্রাম স্ব-স্ব উৎপাদন-বৈশিষ্ট্যে

গ্রামগুলির স্বয়ং-  
সম্পূর্ণতায় হাটের  
ভূমিকা

উজ্জল। কিন্তু অল্প-নিরপেক্ষতা কোন গ্রামই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। পরস্পরের মধ্যে  
আদান-প্রদানের মাধ্যমেই আসে গ্রামগুলির স্বয়ংসম্পূর্ণতা। এবং সেই স্বয়ংসম্পূর্ণতার  
মূলে রহিয়াছে হাটগুলির মূল্যবান বাণিজ্যিক অবদান।

গ্রামে গ্রামে যে পণ্য উৎপন্ন হয়, তাহার সমস্তটাই গ্রামের প্রয়োজনে লাগে না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত পণ্য হাটে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে আনীত হয়। সেই উদ্ভূত পণ্য ক্রয় করিবার জন্য আসে ঘাটতি গ্রামের ক্রেতারা; আর আসে দূর-দূরান্তের দালাল-কড়িয়া-বেপারীরা। এইভাবে হাটের বাণিজ্যিক মধ্যস্থতায় গ্রামের উদ্ভূত পণ্য গ্রামান্তরে কিংবা শহরে, গঞ্জে কিংবা বড় বড় রেল-স্টেশনে প্রবাহিত হইয়া যায়। কাজেই, অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে কেবল বাণিজ্যিক আদান-প্রদানেই গ্রামের হাটের ভূমিকা নিঃশেষিত নয়, ইহার বাণিজ্যিক ও বণ্টনগত ভূমিকারও আছে গৌরবময় তাৎপর্য।

সাধারণতঃ নদীতীরে গ্রামের বা নৌকার ঘাটে, বড় রাস্তার সান্নিধ্যে বা রেল-স্টেশনের কাছে হাট বসিয়া থাকে। হাটের সঙ্গে দূর-দূরান্তের পরিবহণের থাকে গভীর সংযোগ। সেখানে গ্রামের পণ্য শহরে কিংবা গ্রামান্তরে, শহরের পণ্য গ্রামে প্রবাহিত হইয়া যাইবার ব্যবস্থা থাকে সম্পূর্ণ। যেখানে হাট বসে, সেখানে প্রত্যহ বাজারও বসিয়া থাকে। বাজার হইল প্রাত্যহিক সংস্করণ আর হাট হইল সাপ্তাহিক কিংবা অর্ধ-সাপ্তাহিক। কাজেই, হাট এবং বাজারের আছে কালগত ও আকৃতিগত ব্যবধান।

হাটে থাকে কতকগুলি টিন বা খড়ের চালার স্থায়ী দোকান। এই দোকানগুলি বহিষ্কৃত কিংবা অবস্থাপন্ন বিক্রেতাদের। আর কতকগুলি থাকে অস্থায়ী দোকান। খুটি দিয়া তৈয়ারী দোচাল-খের অল্পবিস্তৃত দোকানগুলি বসে। যাহাদের পুঁজির সামর্থ্য আরও কম, তাহারা খোলা ভায়গায় সারিবদ্ধভাবে বসিয়া যায়। বহু দোকানের ভিড়ে এবং বহু মানুষের সমাগমে হাট যখন জমিয়া উঠে, তখন সেই বিকিকিনির বাস্তবতার দৃশ্য সত্যই অপূর্ব লাগে। বাজার কিংবা আজ সকালেই হাটের অনবরত স্থানটি পরিত্যক্ত পড়িয়া ছিল। তাহাতে লোকজনের কোন সমাগমই ছিল না। মধ্যাহ্নের পর হইতে লোক-সমাগম শুরু হইল। অপরাহ্নে মানুষের জোয়ারে হাট যেন থই-বই করিতে থাকে। একপাশে তরি-তরকারি শাক-সবজির দোকান, হাটের দৃশ্য অন্য পাশে কলসী-হাঁড়ি ও অগ্ন্যাশ্রয় মণি-দোকান, কোথাও একপাশে জামা-কাপড়-গামছার দোকান, কোথাও-বা ধান-চালের দোকান, কোথাও-বা মাছের দোকান, কোথাও-বা ময়রার মিষ্টর দোকান। সব দোকানেই সন্ধান ভিড়। সর্বত্রই ‘মাল-চেনাচেনি, দর-জানা জানি। নাকড়ি নিয়ে কত টানাটানি।’ উচ্চ বেগুন পটল মূলা, বেতের বোনা; কুলো, সর্ষে ছোলা ময়দা আটা, শিমের রাসপারি মসুর শাট, ঝাকরি কড়া বেড়ি ছাঁচ, শহর থেকে সস্তা ছাতা—সবই এখানে দর-দস্তুর করিয়া বিক্রয় হয়। সর্বোপরি এ সব মানুষের কলকোলাহলে যে সেরগোল ফুট হয়, তাহার তুলনা হয় না। কোন কোন হাটে ধান, পাট, নারিকেল প্রভৃতি প্রধান প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য এবং তাঁদের ইত্যাদি শিল্পজাত দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া কেক গোরু, মহিষ, ছাগল, হাঁস, মুরগী প্রভৃতি বিক্রয়ের পৃথক পৃথক ব্যবস্থা।

হাট যেমন পণ্য-বিক্রিনির কেন্দ্র, তেমনি ভাবের আদান-প্রদান ও যোগাযোগের প্রধান কেন্দ্র। কৃষক ও শিল্পীরা সারা সপ্তাহ ধরিয়া নিজ নিজ কর্মস্থলে থাকে কর্মব্যস্ত। পরস্পরের সঙ্গে কোন যোগাযোগ থাকে না। হাট ভাব-বিনিময়ের ও বহির্বিষয়ের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের সার্থক কারিগর। হাটের কাছে সাধারণতঃ থাকে পোস্ট-অফিস, স্থল, ডাক্তারখানা, আর দুই-একটি সরকারী অফিস। ডাক-পিয়ন এখানে চিঠি বিলি করে। খবরের কাগজ আসে দুই-একখানা। তাহা ছাড়া, শহর হইতে আসে দালাল-কড়িয়া ও পাইকারী ক্রেতারা। খবরের কাগজের মাধ্যমে বা দালাল-কড়িয়া প্রভৃতির মধ্যস্থতায় বহির্বিষয়ের সঙ্গে গ্রামের একটি অদৃশ্য যোগবন্ধন স্থাপিত হয়। একদিকে আসে গ্রামান্তরের মানুষ, অন্যদিকে আসে দূর শহরের ব্যবসায়ীরা। পরস্পরের

সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয়, অন্তর জানাজানি হয়, সেই সঙ্গে সমস্বার্থে ভাবের আদান-প্রদান ও যোগাযোগের স্থান

সকলে এক অথও আর্থিক দুনিয়ার বৃত্তের মধ্যে আসিয়া পড়ে।

গ্রামের পণ্য নৌকা, ট্রেন কিংবা ট্রাক বোঝাই হইয়া শহরে চলিয়া যায়, বিনিময়ে শহরের টাকা প্রবাহিত হইয়া আসে গ্রামে। তাহা ছাড়া, গ্রামের সহজ সরল মানুষদের কাছে শহরের কোন নূতন আবিষ্কৃত পণ্য বিক্রয় করিবার জন্য শহর হইতে দলে দলে আগমন ঘটে ফেরিওয়ালাদের। বিচিত্র তাহাদের বেশবাস, বিচিত্র তাহাদের কণ্ঠস্বর, বিচিত্র তাহাদের বিক্রয়-কলা। কেহ মাইক্রোফোনে করিয়া কিংবা রেকর্ড বাজাইয়া, কেহ-বা পায়ে ঘুড়ুর বাঁদিয়া নাচিয়া নাচিয়া, কেহ-বা আবার হারমোনিয়াম-সহযোগে গান গাহিয়া তাহাদের পণ্য বিক্রয় করে। তাহাদের বক্তৃতায় ও নাচে-গানে হাট মুখর হইয়া উঠে। আবার, কোথাও-বা পথের ধারে বসিয়া অল্প ভিক্ষুক করণ কর্তে গান গাহিয়া ভিক্ষা করে। তাহার গানের আবেদনে সমগ্র হাটের পরিবেশটি রূপ হইয়া উঠে।

বিকালের কর্মব্যস্ততার পর সন্ধ্যা নামে; এখানে-ওখানে হারিকেন, লণ্ঠন, হাজাক ইত্যাদি গুলিয়া উঠে। বেচাকেনার মধ্য দিয়া ক্রমে রাত্রি বাড়িতে থাকে। ধীরে ধীরে মানুষের চিত্ত ফিরিতে থাকে। বেচাকেনা সান্ত্বন্য করিয়া এবার হাট ভাঙিবার পালা।

দোকান-পাট গুছাইয়া, টাকা-পয়সার হিসাব সারিয়া দিনের উপসংহার

বেচাকেনার গল্প করিতে করিতে দোকানী-পসারীরা স্ব-স্ব গ্রাম অতিমুখে চলিতে থাকে। গ্রামের প্রান্তরে গভীর অন্ধকারের মধ্যে অসংখ্য চলমান আলোর বিন্দু দিক্-দিগন্তে উদ্দেশে যাত্রা করে। নদীতে ভাসমান নৌকায় আলোর বিন্দু এবং গোবর গাড়ির মুখের ল্যাম্প হইতে হইতে দূরে মিলাইয়া যায়। নির্জন নিঃশব্দ অন্ধকারে এক বিশেষ বিষম মূর্তিতে গ্রামের হাট নিঃশব্দে পড়িয়া থাকে ॥

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- একটি হাটের বর্ণনা
- পল্লীর জীবনে হাটের স্থান

প্রবন্ধ-সূত্র : সূচনা। আনন্দের অনুসন্ধান  
ও বনভোজন। রাজা-মহারাজাদের মৃগয়াযাত্রা।  
জীবন-স্বতিতে বনভোজনের বর্ণনা। বনভোজনের  
আধুনিক রূপ। উপসংহার।

১০.

বনভোজন

মা. '৭০

দৈনন্দিন জীবনচরণের গভীরগতিকতার কঠিন সীমাবেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া মানুষ একসময় দুর্জয় ক্রান্তিভারে হাঁপাইয়া পড়ে। তাহার মনের রাজ্যে সেই ক্রান্তির সঙ্গে আসে সংকীর্ণতা, আসে সহস্র ক্ষুদ্রতা, হৃষ্ট হয় স্বার্থক্লিন্ন ভেদবুদ্ধির পঙ্কিলতা।

সেই দুঃসহ সংকীর্ণ সীমায়তন হইতে বাহিরে আসিয়া শত-সহস্র সূচনা

মানুষের অব্যবহিত সান্নিধ্যে দাঁড়াইবার প্রয়োজন হয়। তাহার কলে বৃদ্ধি পায় তাহার মানস-প্রসারতা এবং গড়িয়া উঠে একটি অখণ্ড সামাজিকতা। মানুষ তাই মাঝে মাঝে তাহার স্বরচিত অচলায়তনের পাখান-গুহা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া উন্মুক্ত আকাশের নীচে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিতে চায়। বনভোজন সেই গভীরগতিকতার নাগপাশ হইতে মুক্তির একটি আনন্দঘন প্রমোদ-পন্থা।

মানুষ স্বভাবতঃই আনন্দবাদী। সে আনন্দ চায়। তাহার নিরানন্দ জীবনকুণ্ডে আনন্দ-মহাসাগরের বন্যা আসিয়া লাগুক, তাই সে চায়। কিন্তু কর্মবাস্ত জীবনে

তাহার সন্মুখ কোথায়? সভ্যতা তাহাকে সব দিয়াছে, সুখ-আনন্দের অনুসন্ধান  
ও বনভোজন

স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের নামে বিজ্ঞান তাহার জীবনকে যন্ত্র যন্ত্রে ভরিয়া দিয়াছে, কিন্তু কাঁড়িয়া লইয়াছে তাহার মনের শান্তি, অন্তরের আনন্দ। সেই আনন্দের সন্ধান একদিন তাহার গৃহবাস ছাড়িয়া দলবদ্ধভাবে বনের গভীরে প্রবেশ করে। অরণ্যের অভ্যন্তরে করে আহার-বিহারের আয়োজন। বনভোজন তাহার নাম।

পূর্বে আমাদের দেশের রাজা-মহারাজারা মাঝে মাঝে বনভোজন করিয়া আনন্দ পাইতেন। রাজধানীতে সন্তোষের রাজকাৰ্য্যে তাহারা যখন হইয়া উঠিতেন ক্রান্ত-প্রাণ,

তপ্ত-জন্ম, তখনই তাহারা রাজধানীর কর্ম-জীবন হইতে মুক্তি লইয়া দূরে অরণ্যের আশ্রমে আসিয়া বসিতেন। কিছু সময়

অতিবাহিত করিবার জন্য অন্তরে, একপ্রকার তাগিদ অনুভব করিতেন। রাজার সঙ্গে রাজধানীর সম্মিলিত ব্যক্তিরাজ্য মৃগয়ার আনন্দের অংশভাগী হইতেন। তাহাদের সপারিসদ বন-ভ্রমণের সঙ্গে শিকারের আনন্দ যুক্ত হইয়া কয়েকটি দিন রঙ-রসে নিটোল হইয়া উঠিত।

বলাবাহুল্য, বনভোজন সেই মৃগয়ারই আধুনিক সংস্করণ। পূর্বে মৃগয়ায় থাকিত মৃগ বা পশু-শিকারের আয়োজন। পরবর্তীকালে তাহা কষ্টসাধ্য বলিয়া বর্জিত হয় রবীন্দ্রনাথের জীবন-স্বতিতে তাহার একটি মনোজ্ঞ বর্ণনা আছে : 'রবিবারে জ্যোতিষাদা

দলবল লইয়া শিকার করিতে বাহির হইতেন। রবাহুত, অনাহুত যাহারা আমাদের দলে আসিয়া জুটিত তাহাদের অধিকাংশকেই আমরা চিনিতাম না। আমাদের মধ্যে ছুতার, কামার প্রভৃতি সকল শ্রেণীরই লোক ছিল। এই শিকারে রক্তপাতটাই সব চেয়ে নগণ্য ছিল, অন্তত সেইরূপ ঘটনা আমার তো মনে পড়ে না। শিকারের অন্ত সমস্ত অকুষ্ঠানই বেশ ভরপুর মাত্রায় ছিল—আমরা হত-আহত পশু-পক্ষীর অতি তুচ্ছ অভাব কিছুমাত্র অনুভব করিতাম না। প্রাতঃকালেই বাহির হইতাম।

জীবন-শ্রুতিতে বন-  
ভোজনের বর্ণনা

কিছুমাত্র অনুভব করিতাম না। প্রাতঃকালেই বাহির হইতাম।

বউঠাকুরাণী রানীকৃত লুচি তরকারী প্রস্তুত করিয়া আমাদের সঙ্গে দিতেন। ঐ জিনিসটাকে শিকার করিয়া সংগ্রহ করিতে হইত না

বলিয়া একদিনও আমাদের উপবাস করিতে হয় নাই। তাহার এই বর্ণনায় সেকালের সাম্প্রদায়িক বনভোজনের অহিংসক আয়োজনের একটি নিখুঁত চিত্র পাওয়া যায়। গৃহ হইতে অনীত ষাণ্ড-সামগ্রী বনভোজনের মুখরক্ষা করিত। বর্তমানে সেই রক্তপাতবিহীন মৃগয়ার আধুনিক সংস্করণ বনভোজনেও সেই ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ আছে। শুধু অক্ষুণ্ণই নয়, তাহার জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

আধুনিক নাগরিক জীবনেও বনভোজনের বিশেষ ভূমিকা আছে। শুষ্ক নাগরিকতা ও হৃদয়হীন যান্ত্রিকতার তপ্ত নিঃশ্বাস হইতে মুক্তির আহ্বান আসে বনভোজনের মাধ্যমে। নগরের রুটিন-বীধা দৈনন্দিন জীবন-মাত্রার গ্লানি হইতে মুক্তি পাইতে হইবে। বড়দিন, নিউ ইয়ার্স ডে, নববর্ষ ইত্যাদি ছুটির সুযোগে বন্ধুবান্ধবেরা দলবদ্ধভাবে

বনভোজনের  
আধুনিক রূপ

চলে শহরের বাহিরে। সঙ্গে চলে প্রচুর ষাণ্ডসামগ্রী এবং নানা

তৈজসপত্র। কেহ যায় কাকদ্বীপ, কেহ যায় বকখালি, কেহ যায়

ভায়মগুহারবার, কেহ যায় ফলতা, কেহ যায় দমদম, কেহ কল্যাণী

পিকনিক পার্কে, কেহ-বা দোবাব সমুদ্র-সৈকতে। মাটিতে গর্ত খুঁড়িয়া উন্নত প্রস্তুত

হয়। তাহাতে আগুনের চেয়ে ঘোঁরা হয় প্রচুর। তবু চোখের জলে মনের আনন্দে

সবাই মগিয়া রান্না করিতে থাকে। অনভ্যস্ত হাতে ভাত হয়তো ঠিকমতো ফুটে না,

রান্না হয়তো ~~না~~ তাহাতে কি আসে যায়? প্রাণের আনন্দে সবাই সেই

অথাগত ভক্ষণ করিয়া নানা খেলাধুলায় মাতিয়া উঠে।

বনভোজন আমাদের বর্তমান নাগরিক জীবনের শুষ্ক মরুভূমির বক্ষে এক টুকরা

শ্রামল ওয়েসিস। বন-হত্যার মরু-নিঃশ্বাসে যখন আমাদের প্রাণ হাঁপাইয়া উঠে,

তখন ~~বন~~ মৃগা কিংবা নদীতীর কিংবা পাহাড় কিংবা সমুদ্র-সৈকত

আমাদের হাতছানি দিয়া থাকে। বনভোজনে উদর-সর্ব্ব্বশ্ব ভোজন-  
বিলাসিতা নাই। আছে মাংসের, বৃক্ষের বন্ধুত্বের নিবিড় আশ্বাস ও প্রকৃতির স্নেহ-স্বশীতল

স্পর্শ এবং আনন্দের অফুরন্ত আধার ॥

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- চড়ুই ভাতি
- একটি ছুটির দিন
- একটি বনভোজনের বর্ণনা

শ্রবন্ধ-সূত্র : হুচনা ॥ য়ুরোপে ও ভারতে জাতি-  
গঠন—‘ভারত-সংস্কৃতি’ ॥ ভারতে জাতীয় ঐক্যের  
সাধনা ও সফলতা ॥ স্বাধীন ভারতে জাতীয়তায়  
ভাটা ও সংহতিতে ফালে ॥ কারণ : শিক্ষার  
একদেবদ্বিত্বতা ॥ ভাষা-সমস্যা ॥ সাম্প্রদায়িকতা,  
রাজনৈতিক দলাদলি, আঞ্চলিকতা ও প্রাদেশিকতা ॥  
উপসংহার ॥

## ভারতের জাতীয় সংহতি

সমগ্র জাতির ভাগ্যাকাংশে আজ ঘনাইয়া আসিয়াছে এক ঘোরতর দুর্যোগ। স্বাধীনতা লাভের পর এত বড় দুর্যোগ আর কখনও আসে নাই। আজ দিকে দিকে চলিয়াছে ভারত-ভাঙ্গার নানা চক্রান্ত। সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, রাজনৈতিক ভেদবুদ্ধি, ভাষা-কলহ দিনে দিনে ক্ষীণতর হইয়া উঠিতেছে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারত ভাঙ্গিয়া তিন খণ্ড করিয়া আমরা স্বাধীনতা লাভ হুচনা করিয়াছি। দেশ একবার ভাঙ্গিলে ভাঙ্গনের নেশায় পাইয়া বসে। এখন তাই ভাঙ্গনের চক্রান্ত দিকে দিকে সক্রিয় হইয়া উঠিতেছে। ভারতের জাতীয় সংহতি আজ তাই বিপন্ন। তাহাকে রক্ষা করিতে হইবে। সকল ভেদবুদ্ধির চক্রান্তের অবসান ঘটাইয়া ভারতে আবার প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে ‘এক জাতি, এক প্রাণ, একতা’।

ভারতের জায় য়ুরোপও একই ভূখণ্ড। একই ভূখণ্ড হইয়াও য়ুরোপীয় দেশগুলি দ্বন্দ্ব-সংঘাত-কাতর বহু বিবর্তমান জাতির সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু ভারতের ভৌগোলিক বিস্তার এবং বহু দূরত্ব প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও ‘নানা ভাষা নানা বেশ নানা পরিধানে’র বিবিধত্বের মধ্যে এখানে এক মহান মিলনের স্বপ্ন সাধক হইয়া উঠিয়াছে। এত বৈচিত্র্য, এত বিশালতা! তবু ভারত ‘একের অন্তঃসংহতি’ দিয়া

য়ুরোপে ও ভারতে  
জাতি-গঠন—  
‘ভারত-সংস্কৃতি’

বিভিন্ন ভুলিল, ভাগায়ে তুলিল একটি দিরাট দিয়া।’ আকুমা-রিকা-  
চিন্মাচল—এই বিশাল ভূখণ্ড জুড়িয়া এখানে কেবল একটিমাত্র  
জাতির বিকাশ হইয়াছে। সে জাতির নাম ভারতীয় জাতি।

সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র হইতে কুম্ভ-কাবেরী-দাবরা পর্যন্ত কেবলমাত্র  
একটি প্রাণ-প্রবাহিনী শক্তি প্রবাহিত। তাহা হইল ‘ভারত-সংস্কৃতি’। তাহাই  
‘পাণ্ডাব-সিন্ধু-গুজরাট-মারাঠা-দ্রাবিড়-উৎকল-বঙ্গে’ নানা পৈ নানাভাবে বিকশিত হইয়া  
উঠিয়াছে। এই সত্যটি না জানিলে ভারতকে জানা হইবে না এবং ভারতকে না জানিয়া  
তাহার ঐক্য-সমস্যাও সমাধান করা যায় না।

জাতীয় সংহতির এই অন্তর্লীন সম্ভাবনা ঐক্য সত্ত্বেও ভারতে জাতীয় সংহতি  
বারে-বারে বিস্তৃত হইয়াছে। কেবল মৌর্য-শাসনের যুগে ভারতের সংহতি-সাধনা  
একবার সফল হইয়াছিল। বাহিরের ও অন্তরের ঐক্য সেদিন ভারতবর্ষের ইতিহাসকে

গৌরবশক্তি করিয়া তুলিয়াছিল। তারপর কত যুগ কাটিয়া গিয়াছে। ভারতের জাতীয় ঐক্য আর সাধিত হয় নাই। ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতে বাহিরের চাপে ঐক্যের যে সূচনা হইয়াছিল, পরাধীনতার বন্ধন-মাখন ও সফলতা

মুক্তির আশ্বিক প্রয়াসে তাহা সম্পূর্ণতা লাভ করিল ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে। সে ভারতের জাতীয় ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়।

কিন্তু কূট-কুশলী ইংরেজ ভারতে যে দ্বিজাতি-তত্ত্বের বীজ বপন করিয়াছিল, তাহাও বিবসন্ন পরিণামে দেখা দিল বিভীষিকাময় সাম্প্রদায়িক হান্ধামা এবং বেদনাবহ দেশ-বিভাগ। কিন্তু দেশ বিভাগের দ্বারা আমবা ভাবতী শরীর হইতে সাম্প্রদায়িকভাৱ

স্বাধীন ভারতে  
জাতীয়তার ভাঁটা  
ও  
সংহতিতে কাটল

বিষকে নিমূল করিতে পারি নাই, বরং তাহাকে প্রভঞ্জন দিয়াছি। আজ স্বাধীনতালাভের দীর্ঘদিন পবে যখন হিসাব মিলাইতে বসি, তখন তাই দেখি বিপবীত চিত্র। 'আজ কোথায় সেই সংহতি? কোথায় গেল সেই ঐক্যমন্ত্র—'এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্র জীবন'? আসল কথা, স্বাধীনতালাভের পর আমাদের স্বদেশপ্রেমে ভাঁটা

পড়িয়াছে। জাতীয়তাব জোয়ারে ভাঁটা আসায় জল সরিয়া গিয়া সাম্প্রদায়িক, প্রাদেশিক ও রাজনৈতিক ভেদবুদ্ধির জীর্ণ তুণ আজ অত্যন্ত প্রকটরূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছে।

এই সর্বব্যাপী জাতীয় অনৈক্যের মূলে আছে আমাদের আত্যন্তিক বাস্তবমুখীনতা। স্বাধীনতালাভের পর আমাদের দেশ অধিক সংখ্যক ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি চাহিয়াছে। সেই সঙ্গে 'আত্ম'ন করিয়াছে অতি-ব্যক্তিকতা ও ব্যাপক শিল্পায়ন। কিন্তু সেই সঙ্গে দর্শন চিন্তা, ইতিহাস-চর্চা, ভাষা ও সাহিত্যালোচনার সহিত সংহতিপূর্ণ একটি সুসমঞ্জস

কারণ: শিক্ষার  
একদেশশীলতা

শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন প্রয়োজন ছিল। শিক্ষার এই একদেশশীলতাব বিবসন্ন পরিণামে ভেদবুদ্ধি লোকচক্ষুর অন্তবালে ধীবে ধীবে শক্তি সঞ্চয় করিয়া নানা স্থানে প্রচণ্ড তুপের মতো কাটিয়া পড়িতেছে।

দ্বিতিকে রাজ্য পুনর্বিন্যাস কমিটিব স্থপারিশ অনুযায়ী ভারত ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠন করে নাই। বহু ভাষা ভাষী দেশ এই ভাবে ইংরেজিকে অপসাবিত করিয়া কৃত্রিম সংখ্যা গরিষ্ঠতার জোরে একটিমাত্র ভাষা হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষার ভাষা-সমত্তা মুহাদ্দার অভিযুক্ত করিয়া জ'গাইয়া তোলা হইয়াছে এক স্বতীত্ৰ ভাষা সমত্তা। এইভাবে হিন্দী-সাম্রাজ্যবাদের সূচনা। এই সমস্তার একমাত্র সমাধান হইল, সোভিয়েট রাশিয়ার মতো সকল আঞ্চলিক ভাষাকে স্বীকৃতি দান।

আবার, আমরা সাম্প্রদায়িকতাকে অস্বীকার করিয়া দেশ বিভাগকে স্বীকার করিয়া লইয়াছি। তারপর কার্যেই স্বাধীচক্রের ক্রমাগত সাম্প্রদায়িক প্ররোচনা ভারতের ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রদর্শকে বারে-বারে অগ্নি-পরীক্ষার সম্মুখীন করিতেছে। এদিকে আবার, ভারতে গণতন্ত্রের প্রয়োজনে বহু রাজনৈতিক দল সংগঠিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাতে রাজনৈতিক দলাদলি ও ভেদবুদ্ধি বজ্রি পাউয়াছে। কোন কোন রাজনৈতিক দল ধর্মের



মুখোশ পরিয়া সাম্প্রদায়িকতার বিবাক্ত ভেদবুদ্ধিকে জাগাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছে। সেই সঙ্গে বৈবয়িক উন্নয়নে বৈষম্য, স্বতন্ত্র ধন-বৈষম্য, স্থগ্য আকলিকতা ও প্রাদেশিকতা ভেদ-মূলক বিষয়ে ধূমায়িত করিয়া তুলিতেছে। আজ আবার দিকে দিকে শিবসেনা, নাগসেনা, লাচিতসেনা, ভূমিসেনা—ইত্যাদি নানা বিচ্ছিন্নতাবাদী সেনাবাহিনী মাথা চাড়া দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে। এই, সমস্ত কারণে ভারতে নিত্য-নূতন সংঘাত ও সংঘর্ষ এবং বৈষম্যের রক্তাক্ত বহুশিখা জলিয়া উঠিতেছে। এবং 'হবে তা সহিতে মর্মে দহিতে, আছে সে ভাগ্যালিখা।'

একথা সর্বজনবিদিত যে, আমাদের সকল অসংহতি ও অশান্তির মূলে রহিয়াছে কতকগুলি মৌল বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের অভিসন্ধিমূলক ও অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্ত এবং তাহাদের রূপায়ণে অহতুক হঠকারিতা। তাহার ফলে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের দিকে দিকে অশান্তির ধূমায়িত আগুনিখা জলিয়া উঠিয়াছিল। বর্তমানে সেই মৌলিক সত্যটি কেন্দ্রীয় সরকারের বিলম্বে হইলেও উপলব্ধি হইয়াছে—ইহা স্বেচ্ছের কথা। আজ তাই ভারতের আবালবৃদ্ধবনিতা জাতীয় সংহতির প্রাণে 'মায়ের ডাকে' সম্মিলিত হইয়াছে। ইহা জাতীয় জীবনের একটি বড় স্থলকণ। ইহা বাহাতে আমাদের জাতীয় জীবনে দীর্ঘস্থায়ী হয়, তাহার জন্য সকলেই আজ উৎসুক। সকল উপদংশর কূট চক্রান্ত ও স্থগ্য ভেদবুদ্ধির উর্ধ্বে একমুখে বাঁধা সহস্র জীবন, জনমীর স্নেহধন্য পুত্র-সংঘ আজ মাতৃমন্দির পূণ্য অঙ্গনে অহুতপ্ত, হৃৎসদীর্ণ, বেদনা-বিহ্বল কর্তে প্রার্থনা করিতেছে : 'জননি, সময় নিকটবর্তী হইয়াছে—এখন বাজাও তোমার শব্দ, জালাও তোমার চন্দীপ—তোমার প্রসারিত শীতলপাটির উপরে আমাদের ছোট বড় সকল ভাইয়ের মিলনকে তোমার অশ্রু-গদগদ আলোবানের দ্বারা সার্থক করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকো।' কাজেই, এখন আমাদের বিলম্ব করিবার সময় নাই। দীর্ঘ-প্রতীক্ষিত মাছু-অভিনেতার পবিত্র লগ্ন সমাগত।

'মার অভিষেকে এসো এসো ওরা

মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা

দবার-পরশে-পরিভ্র-করা তীর্থনীরে—

সকল ভ্রান্ত বিরোধ এবং সকল নির্লজ্জ বিভেদের অবসানে আজ এক নূতন ভারত জন্মান্ত করিতেছে। ভারতের জাতীয় ইতিহাসের এই শুভতম দিনটি ভারতবাসীর জীবনে সকল হউক, সত্য হউক।

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যাই :

- ভারতের জাতীয় ঐক্য
- বৈচিত্র্যময় ভারত
- বিভিন্ন ভারত
- ভারতের ভাষা-সমস্যা
- 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে'।

এবং-সুজ : হচনা। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে  
সংবাদপত্রের ভূমিকা। সংবাদপত্রের নানা গুরুত্ব-  
পূর্ণ ভূমিকা। সংবাদপত্রের আবির্ভাবের ইতিহাস।  
'It is the people's Parliament always in  
session'। উপসংহার।

## সমাজ-জীবনে

### সংবাদপত্রের প্রভাব

ক. প্রা. ৩৪

পূর্ব-দিগন্তে আলোকের বিজয়-ঘোষণার পূর্বেই সমগ্র পৃথিবী আমাদের দ্বারা  
আসিয়া করাঘাত করে। সংবাদপত্রই সেই পৃথিবীর বাণীরূপ। গৃহবদ্ধ মানুষ এবং  
মুহুর্তে তাহার সকল সংকীর্ণতার গভী অতিক্রম করিয়া বিশাল পৃথিবীর উদার  
আকাশের নীচে আসিয়া দাঁড়ায়। সংবাদপত্র দৈনন্দিন জীবনে  
হচনা সীমাবদ্ধ মানুষকে বিশ্ব-মানবতা ও বিশ্ব-নাগরিকতার উন্মুক্ত  
প্রাঙ্গণে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়। মানুষ স্বভাবতঃই হৃদয়কে জানিতে চায়, আপন হাতে  
মুঠায় পাইতে চায় বৃহৎ বিশ্বকে। সংবাদপত্র তাহার সেই আকাঙ্ক্ষাকে সফলত  
দান করিয়াছে। সংবাদপত্র মানুষের দ্বারা বহন করিয়া আনে সেই বাহিত হৃদয়কে  
ঘরের প্রাঙ্গণে আনিয়া উপস্থিত করে হৃদয় বিশ্বকে।

শুধু তাই নয়। সংবাদপত্র গণতন্ত্রের সদা-জাগ্রত প্রহরী। গণদেবতার বিচার-  
শালায় সে নিপীড়িত মানুষের পক্ষ সমর্থন করে। সর্বদা জ্ঞান ও সত্যের মন্ত্রে সে করে  
জন-গণেশের পূজা। ক্রোখা-ও-জন-গণেশের পূজার ব্যাঘাত হইলে, গণতন্ত্রের মর্দন  
ধূলিলুপ্ত হইলে কিংবা গণতন্ত্রের পবিত্রতা কোন কারণে কলুষিত হইলে সংবাদপত্রের  
নির্ভীক কণ্ঠ সেখানে সোচ্চার হইয়া উঠে। তখন তাহার কালো-  
কালো অক্ষরগুলি অগ্নিশিখার মতো জ্বলিয়া উঠে, হুবিজ্ঞত  
বাক্যাবলী গণতন্ত্রের শত্রুদের হৃদয় লক্ষ্য করিয়া বুলেটের মতো  
ছুটিয়া চলে, মানবতার শত্রুদের হৃদয় বিদ্ধ করিয়া জনসাধারণের স্বেচ্ছাসিদ্ধ  
অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া সে বিজয়গর্বে কিরিয়া আসে। অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় জনগণের,  
জয় হয় গণতন্ত্রের। সংবাদপত্র তাই জনগণের পবিত্র গণতান্ত্রিক অধিকার-সংরক্ষণের  
সর্বদা দায়িত্বশীল অভিভাবক।

সংবাদপত্র বর্তমান সভ্যতার অপরিহার্য অঙ্গ। এত অপরিহার্য যে, তাহা বর্তমান  
সভ্যতার দৃষ্টান্তের সঙ্গে অনায়াসে তুলনীয়। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মানব-ভাগ্যে যখন  
হুর্দিন ঘনাইয়া আসে, তখন সংবাদপত্রই সেই হুঃসংবাদ গণ-দ্বারা পৌছাইয়া  
দিয়া জাগরুকে করে স্ফুরিত। স্বাঃ-সংঘাতময় অগ্নি-পরিধি,  
মহাসাগরের দুল্লভ ব্যবধান কিংবা গিরি-কাণ্ডার ও মরু-প্রান্তরের  
হুঃসাধ্য দুর্গমতাকে তুচ্ছ করিয়া সে বিশ্ববার্তা সংগ্রহ করিয়া  
আনে। রোগজর্রর পৃথিবীর শিয়রে বসিয়া সে মহাতাপসীর মতো অহুত্ব করে তাহার  
বন্ধ-স্পন্দন এবং পৃথিবীর মানুষের কানে পৌছাইয়া দেয় তাহার সকল সংবাদ, দুঃ করে  
মানুষের উৎকর্ষ ও ব্যাকুল সংবাদ-ভুকা। বিশ্বের রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি

সংবাদপত্রের নানা  
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

বিজ্ঞান, বাণিজ্য, সাহিত্য, সংস্কার, খেলাধুলা, আমোদ-প্রমোদ—সকল ক্ষেত্রেই তাহার অব্যাহত পদসঞ্চার। মানুষের দয়া-দাক্ষিণ্য, তাহার ক্ষমতার অহংকার, তাহার পৈশাচিক উল্লাস—সকল বিবরণ আনিয়া সে উপস্থিত করে মানুষের বিবেকের দরবারে, গণদেবতার নির্মম বিচারশালায়। 'আর, পৃথিবীর যেখানে 'প্রতিকারহীন শক্তির অপরাধে' বিচারের বাণী নীরবে নিভুতে কাঁদে,' সেখানেই সংবাদপত্রের নির্ভীক দিক্কার-বাণী ধ্বনিত হইয়া উঠে; সঙ্কে সঙ্কে পৃথিবীর লক্ষ-কোটি মুক কণ্ঠস্বরও প্রবল বিক্ষোভে সোচ্চার হইয়া উঠে। শক্তিমদমত্ত অত্যাচারীর দল সেই প্রবল গণ-বিক্ষোভের সম্মুখে পাড়াইতে পারে না। তখন ভীত, সমস্ত অত্যাচারীর দল নতি স্বীকার করে সেই জাগ্রত জনমন্ডলের নিকট। অস্ত্রাঘের পরাভবে জ্বরের অগ্নি মর্ষাণা হয় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত। পরাজিত হয় অত্যাচারী স্বৈরতন্ত্র, জয় হয় মানবতার। নির্ভীক সংবাদপত্রই সেই কৃতিত্বের কারিগর।

একদা যুগ-প্রয়োজনেই সংবাদপত্রের প্রথম আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। যুগে যুগে তাহার সেই প্রয়োজনীয়তা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুগের অনিবার্য প্রয়োজনে তাহাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে নানা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার দায়িত্বও ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়াছে। এ যুগের শিক্ষা ও সভ্যতা সংবাদপত্রের সহায়তা ভিন্ন সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। কাগজ ও মুদ্রণ-ব্যয় আধিকারের জায় সংবাদপত্র প্রকাশের প্রথম গৌরবও চীনদেশের প্রাপ্য। ভারতবর্ষেও মোগল-রাজত্বকালে ছিল হস্তলিখিত সংবাদপত্রের সীমিত প্রচলন। একমাত্র প্রশাসনিক বিভাগের মধ্যেই তাহার

প্রচার ছিল সীমাবদ্ধ। যুরোপে সংবাদপত্রের প্রথম আত্মপ্রকাশ  
সংবাদপত্রের  
আবির্ভাবের ইতিহাস  
ঘটে ইতালি দেশে। বাংলাদেশে মুদ্রণ-যন্ত্রের প্রথম আবির্ভাব  
সূচিত হয় অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে। সেই সূত্রে বাংলা  
সংবাদপত্র ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ-লগ্নে আত্মপ্রকাশ করে ত্রীন্দ্ৰমুখের ত্রীষ্টান  
মিশনারীদের হাতে। মুঠিমেয় কয়েকটি দেশ ব্যতীত পৃথিবীর সর্বত্রই আজ সংবাদ-  
পত্রের অব্যাহত পদসঞ্চার। সংবাদপত্রহীন আধুনিক জীবন সম্পূর্ণরূপে অচল, অসম্ভব ও  
অকল্পনীয়। বর্তমানে ভারতে প্রচলিত সংবাদপত্রের মোট-সংখ্যা ১২,৬৫০। তন্মধ্যে  
বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের সংখ্যা ৭৮৫ এবং ইহাদের বিক্রয়-সংখ্যা ক্রিষ্টাব্দিক  
ছই কোটি। স্বাধীন বাংলাদেশে সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর মুখের ভাষাও বাংলা।  
সেখানে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির মধ্যে 'ইত্তেফাক'ই প্রধান।

সংবাদপত্র মহামানবের দরবার, গণদেবতার বিচারশালা। জনস্বার্থের উদ্দেশে  
স্বীকৃত কোন অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার রূপায়ণ ও তাহার সাক্ষ্য বা ব্যর্থতার চিত্র  
গণদেবতার দরবারে উপস্থাপিত হওয়া চাই। সংবাদপত্র সেই  
'It is the people's  
Parliament  
always in session'  
চিত্র উপস্থাপনায় বিশ্বস্ত ও দায়িত্বশীল মাধ্যম। কোথাও গণস্বার্থ  
পদদলিত কিংবা অবহেলিত হইয়া মুঠিমেয়ের দ্বাৰা স্বীকৃত  
হইলে সংবাদপত্রের নির্ভীক কণ্ঠ সোচ্চার হইয়া উঠে। কোথাও  
রাষ্ট্রীয় উচ্চাঙ্গের ব্যর্থতা বা ভ্রুটি-বিচ্যুতি, কোথাও বা কায়মী স্বার্থের পদ-লেখন—  
সেই সব ক্ষেত্রে সংবাদপত্র তাহার সুরধার মন্তব্যে প্রতিবন্ধক দ্বাণ-বর্ষণে মুখর হইয়া উঠে।

তাহা ছাড়া, জনসাধারণের চিঠিপত্র প্রকাশনার মাধ্যমে জাগ্রত গণরীতিকে প্রতিকলিত করিয়া উঠা বহন করে তাহার পবিত্র নৈতিক দায়িত্ব। এইভাবে বহন সারাদেশে প্রবল জনমত গড়িয়া উঠে, তখন নীতিভ্রষ্ট স্বৈরাচারী সরকারকে নিরুপায়ভাবে শাসকের আসন হইতে নামিয়া আসিতে হয়—গণদেবতার বিচারশালার কাঠগড়ায় স্তম্ভ দায়িত্ব বহনে অসামর্থ্যের কথা স্বীকার করিয়া তাহাকে নতজাহ্ন হইয়া ক্ষমাভিক্ষা করিতে হয়

মনে হয়, 'It is the people's Parliament always in session'—

সর্বতোভাবে সার্থক। সংবাদপত্র, আক্ষরিক অর্থেই, জনগণের সদাজাগ্রত লোকসভা।

সংবাদপত্রের এই ভূমিকা গৌরবোজ্জ্বল, কিন্তু সংকটমুক্ত নয়। সংকটের নানা রাস্তাঘাसे নিপতিত হইয়া সংবাদপত্র মাঝে মাঝে তাহার পবিত্র দায়িত্ব বহনে অসমর্থ হইয়া পড়ে। স্বভাবতঃই সংবাদপত্রের প্রকাশনা আজ একটি লাভজনক ব্যবসাস্থে পরিণত হইয়াছে। বলাবাহুল্য, অস্ত্রান্ত বহু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মতো সংবাদপত্র-প্রকাশন ব্যবসায়ও ধনিক-সমাজের কুক্ষিগত। সংবাদপত্রের ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের মালিকরা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থরক্ষার জন্য ক্ষমতারূচ শক্তিশালী শাসকগোষ্ঠীর মনোরঞ্জে আত্মনিয়োগ করিয়া থাকে। তাহাতে ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠীর জনস্বার্থ-বিরোধী কার্যাবলীও সমর্থিত হয় এবং পবিত্র জনস্বার্থ নির্মমভাবে হয় পদদলিত। তখন

ঈপসংহার

মানবজাতির বিশেষ জাতিগোষ্ঠীর ভাগ্যে সত্যই বড় দুর্দিন ঘনাইয়া আসে। নানা কায়দে স্বার্থের হাতে জীড়নক হইয়া তখন সংবাদপত্র তাহার নিরপেক্ষতা বিসর্জন দিয়া জনগণের দুঃখ-দুর্দশার মাত্রাকে আরও বাড়াইয়া তোলে। যেখানে 'প্রতিকারহীন শক্তির অপরাধে বিচারের বাণী নীরবে নিভুতে কাঁদে,' সেখানে যদি সংবাদপত্রের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া যায়, যদি সংবাদপত্র লালিত নিগীড়িত মানবতার মূঢ়, মুক, ব্লান মুখে ভাষা যোগাইতে বার্থ হয়, তাহা হইলে এই আধুনিক পৃথিবীর লক্ষ-কোটি নিঃসহায় মানুষ বিচারের প্রার্থনায় কাহার দ্বারে গিয়া দাঁড়াইবে? মুষ্টিমেয় শক্তিমান, বুদ্ধিমান ও ধনবানের হাতে যদি সংবাদপত্র অমূল্য গণস্বার্থকে বিকাইয়া দেয়, তবে এই লোভ-জটিল পৃথিবীতে মানুষের আর আশা-ভরসা কি রহিল? সংবাদপত্র কবে এই সর্বনাশের রাস্তায় হইবে?

এই প্রবন্ধের অন্ত্যসরণে লেখা যায় :

সংবাদপত্র-পাঠের প্রয়োজনীয়তা

গণতন্ত্র ও সংবাদপত্র

জনগণের সেবার সংবাদপত্র

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংবাদপত্রের ভূমিকা

সংবাদপত্র ও তাহার দায়িত্ব, ক. প্রা. '৩৯

সংবাদপত্র-পাঠের উপকারিতা

জাতি-গঠনে সংবাদপত্রের স্থান

সমাজ-গঠনে সংবাদপত্র

প্রবন্ধ-মুদ্র : হুচনা। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার।  
 বিজ্ঞানের জয়যাত্রা। মানবজীবনে বিজ্ঞানের  
 অবস্থান। প্রতিদিনের জীবনে বিজ্ঞানের অবস্থান।  
 বিজ্ঞানের বিভীষিকাময় রূপ। বিজ্ঞানের সর্বব্যাপী  
 অকল্যাণ-মূর্তি। হোব কাহার? বিজ্ঞানের নঃ  
 প্রয়োগ-পদ্ধতির? উপসংহার।

## বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ৪

### মানব-সভ্যতা

উ. দা. '৩১; দা. '৩০

মানুষ তাহার যুগ-যুগান্তরের স্বপ্ন ও সাধনার অনবচ্ছিন্ন কসল দিয়া সভ্যতার এই  
 বিশাল ইমারৎ গড়িয়া তুলিয়াছে। আপনার প্রাণশক্তি ভিল ভিল দান করিয়া, বৃকের  
 রক্ত বিন্দু বিন্দু ঢালিয়া দিয়া সে রচনা করিয়াছে সভ্যতার এই তিলোত্তমা-মূর্তি। সে  
 সভ্যতার বেদীমূলে দিয়াছে বাহুর শক্তি, মস্তিষ্কের বুদ্ধি, ইঞ্জিনের  
 হুচনা।

অহুভূতি এবং হৃদয়ের ভালোবাসা। বিজ্ঞানও মানুষের অতীত  
 সাধনার কসল। বিজ্ঞানকে সে সভ্যতার বনিয়াদ-রচনার কাজে করিয়াছে নিয়োজিত।  
 বর্তমান সভ্যতার এই চরম সমুন্নতির মূলে রহিয়াছে তাই বিজ্ঞানের অপরিণীম বিষয়।

আজ বিজ্ঞানের বিশ্ববিজয় বিস্ময়কর হইলেও বিজ্ঞান-সাধনার হুচনা হইয়াছিল  
 অত্যন্ত দীনভাবে। "বহু মানবের যুগ-যুগান্তরের সাধনায় ও সর্বব্যাপী জ্ঞান-তপস্বীদের  
 তপস্বী তপস্তায় সাকল্য লাভ করিয়া বিজ্ঞান রূপকথার দৈত্যপুত্রী হইতে সংগ্রহ করিয়া  
 আনিয়াছে সোনার কাঠি এবং রূপার কাঠি। তাহা হস্তগত করিয়া  
 বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সভ্যতার প্রভাবলয়ের সেই অসহায় মানুষ আজ অসাম শক্তিদর।  
 সেদিনের অরণ্যচারী, গুহাবাসী মানুষ আকাশে মেঘ এবং মেঘের বৃকে বিদ্যুজ্জ্বলা  
 দেখিলে ভয় পাইত। আর, আজ মানুষ মেঘকে করিয়াছে বন্দীভূত, বিদ্যুৎকে করিয়াছে  
 পদানত।

বিজ্ঞানের বলে বলীয়ান মানুষ আজ ধনির অঙ্ককারে আলো জালিয়াছে, ঘুম  
 ভাঙাইয়াছে পাতালপুরীর ঘুমন্ত রাজকন্ডার, দৈত্যপুত্রীর বন্দীশালা হইতে মুক্ত করিয়া  
 আনিয়া তাহাকে নিজের পরিকল্পনা অহুসারে সাজাইয়াছে, উদ্ভাবন করিয়াছে উৎপাদনের  
 নব নব প্রকরণ, পৃথিবীর শৈশবের জড়তা কাটাইয়া আনিয়া দিয়াছে যৌবনের অফুরন্ত  
 কর্মশক্তি ও গতির উল্লাস। অতীতকে, বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক  
 বিজ্ঞানের জয়যাত্রা।

শক্তিবলে মানুষ উদ্ভাষ উচ্ছ্বল নদীস্রোতকে বন্দীভূত করিয়া উত্তর  
 মন-প্রান্তরকে করিয়াছে জলসিক্ত, ভূগর্ভের সঞ্চিত শস্ত-সম্ভাবনাকে করিয়া তুলিয়াছে  
 উজ্জল, পাবাগী অহুলা ধরিত্রীর সর্বদেহে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছে অগ্নী প্রাণস্পন্দন।  
 বিজ্ঞান আজ উর্বরতা দিয়া ক্ষয়িষ্ণু বহুধাকে শস্তবতী করিয়া তুলিয়াছে, শিল্প-শৈলীর নব  
 নব প্রবর্তনে সে উৎপাদন-জগতে আনিয়াছে যুগান্তর এবং হৃদয়কে করিয়াছে আমাদের  
 নকটম। বিজ্ঞানের অকৃতপূর্ব সাকল্যে জীবদাত্তী বহুধা আজ সন্না-হাস্তময়ী।

প্রাগৈতিহাসিক মানবের অগ্নি-প্রজ্বলন-কৌশল আয়ত্ত করার দিন হইতে আধুনিক  
 রকেট-স্পুটনিক-মহাকাশযানের যুগ পর্যন্ত মানুষের অতীত সাধনা বিজ্ঞানকে করিয়াছে  
 সর্বত্র, সভ্যতাকে করিয়াছে অদম। বাণীর শক্তিকে সে করিয়াছে বন্দীভূত, আকাশের

বিদ্যাকে সে করিয়াছে করায়ত্ত, মৃষ্টিতে পুরিয়া লইয়াছে আণবিক, পারমাণবিক শক্তিকে। স্থলপথে ছুটিয়াছে মোটর-ট্রেন, জলপথে চেউ-এর বুটি আপুটিয়া ধরিয়া

তারি আহাজ ছুটিয়া চলিয়াছে, আকাশ তোলাপাড় করিয়া উড়িয়া চলিয়াছে শব্দের চেয়েও দ্রুতগামী বিমান-পোত, মহাশূন্যে পাঙ্কি দিতেছে রকেট-স্পুটনিক-মহাকাশযান। অন্তর্দিকে, বিজ্ঞান

সাবিত্রীর মতো মৃত্যুর করালগ্রাস হইতে জীবনকে বাঁচাইয়া তুলিবার জ্ঞান প্রতিশ্রুতি-বদ্ধ।

আজ মানুষের জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অব্যাব পদসঞ্চার। প্রভাতের শয্যাভ্যাগ হইতে নিশীথের শয্যাগ্রহণ পর্যন্ত বিজ্ঞান তাহার অঙ্গুগত অঙ্গুচর। প্রভাতে 'এলার্ব ঘড়ি'র শব্দে কিংবা রেডিয়ার প্রভাতী ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভাঙিল তাহার। বিজ্ঞানের বিচিত্র কৌশলে ততক্ষণে কলে জল আসিয়াছে। প্রয়োজনমতো কখনও সে জল উষ্ণ, কখনও-বা শীতল। মাথার উপর পাখা ঘুরিতে লাগিল, রেডিয়োতে বাজিতে লাগিল নানা বিচিত্র গান। কোথাও-বা দূর-দূরান্তরের ছবি ও বাণী চক্ষের নিম্নে টেলিভিশনের পর্দায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। বাজার ঘাইবার প্রয়োজন নাই। বিজ্ঞানের দৌলতে ঘরের একপাশে 'ফ্রীজ'র মধ্যে একটি আঁত বাজারকে অবিকৃত অবস্থায় বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে। 'এদিকে, বৈজ্ঞানিক উদ্যানে বা প্যাসের উদ্যানে চা-কফির জল গরম হইল, প্রস্তুত হইল প্রাতরাশ। সমুদ্রের টেবিলে সংরক্ষিত সংবাদপত্র এবং অন্যান্য পত্রিকা মুদ্রাবস্তুর সাহায্যে মুদ্রিত; এবং তাহাও বিজ্ঞানের অবদান। একপাশে রক্ষিত নীরব টেলিফোন সহসা বাজিয়া উঠিল। হাজার মাইল দূরের বন্ধুর কণ্ঠস্বর টেলিফোনে ভাসিয়া আসিল। 'কলিং বেল' বাজিল। কোন অতিথি বিশেষ প্রয়োজনে

সাক্ষাৎ-প্রার্থী। অতিথির সহিত আলাপান্তে ঘড়িতে চোখ পড়িল। প্রতিদিনের জীবনে বিজ্ঞানের অবদান ওদিকে বিজ্ঞানের হাতে বাথরুমে প্রানের জল প্রস্তুত। নানাহার সারিয়া বাহিরে যাইতে হইবে। পোশাক-পরিচ্ছদ পূর্ব হইতেই

ওয়ার্মিং মেশিনে কাচিয়া ইলেকট্রিক ইস্তিতে ইস্তি করিয়া রাখা হইয়াছে। বিজ্ঞানের কল্যাণে কোন কোন পোশাক-পরিচ্ছদের আবার ইস্তি করিবার প্রয়োজনই হয় না। যাহা হউক, 'দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি'। সে সৌভাগ্য বাহানের নাই, তাহাদের জ্ঞান রহিয়াছে ইলেকট্রিক ট্রেন, ট্রাম, বাস বা ট্যাক্সি। অকিসে আলো জলিতেছে, পাখা ঘুরিতেছে, কোন অকিস হয়তো বা শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত। চাবি টেপার সঙ্গে সঙ্গেই উর্ধ্বলোক হইতে রথ নামিয়া আসিল; সেই লিক্ট তাহাকে অকিসের দ্বার-প্রান্তে নামাইয়া দিয়া গেল। 'টাইপ রাইটার'-এ চিঠিপত্র টাইপ করা হইতেছে; কম্পিউটারের সাহায্যে সূক্ষ্মতিসূক্ষ্ম হিসাব রক্ষিত হইতেছে। ছুটির পরে আমোদ-প্রমোদের জন্ত রহিয়াছে সিনেমা-বায়োথোপ। ইতিমধ্যে শরীর-অবস্থা বোধ হইলে আছে ডাক্তারখানা, আছে ডাক্তারখানার ঔষধ। রাতে ঘুমাইয়া পড়িলে ও আহা়ান্তে ঘুম না আসিলে বিজ্ঞান রেডিয়ার সাহায্যে শুনাইবে ঘুম-প্যাড়ানিয়া গান। বিজ্ঞান তাহার দ্বিগুণে সারারাত অক্লান্ত হাতে পাখা ঘুরাইবে কিংবা শীতাতপ-নিয়ন্ত্রক যন্ত্রটিকে চালু রাখিয়া মানুষের স্বপ্ননিজার ব্যবস্থা করিবার জ্ঞান বীতনির থাকিবে।

এই সমস্ত হইল বিজ্ঞান-নির্ভর সভ্যতার উজ্জ্বল দিগন্ত। অল্প দিগন্তে জমিয়াছে অনেক দুঃখ, অনেক প্রবঞ্চনা। বিজ্ঞান আসিয়া জোর করিয়া মানুষের হাতের কাজ কাড়িয়া লইয়া তাহাকে নিশ্চিত অনাহারের দিকে ঠেলিয়া দিয়াছে; দরিদ্রকে করিয়াছে আরও দারিদ্র, ধনিককে করিয়াছে আরও ধনী। সে প্রাচীন, শাস্ত্র, বিজ্ঞানের হৃদয়, সনাতন জীবন-ছন্দের তার ছিঁড়িয়া দিয়াছে। মানুষের এই বোবা দুঃখ, এই নিঃসহায় নৈরুধ্য পৃথিবীর বুকে আজ সৃষ্টি করিয়াছে এক দূরপন্থের ক্ষত। বিজ্ঞানের এই স্বল্প-সিদ্ধ কাপালিক বিভীষিকা হইতে মানুষের মুক্তি নাই, মুক্তি নাই শোষণের এই সর্বনাশা পরিণাম হইতে।

বিজ্ঞান যে-সভ্যতার শরীরে জীবন প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, আজ তাহারই বিনাশে সে মাতিয়া উঠিয়াছে কুধির-তুষাতুর ছিন্নমস্তার মতো। বর্তমান শতাব্দীতে সংঘটিত দুইটি বিশ্ব মহাযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসলীলা বিজ্ঞানের দানবীয় শক্তি সশব্দে মানুষের মনে আনিয়া দিয়াছে এক ঘোরতর আতঙ্ক। বর্তমান কালে বিজ্ঞান কী চায়? জীবন, না মৃত্যু? আজ পৃথিবীর মানুষের মনে জাগিয়াছে এই অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

কিছু দোষ কাহার? বিজ্ঞানের, না যাহারা বিজ্ঞানকে স্বার্থ-লোলুপ দানবীয় প্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য নির্লজ্জভাবে প্রয়োগ করে, তাহাদের? সেই স্বার্থপর নরপিশাচদের হাতেই বিজ্ঞান বারবারে তাহার মানবিক কল্যাণ-দোষ কাহার? বিজ্ঞানের না প্রয়োগ-পদ্ধতির? ব্রত হইতে ভ্রষ্ট হইয়া করিয়াছে নরমেধ যজ্ঞের আয়োজন। দোষ হইতেছে সেই লোভী-শয়তানদের সংকীর্ণ স্বার্থ-বুদ্ধির, দোষ এই শক্তি-স্পর্ষিত ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার। আজ আর বিজ্ঞানের হাত ছাড়িয়া দিয়া জীবনাচরণ সম্ভব নয়। কাজেই, আজ প্রয়োজন বিজ্ঞানের প্রয়োগ-পদ্ধতির পরিবর্তনের।

অসীম সম্ভাবনাময় বিজ্ঞান মুষ্টিমেয় স্বার্থপর নরপাশীদের হাতে আজ সমাজের সার্বিক দুঃখ ও আতঙ্কের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। কিছু আর কতকাল বিজ্ঞান-লক্ষী ক্লেশহীন নর-পিশাচের গৃহে দাসীবৃত্তি করিবেন? যিনি কল্যাণের অধিষ্ঠাত্রী, তিনি কি তাহার কল্যাণপূত দক্ষিণ হস্ত সকল মানুষের জন্য প্রসারিত করিয়া দিবেন না? বিজ্ঞান যদি সর্বধ্বংসী মারণাস্ত্র নির্মাণ হইতে বিরত হইয়া কেবল মানবিক কল্যাণে ব্যবহৃত হয়, তবেই মানুষের এই দুঃখ-রজনীর অবসান হইবে, রক্ত-বিল্পের হাত হইতে রক্ষা পাইবে জীবধাত্রী বহুধা।

এই প্রশ্নের অনুসরণে লেখা যায় :

- বৈদ্যুতন জীবনে বিজ্ঞানের প্রভাব, পৃ. '৬০
- প্রতিদিনের জীবনে বিজ্ঞান, উ. দা. '৬১
- সভ্যতার বিকাশে বিজ্ঞানের অবদান
- বিজ্ঞান কী চায় : জীবন, না মৃত্যু?
- বিজ্ঞান ও মানব-সভ্যতা
- বিজ্ঞানের দান

প্রবন্ধ-২য় : হুচনা। বেতার-বস্ত্র বিজ্ঞানের  
বিস্ময়কর আবিষ্কার। বেতার-বস্ত্রের কারিগরী  
বিত। বেতার-বস্ত্রের আবিষ্কার। জগদীশচন্দ্র ও  
মার্কনি। প্রচার ও উপযোগিতা। শিক্ষামূলক  
অনুষ্ঠান-১টা। ভারতের আকাশবাণী। উপসংহার।

## বেতার-বার্তা

ক. প্রা. '৬৭

‘কত অজ্ঞানারে জানাইলে তুমি  
কত ঘরে ঘিলে ঠাই,  
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু  
পরকে করিলে ভাই।’

—রবীন্দ্রনাথ

বিজ্ঞান আজ হৃদয়কে করিঘাছে নিকটতম, পরকে করিঘাছে ভাই, বিশ্ব-জগৎকে  
আনিয়া উপস্থিত করিঘাছে আমাদের ঘরের ছায়ায়। পৃথিবীর কেহ আজ আর  
দূরে নাই, কোন কিছুই আজ আর দূরে নাই, সবাই নিকটে আসিয়াছে, সবই নিকট  
হইয়াছে। বিজ্ঞানের যে বিস্ময়কর আবিষ্কার এই অসম্ভবকে সম্ভব করিঘাছে—

এই অসাধ্য সাধন করিঘাছে, তাহা বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার  
হুচনা  
অবদান—বেতার-যন্ত্র। বেতার-যন্ত্র আজ লক্ষ কোটি মাইলের  
দূর্বীর বন্ধুরতা জন্ম করিয়া বাহির-বিশ্বকে মানুষের করতলে আনিয়া দিয়াছে। ঘরে  
বসিয়া আমরা আজ ইহার সাহায্যে হৃদয়ের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইতেছি এবং আমাদের  
কণ্ঠস্বর হৃদয়ের মানুষকে শুনাইতে পারিতেছি।

বেতার-যন্ত্র বিজ্ঞানের একটি অত্যন্ত অসাধ্য অবদান। ইহা দূরকে করিঘাছে আমাদের  
নিকটতম প্রতিবেশী। পৃথিবীর দেশ-দেশান্তরের স্থল-দুঃখ ও রাজ্য-ভাঙাগড়ার সকল  
গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ আমাদের নিকট মুহূর্তে সে বহন করিয়া আনিয়া আমাদের কর্ণে  
ঢালিয়া দিতেছে। বিশাল এই বিশ্বকে সে সংকুচিত করিয়া আমাদের গৃহকোণে আনিয়া  
উপস্থিত করিতেছে। যোজন-যোজন মাইলের দুর্লভ্য দূরত্বকে অপসারিত করিয়া  
হৃদয়ের মানুষকে সে করিঘাছে আমাদের পরমাঙ্গীয়। প্রাগাধুনিক কালের মানুষের  
কল্পনায় একদিন দৈব-বাণীর জন্ম হইয়াছিল; আধুনিক কালের  
বেতার-যন্ত্র বিজ্ঞানের মানুষ সেই রূপকথা ও পুরাণ-কথিত দৈব-বাণীকে দিল আকাশ-  
বিস্ময়কর আবিষ্কার বাণীর রূপ। আকাশের নীরব নীলিমার বুক হইতে সে মানুষের  
উর্ধ্বোৎকৃষ্ট ভাষাকে বিজ্ঞান-বলে মাটিতে নামাইয়া আনিয়া। বেতার-যন্ত্র মানুষের  
বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন-শক্তির একটি বিস্ময়কর নিদর্শন। বিজ্ঞানের এই পরম বিস্ময়কর  
আবিষ্কার আজ মানুষের অন্তরলোক জন্ম করিয়া অল্পকালের মধ্যেই বিশেষ জনপ্রিয়তা  
অর্জন করিঘাছে। বিপুল এই পৃথিবীর কত নগর, রাজধানী, মানুষের কত কীর্তির  
পরিচয় ইহা নিত্য আমাদের নিকট বহন করিয়া আনিতেছে। সহস্র যুগের অপরিচয় ও  
সহস্র যুগের দুর্বীরতাকে বশীভূত করিয়া ইহা পৃথিবীর হৃদয়তম দিগন্তসমূহের মধ্যে  
রচনা করিঘাছে মিলনের অপূর্ব সেতু-বন্ধন।

ঈশ্বরের মধ্য দিয়া কিভাবে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ভ্রমণ করে, সেই তরঙ্গের উপর ভিত্তি  
করিয়াই বেতার-বস্ত্রের সৃষ্টি। শব্দতরঙ্গকে বিদ্যুৎ-তরঙ্গে রূপান্তরিত করিয়া



মাইক্রোকোনের সাহায্যে তাহা উচ্চতর শক্তি-সম্পন্ন ট্রান্সমিটিং স্টেশনের প্রেরক-যন্ত্রে মহাকাশের উর্ধ্বস্থিত ঈথার-সমূহে প্রেরিত হয়। প্রেরক-স্টেশনের এরিয়েলের সাহায্যে মহাশূন্যে প্রেরিত সেই বিদ্যুৎ-তরঙ্গ স্থানান্তরে গ্রাহক-যন্ত্রের এরিয়েলে তরঙ্গ সৃষ্টি করে এবং তাহা আবার মাইক্রোকোনের সাহায্যে সম্প্রচারিত হইয়া আমাদের শ্রুতিগোচর হয়। ইহাই হইল বেতার-যন্ত্রের কারিগরী দিক। অর্থাৎ ইহার এক দিগন্তে প্রেরক-স্টেশন, অন্য দিগন্তে বিশেষভাবে নিমিত গ্রাহক-যন্ত্র। মাঝখানে অন্তরীক্ষণ শব্দহীন ঈথার-সমূহ।

বেতার-যন্ত্রের আবিষ্কারের ইতিহাসের সঙ্গে বিজ্ঞাভিত্ত হইয়া আছে বিজ্ঞানচর্চা জগদীশচন্দ্রের চিরস্মরণীয় নাম। ইহার বিশ্বব্যাপক আবিষ্কার সর্বপ্রথমে উকি মারিয়াছিল তাঁহারই অমূল্যস্বপ্ন মনে। স্বল্পকাল গবেষণার দ্বারা তিনিই সবাঞ্চে জানিতে পারিয়াছিলেন, বিশ্বভূবন এক নিঃসীম বিদ্যুৎ-সমূহে ভাসমান। কাজেই, এই নিঃসীম বিদ্যুৎ-মহাসমূহে কোন শব্দ নিক্ষিপ্ত হইলেই তাহা এক অদৃশ্য তরঙ্গ সৃষ্টি করিয়া সমগ্র মহাসাগরটিকে অতি দ্রুত আলোড়িত করিয়া তোলে। পৃথিবীপৃষ্ঠ ছাড়িয়া যতই উর্ধ্ব

আরোহণ করা যায়, বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ততই শাস্ত হইয়া আসে। সেই দূরত্ব বিদ্যুৎ-সমূহকে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় বলা হয় ঈথার-লোক। কোন উচ্চ-শক্তিসম্পন্ন প্রেরক-যন্ত্রের সাহায্যে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে কোন শব্দকে যদি সেই ঈথার-সমূহে প্রেরণ করা যায়, তবে পৃথিবীর অন্য প্রান্ত হইতে গ্রাহক-যন্ত্রের সাহায্যে সেই শব্দকে আকর্ষণ করিয়া আন সম্ভব। জগদীশচন্দ্র পরাধীন ভারতের দরিদ্র বৈজ্ঞানিক বলিয়া তাঁহার সেই আবিষ্কার পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান-জগতে স্বীকৃতি লাভ করিতে পারে নাই। তাঁহার আবিষ্কারের স্মৃতি ধরিয়া অবশেষে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ইতালীয় বৈজ্ঞানিক মার্কনি এই 'তারবিহীন টেলিগ্রাফ যন্ত্রের' আবিষ্কার করেন। ক্রমশঃ তাহার বহুতর উন্নতি সাধিত হইয়া বর্তমানে উহা পরিগ্রহ করিয়াছে বেতার-যন্ত্রের সুসংস্কৃত ও স্মার্কিত রূপ।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তীকাল হইতে সূচিত হইয়াছে বেতার-যন্ত্রের বহুল প্রচলন। বিপন্ন জাহাজ কিংবা বিমান হইতে এই যন্ত্রের সাহায্যে বিপদ-বার্তা প্রেরণ করা যায়। কেবল বিপদ-বার্তা প্রেরণই নয়, বিপন্নুক্তির জন্য সাহায্য প্রেরণের আবেদনও ইহা নিরাপদ বন্দরে পৌছাইয়া দেয়। নিরাপদ বন্দরের সহিত বা প্রচার ও উপযোগিতা অন্য জাহাজের সহিত মহাসমূহে দুর্ঘটনায় নিপতিত বিপন্ন যুদ্ধমান জাহাজের একমাত্র সংযোগ-যন্ত্র হইল এই বেতার-যন্ত্র। বিপন্ন মাহুকের সাহায্যের জন্য বেতার-যন্ত্র যে কল্যাণ-মণ্ডিত ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে, তাহা সত্যই অনবদ্য। বাস্তবিকই, তাহার জন্য এই আবিষ্কারের নিকট সমগ্র মানব-সমাজ গভীরভাবে ঋণী।

বর্তমান বিশ্বে বেতার-যন্ত্রের ব্যবহার অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। সে আজ কাল অবসর মাহুকের মনে আনন্দ-বিতরণের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। মাহুকের অবসর-বিনোদনের জন্য বেতারের মাধ্যমে গীত-বাণ-নাট্যাঙ্কটান ইত্যাদি এবং নানা উত্তেজনাপূর্ণ ক্রীড়ার ধারা-বিবরণী প্রচারিত হইয়া থাকে। আনন্দ-পরিবেশনের

## বেতার-বার্তা

ভূমিকা ছাড়াও বেতার-বার্তার শিক্ষাদানেরও একটি গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা আছে। বেতার-বার্তা আমাদের দায়িত্বশীল লোক-শিক্ষক। বিশ্ব-বিস্তৃত বিশ্বজ্ঞানের মূল্যবান বক্তৃতাগুলি বেতার-মারফৎ সম্প্রচারিত হইয়া থাকে। বেতারের সংবাদ পরিবেশনার দায়িত্বও অসীম। দেশে ইহার দ্বারা লোক-শিক্ষার ব্যাপক বাবস্থা করা যায়। ইহার মাধ্যমে শিক্ষামূলক রূপকাঙ্কনগুলি বিভাগায়ের শিক্ষার্থী-মহলে অত্যন্ত জনপ্রিয়। তাহা ছাড়া, দেশ-বিদেশের সংবাদ আদান প্রদান, রাজনীতি এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য ইত্যাদি ব্যাপারে যোগস্বত্ব-স্থাপনের বিশেষ উপায় হইল বেতার-যন্ত্র।

ভারতে বেতার-যন্ত্র জাতীয় জীবন সংগঠনে গ্রহণ করিয়াছে নূতন দায়িত্ব। স্বাধীনতা-লাভের পর সৃষ্টি হইয়াছে ইহার এক নবতর অধ্যায়। বর্তমানে ভারতে রহিয়াছে মোট ছিয়াত্তরটি সম্প্রচার-কেন্দ্র। তাহাদের মোট প্রেরক-যন্ত্রের সংখ্যা হইল একশো একচল্লিশ। ভারতের মতো দেশে এই আয়োজন নিঃসন্দেহে ব্যাপক এবং সম্ভাবনাকর। অতি স্বল্পকালের মধ্যেই দেশের আপামব জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-প্রচারে যে মূল্যবান ভূমিকা ইহা গ্রহণ করিয়াছে, তাহা অকুণ্ঠভাবে প্রশংসনীয়। ইহার মাধ্যমে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে শিল্পীগণ নব নব উপায়-উদ্ভাবনে প্রয়াসী হইয়াছেন। প্রত্যাহ সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত দীর্ঘ আঠারো ঘণ্টা ভারতীয় বেতার-প্রতিষ্ঠান—আকাশবাণী—সংবাদাদি পরিবেশন করিয়া জনজীবনে দৃষ্টবাদাই হইয়াছে।

আধুনিক বিশ্বে যোগাযোগ স্থাপনে দ্রুততর উপায় হইল বেতার-যন্ত্র। ইহার দ্বারা সর্বদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির বহমান ধারার সহিত যত সহজে আমাদের পরিচয় সংসাধিত হয়, এমন আব কোন কিছুতেই সম্ভব নয়। ইহার ব্যাপক ব্যবহারের ফলে আজ ‘বহুধৈব’ আমাদের ‘সুদৃশক’ হইয়াছে। বেতার-যন্ত্র মুহূর্তেব মধ্যে বিশ্ববার্তাকে আনিয়া আমাদের কর্ণগোচর করিয়া দিতেছে। বিজ্ঞানের এই বিশ্বকর আবিষ্কার এখন আমাদের

আর বিশ্বয়ের উদ্রেক করে না। ইহা আমাদের গৃহস্থালির সহিত উপসংহার মিলিয়া-মিশিয়া আমাদের একেবারে ঘরোয়া জিনিস হইয়া গিয়াছে।

শুধু তাহাই নয়, বেতার-যন্ত্র আজ ভ্রমণে-পয়টনে, স্বদেশে-বিদেশে, বিপদে-আপদে আমাদের নিত্য-সান্নিধ্য। তাহা ছাড়া, বেতার-যন্ত্র আজ হৃদয় পল্লী-অঞ্চলকেও সভ্যতার অগ্রগতির সহিত এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধিয়া দিয়াছে। দূস্তর ভৌগোলিক ব্যবধান আজ আর কোন ব্যবধানই নয়। বেতার-যন্ত্রের কল্যাণে ‘দুর্গম গিরি, কান্ডার মক, দূস্তর পারাবার’ উত্তীর্ণ হইয়া দেশ-দেশান্তর আমাদের গৃহকোণে আনিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বেতার-যন্ত্র বিশ্ব-মানবের মিলনের বিশ্বস্ত দূত, বিশ্বের দুঃখ-সুখের দ্রুততম বার্তাবহ।

এই প্রবন্ধের অন্তঃসরণে দেখা যায় :

- আধুনিক যুগে রেডিওর প্রভাব, ক. প্রা. '৬৭
- বর্তমান মানব-সভ্যতা ও বেতার-যন্ত্র
- মানব-সভ্যতার সেবার বেতার-যন্ত্র
- বেতার-যন্ত্রের জনপ্রিয়তা

প্রবন্ধ-সূত্র ও সূচনা। মহাকাশ ও মানুষ।  
 ক্ষয় ও সাধন। রকেটের জন্ম-ইতিহাস। মহাকাশ-  
 অভিযানে প্রথম পদক্ষেপ : স্পুটনিক। সোভিয়েট  
 মহাকাশ-অভিযান। মার্কিন মহাকাশ-অভিযান।  
 চন্দ্র-বিজয় : এক. আর্মস্ট্রং, অলড্রিন ও কলিনস।  
 চন্দ্র-বিজয় : দুই. শেপার্ড, কস্মা ও মিলেল।  
 উপসংহার।

## চন্দ্রলোক বিজয়

ই. মা. '৬০, '৬৩, '৭০

‘হাটাই চড়ে চার বেতে কে চন্দ্রলোকের অচিনপুরে।’ —নজরুল ইসলাম

অবশেষে আসিল মানব-ইতিহাসের সেই চরম রোমাঞ্চকর মুহূর্ত। ১৯৬৯ সাল, ২০শে জুলাই। ভারতীয় সময় : সোমবার সকাল ৮টা ২৬ মি. ২০ সেকেন্ড। মানুষের বহু শতাব্দীর স্বপ্ন সেদিন সকল হইল। পৃথিবীর দুই হুঃসাহসী সন্তান নীল আর্মস্ট্রং ও অলড্রিন সেদিন চন্দ্রের বুকে তাঁহাদের পদচিহ্ন অঁকিয়া দিলেন। এতদিনে সূর্য আকাশের হর্লভ চাঁদ-মামা মর্ত্যের মানব-শিশুর হাতে সত্যসত্যই ধরা দিলেন।

স্বরণাভীত, কাশ হইতে মানুষ মহাকাশের সূর্য নীলমাকে উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া বলিয়াছে : ‘খোলো খোলো, হে আকাশ, শুদ্ধ ভব নীল যবনিকা।’ কিন্তু আমাদের মর্ত্য-জননী বড় মমতাময়ী। তাহার নিবিড় মাধ্যাকর্ষণের বিপুল স্নেহ-বন্ধন ছিন্ন করিয়া গ্রহ-গ্রহান্তরে যাত্রার জন্ত চলিয়াছে মানুষের নিবলস প্রচেষ্টা। একদিন গ্যালিলিও-র দূরবীক্ষণ-যন্ত্র মহাকাশের জানালা খুলিয়া দিল। তারও পবে কেপ্‌লারের গতি-গতিতত্ত্ব এবং নিউটনের মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব তাহার মহাকাশের ঠিকানা আবিষ্কারের হইল বড় হাতিয়ার। তারপর এডগার আলেন পো, হেল, এইচ. জি. ওয়েলস্, জুল ভার্ন, সিম্বলতস্ এবং গডার্ডের রচনায় মানুষের সেই আকাঙ্ক্ষা আরও উদ্দীপিত হইয়া উঠিল।

মহাকাশ-অভিযানের পথ-নির্মাণে সর্বাধিক কার্যকরী হইয়াছে আধুনিক বিজ্ঞানের বিস্ময়কর সৃষ্টি—রকেট। রকেট নির্মাণের প্রাথমিক গৌরব চীন দেশকেই দান করা হয়। অতি আধুনিককালে রকেটের গতিপথ নিয়ন্ত্রণের কলাকৌশল রকেটের জন্ম-ইতিহাস এবং তাহার গতিবেগ যতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, মানুষের মহাকাশ-বিজয়ের কল্পনাও ততই প্রসারিত হইতে লাগিল।

১৯৫৭ সালের ৪ঠা আগস্ট : মহাকাশ-অভিযানের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন সেদিন রাশিয়ার উৎকৃষ্ট প্রথম ‘স্পুটনিক’ প্রায় ১১৮ কিলোমিটার উর্ধ্বলোকে পৃথিবী প্রদক্ষিণ শেষ করিয়া সগৌরবে ফিরিয়া আসিল মর্ত্যের মাটিতে। তারপর ১৯৫৭ সালের ৩রা নভেম্বর ‘লাইকা’ নামে একটি জীব স্পুটনিক কুকুরকে বহন করিয়া রাশিয়ার দ্বিতীয় স্পুটনিক প্রায় ১,৫১১ কিলোমিটার উর্ধ্বলোকে পৃথিবী পরিক্রমা শেষ করিয়া সাকল্যের সহিত ‘বাটি মায়ের কোলে’ ফিরিয়া আসিল। প্রাথমিক সাকল্যের উৎসাহে উৎসাহিত বিজ্ঞানীদ

চন্দ্রলোক-বিজয়ের স্বপ্ন-দেখিতে লাগিলেন। ১৯৫৯ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর রাশিয়ার রকেট চন্দ্র-বিজয় সমাপ্ত করিল।

এইবার মহাকাশ-বিজয়ের কলহাস যুরি গাগারিন ১৯৬১ সালের ১২ই এপ্রিল মহাকাশের রহস্য-যবনিকা উন্মোচন করিয়া পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিলেন। তারপর মহাকাশে ‘আগ্ন-আধরে’ নিজেদের নাম রাখারা লিখিয়া আসিলেন, তাঁহারা হইলেন টিউভ, নিকোলায়েভ, পোপোভিচ, বিকোভস্কী এবং ভ্যালেন্তিনা তেরেস্কোভা।

তারপর কোমরভ, ইয়েগোরভ ও কিওকতিস্তোভ ভ্রমণ : এক-  
সোভিয়েট মহাকাশ-  
অভিযান .  
যোগে ১৯৬৪ সালে, এবং লিওনেভ ও বেলায়েভ ভ্রমণ : দুই-যোগে

১৯৬৫ সালে সাকল্যের সহিত মহাকাশ-পরিক্রমা সমাপ্ত করিয়া আসিলেন। কিন্তু তারপর মহাকাশ-পরিক্রমাকালে সোভিয়েট নভশ্চর কোমরভ দুর্ঘটনায় নিপতিত হইয়া নিহত হন। মহাশূন্তে ইহাই প্রথম দুর্ঘটনা। তারপর ১৯৬৮ সালে এককভাবে বেয়োগোভয় এবং ১৯৬৯ সালে যৌথভাবে সাতালভ, ইলিসিয়েভ ও -  
ফ্রনভ এবং ভলিনভ ও ফ্রনভ সাকল্যের সহিত মহাকাশ-অভিযান সারিয়া আসেন।

মহাকাশ-অভিযানে সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের সাকল্য মার্কিন বিজ্ঞানীদের অল্পপ্রাণিত করে। ১৯৫৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় মার্কিন জাতীয় বিমান-বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা। এই সংস্থা ১৯৬৩ সালের মধ্যে পৃথিবীর কক্ষপথে শতাধিক এবং সূর্যের ‘কক্ষপথে’ পাঁচটি মহাকাশযান স্থাপন করে। তারপর ১৯৬১ সালে মার্কিন মহাকাশচারী শেপার্ড ও গ্রিন্সম, ১৯৬২ সালে গেন, কার্পেন্টার ও সিরি এবং ১৯৬৩ সালে কুপার সাকল্যের সহিত মহাকাশ-পরিক্রমায় অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৬৫ সালের মার্চ মাসে গ্রিন্সম ও ইয়ং, এপ্রিল মাসে হোয়াইট ও ম্যাকডিভিট, আগস্ট মাসে কুপার ও  
মার্কিন মহাকাশ-  
অভিযান  
কনরাড, ডিসেম্বর মাসে বোরম্যান ও জেমস লোভেল এবং উহার  
এগারো দিন পরে সিরি ও স্ট্র্যাফোর্ড মহাকাশে পৃথিবী পরিক্রমা  
সারিয়া মর্তে ফিরিয়া আসেন। ১৯৬৬ সাল : এবার মার্কিন মহাকাশ-অভিযানের যুদ্ধ নাবিক হইলেন যথাক্রমে নীল আর্মস্ট্রং ও ডেভিট স্কট, টমাস স্ট্র্যাফোর্ড ও ইউজেন সারনাভ, ইয়ং ও কলিন্স, কনরাড ও গর্ডন, লোভেল ও অল্ড্রিন। তারপর ১৯৬৮ সালে সিরি, ইজল ও কানিংহাম অভিযাত্রীদ্বয় মহাকাশ পরিভ্রমণ করিয়া আসেন।

এ সব ‘মাসবেলাকার পিদিম জ্বালার আগে সকালবেলায় সন্ডে পাকানো’র মতো চন্দ্রাভিযানের প্রস্তুতিমাত্র। সেই প্রস্তুতির চূড়ান্ত পর্যায়ে ১৯৬৮ সালে বোরম্যান, লোভেল ও এণ্ডার্স টাদের প্রায় ১১২ কিলোমিটার দূরত্ব হইতে ফিরিয়া আসেন। তারপর ১৯৬৯ সালে ম্যাকডিভিট, স্কট ও সোরেকার্ট মহাকাশে চন্দ্রযানের পরীক্ষা-কাৰ্য সমাপ্ত করিয়া আসিলেন। সব শেষে স্ট্র্যাফোর্ড, ইয়ং ও সারনাভ চন্দ্রযানে টাদের প্রায় ১৫ কিলোমিটারের মধ্যে পরিভ্রমণ করিয়া আসেন। তারপর ১৯৬৯ সালের ১৬ই জুলাই। ঐদিন অ্যাপোলো : এগারো-যোগে আর্মস্ট্রং, কলিন্স ও অল্ড্রিন চন্দ্রাভিযানে শুরু করিলেন পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা দুঃসাহসিকতম অভিযান। ২০শে জুলাই ভারতীয় সময় রাত্রি ১টা ৫৩ মি.-এ চন্দ্রযান ‘ঈগল’ আর্মস্ট্রং ও অল্ড্রিনকে লটকা চাকের দ্বিতীয়

স্পর্শ করিল। ২১শে জুলাই ভারতীয় সময় : সকাল ৮টা ২৬ মি. ২০ সেকেন্ড। মানব-সভ্যতার ইতিহাসে সর্বাধিক গৌরবময় ও চিরস্মরণীয় মুহূর্ত। প্রথমে নীল আর্মস্ট্রং 'ঈগলে'র দরজা খুলিয়া মই বাহিয়া তাঁদের মাটিতে পদস্থাপন করিলেন। প্রাণহীন, জলহীন, ধূসর চন্দ্রকে পৃথিবীর দুঃসাহসী মানুষের প্রথম পদচিহ্ন অঙ্কিত হইল। কিছুক্ষণ পরে অল্ট্রিনিও আর্মস্ট্রং-এর অনুসরণ করিলেন।

চন্দ্র-বিজয় : এক.  
আমস্ট্রং, অল্ট্রিনিও  
কলিন্স

প্রায় আড়াই ঘণ্টা কাল তাঁহারা চন্দ্রের প্রান্তরে বিচরণ করেন এবং যথানির্দিষ্ট কর্তব্যগুলি সমাধা করেন। তারপরে ঘরে ফিবিবারপালা। ভারতীয় সময় বেলা ১১টা ২৪মি.-এ 'ঈগল' চন্দ্রপৃষ্ঠ ত্যাগ করিয়া উঠিয়া আসিল। রাত প্রায় ৩টার সময় কলিন্স-চালিত অ্যাপোলো-যানের সহিত 'ঈগলের' মিলন ঘটিল। 'ঈগল'কে দূরে নিক্ষেপ করিয়া অ্যাপোলো : এগারো মহাকাশচারীজনকে লইয়া ২৪শে জুলাই ভারতীয় সময় রাত্রি ১০টা ১১মি.-এ নিরাপদে প্রশান্ত মহাসাগরে অবতরণ করিল।

এই জয় কেবলমাত্র রাষ্ট্রবিশেষের জয় নয়, এই জয় সমগ্র বিশ্বমানবের জয়, মানব-সভ্যতার জয়। আবার, ১৯৭০ সালের মার্কিন চন্দ্রাভিযান ব্যর্থ হওয়ার পরে ১৯৭১ সালের ৩১শে জানুয়ারী অ্যাপোলো : চৌদ্দ ম্যালেম শেগাড, স্টুয়ার্ট কুসা ও এড্‌গার মিলেনকে লইয়া চন্দ্রাভিযাত্রা করে। এই কেন্দ্রকারী চন্দ্রযান 'আস্কারাস' তাঁদের 'ফ্রা মরো' অঞ্চলের মাটি স্পর্শ করিল। তাঁদের বৃকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি-সমেত রিক্শা টানিয়া অভিযাত্রীজন কয়েক কিলোমিটার পথ পরিভ্রমণ করেন। পরিকল্পনা ছিল, তাঁদের একটি পাহাড়ের উপর অভিযান চালানো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহা পরিত্যক্ত হয়। অবশ্য সেই অঞ্চলে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালাইবার জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি স্থাপন করিয়া এবং সেই অঞ্চলের মাটি সংগ্রহ করিয়া অভিযাত্রীজন মূল মহাকাশ-যানে ফিরাই আসিলেন। তারপর ঘটিল প্রশান্ত মহাসাগরে তাঁহাদের সকল প্রত্যাবর্তন।

সাকল্যের পর আবার সাকল্য। সোভিয়েট স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র-গবেষক লুনাখোদ : ৯ চন্দ্রে 'পর্যবেক্ষণ সাগর' এলাকায় এ্যালুমিনিয়াম, লোহ, সিলিকন, টাইটেনিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়ামের আকর খনিজ পাওয়াছে। এইভাবে

মানুষের যুগ-যুগান্তরের চন্দ্র-বিজয়ের স্বপ্ন অবশেষে সফলতা লাভ করিল। 'সুদূরের পিয়াসী' মানুষের গ্রহান্তর-বিজয়ের স্বপ্নও এইভাবে চমকতো একদিন সাকল্যমণ্ডিত হইবে। কিন্তু—'নিদারূণ দুঃখরাতে, মৃত্যুঘাতে/মানুষ চূর্ণিবে যবে নিজ মর্ত্য-সীমা/তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা ?'

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- মহাকাশ-অভিযান
- মানুষের চন্দ্রলোক-অভিযান
- মানুষের আকাশ-বিজয়, ট. দা. ৩০
- মানুষের অস্তরীক-বিজয়, ট. দা. ৩০

প্রকৃতি-জয় : যুগ্মনা । বিজ্ঞানের জয়যাত্রা ।

৭-শক্তি : ইহার, ইলেকট্রন : টেলিগ্রাফ, টেলি-

। টেলিভিশন । ইহার আবিষ্কার । ইহার

। : যেতার ও চলচ্চিত্র । ইহার ব্যবহার :

। : ইহার কার্যকারিতা । ভারতে টেলি-  
শন । : উপসংহার ।

## টেলিভিশন

স্বষ্টির কোন আদিম প্রভাত হইতে প্রকৃতির অগতে শুরু হইয়াছে মানুষের জয়যাত্রা । সেই জয়যাত্রা আজও চলিয়াছে নিরবচ্ছিন্ন ও অপ্রতিরোধ্য গতিতে চেনালাগে দুর্জয় প্রকৃতি প্রতি পদবিক্ষেপে তাহার যাত্রাপথে, সৃষ্টি করিয়াছে দুর্লভ্যাদি, সকল শক্তি দিয়া প্রতিরোধ করিয়াছে তাহার জয়যাত্রাকে । কিন্তু মানুষ সেই দুর্জয় প্রতিরোধ মানে নাই, নির্মমভাবে সকল বাধাকে সে চলা করিয়াছে পদ-দলিত । তারপর কৌতুহলী মানুষ ধীরে ধীরে প্রকৃতির হাত হইতে কাড়িয়া লইল তাহার রহস্ত-নিকেতনের গোপন চাবিকাঠি, জয় করিয়া আনিল এই বিপুল-ব্যাপ্ত জড়বিশ্বের বিচিত্র তথ্য-সম্ভার, কার্যকারণহুজে গ্রথিত করিল সংগৃহীত মূল্যবান তথ্যসমূহকে । এইভাবে সৃষ্টিত হইল বিজ্ঞানের নবজন্ম, শুরু হইল বিজ্ঞানের নিরলস জয়যাত্রা ।

সেই বিজ্ঞানের বলে বলায়ান্ মানুষ বলিষ্ঠ পদবিক্ষেপে আজ প্রকৃতির রহস্ত-নিকেতনের কক্ষ-কক্ষান্তরে যাত্রা শুরু করিয়াছে । বিজ্ঞানের সেই অভিযান, বিজ্ঞানীদের সেই অতঙ্গ সাধনা চলিয়াছে অব্যাহত গতিতে । সেই অক্লান্ত বিজ্ঞান-উপস্বীর দল

মাতিয়া রহিয়াছেন নিত্য-নূতন বিশ্বয়কর বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনে ।  
বিজ্ঞানের জয়যাত্রা । তাঁহাদের সাধনাপুষ্ট বিজ্ঞান আজ মানুষের পদচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে জলে-স্থলে-অস্তরীক্ষে, পরিদৃশ্যমান এই বিরাট বিশ্ব-সংসারের সর্বত্র বিজ্ঞান প্রসারিত করিয়া দিয়াছে তাহার বিশ্বয়কর ঐজ্জ্বালিক শক্তি । সেই শক্তির দ্বারা মানুষ হৃদরকে করিয়াছে নিকটতম, অদৃশ্যকে করিয়া তুলিয়াছে পরিদৃশ্যমান ।

‘টেলিভিশন’ হইল বিজ্ঞানের জয়যাত্রার নবতর সাকল্যের দিক্‌চিহ্ন । হৃদরকে নিকটতম করিবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছিল টেলিগ্রাফ এবং টেলি-

কোন , টেলিগ্রাফ-টেলিফোনের আবিষ্কার সেদিন বিশ্বকে  
বিদ্যুৎ-শক্তি : ইহার, চমৎকৃত করিয়াছিল । কিন্তু তাহা আজ বিজ্ঞানে সকলকাম  
ইলেকট্রন : টেলিগ্রাফ, মানুষের মনে আর কোন বিশ্বয় উৎপাদন করে না । তারপর  
টেলিফোন মাছুষের বৈজ্ঞানিক একদিন আবিষ্কার করিলেন বিদ্যুৎ-শক্তি । সেইদিন

হইতে মানুষ দুর্জয় শক্তিশালী হইয়া উঠিল । সঙ্গে সঙ্গে তাহার হাতে ধরা পড়িল ইহার এবং ইলেকট্রনের গোপন রহস্ত । বিজ্ঞানের জয়যাত্রার ইতিহাসে সংযোজিত হইল এক নূতনতম অধ্যায় ।

তবু টেলিগ্রাফ-টেলিফোনের উদ্ভাবন-সাকল্যেই মানুষ তৃপ্ত থাকিতে পারিল না ।  
জ্ঞানপূর্বে সে অসীম শক্তি-সম্পন্ন বিদ্যুৎকে করিয়াছে কার্যকর । এখন সে আরও দূরে

পাইতে চাহিল সুদূরকে, শুনিতে চাহিল দূরান্তরের মাছুষের হৃৎপিট কণ্ঠস্বর। তাহা সেই আকাক্ষার তাগিদেই উদ্ভাবিত হইল বেতার-বার্তা। এবার আর শুধু কণ্ঠস্বরেই লেহু রহিতে পারিল না, সঙ্গে সঙ্গে মাছুষের মূর্তিও সে চাহিল প্রত্যক্ষ করিতে।

আসিল টেলিভিশন। লক্ষ-কোটি মাইলের দূরবর্তী মাছুষকে মুহূর্ত-মধ্যে নিবিড় সান্নিধ্যে পরিদৃশ্যমান করিয়া তুলিতে পারে এই বিস্ময়কর আবিষ্কারটি। কেবল তাহাই নয়, ইহার দ্বারা সুদূর বহির্বিশ্বকে মাছুষ তাহার আপন কক্ষে করায়ত্ত আমলকীবৎ আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে। টেলিভিশন আধুনিক বিজ্ঞানের একটি অভূতপূর্ব আবিষ্কার, একটি অতি বিস্ময়কর অবদান।

বৈজ্ঞানিক শক্তির আবিষ্কারই টেলিভিশন আবিষ্কারের মৌল প্রেরণা। বৈজ্ঞানিক শক্তি আবিষ্কারের দ্বারা বেতার-যন্ত্র ও চলচ্চিত্র আবিষ্কার সম্ভব হইয়াছে। বেতার-যন্ত্র সুদূরের কণ্ঠস্বর নিকটে বহন করিয়া আনিয়াছে। আবার, চলচ্চিত্র মাছুষের নির্বাক স্থির ছবিকে করিয়া তুলিয়াছে সচল এবং সবাৎ। টেলিভিশন ইহার আবিষ্কার বেতার-যন্ত্র ও চলচ্চিত্রের সমবায়িক কার্যকারিতার আশ্চর্য যোগফল। ইহা সুদূরের চিত্রকে মুহূর্ত-মধ্যে কাছে আনিয়া সচল এবং সবাৎ করিয়া তোলে। টেলিভিশনের আবিষ্কারের অন্ত ইহার অন্ততম আবিষ্কার জন বেয়ার্ডের নিকট বিশ্ববাসী কৃতজ্ঞ।

টেলিভিশনের একদিকে বেতার-বার্তা, অন্যদিকে চলচ্চিত্র। উচ্চশক্তি-সম্পন্ন ট্রান্সমিটারযোগে পৃথিবীর কোনও শব্দ মহাশূন্যের ঈশ্বর-সমুদ্রে প্রেরিত হয়। সেই সঙ্গে এক উচ্চশক্তি-সম্পন্ন ক্যামেরার সাহায্যে উৎপন্ন ঈশ্বর-লোক প্রেরিত হয় ক্রমাগত সঞ্চিত-গতিতে-গৃহীত সংখ্যাতীত আলোকচিত্র। তারপর ইহার কলা-কৌশল : এক বিশেষ প্রকারে প্রস্তুত গ্রাহক-যন্ত্রের দর্পণে অলোকচিত্রগুলির বৈজ্ঞানিক প্রতিকলন হয় এবং তাহার সহিত গৃহীত শব্দের হয় সম্প্রসারণ। তাহার ফলে কোন দূরবর্তী স্থানের ব্যক্তি বা বস্তু গৃহীত এবং প্রেরিত চিত্র ও শব্দ-সম্ভার নিমেষ-মধ্যে এই যন্ত্রে আনিয়া পরিদৃশ্যমান ও শ্রবণ হইয়া উঠে।

টেলিভিশনের আবিষ্কার ইলানোংকালের। কাজেই, ইহার বয়স বেশী হয় নাই। কিন্তু ইতিমধ্যেই ইহার ব্যবহার পৃথিবীর সকল উন্নত রাষ্ট্রেই জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে। উল্লেখ্য যে, মহাকাশ-অভিযানে ইহার সাহায্য বিশেষ কার্যকরী হইয়াছে। মহাকাশযানের অভ্যন্তরে মহাকাশ-অভিযাত্রীর চিত্র ও বাণী প্রতিমুহূর্তে ইহা পৃথিবী-পৃষ্ঠে পৌছাইয়া দিয়া মাছুষের উদ্বেগ-নিরাসনের হইয়াছে বিশেষ সহায়ক। মহাকাশ-অভিযাত্রীর সকল অবস্থার চিত্র ও শব্দ সর্বত্র টেলিভিশন পৃথিবীতে বহন করিয়া আনিয়াছে বলিয়া তাহা সম্ভব হইয়াছে। চল্লোক-বিজ্ঞান টেলিভিশন অভ্যন্তর নিষ্ঠার সহিত চিত্রাভিযাত্রীদের সাফল্যের চরম মুহূর্তগুলিকে মর্ত্যবাসীদের দৃষ্টির সম্মুখে দৃশ্যমান করিয়া তুলিয়াছিল।

অভিযাত্রীগণ পৃথিবীর মাছুষের মহাবিশ্ব-পবেষণার সুবিধার অন্ত চতুর্পৃষ্ঠে একটি শক্তিশালী টেলিভিশন প্রেরক-যন্ত্র স্থাপন করিয়া আসিয়াছেন।

টেলিভিশন স্বদূরকে অত্যন্ত সরিকটে প্রত্যক্ষ ও শব্দমুখর করিয়া তোলে। ইহা বর্তমানে পৃথিবীর ধনী-রাষ্ট্রগুলির অধিবাসীদের আমোদ-প্রমোদ ও অবসর-বিনোদনের মূল্যবান উপকরণরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। তাহা ছাড়া, ইহা বিশ্বের এক স্বদূর ঐশ্বরের

সংবাদ ও ঘটনা মুহূর্ত-মধ্যে অল্প প্রান্ত্রে প্রত্যক্ষ ও জীবন্তরূপে ইহার কার্যকারিতা পরিবেশন করিতে পারে। আমাদের বিশ্বাস, ইহা যেমন মানুষের চক্ষুভিষানে চন্দ্রলোকের চিত্র ও বাণী বহন করিয়া আনিয়াছিল, তেমনি ইহা একদিন হয়তো গ্রহান্তরের চিত্র ও বাণী পৃথিবীপৃষ্ঠে বহন করিয়া আনিতে সক্ষম হইবে। সেদিন বোধ হয় আর বেশী দেরী নাই।

ভারতে টেলিভিশন-যুগের সবেমাত্র সূচনা হইয়াছে। অত্যন্ত ব্যয়-সাপেক্ষ বলিয়া ইহা ভারতে এখনও জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে পারে নাই। দিল্লীর ৬০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে ইহার কার্যকারিতা এখন সীমাবদ্ধ। শীঘ্রই ভারতের অন্যান্য বৃহৎ শহরগুলিতে টেলিভিশন সম্প্রসারিত হইতেছে। ১৯৫১ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর ভারত টেলিভিশন-যুগে পদার্পণ করে। প্রাথমিক স্তরে ইহার কার্যকারিতা টেলি-ক্লাবগুলিতে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বর্তমানের চেহারা সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। ১৯৬৫ সালের ১৫ই আগস্ট হইতে ইহার কর্মসূচী প্রাত্যহিক অনুষ্ঠান-সূচীতে রূপান্তরিত হইয়াছে। হিন্দী এবং ইংরেজিতে সংবাদ, সংবাদ-সমীক্ষা, লোকনৃত্য, লোকসংগীত, বিষয়-নির্ভর

আলোচনা, সাহিত্য-বাসর, দেশ-বিদেশের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সম্পর্কে ভারতে টেলিভিশন প্রামাণিক চিত্র-প্রদর্শনী ইহার অনুষ্ঠান-সূচীর অঙ্গ। ভারতে বর্তমানে প্রায় পোনে দুই লক্ষ টেলিভিশন গ্রাহক-যন্ত্র ব্যবহৃত হইতেছে। কলিকাতা, বোম্বাই, অমৃতসর, পুনা ও ত্রীনগরে টেলিভিশন-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে এবং কানপুর, ছর্গাপুর, আসানসোল ও মুর্শোরিতে টেলিভিশন পুনঃসম্প্রচার কেন্দ্র স্থাপিত হইবে। ১৯৭৫ সালে কলিকাতায় টেলিভিশন আসিয়াছে। কিন্তু ব্যয়বাহুল্যের জন্য উহা জনপ্রিয় হইতে পারে নাই, প্রচার-সূচীও সীমিত। কাজেই, কেবল টেলিভিশন-কেন্দ্রের সম্প্রসারণই যথেষ্ট নয়, দেশে স্থলভে পর্যাপ্ত-সংখ্যক টেলিভিশন গ্রাহক-যন্ত্র উৎপন্ন হওয়াও উচিত।

টেলিভিশন আধুনিক বিজ্ঞানের একটি বিশ্বয়কর আবিষ্কার। মানুষের যুগ-যুগান্তরের স্বপ্ন ও কল্পনা আজ ইহার মাধ্যমে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। মহাভারতে বর্ণিত আছে, মহাত্মা সঞ্জয় হস্তিনানগরে বসিয়া কুরুরাজ দ্রুতরাষ্ট্রকে উপদেহার কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের বর্ণনা শুনাইতে গিয়া এক অদৃশ্য এবং অলৌকিক শক্তিবলে যুদ্ধক্ষেত্রের সমস্ত দৃশ্য ও শব্দাবলী দেখিতে ও শুনিতে পারিতেন। আধুনিক-কালের মানুষ বৈজ্ঞানিক শক্তিবলে মহাকবি-কল্পিত সেই অদৃশ্য শক্তি করারসুত করিয়াছে। টেলিভিশন মহাকবি-বর্ণিত সেই অদৃশ্য শক্তির বিজ্ঞান-সিদ্ধ মূর্ত প্রতীক।

এই প্রবন্ধের অন্তিমসরণে লেখা যায় :

● বিজ্ঞানের একটি বিশ্বয়কর আবিষ্কার

র. বি. (১ম)—৪



প্রবন্ধ-সূত্র : সূচনা। বর্তমান সভ্যতা বিদ্যা-  
নির্ভর। বৈদ্যুতিক জীবনে বিদ্যুতের দান।  
চিকিৎসা-বিজ্ঞানে বিদ্যুতের দান। উৎপাদনে  
বিদ্যুতের দান। পরিবহন ও যোগাযোগ। জ্বালানির  
পরিবর্তে জল-বিদ্যুৎ। উপসংহার।

## বর্তমান সভ্যতার

## বিদ্যুতের দান

ক. প্রা. '০০

বৈজ্ঞানিক ক্যারাডেকে ধন্তবাদ, তিনি আকাশের বিদ্যুৎকে নামাইয়া আনিয়া মাটির মানুষের কাছে লাগাইয়াছেন। সৃষ্টির আদিম প্রভাতে আকাশে বিদ্যুতের অহংকার দেখিয়া অসহায় ভয়াবহ মানুষ তাহাকে কোন অলক্ষিত দেবতার নির্দয় হাতের দুর্জয় আয়ুধ ভাবিয়া অরণ্য অথবা গুহার নিরাপদ আশ্রয়ে আশ্রয়-  
সূচনা

গোপন করিয়াছিল। আধুনিক কালের বিজ্ঞানের বলে বলায়ান মানুষ আজ সেই দেবরাজ ইজের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়াছে দুর্জয় বজ্র, কাড়িয়া লইয়াছে দুর্বীর বিদ্যুৎ। সকল শক্তির উৎস বিদ্যুৎকে সে আলাদীনের প্রদীপের দুর্ধ্ব দৈত্যের মতো করিয়াছে বশীভূত, তাহাকে নিয়োজিত করিয়াছে মানুষের একনিষ্ঠ সেবার—সভ্যতার সার্বিক বিকাশে।

আসলে, বিদ্যুৎ যে শুধুমাত্র আকাশেই ছিল, তাহা নয়। সর্বত্রগামী বিদ্যুতের উপস্থিতি রহিয়াছে জড়-জগতের প্রতিটি ক্ষেত্রে। এই দুর্লভ সত্যটি সর্বপ্রথম উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল আচার্য জগদীশচন্দ্রের নিত্য-উদ্ভাবনশীল মনোলোকে। উপযুক্ত পরীক্ষার দ্বারা আচার্য জগদীশচন্দ্র প্রমাণিত করিয়াছিলেন যে, সমগ্র জড়-জগৎকে ঘিরিয়া

রাখিয়াছে সর্বশক্তিমান বিদ্যুৎ। কিংবা বলা চলে, অসীম শক্তিশালী  
বর্তমান সভ্যতা  
বিদ্যুৎ-নির্ভর  
বিদ্যুতের এক বিশাল মহাসমুদ্রে এই জড়-জগৎ নিত্য-ভাসমান।

সে যাহা হউক, দুর্জয় বিদ্যুৎকে করায়ত্ত করিয়া মানুষ ধীরে ধীরে সম্ভব-অসম্ভবের সীমারেখা মুছিয়া ফেলিতেছে। বিদ্যুৎ-শক্তির বিচিত্র কার্যকারিতার উপর রচিত হইয়াছে বর্তমান সভ্যতার সূদৃঢ় বনিয়াদ। বর্তমান সভ্যতা এত বেশী বিদ্যুৎ-নির্ভর যে, বিদ্যুতের হাত ছাড়িয়া দিয়া আজ তাহার পক্ষে একপদও অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়।

আকাশের অবাধ্য বিদ্যুৎ প্রথম যেদিন মানুষের হাতে ধরা দিল, সেদিনটি মানব-ইতিহাসের একটি অরণীয় দিন। সেইদিন মানুষের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল একটি নূতন যুগ, নূতন জীবনাদর্শ। সেই নূতন যুগের নামকরণ করা যাইতে পারে আলোকের যুগ, গতির যুগ। সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের পাতা গেল উল্টাইয়া, স্থব-স্বাচ্ছন্দ্য ও গতি-ব্যস্ততার মহোন্মাদ শুরু হইয়া গেল দিকে-দিকে। আজ বিদ্যুৎ মানব-জীবনের নানা স্থব-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিয়াছে, দূর-দূরান্তরে ঐশত্ত করিয়া দিয়াছে তাহার অবাধ্য গতিবিধি। বৈদ্যুতিক বাতি, বৈদ্যুতিক পাখা, টেলিগ্রাফ-টেলিফোন, রেডিও, টেলিভিশন—সবই রহস্যময় বিদ্যুৎ-শক্তির বিন্দুরকর অবদান। ঘরের কোণে বসিয়া আমরা আজ দূর-দূরান্তের

পৃথিবীকে সহজে প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছি। অনায়াসে তাহার সহিত যোগাযোগ  
পন করিতে পারিতেছি। এমন-কি, মানুষের ব্যাধি-বিজয়ের কাজেও বিদ্যুৎ অ্যুসিরা  
সম্বোধে হাত লাগাইয়াছে; রোগ-জরুর মানুষকে দিতেছে আরোগ্যের ঠিকানা।

বৈদ্যুতিক জীবনে  
বিদ্যুতের দান

বিদ্যুৎ আজ রাত্রির অন্ধকারকে আলোকিত করিতেছে, দাবদফ  
গ্রীষ্মের নিদ্রারূপ অস্বস্তির অবসান ঘটাইয়া ঘুরাইতেছে পাখা,  
চালাইতেছে এয়ার-কুলার, বাসগৃহকে করিয়াছে শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত।

রন্ধন-কার্যেও বিদ্যুৎ হাত লাগাইয়াছে। রন্ধনের নানা ব্যবস্থা আজ বৈদ্যুতিক উনানে  
সম্ভব। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সকল ক্ষেত্রেই ছড়াইয়া রুহিয়াছে বিদ্যুতের সক্রিয়  
স্পর্শ। বিদ্যুৎকে বাদ দিয়া আধুনিক হুসভ্য জীবন একেবারেই অচল।

আজ মানুষের আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের যে বিস্ময়কর উন্নতি সাধিত হইয়াছে,  
তাহা বিদ্যুতের সাহায্যেই সম্ভব হইয়াছে। দেহাভ্যন্তরে কোন স্থান ব্যাধিগ্রস্ত হইলে  
যখন বাহির হইতে কিছুতেই রোগ-নির্গম করা সম্ভব হয় না, তখন অসুস্থ-নির্ভর

চিকিৎসা-বিজ্ঞানে  
বিদ্যুতের দান

চিকিৎসা না চালাইয়া ‘এক্স-রে’ বা রঞ্জন রশ্মির সাহায্যে  
দেহাভ্যন্তরের ছবি তুলিয়া রোগ-নির্ধারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হইয়া  
সঠিক চিকিৎসা করা সম্ভব। অসুস্থ-নির্ভরতা হইতে বিদ্যুৎ

চিকিৎসা-বিজ্ঞানকে মুক্তি দিয়াছে। তাহা ছাড়া, বৈদ্যুত রশ্মির সাহায্যে ক্যান্সার  
প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসাও করা হইতেছে।

বিদ্যুৎ আজ বিশ্বের উৎপাদনের ইতিহাসে আনিয়াছে যুগান্তর। সে আজ দ্রুত  
ছন্দে কলকারখানায় ঢাকা ঘুরাইতেছে। দ্রুততর উৎপাদনের নূতন দৃষ্টান্ত স্থাপন  
করিয়াছে। কেবল বৃহদায়তন শিল্পেই নয়, আজ কুটির-শিল্প ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলিতেও  
বিদ্যুতের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অতীতকালে, বিদ্যুৎ কৃষির সেবায়ও আজ লাগাইয়াছে

উৎপাদনে বিদ্যুতের  
দান

তাহার শক্ত-সমর্থ হাত। পাম্পের সাহায্যে গভীর নলকূপের জল-  
উত্তোলন এবং তৃণার্ত কৃষিক্ষেত্রে প্রেরণ বিদ্যুতের দ্বারা সম্ভব  
হইয়াছে। ফলে, দৃষ্টিহীন অঞ্চলে ও শুষ্ক মরুভূমিতে

সাহায্যে কৃষি সম্ভবতী হইয়া উঠিয়াছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সঙ্গে পান্না দিয়া  
বর্তমান দুনিয়ার উৎপাদন যে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার মূলে রহিয়াছে বিদ্যুৎ  
বিদ্যুৎই বর্তমানকালের কৃষি ও শিল্পোৎপাদনে গ্রহণ করিয়াছে চালক-শক্তির ভূমিকা।

পরিবহণ ও যানবাহনের ইতিহাসেও বিদ্যুতের দান অসীম। বিদ্যুৎ শহরে ট্রাম  
গাড়ি চালাইতেছে। শহর ও গ্রামের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিয়াছে বৈদ্যুতিক  
ট্রেন। ইহা বাষ্পচালিত ট্রেনের অপেক্ষাও দ্রুতগামী এবং ইহার সাহায্যে দূরবর্ত  
স্থানে অল্প সময়ের মধ্যে যাতায়াত করা যায়। ভারতের গুরুত্বপূর্ণ রেলপথগুলিতে

পরিবহণ ও যোগাযোগ  
গগনচুম্বী

দ্রুত বৈদ্যুতিকরণের কাজ চলিতেছে। শহরে সম্প্রতি যে সমা  
গগনচুম্বী অট্টালিকা নির্মিত হইতেছে, বিদ্যুৎ-চালিত ‘লিফ্ট’

তাহাতে উঠানামার একমাত্র ভরসা। তাহা ছাড়া, বন্ধুত্ব এবং রেলস্টেশনে  
‘কলিকাতা’ জাতীয় সড়ক মাল উত্তোলন করে ও নামাটিকা দেয়। তাহাও

উৎস হইল বিদ্যুৎ। অতীতকালে, টেলিগ্রাম, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের যে বিধের যোগাযোগ-ব্যবস্থাকে ক্ষততর করিয়া তুলিয়াছে, তাহাও তো বিদ্যুতেরই অবদান

জালালি গুড়াইয়া বিদ্যুৎ উৎপাদনের দিন অতীত হইয়াছে। আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিকগণ বজ্রা-নিয়ন্ত্রণের জন্ত পৃথিবীর ধরাত্তো নদীগুলিকে বন্দী করিতে গিয়া পাইলেন অফুরন্ত জল-বিদ্যুতের সম্ভান। পৃথিবীর উচ্ছ্বল নদীগুলির অবাধ্য জল-স্রোতে যে এত প্রচুর পরিমাণ বিদ্যুতের সম্ভাবনা ছিল, তাহা আগে কে জানিত! এবং সেই বিদ্যুৎ যে এত সম্ভাব্য উৎপাদন করা সম্ভব, তাহাই বা কে জানিত?

জালালির পরিবর্তে  
জল-বিদ্যুৎ  
বিদ্যুতের উৎস অফুরন্ত। কিন্তু পৃথিবীর জালালি-সম্ভার সীমিত কার্জই, পৃথিবীর সকল দেশেরই উচিত জালালি সংরক্ষণ করিয়া অবাধ্য নদীগুলির জল স্রোত হইতে জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনে মনোনিবেশ করা। বিশেষতঃ অল্পমাত্র দেশগুলি দূরন্ত নদীগুলিকে শক্ত কংক্রিটের বাঁধন পরাইয়া যদি জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন করে, তবে তাহারা উপকৃত হইবে এবং তাহাতে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির দ্বার খুলিয়া যাইবে। কয়লার ধনিগুলিতে হাত না দিয়া জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়া দেশের ভবিষ্যৎ গঠনে মনোনিবেশ করা বুদ্ধিমানের কাজ।

বর্তমানকালে বিদ্যুৎ আমাদের নিত্য সহচর। বিদ্যুৎ ছাড়া আমরা একপদও অগ্রসর হইতে পারি না। সে আমাদের পরিশ্রম-ভার লাঘব করিয়া দিতেছে, আমাদের বিশ্রাম-স্বথকে পরিপূর্ণতা দান করিতেছে। শুধু তাহাই নয়, সে আমাদের শহরগুলিকে আলোকমালায় সাজাইয়া তাহাদের অপরূপ করিয়া তুলিয়াছে। তাহা ছাড়া, আমাদের সহস্র যুগের অন্ধকার গ্রামগুলিতেও আলো জ্বালাইবার দায়িত্ব সে আজ গ্রহণ করিয়াছে। সকাল হইতে রাত্রি এবং রাত্রি হইতে সকাল—বিদ্যুৎ আমাদের সেবায় নিয়োজিত

উপসংহার  
এমন কি, আমরা যখন ঘুমাইয়া পড়ি, তখনও বিদ্যুৎগত পাখার হাওয়ায় এয়ার কুলারের সাহায্যে অথবা শীতাতপ-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে বিদ্যুৎ রাখে তাহার নিরলস সেবার স্বাক্ষর। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের জীবন-ধারণের সার্বিক স্বচ্ছন্দ্য-বিধানের জন্ত বিদ্যুতের চোখে ঘুম নাই। এমন-কি, মৃত্যুর পরেও যখন সকলের সকল সেবায়ত্তর অবদান হয়, তখনও বৈদ্যুতিক চুত্ৰীতে বিদ্যুৎ আমাদের নখর দেহখানাকে সমস্তে গ্রহণ করিয়া সেবার সর্বশেষ স্বাক্ষর মুদ্রিত করিয়া দেয়। এক কথায়, বিদ্যুৎ মানব-জীবনে আজ অপরিহার্য। মানব-সভ্যতার বিকাশে বিদ্যুতের অবদান যে অসামান্য, তাহা আজ অস্বীকার করিব কিরূপে?

প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যাক :

- বিদ্যুৎ-শক্তি ও মানব-সম্ভাবনা
- সভ্যতার বিকাশে বিদ্যুতের অবদান
- আধুনিক-সভ্যতার বিদ্যুৎ-শক্তির দান, ক. প্রা. '৬৫

প্রবন্ধ-সূত্র : নূন্য। ইংরেজ আমলে ভারতে  
শিক্ষা-ব্যবস্থা। স্বাধীন ভারত ও শিক্ষার ধারা।  
শিক্ষা ও উন্নয়নের বৈচিত্র্য-সাধনের প্রয়োজনীয়তা :  
শিক্ষা-সংস্কারের ভিত্তি কি হওয়া উচিত। শিক্ষার  
নববিধান। পরীক্ষা-সংস্কার ও ফলাফল। উপসংহার।

স্বাধীন ভারতে শিক্ষা-সংস্কার

৪

পরীক্ষা-সংস্কার

‘দেশের লোককে শিশুকাল হইতে মানুষ করিবার সঙ্গপার যদি নিজে উদ্ভাবন এবং তাহার উজ্জ্বল  
যদি নিজে না করি তবে আমরা সর্বপ্রকারে বিনাশপ্রাপ্ত হইব, অল্পে মরিব, স্বাস্থ্যে মরিব, বৃদ্ধিতে মরিব,  
চরিত্রে মরিব—ইহা নিশ্চয়।’  
—রবীন্দ্রনাথ

শিক্ষায় এক অকালমৃত্যুর মড়ক আজ আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বত্র ছড়াইয়া  
পড়িয়াছে। ইহার প্রতিকারের জন্য আজ আমাদের বৃত্তিতে হইবে যে, জাতীয় শিক্ষা ও  
জাতীয় উন্নয়ন—জাতীয় জীবনের এই দুইটি মৌল দিকের মধ্যে একটা গভীর সামঞ্জস্য  
প্রয়োজন। বর্তমানে ভারতের জাতীয় উন্নয়ন শুরু হইয়াছে। স্বাধীনতালাভের পর  
আটশ বৎসর অতিবাহিত হইল, কিন্তু সেই উন্নয়ন-ধারা এখনও আমাদের জাতীয়  
জীবনের সকল দিক স্পর্শ করিতে পারে নাই। স্বাধীন ভারতে  
শিক্ষা-সংস্কারও সূচিত হইয়াছে। বহু কমিটি ও বহু কমিশন  
বসাইয়া ইংরেজ-আমলের শিক্ষা-ব্যবস্থার যে পুনর্গঠনের আয়োজন করা হইল, তাহার  
সচিৎ জাতীয় উন্নয়নের যোগ কোথায়? তাহা ছাড়া, সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে  
রহিয়াছে হুঃখজনক বিচ্ছেদ। এই বিচ্ছেদের ফলে ভারতে চলিয়াছে মানবিক শক্তি ও  
সম্ভাবনার অদুরন্ত অপচয়। তরুণ-সমাজ শিক্ষা-ব্যবস্থার এই শৃঙ্খলাহীনতায় দিশাহারা,  
অভিভাবকগণ বিমূঢ়। শক্তির এই বিপুল অপচয় ভারত-ভাগ্যবিধাতা আর বেশীদিন  
ক্ষমা করিবেন না।

ইংরেজ আমলে ভারতে যুরোপীয় ভাবধর্মী শিক্ষাধারা প্রবর্তিত হওয়ায় ভারতের  
সার্বজনীন শিক্ষার ধারা রুদ্ধ হইল। শিক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের চারি দেওয়ালের মধ্যে  
সীমাবদ্ধ করিয়া সেখানে শেজপীয়ার, শেলী, কীটস্, বায়রনের কবিতার পঠন-পাঠন শুরু  
হইল, কিন্তু যে শিক্ষা জাতির অর্থনৈতিক উন্নতির বিনিয়াদ রচনা করিতে পারে, তাহার  
ব্যবস্থা হইল না! ‘নিজে চিন্তা করিবে, নিজে সন্ধান করিবে, নিজে কাজ করিবে,  
এমনতরো মানুষ তৈরী করিবার প্রণালী এক; আর পরের হুকুম  
মানিয়া চলিবে, পরের মতের প্রতিবাদ করিবে না, ও পরের কাজের  
জোগানদার হইয়া থাকিবে মাত্র, এমন মানুষ তৈরীর বিধান  
অন্তরূপ।’ ইংরেজ এদেশে বিভিন্ন প্রকারের মানুষ তৈরীর অপচেষ্টা করিয়াছিল।  
সাম্রাজ্যিক প্রয়োজনে এবং বাণিজ্যিক হিসাব-রক্ষার উদ্দেশ্যে তাহারা এদেশে চাহিয়াছিল  
ইংরেজি শিক্ষিত একদল সিবিলাইন ও করণিক সৃষ্টি করিতে। তাহাদের সেই উদ্দেশ্য  
সিদ্ধ হইল। কিন্তু ভারতবাসীর সম্মুখে যে সকল দুয়ার রুদ্ধ করিয়া কেবল একটি দুয়ার  
খলিয়া রাখা হইল, তাহাতে সমগ্র জাতি একটি কলম-পেবা যন্ত্রে পরিণত হইল।

দুর্ভাগ্যের কথা, বাধীন ভারতেও সেই অবরুদ্ধ দুয়ারগুলির সব করটি উন্মুক্ত হ' নাই। গণ-শিক্ষার দিক হইতে ভারতের অবস্থা হতাশাব্যঞ্জক। শতকরা দশ-বারোভাগ্যে মাত্র পাঠ্য। অবশ্য অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হওয়ায় এ সংখ্যা কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু তাহাতে ভারতের লাভ হইয়াছে কতটুকু? বাহার উচ্চশিক্ষা লাভ করিবার সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছেন, তাঁহারা যে শিক্ষা পান, তাহাতে দেশের বৈষয়িক উন্নয়নের কোন প্রয়োজনই বা মেটে? ছাত্রা কোটি জনসংখ্যার মধ্যে বৎসরে কয়েক হাজার স্নাতক লাভ করিলে কি দেশ কৃতার্থ হইবে? ডিগ্রী-ডিপ্লোমা হাতে তাহারা অবশেষে সকল দুয়ার হইতে প্রতীক্ষাভ্যস্ত হইবে। কেবলমাত্র কেরানীগিরি তাহাদের কতজনকে ভাগ্য-সংস্থান করিয়া দিতে পারে? কর্মসংস্থান-ক্ষেত্রে তাহাদের অধিকাংশই পড়িবে বাতিলের খাতায়। তাহার ফলে সমাজের সকল স্তরে অশান্তি ও বিক্ষোভ উঠিবে দান পাকাইয়া। আর, তখন অন্তর্দিকে ভারতের সার্বিক উন্নয়নের বিপুল সম্ভাবনার উপকরণ হাতে লইয়া ভারতের ভাগ্য-বিধাতা বসিয়া মুখ টিপিয়া হাসিবেন।

বাধীন ভারত ও  
শিক্ষার ধারা

শিক্ষা ও উন্নয়নের  
বৈচিত্র্য-সাধনের  
প্রয়োজনীয়তা

আসল কথা হইল, শিক্ষার সকল দুয়ার উন্মুক্ত করিয়া দিতে হইবে এবং তাহাতে ধনী-দরিদ্র—শ্রেণী-ভেদ করিলে চলিবে না। কারণ গরীবের ছেলেও তো বড়ো ডাক্তার কিংবা বড়ো ইঞ্জিনিয়ার হইতে পারে। তাই শিক্ষার ক্ষেত্রে চাই সমানাধিকার, চাই প্রতিভার পূর্ণ সম্ভাবহার। সেই সঙ্গে দেশের বৈষয়িক উন্নয়নের সকল দুয়ার খুলিয়া দিতে হইবে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া দেশময় ব্যাপক সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করিতে পারিলে এবং শিক্ষা-ব্যবস্থার বৈচিত্র্য সাধন করিয়া তাহার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধিয়া দিতে পারিলে শক্তির মর্যাদাসিক অপচয় অবরুদ্ধ হইবে এবং জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে উন্নতির বান ডাকিবে।

জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিবার উপযুক্ত আয়ুধে সজ্জিত হওয়াই আধুনিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। রবীন্দ্রনাথ তাই শান্তিনিকেতনের পাশে বিভিন্ন কারিগরী বিদ্যালয় কেন্দ্র শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাবের সঙ্গে ভাতের ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন সর্বদর্শী কবি। গান্ধীজী তাঁহার ওসার্দা পরিকল্পনায় যে কর্মক্ষেত্রিক শিক্ষার আয়োজনের নির্দেশ দিয়াছিলেন, তাহাকে বাস্তবায়িত করিলে তাহা ভাতির পক্ষে গৌরবজনক হইবে। আমাদের শিক্ষাকে গ্রন্থক্ষেত্রিক না করিয়া কর্মক্ষেত্রিক করিয়া তুলিতে হইবে, মুক্তিলাভ করিতে হইবে কেরানী-জীবনের ঘৃণ্য নাগপাশ হইতে।

শিক্ষা-সংস্থানের  
ভিত্তি ক হওয়া  
উচিত

ভারতে শিক্ষার নববিধান শিক্ষার বহুমুখিতা আনয়ন করিবার জন্ত এবং কলেজে-কলেজে ছাত্রদের ভিড় হ্রাস করিবার জন্ত বহুমুখী বিদ্যালয়সমূহের প্রতিষ্ঠা এবং জৈ-বার্ষিক ডিগ্রী কোর্স চালু করা হইয়াছিল। স্কুল-কাইন্ডাল বিদ্যালয়গুলির কিছু-সংখ্যক উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। বাহারা স্কুল-কাইন্ডাল পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইবে, তাহাদের জন্ত প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ-পুঁচী প্রবর্তিত হয়। তাহারা প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয়

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের সহিত ত্রৈ-বার্ষিক ডিগ্রী কোর্সে প্রবেশাধিকার লাভ করিতেছিল। ১৯৭৪ সালে আবার উচ্চ-মাধ্যমিক তৃতীয়া দিৱা স্কুল-কাইডাল চালু করা হইয়াছে। ইহাতে উত্তীর্ণ হইলে শিক্ষার নববিধান দুই বৎসর ইন্টারমিডিয়েট পড়িতে হইবে। তাহাতে পাস করিলে ত্রৈ-বার্ষিক ডিগ্রী কোর্সে প্রবেশাধিকার লাভ করিবে। তাহা হইলে পরিবর্তন কি হইল? এবং সেই পরিবর্তনের স্বকল অ্যুমরা কি পাইলাম?

এত করিয়াও স্কুল ও কলেজগুলিতে ছাত্র-সংখ্যা হ্রাস করা যায় নাই। এখনও শিক্ষক-পিছু ছাত্র-সংখ্যার অল্পপাত বিশাল। পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন এখন একটি প্রায় সার্বজনীন ব্যাপার। কিছুদিন পূর্বে ছাত্ররা পরীক্ষা-মন্দিরে বই লইয়া আসিত মগজের তলায়; এখন লইয়া আসে জামার তলায়। দুইটিই সমান অপরাধ। এই অপরাধ হইতে ছাত্রদের মুক্তি দিবার জন্য বিদ্যালয়-স্তরে নতুন পাঠ-শুচী চালু হইয়াছে; নতুন পরীক্ষা-রীতিও চালু হইবার কথা। পর্যায়ন-প্রথা [ graduation ] চালু না করিয়া নবরদান প্রথাকেই বহাল রাখা হইয়াছে। কারিগরী শিক্ষার অগ্রগতিও হতাশাজনক। শিক্ষক-সমাজের আর্থিক দুর্গতি এখনও ভয়াবহ। বলাবাহুল্য, এ পর্যন্ত শিক্ষাধাতে ব্যয়িত অর্থের ফলভোগ শিক্ষক বা ছাত্র—কাহারও ভাগ্যেই ঘটে নাই, ঘটয়াছে কেবলমাত্র মৃষ্টিময় কতকগুলি ঠিকাদারদের ভাগ্যে। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া

পরীক্ষা-সংস্কার ও  
ফলাফল

কমিটি-কমিশন গঠিত হইয়াছে, কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিয়া বিশাল-বিশাল ইমারত নির্মিত হইয়াছে। তাহা দেখাইয়া

শিক্ষাধাতে প্রচুর ব্যয় করা হইতেছে বলিয়া সরকারের সোচ্চার ঘোষণা কি ভারতের দরিদ্র জনসাধারণের সঙ্গে একটা স্কুল রসিকতা মাত্র নয়? গগনচুম্বী স্কুল-ভবন নির্মিত হইয়াছে, কিন্তু ল্যাবরেটরীতে যন্ত্রপাতি নাই, উপযুক্ত শিক্ষক নাই, খেলার মাঠ নাই—একেবারে অস্তঃসারশূন্য। এইভাবে আমাদের জাতীয় শিক্ষার অকাল-মৃত্যুর মড়ক ডাকিয়া আনা হইয়াছে। তাই আজ আমরা অগ্নে মরিতেছি, স্বাস্থ্যে মরিতেছি, বুদ্ধিতে মরিতেছি, চরিত্রে মরিতেছি। এই দেশব্যাপী মড়কের হাত হইতে আমাদের শিক্ষার কি মুক্তি নাই?

আসল কথা, বর্তমানে জাতীয় শিক্ষা ও জাতীয় উন্নয়ন হইয়াছে বিপরীতমুখী। ইহাদের একই খাতে প্রবাহিত করিতে পারিলে তবেই স্বকল পাওয়া যাইবে। অর্থাৎ, কেবল শিক্ষা-সংস্কারেই চলিবে না, তাহার সঙ্গে সমতা রক্ষা করিয়া ব্যাপক সুযোগ-সৃষ্টির জন্য দেশময় কর্মোন্মোচনের একটি জোয়ার আনিতে হইবে।

উপসংহার

তবে শিক্ষা-সংস্কারের পূর্ণ সফলতা লাভ করা যাইবে। শিক্ষক-সমাজের জীবনধারণের মান ও সামাজিক মর্যাদা উন্নীত করিতে হইবে এবং সর্বোপরি জাতীয় শিক্ষা ও জাতীয় উন্নয়নের মধ্যে স্থাপন করিতে হইবে একটি নিবিড় বোণ-বন্ধন। নচেৎ, জাতীয় অর্থ এবং শক্তির এই বিরাট অপচয় রোধ করা যাইবে না।

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- আমাদের শিক্ষা-সংস্কার
- ভারতের বৈবরিক উন্নয়ন ও শিক্ষা-সংস্কার

প্রবন্ধ-স্বত্ব: দুটো। ইংরেজি ভাষার  
প্রয়োজনীয়তা। ইংরেজি ভাষা-সর্বভার পরিণাম।  
জাতীয় স্পর্শ। মাতৃভাষার অভিব্যক্তি। শিক্ষা ও  
জীবনে মাতৃভাষা। চিন্তা-মুক্তি ও মাতৃভাষার সম্বন্ধ।  
মাতৃভাষার মুক্তি-আন্দোলন: বাংলাদেশ ও  
ভারতবর্ষ। বাংলা ভাষার মাধ্যমে পঠন-পাঠন।  
উপসংহার।

## শিক্ষার বাহনরূপে মাতৃভাষা

মাতৃভাষার মাধ্যমে ব্যতীত জাতির জন্মমুক্তি নাই। এতকাল আমরা বিদেশী  
ভাষার দাসত্ব গ্রহণ করিয়াছিলাম। দেশের মুষ্টিমেয় শিক্ষিত মানুষ সেই ইংরেজি  
ভাষায় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, জালাময়ী বক্তৃতা দিয়াছেন, বিভ্রমূলক আইনের খসড়া প্রস্তুত  
করিয়াছেন এবং দেশময় প্রবল হৈ-চৈ শুরু করিয়াছেন। ইংরেজি ভাষার সেই দুর্বোধ্য  
সাইক্লোনে দেশের অগণিত অশিক্ষিত জনসাধারণ দিশাধারা হইয়া  
হুতন

পড়িয়াছে। অর্থাৎ, সেই মুক্তি-যজ্ঞে জনসাধারণের আমন্ত্রণ ছিল  
না। দেশের সংখ্যা-গরিষ্ঠ মানবগোষ্ঠীকে ইংরেজি ভাষার কৃত্রিম গণ্ডির বাহিরে  
নিবাসিত রাখিয়া তাহারা শিক্ষা-নীকার, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, রাজনীতি-সমাজনীতিতে  
একটি নতুন সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিল। বলা বাহুল্য, দেশের মাটির  
সংস্কৃতি, দেশের জল-হাওয়ার সংস্কৃতি তাহার কোন যোগ-বন্ধন ছিল না। দেশের আপামর  
জনসাধারণ তাহাতে অংশ গ্রহণ করিতেও পারে নাই।

কিন্তু একদিন আমাদের জাতীয় জীবনে ইংরেজি ভাষারও প্রবেশজন ছিল। প্রাচীন  
কালের অন্ধকার-অপসারণ ও মুক্তা-মুক্তির জন্ত পাশ্চাত্য চিন্তা-সংঘাতের প্রয়োজন  
ছিল। বিশাল বিশ্ব হইতে নিবাসিত হইয়া আমরা এক অলোচন,  
ইংরেজি ভাষায়  
প্রয়োজনীয়তা।  
প্রাণহীন অন্ধরূপে নিমজ্জিত হইয়াছিলাম। নানা অন্ধ কুসংস্কারে  
পরিপূর্ণ সেই অচলায়তনকে বিধ্বস্ত করিল যুরোপীয় মনের জন্ম  
শক্তি। এ কথা আজ স্বীকার করিতেই হইবে যে, ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের হাত  
ধরিয়া আমরা আধুনিক রূপে পদার্পণ করিয়াছি।

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে আমাদের চিন্তা-মুক্তি ঘটিলেও এদেশে  
ইংরেজি ভাষা প্রবর্তনের মূল ছিল ভারতের মনোবিজ্ঞানের চক্রান্ত। সেই চক্রান্ত সফল  
হইয়াছে। কিন্তু তাহার ফলে এ দেশে যে নব-জাগরণ আসিল,  
ইংরেজি ভাষা-  
সর্বস্বত্ব পরিণাম  
তাহা আমাদের অতিরিক্ত লাভ। কিন্তু তাই বলিয়া বিদেশী ভাষা-  
সর্বস্বত্ব কোন জাতির পক্ষেই গৌরবজনক নয়। ইংরেজি ভাষার  
মাধ্যমে আমরা সূর্যের বিশ্বকে জানিয়াছি; কিন্তু আমরা আমাদের ঘরকে, ঘরের মানুষকে  
কিংবা ঘরের মানুষের স্নেহ-ধ্বংসকে জানিতে পারি নাই।

তাই স্কুল-কলেজে ইংরেজি ভাষার অবগুষ্ঠিত বিস্তার স্বভাবতই আমাদের মনের  
সহবর্তিনী হইতে পারে নাই। সেইজন্য আমরা যে পরিমাণ শিক্ষা পাইয়াছি, সে  
পরিমাণে বিজ্ঞা পাই নাই। আমাদের শিক্ষার ভোজে ঘটে তাই অপরিমেয় অপচয়।

## শিক্ষার বাহনরূপে মাতৃভাষা

সেই অপচর হইল শক্তির অপচর, সম্পদের অপচর, এক কথার আতীর অপচর।  
 রবীন্দ্রনাথ তাই অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলিয়াছিলেন, 'চারিদিকের  
 আবেহাওয়া থেকে এ বিজ্ঞা বিচ্ছিন্ন, আমাদের ঘর আর ইহুদের  
 মধ্যে দ্রোম চলে, মন চলে না।'

দীর্ঘকালের সংগ্রামের পব আজ আমরা পরাধীনতার নাগপাশ হইতে মুক্তি  
 লাভ করিয়াছি। আজ নিজের ঘরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কবিতে হইবে, সেখানে কত  
 দুঃখ, বেদনা ও দারিদ্র্যের স্বাক্ষর পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা দূর করিতে হইবে।

তাহা ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে সম্ভব হইবে না। সেখানে মাতৃ-  
 ভাষাকে আহ্বান করিতে হইবে। দেশবাসী দুঃখ-যন্ত্রণা ও  
 দারিদ্র্যের সিংহাসনে আজ আমাদের অবহেলিত মাতৃভাষাকে সম্মানে অভিষিক্ত  
 কবিতে হইবে। কাবণ, সাত্তসমুদ্র তেবোনদীর পাবেব ভাষা দিয়া আর যাহাই হউক,  
 মাতৃ পূজার বোধন-মন্ত্র কখনই রচিত হইতে পারে না।

‘আমরা যেভাবে জীবন নির্বাহ কবিব আমাদের শিক্ষা তাহার আত্মপাতিক নহে,  
 আমবা যে গৃহে আত্মতৃপ্তকাল বাস কবিব সে গৃহেব উন্নত চিত্র আমাদের পাঠ্যপুস্তকে  
 নাই, যে সমাজেব মধ্যে আবাদিগকে জন্ম স্থাপন করিতেই হইবে, সেই সমাজের কোন  
 উচ্চ আদর্শ আমাদের নূতন শিক্ষিত সাহিত্যেব মধ্যে লাভ করি না, আমাদের

শিক্ষা ও জীবনে  
 মাতৃভাষা  
 পিতামাতা—আমাদের স্বপ্ন-বন্ধু—আমাদের ভ্রাতাভ। কে তাহার  
 মধ্যে প্রত্যক্ষ দেখি না, আমাদের দৈনিক জীবনের কার্যকলাপ

তাহাব বর্ণনাব মধ্যে কেননা স্থান পায় না, আমাদের আকাশ এবং  
 পৃথিবী আমাদের নির্মল প্রভাত এবং সন্ধ্যা—আমাদের পরিপূর্ণ শত্রুক্ষেত্র এবং  
 দেশলক্ষ্মী শ্রোতবিনোব কোন্সংগীত তাহার মধ্যে ধ্বনিত হয় না, তখন বুঝিতে পারি  
 আমাদের শিক্ষার সহিত আমাদের জীবনেব তেমন নিবিড় মিলন হইবার কোনো  
 স্বাভাবিক সম্ভাবনা নাই। উভয়ের মাঝখানে একটা ব্যবধান থাকিবেই থাকিবে,  
 কিন্তু এ মিলন কে সাধন কবিতে পারে? বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য।’

যে ভাষায় শিশু মুখে বুলি কোটে, সে ভাষা তাহাব নিঃস্বাস-প্রশ্বাসের মতো  
 হৃৎস্পন্দনের সঙ্গে, তাহাব শোণিত-ধারার সঙ্গে মিশিয়া থাকে। মাতৃভাষায় ভাবপ্রকাশ  
 তাহার জন্মগত অধিকার। সেই ভাষাতেই তাহাব চিত্র মন্দির গঠিত সম্ভব। সোভিয়েট  
 রাশিয়া স্বতদিন তাহাব মাতৃভাষাকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে নাই, ততদিন  
 সে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আশাবরূপ অগ্রসব হইতে পারে নাই।

চিত্ত-মুক্ত ও মাতৃ-  
 ভাষার সঙ্গ  
 তাহাব আজ যে বিজ্ঞান-সাধনার চরম সমুন্নতি, তাহার মূলে  
 রহিয়াছে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার আয়োজন। বিজ্ঞানচার্য  
 সত্যেন্দ্রনাথ বসুর মতে, আমাদের পার্শ্ব জীবনের সকল ভাব-চিন্তা, আশা-আকাঙ্ক্ষার  
 সঠিক রূপায়ণ বাংলা ভাষার মাধ্যমে সম্ভব। বিশেষতঃ, যে ভাষায় মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র,  
 রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যেব দ্বিপালগণ তাহাদের প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ উপচার  
 দিয়া নৈবেদ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা কখনই ব্যর্থ হইতে পারে না।



পূর্ব-বাংলার মাতৃভাষার অসঙ্গত অধিকারকে ধ্বংস করিবার জন্য যখন চক্রান্ত হইয়াছিল, তখন কেবলমাত্র উদ্বুদ্ধ পাকিস্তানের স্বাধীনতা করার প্রস্তাবকে কেহ করিয়া সেখানকার জনগণের কোথ প্রচণ্ড বিক্ষোভের আকারে কাটিয়া পড়িল : 'বাংলা ভাষার কণ্ঠ রোধ করা চলিবে না।' তাহারা বুকের রুধির দ্বিত্বা মুখের ভাষাকে মাতৃভাষার মুক্তি- অতিথিত করিল। বুকের রক্তের মূল্যে তাহারা রক্ষা করিয়াছে আন্দোলন : বাংলাদেশ মাতৃভাষার পবিত্র অধিকার। ভারত-রাষ্ট্রেও মাতৃভাষার মর্যাদা ও তামিলনাড়ু রক্ষায় অগ্রণী হইয়াছে তামিলনাড়ু রাজ্য। অন্তরিক্ত সীমান্তের অপর পারে বাংলাদেশ বাংলা ভাষায় টেলিগ্রাম প্রেরণ, এমন-কি মুদ্র-লিখন যন্ত্র নির্মাণ সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। আমরা এখনও তাহা পারি নাই। সেদিক হইতে পশ্চিমবঙ্গ যে পশ্চাত্তরী, তাহা অনস্বীকার্য।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ, স্তার আশুতোষ প্রমুখ মনীষীগণের চেষ্টায় বহুদিন হইল উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার পঠন-পাঠন শুরু হইয়াছে। আবার, বিশ্ববিদ্যালয়-স্তরে উচ্চশিক্ষায়ও বাংলা ভাষার মাধ্যম সম্প্রতি স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। ইহা আশার কথা। কিন্তু এতদিন বিশ্ববিদ্যালয়-স্তরে বাংলা ভাষার বাংলা ভাষার মাধ্যমে পঠন-পাঠন মাধ্যম যে স্বীকৃতি লাভ করে নাই, তাহার মূলে ছিল বিভিন্ন বিষয়ে বাংলা ভাষায় উপযুক্ত গ্রন্থের অভাব। সম্প্রতি বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় গ্রন্থ-রচনার জন্য উপযুক্ত গ্রন্থকারদের সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ঘোষিত হইয়াছে। কাজেই, যোগ্যতা-সম্পন্ন ব্যক্তিদের এ বিষয়ে উদ্যোগী হইতে হইবে। সেই সঙ্গে উদ্যোগী হইতে হইবে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার সরকারী কার্যে বঙ্গভাষা ব্যবহারের একটি বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু সরকারী কার্যে বাংলা ভাষার প্রয়োগ-সাক্ষ্য এতদিনে যতখানি অগ্রসর হওয়া উচিত ছিল, সরকারী আমলাদের চক্রান্তে তাহা সম্ভব হয় নাই। তাহারা বাংলা ভাষাকে দূরে সরাইয়া

রাখিয়া ইংরেজিকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বহাল রাখিতে চায় এবং সরকারী কার্যে ইংরেজি শিক্ষিতদের একাধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিতে চায়। তথাপি আমরা প্রার্থনা করি, মাতৃভাষার মাধ্যমে আমাদের জাতীয় শিক্ষা ও জাতীয় জীবন—এই দুইয়ের মধ্যে এক নিবিড় যোগসূত্র স্থাপিত হউক। এইবার 'মাতৃভাষার অপবাদ দূর হোক, যুগশিক্ষার উদ্বল ধারা বাঙালীচিন্তের শুভ নদীর রিক্ত পথে বান ডাকিয়ে, বয়ে যাক, দুই কূল জাগ্রত পূর্ব চেতনায়, ঘাটে ঘাটে উঠুক আনন্দ-ধ্বনি।'।

এই প্রবন্ধের অন্তঃসরণে লেখা যায় :

- মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান
- 'বিনা স্বদেশীভাষা মিটে কি আশা ?'
- 'মোদের পরব মোদের আশা আ-মরি বাংলা ভাষা'
- বুকের রুধির মুখের ভাষা

প্রবন্ধ-সূত্র : সূচনা। অতীত ভারতে বৃত্তি-  
শিক্ষা। ভারতের বর্ণাশ্রম সমাজ ও বৃত্তি-শিক্ষা।  
ইংরেজ-আমলে কারিগরী-শিক্ষার পরিণতি।  
বাহীন ভারতে বৃত্তি-শিক্ষা ও বৃত্তি-নির্বাচন।  
কারিগরী-শিক্ষার উপকারিতা। অপকারিতা।  
উপসংহার।

## বৃত্তি-শিক্ষা ও বৃত্তি-নির্বাচন

আজ ভারতের দিকে দিকে দারিদ্র্যের হাহাকার। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির  
যাহা কিছু সম্ভব ছিল, ইংরেজ সমস্ত কিছু ধ্বংস করিয়া তাহাকে একটি দীনতার বিস্তীর্ণ  
ধ্বংসভূপুরুষে পরিভাষ্য করিয়া গিয়াছে। সে ভারতের কৃষি ও শিল্প-সম্পদকে ধ্বংস  
করিয়া তাহার চরম সর্বনাশ সাধন করিয়া গিয়াছে। ভারতের সেই উন্নত কারিগরী  
শিক্ষা, যাহা ভারতের প্রতিটি পরিবারের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য  
সূচনা।

বিধান করিত, তাহা আজ কোথায়? ভারতের সেই প্রখ্যাত  
শিল্পী-কারিগরেরা, যাহারা তাহাদের কুশলী কলা-নৈপুণ্যে বিশ্বের মনোরঞ্জন করিত,  
তাহারাই বা কোথায় গেল? ভারতের এই সর্বব্যাপী দারিদ্র্যের পিছনে রহিয়াছে  
তাহার কারিগরী-শিক্ষার অভাব, তাহার কারিগরী-শিক্ষার অবলুপ্তি।

অথচ কারিগরী-শিক্ষার দ্বারা লোকে একদা ঘরে বসিয়াও তাহার জীবিকা-নির্বাহের  
ব্যবস্থা করিতে পারিত। তাঁতী তাঁত বুনিয়া, ডোম বুড়ি-চুবড়ি-খামা-কুলো ইত্যাদি  
তৈয়ারী করিয়া, মৃৎশিল্পী নানা প্রকারের মাটির পুতুল তৈয়ারী করিয়া জীবিকা অর্জন  
করিত। তাহাদের হাতের তৈয়ারী জিনিসপত্রের স্মৃতি রুচিবোধ ও গভীর কারিগরী

জ্ঞানের পরিচয় থাকিত মুক্তিত। স্বদেশে-বিদেশে সেই সমস্ত দ্রব্য-  
সামগ্রী বিক্রয় হইত উচ্চমূল্যে এবং অর্থনৈতিক শক্তি বিনিময়ের  
উপর প্রতিষ্ঠিত হইত প্রতিটি পরিবার। তাহার ফলে সমগ্র

সমাজে একটা সচ্ছলতার হাওয়া বহিত। ঘরে আসিত স্বথ, আসিত শান্তি। প্রাচীন  
ভারতের স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতির মূল চাবিকাঠি ছিল ইহাই। আজ আমরা ভাগ্যের  
নির্মম পরিহাসে তাহা হারাইয়া জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন একটি শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু  
করিয়া জাতিকে কেবল কেরানীগিরির দিকে পথ-নির্দেশ করিতেছি। এক দিগন্তে  
রহিল শিক্ষা, অত্র দিগন্তে দারিদ্র্য-অভিশপ্ত জীবন; ইহাতে জাতির মুক্তি কোথায়?

প্রাচীন ভারত ছিল বর্ণাশ্রম ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। স্ব-স্ব বৃত্তি অহুয্যী ব্রাহ্মণ,  
কজ্রিয়, বৈশ্য ও শূত্র—এই চারিটি বর্ণের উদ্ভব হইয়াছিল। পরিবারের বৃত্তি ছিল

বংশাধিকারিক। বংশ বংশ ধরিয়া একই বৃত্তির অহুয্যীলানে প্রত্যেক  
পরিবারই হইয়া উঠিত এক-একটি শ্রেষ্ঠ বৃত্তিমূলক শিক্ষারতন।

পিতা পুত্রকে তাহার নিজস্ব কারিগরী বিদ্যা ও অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞান  
দান করিয়া বাইতেন। এইভাবে যুগায়ুগান্তর ধরিয়া অহুয্যীলিত ও কবিত হইবার ফলে  
প্রাচীন ভারত এক বিশ্বব্যাপী কারিগরী উৎকর্ষ ও শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিল।

ভারতের বর্ণাশ্রম  
সমাজ ও বৃত্তি-শিক্ষা

তারপর আসিল ইংরেজ। নানা কলকারখানা জাত পণ্যসামগ্রী লইয়া ব্রিটিশ বাণিজ্য-স্বাহাজ আমাদের উপকূলে আসিয়া ভিড়িল। ইতিহাস বলে, সে আমাদের পণ্যসামগ্রীর কারিগরী উৎকর্ষের আকর্ষণে এদেশে বাণিজ্য করিতে ছুটিয়া আসিয়াছিল। শক্তিমান ইংরেজ আমাদের সেই সনাতন কারিগরী শিক্ষা-নিকেতনের উপর হানিল ইংরেজ-সামলে প্রথম আঘাত। তাহাদের শিল্পজাত পণ্যের সহিত প্রতিযোগিতায় কারিগরী-শিক্ষার আমাদের কারিগরদের হাতের তৈয়ারী শিল্পদ্রব্য পরাজিত হইল। পরিণতি বিলাতী পণ্যের চাকচিক্য আমাদের মনোহরণ করিল এবং আমরা আমাদের ঘরের লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলিয়া বিদেশী পণ্যের প্রতি আকৃষ্ট হইলাম। যে কারিগরী-শিক্ষার সাক্ষ্যে আমরা অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিয়াছিলাম, তাহা হারািয়া বিদেশী-প্রবর্তিত ডিগ্রীর মোহে আকৃষ্ট হইয়া স্বাধীন জীবিকার পরিবর্তে পরাধীন কেরানীগিরির তত্ত্ব উমেদারী করিতে লাগিলাম।

তারপর পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমামী হৃতসর্বস্ব ভারতীয়দের একদিন জ্ঞান-চক্ষুর উন্মেষ ঘটিল। সেদিন তাহার 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' মাধায় তুলিয়া লইল। ম্যাক্সটার-বাকিংহাম পরিত্যক্ত হইল। ঘরের ছেলে বহুদিন পরে ঘরে ফিরিয়া আসিল। ইতিমধ্যে দেশ স্বাধীন হইয়াছে। স্বাধীন ভারতে বৃত্তি-শিক্ষার গুরুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। শিক্ষার নব-বিদানে বিনিয়াদী শিক্ষা প্রাথমিক পাঠ-সূচীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। শৈশব-শিক্ষার প্রারম্ভ হইতে যাহাতে শিশুরা কারিগরী-শিক্ষায় দক্ষতা অর্জন করিতে পারে, তাহার জন্য বিনিয়াদী বিদ্যালয়গুলিতে ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষকেরা তাহাদের এ বিষয়ে শিক্ষাদান করেন। তাহা ছাড়া, বহু কারিগরী বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যে সব ছাত্র উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে অসমর্থ, অথচ কারিগরী-শিক্ষায় উৎসাহী, তাহারা কারিগরী বিদ্যালয়ে উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিয়া কর্ম-জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে। ইহার দ্বারা ভারতের বেকার-সমস্যার কিছুটা সমাধান হইতেছে। কিন্তু এই জাতীয় বিদ্যালয়ের সংখ্যা দেশে আরও বর্ধিত হওয়া উচিত।

কারিগরী-শিক্ষা কেবল জাতির অর্থনৈতিক বিনিয়াদই রচনা করে না, তাহাকে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিও দান করে। ইহার দ্বারা সমাজের প্রতিটি পরিবার অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিতে পারে। জাতির সুখ ও সমৃদ্ধি রচনা করিয়া কারিগরী-শিক্ষা দেশের সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ গঠন করে। ইহা বেকার-সমস্যার তীব্রতা হ্রাস করিয়া নানা

অশান্তির সম্ভাবনাকে বিলুপ্ত করে। কারিগরী-শিক্ষা ব্যাপকভাবে কারিগরী-শিক্ষার প্রচলিত হইলে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত ভিড় হ্রাস পাইবে। উপকারতা এক কথায়, কারিগরী-শিক্ষা ভারতের জায় দরিদ্র দেশের হাতে

তুলিয়া দিবে দারিদ্র্য-বিষয়ের স্থানশিথ হাতিয়ার। আজ দেশের তরুণ-সমাজ যে অন্তর্ধান নৈরাশ্র ও শূণ্যতাবোধের মধ্যে ভবিষ্যৎ-জীবনের কোন স্থানশিথ প্রতিক্ষণিত না পাইয়া দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে, বৃত্তি-শিক্ষার ব্যাপক আয়োজনের মধ্যে তাহারা তাহাদের স্থানশিথ ভবিষ্যৎকে খুঁজিয়া পাইবে। ধীরে ধীরে তাহাদের মনে নৈরাশ্র ও

শূন্যতাবোধ কাটিয়া গিয়া পূর্ণ দায়িত্ববোধ বিকশিত হইয়া উঠিবে। কলে, দেশব্যাপী আন্দোলনের কিছুটা উপশম ঘটিবে। তাহা ছাড়া, বৃত্তি-সাধনার মধ্য দিয়া রতের অবহেলিত কুটির-শিল্প পুনর্জীবন লাভ করিবে এবং জাতির সম্মুখে অর্থনৈতিক সচ্ছলতার এক নতুন দিগন্ত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে।

কারিগরী-শিক্ষার অপকারিতাও আছে। ইহা মানুষকে বড় বেশী বাস্তবমুখী করিয়া তোলে। রূঢ় বাস্তবের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে মানুষ স্বল্প ও উচ্চ চিন্তা হইতে বিরত হইয়া পড়ে এবং ধীরে ধীরে ক্রিয়াক্রান্তি ও ক্রান্তি আসিয়া তাহাদের হৃদয় ও মন অধিকার করিয়া বসে। শিল্পী-কারিগরের জীবন ক্রমে ক্রমে যান্ত্রিক ও গতানুগতিক হইয়া পড়ে।—এই অপপ্রচারের দ্বারা আমাদের বিদেশী ঐতর্য্য এতদিন এদেশে কারিগরী-শিক্ষার প্রবর্তনকে বিলম্বিত করিয়াছে। আমরাও তাহাদের অভিসন্ধিপূর্ণ অপপ্রচারে ভুলিয়া প্রতারিত হইয়াছি। কিন্তু বোঝা উচিত ছিল যে, শূন্য উদরে উচ্চ চিন্তা বেশীদিন চলে না। দলে দলে শিক্ষিত বেকার দিয়া রাস্তার চৌমোহানায় কী উচ্চ চিন্তার বিকাশ হয়, জানি না এবং তাহার গতানুগতিকতায় যদি ক্রান্তি না আসে, তবে কারিগরী-শিক্ষার দ্বারাও ক্রান্তি আসিবে না। অবশ্য, অপকারিতা

বৃত্তিমান্নেরই অমুখীলনে আছে যান্ত্রিকতা, আছে গতানুগতিকতা। যান্ত্রিকতা ও গতানুগতিকতার ভয়ে যদি তরুণেরা বৃত্তি-চর্চা হইতে বিরত হয়, আপন মেধাশক্তির সামর্থ্যকে উপেক্ষা করিয়া যদি উচ্চশিক্ষার জগৎ কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিড় করে, তবে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অপর তিলধারণের স্থান থাকিবে না, পরীক্ষায় অকৃতকার্যের সংখ্যা হইবে ক্রমবর্ধমান, শিক্ষার মানও অবনমিত হইয়া পড়িবে এবং দেশে বেকার-সমস্তার তীব্রতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। পরিণামে সমগ্র দেশে দেখা দিবে চরম অর্থ-সংকট। অলস কর্ম-বিমুগ্ধদের নিকট বাহা গতানুগতিকতা, তাহাই উৎসাহী ও উজ্জ্বলদের হৃদয় বিশেষজ্ঞ হইয়া উঠিতে সাহায্য করিবে এবং নতুনত্বের দ্বারা প্রতিদিন পুরাতনের অভিষেক হইবে।

একথা আজ স্বীকার করিতেই হইবে যে, ভিগ্রির মোহ বা চাকুরির মোহ জাতির কর্মদক্ষতাকে, তাহার কলা-নৈপুণ্যকে পঙ্গু করিয়া ফেলে। একটা বিশাল জাতির বৃত্তি কেবল পরাধীন চাকুরিগিরিতে সম্ভব নয়। তাই আজ কারিগরী-শিক্ষা বা বৃত্তিমূলক শিক্ষার রুদ্ধ দুয়ারগুলি একে একে উন্মুক্ত করিয়া দিতে হইবে। উপসংহার কারিগরী-শিক্ষা জাতীয় জীবনের ভিত্তি-প্রস্তর রচনা করিয়া দিবে এবং তাহার ফলে দূর হইবে দীর্ঘকালের পরাধীনতার বেদনা এবং বহু শতাব্দীর দৈন্ত ও দারিদ্র্যের অভিশাপ। ‘ভারত আবার জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।’

এই প্রবন্ধের অন্তঃসরণে লেখা যায় :

- বৃত্তি-শিক্ষা
- কীবিকামূলক শিক্ষা
- বৃত্তিমূলক শিক্ষা
- কারিগরী-শিক্ষা

প্রবন্ধ-সূত্র : হুচনা। কটোগ্রাফিক ও ম্যাজিক লঠন। চলচ্চিত্রের আবিষ্কার : এডিসন ও ইস্টম্যানের অবদান। শব্দ-কটোগ্রাফিক। চলচ্চিত্রের বৈশিষ্ট্য দায়িত্ব। বিশ্বালয়ের চলচ্চিত্র : যুরোপে, আমেরিকায় ও ভারতে। ভারতীয় চলচ্চিত্রের রুচি-বিকৃতি ও তাহার পরিণাম। উপসংহার।

## শিক্ষা-বিস্তারে ও

## সমাজ-জীবনে চলচ্চিত্র

উ. মা. '৩২

শিক্ষা-সম্প্রসারণ ও আনন্দ-পরিবেশন—এই বৈশিষ্ট্য যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মাধ্যমে সংসাধিত হইতেছে, তাহার নাম 'চলচ্চিত্র'। প্রমোদমূলক শিল্প হিসাবে ইহার জনপ্রিয়তা ক্রমসম্প্রসারণশীল। চলচ্চিত্র-শিল্প আজ সমাজের সর্বস্তরের উপর যে অত্যাশ্চর্য প্রভাব বিস্তার করিয়া চলিয়াছে, তাহাঁই হুচনা নিঃসন্দেহে বিশ্বব্যাপক। ইহার সর্বব্যাপী প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া এবং মান্না-মন্দির আকর্ষণের দুর্ব্যবহার কালে আমাদের চিরাচরিত রন্ধমন্ডলের আবেদন-জলুস ও আশ্রয় নিশ্চিত। ইহার আবেদনের মনোহারিত্ব ও সার্বজনীনতা ইহাকে শিক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যমের মর্যাদা দান করিয়াছে। বিশেষতঃ, লোকশিক্ষার ক্ষেত্রে ইহার সাফল্যের সম্ভাবনা অসামান্য।

আজ চলচ্চিত্র আমাদের কাছে আর বিশ্বয়ের বস্তু নয়। কিন্তু একদিন এমন ছিল, যেদিন ছবির মানুষ হাত-পা-মুখ নাড়িয়া রক্ত-মাংসের জীবন্ত নরনারীর মতো কথা বলিতে পারে, গান গাহিতে পারে—ইহা ছিল এক পরম বিশ্বয়ের ব্যাপার। চলচ্চিত্র আবিষ্কারের পূর্বে আবিষ্কৃত হইয়াছিল কটোগ্রাফিক। আর ছিল ম্যাজিক লঠন। পর্দায় প্রতিকলিত নিশ্চল ছবির সঙ্গে চলিত কথকতার মতো নীতিগত বন্ধুতা। তাহাও সেদিন লোকশিক্ষা ও লোক-রঞ্জনের দৈব ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল।

মানবের চক্ষু-তারকায় কিভাবে ছবি প্রতিকলিত হয়, সে সম্বন্ধে গবেষণায় রত পিটার মার্ক রজেক্ট নামক জনৈক বিজ্ঞানী আবিষ্কার করিলেন যে, মানুষের চক্ষু-তারকায় বস্তুর যে প্রতিবিম্ব পড়ে, বস্তুটি চক্ষুর সম্মুখ হইতে অপসারিত হইবার পরেও কিছুক্ষণ পর্যন্ত ঐ প্রতিবিম্ব স্থায়ী হয়। এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিল চলচ্চিত্র শিল্প। চলচ্চিত্রে যে চিত্র প্রতিকলিত ও প্রদর্শিত হয়, তাহা কল্পে দ্রুত-গৃহীত কয়েকটি ছবির সমষ্টি মাত্র। ক্রমাগতই গৃহীত গতিশীল ভঙ্গীর প্রতিটি চিত্র ক্রমাগতই সাজানো থাকে—যন্ত্রের সাহায্যে দ্রুত আবর্তনের কালে ছবির পর ছবি আসিয়া পর্দায় পড়ে এবং সেই চলমান গতিটি তখন আমাদের মান্না-বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। প্রতিটি ছবি যদি কিছুক্ষণ অন্তর পর্দায় প্রতিকলিত করা যায়, তখন আর ছবির গতি থাকে না। এই শিল্পের পূর্ণাঙ্গ রূপ দিলেন আমেরিকার শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী এডিসন। তবে এই কার্যে কটোগ্রাফিক-আবিষ্কর্তা ইস্টম্যান তাঁহাকে প্রচুর সাহায্য করিয়াছেন। এডিসন আমেরিকায় তাঁহার ল্যাবরেটরিতে সর্বপ্রথম এই চলন্ত ছবি দেখান ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে।

কটোগ্রাফিক ও  
ম্যাজিক লঠন

চলচ্চিত্রের আবিষ্কার :  
এডিসন ও ইস্টম্যানের  
অবদান

ভারপর শিল্পী ও বিজ্ঞানীরা কাজে লাগিয়া গেলেন। সেলুলয়েড কিতার  
র মুদ্রিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্র-সম্বলিত রীল চিত্রক্ষেপণ-যন্ত্রের [ Projector ] দ্বারা তীব্র  
লাকের সাহায্যে পর্দার উপর বড় করিয়া প্রতিকলিত করিয়া ছবি দেখানো হইতে  
লাগিল। চলন্ত ছবি দেখিতে বেশ ভিড় জমে দেখিয়া ব্যবসায়ীরাও  
শব্দ-কটোগ্রাফি তাহার পূর্ণ স্বযোগ গ্রহণ করিল—ক্রমশঃ স্রষ্টা হইল সবাক  
চলচ্চিত্র। ছবির কটোগ্রাফের পাশে পাশে সেলুলয়েডের ফিল্মের উপর Sound  
Photograph বা শব্দেরও কটো উঠিতে লাগিল। তখন আর কি! গল্প, উপন্যাস,  
বীটিক, অভিনয় ইত্যাদি নিত্য-নূতন আনন্দের আয়োজনে যোগ দিল লোক-লোক লোক।

চলচ্চিত্রের আনন্দ-বিতরণী ও চিত্র-বিনোদিনী ক্ষমতা অসামান্য। তাই চলচ্চিত্র  
ভাষার ভূমিষ্ঠ-লগ্ন হইতেই লোক-রঞ্জনী ভূমিকায় নিয়োজিত রহিয়াছে। আনন্দাভিলাষী  
কর্মরাস্ত্র মানুষের দর্শনেন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করিয়া নূতন কর্মোত্তম ও কর্ম-  
প্রেরণা সঞ্চারে তাহার জুড়ি নাই। কিন্তু সেই ভূমিকাতেই চলচ্চিত্রের সকল দায়িত্ব  
অবসিত হয় নাই। সকল শিল্পের কাছে যেমন সমাজের একটা দাবি আছে, চলচ্চিত্র-  
শিল্পের কাছেও তেমনি আছে সমাজের মহত্তর দাবি। তাহা হইল চলচ্চিত্রের দ্বিতীয়  
ভূমিকা—লোকশিক্ষা। ছায়াচিত্র আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষাদানে  
চলচ্চিত্রের বৈত দায়িত্ব অধিভার। বিশেষতঃ, ভারতের মতো দেশে, যেখানে নিরক্ষরের  
সংখ্যা সামগ্রিক জন-সংখ্যার সত্তর-শতাংশ, সেখানে চলচ্চিত্রের ভূমিকা অত্যন্ত  
সম্ভাবনাপূর্ণ। শিক্ষাকে মানুষের দৃষ্টিশক্তির সহিত তুলনা করা হয়। শিক্ষাহীন মানুষ  
অন্ধ। কিন্তু নিরক্ষর মানুষ জ্ঞানদৃষ্টিহীন হইলেও মানবিক-দৃষ্টি-সম্পন্ন। সেই দৃষ্টিতে  
অক্ষর নিষ্ফল হইতে পারে, কিন্তু চিত্র নিষ্ফল হয় না। এইখানেই চিত্রের সার্বজনীনতা।  
চলচ্চিত্র আবার চলমান জীবনের শিল্পিত বিবৃতি। সকল মানুষের দৃষ্টিতেই রহিয়াছে  
তাহার সার্বজনীন আবেদন। ভারতের উচিত ইহার পূর্ণতম স্বযোগ গ্রহণ করিয়া  
লোক-শিক্ষার জনপথ উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া।

বিজ্ঞানতনুগুণিতে চলচ্চিত্র-ব্যবহারের সাক্ষ্য বিস্ময়কর। যুরোপ ও মার্কিন দেশে  
প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে সাক্ষ্যের সহিত চলচ্চিত্র ব্যবহৃত হয়। জার্মানীর  
বিদ্যালয়গুলিতে চলচ্চিত্রের ব্যবহার সর্বাধিক। সোভিয়েট রাশিয়াও এ-বিষয়ে যথেষ্ট  
অগ্রসর। ইংলণ্ডের বিদ্যালয়গুলিতে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে ভূগোল, ইতিহাস, প্রাকৃতিক  
বিজ্ঞানে চলচ্চিত্র : বিজ্ঞান, জীব-বিজ্ঞা ইত্যাদি বিষয়ে অত্যন্ত সরল ও সহজভাবে শিক্ষা  
য়ুরোপে, আমেরিকায় দান করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা-কাষে, বিশেষতঃ বিজ্ঞানচর্চার  
ও ভারতে চলচ্চিত্রের ভূমিকা অনবদ্য। ইংলণ্ডের বৃত্তিমূলক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানেও  
চলচ্চিত্রের ব্যবহার বহুল। কিন্তু ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ একান্তভাবে  
নৈরাশ্রজনক। আমাদের দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে চলচ্চিত্রকে প্রয়োগ করা হয় নাই। চলচ্চিত্র  
আমাদের দেশে কেবল বিলাসের সামগ্রী, জাতি-গঠনে ও চিত্তের উত্তোষনে ইহার যে  
ভূমিকা আছে, তাহা রাষ্ট্র কর্তৃক পুরোপুরি উপেক্ষিত। কেবল বিজ্ঞানতনুগুণিতেই নয়,  
সমগ্র সমাজের শিক্ষার দায়িত্ব বহনে চলচ্চিত্রের তুলনা নাই। বাহারা নিরক্ষর, তাহাদের

কাছে সংবাদপত্র মূল্যহীন; কিন্তু চলচ্চিত্র সেই হতভাগ্যদের অজানতার অন্ধকার হইতে জ্ঞানের আলোতে লইয়া আসিতে পারে। পৃথিবীর নানা বৈচিত্র্যময় রূপ, দেশ-বিশেষের মানুষের জীবন-যাত্রা-পদ্ধতি, ইতিহাস-বিশ্রুত ঘটব্য স্থান ইত্যাদি আমরা ইহার সাহায্যে প্রত্যক্ষ করিয়া আমাদের জ্ঞান-ভাণ্ডার প্রশমিত করিতে পারি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারতে নির্মিত চলচ্চিত্রগুলির লোক-রঞ্জনী ভূমিকা বাহাই থাকুক, শিক্ষামূলক ভূমিকা নগণ্য। ভারত সরকারের কিন্মা ডিভিশন প্রযোজিত উচ্চশিক্ষণী কিন্মাগুলির প্রচারমূলক ভূমিকা যতখানি, শিক্ষামূলক ভূমিকা ততখানি নয়।

ভারতীয় চলচ্চিত্রের শিক্ষামূলক ভূমিকা তুচ্ছ হইলেও তাহার কৃষিক্ষেত্র, স্বাস্থ্যের ভূমিকা অসামান্য। সেই দিক দিয়া কিন্মা সেন্সর বোর্ডের দায়িত্ব অর্পিত হইলেও কুর্কচিপূর্ণ চলচ্চিত্রের স্বাস্থ্যের ধারা অব্যাহত। ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রযোজক-পরিচালকদের ভারতীয় চলচ্চিত্রের নির্লজ্জ অর্থ-লিপ্সার কাছে সমাজের রুচিবোধ ও নৈতিক চরিত্র রুচি-বিকৃতি ও তাহার আজ বলি দেওয়া হইয়াছে। ভারতীয় চলচ্চিত্রে নাই কোন স্বস্থ পরিণাম

সবল জীবনাদর্শের বলিষ্ঠ প্রতিকলন, নাই কোন মহৎ হৃদয়-বৃত্তির রূপায়ণ, নাই উদার চরিত্র-মহিমা, নাই বাস্তব জীবনের বিখ্যাত প্রতিকল্পবি; কোন উচ্চতর শিল্প-স্বস্তার উপস্থাপনাও দুর্লভ। আছে কেবল অস্থস্থ মনোবিকার, দেহ-কামনার উন্মত্ত উল্লাস, যৌন-বিলাসের নিরাবৃত্ত প্রকাশ। ইহাতে প্রযোজক-পরিচালকদের অর্থাগমের পথ সুগম হইয়াছে বটে, কিন্তু জাতির সর্বনাশ সাধিত হইতেছে।

ভারতীয় চলচ্চিত্র আজ বিশ্ব-বিজয় সমাপ্ত করিয়াছে। বাঙ্গালী চলচ্চিত্র-পরিচালক সত্যজিৎ রায়ই সেই সাকল্যের পথিকৃৎ। কিন্তু একদিকে যেমন ভারতীয় চলচ্চিত্রের গৌরব সাত-সমুদ্র তেরো নদীর পারকে স্পর্শ করিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি ভারতীয় চলচ্চিত্রের ব্যর্থতা প্রকটিত হইয়া পড়িয়াছে। ভারতীয় চলচ্চিত্রকে রুচি-বিকারের রাহ গ্রাস করিয়াছে। সর্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয়, ভারতে চলচ্চিত্রের উপযুক্ত শ্রেণী-বিস্তার নাই। সোভিয়েট রাশিয়া, ইংলও প্রভৃতি রাষ্ট্রে কারখানার শ্রমিক-সমাজ এবং বিদ্যালয়ের ছাত্র-সমাজের জন্য পৃথক পৃথক চলচ্চিত্রের ব্যবস্থা রহিয়াছে। কিন্তু ভারতে

সেরূপ কোন ব্যবস্থা নাই। যে চিত্র কারখানার শ্রমিক-সাধারণ উপন্যাসের দেখিয়া চিত্ত-বিনোদন করে, সেই চিত্র দেখিবার জন্য দুঃখপোষ বালকেরাও দলে দলে ভিড় করে। যে অশ্লীলতা কারখানার শ্রমিকদের মনোরঞ্জন করে, তাহা যে অল্পবয়স্ক বালকদের চারিত্রিক সর্বনাশ সাধন করে, তাহা এই দুর্ভাগ্য দেশে কেহ ব্রিতে চায় না। তাই দেখা যায়, 'কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য' নির্মিত ছবি দেখিবার জন্য প্রাপ্তবয়স্কদের ভিড় নিয়ন্ত্রণে পুলিশবাহিনীকে আহ্বান করিতে হয় ইহাতে চলচ্চিত্র-নির্মাতা, সরকার, শিক্ষক, ছাত্র ও অভিভাবক—কাহারও লজ্জা মাথা কাটা যায় না। 'সত্য সেলুঁকাস, কি বিচিত্র এই দেশ !!'

এই প্রবন্ধের অন্তিমের লেখা যার :

- শিক্ষা সম্প্রদায়ের চলচ্চিত্র, উ. মা. '৬২
- চার্যাচর ও সমাজ-জীবনে তাহার প্রভাব
- ছায়াছবির স্বকল ও কৃষল

এবং-মুক্ত : মুক্তা। ভারতে নারী-শিক্ষা  
ও নারী-স্বাধীনতা : বৈদিকযুগে ও বৌদ্ধযুগে।  
বখাযুগে ভারতীয় নারী। উদ্বিগ্ন শতাব্দীতে  
নারী-মুক্তির আন্দোলন। স্বাধীন ভারতে নারী-  
শিক্ষা ও নারী-প্রগতি। নারী-প্রগতির মূলমন্ত্র।

১৯২৫

## আন্তর্জাতিক নারী-বর্ষ

“নারীকে আগুন-ভাগ্য জয় করিবার  
কেন নাহি বিবে অধিকার ?”

—রবীন্দ্রনাথ

১৯২৫ সাল। আন্তর্জাতিক নারী-বর্ষ। আজ নবযুগের নবীন প্রভাতে দিকে  
নারী-প্রগতির জয়ধ্বনি বিবোধিত হইতেছে। নারী পূর্বে ছিল পুরুষের ভাগ্যের  
ভাগ সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। নারীর কোন স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকৃত ছিল না। নারীর পরিচয়  
ছিল কখনও কন্যারূপে, কখনও ভগ্নীরূপে, কখনও পত্নীরূপে, কখনও মাতারূপে। সর্বত্রই  
ছিল তাহার নিঃসহায় গলগ্রহতার প্রকটিত রূপ। স্বর্ষের বিষয়, নারী আজ আর  
সেই বিগত শতাব্দীর অন্ধকারাচ্ছন্ন অন্তঃপুরে মৌন জ্ঞান মুখে বসিয়া নাই। সে সেই

আলোহীন, প্রাণহীন দুর্ভেদ্য অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া আজ  
হয়।  
আলোকিত জগতের উদার প্রান্তরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। পৃথিবীর  
প্রগতি ধারার সহিত সমান তালে নারীও চলিয়াছে। দ্রুত পদবিক্ষেপে। প্রাণাধুনিক  
কালে নারী ছিল অন্তরালবর্তিনী, অস্বপ্নমুখা। যে দুর্জয় চালক-শক্তি তাহাকে  
পাষাণ-পুরীর অন্ধকার হইতে মুক্ত করিয়া আধুনিক জগতের আলোকিত প্রান্তরে দাঁড়  
করাইয়াছে, তাহা হইল আধুনিক শিক্ষা। সেই শক্তিবলে নারী আধুনিক যুগে লাভ  
করিয়াছে আপন ভাগ্য জয় করিবার দুর্লভ অধিকার।

আজ যে বাহিরের জগতে নারী-স্বাধীনতার উজ্জ্বল আলো ছুড়াইয়া পড়িয়াছে,  
সেখানে যুগ-যুগান্তরের অবশুষ্ঠনবতী ভারতীয় নারীরাও উপস্থিত। প্রাচীন ভারতে  
বৈদিকযুগে নারী-স্বাধীনতা স্বীকৃত ছিল সমাজে। নারী-শিক্ষারও ছিল অবাধ  
অধিকার। ব্রহ্মবাদিনী, লোপামুদ্রা, বিশ্ববারা, গার্গী, মৈত্রেয়ী,  
নারী-স্বাধীনতা : অরুণভী প্রমুখ মহীয়সী নারীদের নাম ইতিহাসে স্বর্ণাকরে  
বৈদিকযুগে ও লিখিত আছে। নারী সেদিন পুরুষের শুধু সহধর্মিণীই ছিলেন না,  
বৌদ্ধযুগে সহকর্মিণীও ছিলেন। এমন-কি, বেদের আলোকিত বিদ্যায় ছিল  
ঐশ্বর্যের সমান অধিকার। উপবীত-ধারণে, বৈদিক মন্ত্র-রচনায় তাঁহারা স্রবঙ্গীরা  
হইয়া আছেন। বৌদ্ধযুগেও নারীর সম-অধিকার ছিল স্বীকৃত। হুজ্বাতা, হুপ্রিয়া,  
হুম্মিয়ার নাম বৌদ্ধধর্ম-প্রচারের ইতিহাসে অল্পান মহিমা-স্বাক্ষর ও ভাস্বর। শিক্ষা-  
শিক্ষায়, কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে তাঁহারা ছিলেন প্রাণসর।

ভারতের আঙ্গিনা মুসলমান-যুগ। এবার শিক্ষা ও স্বাধীনতার উজ্জ্বল জগৎ হইতে  
বঞ্চিত হইয়া নারী হইল অন্তরালবর্তিনী, নিষ্কণ্টক হইল স্ত্রীভেদ অন্ধকারময়  
অন্তঃপুরের পাষাণ-বেষ্টনীর মধ্যে। বাহিরে স্বর্ষ উঠিয়াছে, স্বর্ষ ডুবিয়াছে। মুগ্ধ



আবর্তিত হইয়াছে। কিন্তু নারীজাতি 'যেই তিমিরে, সেই তিমিরে' রহিয়াছে পড়িয়া। সেই চরম অগোরবের মধ্যে তাহাদের মুক্তির আহ্বান আসে নাই, উন্মুক্ত হয় নাই পাষণ-কারার রুদ্ধ দ্বার। অশিক্ষা, হুশিক্ষা ও আচার-অহুষ্ঠানাদির কুসংস্কারকে নিত্য সজী করিয়া তাহারা যাপন করিয়াছে নিত্যই গৌরবহীন জীবন। জগদ্বল পাষণের মতো সমাজের বাহিরের সকল পরাভবের গ্লানি তাহাদিগকেই বরণ করিতে হইয়াছে।

প্রগতির সকল পথ অবরুদ্ধ হওয়ায় এ দেশের মানহীনা নারী-মধ্যগ্রে ভারতীয় নারী

প্রাণহীন আচার-কুসংস্কারের মধ্যে আত্মনিয়োগ করিল। স্ত্রীশিক্ষা তাহাদের গ্রাস করিল কৌলিষ্ঠ-প্রথা, বাল্য-বিবাহ-প্রথা ও সতীদাহ প্রভৃতি নানা নিষ্ঠুর প্রথার নিষ্ঠুরতম শাসন। জীবনের সকল প্রকার বহমানতা হারাইয়া, জগতের প্রগতির ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাহারা তাহাদের নিস্তরঙ্গ জীবনে প্রথারুগতোর অজস্র জঞ্জাল জমাইয়া সমাজকে একটি ঘৃণ্য নরককুণ্ডে পরিণত করিল।

তারপর প্রগতির জয়ধ্বজা উড়াইয়া আমাদের শরের দ্বারে আসিল আধুনিক যুরোপ। যুরোপের সঙ্গে ভারতের বাধিল চিত্ত-সংঘাত। তাহাদের জন্ম শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সভ্যতার অভিবাতে আমাদের স্ববির সমাজের উপকূলে জাগিল প্রচণ্ড তরঙ্গ-বিস্ফোভ। পুরুষ-সমাজে সেই জাগৃতির ঢেউ আসিয়া লাগিল প্রথমে। তারপর নারী-সমাজকে স্পর্শ করিল সেই তরঙ্গ-সংঘাত। প্রকৃতপক্ষে, উনবিংশ শতাব্দীতে যদিও সকল বন্ধন-

মুক্তির নেতৃত্ব পুরুষেরা গ্রহণ করিয়াছে, তবু স্বরণ রাখিতে হইবে উনবিংশ শতাব্দীতে নারী-মুক্তির আন্দোলন যে, সকল সামাজিক মুক্তি-আন্দোলন বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে নারী-সমাজকে কেন্দ্র করিয়া। রামমোহন সতীদাহ-প্রথার উচ্ছেদ

আনিলেন, বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন এবং তৎসহ নারী-শিক্ষার আন্দোলন আনিলেন প্রাচীন-স্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়। সহস্র যুগের বন্দি নারী অন্ধ-তামসিকতার অচলায়তনে শিকল-দেবীর পূজাবেদীতল হইতে আলোকোজ্জ্বল বহির্বিষয়ের উদার প্রাক্ষেপে আসিয়া দাঁড়াইল। এত আলো, এত জীবন।—তাহারা এই প্রথম দেখিল। আত্মশক্তিতে উবুদ্ধ নারী সেদিন উচ্চারণ করিল—‘আমি নারী, আমি মহীয়সী!’

তারপর দেশে নারী-শিক্ষার অগ্রগতির জন্ত স্থল-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। নারী-জাতির চিত্তোন্মেষ ঘটিতে লাগিল নব নব জ্ঞানের স্পর্শে। ভারতের চিত্ত-শতদল একে একে বিকশিত হইতে লাগিল। আসিল ভারতের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রাম। জাতির সেই মুক্তি-সংগ্রামে নারীরা আসিয়া পুরুষদের পাশে স্থান গ্রহণ করিল। স্বাধীন

ভারতে নারী-শিক্ষার অগ্রগতি অব্যাহত আছে। সকল প্রকার স্বাধীন ভারতে নারী-শিক্ষা ও নারী-প্রগতি শিক্ষার-দীক্ষার, কর্ম-সংস্থানে নারী-জাতির সমানাধিকার আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। নারী-জাতিকে অন্তঃপুরচারিণী করিয়া সমগ্র সমাজ

বে পক্ষাঘাত-দূরে হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার অবসানে আজ নারী-জাতির প্রতি দৃষ্টি-ভরী মৌলিক পরিবর্তন আসিয়াছে। নারী আজ আপন ভাগ্য জয় করিবার পাইয়াছে পূর্ণ অধিকার। বিজ্ঞান, সাহিত্য, চিকিৎসা, ইঞ্জিনিয়ারিং, সাংবাদিকতা, রাজনীতি ইত্যাদিতে আজ আমরা আধুনিক যুগের স্ব-প্রতিষ্ঠ নারীকে দেখিতে পাই।

## আন্তর্জাতিক নারী-বর্ষ

উন্নত মানসিকতা-সম্পন্ন সবল, বলিষ্ঠ জাতি-গঠনের জন্য নারী-জাতির শিক্ষা প্রগতি অত্যাবশ্যক। যে হাত দোলনা দোলায়, সেই হাতই বিশ্ব শাসন করে। শিশু জীবনে জননীর শিক্ষা ও প্রগতিশীলতার প্রভাব অনস্বীকার্য। তাহা ছাড়া, সমানে অর্ধাংশকে বহির্বিষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত রাখা কেবল সামাজিক অপচয় নয়, আত্মহত্যার সামিল। কাজেই, সমাজে নারী-জাতিকে যুগে সহবর্তীণী করিতে হইবে। কেবল নারী-জাতির প্রয়োজনেই নয়, পুরুষের প্রয়োজনে-সমাজের সামগ্রিক প্রয়োজনে নারী-জাতির উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষা, মুক্তি-মানসিকতা আৱশ্যিক। আমরা চাই শিক্ষায়-দীক্ষায়, ক্রুটি ও সংস্কৃতিতে উজ্জল পরিবার এবং সেই স্বাধীন, সন্তুষ্ট ও আদর্শ পরিবার-রচনায় নারীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই

সেক্ষেত্রে নারী-শিক্ষা প্রসারের গুরুত্ব সন্দেহাতীত। তাহাতে নারী-প্রগতির মূলতত্ত্ব সামাজিক অচলায়তন সৃষ্টির সকল সম্ভাবনাও বিলুপ্ত হইবে কিন্তু নারী-শিক্ষার আদর্শ কি হওয়া উচিত? আমাদের দেশে পরিবারই সমাজে কেন্দ্র-বিন্দু এবং নারী হইল পরিবারের সক্রিয় নিয়ামক শক্তি। তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া আমাদের পরিবার-চক্র আবর্তিত হইয়া চলে। প্রতি পরিবারের নারীকে তা সাহিত্য, ভূগোল, গণিত, ইতিহাস, গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান, শিশু-মনস্তত্ত্ব, সৃষ্টিশিল্প এবং রন্ধনশিল্প ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষাদান করিতে হইবে। সেই সঙ্গে উচ্চশিক্ষার দুয়ার উন্মুক্ত রাখিতে হইবে প্রতিভাসম্পন্ন নারীদের জন্য। আসল কথা, আমাদের সমাজে চাই আদর্শ জননী, চাই আদর্শ কন্যা। আন্তর্জাতিক নারী-বর্ষের শিক্ষা তো তাহাই।

আমরা বিশ্বাস করি, নারী-জাতির মুক্তির মধ্য দিয়া আমাদের সমাজের বহু যুগের অনড় অচল রথচক্র আবার সচল হইয়া উঠিবে। কাজেই, আমাদের সমাজের প্রয়োজনে আদর্শ পরিবার-গঠনের প্রয়োজনে, এমন-কি, আদর্শ জীবন-গঠনের প্রয়োজনে চাই উপযুক্ত নারী-শিক্ষা। সেই নারী-শিক্ষা নারী-প্রগতির পথ নির্মাণ করিয়া দিবে, নারীর ভাগ্যরচনার হইবে প্রধান হাতিয়ার। কিন্তু সেই নারী-প্রগতির অর্থ যথেষ্টাচার নয়। আমরা চাই নারীর মেধা ও বুদ্ধির সহিত তাহার ঐক্য ও মহত্বের সুসমঞ্জস বিকাশ।

সোভিয়েট রাশিয়ার মহাকাশচারিণী ভ্যালেন্টিনা তেরেসকোভার উপসংহার মতো ভারতীয় নারীও বিশ্বসন্মান অর্জন করুক। কেবল মাত্রলিক-বোধহীন, বীধন-হেঁড়া নিরুদ্দেশ প্রগতির মোহে ছুটিয়া চলিলে তাহাতে নারীর মুক্তি নাই, তাহার মুক্তি সামাজিক কল্যাণের মত্রে উদ্ধৃত হইয়া আদর্শ পরিবার-রচনায়। ভারতীয় নারী ঘর আর বাহির, অন্তঃপুর ও বহির্বিষ—এই দুয়ের মধ্যে উপযুক্ত যোগবন্ধন রচনার মধ্য দিয়া স্ব-মহিমায় বিকশিত হইয়া উঠুক, তাহার পত্ত-পবিত্র কল্যাণ-সাধনায় কল্যাণত্ৰিমণ্ডিত হইয়া উঠুক আন্তর্জাতিক নারী-বর্ষ

এই প্রবন্ধের অমুসরণে লেখা যাব :

- নারী-শিক্ষা
- বর্তমান ভারতে নারী-শিক্ষার রূপ
- স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-বাণীবৃত্তা
- ভারতে নারী-প্রগতি

**এবং-মুদ্র :** মূচনা। ভারতের ভৌগোলিক বিশালতা ও সীমান্ত-রেখার বিস্তৃতি। ভারতের যুদ্ধ-বিরোধী জীবন-দর্শন। প্রাচীন ভারতে সামরিক শিক্ষা। মোঙ্গল ও ব্রিটিশ আমলে সামরিক শিক্ষা। স্বাধীন ভারতের যুদ্ধ-বিরোধী মনোভাব ও সামরিক শিক্ষার বিপর্যয়। বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা। কলাকল বিচার। উপসংহার। ৯৭

## হাত-জীবনে সামরিক শিক্ষা

ক. প্রা. '৩৩

হুদীর্ঘ দুই শতাব্দীর পরাধীনতার অবসানে ভারত লাভ করিয়াছে তাহার দুর্লভ স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা অর্জন করিতে তাহাকে কত অমূল্য প্রাণ বলি দিতে হইয়াছে, কত দুঃসহ ক্লম্মসাধন ও দুঃখবরণ করিতে হইয়াছে।

হুদনা

ভারতের এই কষ্টাক্রান্ত স্বাধীনতাকে অপহরণ করিবার জন্য, কণ্ঠরোধ করিয়া তাহাকে হত্যা করিবার জন্য আজ চারিদিকে চলিয়াছে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কত বড়যন্ত্র। ভারতকে আজ তাহার সেই দুঃখ-লব্ধ স্বাধীনতাকে রক্ষা করিতে হইবে। তাহার জন্য চাই উপযুক্ত শিক্ষা, চাই উপযুক্ত প্রস্তুতি।

ভারত-রাষ্ট্রের ভৌগোলিক বিশালতার দিকে দৃষ্টি-ক্ষেপণ করিলে ভারতে সামরিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা যে 'কত গুরুত্বপূর্ণ, তাহা সহজে অহুত্ব হইবে। তাহার ভৌগোলিক বিস্তৃতি যেমন বিশাল, তাহার সীমান্ত-রেখাও তেমন হুবিস্তৃত। দেশবিভাগের পর সেই সীমান্ত-রেখা আরও প্রসারিত হইয়াছে। পূর্ব ও পশ্চিমে যে প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল দুর্ভেদ্য, তাহা পড়িল পাকিস্তানের ভাগে। আর, ভারতের ভাগে পড়িল তাহার বিনিময়ে হুদীর্ঘ সমতল-সীমান্ত, যাহার প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা না করিয়া ভারতের উপায় নাই। তাহা ছাড়া, স্বাধীনতা-লাভের পর পাকিস্তানের জঙ্গী-শাসন ক্রমাগত সেই প্রয়োজনীয়তাকে দিয়াছে আরও বাড়াইয়া। অন্তরিক, ভারতের 'উত্তরপ্রাচ্য দিশি নগাধিরাজ হিমালয়ের' প্রাকৃতিক পার্বত্য বন্ধুরতাও আজ আর নিভরযোগ্য নয়। এই আলোকে ভারতের সামরিক প্রস্তুতির গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

ভারতের ভৌগোলিক বিশালতা ও সীমান্ত-রেখার বিস্তৃতি

ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে ভারত চিরকালই সামরিক ক্ষেত্রে গৌরবহীন। মাঝে মাঝে তাহার ব্যতিক্রম লক্ষিত হইলেও তাহার ইতিহাস এই অভিমতের অহুত্বই সাক্ষ্য দেয়। সে কদাচিৎ তাহার বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারিয়াছে।

ইতিহাস সাক্ষী, ভারত কোনদিন পররাজ্য আক্রমণ করে নাই। শুধু তাই নয়, যখন কোন বৈদেশিক শক্তির দ্বারা সে আক্রান্ত হইয়াছে, তখনই তাহার প্রতিরক্ষার বাহু তাসের প্রাঙ্গণের মতো তানিয়া পড়িয়াছে। পরাভব এবং পর-দাসত্বের কলঙ্ক হইয়াছে তাহার ললাট-লিপি। ভারতের এই-যে দুর্ভাগ্য, তাহার মূলে আছে তাহার নিরুবেগ, পরলোক-বিশ্বাসী জীবন-দর্শন। সেই যুদ্ধ-বিরোধী জীবন-দর্শনই তাহার প্রতিরক্ষা-প্রস্তুতির বেদনাবহ অবহেলার জন্য দায়ী।

ভারতের যুদ্ধ-বিরোধী জীবন-দর্শন

তথাপি প্রাচীন কাল হইতে ভারতের সামরিক প্রগতি আরোজন কম ছিল না। বেদ-বেদান্ত শিক্ষার পাশাপাশি প্রবাহিত ছিল সামরিক শিক্ষার ধারা। কিন্তু সেই সামরিক শিক্ষা লাভের অধিকার ছিল কেবলমাত্র ক্ষত্রিয়-সন্তানদের। বলাবাহুল্য, সেই সামরিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল নিরঙ্কুশ রাজশক্তির স্বাধিষ্ণু রক্ষা, জাতি-কলহে কিংবা

প্রাচীন ভারতে  
সামরিক শিক্ষা

প্রতিবেশী রাজ্য-কলহে জয়লাভ। আর, সমাজের বৃহত্তম শক্তি শূদ্র-সন্তানেরা মহাভারতের একলব্যের মতো দক্ষিণ হস্তের বুদ্ধাঙ্গুষ্ঠ গুরু-দক্ষিণা দিয়া চির-পশুত্ব বরণ করিয়াছে। তাহাতে ভারতের

সামরিক শক্তি হইয়াছে চির-দুর্বল। অতীতকালে, ক্ষত্রিয়-সীমিত সামরিক শক্তি জাতি-কলহে কিংবা প্রতিবেশী-সংঘর্ষে হইয়া পড়িয়াছে হীনবল। তারপর যখন প্রবল বহিঃশত্রুর দল দুর্বীর বন্তার মতো ভারতের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে, তখন সেই বহিঃশত্রুর আক্রমণে পরাজয়ই হইয়াছে তাহার ভাগ্য-লিপি।

মোগল-আমলে সামরিক শিক্ষার তেমন কোন উন্নতি হয় নাই। যেটুকু হইয়াছিল, তাহার কৃত্তিহের দাবিদার হইলেন বাবর, শেরশাহ এবং আকবর। কিন্তু তাহাও ছিল গতানুগতিক সময়-কোণলের জীর্ণ পুনরাবৃত্তি। তবে ব্রিটিশ আমলে দুই-এক স্থানে আধুনিক পদ্ধতিতে সামরিক শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল মাত্র।

মোগল ও ব্রিটিশ-  
আমলে সামরিক শিক্ষা

তাহাতে ভারতীয়রা যোগদান করিয়া আধুনিক সময়-নীতি আয়ত্ত করে। ইংলণ্ডের সামরিক শিক্ষায়তনে তাহার শিক্ষা লাভেরও অধিকারী হইয়াছিল। পরে দেখা গিয়াছে, ভারতীয় যুবকরা স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমানবাহিনী—সামরিক বিভাগের সকল শাখাতেই উজ্জল কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে।

স্বাধীন ভারতে নানা কারণে সামরিক শিক্ষার প্রতি একটা প্রতিকূল মনোভাবের সৃষ্টি হইয়াছিল। অহিংসা, নিরপেক্ষতা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান-নীতির প্রতি আনুগত্যই

স্বাধীন ভারতে যুদ্ধ-  
বিরোধী মনোভাব ও  
সামরিক শিক্ষার  
বিপর্যয়

ভারতের সেই সামরিক দুর্বলতার মূল কারণ। তাই বলিয়া বর্তমান জগতে এই নীতিগুলির কি কোন মূল্যই নাই?—আছে। কিন্তু সেই সঙ্গে স্মরণীয় যে, মহামতি অশোকের সম্মতান শান্তি ও অহিংসা-নীতির উপর অতি-নির্ভরতা পরবর্তীকালে সাম্রাজ্যিক

পতনকে অনিবার্য করিয়া তুলিয়াছিল।

ভারত পররাজ্য আক্রমণ করিবে না, কিন্তু বহিঃশত্রুর আক্রমণও বরদাস্ত করিবে না—ইহাই তাহার সোচ্চার ঘোষণা। বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে তাহার স্বাধীনতার প্রদীপ-শিখাকে রক্ষা করিবার জন্য ভারত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্ষায়ে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার প্রবর্তন করিয়াছিল। এন. সি. সি. ও

বাধ্যতামূলক  
সামরিক শিক্ষা

এন. সি. সি. আর. সময়-শিক্ষার্থীবাহিনীতে প্রত্যেক সমর্থ ছাত্রদের যোগদান বর্তমানে স্বেচ্ছামূলক। ছাত্রগণ ইচ্ছানুযায়ী স্থল, নৌ বা বিমান—সময়-শিক্ষার্থী বাহিনীতে যোগদান করিতে পারে। এ বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় সৈনিক-স্কুল রহিয়াছে দেয়াছেন। আহমদনগরে আছে বার্লিক যুদ্ধ-কৌশল শিখাইবার ব্যবস্থা। বিমানবাহিনীর শিক্ষাকেন্দ্র আছে দেয়াছেন ও দাখলোরে।

ভারতে সমর-শিক্ষা বর্ডিনির খেঁজাবৃত ছিল, ততদিন নৈগূণ্য বা কৃত্রিম প্রদর্শন ছিল সীমাবদ্ধ। সীমান্ত-সংকটের প্রেক্ষাপটে ব্যাপক সমর-শিক্ষার মাধ্যমে তাহা সম্প্রসারিত হয়। কেবল তাহাই নহে, যে দেশ-প্রেম ছিল স্থপ্ত, আজ তাহা সামরিক শিক্ষার সুযোগে হইয়াছে জাগ্রত। সীমান্তে যে ভারতীয় জওয়ানেরা দেশের নিরাপত্তা-রক্ষায় ব্যাপক, তাহারা যে একা কিংবা অসহায় নয়, তাহাদের পশ্চাতে কল্যাণকর বিচার রহিয়াছে বিপুল সম্ভাবনাময়, উপযুক্ত শিক্ষার শিক্ষিত এবং সদা জাগ্রত যুব-সম্প্রদায়, তাহা আজ স্পষ্ট এবং তাহা আজ অগ্রগামী সৈন্তবাহিনীর দৃঢ় মনোবলের ভিত্তিভূমি রচনা করিয়াছে। ইহারা প্রয়োজনবোধে আগামীকাল তাহাদের স্থলাভিষিক্ত হইতে পারিবে।

ভারতে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা বহু সমালোচনার সম্মুখীন হইয়াছিল। যেখানে ছাত্রসমাজের একাংশ দরিদ্র, কায়ক্লেশে যাহাদের গ্রাসাচ্ছাদন ও শিক্ষা-ব্যয় সংগ্রহ করিতে হয়, সেখানে তাহাদের উপরে এই সামরিক শিক্ষার হরহ গুরুভার চাপাইয়া দেওয়া অসম্ভব। তাহা ছাড়া, মুসোলিনী-হিটলারের জায় জঙ্গী-নীতি প্রবর্তনের দ্বারা দেশের জনমনের স্বকোমল বৃত্তিগুলিকে কণ্টরোধ করিয়া হত্যা করিলে দেশের সামূহিক সর্বনাশ যে অবশ্যজ্ঞাবী, ইহা অনেকেই স্থচিত্তিত অভিমত। কারণ, লাইকারগাসিজম স্পাটাকে যতই শক্তিশালীরূপে গড়িয়া তুলুক, বিশ্বের শ্রদ্ধা আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিল এখেলার শিল্প-সৌন্দর্যের নব নব উপহার। তবু স্বাধীন রাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রয়োজনে

উপসংহার

সামরিক শক্তি-বৃদ্ধি নিঃসন্দেহে আবশ্যক। পরাধীনতার ক্ষত-চিহ্নগুলির তিন্ত যন্ত্রণা আমরা আজও ভুলিতে পারি নাই। আমাদের সামরিক দুর্বলতার সুযোগে বহিঃশত্রুরা বাঁরে বাঁয়ে আমাদের স্বাধীনতা অপহরণ করিয়া আমাদের চোখে-পায়ে দাসত্বের শৃঙ্খল পরাইয়া দিয়াছে—ভারতের ইতিহাসে রহিয়াছে তাহার বেদনালাদক সাক্ষ্য। কাজেই, ভবিষ্যতে যাহাতে আমাদের স্বাধীনতা দুর্ধর্ষ বিদেশী দস্যুদের হাতে অপহৃত না হয়, তাহার জন্য উপযুক্ত সামরিক শক্তি-সংগঠন আমাদের দরকার। তাই স্বাধীন ভারতে ব্যাপক সামরিক শিক্ষা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু সামরিক শক্তির উপর আত্যন্তিক প্রাধান্ত আবার দেশের বিপদ ডাকিয়া আনিতে পারে—সে বিষয়েও আমাদের সতর্ক থাকিতে হইবে। ইতিমধ্যে তাই ভারতে সামরিক শিক্ষাকে খেঁজাবৃত করা হইয়াছে।

এই প্রবন্ধের অন্তঃসরণে লেখা যায় :

- দেশরক্ষায় ছাত্রদের কর্তব্য
- সামরিক শিক্ষা ও জাতীয় প্রতিরক্ষা-বাহিনী
- ভারতে দেশরক্ষার প্রস্তুতি

প্রবন্ধ-সূত্র : পূচনা । ছাত্র-সমাজের অপরাধে  
শক্তি । ছাত্র-সমাজ ও সামাজিক নেতৃত্ব । ভারতে  
ছাত্র-সমাজ । লোকসেবার ছাত্র-সমাজ । ছাত্র-  
সমাজের বেচ্ছাবৃত লোকসেবা । লোকসেবার ছাত্র-  
সমাজের একটি হৃদয়িত কার্যকরী । উপসংহার ।

## সমাজসেবা ও ছাত্র-সমাজ

ট. বা. '৩৩

সবুজ, সতেজ ছাত্র-সমাজ জাতির সর্বাপেক্ষা বলিষ্ঠতম অংশ । নবীন প্রাণশক্তির  
অফুরন্ত উচ্ছ্বাসে ভরপুর তাহাদের দেহমন ; হৃদয়ে তাহাদের অসীম দুঃসাহস, 'বাহতে  
নবীন বল' । তাহাদের চক্ষে উদ্দীপনার জলন্ত মশাল, বক্ষে অসম্ভবকৈ 'চ্যালেঞ্জ'  
করিবার দুর্বার প্রতিশ্রুতি । সজীবতার এমন বলিষ্ঠ প্রকাশ সমাজের অন্য কোন অংশে  
দেখা যায় না । প্রাণ-প্রাচুর্যে-ভরা এই তরুণ গরুড়ের দল অসীম  
পূচনা

শক্তি ও সম্ভাবনার প্রতীক । সামাজিক স্বাধীনতা, প্রগতি ও  
কল্যাণের স্বার্থে জীবন-বলিদানের জন্ত তাহারা চির-অস্বীকারবদ্ধ । যখন সমাজের  
অগ্রান্ত অংশ অজগর-নিদ্রায় নিমগ্ন, তখনই ছাত্র-সমাজের ঘুম ভাঙে । যুগে যুগে ছাত্র-  
সমাজের ইতিহাসে রহিলছে তাহার উজ্জল সাক্ষ্য । সমাজের অগ্রদূত, অসত্য ও  
প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে তাহাদের চিরন্তন সংগ্রাম । যেখানে বাধা-বৈদন্যের হাাহাকার, আর্ন্ত-  
পীড়িতের ক্রন্দন-রোল, সেখানেই ছাত্র-সমাজের নির্ভীক উপস্থিতি ।

সামাজিক শক্তির এই সর্বাপেক্ষা সতেজ অংশটি পৃথিবীর দেশে দেশে উপেক্ষিত ।  
সামাজিক নেতৃত্বের দায়িত্বভার ধূসর বার্ষিকের পশ্চিম দিগন্তে পুঞ্জিত হওয়ায় জীবন-  
প্রভাতের পূর্ব-দিগন্ত সর্বদাই অবহেলিত হইয়া থাকে । অথচ এই ছাত্র-সমাজের মধ্যে  
যে শক্তি-সম্ভাবনার অপরাধের উৎস নিহিত রহিয়াছে, তাহা বিকাশের যথাযোগ্য  
সুযোগ লাভ করিলে এবং পূর্ণভাবে ব্যবহৃত হইতে পারিলে বহু  
অসাধ্য সাধিত হইতে পারে, সামাজিক কল্যাণের রুদ্ধধার  
উদ্ঘাটিত হইতে পারে । কিন্তু দুঃখের বিষয়, জরাগ্রস্ত সমাজ এই

ছাত্র-সমাজের  
অপরাধের শক্তি

দুর্জয় শক্তির সন্ধান রাখে না, কোন মহত্তর সামাজিক কল্যাণের মন্ত্রে ইহাকে  
অনুপ্রাণিতও করে না । কলে, বাহা হইবার, তাহাই হয় । যে শক্তি সামাজিক  
কল্যাণকর্মে নিয়োজিত হইয়া সোনা ফলাইতে পারিত, তাহা নানা অবাক্রিত বিধি-  
নিষেধ ও নৈকর্ম্যের প্রাচীরে প্রতিহত হইয়া সামাজিক অকল্যাণের অতিমুখে ধাবিত  
হয় ও নানা সমাজ-বিরোধী কার্যকলাপে মাতিয়া উঠে ।

তবে দোষ কাহাকে দিব ? সাধারণতঃ ছাত্র-সমাজের স্বার্থেই এই দোষের দায়ভাগ  
চাপাইয়া দেওয়া হয় । কিন্তু অকর্মণ্য অতিভাকত্বের পরিণামেই যে তরুণ ছাত্র-সমাজ  
আজ বিপথগামী, তাহা অস্বীকার করিবে কে ? আসল কথা  
হইল, ছাত্র-সমাজ স্বতঃস্ফূর্ত জীবনী-শক্তির ভোক্তা । তাহাদের  
মাঝে গতির আহ্বান, কর্মের নেশা, সৃষ্টির মহোদ্যাস । কিন্তু

ছাত্র-সমাজ ও  
সামাজিক নেতৃত্ব

নেতৃত্বের দিগন্তে জরা এবং বার্ষিক্য, অনড় অচলায়তনের লৌহ-প্রাচীর । সামাজিক  
অতিভাবকদের দিক-নির্দেশ ও কর্ম-প্রবর্তনার অভাবে অফুরন্ত গতি ও কর্মোদ্যোগ

উৎস ছাত্র-সমাজ স্থায়ী বিপরীত বিপক্ষে ধ্বংসের নেপায় মাতিয়া উঠে। ছাত্র-সমাজের এই ধ্বংসমূলক কার্যকলাপ অবশ্যই নিম্ননীয়; কিন্তু সামাজিক নেতৃব্দের জড়তা ও নৈকর্য্যও কি প্রশংসাবোধ্য ?

কাজেই, অতি-সাম্প্রতিককালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছাত্র-সমাজের উচ্ছ্বলতা ও বিপথগামিতার জন্য ছাত্র-সমাজ যতখানি দায়ী, তদপেক্ষা অধিক দায়ী জড়তাগ্রস্ত সামাজিক নেতৃত্ব। দেশগৌরব স্থতাবচনও একদিন গভীর আক্ষেপে বলিয়াছিলেন, আমাদের দেশে ছাত্র-সমাজ গৃহে ভৎসনার পাত্র, বিদ্যালয়ে শাসনের পাত্র এবং সমাজে উপেক্ষার পাত্র। কেবলই ভৎসনা, শাসন ও উপেক্ষা আমাদের ভারতে ছাত্র-সমাজ হতভাগ্য ছাত্র-সমাজের ভাগ্য-লিপি। উপযুক্ত নেতৃব্দের অভাবে,

শুভকর্মে আহ্বানের অভাবে অফুরন্ত প্রাণশক্তির দুর্ঘর প্রকাশ ছাত্র-সমাজ যখন উচ্ছ্বল হইয়া অন্ততকর্মে লিপ্ত হয়, তখন চারিদিকে প্রবল চিংকার ধ্বনিত হইয়া উঠে। কিন্তু সমাজের বোকা উচিত, দোষ কাহার? দোষ সমাজেরই। কারণ, কোনকালেই আমাদের ছাত্র-সমাজকে শুভ কর্মপথে চলিবার মত্রে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলা হয় নাই।

ভারতের মতো দেশে, যেখানে সাধারণ মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্যের অন্ত নাই, অশিক্ষা-কৃশিকার গুরুতাপে যেখানে নিরানন্দ মরুভূমি তাহার স্থায়ী আসন কায়েম করিয়া বসিয়াছে, যেখানে রোগ-তাপ-জর্রতায় এবং প্রাকৃতিক দৈব-দুর্বিপাকে কোটি-কোটি মানুষের জীবন বিপন্ন, অসহায়, সেখানে ছাত্র-সমাজের ভূমিকা অসামান্য। অর্থাৎ, ভারতের মতো দারিদ্র্য-জর্রর, রোগ-জর্রর, সমস্তা-জর্রর দেশে ছাত্র-সমাজের সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে লোকসেবার বিস্তীর্ণ প্রান্তর। প্রকৃতির নিষ্করণ রুদ্ররূপে এদেশে

লোকসেবায়  
ছাত্র-সমাজ

মানুষের দুঃখ-দুর্গতির অন্ত নাই। বন্যা-প্রাধান-জলোচ্ছ্বাস এবং ভূমিকম্প-দুর্গিবাত্যা-ধ্বংসের কালে প্রতি বৎসরই ভারতে বহু মানুষের জীবন বিপন্ন হইয়া পড়ে। তাহা ছাড়া, দূর্ভিক্ষ ইত্যাদি মহাশয়-সৃষ্ট

মহাবিপত্তিসমূহ তো আছেই। দীর্ঘকালব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের শোষণ, অনিয়ন্ত্রিত প্রাকৃতিক শক্তির আকস্মিক আক্রমণে এবং অর্থ নৈতিক দুঃখ-দুর্দশার ভয়াবহ পরিণামে প্রতিনিয়ত জনগণের ভাগ্যে ঘনাইয়া আসে দুঃখের অমারাজি। বিপন্ন মানবতার আর্ত হাহাকারে আকাশ-বাতাস যখন পূর্ণ হইয়া উঠে, অকাল-মৃত্যুর হাতে অসহায় জনগোষ্ঠীর অক্ষম আত্মসমর্পণে যখন বেদনার অশ্রুসিক্ত ইতিহাস রচিত হয়, তখন আমাদের দেশের ছাত্র-সমাজের কি কিছুই করণীয় নাই ?

লোকসেবায় অনুপ্রাণিত হইবার জন্য যখন সমাজ বা রাষ্ট্র ছাত্র-সমাজকে আহ্বান করে না, তখন ছাত্রগণ স্বেচ্ছাবৃত্তভাবেই অনেক সময় লোকসেবায় ঝাঁপাইয়া পড়ে।

ছাত্র-সমাজের  
স্বেচ্ছাবৃত্ত লোকসেবা

মানুষের অসহ দুঃখ-বেদনার নীরব দর্শক হইয়া তাহার কিছুতেই থাকিতে পারে না। দুঃখ-সংকটের আবর্ত-ঝঞ্ঝে নিজের নিজের করিয়া বিপন্নের উদ্ধারে রচনা করে আত্মত্যাগের নতুন ইতিহাস।

ছাত্রসমাজ যতাবতই লোকসেবার ব্রতধারী। সেকথা সমাজ অনায়াসে স্বীকার করে। ব্রতার্ঘ বা দূর্ভিক্ষ-পীড়িতদের সেবায় টিকিনের পরশা দিয়া কি ছাত্ররা জ্ঞান-তহবিল

গড়িয়া তোলে না? দলবদ্ধভাবে রাস্তার রাস্তার ঘুরিয়া কি তাহারা আর্ড-পীড়িতের সেবার সাহায্য সংগ্রহ করিয়া বেড়ায় না? জীবন বিপন্ন করিয়া কি তাহারা অজ্ঞান, এলাকার ছুটিয়া যায় না? ‘চারিটি শে’র ব্যবস্থা করিয়া, সারাদিন রিকশা চালাইয়া, এমন-কি জুতা পালিশ করিয়া তাহারা আর্ডসেবার রাখে গৌরবোজ্জ্বল স্বাক্ষর।

সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অভিভাবকেরা তাহাদের এই মন্থান মানবিকতার দিকটি দেখিতে পান না। তাহারা তাহাদের কেবল উচ্ছৃঙ্খলতাই দেখিতে পান এবং সেই অভ্যুত্থানে তাহাদের খিত্তার জানাইবার জন্ত সর্বদা প্রস্তুত। কিন্তু এতদিন তাহারা লোকসেবার একটি স্ফুটিত কার্যশ্রুতি প্রণয়ন করিয়া ছাত্র-সমাজের হাতে তুলিয়া দিতে পারিয়াছেন কি? অর্থাৎ, সমাজের সজীবতম অংশ ছাত্র-সমাজকে তাহারা কোন স্থানির্দিষ্ট পরিকল্পনার সাহায্যে গঠনমূলক কর্মে অহুপ্রাণিত করিতে পারেন নাই। এই ব্যর্থতা তাহাদের অভিভাবকদের ব্যর্থতা। একথা সত্য যে, সমাজের বিশাল

লোকসেবা ও ছাত্র-  
সমাজের একটি  
স্থানির্দিষ্ট কার্যশ্রুতি

জনগোষ্ঠীর হৃৎ-দাবিঙ্গ ও রোগ-জরুরতার মূল রহিয়াছে তাহাদের শতাব্দী-লাগিত অশিক্ষা। অশিক্ষার সেই জগদল পাথরটাকে জনজীবনেব বুকের উপর হইতে অপসারিত করিতে পারিলে জনগণকে সচেতন ও স্বনির্ভর জীবন-যাপনে উৎসুক করা যায় এবং

লোকসেবার মহত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়। স্থল-কলেজে এমন কি কোন কার্যশ্রুতি চালু করা যায় না, বাহার কলে ছাত্র-সমাজ বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ দুই-তিন সপ্তাহের জন্তও দেশের নিবন্ধরতা দূরীকরণের অভিযানে সক্রিয় অংশ গ্রহণে কার্যতঃ বাধ্য থাকে? বিপন্ন জনগোষ্ঠীকে রক্ষা করিবার জন্ত সেবাই কি শুধু লোকসেবা? সম্ভাব্য বিপদের মূলোৎপাটন কি লোকসেবা নয়? তাহা ছাড়া, স্থল-কলেজে আর্ডব্রাণ দল সংগঠিত করিয়া লোকসেবার স্থায়ী ব্যবস্থা করিয়াও রাখা যায়। অবশ্য সেজন্ত ‘স্কাউট দল’, ‘সেন্ট ভনু’ অ্যাথলেটিক কোর’ ইত্যাদির সেবা-শ্রুতি অত্যন্ত সীমিতভাবে চালু আছে।

কিন্তু তাহাই যথেষ্ট নয়। স্থল-কলেজে বাধ্যতামূলকভাবে লোকসেবার সম্প্রসারিত কার্যশ্রুতির প্রচলন চাই। ইহার দ্বারা কেবল লোকসেবার মহত্তম দৃষ্টান্তই স্থাপিত হইবে না, ইহার দ্বারা ছাত্র-সমাজের জ্ঞানার্জন পরিপূর্ণতা লাভ করিবে এবং সেই সঙ্গে সামাজিক দায়িত্ববোধেরও উন্মেষ ঘটিবে। এইভাবে গঠনমূলক উপসংহার কার্ণে উৎসুক করিয়া তুলিতে পারিলে ছাত্রসমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা ও বিপদগামিতা প্রতিকূল হইবে। কলে, একদিকে যেমন নবীন প্রাণের উৎস ছাত্র-সমাজের শক্তি-সামর্থ্য জাতির সেবার সার্থকতা লাভ করিবে, অন্যদিকে তেমনই সমগ্র জাতি এই সেবার চির-নিশ্চিত ছাত্র-সমাজের কাছে থাকিবে চির-কৃতজ্ঞ।

এই প্রবন্ধের অন্তঃসরণে লেখা যায় :

- লোকসেবা ও ছাত্র-সমাজ
- বেশপঠনে ছাত্র-সমাজ
- আর্ডের সেবা ও ছাত্র-সমাজের কর্তব্য
- ছাত্র-সমাজের শক্তির অপচয় বন্ধ করিবার উপায়
- নিরক্ষরতা দূরীকরণে ছাত্রগণের কর্তব্য



এবং-স্বত্ব : হুনা। ব্যক্তি-জীবনে শৃঙ্খলা-  
বোধের প্রয়োজনীয়তা। সমাজ-জীবনে শৃঙ্খলা-  
বোধের প্রয়োজনীয়তা। শৃঙ্খলা ও মানব-সমাজের  
সামগ্রিক উন্নতি। ছাত্র-জীবনেই শৃঙ্খলাশীলনের  
উপযুক্ত সময়। শৃঙ্খলা শৃঙ্খল নয়। বর্তমানে ছাত্র-  
সমাজের উচ্চ-শ্রমতার কারণ। উপসংহার।

## ছাত্র-সমাজ ও শৃঙ্খলাবোধ

এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড এক অদৃশ্য দুর্লভ্য নিয়মের সূত্রে গ্রথিত। ক্ষুদ্রতম অণু-পরমাণু  
হইতে বিশালকায় গ্রহ-নক্ষত্র পর্যন্ত—সর্বত্রই বিরাজিত এক কঠোর নিয়মের শাসন।  
প্রভাতে পূর্ব-দিকস্থে সূর্যোদয় এবং সন্ধ্যাহে পশ্চিম-দিকস্থে সূর্যাস্ত—সবই এক দুর্লভ্য  
নিয়মাবলী। মানব-জীবনেও প্রয়োজন সেই নিয়মের শাসন।  
মাছুষের জীবনকে সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও সুবিস্তৃত করিয়া তুলিতে  
হইলে জীবনেও আহ্বান কবিত্তে হইবে শৃঙ্খলাবোধ। কেবল ব্যক্তি-জীবনেই নয়,  
সামাজিক শান্তি, শ্রী ও কল্যাণের জন্য চাই সামাজিক নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা।

প্রকৃতির রাজ্যে যে শৃঙ্খলার শাসন-চক্র নিত্য-আবর্তমান, সেই শৃঙ্খলার শাসনে  
মাছুষের দেহ-মনে অসুস্থে অনিবার্য ক্রমবিবর্তন। কোন্ মাছুষ সেই নিয়মকে অস্বীকার  
করিতে পারিয়াছে? শৈশবকালেই মানব-জীবনে প্রবেশের সিংহ-  
দ্বার। কাজেই, শৈশবের শুভলগ্নেই নিয়মশীলনের ব্রতে দীক্ষা  
গ্রহণ করিতে হয়। আসল কথা, এই মানব-জীবনে সোনা  
কলাইতে হইবে। দুর্লভ মানব-জীবন কেবল ছন্দোহীন অপচয়ের জন্ত নয়। মানব-  
জন্মিনে সোনা কলাইতে হইলে চাই নিয়মাবর্তিতা ও শৃঙ্খলাবোধের বিশ্বস্ত অহুশীলন।

প্রতিটি কর্মশীলনের জন্ত আছে একটি বিশেষ ধারাক্রম, যাহার নাম ছন্দ। সেই  
ছন্দই শৃঙ্খলা, সেই ছন্দই সাকল্যের পুরোহিত। শৈশবকাল হইতে মাছুষকে সমাজে  
বিচরণ করিতে হয়, গ্রহণ করিতে হয় নানা সামাজিক দায়িত্ব। কিন্তু সমাজবদ্ধ প্রতিটি  
মাছুষ যদি খেয়াল-খুশিমতো যথেষ্টাচার শুরু করে, তাহা হইলে  
সমগ্র সমাজটাই উচ্চশ্রমতার উদ্যোগগারে পরিণত হইবে। অবিশ্রান্ত  
সংসর্গে মানব-জীবনের অস্তিত্বও বিপন্ন হইয়া পড়িবে। সৌরভগতে  
নিয়মের সামান্ত্রতম ব্যতিক্রমে যেমন সর্বধ্বংসী বিপর্যয় ঘটতে পারে, তেমন নিয়মের  
ব্যতিক্রমে সমগ্র সমাজ-জীবনে ঘনাইয়া আসিতে পারে এক ঘোরতর বিশৃঙ্খলা।

কাজেই, মানব-সমাজের সার্বিক উন্নতি ও মানব-সভ্যতার চরম বিকাশের মূল  
রহিয়াছে মাছুষের সুশৃঙ্খল ও সুসংহত কর্মোদ্ভোগ। যেখানে শৃঙ্খলা নাই, সেখানে শ্রী  
নাই, কল্যাণ নাই, আনন্দ নাই, শান্তি নাই। সেই নিরানন্দ, কল্যাণশ্রী-স্বমহীন  
অশান্ত অরাজকতার ঘনাইয়া আসে মানব-জীবনের অন্তিম লগ্ন।

শৃঙ্খলা ও মানব-

সমাজের সামগ্রিক উন্নতি

শৃঙ্খলাবদ্ধ, নিয়মাহুত্বর্তী, সুসংহত সৈন্তবাহিনীই যুদ্ধ-বিজয় করিতে  
পারে। কিন্তু বিশৃঙ্খল উন্মত্ত জনতাকে বহন করিতে হয়  
পরাজয়ের মানি। তাই তো সুশৃঙ্খল জাতির ভাগ্যে জোটে সাকল্যের জয়টিকা এবং  
উচ্চশ্রম জাতির ভাগ্যে জোটে বার্ষিকতার ছরণের মানি।

ছাত্র-জীবনই শৃঙ্খলাবোধ ও নিয়মানুবর্তিতা অঙ্গীকারের উপযুক্ত সময়। এই সময় সম্ভাব্য-কোমল মানব-ভূমিতে শৃঙ্খলাবোধ ও নিয়মানুবর্তিতার বীজ বপন করিলে ছাত্র-জীবনই শৃঙ্খলা-উত্তরকালে তাহাতে অমৃত ফল ফলে। ভারতের বৈদিক সমাজ যুগের উপযুক্ত সময় তাই ছাত্র-জীবনে কঠোর ব্রহ্মচর্য পালনের নির্দেশ দিয়াছিল। সেই ব্রহ্মচর্য-পালন, সেই ব্রতানুবর্তিতা জীবনের মুক্তিকায় শৃঙ্খলা-বোধকর্তৃকর্ণের ভূমিকা। শৃঙ্খলাশীলন তাই সর্বকালের সর্বদেশের ছাত্র-জীবনের অবশ্য-আচরণীয় বিধি।

শৃঙ্খলাবোধ জীবন-বিকাশের উজ্জীবন-মন্ত্র। তাহা জীবন-বিকাশের অমূল্য গতিপথ রচনা করিয়া দেয়। কিন্তু শৃঙ্খলা যদি শৃঙ্খল হইয়া প্রতিনিয়ত পদযুগলে নির্দয়ভাবে বাজে, যদি অগ্রগতির পথে সৃষ্টি করে দুর্বীর প্রতিবন্ধকতা, তাহা হইলে জীবন কৃপ-মণ্ডুকতার পাষণ-প্রাচীরে মাথা কুটিয়া মরে এবং সমাজ প্রাণহীন শৃঙ্খলা শৃঙ্খল নয় নিয়ম-শৃঙ্খলার আচারানুষ্ঠানের মাধ্যমে পরিণত হয় এক সংকীর্ণ অচলায়তনে। যুগে যুগে দেখা-গিয়াছে, অর্থহীন নিয়মের নিগড়ে বাঁধা পড়িয়া বারে বারে সামাজিক প্রগতি প্রতিরুদ্ধ হইয়াছে, জীবন পরিণত হইয়াছে শুষ্ক মরুভূমিতে।

বর্তমানকালে ছাত্র-সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতায় সকলেই বিশেষভাবে উদ্বেগ। বলাবাহুল্য, সেই উদ্বেগ অমূলক নয়। তাহাদের উচ্ছৃঙ্খলতার কলঙ্কিত স্বাক্ষর পড়ে পরীক্ষা-মন্দিরে, ট্রামে-বাসে, পথে-ঘাটে, সমাজ-জীবনের অলিতে-গলিতে। ছাত্র-সমাজ অগ্রযাত্রীর দল। তাহারা স্বভাবতঃই অগ্রসর হইতে চায়, চায় কর্ম-ব্যস্ততা। কিন্তু

আজ তাহাদের সম্মুখে অগ্রসরণের সকল পথ রুদ্ধ। কর্মহীনতার বিশাল অবকাশ তাহাদের মানস-ক্ষেত্রে শয়তানের কারখানার পরিণত করিয়াছে। দেশব্যাপী আশাহীনতা তাহাদের নিক্ষেপ করিয়াছে এক গভীর নৈরাশ্রের স্বাক্ষরে। তাহা ছাড়া, কুরুচি ও দুর্নীতিপূর্ণ চলচ্চিত্র-প্রদর্শনী ছাত্র-সমাজকে উচ্ছৃঙ্খলতার পথে চালিত করে। ছাত্র-সমাজে যদি শৃঙ্খলা-বোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, তবে তাহাদের উচ্ছৃঙ্খলতার মূল কারণগুলির বিলোপ-সাধন করিতে হইবে। কেবল ছাত্র-সমাজকে তিরস্কার করিয়া কিছু হইবে না।

বর্তমান জরুরী অবস্থা ছাত্র-সমাজের শৃঙ্খলা দাবী করে। ছাত্র-সমাজেরও মনে রাখিতে হইবে যে, ছাত্র-জীবনই হইল জীবন-গঠনের সময়, উত্তর-জীবনের প্রস্তুতির কাল। শৃঙ্খলাবোধ জীবনের ভিত্তি-স্বরূপ। বর্তমানের নৈরাশ্রবোধ কিংবা কুচি-বিকৃতি অপসারিত হইয়া শীঘ্রই নূতন আশা ও আদর্শের সূর্যোদয় ঘটিবে। ইহার পর আসিবে নূতন দিন, নূতন জীবন। আমাদের ছাত্র-সমাজ তাহাকে বরণ করিবার জন্ত যেন প্রস্তুত থাকে ॥

এই প্রবন্ধের অন্তঃসরণে লেখা যায় :

- ছাত্র-সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য
- শৃঙ্খলাবোধ
- নিয়মানুবর্তিতা
- ছাত্র-উচ্ছৃঙ্খলতার কারণ ও প্রতিকার

প্রবন্ধ-সূত্র: হুচনা। জীবন-চরিত পাঠের  
উপকারিতা। বৃহত্তর সংস্পর্শে নবজন্ম লাভ।  
মৃত্যু-জয়ের মন্ত্র। জীবন-চরিত স্পর্শমণি-স্বরূপ।  
উহা বিকৃ-বর্ণনবস্ত্র-স্বরূপ। উপসংহার।

## জীবন-চরিত পাঠ

‘মহাজ্ঞানী মহাজন • যে গণে করে গমন  
হ’রছেন পাতঃস্মরণীয়  
দেউ পণ লক্ষ্য করে স্বীয় কীতিধ্বজা ধরে  
আমরাও হব বরণীয়।’

আমরা সাধারণ মানুষ। অসাধারণত্বের ঐশ্বর্য বলিতে আমাদের কিছুই নাই। সে বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণরূপে নিঃস্ব। কিন্তু মানব-সমাজে যাহারা অসাধারণ কিংবা অনন্তসাধারণ, যাহাদের মধ্যে আমরা দেখিয়াছি মনুষ্যত্বের অপার বিশ্বাস, আমরা তাঁহাদের শ্রদ্ধা করি। হৃদয়ের ভক্তি ও ভালোবাসা দিয়া আমরা তাঁহাদের উদ্দেশ্যে রচনা করি অর্ঘ্য-ডালা। মহাপুরুষগণের জীবন-চরিত আমাদের অস্তরে সেই শ্রদ্ধা-ভক্তির অর্ঘ্য-ডালা রচনার প্রেরণা জাগায়। তাই আমরা পাঠ করি তাঁহাদের অমূল্য জীবন-চরিত এবং হৃদয়কে তদনুসারে বিকশিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করি।

আমরা যে মহাপুরুষগণের জীবন-চরিত পাঠ করি, তাহাতে মহাপুরুষগণের কল্যাণ হয় না, কল্যাণ হয় আমাদেরই। যাহারা প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ, তাহারা ইতিহাসের পাতায় তাঁহাদের মহামুভবতা ও জাগতিক কল্যাণ-ব্রতের অগ্নান স্বাক্ষর রাখিয়া পৃথিবী হইতে তিরোহিত হইয়াছেন, পশ্চাতে রাখিয়া গিয়াছেন অক্ষয় কীর্তির নানা উজ্জ্বল কাহিনী। আমরা সেই সকল কাহিনী পাঠ করিয়া তাঁহাদের মহান কীর্তির স্পর্শে অভিভূত হই, ধ্বংস হই। তাঁহাদের পবিত্র জীবনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আমাদের মানসিক উৎকর্ষ ঘটে, আমাদের চিন্তা-শক্তির বিকশিত হয়।

কাজেই, আমাদের জড়, তামসিকতাময় জীবনের উদ্বোধনের জন্য মহাপুরুষগণের জীবন-চরিত পাঠ অত্যন্ত আবশ্যিক। অত্যন্ত সাধারণ মানুষ আমরা। সহস্র ক্ষুদ্রতা-তুচ্ছতা লইয়া এই ধূসিময় পৃথিবীতে আমরা ঘর বাধি। সংকীর্ণ আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি, স্বার্থ-গান্ধিময় আমাদের জীবন। সেই ক্ষুদ্রতা-তুচ্ছতার মধ্যে আমাদের প্রাণ হাঁপাইয়া উঠে। মহাপুরুষগণের উদার, বিশ্বমুখী জীবনের সংস্পর্শে উদ্বোধন হয় আমাদের চেতনার। আমরা আমাদের স্বার্থমগ্নতার সংকীর্ণ সীমা-বেষ্টনী হইতে তাঁহাদের হাত ধরিয়া উদার উন্মুক্ত জীবনে বাহির হইয়া পড়ি। বৃহত্তর সংস্পর্শে আমরা যেন নবজন্ম লাভ করি।

যে পৃথিবীতে আমরা বাস করি, সেখানে ‘আছে হুঃণ, আছে মৃত্যু’। আছে বন্দ-সংঘাত, আছে স্বতীত্ব সংগ্রাম। এই বন্দ-সংঘাতময় পৃথিবীতে হুঃণাসনের অত্যাচারে

জীবন-চরিত পাঠের  
উপকারিতা

বৃহত্তর সংস্পর্শে  
নবজন্ম লাভ

অভ্যচারিত হইয়া আমরা অশ্রু-মোচন করি, মৃত্যুর পূর্বে বহুবার মৃত্যু বরণ করি। তখন মহাপুরুষগণের জীবন-চরিত আমাদের সম্মুখে আঁকিয়া দেয় আলোকিত পথ-রেখা, আমাদের কর্ণে ঢালিয়া দেয় দুঃখ-জয়ের অমৃত-বাণী। উহা মৃত্যু-জয়ের মস্ত্র দীক্ষা দিয়া আমাদেরকে যথার্থ মানুষ করে, অনিবার্য নৈরাশ্রের হাত হইতে রক্ষা করে। তাঁহারা যেভাবে দুঃখ-সংকটের সহিত সংগ্রাম করিয়া অবশেষে জয়লাভ করিয়াছেন, তাহা আমাদেরকে দেয় সংকট-উত্তরণের প্রেরণা।

স্পর্শমণি আমরা দেখি নাই, উহা কাব্য-কথিত বস্তু। কিন্তু মহাপুরুষগণের জীবন-চরিতই আমাদের নিকট প্রকৃত স্পর্শমণি। উহার স্পর্শে আমাদের হৃদয়ে ক্ষুদ্রতা তিরোহিত হইয়া মহান আদর্শের প্রতিকলন ঘটে; ইতিহাসে সেই হৃদয়-সংশোধন বা চিত্ত-শুদ্ধির অনেক দৃষ্টান্ত আছে। ভগবান বুদ্ধের জীবন ও বাণী কিরূপে চণ্ডাশোককে ধর্মাশোক রূপান্তরিত করিয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই কাল্পনিক সত্য নয়, উহা একটি ঐতিহাসিক সত্য। বিধাতা-পুরুষ সকল মানুষকে একটা স্বাভাবিক উচ্চতা দান করেন। কিন্তু এই পৃথিবীর কতিপয় মানুষ লাভ করেন স্বাভাবিকতার অধিক উচ্চতা—চতুর্দিকের দীনতা, দীনমন্ত্রতার ক্ষুদ্র ওষধি-পুঞ্জের মধ্যে তাঁহারা বৃহৎ বনস্পতিব ন্যায় অসামান্যতার উর্ধ্বগগন স্পর্শ করেন। আমরা সামান্ত মানুষ, তাঁহাদের মহৎ ছায়ায় গিয়া দাঁড়াই। পাখিব জালা জুড়াই, মানুষের দেবত্ব দেখিয়া বিস্মিত হই।

এই পৃথিবীর ‘পতন-অভ্যাস বন্ধুর পন্থা’র দুঃখ-বেদনাপূর্ণ ঘণাবর্তে অনেক সময় আমরা দিশাহারা হইয়া বিমূঢ় হইয়া পড়ি। কোন পথে চলিব—পথের ঠিকানা খুঁজিয়া পাই না। অন্ধকারের পাহাড়ে তখন মাথা কুটিয়া মরি। জীবন-চরিতে বর্ণিত মহাপুরুষগণের জীবনী ও বাণী আমাদের দেয় সঠিক পথ-নির্দেশ। এই উত্তাল তরঙ্গ-সংকুল জীবন-সমুদ্রে আমরা দিশাহারা পথিক। ক্ষণজন্মা মহাপুরুষগণের জীবন-চরিত আমাদের নিকট দিক্-দর্শন-স্বরূপ—আমাদের পার্শ্ব জীবনের চির-উজ্জল আলোকস্তম্ভ।

বর্তমানকালের পৃথিবী অন্ধ-তমসাময়, ক্ষুদ্রতা-তুচ্ছতা-স্বার্থপরতার ক্লেদ-কলহে পঙ্কিল। চতুর্দিকে ঘৃণা, বিদ্বেষ এবং দুর্নীতির অট্টহাসি—সর্বদা মানবতার বিরুদ্ধে চলিয়াছে কুটিল চক্রান্ত। আজ মানুষের চিত্ত-শুদ্ধির একান্ত প্রয়োজন, প্রয়োজন পাপ-পঙ্কিল হৃদয়ের স্বার্থ সংশোধন। আজ কে মানুষকে এই নিবিড় বন অন্ধকারে পথ দেখাইবে? কে তাহাকে দিবে পথের সঠিক ঠিকানা?...কে তাহাকে এই বিশ্বব্যাপী নৈরাশ্রের মধ্যে শুনাইবে উজ্জল আশার বাণী? আজ মহাপুরুষগণের জীবন-চরিতই আমাদের একমাত্র তরঙ্গ। উহাই আধুনিক পৃথিবীর প্রকৃত মুক্তি-বেদ ॥

এই প্রবন্ধের অন্তঃসরণে লেখা যায় :

- মহাপুরুষগণের জীবনী-পাঠের উপকারিতা
- জীবন-চরিত পাঠের উপকারিতা, মা. '৬২
- মহাপুরুষগণ ও আমরা

শ্রবণ-সূত্র : সূচনা। সীমাবদ্ধ জীবনে  
অধিক জ্ঞানলাভের উপায় : গ্রন্থ-পাঠ। দুর্গম  
পৃথিবীর সংবাদলাভ। দুর্গমতম মানুষের পরিচয়  
লাভ। মহাপুরুষগণের জীবনী-পাঠ। অবকাশ-  
ব্যাপন ও আনন্দলাভ। গ্রন্থ-নির্বাচন। উপসংহার।

বিপুল। এই পৃথিবী। দিকে দিকে তাহার বৈচিত্র্যের অফুরন্ত সমাবেশ। মানুষের  
জিজ্ঞাসাও তেমনই অন্তহীন। এই বিপুল বৈচিত্র্যময় পৃথিবীর দিকে চাহিয়া তাহার  
অন্তরে জাগে বিশ্বয়, জাগে অদম্য কৌতূহল। সে জানিতে চায় পৃথিবীকে, পৃথিবীর  
লক্ষ-কোটি মানুষকে এবং নিঃসঙ্গ আপনাকে। ‘দেশে দেশে  
সূচনা কত-না নগর রাজধানী—মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি  
সিঁদু মরু, কত-না অজানা জীব কত-না অপরিচিত তরু’ রহিয়াছে এই পৃথিবীতে।  
একজন মানুষের পক্ষে তাহার সংক্ষিপ্ত জীবনায়তনের মধ্যে সমস্ত কিছু দেখা কিংবা  
জানা সম্ভব নয়।

‘বিশাল বিশ্বের আয়োজন ;

মন মোর জুড়ে থাকে অতি ক্ষুদ্র তারি এক কোণ।

হেই কোণে পড়ি গ্রন্থ ভ্রমণবৃত্তান্ত আছে বাহে

অক্ষয় উৎসাহে—’

মানুষের গ্রন্থ-পাঠের ভূমিকা হইল ইহাই। কাল নিরবধি এবং পৃথিবী বিপুল। সেই  
তুলনায় মানুষের জীবন সংক্ষিপ্ত। এই সংক্ষিপ্ত জীবনায়তনের মধ্যে পৃথিবীর সমস্ত কিছু  
প্রত্যক্ষ করিয়া উঠা অসম্ভব। কিন্তু বাহারা পৃথিবীকে অল্প-বিস্তর প্রত্যক্ষ করিয়াছেন,  
তাঁহারা তাঁহাদের অভিজ্ঞতাকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন গ্রন্থাকারে। সেই গ্রন্থ পাঠ করিয়া  
আমরা জ্ঞান লাভ করি। সেই জ্ঞান পরোক্ষ-জ্ঞান, কিন্তু তাহাতেও  
সীমাবদ্ধ জীবনে অধিক জ্ঞানলাভের উপায় : গ্রন্থ-পাঠ।  
আমরা পাই যে অনাবিল আনন্দের ভাগ, তাহা আমাদের জীবনে  
মোটাই উপেক্ষণীয় নয়। এইভাবে ঘটে আমাদের জ্ঞানের প্রসার,  
সভ্যতার সামগ্রিক অগ্রগতি। যুগ-যুগান্তরের মানুষ তাঁহাদের  
দুঃখলব্ধ চরম অভিজ্ঞতা এবং দুঃস্বপ্ন জ্ঞান-তপস্তার পরম সিদ্ধিকে গ্রন্থের হিরণ্য পাত্রে  
ভরিয়া ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যে নিরবধি কাল-প্রবাহে ভাসাইয়া দিয়াছেন। মহাকাালের ঘাটে  
ঘাটে উৎসব জ্ঞান-পিপাসুদের ভিড়। তাঁহারা অঞ্জলি ভরিয়া সেই অনন্ত সাধনালব্ধ  
অমৃতরস আকর্ষণ পান করেন। অনন্ত কাল-প্রবাহে সেই অমৃত-কুন্ত পুনরায় ভাসিয়া  
চলে। সর্বাবস্থানিক জ্ঞান-চর্চার মূলে এইভাবে গ্রন্থের রহিয়াছে অসামান্য অবদান।

জ্ঞানস্পর্শ হইল আমাদের সীমাবদ্ধ জীবনের আত্মার আকৃতি। সেই জ্ঞানের  
পিপাসার চরিতার্থতার জন্য মানুষ ঘরের বাহির হইয়া পড়ে।  
দুর্গম পৃথিবীর সংবাদলাভ বাহিরের পৃথিবীতে কোথাও দুর্গম গিরি, কোথাও কান্ডার মরু,  
কোথাও দুষ্টর পারাবার। কিন্তু গ্রন্থ আমাদের ঘরের ঘরে  
বহন করিয়া আনে সেই দুর্গম পৃথিবীর সংবাদ। আমরা ঘরে বসিয়াই সেই বহু

দেশ-বিদেশের রূপ মানস-চক্ষে প্রত্যক্ষ করিতে পারি, জানিতে পারি সেখানকার জীবজন্তুর বৈশিষ্ট্যের কথা এবং সেখানকার মানব-গোষ্ঠীর বিশেষ জীবনচরণের কথা।

কিন্তু বিশ্বে সবচেয়ে দুর্গম হইল মানুষ। সে দুর্গমতম ‘আপন অন্তরালে’। অন্তর মিশাইলে তবেই তাহার অন্তরের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের পক্ষে তাহা দুর্গমতম মানুষের পরিচয় লাভ হইয়া উঠা সম্ভব নয়। কিন্তু বাহারা তাহাদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যোগাযোগ করিয়া তাঁহাদের কষ্টলব্ধ অভিজ্ঞতাকে গ্রন্থকারে পরিবেশন করিয়াছেন, তাঁহাদের রচিত গ্রন্থ-পাঠে আমরা পাই তাঁহাদের গভীর পরিচয়।

তাহা ছাড়া, মহাপুরুষগণের সাধনালব্ধ অভিজ্ঞতা এবং তাঁহাদের অপূর্ব জীবন-কাহিনী পাঠ করিয়া আমাদের চিত্তের উদ্বোধন ঘটে। তাঁহাদের রচিত গ্রন্থে তাঁহাদের দ্রব্যবাহ অমূল্যত্ব এবং জীবন-রহস্য আমাদের মনোভূমিকে করে অভিযুক্ত। তাহাতে আমাদের অন্তরলোক জ্ঞানের এক অপূর্ব আলোকে আলোকিত হইয়া উঠে।

গ্রন্থ নিঃসঙ্গতার সঙ্গী, অবকাশের আনন্দ। গ্রন্থপাঠের মতো অবকাশ-বাগনের এমন উপকরণ আর নাই। গ্রন্থ অনাবিল আনন্দের অফুরন্ত উৎস। কাব্য, উপন্যাস, অবকাশ-বাগন ও গল্প, রম্য-রচনা পাঠ করিয়া যে আনন্দ পাওয়া যায়, তাহার তুলনা আনন্দলাভ হয় না। কালিদাসের রঘুবংশ, শকুন্তলা, মেঘদূত কিংবা শেখরীয়ারের নাটকমালা কিংবা রবীন্দ্রনাথের কবিতা-সম্ভার, গল্পগুচ্ছ, ছিন্নপত্র প্রভৃতি কোনদিন কি পুরাতন হইবে? ইহারা নব নব রসবর্ষণে চির-নূতন। সর্ব দেশের সর্ব-কালের মানুষকে ইহারা অগ্নান মহিমায় আনন্দ বিতরণ করিতে থাকিবে।

কিন্তু গ্রন্থ-নির্বাচনে পাঠক-সাধারণকে সতর্কতা-অবলম্বন করিতে হইবে। বিশেষ করিয়া তরুণ-সমাজকে। তরুণ-সমাজ স্বভাবতঃই অপ্রাণবন্ত। কাজেই, প্রাপ্তবয়স্কদের

জন্ত রচিত গ্রন্থ-সম্ভার তাহাদের পাঠ করা উচিত নয়। যে সব গ্রন্থে জীবন-জিজ্ঞাসা নাই, আছে কেবল ইঞ্জিয়-বাসনার বহুসংস্রব, সেগুলি পাঠকের জীবনের পক্ষে ক্ষতিকর। গ্রন্থ-নির্বাচনে তরুণ-সমাজকে পাঠাগারিক কিংবা শিক্ষক মহাশয়গণ সাহায্য করিতে পারেন। যদি গ্রন্থের এবং সেই সঙ্গে গ্রন্থাগারের শ্রেণীবিভাগ নিখুঁত হয়, তবে এই গ্রন্থ-নির্বাচন ব্যাপারটিও সহজ হইয়া যায়।

যে গ্রন্থগুলি মহান্ ভাবাদর্শের স্রোতক, সেগুলি মহাসাগরের স্রাব অনন্তের বার্তাসহ। তাহাতে ‘ভাষা চূপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা উৎসাহের পড়িয়া আছে। হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন তুষারের মধ্যে যেমন কত শত বস্তা বাঁধা পড়িয়া আছে, তেমনি এই পুস্তকাগারের মধ্যে মানব-জন্মের বস্তা কে বাঁধিয়া রাখিয়াছে?’

এই প্রবন্ধের অন্তিমরণে লেখা যায় :

- গ্রন্থ-পাঠের উপকারিতা
- অগ্ন-কাহিনী পাঠের প্রয়োজনীয়তা

প্রবন্ধ-সুজ। সূচনা। চলাই জীবনের মর্মবাণী।  
জানার আগ্রহ ও দেশভ্রমণ। শিক্ষার অঙ্গরূপে  
দেশভ্রমণ। তীর্থ-ভ্রমণের দ্বারা জগতের প্রসারতা  
লাভ। গতির বোঝা : নামহীন গিরি-নদী আবিষ্কার।  
দেশভ্রমণ-বাবস্থার উন্নতি। পারস্পরিক বোঝাপড়া :  
জাতীয় সংহতি ও সৌভ্রাতৃত্ববোধের উদ্বেগ।  
উপসংহার।

## দেশভ্রমণ

বা. '৩১, '৩৩

‘বিপুল! এ পৃথিবীর কতটুকু জানি  
দেশে দেশে কত না নগর রাজধানী—  
মানুষের কত কীৰ্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু,  
কত-না অজানা জীব কত-না অশির্বিচিত্র তরু  
রয়ে গেল অগোচরে।’

—রবীন্দ্রনাথ

বিশাল এই পৃথিবী। আয়োজন তাহার বিপুল, অফুরন্ত। কত নতুন নতুন দেশ,  
কত নদী-নিকর, কত গিরি-পর্বত সৌন্দর্যের অপরূপ ডালি সাজাইয়া পৃথিবীর বুক  
জুড়িয়া বিরাজ করিতেছে। আমরা তাহার কতটুকুই ব: জানি? আমাদের জানার  
পরিধি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। চারিদিকে সবই অজানা, সবই অচেনা। আমাদের  
নিত্যকার পরিচিত পৃথিবীর বাহিরে অপরিচয়ের দ্বার মহাসমুদ্র। সেই মহাসমুদ্রের  
অদৃশ্য তরঙ্গ প্রতিনিয়ত আমাদের হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে।  
সেই অজানা, অচেনা বিপুল পৃথিবীকে আমরা জানিতে চাই।  
জানিবার জন্য আমাদের অসীম আগ্রহ, অনন্ত উৎকণ্ঠা। তাই সেই অভাব পূরণ  
করিবার জন্য আমরা পাঠ করি ভ্রমণ-কাহিনী। কিন্তু ভ্রমণ-কাহিনী পড়িয়া আমাদের  
মন ভরে না। কারণ, ইহা তো পরোক্ষ অভিজ্ঞতার নিরুদ্ভাপ বিবৃতি। প্রত্যক্ষ  
অভিজ্ঞতার রোমাঞ্চ ইহাতে কোথায়? তাই আমরা অজানার আকর্ষণে পরিচিত  
পৃথিবীর দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া পড়ি। দেশ-ভ্রমণ করিয়া আমরা লাভ করিতে  
চাই ভ্রমণের প্রকৃত আনন্দ।

তাই সমুদ্র-মেখলা, নদী-পর্বত-মরু-উপবন-শোভিত এই বিপুল বিশ্ব আমাদের  
অন্তরকে প্রতি মূহুর্তে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। বিশ্বের এই বিশাল আয়োজনের  
সঙ্গে রহিয়াছে আমাদের অন্তরের একটি নিগূঢ় বোগসুজ। ‘চরৈবতি চরৈবতি’—  
চলো, চলো, চলো—সমুদ্রের ঢেউ-এর মতো চলো, পাখির গানের মতো চলো, প্রভাতের  
আলোর মতো চলো। ইহাই আমাদের অন্তরাত্মার মর্মবাণী। কত  
অজানিত দেশ, কত বিচিত্র রকমের মানুষ, কত বিচিত্র তাহাদের  
জীবন-ধারা—কিছুই জানা হইল না। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কত  
অফুরন্ত আয়োজন লইয়া কত ভূগুণ অধীর আগ্রহে আমাদের আগমনের প্রতীক্ষা  
করিতেছে। সেই সমস্ত আমাদের দেখা হইল না। আমাদের হৃদয়ের স্রুধা, আমাদের  
অন্তরের অতৃপ্তি আমাদের গৃহ-প্রাচীরের আবেষ্টনী হইতে মুক্ত করিয়া:  
সমুদ্রের অনন্ত আশ্রানে গাড়া দিবার জন্য মহাবিশ্বের মুক্তাঙ্গনে টানিয়া লইয়া চলে।

চলাই জীবনের  
মর্মবাণী

এইরূপে আমাদের অন্তরের ক্ষুধা মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির নব নব রূপান্তরের মধ্যে আমাদের আশ্রয় উপস্থিত করে। ইতিহাস ও ভূগোল প্রত্যক্ষ এবং অব্যবহিত সাক্ষ্যে দাঁড়াইয়া আমরা অতীত ও বর্তমানের স্মৃতি গায়ে মাখিয়া ধস্ত হই এবং হৃদয়ের ঘনিষ্ঠ স্পর্শ লাভ করিয়া অন্তরে অনুভব করি আত্মলবীর অপার আনন্দ। মানুষের এই-বে জানিবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা, তাহার অনন্ত জিজ্ঞাসা—তাহার পরিতৃপ্তি সাধনের মধ্য দিয়া এক পবিত্র আনন্দানুভব দেশভ্রমণের একমাত্র উদ্দেশ্য। তাহার দ্বিধিক্রম করিয়া সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছে, তাহাদের ছিল না সেই আনন্দানুভূতি, তাহাদের অন্তরে ছিল রাজ্যাভ্যাস, ছিল কুটিল পাপ। তাই তাহারা ছিল অসুখী।

কেবল ইতিহাস ও ভূগোল পাঠই জ্ঞানলাভের পরিপূর্ণতা আনিতে পারে না। তাহার জন্ত প্রয়োজন দেশভ্রমণ। ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ ভ্রমণ করিলে শিক্ষা সম্পূর্ণতা লাভ করে। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হইতে আমরা বিশেষ বিশেষ স্থান সম্পর্কে কিছু কিছু জানিতে পারি মাত্র। কিন্তু তাহাতে অন্তর ভরে না; তাহাতে আনন্দ নাই, নাই শিক্ষার পূর্ণতা; পৃথিবী মানে তো আর মানচিত্রের কতকগুলি মৃত রেখা নয়, দেশ মানেও নয় ভূগোলের নিখাদ বিবৃতি। পৃথিবী বহু মানুষের কলরব-মুখরিত সজীব-সুন্দর বিচিত্র বিশ্ব এবং দেশ রক্তমাংসের মানুষের হাসিকান্নার সংমিশ্রিত শ্রামল শোভন প্রাণোচ্ছল ভূখণ্ড। বাহিরে অবাধ উন্মুক্ত আকাশের নীচে জীবন্ত দেশটি দেখিয়া তাহার অধিবাসীদের প্রত্যক্ষ স্পর্শ লাভ করিয়া তাহাদের জীবনধারা জানিতে হইবে, তাহাদের দেশের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিতে হইবে। সেই জানাই প্রকৃত জ্ঞান।

মানুষ দিনের পর দিন তাহার গৃহের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের মধ্যে বন্দী থাকিয়া হাঁপাইয়া উঠে। সে সেই চারি দেওয়ালের স্বরচিত কারাগার হইতে খোঁজে মুক্তি। তাই তীর্থভ্রমণের তাগিদ সে মাঝে মাঝে অন্তরের মধ্যে অনুভব করে। মানুষ বৃহত্তর সম্মান। সে বৃহত্তর মধ্যে নিজেকে দেখিতে চায়। অনেকের মধ্যে নিজেকে হারাইয়া খুঁজিবার জন্ত তাহার অনন্ত আকুতি। ক্ষুদ্রতা ও সংকীর্ণতার কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া প্রকৃতির অব্যবহিত সাক্ষ্যে স্থাপিত তীর্থস্থানগুলির পাদপীঠতলে দাঁড়াইয়া তাহার মুখ হৃদয় ছড়াইয়া পড়ে প্রকৃতির সীমাহীন সৌন্দর্যের মধ্যে, বহু মানবের স্পর্শ লাভ করিয়া ঘটে তাহার নবজন্ম। তারপর সম্পূর্ণ নতন মানুষ হইয়া সে গৃহে ফিরিয়া আসে।

ভ্রমণের নেশাই গতির নেশা। এই গতির নেশা বাহার শোণিত-ধারায় দোলা লাগাইয়াছে, তাহার কাছে গৃহ-বন্দী জীবনের স্থখ মিথ্যা, রুটিন-বাঁধা জীবনচরণ মিথ্যা। বাহারা স্বরণীয় পরিব্রাজক, তাহারা এই গতির নেশায় জীবনকে তুচ্ছ করিয়া অজানিতের পথে পাড়ি দিয়া ‘হুগম গিরি কান্তার মরু, হস্তর পারাবার’ লঙ্ঘন করিয়া ছুটিয়াছেন। কা-হিন্য়েন, হিউয়েন-সাঙ, ইবন্ বতুতা, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান—পৃথিবীর দেশ-দেশান্তরের সভ্যতা ও



সংস্কৃতির সম্যক পরিচয় লাভের জন্য দূর অজ্ঞানার পথে পাড়ি দিয়াছিলেন। ভান্ডো-জা-গামা, কলম্বাস, লিভিংস্টোন, ক্যাপ্টেন কুক, মার্কো পোলো প্রমুখ দূরবার পথচক্ৰগণের দুঃসাহসিক পথচরিত্রের ফলে আজ পৃথিবীর বহু দুর্গম দেশ-দেশান্তর মানুষের জ্ঞানের পরিধির মধ্যে আসিয়াছে। তাঁহাদের দূরবার দেশ-পথচরিত্রের ফলে পৃথিবীর কত নামহীন গিরি-নদী আবিষ্কৃত হইয়া আজ মানুষের জ্ঞান-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিয়াছে।

অতীতকালে দেশভ্রমণ ছিল অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। আজ নানা পথ ও পরিবহন প্রস্তুত হওয়ার ফলে দেশভ্রমণ হইয়াছে সহজসাধ্য। দেশ-দেশান্তরে রেলপথ বিস্তৃত হইয়াছে, প্রস্তুত হইয়াছে বিশালকায় সেতু। রেল, মোটর, বৈদ্যুতিক ইত্যাদির প্রচলনের ফলে পথের বাধা-বিপত্তি প্রায় উধাও। ভ্রমণ-ব্যাপারে সাহায্য করিবার জন্য এখন দেশে দেশে 'ট্যুরিস্ট ব্যুরো' স্থাপিত হইয়াছে। সেখানে দ্রষ্টব্য স্থান সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ, পথের বর্ণনা, মানচিত্র ইত্যাদি প্রকাশ করিয়া ভ্রমণার্থীদের নানাভাবে সাহায্য করা হয়।

বর্তমান কালে দেশভ্রমণ শিক্ষার একটি অপরিহার্য অঙ্গরূপে স্বীকৃত। দেশ-দেশান্তরের ভৌগোলিক পরিস্থিতি, প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং সেখানকার নরনারীদের জীবনচরিত্রের প্রত্যক্ষ জ্ঞান-লাভ দেশভ্রমণের মাধ্যমে সম্ভব হয়। আনন্দলাভই দেশভ্রমণের একমাত্র ফলশ্রুতি নয়, মনের প্রসারতা, হৃদয়ের পারস্পরিক বোঝাপড়া :  
 - ব্যাপ্তি ও সেই সঙ্গে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্য দিয়া অর্থও জাতীয় সংহতি ও  
 - সৌভ্রাতৃত্ববোধের উদ্বেগ  
 সংহতি সৃষ্টিও দেশভ্রমণের অতি গুরুত্বপূর্ণ ফল। তাহা ছাড়া, ব্যবসা-বাণিজ্য-সংক্রান্ত জ্ঞানলাভও দেশভ্রমণের পরোক্ষ ফল। অগ্রদিকে, ভ্রমণের মাধ্যমে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যে একটা ভাবমূলক সংহতি গড়িয়া উঠে, তাহা জাতীয় সংহতির পক্ষে, মানবিক সৌভ্রাতৃত্ববোধের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দিনে দিনে সারা পৃথিবীতেই দেশভ্রমণ জনপ্রিয়তা অর্জন করিতেছে। রাষ্ট্রসংঘও দেশভ্রমণকে 'বিশ্বশান্তির ছাড়পত্র' [ a Passport to World Peace ] অভিহিত করিয়া বিশ্ববাসীকে দেশভ্রমণে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। তাই আজ পৃথিবীর দেশে দেশে লক্ষ-কোটি ভ্রমণ-বিলাসীর দল ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ইহা আনন্দের কথা। ইহাতে যেমন পারস্পরিক সহযোগিতার ভাবটি জাগিয়া উঠিতেছে, তেমনি আমাদের অন্তরে গতির নেশা ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হইতেছে। অজ্ঞানিতের পথে পাড়ি দিবার জন্য দূর-দূরান্তে কে যেন ঘন ঘন হাতছানি দিয়া আমাদের ডাকিতেছে। 'উত্তর-মেরু যোরে ডাকে, ভাই, দক্ষিণ-মেরু টানে।' আমরা কি চক্ষুর্কণ দুইটি ডানায় ঢাকিয়া ঘরে বসিয়া থাকিতে পারি ?

ঐ প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- দেশভ্রমণের উপকারিতা, মা. '৩১, '৩৩
- শিক্ষার অঙ্গরূপে দেশভ্রমণ
- দেশভ্রমণের শিক্ষাগত মূল্য

প্রবন্ধ-সূত্র : হুচনা। গ্রন্থাগার ভাব-চিন্তার  
যোগ-মিলনের সেতু। গ্রন্থাগারের হবিধা।  
গ্রন্থাগারের আদিম অবস্থা। প্রাচীনকালের  
গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগার ধ্বংসের অপকীর্তি। গ্রন্থাগারে  
জ্ঞান-পরিচর। ভারতে গ্রন্থাগার। বরোদার  
গ্রন্থাগার। উপসংহার।

## গ্রন্থাগার

গৌ. প্রা. '৩২

‘মহাশমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত  
যে, সে ঘুমন্ত শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশমুদ্রের সহিত এই  
কারাগারের তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে,

মানবাত্মার অমর-আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের  
কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে। হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন  
তুষারের মধ্যে যেমন কত শত বস্তা বাঁধা পড়িয়া আছে, তেমনি এই পুস্তকাগারের মধ্যে  
মানব-হৃদয়ের বস্তা কে বাঁধিয়া রাখিয়াছে?’—রবীন্দ্রনাথ

গ্রন্থাগার অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের যোগ-মিলনের সেতু। নদীর স্রোতের মতো  
জ্ঞান-প্রবাহ দেশ-দেশান্তর ও যুগ-যুগান্তরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া চলে। এক  
হৃদয়ের ভাবরাশি নিঃশেষে সঞ্চারিত হইয়া যায় হৃদয়ান্তরে। গ্রন্থাগার তাই লক্ষ-কোটি  
মানুষের নীরব আলাপনের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। এখানে চিন্তাবিদ  
পায় চিন্তার খোরাক এবং নানা দুরূহ জিজ্ঞাসার উত্তর, ভাবুক  
পায় ভাবরসের সন্ধান। হৃদয় ও মনের ক্ষুদ্রবৃত্তির এমন বিপুল  
আয়োজন আর কোথায় আছে? গ্রন্থাগার, বলা যায়, ভাব-তৃপ্তি ও জ্ঞান-পিপাস  
সহস্র চিন্তের তৃপ্তি-সরোবর, তথা অমৃত-সরোবর।

জ্ঞান অজস্র, ভাবরাশিও অক্ষুরন্ত। বিভিন্ন ভাব ও চিন্তা বিষয়ে রচিত হইয়াছে  
অসংখ্য পুস্তক। কোন একজন ব্যক্তির পক্ষে সেই সকল গ্রন্থ সংগ্রহ করা সম্ভব নয়।  
গ্রন্থাগার বহু মানুষের যৌথ প্রতিষ্ঠান। সেখানে বহুর প্রয়াসে  
সংগৃহীত বহু গ্রন্থ পাঠের সুযোগ মেলে। তাহা ছাড়া, গ্রন্থাগার  
হইতে বালক, বৃদ্ধ, যুবক—সকলেই নিজ নিজ কচি-অনুযায়ী সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন,  
ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি, বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়ে গ্রন্থ লইয়া পাঠ করিতে পারেন।

গ্রন্থাগারের ইতিহাস অতি প্রাচীন। সভ্যতার আদিম প্রত্য্যেই মানুষের মনে  
জাগিয়া উঠিয়াছিল অদমা জ্ঞান-পিপাস। সেই জ্ঞান-পিপাসার তীব্র তাগিদে শুরু  
হইয়াছিল জ্ঞান-চর্চা। ভারতে অতি প্রাচীনকালে সেই জ্ঞান-  
চর্চার কসল বেদের আকারে সমাহৃত হইয়াছিল। ‘বেদ’ কথা  
একটি অর্থ ‘জ্ঞান’, অল্প অর্থ ‘প্রতি’। যখন লেখার অক্ষর আবিষ্কৃত  
হয় নাই, যখন আবিষ্কৃত হয় নাই গ্রন্থ-রচনার অমূল্য কৌশল, তখন কেবল মানুষের  
স্মরণ-শক্তিকে আশ্রয় করিয়া চলিত জ্ঞান-চর্চা ও তাহার মূল্যবান আদান-প্রদান।

মাহুঘের সূত্র-শক্তিতেই ছিল জ্ঞানের অবস্থিতি। শ্রুতিধর পণ্ডিতরাই ছিলেন সেদিনের জ্ঞানধার। শিষ্য-পরম্পরায় সেই সকল জ্ঞান যুগ-যুগান্তরে, দেশ-দেশান্তরে প্রবাহিত হইয়া বাইত। পথের দুঃখ-কষ্ট ও দৈব-দুর্বিপাক তুচ্ছ করিয়া জ্ঞানের মধু আহরণের জন্য দেশ-দেশান্তর হইতে আসিতেন জ্ঞান-পিপাসু পরিব্রাজকের দল। তাঁহারা নানা বিষয়ে জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া সানন্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতেন। এইভাবে গ্রন্থাগার সৃষ্টির পূর্বে জ্ঞানের ধারা সীমিতভাবে হইলেও দেশ-দেশান্তরে, যুগ-যুগান্তরে প্রবাহিত হইয়া বাইত। ইহাতে পঞ্চক্লেশ ছিল, ছিল আকস্মিক বিপৎপাত। গ্রন্থাগার তাহা দূর করিয়া বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডারকে আমাদের ঘরের দ্বারে আজ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে।

তারপর অক্ষর আবিষ্কৃত হইল। কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে মানব-মনের অসংখ্য ভাব-চিন্তা বাধা পড়িল। রচিত হইল গ্রন্থ। তালপত্রে ও ভূজপত্রে হস্তলিখিত গ্রন্থ রচিত হইল। কিন্তু ইহাদের অচিরস্থায়িত্ব সকলকে চিন্তিত করিল। আসিল পশুচর্ম। পশুচর্মে অক্ষরের শৃঙ্খলে জ্ঞান-সম্ভারকে বন্দী করা হইল। প্রাচীন মিশর 'প্যাপিরাস'-এর পাতা জোড়া দিয়া কাগজ প্রস্তুত করিয়া জ্ঞান-সংরক্ষণের পদ্ধতি আবিষ্কার করিল।

প্রাচীনকালের  
গ্রন্থাগার

পরে কাগজ আবিষ্কৃত হইল এবং কাগজে গ্রন্থ রচিত হইতে লাগিল।

সর্বপ্রথম গ্রন্থাগার স্থাপনের কৃতিত্ব রোম দেশের। খ্রীষ্টীয় প্রথম

শতাব্দীতে সর্বসাধারণের মধ্যে জ্ঞান-বিস্তারকল্পে সেই গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। তাহা ছাড়া ভারতবর্ষ, চীন, তিব্বত, মিশর ও ব্যাবিলন প্রভৃতি দেশে প্রাচীন গ্রন্থাগারের নিদর্শন আছে। প্রাচীন ভারতের নালন্দা ও বিক্রমশীলার গ্রন্থাগার ছিল বিখ্যাত। হিন্দু দেব-মন্দির ও বৌদ্ধমঠ ছিল জ্ঞানচর্চার পীঠস্থান। বারাণসীতেও ছিল বিশাল গ্রন্থাগার। বিজ্ঞানসাহী শ্রীহর্ষের ছিল এক বিপুলায়তন গ্রন্থাগার।

কিন্তু মুসলমান আক্রমণ ও তাহাদের ধ্বংসশীলার কবল হইতে ভারতের গ্রন্থাগারগুলি রক্ষা পায় নাই। নিম্নমভাবে সেগুলি ধ্বংস করিয়া তাহারা কত মূল্যবান গ্রন্থ যে লেলিহান অগ্নিলিখায় সমর্পণ করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইংরেজরা কোন গ্রন্থাগার নষ্ট হইতে দেখে নাই। বরং লুপ্ত গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার আবিষ্কারে উৎসাহ দান করিয়া এবং বর্তমান গ্রন্থাগারগুলির সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া তাহারা ভারতের জ্ঞান-চর্চার দ্বার মুক্ত রাখিয়া গিয়াছে। কিন্তু মুসলমানেরা এদেশের গ্রন্থাগারগুলির ধ্বংস-সাধন করিয়া এদেশে জ্ঞান চর্চার দ্বার চিরকুদ্ধ করিয়া দিতে

গ্রন্থাগার ধ্বংসের  
অপকীর্তি

চাহিয়াছিল। সোমনাথ মন্দিরের গ্রন্থাগারের ধ্বংস-সাধন স্থলতান

মামুদের দুর্পনের অপকীর্তি। বারাণসীর গ্রন্থাগারের ধ্বংস-সাধন

মুসলমান আক্রমণের আর একটি কলঙ্ক-চিহ্ন। নালন্দা ও বিক্রমশীলার বিখ্যাত গ্রন্থাগারগুলিও তাহাদের আক্রমণ হইতে রক্ষা পায় নাই। গ্রন্থ ছিল বোধ ভিক্ষুদের নিকট প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর। তাই মুসলমান আক্রমণ হইতে গ্রন্থগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণকে তুচ্ছ করিয়া নালন্দা-বিক্রমশীলা মহাবিহারের ভিক্ষুগণ মূল্যবান বহু গ্রন্থ নেপাল ও তিব্বতে লইয়া যান। নেপালের রাজ-গ্রন্থাগারে সেই গ্রন্থগুলি আজও সসম্মানে রক্ষিত আছে। মুসলমানদের এই গ্রন্থাগার-ধ্বংসের অপকীর্তি ভারতের

বহু রহিয়াছে। আলেকজান্দ্রিয়া, বাগদাদ ও সেকেন্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার ধ্বংস সাধনের কলঙ্ক-কুসুমিমা আজও ইতিহাস বিস্তৃত হইতে পারে নাই।

সেই সকল গ্রন্থাগারে বহু মূল্যবান পুস্তক স্থান পাইয়াছিল সত্য, কিন্তু জনসাধারণের জন্য তাহাদের দ্বার কোনকালেই উন্মুক্ত ছিল না। স্বয়ংগত যে গ্রন্থাগার সভ্যতার প্রতীক-

চিহ্নরূপ। কোন সভ্যতার অগ্রগতির প্রকৃত পরিচয় তাহার গ্রন্থাগারেই পাওয়া যাইবে। যে জাতির সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার নাই, সে জাতি অন্ধ। গ্রন্থাগার সার্বজনীন পাঠশালা। এখানে সকল মানুষের অবাধ আমন্ত্রণ। বিচার প্রণীত উপচার সাজাইয়া গ্রন্থাগারগুলি জ্ঞান-পিপাস্বদের জ্ঞান-তৃষ্ণা দূর করিবার জন্য দেশ-দেশান্তরে পবিত্র মন্দিরের স্তায় দাঁড়াইয়া আছে।

দিল্লীতে সম্রাট হুমায়ূনের ছিল বিখ্যাত গ্রন্থাগার। কিন্তু ভারতে আধুনিক গ্রন্থাগার সৃষ্টি হইয়াছে ইংরেজ আমলে। স্কুলে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে ইংরেজদের অত্মকরণে গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। স্কুল-কলেজের গ্রন্থাগারগুলি

ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সর্বসাধারণের জন্য স্থাপিত গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে রামমোহন লাইব্রেরী, চৈতন্য লাইব্রেরী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ, এশিয়াটিক সোসাইটি, বিশ্ব-ভারতী গ্রন্থাগার বিখ্যাত। তাহা ছাড়া, বহু বিখ্যাত ব্যক্তিদের গৃহে ছিল বহু মূল্যবান গ্রন্থ-সংগ্রহ। ইংরেজ-আমলে স্থাপিত ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী স্বাধীন ভারতে 'জাতীয় গ্রন্থাগার' নামে ওয়ারেন হেস্টিংসের বাসভনে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

সুগঠনাবে গ্রন্থাগার পরিচালনা একটি দায়িত্বপূর্ণ কাজ। অন্যান্য বিষয়ের মতো গ্রন্থাগার-পরিচালনা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থাও পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে আজ স্বীকৃত।

ভারতের মধ্যে বরোদাই গ্রন্থাগার পরিচালনায় সমধিক অগ্রগত। ভারতীয় গ্রন্থাগার সেখানকার পাঠক-সমাজের দায়িত্বশীলতা অভিনন্দনযোগ্য। সেখানে আছে ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার, যাহার অভাব ভারতে বিশেষভাবে অনুভূত হয়। গ্রামে গ্রামে ইহার পুস্তক লেনদেনের দৃষ্টান্ত সমগ্র ভারতের অত্মকরণযোগ্য।

অতীতের কোলে যে সমস্ত মনীষীদের কণ্ঠ চিরদিনের মতো নীরব হইয়া গিয়াছে, যাহাদের জ্ঞানালোকিত সান্নিধ্য লাভের আর উপায় নাই, গ্রন্থাগার মাধ্যমে আমরা তাহাদের লেখনী-নিঃসৃত বাণীময় জগতের সহিত পরিচিত হইতে পারি। স্বাধীন ভারতে কেন্দ্রীয় ভাবাবধানে দেশময় গ্রন্থাগারের একটি জাল বিস্তৃত হওয়া উচিত, যাহাতে গ্রাম ও শহর বাধা পড়িবে, যাহাতে ধনী-দরিদ্র সকলের থাকিবে প্রবেশের সমান অধিকার।

এই প্রবন্ধের অন্তঃসরণে লেখা যায় :

- পুস্তকাগার
- পাঠাগার
- সাধারণ পাঠাগার

এবং-মৃত্যু : মৃত্যু। সময় অনন্ত, কিন্তু  
 জীবন ক্ষুদ্র, তাই সময় মূল্যবান। সময় অমূল্য।  
 সময়ের অবহেলাই সময়ের অপচয়। সময়ের  
 মূল্যবোধের অর্থ। উপসংহার :-

মা. '৪৭, '৭০

অনন্ত প্রসারিত সময়ের পথ। পথিক-মানুষ সময়ের সেই পথ-রেখা ধরিয়া  
 অগ্রসর হয়। সময়ের দ্বারা মানব-জীবন যদি অন্তহীন হইত, তবে মানুষের চেষ্টা  
 থাকিত না। সময় নিরবধি, কিন্তু মানব-জীবন সংক্ষিপ্ত। এইখানেই গরমিল।  
 মানুষ চায় তাহার সংক্ষিপ্ত জীবনায়তনের মধ্যে বহুতর কর্মের উদ্‌যাপন। কিন্তু সময়  
 তাহা মঞ্জুর করে না। কর্ম-উদ্‌যাপনের পূর্বেই তাহার বিদায়ের ডাক আসিয়া পড়ে।

মানুষের কাছে সময় তাই অমূল্য ধন। 'সময় চলিয়া যাত নষ্টের  
 মতন'

শ্রোতের প্রায়।' বাস্তবিকই, নদীর শ্রোতের দ্বারা সময়ও সর্বদা  
 অস্থির। প্রবাহমানতাই তাহার মৌল বৈশিষ্ট্য। কোথাও সে স্থির থাকে না, তাহারও  
 জন্ত সে অপেক্ষা করে না—'চরৈবেতি চরৈবেতি'—চলো, চলো, চলো—অনাহুত  
 রবে ছুটিয়া চলাই তাহার মর্মবাণী। মানুষের জীবনও সেই চলার চাক্ষুশের  
 বীথিয়াছে। সময়ের অন্তহীন প্রবাহে সে ছুটিয়া চলিয়াছে জন্ম হইতে মৃত্যুর অভিমুখে।

সময়ের এই ধাবমানতার ভিত্তি জীবন মানুষের কাছে পরম মূল্যবান। সময় অনন্ত,  
 কিন্তু জীবন সীমাবদ্ধ। তাহার এক প্রান্তে জন্ম, অন্য প্রান্তে মৃত্যু। এই জন্ম ও মৃত্যুর  
 মাঝে জীবন সঙ্গ-সঙ্কুচিত। মানুষ চায় সময়ের অন্তহীনতার মধ্যে অন্তহীন জীবন  
 কিন্তু পায় না। তাহাই মানব-জীবনের চরম ট্রাজেডি। তাই কবি হইন্দ্রদাস  
 বলিয়াছেন—'His life is a vision or a watch between a sleep and a  
 সময় অনন্ত, কিন্তু sleep.' হই প্রান্তেই গুম, ঘুমের মধ্যে অন্ধকার। মাঝখানে  
 জীবন ক্ষুদ্র, তাই সময় শুধু একটুখানি চোখ মেলিয়া চাওয়াই জীবন। জীবনের এই  
 মূল্যবান

সীমাবদ্ধতার ভিত্তি বাংলার লোককবিও অল্প বিসর্জন করিয়াছেন—  
 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মাঝখানে চর।' এক পারে জন্ম, অন্য পারে মৃত্যু; মাঝখানে  
 সংক্ষিপ্ত, সীমাবদ্ধ জীবন। জীবনের এই সীমাবদ্ধতার ভিত্তি সময় এত মূল্যবান। সময়  
 অনন্ত, কিন্তু জীবন তাহার অতি সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র। তাই তো জীবন আমাদের  
 নিকট পবন আনন্দীয় এবং আমাদের নিকট অমূল্য ও আকর্ষণীয়।

সময়ের চলমানতার ভিত্তি তাহা মানব-জীবনের একটি সম্পদ। সঙ্গ-চকল সময়  
 কাহারও জন্ত অপেক্ষা করে না। অর্থবান লোকেরা ইচ্ছামতো জগতের যে-কোন দ্রব্য  
 ক্রয় করিতে পারেন। কিন্তু সময়কে ক্রয় করা যায় না। সময় মানুষের সকল ক্রয়  
 ক্ষমতার উর্দে। পাখির জগতের সময় কিছুকে অনায়াসে উড়ত

সময় অমূল্য

অবহেলা করিয়া সময় বাধাবন্ধনস্বরূপে ছুটিয়া চলিয়া যায়।  
 তাহার কোন কিছুর প্রতি আসক্তি নাই, নাই অহেতুক আকর্ষণ। শুধু চলা,—চলা,—  
 চলা। তাহার এই নির্মম নিষ্ঠুর চলার ভিত্তি তো সময় যেমন অবিচল

জীবনের এই সীমাবদ্ধ অবসরে সময়ের যে ভগ্নাংশটুকু পাওয়া যায়, তাহার সন্ধ্যাবহারের মাধ্যমেই জীবন সার্থক এবং সুখময় হইয়া উঠে। কাজেই, জীবনের সীমায়ত্ত্বের মধ্যে যে পরম মূল্যবান সময় আমরা পাই, তাহার যদি অবহেলা করি, যদি আলস্তভরে সেই দুর্লভ সময় কাটাইয়া দিই, তাহা হইলে তাহা হয় সময়ের অপচয় মাত্র। সেই অপচয়ের বেদনা আমাদের জীবনে একদিন মর্মান্তিক দুঃখের আকারে নামিয়া আসিবে। তখন বুক-কাটা আর্তনাদে কিংবা অজস্র অশ্রুবর্ষণে কিংবা অহুতাপের অন্তর্দাহে সেই আলস্ত-অভিবাহিত সময় আর কিরিয়া পাওয়া যাইবে না।

সময়ের অবহেলাই  
সময়ের অপচয়

আসল কথা হইল, সময়ের যথার্থ মূল্যবোধই জীবনে সাক্ষ্য অর্জনের সোপান। সময়ের মূল্যবোধ হইল, যে সময়ের যে কাজ, তাহা সেই সময়ে সম্পাদন করা। যে তাহা করে না, সে করে সময়ের অমর্যাদা; পরাজয়ই হয় তাহার জীবনের ভাগ্যলিপি। সময়ের এই অবহেলার জগু ভবিষ্যতে তাহাকে কঁাদিতে হইবে। যে কৃষক কসলের ঋতুতে কসলের বীজ বপন না করিয়া আলস্তে সময় অভিবাহিত করে, সে কিরূপে কসল উঠিবার সময় গ্রাম্য-পূর্ণ কসল আশা করিবে? কসল উঠিবার সময় কসলের বীজ বপন করিলে তো আর চলিবে না? সময় চলিয়া গিয়াছে, কসলের ঋতু কবে সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। এখন কঁাদিয়া কিছু হইবে না। মানব-জীবনেও সেই এক কথা। জীবনে যখন শক্তি থাকে, সামর্থ্য থাকে, তখন আলস্তে অথবা কালহরণ করিয়া জীবন কাটাইলে জীবন-শায়াহুে অবশুই দুঃখ-ভোগ করিতে হইবে।

সময়ের মূল্যবোধের  
অর্থ

শৈশবই কর্ম-জীবন প্রবেশের ভোর-দ্বার। এই সময়ই জীবনের প্রস্তুতির কাল। ভবিষ্যৎ কর্ম-জীবনে সকল দায়িত্বভার বহনের যোগ্যতা এই সময়েই অর্জন করিতে হইবে। শৈশবকালের প্রতিটি মুহূর্তকে যথাযথভাবে ব্যবহার করিলে এবং অমূল্য সময়ের অপচয় না করিয়া প্রতিটি দুর্লভ মুহূর্তকে জীবনক্ষেত্রে প্রয়োগ করিলে পরবর্তী কালে সুখ ও শান্তি—দুই-ই পাওয়া যাইবে। শৈশবেই আমাদের উপলব্ধি করিতে হইবে যে, সময় অমূল্য রতন। সেই অমূল্য রতন রহিয়াছে আমাদের সকলের অধিকারে। তাহাকে কাজে লাগাইতে পারিলেই হইবে তাহার পরম সন্ধ্যাবহার। আবাল্য অভ্যাসের দ্বারাই দুর্লভ সময়ের সেই সন্ধ্যাবহার আয়ত্ত করা যায়; সেই অভ্যাসের কলে জীবনে আসে সমদ্বাহুবর্তিতা। সমদ্বাহুবর্তিতাই জীবনে সাক্ষ্য লাভের চাবিকাঠি এবং সমদ্বাহুবর্তিতার মাধ্যমে কল্যাণপূত কর্মেই জীবনের চরম সার্থকতা।

উপদেশ-স্বরূপ

এই প্রবন্ধের অন্তঃসরণে লেখা যায় :

- সময়ের সন্ধ্যাবহার, বা. '৫৭
- সমদ্বাহুবর্তিতা, বা. '৭০
- 'জীবনের মূল্য জাহুতে নহে, কল্যাণপূত কর্মে।'

প্রবন্ধ-মুদ্রা : রচনা। পরিশ্রম : ভাণ্ডার  
রচনা ও প্রতিভার বিকাশ। পরিশ্রম বিশ্ব-জননীর  
পূজার উপচার। পরিশ্রম-ভিত্তিক জাতীয়বিভাগ,  
জাতিভেদের মুক্ত। অমিত্র-শাস্ত্রনা। উপসংহার।

উ. মা. '৩১, '৩৩; গো. প্রা. '৩৩

পরিশ্রমই বর্তমান দুনিয়ার সংগ্রামের প্রধানতম হাতিয়ার। বর্তমানের পৃথিবী সংগ্রামময়। সংগ্রাম ভিন্ন এই পৃথিবীতে জয়লাভের দ্বিতীয় পন্থা নাই। অতএব সংগ্রামই শক্তি এবং পরিশ্রম সেই সংগ্রামের রূপকার। বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার এই চরম সমুন্নতির দিকে তাকাইয়া আমরা মাঝে মাঝে বিম্বয়ে হতবাক হইয়া যাই। সভ্যতার এই চরম বিকাশের মূলে রহিয়াছে যুগ-যুগান্তরের লক্ষ-কোটি মানুষের অতুরন্ত শ্রম। বহু মানব তাহাদের বহু দিবসের শ্রম তিলে তিলে দান করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে

সভ্যতার এই তিলোত্তমা মূর্তি। তাহাদের নাম ইতিহাসে লেখা হইয়াছে।

নাই। তাহারা পাহাড় ভাঙ্গিয়া পথ প্রস্তুত করিয়াছে, সেতু-বন্ধনে বাঁধিয়াছে নদীর উভয় তটভূমিকে, নির্মাণ করিয়াছে প্রাসাদ-অট্টালিকা। কেহ কলাইয়াছে সোনার ধান, কেহ বুনিয়াছে লক্ষ্য-নিবারণের বস্ত্র, কেহ-বা জীবনকে স্বপ্নের ও আকর্ষণীয় করিয়া তুলিবার জন্য রচনা করিয়াছে সৌন্দর্য-বিলসিত, শিল্প-সৌকর্যময় নানা জব্য-সামগ্রী। সকলের পরিশ্রমের যৌথ প্রয়াসে সভ্যতার এই অনবদ্য বিকাশ সম্ভব হইয়াছে। সভ্যতা তাই মানুষের যুগ-যুগান্তরের পরিশ্রমের সম্মিলিত যোগকল।

মানুষ একদিকে যেমন সভ্যতার স্রষ্টা, অন্যদিকে সে তেমনি আপন ভাগ্যের কারিগর। নিজের ভাগ্যকে মানুষ নিজেই নির্মাণ করিতে পারে। তাহার ভাগ্য-নির্মাণের হাতিয়ার হইল তাহার পরিশ্রম। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আছে সুপ্ত প্রতিভা।

পরিশ্রমের দ্বারা এই সুপ্ত প্রতিভা জাগরিত হইতে পারে।

পরিশ্রম : ভাণ্ডার-রচনা  
ও প্রতিভার বিকাশ

পৃথিবীতে যে সব ব্যক্তি প্রতিভাবান বলিয়া স্বরণীয় ও বরণীয় হইয়া আছেন, তাহারা আশৈশব করিয়াছেন কঠোর পরিশ্রম এবং তাহার কলে তাহাদের প্রতিভা পুষ্পের মতো বিকশিত হইয়া পৃথিবীকে সৌরভ বিতরণ করিয়াছে। পরিশ্রমের অভাবে তাহাদের সেই প্রতিভা কখনও বিকশিত হইতে পারিত না। পরিশ্রম ভাণ্ডার-গঠনের বড়ো হাতিয়ার।

পৃথিবীর সকল কার্য-সম্পাদনে পরিশ্রম প্রয়োজন। পরিশ্রম ব্যতীত কোন কাজই সম্পাদিত হইতে পারে না। আর, সকল কাজই পৃথিবীর কাজ—বিশ্ব-জননীর পূজার

পরিশ্রম বিশ্ব-জননীর  
পূজার উপচার

আয়োজন। পৃথিবীতে স্ব-স্ব শক্তি-অনুযায়ী সকল কাজই মানুষের করণীয়। তাহাতে কাজের যেমন কোন জাতিভেদ নাই, বাহ্যিক সেই কাজ করে, তাহাদেরই কোন জাতিভেদ নাই। হুতরাং পরিশ্রমের মাধ্যমে জগতের যে কাজ সংস্খিত হয়, তাহা আর কিছু নয়, বিশ্ব-জননীর পূজা। পরিশ্রম হইল বিশ্ব-জননীর ওখা মানব-সভ্যতার সেই পূজার উপচার।

মানুষ এই পৃথিবীতে সমাজ রচনা করিয়াছে। সমাজের উন্নতি-বিধানের জন্য সকল মানুষেরই পরিশ্রম করা উচিত। কিন্তু সকল মানুষের পক্ষে সমাজের সকল কাজই করিয়া উঠা সম্ভব নয়। তাহাতে সামাজিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে।<sup>১</sup> সেই সামাজিক বিশৃঙ্খলা পরিহার করিবার জন্য মানুষ করিয়াছে কার্যের শ্রেণী-বিভাগ। তাহারই পরিণামে সমাজে আসিয়াছে ঘৃণ্য জাতিভেদ-প্রথা। ভারতের মতো পৃথিবীর কোন দেশেই এই কর্ম-ভিত্তিক, শ্রম-ভিত্তিক জাতিভেদ-প্রথা ছিল না। কিন্তু তাহাতে মানুষকে করা হইয়াছে ঘৃণা, মানবতার ঘটিয়াছে চরম অপমান। তাই জাতিভেদ লইয়া পৈশাচিক উল্লাস ভারতবর্ষের মতো পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় নাই।

সমাজের উচ্চতরের মানুষ বাহারা, তাহারা লইয়াছে সম্মানের কাজ, গৌরবের কাজ। সমাজের সমস্ত স্বধ-সুবিধা আপনাদের কৃষ্ণিগত করিয়া তাহারা তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মানুষকে নিক্ষেপ করিয়াছে অপমান, ঘৃণা ও বঞ্চার নীরস্ত অন্ধকারে। অথচ সেই শ্রমিকেরা চিরকাল 'অন্ন বস্ত্র কলিঙ্গের সমুদ্র-নদীর ঘাটে ঘাটে' বীজ বুনিয়াছে, পাকা ধান কাটিয়াছে। তাহারা ধরিজীর বন্ধ বিদার করিয়া সোনার কসল ফলাইয়াছে, তাঁতী বসিয়া তাঁত বুনিয়াছে, জেলে ধরিয়াছে মাছ। 'বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার, তারি' পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।' অথচ তাহারা পায় নাই যথার্থ মানুষের সম্মান।

যুগের পর যুগ চলিয়া গিয়াছে, শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হইয়া গিয়াছে। শত শত সাম্রাজ্যের ধ্বংস হু-পের উপরে শ্রমিক-দুনিয়ার মানুষ সভাতার বেনীমূলে অকাতরে তাহাদের শ্রম ঢালিয়া দিয়া নীরবে চিরকাল কাজ করিয়া আসিয়াছে। তাহাদের কর্মের জয়োল্লাসে মুখরিত পৃথিবীর পথ-প্রান্তর। কত রাজ্য-ভাঙ্গাগড়া হইয়া গিয়াছে, পৃথিবীতে ঘটিয়াছে কত সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন। কিন্তু তাহারা 'যেই তিমিরে, সেই তিমিরে।' আজ পৃথিবীতে নবযুগ আসিয়াছে। শ্রমিক-স্বার্থ আজ দিকে দিকে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়ায়, কমুনিষ্ট চীনে শ্রমিক-সমাজ আজ রাষ্ট্র-পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। ব্রিটেনেও রহিয়াছে শ্রমিক দল। রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব পরিচালনার ক্ষমতা রহিয়াছে তাহাদেরও। ভারতেও এখন সেই পুরাতন সমাজ ভাঙ্গিয়া নতন সমাজ-বিস্তারের কাজ শুরু হইয়াছে। জাতিভেদ-প্রথা এখন অতীত ইতিহাসের বিষয়। তাহা ছাড়া, ভারতে অনেক শ্রমিক-কল্যাণ সমিতিও স্থাপিত হইয়াছে। আজ ভারতে কোন কাজ, কোন পরিশ্রমই আর ঘৃণ্য নয়। পরিশ্রমের গৌরব আজ বিধোবিত হইতেছে দিকে দিকে।

এই প্রবন্ধের অন্তরালে লেখা যায় :

● এদের মূল্য

● এদের স্বাধীনতা, উ. দা. [ কম্পার্ট. ] '৩১, '৩৩; পৌ. প্রা. '৩৩



এবং-সুখ : সুচনা। ক্রিকেট খেলার ইতিহাস।

৩২.

সরঞ্জাম ও ক্রীড়া-বিধি। ক্রিকেটের পোশাক ও

ক্রীড়ার আনুশঙ্গিক অনুষ্ঠান। খেলার আরম্ভ ও

খেলার নিয়ম। আউট-বিদ্ধি। ক্রিকেট-জগৎ।

ক্রিকেট-জগতে ভারত। উপসংহার।

## খেলার রাজা ক্রিকেট

খেলার রাজা ক্রিকেট; আবার রাজার খেলা ক্রিকেট। ক্রীড়া-জগতে ক্রিকেটের স্থান সর্বোচ্চে; তেমনি ক্রিকেট খেলার ব্যয়-বাহুল্য এবং ক্রীড়া-পরিধির দীর্ঘায়ত ব্যাপ্তি ইহাকে রাজকীয় মর্যাদা দান করিয়াছে। আভিজাত্যের জন্মে এবং চিত্তহারী চমৎকারিষের আকর্ষণে এই খেলার বৃষ্টি তুলনাই নাই। ক্রিকেটের সুচনা: স্বভাব-ধর্ম্মে আছে যে গৌরবজনক অনিশ্চয়তা, তাহাতে ইহার আকর্ষণীয়তা বৃদ্ধি পাইয়াছে সমধিক। তাহাছাড়া, এই খেলার নিয়ম-কান্ডনের এত কড়াকড়িরও তুলনা নাই। আবার, এই খেলা উপভোগের জন্য হাতে অদূরস্থ অবকাশ এবং আধিক সচ্ছলতায় বিশেষ প্রয়োজন। তাই ক্রিকেট যেমন খেলার রাজা, তেমনি রাজার খেলাও বটে।

এই খেলার জন্মভূমি ইংলণ্ড। ইংরেজ জাতির উদ্ভাবনী শক্তিতে ইহার উদ্ভব, তাহাদের উৎসাহে ইহার বিকাশ, তাহাদের বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য-বিস্তার ইহার প্রচার এবং খেলার উন্নত ক্রীড়াশৈলীতে ইহার শ্রেষ্ঠতা। উনবিংশ শতাব্দীতে এবং বিংশ শতাব্দীর পূর্বাঙ্কে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সম্প্রসারিত চইয়াছিল। পৃথিবীর যেখানেই ইংরেজ জাতি গিয়াছে, সেখানেই সে তাহার এই গৌরবজনক ক্রীড়ার জাতীয় ঐতিহ্যকে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে। আন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভাঙিয়া গিয়াছে, কিন্তু বিভিন্ন দেশের মধ্যে সেই ক্রীড়ার গৌরবময় ঐতিহ্য এখনও অক্ষুণ্ণ আছে।

পূর্বে এই খেলার পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল একটু অদ্ভুত ধরনের। উপকরণগুলিও ছিল অদ্ভুত আকৃতির। ক্রমে বিবর্তিত হইয়া তাহাদের রূপ-পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এক জোড়া ব্যাট, চয়টি স্টাম্প ও বল—ক্রিকেট খেলার ইহাট সরঞ্জাম। বৃত্তাকার মাঠের কেন্দ্রে বাইশ গজ স্থানিমিত্ত জমি—ক্রিকেটের পরিভাষায় ইহার নাম 'পীচ'।

পীচের উভয় প্রান্তে 'বেল'-নিবন্ধ তিনটি করিয়া স্টাম্প প্রাধিক্ত থাকে। এক প্রান্তের স্টাম্পের সম্মুখে ব্যাটসম্যান 'ব্যাট' করেন এবং অন্ত প্রান্তে প্রতিপক্ষের বোলার করেন 'বল'। বল পড়ে, ব্যাট নড়ে। চলে ব্যাট ও বলের লড়াই। উভয়ে উভয়ের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিবার জন্য করেন প্রাণপণ প্রয়াস। ব্যাটসম্যান বলকে বাউণ্ডারীর বাহিরে পাঠাইয়া 'রান' তুলিবার চেষ্টা করেন। অন্তর্দিকে, বোলার-সম্মত মোট এগারোজন ফিল্ডসম্যান তাঁহাকে আউট করিবার জন্য ওত পাতিয়া থাকেন। মাত্র কয়েক ফুট পিছনে থাকা পাতিয়া থাকেন উইকেট-কীপার তাঁহাকে 'স্টাম্প-আউট' করিবার জন্য।

সরঞ্জাম ও

ক্রীড়া-বিধি

নির্ধারিত সময়ের পূর্বে কালো প্যাট, শালা আলখান্নার মতো জামা এবং মাথায় টুপি পরিয়া দুইজন আম্পায়ার মাঠে উপস্থিত হইয়া পীচের উভয় প্রান্তে ‘উইকেট’ রচনা করিয়া দেন।

ক্রিকেটের পোশাক ও  
ক্রীড়ার আনুপূর্বিক  
অনুষ্ঠান

ক্রীড়ারস্তের সংকেতমাত্র উভয় পক্ষের ক্যাপ্টেন বা স্কীপার প্যাতিভিলিয়ান বা শিবির হইতে বাহির হইয়া আসেন। তাঁহাদের পরনে শালা ফুলপ্যাট, পায়ে কেড্‌স, গায়ে শালা ফুলশার্ট, মাথায় ক্যাপ। খেলা আরম্ভ হইবার আগে তাঁহারা পীচ পরীক্ষা করিয়া উইকেটটিকে ভালো করিয়া দেখিয়া যান। উইকেটের চরিত্র দেখিয়াই

তাঁহারা বোলিং বা ব্যাটিং-এর ধারা নির্ধারিত করিয়া লইতে পারেন। তারপর ‘টস’ করিয়া স্থির হয়, কোন্ পক্ষ আগে ব্যাটিং করিবেন কিংবা কোন্ পক্ষ ফিল্ডিং করিবেন।

‘টসে’ বিজয়ী দলের দুইজন ব্যাটস্ম্যান ‘ওপেনার’ হিসাবে ব্যাট করিতে নামেন। তাহাদের ক্রীড়া-নৈপুণ্যের উপর সমস্ত খেলাটির ভাগ্য নির্ভর করে। তাঁহারা ইনিংসের গোড়াপত্তন করেন। প্রতিপক্ষের ক্যাপ্টেন নির্দিষ্ট বোলারের হাতে বল দিয়া বিশেষ কৌশলে আক্রমণ রচনা করিবার নির্দেশ দেন। বিধি-বহির্ভূত বল

খেলায় আরম্ভ ও  
খেলায় নিয়ম

হইল ‘নো বল’। পীচ বল পড়িবামাত্র উইকেটটিকে আড়াল করিয়া ব্যাটস্ম্যান বল মারিয়া ‘রান’ তুলিতে থাকেন। বল হয়

নানা ধরনের—কাস্ট, স্পিন, ইনস্বিং, গুগলি, অক্সব্রেক, ইয়র্কার, বাম্পার ইত্যাদি। ব্যাট করার ভঙ্গিও নানা প্রকারের—ড্রাইভ, স্ট্রাইপ্‌, স্ট্রোক ইত্যাদি।

বোলার করিবেন ব্যাটস্ম্যানকে আউট করিবার চেষ্টা; আর, ব্যাটস্ম্যান উইকেট রক্ষা করিয়া চেষ্টা করিবেন বলকে সীমানার বাহিরে পাঠাইয়া রানের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে। এইভাবে খেলা বেশ জমিয়া উঠে। প্রতিপক্ষের এগারোজন খেলোয়াড় বিভিন্ন স্থানে শিকারী বাঘের মত ওত পাতিয়া থাকেন। তাঁহারা বলকে সীমানার বাহিরে যাইতে

না দিয়া রান রক্ষা করিবেন কিংবা মাটি ছুঁইবার আগে শূন্যে বলটি ধরিয়া ব্যাটস্ম্যানকে ‘ক্যাচ-আউট’ করিবার চেষ্টা করিবেন।

ক্যাচ-আউট ছাড়া আছে বোল্ড-আউট, রান-আউট, লেগ-বিকোর উইকেট, স্টাম্প-আউট ইত্যাদি। প্রথম ইনিংসে দ্বিতীয় পক্ষ যদি প্রথম পক্ষের অপেক্ষা দুইশত রান কম করেন, তাহা হইলে অসম্মানজনক ‘কলো-অন’ করিতে বাধ্য হন।

ক্রিকেট-জগৎ ইংলণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ভারত, পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ছিল সাম্প্রতিক ক্রিকেট-জগতে দুর্ধর্ষ দল। এখন <sup>পাকিস্তান</sup> ভারতের জাতীয় ক্রিকেটে রনজি ট্রফির প্রতিযোগিতা উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় হইয়া উঠে আন্তর্জাতিক টেস্ট খেলাগুলি। উন্নত ক্রীড়াধারা, প্রতিযোগিতার তীব্রতা

ক্রিকেট-জগৎ

এবং জাতীয় মর্যাদা-বোধের সংমিশ্রণে সেই খেলাগুলি অত্যন্ত উপভোগ্য হইয়া উঠে। ভারতীয় ক্রিকেটে রণজিৎ সিংহী, লালু আমরনাথ, বিজয় হাজারে, সি. কে. নাইডু, বিজয় মাঠে প্রভৃতির নাম স্মরণীয় হইয়া আছে। বিশ্ব-ক্রিকেটে জন ব্র্যাডম্যান, ওয়েল-ইয়ারি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। বর্তমান

ক্রিকেট-বিখে বাহারা ক্রিকেটকে উজ্জ্বল ও উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে স্বর্গত ওরেল সর্বাগ্রগণ্য। তিনিই ক্রিকেটকে অপমৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিয়া সাবলীল ও প্রাণবন্ত করিয়া গিয়াছেন।

ক্রিকেট-জগতে ভারত সম্পর্কে ইংলণ্ডের উদ্বাসিততা ছিল প্রচুর। তাহাদের মনোভাবের সমুচিত জবাব তাহারা পাইয়াছে দুইবার—১৯৬১ সালে ও ১৯৬৩ সালে। দুইবারই তাহারা ভারত-ক্রমণে আসিয়া পরাজয় বরণ করিতে বাধ্য হয়। এমন-কি, ১৯৬০ ও ১৯৬৪ সালে ভারত দুর্ধর্ষ অস্ট্রেলিয়া দলকেও পরাস্ত করিয়া তাহাদের বিশ্বজয়ী গৌরব স্নান করিয়া দিয়াছে। ১৯৬৬-৬৭ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ্ ভারত-ক্রমণে আসে। তাহাতে দুইটি টেস্টে ভারত পরাজিত হয় এবং তৃতীয় টেস্টে গৌরবদীপ্ত জয়ের পথে অগ্রসর হইলেও শেষ পর্যন্ত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ্ দলের দৃঢ়তায় খেলাটি অমীমাংসিতভাবে সমাপ্ত হয়। কারণ, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ্ তখন বিশ্ববিজয়ী, ‘ব্যাটিং’ এবং ‘বোলিং’ উভয় দিকেই প্রচণ্ড শক্তিশালী। ১৯৬৭ সালে ভারত ইংলণ্ড ক্রমণে

গিয়া সব কয়টি টেস্টেই পরাজয় বরণ করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু ক্রিকেট-জগতে ভারত — ভারতীয় স্থল-ক্রিকেট দল ইংলণ্ডের মাটিতে যে গৌরবদীপ্ত জয়ের স্বাক্ষর রাখিয়া আসে, তাহাতে বিশ্ব চমৎকৃত হইয়া যায়। এদিকে, ১৯৬৭-৬৮ সালে ভারতীয় ক্রিকেট দলের অস্ট্রেলিয়া-সফর কেবল পরাজয়ের মানিতেই পূর্ণ হইয়া উঠে। ১৯৬৯-৭০ সালে অস্ট্রেলিয়া ভারত-সফরে আসিয়া ‘রাবার’ জয় করিয়া লইয়া যায়। ইতিমধ্যে ভারতীয় ক্রিকেটের অধিনায়কত্ব মনমুর আলি পতৌদির হাত হইতে আসে স্ত্রীংগা অধিনায়ক ওয়াদেকারের হাতে। তাহার নেতৃত্বে ভারতীয় দল ১৯৭১ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ্ ও ইংলণ্ড সফরে অর্জন করিয়াছে ‘রাবার’ লাভের দুর্লভ গৌরব। তাৎপর্য ১৯৭২-৭৩ সালে ইংলণ্ড দল ভারত-সফরে আসে এবং ভারত তাহাতে তাহার বিজয়ী গৌরব অন্ধান রাখে। কিন্তু ১৯৭৪ সালে ভারতীয় দলের ইংলণ্ড সফর পরাজয়ের মানিতে ভরা। এদিকে ১৯৭৪-৭৫ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ্ দলও ভারত-সফরে আসিয়া ‘রাবার’ লইয়া ঘরে ফেরে। ইতিমধ্যে ওয়াদেকারের অবসর গ্রহণের পর বিশেষ সিং বেদী-দল-নাথক নির্বাচিত হইয়াছেন।

এখন পৃথিবীতে সকলেই ‘ট্রাইট’ ক্রিকেট খেলার পক্ষপাতী। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ্ দলের ওরেলই ছিলেন এই ‘ট্রাইট’ খেলার একজন প্রধান প্রবক্তা। বর্তমানে ভারতীয় দল ‘ব্যাটিং’, ‘বোলিং’ এবং ‘কিডিং’-এ ধীরে ধীরে শক্তি অর্জন উপদেহার করিতেছে। ক্রিকেট ভারতের জাতীয় খেলা নয়, তবু ভারত ইচ্ছাতে পৃথিবীর শক্তিশালী দলগুলির সমীহ আদায় করিতে সক্ষম হইতেছে। ইচ্ছা নিঃসন্দেহে ভারতের পক্ষে পরম গৌরবের বিষয়।

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

● ক্রিকেট খেলা

● • ক্রিকেটে ভারতের স্থান

এবং-সুখ : সূচনা। জীবনে শরীর-চর্চায়  
প্রয়োজনীয়তা। স্বাস্থ্য সুখলাভের প্রথম শর্ত।  
স্বাস্থ্যই স্বাস্থ্য-সংঘাত জয়ের শ্রেষ্ঠ আয়ুধ। জীবনে  
প্রতিযোগিতায় জয়লাভের প্রধান উপায়। শরীর-  
চর্চায় দিক-দিশস্ত। উপসংহার।

৩৩.

## শরীর-চর্চা ও খেলাধুলা

মা. '৩২

“চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু, সাহস-বিস্তৃত বক্ষপট।” —রবীন্দ্রনাথ

শরীরই সর্বস্ব। শরীরই মানুষের প্রথম পরিচয়। এই শরীর লইয়াই মানুষ  
পৃথিবীতে আসে। কাজেই, জীবন-পথে তাহার পরিক্রমণের প্রধান অবলম্বন হইল  
এই শরীর। শরীরই হইল তাহার ভেলা। তাহাতে চড়িয়াই  
সূচনা  
সে জীবন-সমুদ্রে সাবলীলভাবে অতিক্রম করিবে। সেজন্য চাই  
সুস্থ, সবল নীরোগ শরীর। ধনৈশ্বৰ্য নয়, বিষয়-আশয় নয়; শরীরই সব। শরীরই  
স্বথ, শরীরই সম্পদ।

কবি তাই বলেন—‘চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু, সাহস-বিস্তৃত  
বক্ষপট।’ সংসার-যাত্রায় আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু কাম্য। কিন্তু তাহা লাভের  
প্রকৃষ্টতম পন্থা হইল সুস্থ, সবল ও নীরোগ শরীর-গঠন। শরীর-চর্চাই হইল গোড়ার  
কথা। শরীর-চর্চা বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যলাভের পথ ঐকান্তিক করিয়া দেয়।

জীবনে শরীর-চর্চায়  
প্রয়োজনীয়তা:

সেই বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যই জীবনে সাক্ষ্য লাভের প্রধানতম হাতিয়ার।  
মানবজীবনে সাক্ষ্য লাভের জন্য মানুষকে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে

হয়। বহু দুঃখ-দহন ও কষ্ট-সহনের পরিণামে একদিন মানুষের কপালে জোটে  
সাক্ষ্যের বিজয়-তিলক। দুর্বল ও রুগ্ণ শরীরের অধিকারী যাহারা, তাহাদের দ্বারা  
সম্ভব নয় কষ্টসাধ্য কর্মের উদ্‌যাপন; সাক্ষ্যের অমৃত-ভাগ তাই তাহাদের ভাগ্যে দুর্লভ।

মানুষ মাত্রই স্ব্থের প্রত্যাশী। স্ব্থের অন্বেষণে সে জীবনের পথে-প্রান্তরে ঘুরিয়া  
বেড়ায়। সুস্থ শরীরই সেই সুখলাভের প্রথম শর্ত। অসুস্থ শরীর যাহাদের, রোগ-

যন্ত্রণায় যাহারা সর্বদা কাতর, তাহারা প্রকৃতই হতভাগ্য। কারণ  
তাহারা জীবনে দুর্লভ স্ব্থের আশ্বাদন করিতে পারিল না। জীবনে

স্বাস্থ্য সুখলাভের  
প্রথম শর্ত

যাহারা স্ব্থের মুখ দেখিল না, তাহাদের জীবন ব্যর্থ। আবার,  
সুস্থ ব্যক্তির কাছে যাহা স্বথ, অসুস্থ ব্যক্তির কাছে তাহাই চরম অস্ব্থের কারণ।  
কাজেই, স্বথ ব্যক্তি-সাপেক্ষ এবং স্বাস্থ্য সুখলাভের প্রধানতম উপকরণ।

অপর পক্ষে, জীবন-পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়; যন্ত্রণাজর্জর, কণ্টকাকীর্ণ। এখানে পদে  
পদে স্বাস্থ্য-সংঘাত, প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর হাতছানি। প্রাকৃতিক বিরুদ্ধ শক্তি এবং রোগ-

ভাগ-জরা জীবনের অস্তিত্বকে নিশিচু করিবার জন্য নিয়ন্ত গোপন  
চক্রান্তে লিপ্ত। ‘সেই চক্রান্তকে পরাস্ত করিয়া জীবনের ললাটে

স্বাস্থ্যই স্বাস্থ্য-সংঘাত  
জয়ের শ্রেষ্ঠ আয়ুধ

জয়টিকা পরাইবার শ্রেষ্ঠ উপায় হইল শরীর-চর্চা। স্বাস্থ্যই  
পৃথিবীতে স্বাস্থ্য-সংঘাত ও মৃত্যুর চক্রান্ত-বিজয়ের একমাত্র আয়ুধ।

শত্রুর ক্রাক্রমণে পরাজিত হয় তখন সমগ্র জাতি স্বদেশপ্রেমে উজ্জ্বল হইয়া স্বদেশের ও স্বজাতির মানমর্যাদা-রক্ষাকল্পে রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিবার জন্ত দলে দলে ছুটিয়া যায়। তখন মনে হয় 'নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।' দেশ-  
স্বদেশপ্রেমের উদ্বোধন দেশান্তরের ইতিহাসই তাহার সাক্ষী। দলে দলে অকাতরে প্রাণ বলি দিতে গিয়া কোন কোন দেশ অবীরা হইয়াছে এবং মহিলারা জ্বর-ব্রত অমুষ্ঠান করিয়াছে কিংবা জলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিয়াছে। ভারতের রাজপুতানার এইরূপ স্বদেশপ্রেমের কথা ইতিহাসে স্বর্ণাকরে লিখিত আছে।

প্রকৃতপক্ষে, দেশপ্রেমের উদ্ভব আত্মসম্মান-বোধ হইতে। যে জাতির আত্মসম্মান-  
 বোধ যত প্রবল, সেই জাতির স্বদেশপ্রেম তত প্রবল। স্বদেশপ্রেম একপ্রকার পরিভ্রম ভাবাবেগ। নিঃস্বার্থ হিংসাবিহীন দেশপ্রেমই প্রকৃত স্বদেশপ্রেম। ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র-  
 স্বার্থের গভী অতিক্রম করিয়া বৃহত্তর স্বার্থের দিকে যখন মন পরিচালিত হয়, যখন  
স্বদেশপ্রেমের প্রকৃত স্বরূপ আত্মকল্যাণ অপেক্ষা বৃহত্তর কল্যাণবোধ সক্রিয় হইয়া উঠে, তখন জলিয়া উঠে স্বদেশপ্রেমের নিকলুয প্রদীপশিখা। স্বদেশের মান-  
 মর্যাদা, তাহার গৌরব-খ্যাতি-রক্ষাকল্পে কত অমর প্রাণ শহীদ হইয়াছে। স্বদেশ-প্রেমিকের দেশসেবার পথে বাধা অনেক, অত্যাচার সীমাহীন। কিন্তু পথের ঝড়ঝঞ্ঝা-বজ্রপাত তাহাদের দৃঢ় বলিদ পদক্ষেপের নিকট মিথ্যা প্রমাণিত হইয়া যায়। পরদেশী শাসকের রক্তচক্ষু কিংবা উগ্ৰত অন্ত তাহাদের নিবৃত্ত করিতে পারে না। রাণা প্রতাপসিংহ, ছত্রপতি শিবাজী, ক্ষুদ্রিরাম, প্রফুল্ল চাকী, বীর সূর্য যেন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র প্রমুখ স্বদেশপ্রেমিকদের জীবনে লক্ষ্য করা যায় স্বদেশ-  
 প্রেমের উজ্জল দৃষ্টান্ত।

স্বদেশপ্রেম দেশ ও জাতির গৌরবের বস্তু, পরম প্লাবীর বিষয়। কিন্তু অন্ধ স্বদেশ-  
 প্রেম ধারণ করে ভয়ঙ্কর রূপ; জাতিতে জাতিতে সংঘাত ও সংঘর্ষ অনিবার্য করিয়া তুলে। অন্ধ স্বদেশপ্রেম কেবল স্বদেশের কথাই চিন্তা করে। আমার স্বদেশের ভয়গান গাহিতে গিয়া যদি অপরের স্বদেশপ্রেমকে আহত করি, তবে সেই অন্ধ স্বদেশপ্রেম বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে ডাকিয়া আনে ভয়াবহ রক্তাক্ত দ্বন্দ্ব-সংঘাত। মাহুঘের  
এক স্বদেশপ্রেমে হিরমন্ত: রূপ বক্ষ-ক্ষরিত রক্ত-পিচ্ছিল পথে চলিতে থাকে উগ্র দেশপ্রেমের নৃশংস অভিযান। হিটলারের জার্মানি এবং মুসোলিনীর ইতালি উগ্র জাতীয়তার সেই নগ্ন বীভৎস প্রকাশের মধ্য দিয়া সেদিন বিশ্ব-মানবতার বক্ষে পদস্থাপনে উগ্ৰত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ এই উগ্র এবং অন্ধ জাতীয়তার ছিলেন ঘোর বিরোধী। যখন পাশ্চাত্য দেশগুলি অন্ধ জাতীয়তার মোহে উন্নত হইয়া পরস্পর হানাহানিতে ব্যস্ত, তখন রবীন্দ্রনাথ তাহার উগ্র ছিন্নমস্তা রূপের সমালোচনা করিয়া ও সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়া অনেকের বিরাগভাজন হন।

আসল কথা, স্বদেশপ্রেমের সহিত বিশ্বপ্রেমের কোন পার্থক্য নাই। স্বদেশপ্রেম বিশ্বপ্রেমেরই নামান্তর। স্বদেশ, বলাবাহুল্য, বিশ্বেরই অন্তর্ভুক্ত। স্বদেশের মধ্য দিয়া পৃথিবীর সহিত আমাদের পরিচয় ঘটে। আমরা স্বদেশকে ভালোবাসিয়া তাহার

পদমূলে যে পূজা নিবেদন করি, তাহা বিশ্ব-দেবতার পদতলে গিয়া পৌঁছায়। কাজেই, স্বদেশপ্রেম, বলা যায়, বিশ্বপ্রেমের প্রথম সোপান। স্বদেশপ্রেমের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই আমরা বিশ্বপ্রেমের জগতে উপনীত হই। স্বদেশবাসীকে ভালোবাসিতে পারিলে আমরা বিশ্ববাসীকেও ভালোবাসিতে পারি। আবার, যে স্বদেশবাসী, সে বিশ্ববাসীও বটে। কাজেই, স্বদেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেমের উৎস এক ও অভিন্ন।

জাতীয়তা ও স্বদেশপ্রেম যখন সংকীর্ণতার অন্ধকূপে বন্দী হইয়া উগ্র ছিন্নমস্তা রূপ ধারণ করে, তখন বিশ্বপ্রেম পদদলিত হয়। স্বদেশকে একমাত্র পরম প্রিয় মনে করিয়া আমরা বিশ্বকে শত্রু মনে করি এবং উহাকে ধ্বংস করিবার জন্ত দাবিত হই। তখন শুভ বিচার-বুদ্ধি স্বদেশপ্রেমের অন্ধ আবেগে লুপ্ত হয়। ফলে, পরস্পর-হানাহানি এবং অব্যাহত রক্তক্ষয় অনিবার্যরূপে দেখা দেয়। আর, নানা মারণাস্ত্র আবিষ্করণের ফলে সেই হানাহানি অচিরেই চরম বিভীষিকাময় রূপ ধারণ করে। কাজেই, উগ্র জাতীয়তাবোধে কল্যাণ নাই। তাই রবীন্দ্রনাথ গাহিলেন :

‘ও আমার দেশের মাটি, তোমার ’পরে ঠেকাই মাথা,  
তোমাতে বিশ্বময়ীর—তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচলি পাতা।’

দেশজননী ও বিশ্ব-জননী এক এবং অভিন্ন। কারণ, দেশজননীর বক্ষের উপরে বিশ্ব-জননীরও আঁচল পাতা। স্বদেশ ও বিশ্ব আমাদের ঐক্য-চেতনার এপিঠ আর ওপিঠ।

স্বদেশপ্রেম আমাদের অন্তরের জলন্ত বহ্নিশিখা। সেই বহ্নিশিখায় হয় বিশ্ব-জননীর পূজার আরতি। যুরোপীয়দের আগমনের পূর্বে আমাদের স্বদেশপ্রেম ছিল অন্তর্লীন, ছিল স্থপ্তিমগ্ন। পরে বিদেশীর নির্মম অত্যাচার ও ইংরেজ-বিষেবের ফলে ষটিল তাহার ধনীভূত প্রকাশ। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাসে আমরা দেশমাতৃকাকে ভাদ্রিয়া তিন টুকরা করিয়াছি, পূজার নামে করিয়াছি মাতৃ-বিগ্রহের অঙ্গচ্ছেদ। এ উপসংহার বেদনা কোথায় রাখিব? বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ কি এই মাতৃ-বিগ্রহ করনা করিয়াছিলেন? ক্ষুদিরাম-প্রফুল্ল চাকীর দল কি এই মাতৃ-মূর্তি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করিয়াছিল? আমাদের স্বার্থ-বুদ্ধি মাতৃ-বিগ্রহকে যে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়াছে, এই আত্মগ্লানির হাত হইতে আমাদের আর মুক্তি নাই ॥

এই প্রবন্ধের অন্তঃসরণে লেখা যায় :

- স্বদেশপ্রেম
- স্বদেশপ্রীতি
- স্বদেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেম
- ‘দেশের কুহুর ঘনি বিদেশের ঠাকুর কেলিরা’

র. বি. (১৪)—৭

প্রবন্ধ-সূত্র : সূচনা । পুরীর পথের অভিজ্ঞতা ।

৩৫

পুরীর সমুদ্র-দর্শন । পুরীর মন্দির-দর্শন ও মন্দির-  
নিমাণের ইতিহাস । অতীতের স্মৃতিচারণা ।  
ওড়িশার মন্দির-নিমাণ-রীতি । সমুদ্রতীরে সুবোধন ।  
উপসংহার ।

## একটি ভ্রমণ-কাহিনী

যাত্রীদের তুমুল কোলাহলে ঘুম ভাঙিয়া গেল। জানিতে পারিলাম, আমরা আমাদের গন্তব্যস্থল পুরীতে পৌঁছিয়া গিয়াছি। ট্রেনের ভিতরে-বাহিরে কোলাহল ও কর্মব্যস্ততা সমানে চলিয়াছে। সন্ধ্যা-ঘুমভাঙ্গা চোখে যাত্রী, পাণ্ডা, কুলি ও বাবু পেট্রার লাক্ষণ ভিড় দেখিয়া প্রথমতঃ দিশাহারা হইয়া পড়িলাম। ভিড় কমিলে ধীরে ধীরে প্র্যাটেকরুমে নামিয়া চারিদিকে চাহিলাম। ঘুম-জড়ানে চোখে সূচনা  
যাহা কিছু দেখিলাম, তাহাই ভালো লাগিল। পুরী সম্বন্ধে অনেক পড়িয়াছি, শুনিয়াছি আরও অনেক। বহুদিন হইতে পুরী দেখিবার ইচ্ছা বড় প্রবল আকারে মনের মধ্যে আন্দোলিত হইতেছিল। আজ আর বইতে-পড়া কাহিনী নয়, অন্তের মুখে শোনা বর্ণনা নয়, নিজের চোখেই পুণ্যলোক বহু মহাপুরুষের স্মৃতি-বিজড়িত পুরীতীর্থক দেখিব তাঁবিষা মনে মনে উল্লসিত হইয়া উঠিলাম।

সাইকেল-রিক্শায় করিয়া প্রথমে হোটেলের সন্ধ্যানে চলিলাম। পরিষ্কার বক্কেল পিচের রাস্তা ধরিয়া দুইপাশে কাউগাছের সারির মধ্য দিয়া সাইকেল-রিক্শা ছুটিয়া চলিয়াছে। সম্মুখে পথ বাঁকিয়া গিয়াছে। কিন্তু যতদূর চোখ চলে চাহিয়া দেখিলাম, নীল আকাশ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়িল না। বিশাল নীল আকাশটা যেন বালির উপর আসিয়া চঠাং ছমড়ি বাইয়া পড়িয়াছে। সমুদ্র কোথায়, পুরীর পথের অভিজ্ঞতা  
খুঁজিয়া পাইলাম না। রিক্শা-চালককে নিবোধের মতো ভিজ্ঞাসা করিলাম, 'সমুদ্র কোথায়?' রিক্শা-চালক সমুদ্রের আকাশের দিকে অঙ্গুলি সংকেত করিয়া বলিল, 'ওই ত।' এবার আসল কথাটা বলি। শহরে বাস করিয়া ইট-কাট-পাথরের আবেষ্টনী দেখিতেই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি। আকাশকে অধিকাংশ দিন দেখিতেই পাই না। আমার কাছে আকাশ যা, সমুদ্রও তাহাই। দুই ই অপার বিন্দু। পুরীতে আসিয়া এই দুই মহাবিশ্বের মিলন দেখিয়া একেবারে দিশাহারা হইয়া গেলাম। কাছে আসিয়া দেখিতে পাইলাম, উদ্ভাল তরঙ্গমালা পুরীর সমুদ্র দর্শন  
বালুকাময় বেলাড়মির কোল ঘেঁষিয়া উদ্ভাস্ত নৃত্য করিতেছে। দ্রুিতে পারিলাম, সমুদ্র ও আকাশ এখানে বিরাট ব্যাপ্তিতে একাকার হইয়া গিয়াছে। আকুল উৎসাহে কাছে ছুটিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। কিন্তু তখন হোটেলের চিন্তায় উদ্বিগ্ন। ট্রেন শুনিয়াছি, হোটলে স্থান পাওয়া দুষ্কর। যাহা হউক, পূর্ব হইতে হোটেল ঠিক করা ছিল বলিয়া কোন অসুবিধা হইল না।

বিকালে পুরীর বাহা কিছু দর্শনীয় আছে, তাহা দেখিবার জন্য বাহির হইয়া পড়িলাম। পুরীতে বহু ইতিহাস, জনশ্রুতি, কিংবদন্তী এবং অজস্র মন্দিরের ছড়াছড়ি।

বহু বিখ্যাত মঠ, মন্দির ও ধর্মশালা রহিয়াছে পুরীতে। যাহা পুরীধামের সর্বাপেক্ষা অধিক আকর্ষণীয়—জগন্নাথদেবের মন্দির, গম্ভীরা ও গুণ্ডিচা মন্দির—সেদিন এগুলি না দেখিয়াই কিরিয়া আসিলাম। অতীতের বহু স্মৃতি-বিজড়িত, পরম আকর্ষণীয় সেই মন্দিরগুলি সেদিন না দেখিবার কারণ ছিল। আসলে ঐ মন্দিরগুলি দেখিবার জন্য চাই ভিন্ন মানসিকতা, চাই অতীতের স্মৃতিচারণা। তাহা ছাড়া, একদিনে দর্শনীয় সেই মন্দিরগুলি দেখিয়া ফেলিলে হাতে অবশিষ্ট থাকিবে কি? আমি বীরে-ব্রহ্মে সব দেখিব

পুরীর মন্দির-দর্শন ও  
মন্দির-নির্মাণের  
ইতিহাস

বলিয়া সেদিন মনের অদম্য উৎসাহ অবলম্বন করিয়াছিলাম। পরদিন সকালে জগন্নাথদেবের মন্দির, গম্ভীরা ও গুণ্ডিচা মন্দির দেখিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। তুর্কী-আক্রমণের পূর্বেই জগন্নাথের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রাজা ইন্দ্রদ্রাম ইহার

প্রতিষ্ঠাতা। অরণ্যভূমিতে শবর নামে অনাথগণের দ্বারা পূজিত নীলমাধব বা জগন্নাথ-বিগ্রহকে তিনিই আনিয়া মন্দিরে স্থাপন করেন। ব্রাহ্মণ-পাণ্ডা পুরোহিত, কিন্তু সেই শবরের বংশধরদের দ্বারা পূজিত না হইলে জগন্নাথদেবের পূজা সম্পূর্ণ হয় না। এই রীতি উপার মানবতা ও শ্রেণী-সম্প্রীতির পরিচায়ক। শুধু তাহাই নয়, রথযাত্রার দিন রথের পুরোভাগে পুরীর রাজাকে সমবেত লক্ষ-লক্ষ যাত্রী ও দর্শক-সাধারণের সম্মুখে সম্মার্জনী হস্তে পঞ্চ মার্জনা করিয়া চলিতে হইবে। অগাধ এই রীতি সম্মানে প্রতিপালিত হয়।

তারপর ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলার ছেলে নিমাই সমগ্র বাংলাদেশকে কাঁদাইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তাঁহার পূণ্য জীবনের দীর্ঘ আঠারো বৎসরের সাধনার ফল রাখিয়া গিয়াছেন এখানেই। নাট্যমন্দিরের প্রান্ত-দেশে যেখানে পাঁড়াইয়া তিনি জগন্নাথ-বিগ্রহের মূর্তি প্রত্যক্ষ করিতে করিতে ধ্যানস্থ হইতেন, সেই স্থানটি প্রত্যক্ষ করিলাম। বহু যুগের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া যেন মধ্যযুগের ইতিহাসের একটি অবিস্মরণীয় কক্ষে উপনীত হইলাম। মন্দিরের স্থাপত্য-রীতি ও উহার বিশালত্ব আমাকে

অতীতের  
স্মৃতিচারণা

বিস্মিত করিল। কিন্তু মন্দির-গাত্রে ধর্ম-বিদ্বেষী কালাপাহাড়ের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ দেখিয়া বড়ই ব্যথিত হইলাম। মন্দির হইতে বাহির হইয়া গম্ভীরায় গেলাম। সেখানে দেখিলাম ত্রিচৈতন্তের বহুস্পর্শ-বিজড়িত পবিত্র স্মৃতি। সেগুলি আজও সম্মানে রক্ষিত দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। গম্ভীরা হইতে গুণ্ডিচা মন্দিরে গেলাম। সেখানে গুণ্ডিচা মাসীর মন্দির। একপাশে একটি মন্দিরে শূত্র খেলী। রথযাত্রার দিন জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা—এই তিন বিগ্রহ রথে করিয়া আনীত হইলে এই বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে।

শুধু পুরীর মন্দিরেই কেন, ওড়িশার যেখানে গিয়াছি, যে-কোন মন্দির প্রত্যক্ষ করিয়াছি—ওড়িশার প্রাচীনতম মন্দির ভুবনেশ্বর কিংবা পরিত্যক্ত মন্দির কোণারক—

ওড়িশার মন্দির-  
নির্মাণ-রীতি

সব একই রীতিতে নির্মিত। ইহাদের স্থাপত্য-রীতি বা গঠন-কৌশল একই রকম। সেই রীতিটি হইল রথের রূপের অঙ্কনসারী। দূর হইতে মন্দিরগুলি এক-একটি রথের স্তায় প্রতীয়মান হয়। কোণারকের রথচক্রে এবং অথবাহনে এই রীতি অত্যন্ত স্পষ্ট। এই রীতির আবর্তিত



সম্ভবতঃ গণ-মানসে সপ্তাশ্ব-বাহিত রথে চড়িয়া স্বর্ঘদেবের আকাশ-পরিক্রমার কল্পনা হইতে। স্বর্ঘদেবতা সাত বোড়ার রথে চড়িয়া প্রত্যহ আকাশ-পরিক্রমায় যাত্রা করেন। এই সুপ্রাচীন গণ-কল্পনা হইতে মন্দিরগুলির রথামুসারী আশ্চর্য স্থাপত্য-রীতির উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া আমার মনে হইল। পরে দক্ষিণ-ভারত পরিক্রমা করিয়া আসিয়াছি। পূর্বীর মন্দিরগুলির স্থাপত্য-রীতির সহিত সেখানকার মন্দিরগুলির স্থাপত্য-রীতির আংশিক সাদৃশ্য আছে। তবে মন্দিরময় ওড়িশা আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে অধিক।

সমুদ্রতীরে আসিয়া যেন অনন্তকালের মধ্যে হারাইয়া গেলাম। সমুদ্রের অবিভ্রান্ত তরঙ্গ-নৃত্য দেখিয়া বিশ্বম্বে অভিভূত হইয়া গেলাম। অনন্ত নীল জলরাশির অন্তহীন কেনিল কলরোলে আমার সমস্ত চেতনা কেমন যেন আবিষ্ট হইয়া গেল। মনে হইল, দূরে কোথায় যেন এক মলাপুজার আয়োজন চলিয়াছে। সেখানে শতসহস্র শব্দ এক অনবদ্য ঐক্যতান সৃষ্টি করিয়া ধ্বনিত হইতেছে। এক আশ্চর্য অল্পভূতির মধ্যে আমি মগ্ন হইয়া গেলাম। পরদিন প্রভাতে স্বর্ঘদেব দেখিতে গেলাম। সে এক অনিবচনীয় দৃশ্য! পূর্বীর সমুদ্রোপকূলে স্বর্ঘদেবের দৃশ্য সত্যই নয়নাভিরাম! গোলাপী রঙে চিত্রিত

আকাশ ও সমুদ্রের সীমারেখায় রক্তবর্ণ স্বর্ঘরশ্মির প্রথম আবির্ভাব। সমুদ্রতীরে স্বর্ঘদেব  
তারপর সিঁদুরের বিন্দুর দ্বারা ধীরে ধীরে স্বর্ঘের আয়তপ্রকাশ। নাস্তিক সিঁদুরের বিন্দু নয়, একটি রক্তিম কলস যেন আকাশ ও সমুদ্রের সীমারেখায় ভাসিয়া উঠিল। আকাশে ও সমুদ্রে তখন রঙের ছড়াছড়ি। সেই রঙ গায়ে মাগিয়া আকাশের বুকে উড়িয়া চলিয়াছে সামুদ্রিক পাখির আর কাঠের ভেলার ডিঙি ভাসাইয়া উত্তাল তরঙ্গমালায় বুকের উপর দিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে সমুদ্রের পরম প্রিয়পাত্র জুলিয়ারা। সমুদ্রতীরের বালিতে কুড়াইলাম কিছুকি। কোন্ অদৃশ্য শিল্পী যেন সমুদ্র-গভীরে নির্জনে আপন চিত্রশালায় বসিয়া ইহাদের গায়ে বিচিত্র রঙের নকশা চিত্রিত করিয়া দিয়াছেন।

স্বর্ঘদেবের পূর্বে সমুদ্রোপকূলে ভিড় ভ্রমিতে আরম্ভ কবে। ভ্রমণকারীদের অধিকাংশই বাঙালী। পূর্বী বাঙালীর কাছে পরম প্রিয় তীর্থস্থান। মনে পড়িল একটি কিংবদন্তীর কথা। ইহাতে বলা হয়, খ্রীষ্টচতুর্থ পূর্বীতে নীলাত সমুদ্র-তটকে নীলকান্ত শ্রীকৃষ্ণ কল্পনা করিয়া ভাব-বিহ্বল চিত্তে তাতাকে আলিঙ্গন করিতে গিয়া দেহত্যাগ করেন।  
উপদেহার  
একটি কিংবদন্তীতে বলা হয়, খ্রীষ্টচতুর্থ জগন্নাথ-মন্দিরে স্মারতি-

কালে ভাব-তরঙ্গ হইয়া জগন্নাথ-বিগ্গহের সহিত বিলীন হইয়া যান। সে যাত্রাই হটক, খ্রীষ্টচতুর্থ যে পূর্বীদ্যমেই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে কোন মতভেদ নাই। তাই পূর্বী বাঙালীর কাছে পরম পবিত্র ক্ষেত্র, বেদনার অশ্রুতীর্থ। তাই বোধ হয়, যেদিন পূর্বী ত্যাগ করিলাম, সেদিন কোন এক অজ্ঞাত কারণে চোপের কোণটি ভিজিয়া উঠিয়াছিল :

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- একটি প্রসিদ্ধ গ্রামে হোমার ভ্রমণ
- একটি বর্ণনায় হান ভ্রমণের কাহিনী

প্রবন্ধ-বৃত্ত : খুচনা। স্মৃতি কথা : জন্ম-  
বৃত্তান্ত। বটগাছের শৈশব। বটগাছের গোবনকাল।  
গ্রামের জীবন ও বটগাছের জীবন। গ্রামের  
ইতিহাস ও বটগাছ। উপসংহার।

৩৬.

## একটি বটগাছের আত্মকাহিনী

আমি একটি বৃদ্ধ বটগাছ। তোমাদের যাওয়া-আসার পথের ধারে নির্বাকভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া রোজ তোমাদের গতিবিধি নিরীক্ষণ করি। তোমাদের পারস্পরিক কথোপকথনে, আচার-আচরণে আমি বড় আনন্দ পাই, আবার কখনও কখনও দুঃখও পাই। সে যাই হউক, আমার সব কথা শুছাইয়া বলিবার শক্তি নাই, তোমাদের মতো আমার হাঁটিবার শক্তিও নাই। তাহা ছাড়া, আমি বৃদ্ধ।

খুচনা।  
চুল পাকিয়া সব জট পাকাইয়া গিয়াছে। আমার জটাজুট ঝুলিয়া পড়িয়া মাটি স্পর্শ করিয়াছে। বিশ্বাস কর, আমি খুব প্রাচীন লোক। জীবনে অনেক কিছু দেখিয়াছি, অনেক কিছু শুনিয়াছি। আমার শাখায়-শাখায় কতো কাহিনী, আমার পাতায়-পাতায় কতো কথা! সব জমিয়া আছে। তোমরা এসো, চূপ করিয়া বসো আমার কোলের কাছে। আমি তোমাদের মাথায় ছায়া বিছাইয়া দিব; আর, নিঃশব্দে শুনাইব আমার অনেক দিনের সঞ্চিত সুখ-দুঃখের অনেক কথা।

আমি অনেকদিনের লোক। আমার বয়স একশত বৎসর পূর্ণ হইল। চোখের সম্মুখে এতগুলি বৎসর দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল। কতো কি দেখিলাম, কতো কি শুনিলাম! সে সব কথা পরে বলিতেছি। এখন বলি, কি করিয়া আমি জন্মগ্রহণ করিলাম। পাশের গ্রামের পথের ধারে আমার মাকে দেখিয়াছি কি? গত উনপঞ্চাশের ঝড়ে আমার মাতা ঠাকুরাণী দেহভ্যাগ করিয়াছেন। পাশের গ্রামের লোকেরা মাকে বড়ে ভালোবাসিত। তাহারা ফুল, বেলপাতা আর গজাজল দিয়া মায়ের পূজা করিত। আমি মায়ের শাখায় একদিন ফুল হইয়া জন্মিয়াছিলাম। তারপর একটি ফলের মধ্যে আমরা ভাইবোন মিলিয়া অনেকে জন্মিলাম। একদিন একটি টিয়াপাখি তাহার শক্ত ঠোটে আমাদের মায়ের কোল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া এখানে বহিয়া আনিল। টিয়াপাখি ফলটিকে খাইয়া ফেলিল, আমার সকল ভাইবোন তাহার উদরস্থ হইল। কেবল আমিই পথের প্রান্তে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়া রহিলাম।

দিন গেল, মাস গেল। আসিল বর্ষাকাল। বৃষ্টির ধারাজলে স্নান করিয়া আমি যেন নবজীবন লাভ করিলাম। একদিন বৃকের মধ্যে অসহ্য ব্যথা অনুভব করিলাম। কিছুক্ষণ পরে আমার বন্ধ বিদীর্ণ করিয়া হইল অঙ্কুরোদগম। আমার সৌভাগ্য বলিতে হইবে, কোন গোক বা ছাগল আমাকে সংহার করিবার জন্য বটগাছের শৈশব আসিল না। আমি মনের আনন্দে হেলিয়া ছুলিয়া দক্ষিণের বাতাসের সঙ্গে খেলা করিতে লাগিলাম। সূর্যের আলোতে এবং বৃষ্টি ও শিশিরে ধারা-স্নান করিয়া আমি বড় হইয়া উঠিতে লাগিলাম।

ক্রমে আমি বোবনে পদার্পণ করিলাম। ধীরে ধীরে বেশ শক্ত সমর্থ স্বাস্থ্যবান হইয়া উঠিলাম। চারিদিকে সবুজ ছাতার মতো আমার ডালপালা মেলিয়া ধরিলাম। দেখিতে দেখিতে আমার চুলে জট ধরিল। আমাকে অনেকটা সন্ন্যাসীর মতো দেখিতে হইল। জানি না, আমার মনের ধর্মভাবের কথা পাখিরা কী প্রকারে জানিয়াছিল। দেখিলাম,

দলে দলে নানা জাতের পাখি আসিয়া বাসা বাঁধিল আমার বটগাছের বোবনকাল পাখায়। তাহারা বলিল, সকালে-সন্ধ্যায় তাহারা আমাকে গান শোনাইবে। আমি বলিলাম : উত্তম। কেন জানি না, শৈশব হইতে আমার হৃদয়ে ঈশ্বরভক্তি প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। পাখিরা সকালে এবং সন্ধ্যায় আমাকে ঈশ্বরের বন্দনাস্তিতি শোনায়। আমি শুনি এবং মনে মনে ভগবানকে প্রণাম করি।

একদিন সকালে আমার পায়ের কাছে গ্রামের লোকেরা একটি মাটির বেদী নির্মাণ করিল। দেখিয়া আমার ভারি আনন্দ হইল। সেই আনন্দ কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া

উঠিল, যখন সন্ধ্যাবেলায় কথক ঠাকুর সেই বেদীতে বসিয়া পুরাণের কাহিনী শুনাইতে আরম্ভ করিলেন। আলো জলিতেছে, একদিকে ধূপের ঘোঁরা উঠিতেছে। সম্মুখে গ্রামের বহু লোক। আমিও পুরাণের কাহিনী শুনিতাম। শুনিয়া হাসিতাম, কখনও কাঁদিতাম। সত্য কথা বলিতে কি, আমি গ্রামের জীবনের সঙ্গে যেন একেবারে মিশিয়া গিয়াছিলাম।

এই ভাবনে কত কী দেখিলাম। এই কিছুদিন আগেও গ্রামে স্বধ-শান্তির আবহু ছিল না। কিন্তু তারপর দেখিলাম, খেতাবদরা গ্রামে আসিতে শুরু করিল। কাগজের নোট দিয়া গ্রামের জিনিস সব কিনিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। আমার ভীষণ রাগ হইত। গ্রামের সব লইয়া গেলে গ্রামের লোকেরা কি খাইবে?

তারপর শুনিলাম, তোমরা সেই খেতাবদেব তাড়াইবার জন্ত চেষ্টা করিতেছ। কিন্তু তাহার আগেই দেখিলাম, গ্রামের হে হিন্দু-মুসলমান এতদিন ভাই-ভাইরূপে পাশাপাশি বসবাস করিতেছিল, তাহারাই হঠাৎ মারামারি করিতে লাগিল। অনেক রক্তপাত হইল, অনেকে প্রাণ হারাইল। কষ্টে আমার প্রাণ কাটিয়া যাইতে লাগিল। ইস, ইহারা কী নিবোধ!

তারপর দেশ স্বাধীন হইল। তোমরা অনেক রাত্তা বানাইতেছ, সেতু তৈয়ারী করিতেছ। আমার পায়ের কাছে একটা শানের বেদী তৈয়ারী করিয়া দিতে পার না? আমি আজ বৃদ্ধ! আর কতদিন বাঁচিব, জানি না।

শুনিতোছি, তোমরা অনেক আত্মত্যাগী মহাপুরুষের জন্মশতবার্ষিকী পালন করিতেছ। যদিও আমার আত্মত্যাগ কিছুই নাই, তবু আমার বয়সও শতবর্ষ পূর্ণ হইল! তোমরা আমার শতবার্ষিকী পালন করিবে না?

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

● একটি বটগাছের আত্মজীবনী

● একটি বটগাছের স্মৃতিকথা

ঐবন্ধ-সুজ : হুচনা । আবির্ভাব । বাল্যকাল ।  
 ভক্তির উন্মেষ । সাধু-সঙ্গ । কলিকাতা আগমন ।  
 বাজকতা । ভবতারিণী দেবী-মন্দিরে পূজারীর  
 ভূমিকা । ভাব-বিস্ময়তা । বিবাহ । ভক্তি-সাধনা ।  
 বেদান্ত-সাধনা । সাধনার সিদ্ধিলাভ । শ্রীরামকৃষ্ণের  
 অমৃত-বাণী ও শিষ্ট-সম্ভাষণ । মহাপ্রয়াণ ।  
 উপসংহার ।

## পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ

উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাতে আমাদের ধর্ম-বিশ্বাস, আচার-সংস্কৃতি, জ্ঞান-সাধনা ও কর্ম-সাধনায় আসিল অভাবনীয় রূপান্তর। বহুদিনের জড়তা গন্ত, স্থপ্তিমগ্ন সমাজ 'হঠাৎ আলোর বলকানি'তে গতির আবেগে চঞ্চল হইয়া উঠিল। বাক্যালীর চিন্তায়, মনস্থিতায় আসিল অদ্বৈতপূর্ব পরিবর্তন। আসিল 'রেনেসাঁস'। কিন্তু জ্ঞানের শুষ্ক বালুকারাশিতে বাক্যালীর হৃদয় হুচনা পরিতৃপ্তি পাইল না। হৃদয় মনের শাসন মানিল না। বাক্যালীর পিপাসার্ত হৃদয় এমন এক মহামানবের আবির্ভাবের প্রতীক্ষা করিতেছিল, যিনি ভাবের বস্তায় বাক্যালীর মনোভূমিকে জ্বালাল, সরস করিয়া তুলিবেন, বাহ্যের স্পর্শে লোহাও সোনার রূপান্তরিত হইবে, যিনি বহু মতের, বহু পথের সমন্বয়-সাধন করিয়া ধর্মের গভীকে মানবতার সুদূর জগতে প্রসারিত করিয়া দিবেন। তিনি আসিলেন—পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ।

‘ওই মহামানব আসে—

দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে

মর্ত্য ধুলির ঘাসে ঘাসে ।

আবির্ভাব

সুরলোকে বেজে ওঠে শব্দ

নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক

এলো মহাজন্মের লগ্ন—’

হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রাম। নব-ভারতের তীর্থভূমি। ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে সেখানে জন্মগ্রহণ করিলেন নব-যুগের আধ্যাত্মিকতার মূর্তি বিগ্রহ গদাধর। গদাধর শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্য-নাম। শৈশবে গ্রামের পাঠশালায় হইল তাঁহার বিদ্যারম্ভ। কিন্তু সেই সীমাবদ্ধ কেতাবী বিদ্যা তাঁহার বিশাল মানসভূমিকে বাধিতে পারিল না। অনন্ত বিশ্বপ্রকৃতি—যাহা স্রষ্টার বিশ্ব-বিভূতি—তাহাই হইল তাঁহার শিক্ষানিকেতন। শৈশবে হইতেই তাঁহার মেধা এবং উপলব্ধি-শক্তি ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। স্মৃতি-রচনা, যাজ্ঞা, গান, কথকতা ইত্যাদির প্রতি তাঁহার অস্বাভাবিক ঝোঁক ছিল এবং ভাব-তন্ময়তা ছিল তাঁহার আবাল্য প্রকৃতি। রামায়ণ, ভক্তি উন্মেষ মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি পুরাণ ও ধর্মগ্রন্থের প্রতি তাঁহার দেখা ঘাইত প্রগাঢ় অকুরাগ। কিন্তু সর্বোপরি, তাঁহার জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রকাশ পাইত এমন একটি সহজ অসাধারণত্ব, যাহা বিশ্বিত করিত এবং সকলের দ্রষ্টা আকর্ষণ করিত।

কামারপুকুরে তাঁহাদের গৃহের পাশ দিয়া ছিল পুরী-যাত্রার হাঁটা-পথ। সেই পথে যে-সকল তীর্থযাত্রী সাধু-সন্ন্যাসী যাতায়াত করিতেন, তাঁহারা মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের গ্রামে বিশ্রাম গ্রহণ করিতেন। বালোই তিনি সেই সব ধর্মপ্রাণ সাধু-সন্ন্যাসীদের সহিত, তাঁহাদের ধ্যান-ধারণার সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। মনের মধ্যে ছিল ধর্ম-ভাবনার অমোঘ বীজ, অল্পকাল পারিপার্শ্বিকতায় তা'হা ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত, মুকুলিত হইতে লাগিল।

বিজ্ঞায়তনিক লেখাপড়া গদাধরের হইল না। যিনি বিশ্বের অনাথ আতুরজনের জন্য মুক্তির বাণী বহন করিয়া আনিয়াছেন, তাঁহাকে বিজ্ঞানজ্ঞের গতানুগতিক শিক্ষা বাধিবে কোন্ শক্তিতে? ইতিমধ্যে তিনি ধর্মের অমৃত-বাণী কণ্ঠে কলিকাতা আগমন লইয়া জনগণের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তিনি গ্রামে গ্রামে যাত্রা-কথকতা করিয়া দিন কাটাতেছেন শুনিয়া অগ্রজ রামকুমার যাজকতা-কাণ্ডে সাহায্য করিবার জন্য তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আসিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া গদাধরের পূজা-অর্চনা, স্তবপাঠ ইত্যাদিতে দেখা দিল আশ্চর্য ভাব-ভগ্নরতা। কিন্তু শত চেষ্টা করিয়াও রাজকুমার তাঁহাকে শাস্ত্র-সম্মত যাজন-ক্রিয়া শিখাইতে পারিলেন না। হৃদয়হীন শাস্ত্রীয় পূজার্নাম্য গদাধরের ছিল প্রবল অনীহা। যে পূজায় হৃদয়ের স্পর্শ নাই, নাই অন্তরের সহজ স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাকুলতা, সেই পূজার প্রতি গদাধরের কোনদিনই সমর্থন ছিল না। সম্পূর্ণ মন্বহীন, ক্রিয়াহীন হইয়াও কেবল ভাবাকৃতির দ্বারা দেবতাকে-বৃকের মধ্যে খঁজিয়া পাওয়া যায়।

ক্রমে গদাধর দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী বিগ্রহের বেশকারীর পদে নিযুক্ত হইলেন। সেই হইতে গদাধর ভাব-ভগ্ন হইয়া দেবীর সাজসজ্জায় আত্মনিয়োগ করিতেন। দেবী যে প্রস্তুতময়ী, ভক্তি-বিহ্বলতার প্রবল আবেগে তা'হাও তিনি ভগ্নতারিণী দেবী-মন্দিরে বিস্তৃত হইলেন। পরে রাজকুমারের মৃত্যুর পর গদাধর ভবতারিণী পূজারীর বৃত্তিকা মন্দিরের পূজারীর পদে বৃত্ত হইলেন। তাঁহার ভক্তিপূত পূজা-নিবেদনের অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখিয়া সকলে বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গেল। এই সময় গভীর নিশীথে পঞ্চবটী বনের নিঃসঙ্গ নির্জনতায় তিনি ধ্যানস্থ হইতেন।

পূজার প্রচলিত শাস্ত্রীয় রীতি পরিত্যাগ করিয়া গদাধর যখন ভক্তি-ব্যাকুল কণ্ঠে স্তবপাঠ করিতেন, কিংবা গান করিতেন, কিংবা 'মা খাও', 'মা পর' বলিয়া নৈবেদ্য হইতে স্নান তুলিয়া বিগ্রহের মুখের কাছে ধরিতেন, তখন অনেকের এই ধারণা হইল যে, তাঁহার বৃষ্টি মত্তিক-বিকৃতি ঘটিয়াছে। ক্রমশঃ গদাধরের আর ভাব-বিস্ময়তা আত্মচরিত পূজা করিবার ক্ষমতা রহিল না। তিনি মাতৃধ্যানে সর্বদা ভগ্ন হইয়া থাকিতেন এবং জীবজন্তু-মাত্রকেই 'মা'-'মা' বলিয়া তাহাদের গলা জড়াইয়া ধরিতেন। এইভাবে তিনি সর্বভূতেই মাতৃ-দর্শন করিতে লাগিলেন।

এই সময় তাঁহার মাতা তাঁহাকে স্বদেশে ক্রিয়াইয়া লইয়া গিয়া রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীশ্রীমারদামণির সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। কিন্তু গদাধর

পত্নীকেও মাতৃজ্ঞানে পূজা করিতে লাগিলেন। গদাধর কিছুদিন পরে আবার দক্ষিণেশ্বরে কিরিয়া আসিলেন। এখানে একদিন ভাবাবেশে তন্ময় হইয়া তিনি গঙ্গাতীরে বসিয়া গান গাহিতেছেন, এমন সময় এক শৈশবী বিবাহ সন্ন্যাসিনী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার মধ্যে মহাভাবের দ্বিবা আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া স্বয়ং সমস্ত উপকরণাদির আয়োজন করিয়া দিয়া ভক্তি-সাধন-মার্গে তাঁহাকে দিলেন ● পথ-নির্দেশ। তারপর আসিলেন পরম সাধক তোতাপুরী। তিনি তাঁহার গুরুপদে বৃত্ত হইয়া তাঁহাকে দিলেন বৈদান্তিক সাধনায় দীক্ষা। যে বৈদান্ত-সাধনায় মহাসাধক তোতাপুরীর লাগিয়াছিল সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর, গদাধর সেই দুষ্চর সাধনা মাত্র একদিনেই আয়ত্ত করিয়া লাভ করিলেন নিবিকল্প সমাধি। আসল কথা, ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল; অপেক্ষা ছিল কেবলমাত্র বীজবপনের। সময়মত সেই বীজ উপ্ত হইল এবং স্বল্পকালের মধ্যেই কলিল সাফল্য ও সিদ্ধির সোনার কসল। তোতাপুরী বিস্মিত হইলেন। কামারপুকুরের গদাধর হইলেন বিশ্বের শ্রীরামকৃষ্ণ।

অতঃপর তাঁহার দিক্‌লাভের কথা দিকে দিকে প্রচারিত হইয়া গেল। চন্দ্রকের আকর্ষণে লৌহখণ্ডের মতো বহু পিপাসিত চিত্ত ছুটিয়া আসিল দক্ষিণেশ্বরে। তিনি সকলকে পরম সাস্থনা দিয়া বলিলেন—‘যত মত তত পথ।’ সকল পথেই গিয়া পৌছিয়াছে পরমেশ্বরের পদতলে। অন্ধকারে অজ্ঞানাবদ্ধ মানুষ পাইল আলোকের ঠিকানা, মুক্তি-পথের নির্দেশ। আসিলেন দিমলার দত্ত-পরিবারের নরেন্দ্রনাথ। তিনি এই পরশমণির স্পর্শে হইলেন জ্যোতির্ময় বিবেকানন্দ। তিনি সমগ্র বিশ্বে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী বহন করিয়া লইয়া গেলেন এবং শিবজ্ঞানে জীব-সেবার গুরু-নির্দেশকে মূর্ত করিয়া তুলিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের মাধ্যমে। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দ। জগতের সকল পাপ আকণ্ঠ ধারণ করিয়া ক্যান্সার রোগে শ্রীরামকৃষ্ণ করিলেন মহাপ্রয়াণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ বাঙ্গালীর ভক্তি-সাধনার, এক কথায়, বাঙ্গালীর হৃদয়ের মূর্ত প্রতীক। খ্রিস্টধর্মের প্রবল বক্তায় যখন হিন্দুধর্মের ভিত্তি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল, যখন ভাঙন ধরিয়াছিল মানুষের ঈশ্বর-বিশ্বাসে, যখন অজ্ঞান-তিমিরে পথের ঠিকানা হারাইয়া কেলিয়াছিল সমগ্র জাতি, তখনই শ্রীরামকৃষ্ণ দেখাইলেন আলোকিত পথ, আসন্ন ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিলেন হিন্দু-সমাজকে। জীর্ণ প্রাচীন সমাজে সঞ্চারিত করিলেন নবজীবনের প্রাণোচ্ছ্বাস ॥

এই গ্রন্থের অন্তঃসরণে লেখা যায় :

- শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী
- ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ
- বাংলার প্রধান ধর্মগুরু

এবছ-মুখ : মচনা । জন্ম ও বংশ-পরিচয় ।  
 বাল্যকাল ও বিদ্যাশিক্ষা । কর্মজীবন । বিবাহ-  
 বিবাহ-এবর্ডন ও বাল্য-বিবাহ বিবাহ । শিক্ষা-  
 বিভাগ । বয়স সাগর ও বাতুলতা । সাহিত্য-  
 কীতি । চরিত্র-বৃত্তি । উপসংহার ।

৩৮.

## ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

‘বিজ্ঞান সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে ।  
 করুণার সিদ্ধ তুমি, সেই জানে মনে,  
 হীন যে হীনের বন্ধু !’

—কবি শ্রীমধুসূদন

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাঙ্গালী জাতির নিকট একটি প্রাচীনতম নাম । শাস্ত্রীয়  
 প্রাচীরের অচলায়তনের মধ্যে যখন সমগ্র সমাজের নান্দিত্য উঠিয়াছিল, তখন পৃথিবীর  
 পশ্চিম দিগন্ত হইতে ছুটিয়া আসিল দুঃস্থ পশ্চিমা বড় । সেই বড়ের আঘাতে আমাদের  
 অন্ধকার অচলায়তনের রুদ্ধদ্বার খুলিয়া গেল । বড়ের অবসানে পশ্চিম আকাশ হইতে  
 অন্ধরস্ত আলো আসিয়া গৃহের অভ্যন্তরে ছড়াইয়া পড়িল । সেই আলোতে আমরা  
 দেখিলাম, কতকালের কত অর্থহীন জ্ঞান আমাদের সমাজের  
 মূচনা  
 আনাচে-কানাচে স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে । সেই কুসংস্কারের  
 আবর্জনা-স্তুপ হইতে মুমূর্ষু সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য সবপ্রথম আত্মনিয়োগ  
 করিয়াছিলেন কর্মবীর রামমোহন । তথাপি সমাজে জমিয়াছিল বহু অন্ধকার,  
 জমিয়াছিল বহু দুঃখ, বহু ক্লেশ । যিনি সেই পুঞ্জীভূত অন্ধকার, দুঃসহ বেদনা ও  
 অসহায় ক্লেশ সহনশীলতার করম্পর্শে মুছাইয়া দিয়া সমাজের মুখে হাসি ফুটাইয়াছিলেন,  
 তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ।

১৮২০ খ্রীস্টাব্দে মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহের সিংহ-শাখক ঈশ্বরচন্দ্র ভূমি  
 হইলেন । পিতা ঠাকুরলাস বন্দোপাধ্যায়, মাতা ভগবতী দেবী । দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পরিবার ।  
 দারিদ্র্য অনেক সময় মাতৃবীর মনকে দুর্বল করিয়া দেয়, তাহার মেরুদণ্ডকে করিয়া দেয়  
 নমনীয় । কিন্তু দারিদ্র্য তেজস্বী ঈশ্বরচন্দ্রের বলিষ্ঠ মানসিকতাকে  
 দুর্বল করিতে পারে নাই । বরং দারিদ্র্যের সহিত সংঘাতে তিনি  
 তর্পনীয় তেজস্বী এবং অনমনীয় জেলী হইয়া উঠিয়াছিলেন । শৈশবেই তিনি তাঁহার  
 দুর্জয় জিনের জন্য পিতামাতার চিন্তার কারণ হইয়া উঠিয়াছিলেন ।

বালক ঈশ্বরচন্দ্র অতি শৈশবেই গ্রামের চতুঃপাশীতে শিকাগাভ সমাপ্ত করিয়া দরিদ্র  
 পিতার হস্ত ধরিয়া পদব্রজে শহর কলিকাতায় পাড়ি দিলেন । যে কলিকাতা একদা  
 তাঁহার অক্লান্ত কর্মভূমি হইয়া উঠিবে এবং যেখান হইতে তাঁহার দুর্জয় সংগ্রামী শক্তি  
 সারা ভারতকে একলা স্তম্ভিত করিয়া দিবে, সেই কলিকাতায়  
 অত্যন্ত দীনভাবে শুরু হইল এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ-সন্তানের শিক্ষা ।  
 আপন মেধা ও প্রতিভা-বলে তিনি দারিদ্র্যের সকল চক্রান্তকে  
 পরাজিত করিয়া সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করিলেন । অসীম ক্ষমতাবলে তিনি প্রতি  
 বৎসরই প্রথম স্থান অধিকার ও বৃত্তিলাভ করিতে লাগিলেন । কঠোর পরিশ্রমে এই

বাল্যকাল ও  
 শিক্ষাশিক্ষা

দরিদ্র ব্রাহ্মণ-সন্তানকে বাসার সকল কাজ বহুতে সম্পাদন করিতে হইত। একদিকে অবর্ণনীয় দারিদ্র্য, অন্যদিকে অসাধারণ অধ্যয়ন-স্পৃহা। দারিদ্র্যের কণাঘাত তাঁহাকে বিচার সাধনা হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই। অসামান্য প্রতিভাবলে তিনি বিভিন্ন শাস্ত্রে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া ‘বিদ্যাসাগর’ উপাধি লাভ করিলেন। কেবল শ্রোতা সংস্কৃত-বিজ্ঞান নয়, পাশ্চাত্য ইংরেজি-শিক্ষার প্রতিও ছিল তাঁহার প্রগাঢ় অহুসার। তাই সংস্কৃত কলেজে শিক্ষা গ্রহণের পুষাপাশি স্বচেষ্টায় ইংরেজি শিক্ষাও তাঁহার চর্চাতেছিল। এইভাবে কঠোর অধ্যবসায় ও অমাহুতিক পরিশ্রমের মধ্য দিয়া তাঁহার জীবনের প্রস্তুতি-পর্ব সমাপ্ত হয়।

বিদ্যালিকা সমাপ্ত করিয়া তিনি কোর্ট উইলিয়ম কলেজে অধ্যাপকের পদে বৃত্ত হইলেন। কিছুকাল পরে কোর্ট উইলিয়ম কলেজ পরিত্যাগ করিয়া সংস্কৃত কলেজে যোগদান করেন। প্রথমে তিনি সহকারী সম্পাদকের পদ এবং কর্মজীবন পরে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকের পদ লাভ করিলেন। সেই সময়ে স্থল পরিদর্শকের অতিরিক্ত কার্যভারও গ্রহণ করিলেন। কিছুকাল পরে কর্তৃপক্ষের সহিত মতভেদ হওয়ায় তিনি কর্মত্যাগ করিয়া বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। এই সময় তিনি কঠোর পরিশ্রমে মের্টোপলিটন কলেজে প্রতিষ্ঠা করেন।

ভাবত-পাঠিক রামমোহন ভারতে সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদ কবিয়াছিলেন, ফলে, কোলিকট-প্রথা ও বহুবিবাহ-রীতির অমুদ্রাহে সমাজে বিধবার সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছিল। তবে ঘরে বৈধব্যের কাতর ক্রন্দনে বিদ্যাসাগরের হৃদয় বিগলিত হইল, তিনি সমাজ বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের জন্য কৃত-সংকল্প হইলেন।

বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন ও বর্তমান-বিবাহ  
বিবাহ

‘স্ববধনী যখন মর্ত্যে অবতরণ করে তখন কাহার সাধ্য যে সেই  
‘বিবাহ বোধ কবে’ দুবার পদবিক্ষেপে অভ্যুত্থিত সিদ্ধি তন্তু  
অগ্রসর হইয়া’ চলিলেন একক পাঠিক। তাঁহার প্রচেষ্টায় ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে বিধবা-বিবাহ বিধিবদ্ধ হইল। বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন তাঁহার জীবনের সবশ্রেষ্ঠ কাণ্ড। বাল্য-বিবাহ নিবারণও তাঁহার অন্তিম কীর্তি।

তিনি বৃদ্ধকালীন, সমাজের যত অন্ধকার, যত দুঃখ, যত ব্যভিচার— তাহা বৃদ্ধ আচ্ছন্ন শিক্ষার অভাব। এই কুসংস্কারাজ্য, জড়তাগত সমাজের পক্ষপাতী শিক্ষার স্তম্ভ হইলে, তিনি তাহার উপলব্ধি করিয়াছিলেন। শিক্ষা-বিস্তার তাঁহার অমম্য অসাধের মূল চুল্লীতাপ হই উপলব্ধি। দেশময় শিক্ষার জাল বিস্তার কবিয়া দিবার মানসে তিনি নিবিচাবে দেশময় স্থল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

শিক্ষা-বিস্তার  
শিক্ষা বিস্তার ছিল তাঁহার সমাজ সংস্কারের প্রাথমিক সোপান। কেবল পুরুষদের মনোহীন, নারী-সমাজেও শিক্ষা-বিস্তারের জন্য ছিল তাঁহার সমান উৎসাহ। বহু বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপনও তাঁহার অবিস্মরণীয় কীর্তি। শিক্ষাক্ষেত্রে তিনি যে প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির সাক্ষর বাখিয়া গিয়াছেন, তাহা সেকালের এক ব্রাহ্মণ-সন্তানের পক্ষে সম্ভাব্য বিষয়কর।



বাংলাদেশে বিজ্ঞানাগরের প্রকৃত পরিচয় তাঁহার 'দয়ার সাগর' নামে। বিজ্ঞানাগরের দয়ার তুলনা নাই। তাঁহার এই সীমাহীন দয়ার মূলে ছিল গভীর মানবতাবোধ ও পরদুঃখকাতরতা। জননী ভগবতী দেবীর নিকট হইতে তিনি এই গুণগুলি দয়ার সাগর ও মাতৃভক্তি উত্তরাধিকারস্বত্বে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার মাতৃভক্তি একটি প্রবাদের মধ্যমা লাভ করিয়াছে এবং এই মাতৃভক্তিই তাঁহাকে সকল বাধা-বিঘ্ন তুচ্ছ করিয়া পরের দুঃখ-মোচনের প্রেরণা দান করিয়াছে।

বাংলা সাহিত্যও বিজ্ঞানাগরের প্রতিভার নিকট গভীরভাবে ক্ষীণ। 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি', 'বর্ণ পরিচয়', 'সীতার বনবাস', 'শকুন্তলা', 'দ্রাবিড়বিলাস' প্রভৃতি গ্রন্থ কেবল প্রবহমান স্বতঃস্ফূর্ত গল্পের দৃষ্টান্ত হিসাবেই নয়, শিল্প-সৌকর্যমণ্ডিত প্রাণোচ্ছল গল্প-রূপেও সকলের হৃদয় হরণ করে। বর্ণ পরিচয়ের 'জল পড়ে সাহিত্য-কীর্তি পাতা নড়ে' [ জল পড়িতেছে, পাতা নড়িতেছে ? ]—রবীন্দ্রনাথের শৈশবের স্মৃতিস্মৃত : সীতার বনবাসের আলোকায়ন বর্ণনার চমৎকারিত্বে উজ্জ্বল : 'এই সেই জনস্থানমধাবতী প্রস্রবণগিরি। এই গিরির শিখরদেশ আকাশপথে সতত সঞ্চারমান জলধরমণ্ডলীর যোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত ; অধিকাংশ প্রদেশ ঘনসম্মিষ্ট বিবিধ বনপাল্পসমূহ আচ্ছন্ন থাকতে সতত মিষ্ট, শীতল ও রমণীয়।'

বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের মতো এমন দৃঢ় পুরুষের চরিত্র, এমন সংগ্রামী ব্যক্তি চেতন, যাঁহা কেবল পাকাতা দেশেই সম্ভব, তাঁহা এদেশে কিরূপে সম্ভব হইল, তাঁহা সত্যই বিশ্বয়ের বিষয়। অথচ 'বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের জীবন চরিত্রের প্রতি পাতাতেই দেখা যায় যে বিজ্ঞানাগর কাঁদিতেন।' অর্থাৎ, তাঁহার মধ্যে কঠোরতা ও কোমলতার হইয়াছিল অপূর্ব ভাব-সম্মিলন।

১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দের ২২শে জুলাই এই অজয় পৌরুষ-লিখা চির-নিবাপিত হইল। তাঁহার নির্ভীক চরিত্রের মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় ঋষির অতলাস্ত প্রজ্ঞা, ইংরেজ সৈনিকের দুর্বীর তেজস্বিতা এবং বাঙ্গালী জননীর স্নেহ-স্বকোমল হৃদয়ের অপূর্ণ সম্মিলন দৃষ্টিগোচর। তিনি ছিলেন দরিদ্রের পরম বন্ধু, মানবতার মহান পুরোহিত। সমাজের অর্থহীন কুসংস্কার তাঁহাকে ব্যাধিত করিয়াছিল। তাই শিক্ষা-প্রসার ছিল তাঁহার জীবনের মূল ব্রত। তাঁহার সমুদ্র জীবনদর্শন এই অধঃপতিত জাতিকে চরম অপমানের দাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল, গাছের বিলাসিতাহীন সরল জীবন এই শুক, সদস্যহীন দেশে কণ্ঠস্বর প্রাবল্য বচাইয়া দিয়াছিল, দাঁহার জ্ঞান-গভীরতা, তেজস্বিতা ও পরদুঃখ-কাতরতায় বাঙ্গালী-সমাজে নবজীবনের আলোক-রশ্মি বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িয়াছিল, তিনি যে সর্বকালের সবশ্রেষ্ঠ মাতৃম—সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, তাঁহা সর্বজনস্বীকৃত ॥

এই প্রবন্ধের অন্তিমভাগে লেখা যায় :

- একজন অবিদ্বানবীর বাঙ্গালী : বিজ্ঞানাগর
- দয়ার সাগর বিজ্ঞানাগর, পৌ. প্রা. '৩৩
- দানব-সংস্কারের ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানাগর
- একজন শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী

প্রবন্ধ-সুত্র : হুচনা । পরিবেশ ও আবির্ভাব ।  
 শৈশব-শিক্ষা । কবি-কিশোরের কাব্য-চর্চা ।  
 সাহিত্য-সাধনা । নোবেল পুরস্কার । রবীন্দ্র-  
 সংগীত । নাটক ও অভিনয় । স্বদেশ ও সমাজ ।  
 বিশ্ব-ভ্রমণ । শান্তিনিকেতন ও ঐনিকৈতন ।  
 মহাপ্রয়াণ । উপসংহার ।

৩৯.

## কবিশুরু রবীন্দ্রনাথ

কবি-শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ বর্তমান বিশ্বের একটি বিরাট বিষয়। সর্বকালের সর্বদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি তিনি। কেবল কবি-শ্রেষ্ঠ হিসাবেই নয়, সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদরূপেও তিনি সারা বিশ্বে সম্মানিত। মানব-জীবনের এমন কোন ক্ষেত্র নাই, এমন কোন চিন্তা নাই, এমন কোন ভাব নাই, যেখানে তিনি বিচরণ করেন নাই। তিনি মাতৃষের চিরন্তন সুখ-দুঃখ, মিলন-বিয়োগ ও আনন্দ-বেদনের পৌষ-ফাল্গুনের পালাগান রচনা করিয়া বিদ্যমান লইয়াছেন। তাঁহার কাব্যে বাধাহত পাইবে ব্যাধা-বিভয়ের হুচনা।

প্রেরণা, দার্শনিক পাইবেন প্রকৃত সত্যের সন্ধান, রাজনৈতিক পাইবেন নিভুল পথের নির্দেশ, মৃত্যুপথযাত্রী পাইবেন মৃত্যুঞ্জয়ী সাক্ষ্য। এক কথা, রবীন্দ্রনাথই আমাদের একমাত্র কর্তব্য; বাধা, বেদনা ও হতাশাময় এই পৃথিবীতে রবীন্দ্রনাথই আমাদের একমাত্র আশা-ভরসা। আমরা রবীন্দ্রনাথের ভাবতরঙ্গে অবগাহন করি, তাঁহার চিন্তাধারায় চিন্তা করি, তাঁহার সুরে গান গাই, তাঁহার ভাষায় কথা বলি। আমরা রবীন্দ্রনাথে মরি ও বাঁচি।

কলিকাতার ভোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবার। উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য ও সংস্কৃতির পীঠস্থান। কাব্য-কবিতা ও শিল্প-সংস্কৃতি-চর্চা হইতে আরম্ভ করিয়া জাতীয় জাগৃতির উদ্বোধন পর্যন্ত এই পরিবারের অবদানের কথা সমগ্র ভারত চিরকাল শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে। সেই সঙ্গে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পরিবেশ ও আবির্ভাব জ্যোতির্ময় ঔপনিষদিক সাধনা, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অভূতপূর্ব যোগাঙ্গ এবং নব্যোন্মেষিত স্বদেশিকতা এই পরিবারে যে একটি অভিনব পরিমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহারই মধ্যে জন্মিষ্ঠ হইলেন এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও মহামনীষী রবীন্দ্রনাথ।

ঠাকুর-পরিবারের উন্নত শিক্ষা-দীক্ষা, মাজিত সাংস্কৃতিক চেতনা এবং পিতার আলোকিত ধর্ম-বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বিস্ময়কররূপে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। প্রেম, প্রকৃতি, সৌন্দর্য ও স্বদেশ—রবীন্দ্র-কাব্যের এই চারি দিগন্তে পড়িয়াছিল তাহার জ্যোতির্ময় প্রভাব। শৈশবে কিছুকাল ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে শৈশব-শিক্ষা

ও কিছুকাল নর্মাল স্কুলে তিনি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু মর্মের গভীরে বিশ্ব-প্রকৃতির উদার আচ্ছাদন তাঁহাকে স্কুলের গণ্ডিবদ্ধ বন্দী-জীবন বেশীদিন সহ্য করার দান দিল না। অগত্যা দেবেন্দ্রনাথ গৃহশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। স্কুল-কলেজের কুস্তি বিড়া তাঁহার জুটিল না সত্য, কিন্তু বিশ্ব-বিদ্যার সকল ছয়ার তাঁহার সম্মুখে উন্মুক্ত হইয়া গেল।

— তাঁর কবি-কিশোরের শুরু হইল নিরবচ্ছিন্ন কাব্য-চর্চা। তেঁরো বৎসর বয়সে রচিত তাঁহার প্রথম কবিতা প্রকাশিত হইল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়। তাহার পর তাঁহার কাব্যোদ্ভানে শুরু হইয়া গেল কাব্য-কুহুমের বসন্ত-উৎসব। সত্তেরো বৎসর বয়সে অধ্যয়নের জন্ত তাঁহাকে বিলাতে যাইতে হইল। কয়েক বৎসর পরে পাশ্চাত্য জীবনাচরণ, সাহিত্য-সংস্কৃতির নিবিড় পরিচয় এবং সেই সঙ্গে হৃদয়ের বীণাতন্ত্রীতে পাশ্চাত্য সংগীতের সুর-মূর্ছনা লইয়া তিনি বাংলাদেশে ফিরিয়া আসিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রেরণায় এইবার প্রাণে আসিল গানের অভূতপূর্ব জোয়ার, রচিত হইল প্রথম অনবদ্য গীতিনাট্য 'বান্দ্রীকি প্রতিভা'। তাঁহার 'বান্দ্রীকি প্রতিভা' প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সংগীত-চর্চার আশ্চর্য কসল।

কবি-কিশোরের  
ক'ব্য-চর্চা

বাংলা কাব্যের প্রথম রূপশিল্পী তিনি।—প্রাণের আকুল উচ্ছ্বাসে পৃথিবীর মাহুয়ের সুখ-দুঃখ ও আনন্দ-বেদনার ভাণ্ডায় হৃদয়ের গভীরতম অহুত্বগুলিকে তিনি রূপ দিয়াছেন। যৌবনের প্রথম প্রভাতে তাঁহার হৃদয়ের নিবিড় বেদনায় সংগীতের যে উৎসমুখ খলিয়া গিয়াছিল, তাহার মর্ম্মর কলতান বংকুত হইয়া উঠিল সন্ধ্যাসংগীত, প্রভাত সংগীত,

সংগীত-সামান্য

ছবি ও গান, কড়ি ও কোমল, ভাসুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, মানসী ও সোনার তরীতে। এইবার সোনার তরীর পালে লাগিল সৌন্দর্যের হাওয়া। চিত্রা, চৈতালী, কণিকা, কল্পনা, কথা ও কাচিনী, নৈবেদ্য, থেয়া

এবং গীতাঞ্জলি-গীতালি-গীতিমালার সোনার কসলে সেই সোনার তরী বোকাই হইল। তারপর 'হেথা নয়, তেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।' বলাকা, পলাতকা, পুরবী, বনবাণী, মহুয়া, পরিশেষ, পুনশ্চ, শেষ সপ্তক, পত্রপুট ও আশ্রমীর দ্বারা বাহিয়া তাঁহার কাব্যতরী মনজাতক, সানাই, জন্মদিনে ও শেষ লেখার মধ্য দিয়া দিগন্তের অন্তরালে

উধাও হইয়া গিয়াছে। শুধু কাব্যেই নয়, নাটক, প্রবন্ধ, রস-বচন, নবন পুরস্কার

সমালোচনা, রূপক-নাট্য, উপক্ৰাস, ছোট গল্প, শিশু-সাহিত্য, বিজ্ঞান

সমাজ-তত্ত্ব, শিক্ষা-তত্ত্ব, সংগীত, স্থলপাঠ্য পুস্তক, ভ্রমণ-কাহিনী—সাহিত্য ও জ্ঞানের প্রায় সর্ববিভাগেই তাঁহার স্বচ্ছন্দ বিহারের যোগফল হইল বাংলা সাহিত্যের বর্তমান চরম সমৃদ্ধি। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার রচিত গীতাঞ্জলির ইংরেজি অমুবাদের জন্য তিনি সাহিত্যে 'নোবেল পুরস্কার' লাভ করেন। বাংলার কবি হইলেন বিশ্বকবি।

সংগীতে ছিল তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা। নিজের সংগীতে তিনি নিজেই সুর সংযোজনা করিয়া সংগীতের যে একটি বিশেষ ঐতিহ্য সৃষ্টি করিয়া যান, তাহা 'রবীন্দ্র-সংগীত' নামে পরিচিত। সেই সংগীতের সংখ্যা যেমন বিপুল,

রবীন্দ্র-সংগীত

তেমনি বৈচিত্র্যময়। আবৃত্তি ও অভিনয়েও তাঁহার প্রতিভা

আশ্চর্য দক্ষতার আশ্রয় রাখিয়াছে। স্বরচিত নাটকে তিনি নিজেই বিশিষ্ট ভূমিকায়

অবতীর্ণ হইয়া মঞ্চজগতে চমকপ্রদ অভিনয়ের নূতন ঐতিহ্য-ধারা

নাটক ও অভিনয়

সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, পরিণত বয়সে চিত্র-

শিল্পেও তিনি বিশ্বকে বিস্মিত করিয়া দেন। তিনি ছিলেন প্রকৃতির পূজারী

প্রকৃতির মর্ম্মবাণী তাঁহার কাব্যে বিশ্বব্যবহারে রূপলাভ করিয়াছে।

স্বাধীনতা-আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে যোগদান না করিলেও কবিতা, প্রবন্ধ ও সংগীতের মধ্য দিয়া তিনি জাতিকে স্বাধীনতা-সংগ্রামে অল্পপ্রাণিত করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত ‘জনগণ-মন-অধিনায়ক’ গানটি স্বাধীন ভারতের জাতীয় সংগীত। ভারতের মহিমা-কীর্তন, অন্তর্নিহিত আত্মার অমরতা, নির্ভীকতা, তেজস্বিতা, আত্মশক্তি-

নির্ভরতা ইত্যাদি মহৎ ভাবগুলি অপরূপ প্রেরণাময়ী ভাষায় ও স্বরে দেশ ও সমাজ তাঁহার কাব্যে বাণীময় হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে তিনি তাঁহার কাব্য-সাধনার অপরূপ আলোকে জাতির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে প্রোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তাঁহার সোচ্চার প্রতিবাদ এবং ‘স্মার’ উপাধি ত্যাগ তো একটি ঐতিহাসিক ঘটনা।

তিনি চীন, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, আমেরিকা, ইউরোপ, পারস্য, রাশিয়া প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়া তথায় ভারতের মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং বাংলা ভাষার প্রতি বিশ্বের প্রজ্ঞাশীল দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন। বিশ্বের যেখানে তিনি গিয়াছেন, সেখানেই লাভ করিয়াছেন বিশ্বকবির উপযুক্ত সম্মান।

গঠনমূলক কার্যেও রবীন্দ্র-প্রতিভা বিশ্বয়কর কৃতিত্বের অধিকারী। বীরভূম জেলার বোলপুরে ভারতীয় আদর্শে তিনি ‘শান্তিনিকেতন’ নামে একটি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করিয়া তথায় নিজ শিক্ষা দান করিতে থাকেন এবং কালক্রমে তথায় ‘বিশ্বভারতী’ নামে বিরাট বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা ব্যতীত শান্তিনিকেতনের অনতিদূরে দেশীয় কৃষি ও শিল্পের উন্নতিবিধানের জন্ত তিনি ‘ত্রীনিকেতন’ নামে একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া যান। অবশেষে ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দের ৭ই আগস্ট এই মহামনীষী, কবি ও কর্মবীরের জীবনাবসান হয়। ২৫শে বৈশাখের সূর্য অস্তমিত হইল ২২শে শ্রাবণের নিস্তরঙ্গ সন্ধ্যায়।

রবীন্দ্রনাথ যেন ভারত-আত্মার মূর্ত প্রতীক। বৈদিক ঋষির স্মৃতি ছিল তাঁহার প্রজ্ঞা-দৃষ্টি, বান্দীকি-বেদব্যাস-কালিদাসের স্মৃতি ছিল তাঁহার কবি-হৃদয়, আর ছিল গ্যোট্টে-টলস্টয়ের স্মৃতি তাঁহার সুগভীর সমাজ-চেতনা। স্মরণের আরাধনায়, মানবতার পূজায় তিনি তাঁহার পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রদীপ জালিয়া যেন আরতি করিয়া গিয়াছেন। যে গভীর স্পর্শকাতরতা, যে নিবিড় বিশ্বাসবোধ এবং যে স্থির ঈশ্বর-চেতনা তাঁহার কাব্য-কবিতাকে জিবেলী সঙ্গমে স্থাপন করিয়াছে, তাহার নিবিড় অনুবন্ধ পাইতে হইলে আমাদেরকে সেই রবীন্দ্র-তীর্থে যাত্রা করিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথ সকল দেশের, সকল কালের সকল মানুষের তীর্থভূমি।

এই প্রবন্ধের অন্তঃসরণে লেখা যায় :

- কবি-শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ
- কবি-সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ
- বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ

ঐবন্ধ-সুত্র : সূচনা । জন্ম ও পিতৃ-পরিচয় ।  
 ঘটনাবহুল ছাত্রজীবন । সিভিল সাভিস প্রত্যাখ্যান ও  
 জাতীয় আন্দোলনে যোগদান । ঘটনাবহুল জীবন :  
 কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র । কংগ্রেসের  
 সভাপতি ও কংগ্রেস ত্যাগ : নিরুদ্দেশ ও সিদ্ধাপুরে  
 মুক্তিফৌজ গঠন । নেতাজীর ডাক—ভারত-আক্রমণ  
 ও পরাজয় । উপসংহার ।

৪০.

## নেতাজী সুভাষচন্দ্র

‘আমার জীবনে লভিয়া জন্ম জাগোরে সকল দেশ ।’

ইহা যেন শিখগুরু গোবিন্দ সিংহেরই বাণী নয়, ইহা যেন বাংলা-মায়ের দামাল  
 ছেলে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জাগ্রত আত্মার সোচ্চার ঘোষণা । মুক্তি-কামী ভারতের  
 বিক্ষুব্ধ প্রাণসত্তা যেন নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মধ্যে মূর্ত হইয়াছিল । তাঁহার জীবন  
 ত্যাগে শুভ্র, বৈরাগ্যে গৈরিক, দাসত্বের শৃঙ্খল-মোচনে উৎসর্গীকৃত । ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর  
 সকল শক্তি স্বাধীনতার এই অনিবার্য প্রদীপ-শিখাটিকে কণ্টরোধ  
 হুচনা

করিয়া হত্যা করিবার ভ্রম নিম্নোক্ত হইয়াছিল । কিন্তু ব্রিটিশ  
 জাতির সকল দুর্বিসন্ধিকে পরাস্ত করিয়া, সকল চক্রান্ত ছিন্নভিন্ন করিয়া তাঁহার উল্লাস  
 কণ্ঠের শোনা গেল বালিনে-সিদ্ধাপুরে, শোনা গেল ভারতের পূর্ব-সীমান্তে ইম্ফলে ।  
 সুভাষচন্দ্র হইলেন ভারতের জনগণ-মন-অধিনায়ক, নেতৃত্বের চির-জাগ্রত বিজয়-রুদ্র,  
 ভারতের মুক্তি-সাধনার বিজয়-পথিক, ভারতবাসীর চির-আকাঙ্ক্ষিত প্রিয় নেতাজী ।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী । ওড়িশার কটক শহরে ভারত-জননীর বিদ্রোহের  
 এই অগ্নি-শিশু ভূমিষ্ট হইলেন । পিতা—প্রখ্যাত সরকারী উকিল জানকীনাথ বসু,  
 মাতা—প্রভাবতী দেবী । জানকীনাথের পৈতৃক নিবাস ছিল চব্বিশ পরগনা জেলার  
 কোদালিয়া গ্রামে । বিদ্রোহের এই অগ্নি-শিশুর জন্মক্ষেত্রে নবজাতকের জন্মন-ধ্বনিতে

যে প্রথম বিদ্রোহ বিঘোষিত হইয়াছিল, কে বলিতে পারে যে,  
 জন্ম ও পিতৃ-পরিচয় তাহাতে ‘দিল্লী চলে’—এই উল্লাস আহ্বান ধ্বনিত হইয়াছিল  
 কিনা?—কে বলিতে পারে তাহার জন্মলগ্নে পুরনারীগণ যে শঙ্কধ্বনি করিয়াছিলেন,  
 তাহাতে মৃতবৃহৎ কামানের ধ্বনি শোনা গিয়াছিল কিনা?—সেই নবজাত শিশুর  
 মুষ্টিবদ্ধ হাতে কে বলিতে পারে ভারতের চির-আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা বাঁধা পড়িয়াছিল  
 কিনা? তাঁহার জন্মের মধ্যে যেন বিদ্রোহের নবজন্ম হইল, যেন ভারতের স্বাধীনতার  
 আকাঙ্ক্ষার নবজন্ম হইল ।

সুভাষচন্দ্রের শৈশবের শিক্ষারস্তু হইয়াছিল কটকের মিশনারী স্কুলে । পরে রাভেন  
 শ’ কলেজিয়েট স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে  
 দ্বিতীয় স্থান লাভ করিলেন । সেই সময় মুক্তি-পথের সন্ধান  
 ঘটনাবহুল ছাত্রজীবন শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের বীরবাণীর প্রেরণায় তিনি  
 গৃহত্যাগ করিয়া হিমালয়ে করিলেন গভীর সাধনা । কিছুকাল পরে তিনি গৃহে  
 প্রত্যাবর্তন করিয়া উচ্চ-শিক্ষার জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হইলেন । তীব্র

দেশাভিষেক ছিল তাঁহার অন্তরের চালক-শক্তি। তাই বিজাতীয় অধ্যাপক ওটেনের ভারতীয়দের প্রতি অসম্মানকর উক্তির তীব্র প্রতিবাদে তাঁহার অন্তরাত্মা বিজ্রোহী হইয়া উঠিল। পরিণামে তাঁহাকে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বহিষ্কৃত হইতে হয়; কিন্তু পরে স্ত্রীর আশুতোষের চেষ্টায় স্কটিশ চার্চ কলেজে তিনি স্থানলাভ করিলেন এবং

দর্শন-শাস্ত্রে অনার্স সহ বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এম. এ. পড়িতে থাকেন। •পরীক্ষার পূর্বেই ১৯১১ সালে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জ্ঞাত তিনি ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন এবং ১৯২০ সালে আই. সি. এস. পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান লাভ করিয়া সগৌরবে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এদিকে আসিতে লাগিল সরকারী চাকরির নানা প্রলোভন। কিন্তু গোলামির সমস্ত প্রলোভন ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করিয়া তিনি দেশবন্ধুর বনিষ্ঠ সহকর্মীরূপে যোগদান করিলেন ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে। এবার ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে সংযোজিত হইল এক নতুন অধ্যায়।

সুভাষচন্দ্রের কর্ম-জীবন যেমন ঘটনাবল্ল, তেমনী রূপকথার কাহিনীর ন্যায় রোমাঞ্চকর। দেশবন্ধুর নির্দেশে তিনি জাতীয় শিক্ষালয়ের অধ্যক্ষ-পদ গ্রহণ করিলেন। সেই সঙ্গে রহিলেন কংগ্রেস কমিটির প্রচার-সচিব। অতঃপর ইংলণ্ডের যুবরাজের ভারত-আগমন উপলক্ষে পূর্ণ হরতালের আহ্বায়করূপে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। কারামুক্তির পর তিনি হইলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক। এই সময় উত্তরবঙ্গের বঙ্গীয় জাগকাথে তিনি

ঘটনাবল্ল জীবন :  
কলিকাতা।  
কংগ্রেসের মেয়র

যে গৌরবময় ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের জাতীয় ইতিহাসে অনরণীয় হইয়া আছে। তারপর তিনি হইলেন 'করওয়ান্ড' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক এবং নির্বাচিত হইলেন কলিকাতা পৌর নিগমের প্রধান কর্মকর্তা। কিন্তু সরকার-বিরোধী মনোভাবের জ্ঞাত তাঁহাকে অচিরকালের মধ্যেই কারাবরণ করিতে হইল। ১৯২৭ সালে তাঁহার কারামুক্তি ঘটিলেও পুনরায় তাঁহাকে কারাবরণ করিতে হয়। তিনি যতদিন কারা-প্রাচীরের বাহিরে রহিয়াছিলেন, বিদেশী স্বৈরাচারী শাসকের ততদিন মানসিক স্বস্তি ছিল না। কলে, স্বাধীনতার অদম্য সৈনিক সুভাষচন্দ্রকে জীবনের অধিকাংশ সময় কাটাইতে হইয়াছে কারাস্ত্রালের অঙ্ককারে।

দীর্ঘকাল কারাবাসের ফলে তাঁহার স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটে এবং ভগ্ন-স্বাস্থ্য সুভাষচন্দ্রকে চিকিৎসার জন্ত যুরোপ যাত্রা করিতে হয়। স্বাস্থ্যোদ্ধারের পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাকে আবার অন্তরীণ করা হইল। যাহা হউক,

কংগ্রেসের সভাপতি  
ও কংগ্রেস ভ্যাগ

১৯৩৭ সালে কর্তৃপক্ষ সুভাষচন্দ্রকে মুক্তি দিলেন। তারপর ১৯৩৯ সালে তিনি হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হইলেন। ১৯৪০ সালে নির্বাচিত হইলেন জিপুরী অধিবেশনের সভাপতি।

কিন্তু ইতিমধ্যে কংগ্রেসের চরম ও নরম পন্থীদের মধ্যে সংঘাত অত্যন্ত তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল। সুভাষচন্দ্র ছিলেন চরমপন্থীদের অগ্রনায়ক। তাঁহার সভাপতি পদ-লাভে নরমপন্থীরা ক্ষুব্ধ হইলে সুভাষচন্দ্র বিরক্ত হইয়া কংগ্রেস ত্যাগ করিলেন।

এদিকে পৃথিবীতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দাবানল জলিয়া উঠিয়াছিল। স্বাভাবিক ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে তাহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন। ফলে, নরমগছীরা তাঁহাকে ভুল বুঝিল। বিদেশী সরকারও তাঁহাকে অধিক দিন জনগণের মধ্যে থাকিতে দিল না। ১৯৪০ সালেই তাঁহাকে আবার গ্রেপ্তার করা হইল। কিন্তু ভগ্ন-স্বাস্থ্যের জ্ঞান স্বগৃহে অন্তরীণ করিয়া রাখা হইল। ১৯৪১ সালের ২৬শে জানুয়ারী। সংবাদ রটিল—স্বভাবচক্রকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না, স্বভাবচক্র নিকরদেশ। এদিকে তিনি জিয়াউদ্দিনের ছদ্মবেশে পুলিশের চোখে ধুলি দিয়া রহস্যজনকভাবে গৃহ হইতে নিজস্ব হইয়া চলিয়াছেন একক পথিক—স্বদেশের মুক্তি-পূজারী। কাবুল—বার্লিন—সিঙ্গাপুর। অস্থূল দেহেও তিনি এক প্রচণ্ড আগ্রহ বড়ের মতো ছুটিয়া গিয়াছেন। সিঙ্গাপুরে বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে গঠিত হইয়াছিল মুক্তিবাহিনী—আজাদ হিন্দ ফৌজ। বাংলার স্বভাবচক্র হইলেন তাহার সর্বাধিনায়ক, হইলেন রূপকথার রাজপুত্র—ভারতের প্রিয় নেতাজী।

সিঙ্গাপুরে সেদিন আসিল এক অভূতপূর্ব প্রাণের জোয়ার—স্বাধীনতার জোয়ার। নেতাজী উদাত্ত কণ্ঠ ডাকিয়া বলিলেন—‘Give me blood, I promise you freedom’—‘তুমি আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাকে স্বাধীনতা দিব।’ সঙ্গে সঙ্গে ‘আগ কেবা প্রাণ করিবেক দান’—তাহার জ্ঞান দেখা দিল প্রবল উত্তেজনা। সেদিন কোথায় ছিল সাম্প্রদায়িকতা? কোথায় গেল প্রাদেশিকতা? সে আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। অতঃপর আজাদ হিন্দ সরকার গঠিত হইল।

১৯৪৩ সালে এই সরকার ইংলণ্ড ও আমেরিকার বিরুদ্ধে একযোগে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ১৯৪৫ সালের ১৮ই মার্চ। ভারতের জাতীয় জীবনের একটি স্মরণীয় দিবস। ঐ দিন আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতের মুক্তিকায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিল। নেতাজী ডাক দিলেন, ‘স্বাঃ চলো—’। শুরু হইল দিল্লী-অভিযান। স্বাধীনতার অদম্য আকাজক জয় হইল। কিন্তু কালক্রমে ইংরেজ-বাচিনী ব্রহ্মদেশ পুনর্দখল করায় এবং জাপান তাহার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করায় সাহায্যের অভাবে আজাদ হিন্দ সরকারের পতন হইল। দুঃসহ পরাজয়ের বেদনা হইয়া নেতাজী বিমানে জাপান যাত্রা করিলেন। সংবাদে প্রকাশ, তিনি পশ্চিমঘো বিমানে চূর্ণটনায় নিহত হন।

দেশবাসী তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ বিশ্বাস করে না। ভারতের প্রিয় নেতাজীমরণ-বিজয়া গৌরবে ভারতবাসীর হৃদয়ে রহিয়াছেন চির-প্রতিষ্ঠিত। তাহারা আজিও নেতাজীর প্রত্যাবর্তনের জন্য ব্যাকুল, প্রতীক্ষা-কাতর। বরণমালা রচনা করিয়া ভারতের নাট কোটি নরনারী বিজয়া বীরকে অভিনন্দন জানাইবার জন্য উৎকণ্ঠিত। ‘তোমার আসন শূন্য আজি, হে বীর, পূর্ণ করো॥’

এই প্রবন্ধের অন্তঃসরণে লেখা যায় :

একজন শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী

তোমার প্রিয় নেতা

প্রবন্ধ-সূত্র : ১৮৮১। বঙ্গ-সরস্বতীর পূজারী  
বন্ধিমচন্দ্র। বাংলা সাহিত্যে যুগান্তর। প্রাচ্য-  
পাশ্চাত্যের ভাব-সম্বন্ধ। কেন প্রিয় গ্রন্থকার ?।  
বন্ধিম-রচনাবলীর বৈশিষ্ট্য। স্বাধেশিকতার প্রথম  
উল্লেখ। উপসংহার।

আমার প্রিয় গ্রন্থকার :

বন্ধিমচন্দ্র

উ. মা. '৬১

‘আমরা আমাদের ঘরের মেয়েকে সূর্যমুখী-কমলমণি-রূপে দেখিলাম, চন্দ্রশেখর এবং প্রতাপ বাঙালি  
পুরুষকে একটা উচ্চতর ভাবলোকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। আমাদের প্রতিদিনের ক্ষুদ্র জীবনের  
উপরে একটা মহিম রশ্মি নিপতিত হইল।’  
—রবীন্দ্রনাথ

যখন বাংলার কোন সাহিত্যাদর্শ ছিল না, তাহার সাহিত্যে ছিল না কোন মহান  
ভাবের ক্ষুরধা, অবহেলায় অনাদরে যখন বাংলা সাহিত্য নিমজ্জিত-প্রায়, তখনই  
যিনি রূপকথার রাজপুত্রের মতো বাংলার সাহিত্যকে, বাঙ্গালীর ভাষাকে সেই চরম  
অধঃপতন ও অবমাননার হাত হইতে উদ্ধার করিলেন, তিনিই আমার প্রিয় গ্রন্থকার—  
বন্ধিমচন্দ্র। সেদিন ছিল সত্যিই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ঘোর দুর্দিন। একদিকে,  
ইংরেজি শিক্ষিতদের চক্ষে বাংলা ভাষা ছিল বর্বরের ভাষা; অন্য-  
দিকে, সংস্কৃতজ্ঞদের দৃষ্টিতে তাহা ছিল চণ্ডালের ভাষা। সমাজের

উভয় শ্রেণীর এই অপমান ও অনাদর মাথায় বহন করিয়া আমাদের প্রিয় বাংলা ভাষা  
ও সাহিত্য চলিয়াছিল দীনা দীন অবমানিতার বেশে। তাহার কোলের সম্ভ্রান্তেরা  
তাহাকে ত্যাগ করিয়াছিল। তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া ‘পরধন-লোভে মত্ত’ হইয়া  
যখন তাহার ‘কৃষ্ণে ভিক্ষাবৃত্তি আচরণ’ করিয়া ফিরিতেছিল, তৎকালীন শিক্ষিত-শ্রেষ্ঠ  
বন্ধিমচন্দ্র তখন বঙ্গ-সরস্বতীর পদতলে দাঁড়াইয়া ভক্তি-নম্র শিরে যেন মিনতি-ভরা কণ্ঠে  
বলিলেন—‘যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমায় ছাড়বো না, মা—’

তখন চারিদিক হইতে তাঁহার প্রতি ঘৃণা ও বিদ্রূপ বর্ষিত হইতে লাগিল। কিন্তু  
দৃঢ়চেতা বন্ধিম তাহা উপেক্ষা করিয়া তাঁহার পূজা-নিবেদনের অর্ঘ্য রচনা করিয়া  
বলিষ্ঠ পদ-বিক্ষেপে বঙ্গ-সরস্বতীর মন্দিরে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে প্রবেশ  
করিলেন। তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে রূপা প্রদর্শন করিতে  
আসেন নাই; প্রকৃত পূজারীর মতো, শ্রদ্ধাশীল ভক্তের মতো তিনি  
প্রতিভার নৈবেদ্য সাজাইয়া আনিলেন। বঙ্গ-সরস্বতীর মুখে হাসি ফুটিল, সাহিত্যের  
নানা উপচার ঘেন আশীর্বাদের মতো ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

‘বন্ধিম বঙ্গ-সাহিত্যে প্রভাতের সূর্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃৎপদ্য সেই  
প্রথম উদ্ঘাটিত হইল। পূর্বে কী ছিল এবং পরে কী পাইলাম, তাহা দুই কালের  
সঙ্ক্ষিপ্ত দাঁড়াইয়া আমরা এক মুহূর্তেই অনুভব করিতে পারিলাম।  
বাংলা সাহিত্যে কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই স্থগি, কোথায়  
যুগান্তর গেল সেই বিজয়বসন্ত, সেই গোলেবকাওলি, সেই বালক-ভুলানো  
কথা—কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সংগীত, এত বৈচিত্র্য!...  
বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।’



পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সাহিত্যের সংঘাতে উনবিংশ শতাব্দীতে ভাবের যে বিপুল তরলোচ্ছ্বাস উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে অপরূপ বাণীমূর্তি দান করিলেন। তিনি ঋষি অগস্ত্যের মতো পাশ্চাত্য সাহিত্য-সমুদ্রের অক্ষরস্রব জলরাশিকে যেন এক গভূষে পান করিয়া আত্মস্থ করিয়াছিলেন এবং পশ্চিম-প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের ভাব-সমগ্র্য বাহিনী সকল নদীকে পূর্ববাহিনী করিয়া বাংলা সাহিত্যের নৈস্তদশা স্বহস্তে মোচন করিলেন। নব-নব সৃষ্টির উল্লাসে বাংলা সাহিত্যে যেন ফসলের জোয়ার আসিল, বাংলা ভাষা উবরা শস্ত-শ্রামলা হইয়া উঠিল, বাসভূমি হইল যথার্থ মাতৃভূমি। এখন আমাদের মনের খাত প্রায় ঘরের দ্বারেই ফলিয়া উঠিতেছে। ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্যের বিষয়।

কেবল এইজন্যই যে বঙ্কিমচন্দ্র আমার প্রিয় গ্রন্থকার, তাহা নহে। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে আমাদের স্বপ্ন চেতনার প্রথম জাগৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম—আমাদের বন্দিনী ভাবনাসমূহের প্রথম মুক্তি দেখিয়াছিলাম। কল্পনার অবাধ বিস্তার এবং হৃদয়ের অব্যবহৃত প্রসার সেই প্রথম সম্ভব হইল। সেই সঙ্গে সমাজকে, স্বদেশকে এবং স্বদেশের চিরন্তন মানুষ—হাসিম শেখ ও রামা কৈবর্তকে আমরা ভালোবাসিতে কেন প্রিয় গ্রন্থকার? শিখিলাম। সেই ভালোবাসা অন্ধের ভালোবাসা নয়, চক্ষুমানের জাগ্রত প্রীতি। বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের চিত্তের উদ্বোধন ঘটাইয়া আমাদের হৃদয়ে দেশ-প্রীতির জোয়ার বহাইয়া দিলেন। বঙ্কিমের উপল্যাপে, তাঁহার প্রবন্ধাবলীতে, তাঁহার কমলাকান্ত, তাঁহার মুচিরাম গুড়ের জীবনকাহিনীতে আমাদের কেবল চিত্ত-মুক্তি ঘটিল না, আমাদের আত্মদর্শন ঘটিল। আমরা নিজেদের চিনিতে পারিলাম।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপল্যাপ ‘দুর্গেশনন্দিনী’ আমাদের মনোহরণ করিয়াছিল। দুর্গেশনন্দিনীর ভগবৎসিংহের মতো তিনিও যেন বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে দুবার অস্বাভাবিক অসিলেন। গড় মান্দারগের কেবল শৈলেশ্বর মন্দিরেই নয়, বাংলা সাহিত্যের মন্দির-দ্বারেও পড়িল দুর্জয় করাঘাত—দ্বার খোল, খোল দ্বার! শেক্সপীয়ারের জুলিয়াস সিজারের মতো তিনিও বলিতে পারিতেন—‘I came, I saw, I conquered.’ কবিত্বময় ভাষার অনবদ্য সুষমায়, বর্ণনার চমৎকারিত্বে, ঘটনার উপস্থাপনায়,

বঙ্কিম-রচনাবলীর  
বৈশিষ্ট্য

রোম’য়ের বর্ণনা আলোকসম্পাতে দুর্গেশনন্দিনী প্রথম দর্শনেই আমাদের চিত্ত জয় করিয়া লইল। তারপর আসিল কপালকুণ্ডলা।

তরঙ্গমুখর নির্জন সমুদ্রতীরের প্রেক্ষাপটে বন-বালিকা কপালকুণ্ডলার যে বর্ণনা-বিগ্রহ বঙ্কিম রচনা করিলেন, তাহা অনবদ্য। তারপর অপরূপ তরঙ্গ বিস্তার করিয়া আসিল বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, কুরুকান্তের উইল, মৃণালিনী, রজনী, ইন্দিরা, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী ও সীতারাম। আসিল কমলাকান্ত, আসিল মুচিরাম গুড়, আসিল শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র। তাঁহার কমলাকান্ত চির-নতন এবং তাঁহার আনন্দমঠ দেশাত্মবোধ উদ্বোধনের প্রথম বেদগ্রন্থ। ‘বন্দে মাতরম্’ সংগীত দেশ-মাতৃকার পূজার অপরূপ বেদমন্ত্র।

ইতিপূর্বে হিন্দু-মলা প্রতিদ্বিত হইয়াছিল। কাব্য-কবিতায় এবং ভাবে-চিন্তায় আমাদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার ধীর-মন্দর উদ্বোধন দিতেছিল। কিন্তু স্বদেশের ছিল

না কোন রূপমূর্তি, ছিল না মাতৃ-প্রতিমার স্বরূপ। বঙ্কিম মানবী-জননী, দেশ-জননী এবং দেবী-জননীর সমাহারে দেশমাতৃকার এক অনবদ্য বাণী-বিগ্রহ রচনা করিয়া দেশবাসীর হাতে তুলিয়া দিলেন। আনন্দমঠের সন্তানগণই যে একমাত্র সন্তান, তাহা নহে; বঙ্কিমচন্দ্র ভারতের তেত্রিশ কোটি নরনারীকে যেন ত্যাগ-সমুজ্জ্বল সন্তান-ধর্মে দীক্ষিত করিলেন। তাহা ছাড়া, সেদিন সমগ্র জাতিকে তিনি 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া দেশমাতৃকার শৃঙ্খল-মোচনের মহালগ্নকে ত্বরান্বিত করিয়া গিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে; জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমাহারে তিনি তাঁহার 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে

যে নবযুগের মাতৃ-সাধনার সার্থক রূপ তুলিয়া ধরিয়াছিলেন, তাহা স্বাধেশিকতার প্রথম উল্লাস।

জাতির জীবনে ব্যর্থ হয় নাই। তিনি জাতির হাতে যে মাতৃ-বিগ্রহ তুলিয়া দিয়া গিয়াছেন, তাহার মধ্য দিয়া জাতির মুক্তির আকাঙ্ক্ষার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এতদিন জাতির হৃদয়-মন্দিরে ছিল না মাতৃ-বিগ্রহ, শূন্য পড়িয়াছিল পূজা-বেদী। বঙ্কিম সেই শূন্য আসনে দেশমাতৃকার নিরুপম মূর্তি স্থাপন করিয়া আমাদের মাতৃ-পূজার আয়োজন করিলেন। দেখিতে দেখিতে হৃদয়ের মন্দিরে মন্দিরে সেই প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হইয়া পূজিত হইতে লাগিল। মাতৃ-পূজার হইল শুভ উদ্বোধন। বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের স্বাধেশিকতার প্রথম যথার্থ রূপকার, মাতৃ-পূজার বোধন-মন্ত্রের প্রথম বৈদিক ঋষি।

সামগ্রিকতার বিচারে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের ভগীরথ। তাঁহার আবির্ভাবের পূর্বে বাংলা সাহিত্যের সকল ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা যেন ষাট সহস্র সগর-সন্তানের মতো ভস্মীভূত হইয়া পড়িয়াছিল। কোথাও ছিল না প্রাণের স্পন্দন, কোথাও ছিল না শ্রামলতার আভাস। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার প্রতিভাবলে ভাব-মন্ডাকিনীর ধারাস্রোত বাংলা সাহিত্যের ধূসর উসর প্রান্তরে বহন করিয়া আনিলেন। বাংলা সাহিত্যের মৃত এবং ভস্মীভূত ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাসমূহ পুনর্জীবন লাভ করিল এবং সোনালী কসলের আকারে ধরে ধরে আত্মপ্রকাশ করিল। পতিত, বন্ধ্য সাহিত্য-

উপসংহার

প্রান্তরে এবার ফলিল সোনার ধান। পরবর্তীকালের শ্রেষ্ঠশিল্পী রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' সেই ধানে বোকাই হইল, বাংলা ভাষার চরণতীরে সমগ্র জগৎ যাওন্মা-আসা শুরু করিল। বাংলা সাহিত্যের এই চরম সমুন্নতির দিনে বঙ্কিমের নিকট আমরা কতখানি ঋণী, তাহা স্বীকার না করিলে আমাদের জাতীয় জীবনের হইবে চরম অক্লান্ততা। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম সাহিত্য-পুরুষ বঙ্কিমচন্দ্রকে আত্ম-বিস্মৃত বাদ্গালী যেন তুলিয়া না যায় ॥

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র
- আমার প্রিয় সাহিত্যিক ও তাঁহার গুণাবলী, উ. মা. '৭১
- তোমার প্রিয় লেখক
- তোমার প্রিয় গ্রন্থ ও গ্রন্থকার

[ এই সঙ্গে 'আমার প্রিয় উপস্থান : পথের পাঁচালী' প্রবন্ধ-সংকেত দ্রষ্টব্য ]

প্রবন্ধ-সূত্র : যুচনা। আবির্ভাব ও বাংলা  
কাব্যে প্রতিষ্ঠান্নত। কৈশোর ও প্রথম যৌবন।  
নজরুল-প্রতিভার প্রেরণা-উৎস। বিদ্রোহী যৌবনের  
কবি। নজরুলের বিদ্রোহাত্মক কবিতার সৌন্দর্য।  
হিন্দু-মুসলমানের মিলন-তীর্থ। উপসংহার।

## আমার প্রিয় কবি :

নজরুল ইসলাম

যে কবির কাব্যে মৃত্যুঞ্জয়ী চির-যৌবনের জয়ধ্বনি শুনিয়াছিলাম, শুনিয়াছিলাম  
অগ্নিবীণার সুর-ঝঙ্কার, যিনি ধীর স্থির অচঞ্চল বাংলা কাব্যে বহিয়া আনিয়াছিলেন  
দুবীর কালবৈশাখীর বড়, সেই বিদ্রোহী-কবি কাজী নজরুল ইসলামই আমার প্রিয়  
কবি। এই পরাধীন জড়তাগ্রস্ত সমাজের বৃকে তিনিই কোঁ সঞ্চারিত  
করিয়াছিলেন নব-যৌবনের শোণিত-ধারা। তাহার কবিতাগুলি  
নব-ভারতের সঞ্জীবনী মন্ত্র, তাহার সংগীত সর্বহারার কল্লার বাণী। তাহার সংগীত ও  
কবিতায় সেদিন ‘হিমাচল-চাপা প্রাচী’ ‘নব-যৌবন-ভলতরঙ্গে’ নাচিয়া উঠিয়াছিল।  
আজ সেকথা সকলে ভুলিতে পারে, কিন্তু আমি ভুলিব না।

বিদ্রোহের জয়ধ্বজা উড়াইয়া ধূমকেতুর মতো নজরুল ইসলাম দুবীর পদ-বিক্ষেপে  
রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠাভূমিতে অবিকৃত হইলেন। তাহার ‘বিদ্রোহী’ কবিতাটিই  
প্রকৃতপক্ষে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে তাহার ছাড়পত্র-স্বরূপ। উদাত্তকণ্ঠে তিনি ঘোষণা  
করিলেন—

“বল বীর—

বল, উন্নত মন শির

অবির্ভাব ও বাংলা

কাব্যে প্রতিষ্ঠান্নত

শির নেহারি, আমারি নত-শির ই শিখর হিমালয়

বল বিশ্বের মহাকাশ কাড়ি’

চলুহুঁ প্রহতারা চাড়ি’

উঠিয়াছি চির-বিশ্বের আমি বিশ্ব-বিধাতার।”

কেবলমাত্র এই ‘বিদ্রোহী’ কবিতাতেই বাংলা কবিতার আসরে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত  
হইলেন। কবি নজরুল হইলেন বাংলার বিদ্রোহী কবি।

বর্ধমান জেলার চুকুলিয়া গ্রাম। বাংলা-নাম দুখ মিঞা। ধর্মপ্রাণ দরিদ্র পিতা ঐ  
নামই রাখিয়াছিলেন। পিতৃ-বিয়োগের পর কবি-কিশোর নিলাকর্ণ দারিদ্র্যের মধ্যে  
পড়েন এবং অভিতাবকহীনতার জ্ঞাত চরম উচ্ছ্বলতার মধ্যে কাঁপাইয়া পড়েন। এই

সময়ে লোটো গানের দলে গীত রচনা ও সুর-সংযোজনা করার  
কৈশোর ও  
প্রথম যৌবন  
প্রয়াসের মধ্যে নজরুল-প্রতিভার প্রথম বিকাশ পরিলক্ষিত হয়।

পরে মাংসের দোকানে চাকরি ও সিয়ারশোল উচ্চ বিদ্যালয়ে  
ভর্তি—এ সমস্ত নজরুলের জীবনের চমকপ্রদ ঘটনা। তদপেক্ষা চমকপ্রদ ঘটনা হইল  
তাহার বান্ধালী-পন্টনে যোগদান। কাহারও মতে, তিনি করাচী পর্যন্ত গিয়াছিলেন,  
কাহারও মতে, মেসোপটেমিয়ায়। সে যাহাই হউক, সেনাবাহিনীতে যোগ্যতার  
পরিচয় দিয়া তিনি ‘হাবিলদার’ পদে উন্নীত হন।

প্রথম মহাযুদ্ধের অবসান হইল। ছাঁটাইয়ের খাতায় নাম উঠিল নজরুলের। মহাযুদ্ধের স্মৃতি এবং পরাধীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের দাবাঘ্নি আলিয়া দুদাড় আবেগে বাংলাদেশের মাটিতে কিরিয়া আসিলেন বাংলার অখ্যাত হাবিলদার কবি। যুদ্ধক্ষেত্রের ট্রেঞ্চ বসিয়া রচিত তাঁহার কবিতা ‘মুক্তি’ ইতিমধ্যে বাংলা দেশের একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এবার তিনি বিদ্রোহের বহিষ্কৃত লইয়া বাংলা কবিতার আসরে অবতীর্ণ হইলেন। পুরাণ-কোরান-গীতা-মহাভারতের গভীর জ্ঞান এবং আরবী-ফারসী-সংস্কৃত-বাংলার শব্দ-ভাণ্ডারের দুর্লভ চাবিকাঠি ছিল তাঁহার হাতে। আর ছিল উদাত্ত কণ্ঠ এবং রাগ-রাগিণীর জ্ঞানের সঙ্গে বাংলার কীর্তন-বাউল-সারি-ভাটিয়ালির প্রতি প্রাণের টান ও সেই সঙ্গে পাশী-গজলের প্রাণ-মাতানো সুর-বাহার।

নজরুল চির-যৌবনের কবি। প্রাণ-প্রাচুর্যই যৌবনের নিশ্চিত প্রাণ-লক্ষণ। প্রথম মহাযুদ্ধের পর আশাভঙ্গ-হেতু সেই যৌবন বিদ্রোহ-ধর্মী। সর্বপ্রকার বিদ্রোহী যৌবনের কবি শোষণ-শাসন-শৃঙ্খলা সবলে ভাঙ্গিবার দুর্জয় সাধনায় সে ব্রতচারী। নজরুলের কাব্যে শোনা গেল সেই বিদ্রোহী যৌবনের নির্বাধ পদধ্বনি। রবীন্দ্রনাথও বিস্মিত রহে নজরুলকে স্বীকার করিয়া লইলেন।

বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া নজরুল দেখিলেন, দেশব্যাপী পরাধীনতার নীরজ অন্ধকারে, নিকট শ্রেণী ও সাম্রাজ্যবাদীদের নির্লজ্জ শোষণে সমগ্র সমাজে রচিত হইয়াছে কংকাল-পরিকীর্ণ এক বিশাল শ্মশান-ভূমি; তিনি উদ্ধত কাপালিকের মতো সেই শ্মশান-ভূমিতে উচ্চারণ করিলেন শব-সাধনার তৈরবী মন্ত্র—

“কারার ঐ লৌহকপাট  
ভেঙে ফেল কর রে লোপাট  
বক্ত-জমাট শিকল-পুজার পাষণ-বেদী।” —ভাঙ্গার গান

নজরুলের বিদ্রোহাঙ্গক  
কবিতার সৌন্দর্য

বক্ত-গভীর কণ্ঠ ঘোষণা করিলেন—

“আমি বেহুয়িন, আমি ডেঙ্গিস  
আমি আগনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ।” —বিদ্রোহী

কারণ ‘সোইহং’—আমিই সেই। আমার ললাটে ঈশ্বরের আলীর্বাদের জয়-ললাটিকা আমি কাহারও নিকট মস্তক অবনত করিতে পারি না। মাছুষ যতদিন অজ্ঞতার অন্ধকারে থাকে, ততদিন সে নিজেকে চিনিতে পারে না, সন্ধান পায় না নিজের শক্তির। কবি তাই বলিলেন—‘আমি সহসা আমারে চিনিয়া কেলেছি, আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ। আমি উন্মাদ! আমি উন্মাদ!’ আত্মশক্তির সন্ধান লাভ করিলে পরাধীনতার বন্ধন আর স্থায়ী হয় না। কবির বিদ্রোহ যেমন পরাধীনতার বিরুদ্ধে, তেমনি তাঁহার বিদ্রোহ সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধেও। তাঁহার দৃষ্টিতে সমস্ত সামাজিক ভেদাভেদই কৃত্রিম এবং মিথ্যা। তিনি বলিলেন—

‘ও কি চণ্ডাল! চমকাও কেন? নহে ও হুণ্ডা জীব—  
ওই হতে পুরে হরিশক্ত, ওই শ্মশানের শিব।’

—সাম্যবাদী

সামাজিক জড়তা ও ক্রান্তিকর নৈষ্কর্মেয় মধ্যে কালবৈশাখীর ঝড়ের মতো তিনি আবেগ-ধ্বংস কণ্ঠে গাহিলেন—

‘মেনে শত বাধা টিকটিকি হাঁচি  
টিকি ছাড়া নিয়ে আজো বেঁচে আছি  
বাঁচিতে বাঁচিতে প্রায় মরিয়াছি, এবার সবাসাচী,  
বা হোক একটা তুলে দাও হাতে, একবার মরে বাঁচি।’ —সবাসাচী

তাহার ‘অগ্নিবীণা’, ‘বিশ্বের বীণা’, ‘সর্বহার’, ‘কণি-মনসা’ প্রভৃতি কাব্যগুলির মধ্যে বিজ্রোহেরই সোচ্চার জয়ধ্বনি।

দেশে তখন একদিকে স্বাধীনতার আন্দোলন প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি বিদেশীর চক্রান্তে হিন্দু-মুসলমান সমস্তা মাথা তুলিয়া উঠিতেছে। স্বাধীনতা-সংগ্রামের কাণ্ডারীকে ডাকিয়া তিনি আদেশ করিলেন—

হিন্দু-মুসলমানের “হিন্দু না ওরা মুসলিম?—ওই ভিজ্ঞাসে কোন্ জন?  
মিলন-তীর্থ , কাণ্ডারী, বল ডুবিয়ে মানুষ, সম্মান মোর মার।” —কাণ্ডারী ভঁশিয়ার  
এইভাবে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতির মিলন-মন্ত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন তিনি।  
নজরুলের কথা তাই হিন্দু-মুসলমানের মিলন-তীর্থ।

অন্যদিকে, সাম্রাজ্যবাদের নির্ধর শোষণের বিরুদ্ধে তাহার লেখনী অগ্নি উদগার করিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদের পেষণ-চক্রতলে নিপীড়িত মানব-আত্মার আকুল জ্বলন-ধ্বনি তিনি শুনিয়েছেন। তাই তিনি ব্যথাহত কণ্ঠে উচ্চারণ করিয়াছেন—

“বন্ধু গো, আর বলিতে পারি না, বড় বিষ-ছালা এই বুকে,  
দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই মুখে।  
উপন্যাস রক্ত ঝরাতে পারি না তো একা  
তাই লিখে যাই এ রক্ত-লেখা—  
প্রার্থনা করো, যারা কেড়ে খায় তেজস্কে কোটি মুখের জ্ঞান  
যেন লেখা থাকে আমার রক্ত-লেখায় তাদের সর্বনাশ।” —আমার কৈফিয়ৎ

নজরুল সেই রক্ত-লেখার কবি, সেই ব্যথিত মানবাত্মার কবি, আমার প্রিয় কবি। তিনি তো বিজ্রোহী যোবনের কপালে জ্বল-তিলক আঁকিয়া দিয়া তাহাকে ‘দুর্গম গিরি কান্ধার মক্কেল তন্তর পারাবার’ উত্তরণের মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছেন। সমগ্র জাতি নজরুলের কবি-প্রতিভার কাছে তাই অসীম ঋণে পণী ॥

“মেরা একই বুকে হইবে দুসুখ-হিন্দু-মুসলমান।  
মুসলমানের জীবন-মরণ হিন্দু-জীবন-মরণ।”  
—নজরুল

এই প্রবন্ধের অন্তিমরণে লেখা যায় :

- বিজ্রোহী-কবি নজরুল ইসলাম
- নজরুল-প্রতিভা

শ্রবন্ধ-সূত্র : সূচনা। জন্ম ও বংশ-পরিচয়।  
 শিক্ষা-জীবন। কর্ম-জীবন। কৃতিত্ব। বিজ্ঞানের  
 ক্ষেত্রে অবদান। জীবনের অন্ত্যস্ত দিক্-বিগন্ত।  
 উপসংহার।

## বিজ্ঞানার্চ্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু

আচার্য জগদীশচন্দ্র ভারতে বিজ্ঞান-চর্চার যে অমূল্য ঋণিগণ রচনা করিয়া গিয়াছেন, বিজ্ঞানার্চ্য সত্যেন্দ্রনাথের আবির্ভাব তাহার মধ্যেই। বিজ্ঞানের সেবায় উৎসর্গীকৃত-প্রাণ এই মহাতাপস তাঁহার অক্লান্ত সাধনায় পরমাণু-কেন্দ্রের রহস্যের আবরণ উন্মোচন করিয়া বিশ্ব-বিজ্ঞানের এক অদ্ভুত দিগন্তকে আলোকিত করিয়া গিয়াছেন। বিশ্ব-বিশ্রুত বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনের আপেক্ষিক-সূচনা।

তবে এমন কতকগুলি জটিল সমীকরণ ছিল, যাহার পূর্ণ সমাধান অসম্ভব। সত্যেন্দ্রনাথ সেই রুদ্ধদ্বারে করাঘাত করিলেন; আর সঙ্গে সঙ্গেই সেই রহস্য-নিকেতনের দ্বার খুলিয়া গেল। তাঁহার হাতেই অসম্ভব সম্ভব হইয়া উঠিল। এবং সত্যেন্দ্রনাথই হইলেন বিশ্বের একমাত্র সেই বিজ্ঞানী, আইনস্টাইনের নামের সঙ্গে যাহার নাম সগৌরবে যুক্ত।

জন্ম ১৮৯৪ সালের ১লা জানুয়ারী। পিতার নাম সুরেন্দ্রনাথ বসু, মাতার নাম আমোদিনী। সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন রেলের একজন কর্মচারী। জন্ম ও বংশ-পরিচয়  
 রেজিষ্টারপত্র সীমিত; সেই কারণে সংসারও খুব অসচ্ছল। সাংসারিক সেই অসচ্ছলতার মধ্যেই একালের অগ্রতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথের জন্ম।

সত্যেন্দ্রনাথের শিক্ষা-জীবন অতি-সাধারণভাবেই সূচিত হয়। সূচনায় দুই-একটি স্কুলে বিদ্যালিকার পর তিনি হিন্দু স্কুলে ভর্তি হন। ১৯০৯ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান অধিকার করিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হইলেন।

শিক্ষা-জীবন  
 ১৯১১ সালে এফ. এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান এবং ১৯১৩ সালে গণিতে অনার্স সহ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া স্বীয় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখিলেন। তারপর ১৯১৫ সালে মিশ্র-গণিতে এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সাক্ষ করিলেন।

কর্ম-জীবনে প্রবেশের সূচনায় তাঁহাকে স্তার আন্তোয় বিজ্ঞান-কলেজে নব-গঠিত পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগে যোগদানের জ্ঞাত আহ্বান করেন। সত্যেন্দ্রনাথও সেই আহ্বানে সাড়া দিয়া পাঁচ বছর বিজ্ঞান-কলেজের পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগে থাকিয়া যান। এমন-কি,

এই বিভাগের গবেষণাগার ইত্যাদির বিভাগ ও স্থান-বন্টনে ছিল  
 কর্ম-জীবন  
 তাঁহার সৃষ্টিত দূরদর্শিতার স্পর্শ। তারপর ১৯২১ সালে তিনি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ-বিজ্ঞানের রীডার পদে যোগদান করিলেন। সেখানে ক্রমশঃ তিনি পদার্থ-বিজ্ঞানের বিভাগীয় প্রধান পদে বৃত্ত হন। এইভাবে ঢাকায় বহুদিন কাটাইয়া অবশেষে ১৯৪৫ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞানের

বিভাগীয় প্রধান হইয়া আসেন। ১৯৪৪ সালেই তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৯৪৮-৫০ সালে তিনি ভারতের গ্রাশনাল ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সের চেয়ারম্যান পদে বৃত্ত হন। ১৯৫১ সালে ইউনেস্কোর একটি জরুরী কমিটির বৈঠকে যোগদান করেন। ১৯৫৪ সালে ভারত সরকার বিজ্ঞানে তাঁহার কৃতিত্বের স্মারকরূপে তাঁহাকে 'পদ্মবিভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেন। তারপর ১৯৫৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১৯৫৮ সালে বাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে 'ডক্টরেট' উপাধি দিয়া সম্মানিত করেন। ইতিপূর্বে ১৯৫৬ সাল হইতে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত তিনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাৰ্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইবার ১৯৫৮ সালে ভারত সরকার তাঁহাকে জাতীয় অধ্যাপক পদে বরণ করেন। ১৯৭৬ সালের ৪ঠা জানুয়ারী তাঁহার পরলোকগমনের দিন পর্যন্ত তিনি ঐ পদে বৃত্ত ছিলেন।

দীর্ঘদিন ধরিয়া বিশ্ব-বিশ্রুত বৈজ্ঞানিকেরা পরমাণু-বিজ্ঞানের রুদ্ধদ্বারে কৰাধাত হানিতেছিলেন, কিন্তু সেই দুর্ভেদ্য দ্বার খুলিতে সক্ষম হন নাই। জার্মানীৰ বৈজ্ঞানিক ম্যাক্স প্লাঙ্ক ও আইনস্টাইন তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। ১৯০০ সালে ম্যাক্স প্লাঙ্ক যে স্বত্বের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাহাতে বিশ্বের বৈজ্ঞানিকগণের মনের সংশয় দূর হয় নাই। ১৯২৪ সালে ত্রিশ বৎসর বয়স্ক তরুণ অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ একটি ছয় পৃষ্ঠার প্রবন্ধে পরমাণু-বিজ্ঞানের সেই রুদ্ধদ্বারে কৰাধাত করিলেন।

কৃতিত্ব

সঙ্গে সঙ্গে সেই দ্বার উন্মুক্ত হইয়া গেল। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন বহু-স্বত্বের সত্যতাকে স্বীকৃতি জনাইলেন, তরুণ অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বহুকে তাঁহার গবেষণার সাক্ষ্যের ভগ্ন অভিনন্দিত করিলেন। ১৯০০ সালে ম্যাক্স প্লাঙ্ক যাহা শুরু করিয়াছিলেন, তরুণ বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথের হাতে তাহা পূর্ণতা লাভ করিল। বহু-স্বত্বের পথ ধরিয়া আইনস্টাইন আরও অগ্রসর হইয়া গেলেন। পরবর্তীকালে আইনস্টাইন-স্বত্বের নামকরণ করা হইল বহু-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন-স্বত্ব।

কেবল পদার্থ-বিজ্ঞানের পরমাণু-তত্ত্বের ক্ষেত্রেই নয়, বিজ্ঞানের অগ্রাগ্রা শাখা-প্রশাখায় ও আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের কৃতিত্বের অবদান অবিস্মরণীয়। বহু-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন-স্বত্বের জ্যোতির জ্বলসে তাঁহার সেই অবদানগুলি ঢাকা পড়িয়া গেলেও সেগুলিকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ১৯৪৫ সালে আইনস্টাইন যে নুতন

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে  
অবদান

ক্ষেত্র-তত্ত্বের অবতারণা করেন, দীর্ঘদিন পর্যন্ত কেহই তাহাকে সম্পূর্ণতা দান করিতে পারেন নাই। ১৯৫২ সালে সত্যেন্দ্রনাথ অতি সহজ পদ্ধতিতে তাহাকে সম্পূর্ণতা দান করিবার এক

ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। রসায়ন-বিজ্ঞানে—এমন-কি, উদ্ভিদ-বিজ্ঞানেও সত্যেন্দ্রনাথের অবদান অনস্বীকার্য। স্নানামধ্য উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী অধ্যাপক হৃদয়রাম বহু স্বীকার করিয়াছেন যে, আচার্য বহুর মতামত এই বিষয়গুলির বহু অঙ্ককার দিগন্তে আলোকপাতে সমর্থ হইয়াছে।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ছিল আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের অগাধ প্রীতি। প্রমথ চৌধুরী-পরিচালিত ‘সব্জ-পত্র’ গোষ্ঠীর তিনি ছিলেন একজন সক্রিয় সদস্য। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার তিনি ছিলেন প্রেরণার এক স্তমহান উৎস। তিনি একবার বলিয়াছিলেন, আমাদের পাখিব জীবনের এমন কোন ভাব, এমন কোন ভাবনা নাই, যাহাকে বাংলা ভাষায় রূপ দান করা যায় না। বাংলা ভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন সম্ভব—ইহা তাঁহার স্চিন্তিত অভিমত। তাঁহার এই অক্লান্তিম ভাষা ও সাহিত্য-প্রীতির জন্ত রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে তাঁহার ‘বিশ্ব-পরিচয়’ গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন। সংগীত এবং বৈঠকী আলোচনায় ছিল তাঁহার সমান আগ্রহ। নিজে এশ্রাজ্য বাজাইয়া তিনি তাঁহার অবসর বিনোদন করিতেন। পশুপাখিদের প্রতিও ছিল তাঁহার স্নগভীর প্রীতি।

বিভিন্ন দিক দিয়া বিশ্ব-বিশ্রুত বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনের সঙ্গে তাঁহার ছিল গভীর সাদৃশ্য। সেইজন্ত তাঁহাকে ‘বাংলার আইনস্টাইন’ বলা হয়। বিশ্ব-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরমাণুর মৌল কর্ণকাণ্ডলির একজ্ঞেয়ীকে তাঁহার কৃতিত্বের সম্মানে তাঁহারই নামে নামাঙ্কিত করা হইয়াছে—‘বোসন’। এই ‘বোসন’গুলি অবিনশ্বর।  
উপসংহার . বিশ্ব-বিজ্ঞানের ইতিহাসে বিজ্ঞানার্চ্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর অবদানও তেমনি অবিনশ্বর। যতদিন বিশ্বে ‘বোসন’ থাকিবে, বিজ্ঞানার্চ্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নামও ততদিন উজ্জ্বল মহিমায় বিরাজিত থাকিবে ॥

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- বাংলার একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী
- বিজ্ঞানে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর অবদান
- আইনস্টাইন ও আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু



প্রবন্ধ-সূত্র : ৭চনা। ভারতের কুটির-শিল্পের  
পরাত্তব ও তার কারণ। বৈচিত্র্য-বিলসিত ভারতের  
কুটির-শিল্পের বিপুল আয়োজন। ভারতের কুটির-  
শিল্পের চরম সংকট। ভারতের কুটির-শিল্পের নব-  
জীবনায়ন। কুটির-শিল্পের উন্নয়ন-প্রয়াস। উপসংহার।

## কুটির-শিল্প

অতি প্রাচীনকালেই ভারতের কুটির-শিল্প লাভ করেছিল বিশ্ববিশ্রুত মর্যাদা। ভারতের কুটির-শিল্পজাত পণ্যসম্ভার কিনবার জন্তে পৃথিবীর অভিজাত বিলাসী জাতিরা হাতে কড়ি নিয়ে ভারতীয় পণ্য-সম্ভারের পথ চেয়ে বসে থাকতো। এইভাবে বিশ্বের সমৃদ্ধ ধন-সম্পদ কুটির-শিল্পের মাধ্যমে এদেশে প্রবাহিত হয়ে আসতো। আসতো ভারতের স্বপ্ন, আসতো ভারতের সমৃদ্ধি। অতি প্রাচীনকালেই ভারত ‘সোনার ভারত’

নামে তার পরিচিতি-অর্জন করেছিল। আর, ‘সোনার ভারত’

নামে এই-যে ভারতের পরিচিতি, তার পেছনে সোনার খনির সমৃদ্ধি ছিল নগণ্য। সোনার খনি ছিল তার উর্বর শত্রু-প্রান্তরে, ছিল চরকা-চরকা, চাতে-চাতে, কুটির-শিল্পীদের শিল্পের উপকরণগুলিতে। আজ কোথায় গেল তার কাই মসলিন? কোথায় গেল তার চন্দ্রকোণা? অতীতের ইতিহাসের পাতায় ঘুরা গেছে নির্মমভাবে হারিয়ে। স্বদেশ-প্রেমিক কবি তাই পরম বেদনায় তার গারবময় স্মৃতিকে অশ্রুসিক্ত করে গাইলেন :

‘বাংলার মসলিন বোগলান্দ রোম চীন

কাকন ভোলেই কিনতেন একদিন।’

সদিন আজ আর ভারতের নেই; কলাকুশলী ভারতীয় তাঁতীরা আজ আর বিশ্ব-বনকে ঢাকাই মসলিনে কিংবা বিখ্যাত চন্দ্রকোণায় সাজায় না। কাশ্মীরের সৌন্দর্য-বিলসিত শাল, দিল্লীর ক’রুকার্ঘ্যময় রেশমী বস্ত্র আজ লুপ্তগৌরব। আর পরম বেদনার বিষয়, ভারতের স্বনাম কুটির-শিল্পের স্বর্ণযুগ, তখন ইংরেজদের পূর্বপুরুষেরা ছিল ‘চিত্রিত বর্বর’ [Painted Savages]। কিন্তু শিল্প-সংঘাতে ভারত পরবর্তীকালে সেই বর্বরদের উত্তর-পুরুষদের হাতে পরাজিত হলো, পলাতন হলো তাদের কাছে।

ভারতের এই পরাজয়ের কারণ—সে কোনদিন শক্তিচর্চা করেনি, করেছে শিল্প ও দান্দ্য-সাধনা। তাই সে শিল্প-বিপ্লবের আশীর্বাদ-পুষ্ট জাতিগুলির হাতে নির্মমভাবে পরাজিত হলো। তাদের কলকারখানাজাত দ্রব্য-সামগ্রীর কাছে ভারতের কুটির-শিল্পের ঘটলো পরাত্তব। ঢাকার মসলিন-শিল্পীদের এবং চন্দ্রকোণার তক্তবায়নের বৃদ্ধাধুর্ন-ছেদনের কাহিনী এই ঐতিহাসিক সত্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। রাজনৈতিক বিজয় ইংরেজদের অর্থনৈতিক সিদ্ধি নে দিয়েছিল; আর ভারতের ভাগ্যে এনে দিয়েছিল শিল্প-বিপ্লবের চরমতম অভিলাপ।

বিদেশী শক্তির আবির্ভাবের পূর্বে ভারতের কুটির-শিল্প ছিল স্বপ্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত বং বৈচিত্র্য-বিলসিত। রেশম ও পশম-শিল্প, তক্তবায়ন-শিল্প, দুর্ভজাত পণ্যশিল্প, চর্মশিল্প,

কর্মকৃতি, কৃষ্ণকৃতি, শঙ্খকৃতি, বেত্র-শিল্প, কাগজ-শিল্প, অলংকার-শিল্প, কার্পেট, সূচী-শিল্প, কাঠ-শিল্প, ভাস্কর্য-শিল্প, যুং-শিল্প, কাঁচের চুড়ি, বিহুক-নির্মিত দ্রব্য, চীনা মাটির বাসনপত্র, কাংশু-শিল্প, চিত্র-শিল্প, মিষ্টান্ন-শিল্প, গন্ধ-দ্রব্য, রঞ্জন-শিল্প ও প্রসাধন-সামগ্রী ইত্যাদি ছিল ভারতের কুটির-শিল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। তারপর বিদেশী শক্তির আবির্ভাবে ভারতের কুটির-শিল্পের সেই গৌরব-স্বপ্ন হলো অন্তর্মিত।

কুটির-শিল্পের গৌরবময় দিনে ভারতের জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশের জীবিকার সংস্থান করে দিত কুটির-শিল্প। কুটির-শিল্পের শ্রমিক-সংখ্যা ছিল প্রায় দু' কোটি, অর্থাৎ ভারতের জনসংখ্যার প্রায় পনেরো ভাগ। বিলেতের কাপড়ের কলের আক্রমণে একমাত্র তাঁতশিল্পেই প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ লোক বেকার হয়ে যায়। বিদেশী শিল্পের সঙ্গে প্রবল সংঘাতে ভারতের কুটির-শিল্পের গৌরব পরিণত হলো ইতিহাসের এক বিস্মৃততম অধ্যায়ে। দীর্ঘকাল চর্চার অভাবে লুপ্ত হলো অতীতের কারিগরী দক্ষতা, শিল্প-প্রকর্ষ ও উৎপাদন-নৈপুণ্য। এদিকে, বেকার-শিল্পীর জীবিকার প্রত্যাহ্বান এসে ভিড় করলো কৃষির দুয়ারে। অতিভারগ্রস্ত হয়ে পড়লো ভারতীয় কৃষি। তার উর্বরতা-শক্তি হলো অবক্ষয়িত। ঋণগ্রস্ত, অর্ধদুঃস্থ, রোগজীর্ণ, স্বাস্থ্যহীন গ্রামীণ শিল্পীরা প্রতি মুহূর্তে শুনেছে মৃত্যুর পদশব্দ। নতুন যুগের সঙ্গে মোকাবিলা করবার মতো তাদের উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি নেই, উৎকৃষ্ট কাঁচামাল নেই, শৈল্পিক দক্ষতা নেই, মূলধন নেই, নতুন আবিষ্কারের জ্ঞানে নেই গবেষণা, পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নেই কোন বৈজ্ঞানিক ব্যবহার-পদ্ধতি। এই দুর্দশা থেকে একমাত্র সমাধানই কুটির-শিল্পকে বাঁচাতে পারে। কিন্তু আজ অধিকাংশ তাঁত-সমবায়ই পরিবারিক ব্যবসায়। কৃষা নামে অর্থগ্রহণ, তহবিল-তছরূপ ও নানা দুর্নীতিপূর্ণ কার্যকলাপের ফলে কুটির-শিল্পের সর্বনাশ সাধিত হচ্ছে।

কুটির-শিল্পের এই নৈরাশ্রজনক পরিস্থিতি নিয়ে ভারত স্বাধীন হলো। এলো পরিকল্পনার যুগ। শিল্পায়নের আয়োজন চলতে লাগলো দিকে দিকে। কিন্তু কুটির-শিল্প? ভারতের সেই বহু-ঐতিহ্যমণ্ডিত কুটির-শিল্প? ১৯৫৫ সালে হার্ভে কমিটি কুটির-শিল্প ও কুশল-শিল্পের দুর্গতি-মোচনের দিকে অঙ্গুলি-সংকেত করলো। ভারতের অর্থনীতিতে কুটির-শিল্প যাতে তার গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে, তার জল্পে সরকার ও পরিকল্পনা কমিশন সজাগ রয়েছেন। প্রথম পরিকল্পনায় একটি সর্বভারতীয় বোর্ড গঠিত হয়। তা ভারতের কুশল ও গ্রামীণ শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জল্পে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অন্তর্দিকে, তাঁত-শিল্প, রেশম-শিল্প, খাদি ও গ্রামোচ্চোগ-শিল্প, কুশলশিল্প, নারিকেল-ছোবড়া শিল্প, হাতিক্রাফ্ট—এই বোর্ডগুলি সমবায় আন্দোলন থেকে প্রাণপ্রবাহ সংগ্রহ করে নবজীবনের পথে চলেছে এগিয়ে। ঋণহীন, কারিগরী প্রশিক্ষণ, আধুনিকতম যন্ত্রপাতি-সরবরাহ, উপযুক্ত পণ্য-বিক্রয় ব্যবস্থা ইত্যাদির মাধ্যমে চলেছে কুটির-শিল্পের নব-জীবনায়নের আধুনিক আয়োজন।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনায় বৃহৎ ও ক্ষুদ্র-শিল্পের মধ্যে স্বল্পম ভারসাম্যের গাট-ছড়া বেঁধে দিয়ে ভারতের বৈষয়িক সমৃদ্ধির পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন ভারত সরকার। কিন্তু বৃহৎ-শিল্পের আগ্রাসী অভিযানে ক্ষুদ্র-শিল্প ক্রমশঃ নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। বৃহৎ-শিল্প ও ক্ষুদ্র-শিল্প যাতে পরস্পরের পরিপূরকরূপে গড়ে ওঠে, সে জন্তে পরিকল্পনা কমিশন স্থপাশি করছেন : এক. উৎপাদন-বৃদ্ধি ও উৎপাদন-ব্যয়-হ্রাস কুটির-শিল্পের উন্নয়ন-প্রদায় করবার জন্তে শৈল্পিক দক্ষতা বৃদ্ধি, কারিগরী পরামর্শ দান, উন্নত যন্ত্রপাতি ও ঋণ-সরবরাহ ; দুই. বিক্রয়-ব্যবস্থায় উৎসাহ সৃষ্টির জন্তে রিবেট্ দান ও সংরক্ষিত বাজারের ব্যবস্থা ; তিন. ক্ষুদ্র শহর ও গ্রামাঞ্চলে কুটির-শিল্পের সম্প্রসারণ ; এবং চার. শিল্পীদের মধ্যে সমবায়-প্রথার বহুল প্রচলন। তাছাড়া, বাণ-রাষ্ট্রীয়ত্বকরণ ক্ষুদ্র ও কুটির-শিল্পের খুবই সহায়ক হয়েছে।

ভারতের কুটির-শিল্পসমূহের পুনরুজ্জীবন শুরু হয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় ধান-ভাঙ্গা, তৈল-উৎপাদন, চর্মশোধন, দিয়াশলাই, গুড়, মক্ষিকা-পালন, তালগুড়, হস্ত-নির্মিত সাবান, সূতা ইত্যাদি উৎপাদনের দিকে মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল, এবং তাতে সফলও লাভ করা গেছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় ক্ষুদ্রশিল্প-উন্নয়ন সাতাশ লক্ষ লোকের কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা করেছে, উৎপাদন করেছে চল্লিশ হাজার কোটি টাকা মূল্যের পণ্য। চতুর্থ পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র ও কুটির-শিল্পের খাতে ব্যয়িত হয়েছে দুশো নব্বই কোটি টাকা। কিন্তু কেবল ঐগুলিই ভারতের কুটির-শিল্পের শেষ কথা নয়। ভারতের অবলুপ্ত কিংবা লুপ্তপ্রায়—অথচ একদা-বিখ্যাত—কুটির-শিল্পের সেই অনবদ্য সৃষ্টিগুলিকে আজ আবার কিবিধে আনতে হবে : সেজ্ঞা উৎপাদন-উৎকর্ষের সাধনা সম্প্রতি শুরু করেছে ভারতের

কুটির-শিল্প। ভারতে ভোগপণ্যের যে বাজার আছে, তা জয় করে বিদেশের বাজারও আজ দখল করতে হবে। তার জন্তে ভারত সরকারের শিল্প-বিভাগ উপযুক্ত বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করেছেন। এই উৎপাদন-বৈচিত্র্য ও উৎপাদন-উৎকর্ষ সম্পাদনের জন্তে আধুনিকতম উপকরণ ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ করবার প্রয়াস সচিৎ চাচ্ছে। শুধু তাই নয়, এখন পৃথিবীতে ভারতের কুটির-শিল্পের হারানে বাজার পুনরপিকার করবার জন্তেও সরকার উদ্যোগী হয়েছেন। এ বড়ো আশার কথা। ভারতের অর্থনীতির এই মরাগাণ্ডে আজ বচনিন পরে আবার জোয়ারের নতুন আবেগ সঞ্চারিত হচ্ছে। কুটির-শিল্পের সমবায়ী নৌকার পালে আজ লেগেছে নতুন যুগের তাওয়া। অভূতপূর্ব গতির প্রেরণায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে কুটির ও গ্রামীণ-শিল্প। বহু শতাব্দীর জড়তা থেকে ভারতের গ্রামীণ-শিল্পের এই নব-জাগরণ ভারতবাসীর জীবনে সত্য হোক, সফল হোক ॥

এই প্রবন্ধের অন্তঃসরণে লেখা যায় :

- ভারতের কুটির-শিল্প
- বাংলার কুটির-শিল্প
- বাঙ্গালীর শিল্প-সাধনা

প্রবন্ধ-সূত্র : সূচনা। ভারতের মর্মবাণী :  
মানব-সেবা। মানুষের সেবাই ভগবানের শ্রেষ্ঠ সেবা।  
মানুষই বড়, পাত্র বড় নয়। অতিথি-সেবা ও বরিত্র-  
নারায়ণের সেবা। দুঃস্থের সেবাই শ্রেষ্ঠ মানব-সেবা।  
উপসংহার।

বহুলাপ সম্মুখে তোমার  
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?

মা. '৩১, '৪৮

সুদূর গিরি-কন্দরে কিংবা তুর্ভেদ অরণ্য-কান্ডারে গিয়া মানুষ করে তাহার নির্জন ঈশ্বর-সাধনা। স্বর্গের দেবতার জগ্ন সে ঘোড়শোপচারে সাজায় তাহার পূজার নৈবেদ্য। অথচ তাহার দুয়ার হইতে কত ক্ষুধার্ত ভগবান নিত্য কাঁদিয়া যাইতেছে, সেদিকে তাহার ক্রক্ষেপ নাই। সে মানুষকে ঘৃণা করিয়া দেবতার করে পূজা। মানুষের স্পর্শ হইতে দেবতার শুচিতা রক্ষার জগ্ন নিমিত্ত হয় গগন-চূষী মন্দির। পাষাণ প্রাচীরের তুর্ভেদ অস্তরালে দেবতাকে সকল মানুষের সান্নিধ্য হইতে দূরে সরাইয়া আনিয়া স্বার্থপর মানুষেরা তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখে। কিন্তু ঈশ্বর তো

সূচনা

কোন একজন মানুষের কিংবা সম্প্রদায়ের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। ফলে, তাহাতে সে মানুষকে ত হারায়ই, দেবতার করুণালাভও হয় বঞ্চিত। এইখানেই তাহার ট্রাজেডি। বর্তমান যুগে স্বার্থপর মানুষ অপরের কথা ভাবে না, অপরের দুঃখে তাহার দৃষ্টি গলে না, অপরের শোচনীয় দুর্দশায় সে সহানুভূতি দেখায় না। মনুষ্যত্বের গৌরব হারাইয়া মানুষের এই অমানুষিকতায় শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ জনমে অন্তর্ভব করিতেন দুঃসহ বাধা। মানুষের অন্তরে শ্রীভগবানের বাস। মানুষকে ভালোবাসার অর্থ মানুষের অন্তরবাসী শ্রীভগবানকে ভালোবাসা। মানুষকে ঘৃণা করার অর্থ মানুষের অন্তরচারী শ্রীভগবানকে ঘৃণা করা। তাই বিবেকানন্দ বলিয়াছেন :

‘জীব প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।’

ইহা ভারতেরই মর্মবাণী। মানুষের দেহই তো জাগ্রত ভগবানের বাস-মন্দির। মানুষকে ভালোবাসিয়া, মানুষের সেবা করিয়া আমরা আমাদের পরম প্রার্থিত ভগবানের সন্নিহিত হই।

গৌতম বুদ্ধ জীবহিংসা পরিত্যাগ করিয়া সর্বভূতে প্রেম ও মানুষের মধ্যে মৈত্রী স্থাপনের উপদেশ দিয়াছিলেন। খ্রীষ্টচর্চকের বাণীও প্রেম, মৈত্রী ও সহিষ্ণুতার বাণী। আর শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী,—সেবার বাণী, মানবতার বাণী। তিনি উপদেশ দিয়াছেন ভাবকে শিবজ্ঞানে পূজা ও সেবা করিতে। যে যুগে মানুষ পরস্পর হিংসা, ঘেঁষ, পরশ্রীকাতরতায় কাতর—স্বার্থপরতার কুংসিত সংকীর্ণতায় মানুষ

‘ভারতের মর্মবাণী :  
মানব-সেবা’

যখন আপনার স্বজনকে পর্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছে—সেই যুগে মানুষকে দেবতা-জ্ঞান কি সহজে আসে? কিন্তু একবার এই অমূল্য স্মৃতি হৃদয়-মন্দিরে স্থান পাইলে আর মানুষ স্থির থাকিতে পারে না। একদিন বিবেকানন্দ মানব-প্রেমে উষ্ম হৃদয়ে বলিয়াছিলেন, ‘যতদিন ভারতবর্ষে একটি লোকও বুদ্ধি থাকিবে, ততদিন আমি আমার মুক্তি চাই না।’ ইহাই উদার মানব-প্রেম।

কেবলমাত্র মন্দিরেই ভগবানের অধিষ্ঠান নয়। বিশ্ব-জোড়া তাঁহার মন্দির। তিনি বিশ্বের স্বাধঃগরদের পাষণ-প্রাচীরের মধ্যে বন্দী না থাকিয়া বিশ্ব-মানবের মধ্যে নামিয়া আসিয়াছেন। সেইখানে অগণিত মানুষের অব্যবহৃত বিশ্ব-দেবালয়ে আজ ঘটিয়াছে তাঁহার অধিষ্ঠান। এই বিচিত্র ভুবনে ভগবান অসংখ্য জীবের মধ্যে নানাবেশে আমাদের সেবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। কবি-শ্রেষ্ঠের ভাষায়—

‘তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙ্গে

করছে চাষা চাষ—

মানুষের সেবাই  
ভগবানের শ্রেষ্ঠ সেবা

পাথর ভেঙ্গে কাটিছে যেথায় পথ,

খাটিছে বারো মাস।’

ভগবান আছেন ‘সবার পিছে, সবার নিচে, সবহারাদের মাঝে।’ বঞ্চিত, বৃত্তস্থ, পীড়িত, আর্ত, আশাহীন, ভাষাহীন সেই সব মানুষের সেবাই ভগবানের শ্রেষ্ঠ পূজা। বিদ্রোহী-কবি নজরুলের কণ্ঠেও এই বাণী—এই যুগবাণী ধ্বনিত হইয়াছে :

‘মানুষেরে ঘৃণা করি

ও কারা কোরান, বাইবেল, হায়, চুখিছে মরি মরি !

নেশ্বই বড়.

শেষ বড় নয়

ও মুখ হইতে কেতাব-গ্রন্থ নাও জোর করে কেড়ে।

যাহারা আনিল গ্রন্থ-কেতাব সেই মানুষেরে মেরে

পুজিছে গ্রন্থ ভণ্ডের দল।’

শাস্ত্র মানুষেরই সৃষ্টি। কিন্তু যাহারা শাস্ত্রকে মানুষের উপরে স্থান দিয়া মানুষকে নিষেধাত্মের ঘন্থে নিষ্পেষিত করে, তাহারা ধর্মিকের ছদ্মবেশে ভণ্ডের দল। তাহারা মানুষকে ঘৃণা করিয়া করে শাস্ত্রের পূজা। মানুষের স্পর্শকে তাহারা দূরে ঠেকাইয়া রাখিয়া অর্থহীন সামাজিক রীতি ও সংস্কারের করে আরাধনা। ইহাতে তাহারা প্রকারান্তরে ঈশ্বরের স্পর্শকেই দূরে সরাইয়া রাখে। অদৃষ্টের কী নির্মম পরিহাস !

প্রাচীন ভারতে অতিথি-সেবা ছিল গৃহস্থের পরম ধর্ম। প্রত্যেক পরিবারেই সেকালে একটি করিয়া থাকিত ‘অতিথিশালা’। তাহা ছাড়া, দরিদ্রদের সেবার নাম দেওয়া হইয়াছিল দরিদ্র-নারায়ণের সেবা। নরের মধ্যে যিনি আবির্ভূত হন, তিনিই তো নারায়ণ ! প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই তাঁহার আলোকিত আবির্ভাব। দীন-দুঃখীর বেশে তিনি সর্বদাই আমাদের হৃদয়ের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন,

প্রবেশের পথ খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। আমরা কি তাঁহাকে আমাদের

নারায়ণের সেবা

হৃদয়ে প্রবেশাধিকার দিব না ? পৃথিবীর মানুষের অজস্র দুঃখ।

প্রাকৃতিক কারণে সেই দুঃখ অসংখ্য। বড়-ঝুঁপা-বন্যা-অশ্রু-পাত

এবং রোগ-শোক-জরা-ব্যাপি পৃথিবীর মানুষকে বেষ্টন করিয়া নিত্য শ্মশান-নৃত্যে মাতিয়া রহিয়াছে। তাহাতে পীড়িতরাই তো আমাদের পীড়িত ঈশ্বর ! তাহাদের সেবার মধ্য দিয়া আমরা যে অনাবিল তৃপ্ত ও আলোকিত আনন্দের উদ্ভাস ঘটে, তাহাই তো ঈশ্বরের আবির্ভাব। আমাদের চারিদিকে কাঁদিতেছেন কত ক্ষুধার্ত ভগবান, কত পীড়িত ভগবান, আমরা তাহাদের উপেক্ষা করি। দীন-দরিদ্রকে নারায়ণ-জ্ঞানে সেবা করার আদর্শটি

বহুদূরে সমুদ্রে তোমার ছাড়া কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?

- ১২১

অতি মহৎ। ইহাতে আছে সেবার ঐকান্তিকতা ও নিষ্ঠা—আছে মানুষের মনের উদারতা ও প্রসারতা। ভগবান বৃদ্ধ ছিলেন প্রেমের অবতার। তাঁহার প্রবর্তিত ধর্মের মধ্য দিয়াই বৌদ্ধযুগে জনসেবার জন্ম গড়িয়া উঠিয়াছিল নানা প্রতিষ্ঠান। তারপর অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতে ইংরেজদের আগমনের পর খ্রীষ্টান মিশনারীদের উদ্যোগে জনসেবার আরোজন দেখা দেয়। তাহার প্রায় এক শতাব্দী পরে ভারতে গড়িয়া উঠে রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম ইত্যাদি নানা জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান। গান্ধাজীও জনসেবার আদর্শে আত্মনিয়োগ করেন হরিজন-সেবায়।

সমাজবদ্ধ মানুষের মধ্যে আর্ত ও পীড়িতের প্রতি কর্তব্য-বোধ স্বাভাবিক। সকল দেশেই দুঃস্থ, পীড়িত, বিকলাঙ্গ, বৃদ্ধ, অসমর্থদের সেবার জন্ম প্রতিষ্ঠান আছে। এই সব দুঃস্থ ব্যক্তি সমাজেরই অন্তর্গত। কাজেই, ইহাদের জন্ম সমাজের যে কর্তব্য রহিয়াছে, তাহা অনস্বীকার্য। ‘আন্তর্জাতিক রেডক্রস’ প্রতিষ্ঠান এইরূপ একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। এছাড়া, প্রত্যেক দেশেই দাতব্য চিকিৎসালয়, অনাধারম, ধর্মশালা, গরীবখানা ইত্যাদি আছে। মানুষ যে সেবার মহৎ আদর্শটি ভুলে নাই, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় কোন আকস্মিক বিপৎপাতের সময়। দ্বিভিক্ষ, মহামারী, বজ্রা, ভূমিকম্প ইত্যাদি সংঘটিত হইলে দেশের মধ্য হইতেই প্রধানতঃ সেবকদল বাহির হইয়া আর্তদের সেবার লাগিয়া যায়—বিদেশ হইতে বহু প্রতিষ্ঠান মাঝে মাঝে নানা সাহায্য। এইসব স্বতঃস্ফূর্ত সেবার দৃষ্টান্ত দেখিলে মনে আশার সঞ্চার হয়। মানুষ যে জনসেবার আদর্শ হইতে বিচ্যুত হয় নাই, তাহা দেখিয়া সত্যই মানুষের মহত্বের বিশ্বাস ফিরিয়া আসে।

জনসেবাই ঈশ্বর-সেবা। সেই সেবার পশ্চাতে কোন প্রত্যাশা কিংবা অভিসন্ধি থাকি উচিত নয়। প্রত্যাশাবিহীন এবং স্বার্থবিমুক্ত জনসেবার মাধ্যমে দেবসেবার দ্বারা এক অনাবিল স্বর্গীয় আনন্দের প্রসাদ অন্তরে লাভ করা যায়। তাহাই প্রকৃত জনসেবকের চরম এবং পরম প্রাপ্তি। জনসেবার আছে বহু দিক। প্রকৃত জনসেবক শুধু মনে কাজ করিয়া গেলে সেবার মধ্য দিয়া প্রচুর আনন্দ লাভ উপসংহার করিতে পারেন। অনেক তত্ত্ব সেবক আত্ম-স্বার্থ সিদ্ধ করিবার জন্ত পরোপকারের মুখোশ পরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহার সমাজের কলঙ্ক-স্বরূপ। তাহার ক্ষুধিতের অন্ন চুরি করে, দুঃস্থের জাপ-ব্যবস্থায় ভাগ বসায়, আত্মসাৎ করে দাতব্য চিকিৎসালয়ের ঔষধপত্রের বহলাংশ। তাহারের দ্বারা পাপাঙ্ক আর কে আছে ?

এই প্রবন্ধের অন্তরালে লেখা যায় :

● জনসেবা, বা. '৬২

● সেবার্থ

● অস্পৃহতা দিবারণ

● যোগিত্ব সেবা

● 'খীনে প্রেম করে যেই জন সেই জন দেখিছে ঈশ্বর', বা. '৬০

ক. বি. (১৫)—১

ঐশ্বর্য-মুগ্ধঃ মূঢ়না। পৌরুষ ও দৈব-নির্ভরতা।  
 আত্মবিবাস ও আত্মশক্তি। সংগ্রামের পৃথিবী।  
 মনুষ্যের বিজয়। মানুষের শক্তি : ভয়। আত্মশক্তির  
 পুরস্কার। উপসংহার।

## সংগ্রামই জীবন

উ. বা. '৩১, '৩৩

‘আমি ভয় করব না, ভয় করব না  
 ছবেলা মরার আগে মরব না, ভাই, মরব না।’

—রবীন্দ্রনাথ

এই সংগ্রামময় পৃথিবীতে বাঁচিতে গেলে আসে বহু বিপদ, আসে মৃত্যুর বিভীষিকাময় ভয়াল হাতছানি। আর, চিরকালের সংগ্রামী মানুষ দুর্নিবার বিপদ ও মৃত্যুর কুটিল বিভীষিকাকে উপেক্ষা করিয়া জীবনের বিজয়-সংগীত রচনা করিয়া চলিয়াছে। পৃথিবীর চারিদিকে কত সংঘাত, কত হিংসা এবং মৃত্যুর কত গোপন চক্রান্ত। পদে পদে হিংসার উদ্ভাস, দিকে দিকে পশু-শক্তির নির্লজ্জ আফালন। সেই সব বিপদ এক চরম ক্ষণে মৃত্যুর দূত-রূপে আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া, কিন্তু বিপদের আগমনে ভীত, সমস্ত হইয়া ভয়ের অন্ধকার কোটরে আত্মগোপন করিলে বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। সহসা বিপৎপাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া বিপদের সহিত পাক্সা লড়িয়া মানুষকে মৃত্যুর উপরে জয়ী হইতে হইবে। তাহাতেই মনুষ্যের গৌরব, তাহাতেই মনুষ্যের মহিমা। তাই মৃত্যুভয়ে ভীত, সমস্ত মানুষকে কবি মৃত্যুঞ্জয়ী মন্ডে দীক্ষা দিয়া বলেন—‘মৃত্যু যারা বুক পেতে লয় বাঁচতে তারাই জানে।’

মৃত্যুর ঘোর-কুটিল চক্রান্ত পদললিত করিয়া বাঁচার নামই প্রকৃত বাঁচা। বিপদের মুহূর্তে মানুষ অন্তরে অন্তরে বড় দুর্বল হইয়া পড়ে। ‘রক্ষা করো, রক্ষা করো’—বলিয়া ঈশ্বরের নিকটে করে কাতর প্রার্থনা। ভগবান তাহার পরম নিশ্চিন্ত হাত প্রসারিত করিয়া দিয়া মানুষকে বিপদমুক্ত করিতে পারেন। কিন্তু তাহাতে মানুষের আত্মশক্তি ও পৌরুষের ঘটে পরাজয়। মানুষের মধ্যেই রহিয়াছে পৌরুষের দুর্জয় শক্তি—সেই শক্তি দ্বারা সে আত্মরক্ষা করিতে পারে, সকল বিপদ-বাধা উত্তারণ হইয়া সে অসাধ্য সাধন করিতে পারে। কিন্তু দৈব-নির্ভরতা দুর্বলতারই পরিচায়ক। দৈব-নির্ভরতা মানুষের পৌরুষকে ধ্বংস করে, মানুষের অন্তর্নিহিত মনুষ্য-শক্তির করে অপমান। যুগে যুগে দৈব-নির্ভর মানুষ শক্তি-হীন হইয়া মনসস্ত শক্তির নিকট পরাজিত হইয়াছে। তাহার স্বাধীনতা বিপন্ন হইয়াছে, তাহার ব্যক্তিত্ব, ধর্মোচরণ, জীবন-বাক্য বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ইতিহাসে রহিয়াছে তাহার কলঙ্কময় সাক্ষ্য। আসল কথা হইল, মৃত্যু জীবনের বিজয়পত্র হাতে লইয়া মানুষের দুয়ারে করাঘাত করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহার হাত হইতে সেই বিজয়পত্র ছিনাইয়া লইতে হইবে। হুঃ তাহার ছায়া-অন্ধচর। সেই হুঃের আঙনে পরিত্যক্ত হইয়া বাঁচিতে হইবে। পৃথিবীকে বাঁচি সোনা করাই তাহার অভিপ্রায়।

তাই দেখা গিয়াছে, সে সব মানুষ আত্মবিবাসে বলীয়ান হইয়া বিপদ-বাধাকে কুহু জান করিয়াছেন, আপন পৌরুষের বলবোধে সকল মনগর্বা অহংকারকে পরাজিত করিয়া

মহুত্বের বিজয়-পতাকা উড়াইয়া দিয়াছেন, তাঁহারা মহুত্ব-সমাজে হইয়াছেন সম্মানিত। ইতিহাস কেবল তাঁহাদেরই নাম এবং তাঁহাদেরই গৌরবোজ্জ্বল কীর্তি-কাহিনী মনে করিয়া রাখে। উত্তরকালও তাঁহাদের জন্তে রচনা করে বিজয়-অৰ্ঘ্য, সাক্ষর বরণভালা। তাঁহারা চিরকালের স্মরণীয় ও বরণীয়। প্রাচীন ভারতের ঋষিকণ্ঠ হইতে তাই উচ্চারিত হইয়াছে : 'নামমাত্মা বলহীনেন শত্ৰুঃ।' আত্মাকে বলহীন বলজিত্ব লাভ করিতে পারে না। তাহার জন্ত চাই শক্তি, চাই পৌরুষ, চাই দুৰ্জয় সংগ্রামী শক্তি।

এই পৃথিবী সংগ্রাম-মুখর। এখানে বাঁচিতে হইলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সংগ্রাম করিতে হইবে। বিরুদ্ধ প্রাকৃতিক শক্তি ভয়াল কুটিল রূপ ধারণ করিয়া মানুষের অস্তিত্বকে বিলুপ্ত করিবার জন্ত অহরহ করিতেছে ষোর চক্রান্ত। সেই চক্রান্তের উল্লে উঠিয়া মানুষকে তাহার স্বীয় অস্তিত্ব বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। দুর্বীর মরণ-পন সংগ্রামের মধ্য দিয়া জয়ী হইয়া যদি সে স্বীয় অস্তিত্বকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারে, তাহাতেই তাহার চরম গৌরব। এই পৃথিবীতে শক্তিমানেরাই বাঁচিয়া থাকে। আপন অস্তিত্ব রক্ষার জন্ত মানুষের এই-যে সংগ্রাম, ইহার সূচনা হইয়াছে সৃষ্টির সেই আদিম প্রভাত হইতে।

চারিদিকে হিংস্র স্বাপন, চারিদিকেই ভয়াল মৃত্যুর করাল গ্রাস। সংগ্রামময় পৃথিবী পদে পদে তাহার অস্তিত্বকে গলা টিপিয়া হত্যা করিবার জন্ত মৃত্যুর গোপন চক্রান্ত। মানুষ সর্বশক্তি দিয়া তাহার সহিত সংগ্রাম করিয়াছে এবং অবশেষে জয়লাভ করিয়া স্বীয় অস্তিত্বকে বাঁচাইতে সক্ষম হইয়াছে। সেই যুদ্ধই হইল তাহার জীবন-যুদ্ধ—'Struggle for Existence.' তাহাতে বিস্তৃত হইতে হয়, কত বিপদ-বাধা, বড়-বড়, কত অজ্ঞান-অবিচার জয় করিয়া সৃষ্টির প্রথম দিনের সেই মানুষ আজও বাঁচিয়া আছে। কিন্তু কোন্ শক্তিবলে তাহার এই বিজয়-অভিযান? কোন্ শক্তির তেজে সে লগাটে পরিয়াছে বিজয়-লগাটিকা? তাহা আর কিছুই নয়; তাহা তাহার মৃত্যু-তারণ দুঃখ-হরণ দুৰ্জয় আত্মশক্তি।

তাহারা দুর্বল-দ্রব্য কিংবা হ্রাস-পৃষ্ঠ, হ্রাস-দেহ এবং সদা-শঙ্কিত ও পরম্ব্যাপেক্ষী, তাহারা সেই দুৰ্জয় আত্মশক্তির সন্ধান রাখে না; পৃথিবী তাহাদের প্রতি চিরকালই বিমুখ। ঈশ্বরের অহুত্ব প্রার্থনা করিয়া তাহারা দেবতার দেউলে মাথা কুটিয়া মরে, আগ্নেয় বিপদের মুখোমুখি দাঁড়াইয়া তাহারা প্রার্থনা করে অলক্ষিত দেবতার বরাভয়। তখন তাহারা ভুলিয়া যায় যে, তাহারাও মানুষ, তাহাদেরও গ্রাণ

আছে, বাহ্যে আছে অমিত শক্তি, অন্তরে রহিয়াছে অপরাজের মহুত্বের বিজয় পৌরুষ। ভুলিয়া যায় বলিয়াই তাহারা হয় বিপদের বলি। ছুই-বেলা তাহারা তাই মরিয়া বাঁচিয়া থাকে। কিন্তু সেইভাবে মরিয়া বাঁচিয়া থাকার সার্বকতা কোথায়? অন্তরের অপরাজের পৌরুষের দ্বারা বিপদ-বাধা জয় করিয়া মহুত্বের মহিমা প্রচার করিতে হইবে। যুগ যুগ ধরিয়া যে জীবন-ধারা নানা বাধা-বিপত্তি কাটাইয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে, মহুত্বের বিজয়-পৌরুষে তাহার সার্বকতা লাভ করিবে।



ভয় মানুষের অবধারিত শত্রু। সে তাহার আত্মশক্তির স্রুট ভিত্তিকে দুর্বল করিয়া দিয়া সাধন করে তাহার চরম সর্বনাশ। ভয়হীনতাই শক্তি। আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী হইয়া ভয়কে জয় করিতে হইবে এবং পৌরবে আত্মাশীল হইতে হইবে। ‘শক্তি মরে ভীতির কবলে।’ সেই শক্তিকে ভীতির কবলমুক্ত করিয়া, ভয়কে পদদলিত করিয়া, ঋতু মেরুণও লইয়া এই পৃথিবীতে যথার্থ মানুষের মত বাচিতে হইবে। নিশ্চেষ্ট ও পর-নির্ভর হইয়া বাচিয়া থাকার চেয়ে মৃত্যুও শ্রেয়। সেই মৃত্যুতেও আছে মানুষের শত্রু : ভয় গৌরব। অথচ দুর্বল ও ভগবৎ-নির্ভর হইয়া বাচিয়া থাকা চরম অবমাননাকর। বাহারা ভীত, ভয়ের গুহায় বাহারা সারা জীবন আত্মগোপন করিয়া থাকে, বাহারা মৃত্যুর পূর্বে বহুবার মরে, তাহারা মানবতার কলঙ্ক। মানুষ তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধাহীন, ইতিহাস তাহাদের সম্পর্কে কঠিনভাবে নীরব। দৃশ্য দিক্ত জীবনই তাহাদের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

আত্মশক্তির আছে মহত্ব, আছে গৌরবময় পুরস্কার। আত্মশক্তিতে শক্তিমান হইয়া বাহারা বিপদের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া জয়ী হয়, তাহারা সসন্মানে বাচিতে পারে, মহত্ত্বের গৌরবে তাহারা হয় গৌরবান্বিত। কিন্তু পর-নির্ভর, পরমুখাপেক্ষী আত্মশক্তির পুরস্কার হইয়া বাচিয়া থাকিতে গেলে আত্ম-ধিকারে তিলে তিলে দ্বন্দ্ব হইয়া মরিতে হয় মানুষকে। দৈবাহুগৃহীত জীবনও অহরূপভাবে বেদনাদায়ক ও মানিময়।

এই পৃথিবীতে বাস করিতে গেলে আছে বিপদ-মৃত্যু, আছে দুঃখ-যন্ত্রণা, আছে ব্যাধি ও বেদনা। কিন্তু ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া অন্ধকার গুহায় আত্মগোপন করার মতো অপমান আর নাই। বাহারা বিপদকে ভয় করে, বিপদ তাহাদেরই বেনী করিয়া গ্রাস করে, তাহারা বেনী করিয়া বিপন্ন হয়। ভয়ের নিকট হইতে পলায়ন করিয়া তাহারা নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধান করে। কিন্তু যে আশ্রয়কে তাহারা নিরাপদ মনে করে, তাহাই বিভীষিকার ভয়াল নৃতি ধরিয়া তাহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হয়। কাজেই, ভয়ের নিকট নতি-স্বীকার নয়, ভয়কে আপন শক্তি ও সাহসের দ্বারা জয় করিতে হইবে। ভীকৃত্য, কাপুরুষতা ও ক্লাবতা পরিহার করিয়া নির্ভীক পুরুষকারের শক্তিতে শক্তিমান হইয়া বিপদের সন্মুখীন হইতে হইবে। উঠো, জাগো, আত্মার ভাষার তেজে তেজস্বী হইয়া জাগিয়া উঠো। ‘উত্তীর্ণত আগ্রহ প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।’ কারণ দুঃখ ব্যতীত সুখ পাওয়া যায় না। তাই কবি বলেন—‘দুঃখের মরার আগে মরব না, ভাই, মরব না।’ আত্মক ব্যাধি, আত্মক বিপদ, আত্মক মৃত্যু। ভীত পলাতকের মতো ঘরের কোণকে আশ্রয় করিয়া কিছুতেই আমর্য্য মরিয়া বাচিয়া থাকিতে পারিব না। তাগ্যকে ডাক দিয়া বলিব : ‘পূজা দিয়া পদ করি না তিকা, বসিয়া করি না তব প্রতীক্ষা, কে পারে জিনিবে হবে পরীক্ষা—আনিব তোমারে বাঁচিয়া।’

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অন্তঃসরণে লেখা যায় :

● ‘দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মনীতে?’ উ. দা. ‘৬১

● ‘বিপদে মেরে রক্ষা করে। এ নহে মেরে প্রার্থনা/বিপদে আনি না বেন করি ভয়’

প্রবন্ধ-সূত্র : হুচনা । মানুষের মধ্যে সম্ভাবনা  
ও তাহার বিকাশ-প্রয়াস । মানুষের দুঃখে অস্ত  
মানুষ নিজেই দারী । পৃথিবী কর্মময়, কর্মেই মানুষের  
পরিচয় । উপসংহার ।

যে প্রইয়া থাকে  
তাহার ভাগ্যও শুইয়া থাকে

মা. '৫২ ; উ. মা. '৩১, '৩৭

মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য-নিয়ন্তা । মানুষের আকাঙ্ক্ষা যেমন অসীম, তাহার  
রূপদানের ক্ষমতাও তেমনি প্রচুর । প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আছে শক্তির ফুলিক ।  
কিন্তু সেই ফুলিক থাকে তন্মাত্র । চেষ্টা কিংবা পরিশ্রমের জোরে সেই তন্মাত্রাশি  
অপসারিত হইলে মানুষের অন্তর্লীন অগ্নিশিখা স্ব-মহিমায় ভাস্বর হইয়া উঠিবে । মানুষের  
অন্তর-শাস্ত্রী স্থপ্তিময় চেতনার উদ্বোধনে ব্যক্তি-জীবন আলোকিত হইয়া উঠে । চাই  
কেবল স্থপ্তি-ভঞ্নের আয়োজন, চাই কর্মনিষ্ঠা, চাই আত্মবিশ্বাস । মানুষ যখন জড়তাগ্রস্ত  
থাকে, যখন তাহার চেতনাশক্তি থাকে অল্প তামসিকতার আচ্ছন্ন,  
হুচনা

তখন সে ভীত, দুর্বল এবং পরম্ব্যাপেক্ষী । সেই অবস্থায় সে  
তাহার দুর্বল আত্মশক্তির সন্ধান পায় না । তাই সে তখন অসহায় শিশুর মতো সতরে  
আর্তনাদ করিয়া উঠে । বিচার-বিবেচনাহীন ভাগ্যের হাতে আত্মসমর্পণ করিয়া খোজে  
জীবনের ঠিকানা । তখন সে শক্তিহীন ; বিশ্বের সকল কর্মের অযোগ্য এবং সকলের  
রূপার পাঞ্জ । কিন্তু যখন মানুষ স্ব-বলে সেই জড়তা-মোচন করে, যখন ছিন্ন করে  
তাহার মোহাবরণ, তখন জাগ্রত চেতনার প্রথর সূর্যালোকে ঘটে তাহার আত্মোপলব্ধি ।  
সেই আত্মোপলব্ধি তাহার জীবনের সকল সম্ভাবনার দুয়ার খুলিয়া দেয় ।

মানুষের মধ্যে স্থপ্ত রহিয়াছে তাহার বিপুল সম্ভাবনা । সেই সম্ভাবনার সীমানা  
তাহার জানা নাই । গভীর আত্মানুসন্ধান ব্যতীত সেই সম্ভাবনার পরিচয় লাভও  
অসম্ভব । মানুষ যখন নিজেকে জানিতে পারে, যখন চিনিতে পারে  
তাহার গভীর সম্ভাবনার স্বরূপ, তখন সে শক্তির উল্লাসে উল্লসিত  
হইয়া উঠে, সে উৎসুক হইয়া উঠে নব নব কর্ম-প্রেরণায় । তখন  
তাহার চারিদিকে জড়তা ও নৈকর্ম্যের পাবাণ-প্রাচীর ধুলিসাৎ  
হইয়া যায় । এক বিশাল কর্ম-প্রভাত তাহার সম্মুখে কাটিয়া পড়ে । তরুণ গুরুড়ের  
মতো তাহার কর্ম-ক্ষুধা বিশ্বগ্রাস করিতে চায় । প্রাণোন্মাদনার সে তখন বলিয়া উঠে :  
'আমি উন্মাদ, আমি উন্মাদ !

আমি সহসা আমারে চিনিয়া কেলেছি,  
আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ ।'

মানুষ যখন আত্ম-পরিচয় লাভ করে, তখন তাহার সকল বাঁধনই খুলিয়া যায়, খুলিয়া  
যায় তাহার আত্ম-বিকাশের সিংহদ্বার । দ্বিরাশলাইর বান্ধে ক্ষুদ্র কাঠিভাল সামান্য  
বারুদ-লিপ্ত হইয়া স্থপ্তিময় থাকে । তাহার মধ্যে যে কী প্রচণ্ড বিকোরণ লুক্কায়িত  
রহিয়াছে, স্থপ্ত রহিয়াছে কী বিপুল দাবানল, তাহা সে জানে না । যখন বর্ণধেই সে  
এক প্রলয়ধর অগ্নিকাণ্ড বাধাইয়া দিতে পারে ।

মানুষের মধ্যে  
সম্ভাবনা ও তাহার  
বিকাশ-প্রয়াস

বলিয়া সকলেই তাহার কথা উড়াইয়া দেয়। কিন্তু আলোর আহ্বানে বাহার প্রাণে আগরপের বাণী পৌঁছিয়াছে, মুক্তির আনন্দে বাহার হৃদয় নাচিয়া উঠিয়াছে, বাহার প্রাণ জাগিয়া উঠিয়াছে, সে কখনও বিরুদ্ধ সমালোচনার কাত প্রাণের জাগরণ হয় না। সকলের উপহাস, বিজ্ঞপণ ও বড়বড়কে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া সে বাহির হইয়া পড়ে মহামুক্তির ঠিকানার অন্বেষণে। সমালোচনার সকল বড়-বড় পদদলিত করিয়া সে ছুটিয়া চলে সত্যের অমোঘ আহ্বানে।

এইভাবে এই দ্বন্দ্ব-কুটিল পৃথিবীতে বীভৎস ক্রীষ্ট, ভগবান যুধ ও খ্রীষ্টচৈতন্যের যুগ-নির্দিষ্ট জ্যোতির্ময় আবির্ভাব ঘটয়াছে। অজ্ঞানতার ঘোর-কুটিল অন্ধকারে আলোর প্রথম রশ্মি তাঁহাদের হৃদয়ে অনিবার্যভাবে প্রবেশ করিয়াছিল এবং তাহার ফলে আত্মস্বপ্ন, আত্মসর্বস্বতার বন্ধন তাঁহাদের বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না। যে প্রাণ জাগিয়াছে, যে প্রাণে আলোকের বাণী পৌঁছিয়াছে, সে প্রাণ সংসারের স্বার্থমগ্নতার মধ্যে বসিয়া থাকিতে পারে না। বুদ্ধ-বীভৎস-খ্রীষ্টচৈতন্য মহামানবতার উদার প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া মহাজীবনের উদাত্ত

মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছেন। প্রথমে তাঁহাদের অমৃতময় বাণী কেহ শোনে নাই। উপহাস ও বিজ্ঞপণের বিঘ-বাণে তাঁহাদের হৃদয় কত-বিকৃত হইয়াছে। খ্রীয়ামক্লষ্ণ পাগল বলিয়া উপহাসিত হইয়াছিলেন, খ্রীষ্টচৈতন্যের অমৃত নিত্যানন্দের কপালে জুটিয়াছে কলসীর কানা, ক্রুশে প্রাণ দিতে হইয়াছে ভগবান বীভৎসকে। অন্ধকারের অধিবাসীরা আলোকভীর্ণের বলাকাদের কণ্ঠ-সংগীত উপলব্ধি করিতে পারে নাই। কিন্তু তাহাতে বিলুপ্ত হয় না মহাজীবনের সত্য-স্বরূপ। কালক্রমে অন্ধকার অপসারিত হয়। মহাজীবনের সত্য-স্বরূপ প্রথম সূর্যালোকের মতো একদিন সারা পৃথিবীতে কাটিয়া পড়ে। বিশ্বের নূতনের তখন নতজন্ম হইয়া ক্ষমা-ভিক্ষা করিতে হয়।

কিন্তু বিশ্বপথের পথিক যে, সে 'মিথ্যা আপনার স্বপ্ন, মিথ্যা আপনার দুঃখ' বলিয়া প্রথম প্রভাতে বাহির হইয়া পড়ে। স্বার্থমগ্নতার সংকীর্ণ সীমাবেষ্টনী অবলীলায় অতিক্রম করিয়া, ক্ষুদ্র সংসারের সকল মায়া-মোহ-বন্ধন ছিন্ন করিয়া যাত্রার স্তম্ভ সে উদ্ভীষ্ট হইয়া পড়ে। যাত্রাবের দুঃখ-বেদনা দূর করিবার দৃষ্টির ত্রুটি গ্রহণ করিয়াছে সে। আপনার তুচ্ছ স্বপ্ন-দুঃখের কথা চিন্তা করিবার সময় তাহার কোথায়? কবি সেই ঘরছাড়াাদের উদ্দেশে আলীর্বাদ-বাণী পাঠাইলেন :

‘ঘরের মঙ্গল-শব্দ নহে তোর তরে

নহে রে সন্ধ্যার দীপালোক,

...

পথে পথে অপেক্ষিছে কালবৈশাখীর আলীর্বাদ

সেই তোর রক্তের প্রসাদ।’

সম্মুখে ক্ষুণ্ণ-নিশিত দুর্গম পথ। সেই পথে তাহাকে অগ্নসর হইয়া চলিতে হইবে। অন্ধকার রটিকা-বিস্কৃত রাজি। সেই ঘোর অমানিশার বৃকে চলিবে তাহার দুঃখময় রাজির তপস্তা। তাহার তপস্তার সিদ্ধিরূপে পূর্ব-দিগঞ্জে দেখা দিবে নূতন অরশোদয়। অন্ধকারের বন্ধুর যাত্রা-পথে চলিবার সময় সে খুঁজিবে পথের সাঙ্গী, উদাত্ত

কঠে ডাক দিবে অন্ধকারের কোটর হইতে বাহির হইয়া আসিবার জন্ত। কিন্তু কেহ সাজা দিবে না। তমসাময়ী কঠিকা-মুখর রাত্রিতে যার রুদ্ধ করিয়া সকলেই ঘুমাইবে। কিন্তু যে বড়ের পথিক, সে তাহাতে উদ্বেগভ্রষ্ট হইবে না। সে রুদ্ধকেই করিবে তাহার

পথের সাথী। তাহার চরণ-যুগল হইতে রুমির-স্রোত ছুটিবে, পদে-পদে বিপদ-বাধা আসিয়া তাহার অগ্রগমনের পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইবে। রক্তাক্ত পদতলে সেই বাধাবহল, কণ্টকাক্তীর্ণ পুথরেখা দলিত করিয়া আলোকের বাণী, মুক্তির বাণী আনিবার জন্ত ছুটিয়া চলিবে নিঃসঙ্গ, একাকী পথিক। অন্ধকারে পথ দেখা যাইবে না। তাহার অন্ধকারাবৃত পথ আলোকিত করিবার জন্ত

কেহ আলো ধরিবে না। নিরালোক অন্ধকারে সে আপনার অন্তরের নিঃসঙ্গতা অনিবার্য আলোতে নির্ভীক প্রাণে চলিতে থাকিবে। রক্ত-বস্ত্র-বস্ত্রপাতে সে অন্তরের সেই পবিত্র আলোক-শিখাকে নির্বাপিত হইতে দিবে না। স্বমহান আদর্শের সেই আলোক-শিখায় বন্ধের পঙ্কর জ্বালাইয়া ধরিয়া সে চলিতে থাকিবে উদয়-দিগন্তে। ‘যদি মৃত্যুর মাঝে নিম্নে যার পথ স্থপ আছে সেই মরণে!’

পৃথিবীতে যত মহান আদর্শের উদ্‌যাপন এইভাবেই সম্ভব হইয়াছে। এইভাবেই যুগে যুগে মানুষের দ্বারা আবির্ভূত হইয়াছে আলোকোজ্জ্বল নব-প্রভাত। আদর্শের উদ্‌যাপনে জীবন তুচ্ছ করিয়া ক্ষুরধার-নিশিত দুর্গম পথে উদ্‌যাপন পথিক ছুটিয়া গিয়াছে। দুঃখের রাত্রির বজ্রাঘি-শিখায় তাহার আদর্শের চরম অগ্নিপরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। সেখানে মৃত্যু তাহার সকল ভয়াবহতা হারাইয়া মোহন-সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। মৃত্যুর হাতে জীবন তুলিয়া দিয়া আদর্শের জয়গান গাহিয়া কত মহাপ্রাণ এইভাবে মানুষের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন।

জড়ভাষ্য, তত্ত্বজ্ঞান সমাজের বৃক নৃতন প্রাণ-চেতনা আনিবার জন্ত এইভাবে কত একক, নিঃসঙ্গ পথিক দুর্বীর বেগে ছুটিয়া গিয়াছে। আদর্শহীন, নৈতিক মনোবলহীন সমাজ যখন জড়তার অন্ধকারে ও নীতিভ্রষ্টতার পাশে ডুবিয়া থাকে, তখন মহান আদর্শ ও নীতির আলোক-বতিকা হাতে ধরিয়া সঙ্গীহীন পথিক ঘরের বাহির হইয়া পড়ে। কেহ তাহার হাত ধরে না, কেহ তাহার সঙ্গে চলে না। তাহাতে তাহার উপসংহার আক্ষেপ নাই। সে একাকী পথ চলে। সে সমগ্র সমাজে আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়া মানব-মুক্তির স্বপ্নকে সফল করিয়া তোলে। এইভাবে যুগে যুগে সেই ঘরছাড়ার দল সমাজে স্বেচ্ছাসিদ্ধির বাণীকে সফল করিয়া তুলিয়াছে। তাহাদের স্বপ্ন ও সাধনায় সমাজে আসিয়াছে নূতন যুগ, নূতন চেতনা। তাহাদেরই চলার বেগে গতিচকল হইয়া উঠিয়াছে সকল দেশের, সকল কালের গতিহীন, স্থবির সমাজ।

এই প্রবন্ধের অন্তঃসরণে লেখা যায় :

- আদর্শ ও তাহার রূপায়ণ
- ‘রইল যারা পিছু টানে কাঁধে তারা কাঁধে।’
- ‘যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে।’
- জীবনের মূল্য আয়ত্তে নহে, কল্যাণপূত কর্ণে।

এবং-কৃষক : হুনা। বেকারের পক্ষ  
অপচর। শিল্প-প্রসার ও বেকার-সমস্যা। পল্লী-অর্থ-  
নীতির দুর্বলতা : কৃষি ও কুটির-শিল্প। স্বাধীন  
ভারতে শিল্প বেকারত্ব। বেকার-সমস্যার সমাধান :  
শিল্পের সংস্কার ও ব্যবসায়-সৃষ্টি। পরিকল্পনাকালীন  
নিয়োগ-সমস্যা। পশ্চিমবঙ্গের বেকার-সমস্যার রূপ-  
চিত্র। প্রতিকার ও প্রতিরোধ। উপসংহার।

## ভারতের বেকার-সমস্যা

৪

### তাহার প্রতিকার

আজ বেকার-সমস্যার নিদারুণ অভিসম্পাত ছড়িয়ে পড়েছে সমগ্র ভারতে। স্বাধীনভালাভের পর ভারতের যুব-সমাজ যখন দেখেছিল এক নতুন সমাজের, যেখানে অর্থ-সংকট থাকবে না, থাকবে না সর্বনাশা বেকার-সমস্যা। কিন্তু হুনা সে যখন ভেঙে গেছে। ভারতের কর্মহীন বেকার যুব-সমাজ নিদারুণ অপচয়ে আজ দেউলে, সর্বনাশ। স্বল্পবয়সী যে কর্মশক্তি সৃষ্টির নব-নব প্রেরণায় মেতে উঠতো, আজ তা অপচয় ও অবক্ষয়ের শোচনীয় পরিণামে ক্লান্ত, অবসর ও দিশাহারা। অথচ প্রাণশক্তির অক্ষুরন্ত উৎস এই যুব-সমাজ কত ব্যর্থ সাধনাকেই না সাধক করে তুলতে পারতো। দ্বি-শতাব্দীর বিদেশী শাসনে ক্লান্ত, অবসর ভারতকে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আঘাতে সর্বনাশ ভারতকে, স্বাধীনতার অভিশাপে বিধ্বস্ত ভারতকে ইংরেজ 'লক্ষীছাড়া দীনতার আবর্জনা-স্তুপ'রূপে পরিত্যাগ করে চলে গেল। আর, ভারতবাসীর হাতে উপচোকন দিয়ে গেল শতাব্দী-লালিত বেকার-সমস্যা।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সস্তার প্রমিত সহজলভ্য করে রাখার জন্তে ইংরেজ এদেশে কৃত্রিম বেকার-সমস্যা সৃষ্টি করে তাকে জীয়ে রেখেছিল গত দু'শতাব্দী ধরে। তারপর মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রের ধ্বংসযুগের ওপর গড়ে উঠলো ধনতন্ত্রের ইমারত। সমাজ-ব্যবস্থার হাতিয়ার এলো ধনিক-শ্রেণীর হাতে। কল-কারখানা ইত্যাদি অর্থ নৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে ধনপতি-গোষ্ঠী মূনাফার অঙ্ক বাড়ানোর জন্তে যন্ত্রশক্তির ব্যবহারের দিকে মন দিল। যন্ত্র এসে মানুষের হাতের কাজ কেড়ে নিল, চরণ করে নিল তার জীবন-কাঠি। কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হলো একটা, শত-শত তাঁতীর তাঁত বন্ধ হয়ে গেল, বেকার তাঁতী হলো মৃত্যু-পথযাত্রী। তেলের কল কেড়ে নিল শত-শত কলুর হাতের কাজ, ধানের কল বেকার করে দিল অসংখ্য ধান-তাড়ানী গ্রামাঞ্চল মেয়েদের।

শহরগুলিতে বেকার-সমস্যা শিল্পগত, কিন্তু গ্রামাঞ্চলে তা বিশেষভাবে কৃষিগত। চাষাবাদ এদেশের ঋতুগত পেশা। তাই চাষাবাদের কাজ মিটে গেলে বছরের অর্ধেক সময় ওদের বেকার হয়ে বসে থাকতে হয়। ভারতের ঐতিহ্যবাহী কুটির-শিল্প বিধ্বস্ত হওয়ায় এবং শতাব্দী ও অল্পপুরুষ জীবিকাভয়ের ব্যবস্থা না থাকায় তাদের আলতো দীর্ঘ সময় কাটাতে হয়। আবার, চাষাবাদের যে কাজ অল্প-সংখ্যক কৃষকদের দ্বারা

## ভারতের বেকার-সমস্যা ও তাহার প্রতিকার

সম্পন্ন হয়ে যায়, তা অধিকসংখ্যক কৃষকের হাতে অন্ন সময়ে সম্পন্ন হয়। কলে, কর্মহীনতার কাল-পরিমাণ যায় বেড়ে। কাজেই, পল্লী-অঞ্চলের বেকারদের স্বল্প-কালীন কর্মসংস্থান। এই প্রচুর বেকারদের অভিশাপ শহর ও শিল্পাঞ্চলকে স্পর্শ করে। কর্মহীন

কৃষক এবং কৃষি-প্রমিত কর্মের সন্ধানে শিল্পাঞ্চলে এসে ভিড় করে।  
পল্লী-অর্থনীতির দুর্বলতা : কৃষি ও কুটির-শিল্প শিল্পাঞ্চলে আবার বেকার-সমস্যা তীব্ররূপ ধারণ করলে শিল্প-প্রমিতেরা দল বেঁধে প্রত্যাবর্তন করে কৃষিতে। গ্রামাঞ্চলের এই অর্থনিরোগ-সমস্যা ও প্রচুর বেকারদের মৌল কারণ হলো :

গ্রামাঞ্চলে ক্ষতহারে জনবৃদ্ধি এবং কৃষির অনগ্রসরতা। সেজন্তে পল্লী-অঞ্চলে জন-শাসন প্রবর্তন আত্ম প্রয়োজন। সেইসঙ্গে গ্রামীণ কুটির-শিল্পের পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে অল্পপুঙ্খ জীবিকার সংস্থান থাকা চাই। সেজন্তে কৃষি ও কুটির-শিল্পকে চেলে সাজাতে হবে।

ভারতের স্বাধীনতা-লাভের পর বহু বিদেশী শিল্পপতি এদেশ থেকে ব্যবসা গুটিয়ে নিয়ে চলে যায় এবং দেশ-বিভাগের কলে পাট-এলাকা পূর্ববঙ্গ হাতছাড়া হয়ে বাঙালি ভারতের চটকলগুলির ভাগ্যে চরম দুর্দিন ঘনিয়ে আসে। কলে, অসংখ্য চটকল-প্রমিত কর্মহীন হয়ে পড়ে। আবার, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় যোজনায় বিশেষ বিশেষ শিল্পের সুসংবদ্ধ সংস্থারের কলে এবং বিকল্প নিরোগ-ব্যবস্থার অভাবের দরুন বেকারত্ব অনিবার্যরূপে দেখা দেয়।

বর্তমান ভারতে শিক্ষিত বেকারের কর্মসংস্থান-সমস্যা আরো ভয়াবহ। বিজাতীয় শাসকগোষ্ঠী এদেশে বাণিজ্য আর শাসনব্যবস্থার ঢাকা সচল রাখবার জন্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি দিয়ে একদল দক্ষ কেরানী গড়ে তুলতে চেয়েছিল। এবং আমরাও চুম্বাক্ষিপ কোটি জনগণের ভেতর থেকে মাত্র হাজার কয়েক শিক্ষিত ব্যক্তি পেয়ে আশ্চর্যপ্রসাদ লাভ করেছি। পূর্বে শ'-পিছ শিক্ষিত ছিল দশজন; এখন হয়েছে ত্রিশ।

বেকার-সমস্যার সমাধান : শিক্ষার সংস্কার ও সুযোগ-সৃষ্টি হাজারে-হাজারে শিক্ষিত তো সৃষ্টি হচ্ছে; কিন্তু তাদের কর্মসংস্থান হবে কোথায়? কেবল শিক্ষার পুনর্বিভাগসেই সমস্যা মিটেবে না, সমস্যার প্রকৃত সমাধান নিহিত রয়েছে দেশের শিল্প-প্রগতি ও

পর্বাণ্ড-সংখ্যক সুযোগ-সৃষ্টির মধ্যে। দেশে যে-হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে, দেশের শিল্পায়নের গতি তার তুলনায় অতি মন্থর। দেশে যদি ক্ষুদ্রগতিতে শিল্পায়নের সংঘটিত হয়, তবে আরো অধিক-সংখ্যক কর্ম-স্থান সুযোগ সৃষ্টি হবে। কিন্তু সাম্প্রতিক ভারতের জনসংখ্যা প্রায় ৬৬ কোটি। সেই তুলনায় ভারতের শিল্প-সম্প্রসারণ হয়েছে কতটুকু?

সরকারী হিসেব-মতে, তৃতীয় যোজনাতে প্রায় ৩ কোটি ১৮ লক্ষ কর্মপ্রার্থী কর্মহীন ছিল। তার মধ্যে কর্মসংস্থান হয় মাত্র ৫১ লক্ষের। কাজেই, ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত ভারতের হাতে ছিল অতিরিক্ত ২ কোটি ৬৭ লক্ষ লোকের

পরিকল্পনাকালীন নিরোগ-সমস্যা এদিকে পরিকল্পনা সুগতি রাখার ও ব্যবসায়-মন্দা-জনিত ইন্টারইয়ের পরিণামে এবং তার উপর নবাগত কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধ হওয়ার এখন বেকারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫ কোটির মতো

তাছাড়া, অননিরোগ-সমস্যার সমাধান-চিন্তা তো আছেই।

পশ্চিমবঙ্গের বেকার-সমস্যা আরো তীব্র। যুদ্ধোত্তরকালীন হাটাই, দেশবিভাগ-জনিত উদ্বাস্ত-সমস্যা, চটকলগুলির ছরবহা, অমিলায়ী-উচ্ছেদ এবং খাদ্য ও দুরত্ব [telephone]-বিভাগে হাটাইয়ের কলে অসংখ্য কর্মচারী হলো। অল্পের ভাগিদে পথের কাকাল। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্ত কৃষক পশ্চিমবঙ্গে এসে কৃষি-জমির অভাবে হলো। বেকার।

পশ্চিমবঙ্গের বেকার-  
সমস্যার রূপচিত্র

তাছাড়া, পাট-সমৃদ্ধ পূর্ববঙ্গ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার পশ্চিমবঙ্গের ভাগিদে-ভীরের চটকলগুলি কাঁচা-পাটের অভাবে হলো কর্মহীন।

শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতী, সাক্ষর গৃহস্থ-বধূরা পর্যন্ত আজ পারিবারিক অঙ্গচ্ছলতার সমাধানকল্পে কর্ম-প্রার্থিনী। পশ্চিমবঙ্গের পল্লী-অঞ্চলের চিত্র আরো ভয়াবহ। কর্মভাবে ও খাদ্যভাবে সম্ভাবনাপূর্ণ বহু পরিবার বেছে নেয় মর্মান্তিক আত্মহননের পথ। পশ্চিমবঙ্গের স্ত্রী বেকার-সমস্যা ভারতের কোথাও এত ভয়াবহ নয়।

বেকার-সমস্যার অর্থ হলো, দেশের বিপুল সম্ভাবনার অপমৃত্যু। মানুষের যে শক্তি ও সামর্থ্য দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ-ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজের সম্পদ-বৃদ্ধিতে নিয়োজিত হতে পারতো, তার অব্যবহারেই বেকারের উদ্ভব। বেকার ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত ভীতিপ্রদ। বেকারের কর্মহীন ব্যক্তির উৎপাদন-নৈপুণ্যকে বিনষ্ট করে এনে দেয় জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে এক গভীর নৈরাশ্রবোধ। বর্তমান ভারতে প্রকৃতপক্ষে তাই হয়েছে। আজ ভারতের দিকে দিকে যে বিক্ষোভ মাথা চাড়া দিয়ে জেগে

উঠছে, তার মূল কারণ হলো এই নৈরাশ্রবোধ। বেকাররূপে আজ প্রতিকার ও প্রতিরোধ

আলস্তে কিংবা নানা সমাজ-বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে যারা সামাজিক সম্পদ বিনষ্ট করছে, উপযুক্ত কর্মের সুযোগ পেলে তাহাদের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসতে পারতো কতো লক্ষ কর্মী, যারা সম্পদ-স্থিতির মাধ্যমে সামাজিক সমৃদ্ধিকে সম্ভব করে তুলতো। মানব-সম্পদ হলো শ্রেষ্ঠ সামাজিক সম্পদ। তার সদ্যবহারে সামাজিক সমৃদ্ধির বান ভাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা তার সদ্যবহার করতে পারিনি। এটা আমাদের সামাজিক ব্যর্থতা। তাই ভারতে আজ বিক্ষুব্ধ, অশান্ত সম্ভাবনাময় লক্ষ-কোটি মানুষ আত্মঘাতী আক্রোশে সামাজিক সম্পদ-ধ্বংস করার উল্লাসে মেতে উঠেছে।

কহেই, বেকার-সমস্যার সমাধানের প্রয়াস ত্বরান্বিত না হলে জাতীয় জীবন গল্প ও স্থাপু হয়ে পড়বে। সমাজের সতেজ শক্তির এই দুঃসহ অপচয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে

উপসংহার

অনুপস্থিত। সমাজের সকল ব্যক্তির কর্মসংস্থান সেখানে রাষ্ট্রীয়

দায়িত্বের অঙ্গভূক্ত। ভারতে যদি বিশদকা কর্মসূচী সকল হয়, তবে

এই কর্মহীনতা ও দুঃখ-দুর্দশার দুঃসহ নিশার অবসানে এক বিশাল প্রাণ জ্বলন্ত করবে। প্রাণশক্তির সেই অতঃসূর্ত বিকাশে সমৃদ্ধিময় ভারত-রচনার স্বপ্ন সার্থক হবে।

এই প্রবন্ধের অন্ত্যসরণে লেখা যায় :

- পশ্চিমবঙ্গের বেকার-সমস্যার কারণ ও প্রতিকার
- পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত বেকার-সমস্যা
- সামাজিক বিশৃঙ্খলার মূল কারণ

ঐশ্বর্য-সুখ : হুচনা। অমাবস্তার রাত্রি :  
 ঝড়ের পূর্বপাত। সন্ধ্যার ঝড়। অধিক রাতে ঝড়।  
 ঝড়ের নৃতন অভিজ্ঞতা। সকলের দৃষ্ট। 'সরগীর'  
 কেন ?। উপসংহার।

## একটি স্মরণীয় ঘটনা

ক. প্রা. '৬২

সেই তন্মাবহ ঝড়ের রাত্রির কথা আমি জীবনেও ভুলিতে পারিব না। এমন ভয়ঙ্কর  
 ঝড় আমি আর কখনও দেখি নাই। জীবনে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার সহিত মাহুকের  
 পরিচয় ঘটে। সকল কথা সব সময় মনে থাকে না। কিন্তু এমন এক-একটি ঘটনা  
 মাহুকের জীবনে ঘটে, যাহার কথা মাহুকের শত চেষ্টা করিয়াও কোনদিন ভুলিতে পারে না।

হৃদয়-পটে সেই ঘটনার চিত্র যেন স্বয়ংক্রমে মুদ্রিত হইয়া যায়।  
 হুচনা।

আমার ক্ষুদ্র জীবনের অভিজ্ঞতাও অল্প। তথাপি সেই ঝড়ের  
 রাত্রির অভিজ্ঞতা আমার মনের মণি-কোঠায় চিরদিনের জন্য সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে।  
 যখন কোন নিঃসঙ্গ মুহূর্তে একাকী থাকি, তখন সেই ঝড়ের রাত্রি যেন তাহার  
 বিভীষিকাময়ী মূর্তি লইয়া আমার মানস-চক্ষুর সম্মুখে আবির্ভূত হয়। মনে মনে তাহার  
 ঘোর তমসাময় ভয়ঙ্কর রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া শিহরিয়া উঠি।

সেদিন ছিল অমাবস্তার রাত্রি। সকাল হইতে আকাশে মেঘ জমিতেছিল।  
 কালো-কালো পুঞ্জীভূত মেঘ স্তবকে-স্তবকে পরিগ্রহ করিতেছিল ঘনঘোর রূপ। সারাদিন  
 আকাশ ভোলপাড় করিয়া ঝড়ো হাওয়া বহিতেছিল এবং গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির বিরাম  
 ছিল না। এক অজ্ঞাত দুর্ঘোলের আশঙ্কায় পথ ছিল জনবিরল। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যাংশের  
 একটি অধ্যাত শহর। সেই দমকা বাতাস এবং অবিভ্রান্ত বৃষ্টির জন্য পথে লোক-চলাচল  
 প্রায় ছিল না। উন্মত্ত বাতাস ও বৃষ্টির প্রতিযোগিতায় সমস্ত শহর অলসিত হইয়া  
 গিয়াছিল। তাহার মধ্যে কেহ জানে না, কখন স্বর্ঘদেব অস্তহিত হইয়াছিলেন।  
 সারাদিন কেহ স্বর্ঘের মুখ দেখে নাই। ক্রমশঃ ঘোচ্ছন্ন সারাটা দিন রাত্রির মতো প্রতিভাত  
 হইতেছিল। সেদিন ভোরে বাড়ির সবাই কুম্ভনগরে মামার বাড়ি

অমাবস্তার রাত্রি :  
 ঝড়ের পূর্বপাত

চলিয়া গিয়াছে। আমারও যাইবার কথা ছিল। কিন্তু সামনে  
 পরীক্ষা; তাই আমার যাওয়া হইল না। স্থির হইয়াছিল যে,

সেই কয়টা দিন আমি আমার সহপাঠী বন্ধু রতনের বাড়িতে থাইব এবং ঘরে আসিয়া  
 পড়াশুনা করিব। পরীক্ষা হইয়া গেলে আমিও মামার বাড়ি চলিয়া যাইব। কথা  
 ছিল, পাছে আমি ভয় পাই, তাই রতনও আমার ঘরে ঘুমাইবে। ছুপুরে আমি  
 অতিকষ্টে রতনের বাড়ি গিয়া থাইয়া আসিয়াছিলাম। কিন্তু সেদিন ঝড় ও বৃষ্টি  
 বেগ বেতাবে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তাহাতে রাতে রতনের বাড়িতে থাইতে  
 যাইবার আশা পরিত্যাগ করিলাম। একটি রাত্রি না থাইয়া কাটাইতে পারি; কিন্তু  
 রাতে কি করিয়া একা ঘরে থাকিব? সত্যিই সেদিন রতন আসিল না। অন্ধকার  
 ঘরের বাহিরে যখন ঝড়ের প্রচণ্ড তাণ্ডব চলিয়াছে, তখন ঘরের ভিতরে একা বসিয়া  
 আমি প্রতি মুহূর্তে ঝড়ের সহিত লড়াই করিতে লাগিলাম।



হৃদয়ের পর শহরের বুকে যেন গভীর রাজির গাছ অন্ধকার গড়াইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের দুর্বার বেগ বাড়িতে লাগিল। শহরের স্ককের উপরের পাছগুলো শৌ শৌ শব্দ করিয়া সেই দুর্জয় বাতাসের সহিত যেন বুদ্ধ করিয়া টিকিয়া থাকিতে চেষ্টা করিতেছিল। তাহার পর শুরু হইল মূলধারে বৃষ্টি। ক্রমে হৃদয়গম্ভীর রাজি বাড়িতে

লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে বড় এবং বৃষ্টির বেগও ক্রমাগত বাড়িয়া চলিল। কিছু শোনা যায় না, কিছুই দেখা যায় না। বড়ের

প্রচণ্ড বেগে যেন পৃথিবী তুলিয়া উঠিতেছে। কেবল বড়ের গর্জন এবং তাহার মধ্যে বজ্রপাতের গগনবিধারী শব্দ। পৃথিবী যেন নৃচাঁতেভ অন্ধকারে ভরে আন্ধ্রগোপন করিয়া আছে। অন্ধকারের এমন তদ্বাল রূপ আমি কখনও দেখি নাই। মাঝে মাঝে অন্ধকারের বুক বিদীর্ণ করিয়া অগ্নিময় সর্পের মতো বিদ্যুৎ চম্কাইতেছে। সেই অন্ধকারের বর্ণনা করিবার মতো শক্তি আমার নাই।

বড়ের বেগ আরও বাড়িতে লাগিল। ভাবিলাম, পৃথিবীর বুঝি অন্তিম দশা উপস্থিত। আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সে এক ধ্বংসের অতলে তলাইয়া যাইবে। দরজা-জানলায় বটিকার ভীষণ উদ্ধত পদাঘাত অসহ্য করিতে লাগিলাম। এক সময়ে হঠাৎ একটি জানলার কপাট খুলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে বড়ের প্রচণ্ড তাণ্ডবে ঘরের ভিতরকার সমস্ত কিছু ভিজিয়া ও উড়িয়া গিয়া তছনছ হইয়া গেল। জানালা বন্ধ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। বড়ের দুর্বার বিক্রমের সহিত যেন

আমি মরণ-পণ করিয়া পাজা লড়িতেছি—এইরূপ শক্তিতে আমি

জানলাটা অতিকষ্টে বন্ধ করিলাম। জানলাটা বন্ধ করিলাম বটে, ওদিকে দরজাটা সশব্দে খুলিয়া গেল। এখন কৌনদিক সামলাই? এদিকে বড় হা-হা করিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া আমাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল। সমস্ত শক্তি দিয়া দরজাও বন্ধ করিয়া শক্ত করিয়া খিল তুলিয়া দিলাম। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, সমস্ত ঘর জলময় হইয়া গিয়াছে। বৃষ্টির জলে আমিও ভিজিয়া গিয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে বড় অট্টহাস্তে আকাশ কাটাইয়া গর্জন করিয়া উঠিল। জানলার সামান্য ঝাঁক দিয়া তাহার চকিত আলোর চাবুক ঘরের মধ্যে খেলিয়া যাইতেছে। তাহার পর আবার এক সীমাহীন অন্ধকার।

এখন নীত করিতে লাগিল। উন্মুক্ত জানলা ও দরজার মধ্য দিয়া বাহিরের বড়ের যে ভয়ানক রূপ দেখিয়াছিলাম, তাহাতে আমার অন্তরাঙ্গা শুকাইয়া গিয়াছিল। বাহিরে বড় সমানে চলিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে দরজার বাহিরে তদ্যর্ভ করাঘাত শুনিতে পাইলাম। প্রথমে খুলিব কি খুলিব না, ভাবিয়া পাইলাম না।

পরে বহু মানব-কঠোর আর্ন্ত চিংকারে ছুটিয়া গিয়া দরজা উন্মুক্ত করিয়া দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে বড়ের বেগে ঘরের ভিতর আসিয়া ঢুকিল কুড়ি-পঁচিশটি জল-সিক্ত অসহায় মানুষ। ইহারা আমাদের বাড়ির একটু দূরে কুঁড়েঘরগুলিতে বাস করে। তাহাদের ঘরগুলি বড় আর গোলপাতার ছাওয়া। সেই বড়-আর-গোল-পাতার-ছাওয়া ভুল চালাগুলি আর কতজন বড়ের সহিত লুপ্তিতে পারে? বড়

তাহার প্রচণ্ড তাগবে কখন তাহাদের উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে। তখন নিরুপায় হইয়া সেই নিরাশ্রয় মানুষগুলি আশ্রয়ের প্রত্যাশায় বড় আর অন্ধকারের বন্ধ ভেদ করিয়া আমার ঘরের দিকে ছুটিয়া আসিয়াছে।

তাহারা প্রায় ঠাসাঠাসি হইয়া বলিয়া আমার ক্ষুদ্র ঘরে সেই ভয়ঙ্কর রাজির অবসান কামনা করিতে লাগিল। কয়েকটি শিশু চিংকার করিয়া কাঁদিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে ঝড়ের ভয়ঙ্কর তাগবে ভীত হইয়া তাহারা কাঁদিতেও তুলিয়া গেল। জলময় আমার ঘর। তাহারাও জল-সিক্ত। শীতে অসহায়ভাবে সকলে কাঁপিতেছিল। অথচ আমার করিবার কিছুই ছিল না। উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায় সেই সকালের দৃশ্য ঘোর তমসাময়ী বটিকামুখর রাজির অবসান হইল। পূর্ব-দিকস্থ আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। বাহিরে আসিয়া পৃথিবীর যে চেহারা দেখিলাম, তাহাতে মনে হইল, যেন কাল রাত্রে ধ্বংসের দেবতা তাগবে মাতিয়া পৃথিবীর বুকের উপর একটি মহাশ্মশান সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। কত গাছপালা ভাঙ্গিয়াছে, কত কুঁড়ের নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। কত মানুষ মরিয়াছে, পশু যে কত মরিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই।

কেন জানি না, সেই বটিকাবিক্ষুব্ধ রাজির স্বৃতিকে আমার মন হইতে মুছিয়া কেলিতে পারি না। তবে মনে হয়, সেই রাজির যে ভয়াবহ মৃত্যুময় রূপ দেখিয়াছি, সেইজন্যই তাহাকে তুলিতে পারি না। সেই সঙ্গে অসহায় মানুষগুলির আমার ঘরে আশ্রয় গ্রহণ সেই ভয়াবহতাকে আরও বাড়াইয়া দিয়াছিল। সকালে রাজির ঝড়ের যে ধ্বংসাত্মক রূপ দেখিতে পাইলাম, তাহাতে আমার অন্তরাছাড়াও কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। পরের দিন সকালে রতন আসিয়া বলিল : ‘কাল রাতে আমি আসতে পারিনি বলে তুই একা ভয় পাস নি তো?’ মনে মনে রতনের উপর ভারী রাগ হইয়াছিল। কিন্তু রতন সেদিন আসে নাই বলিয়াই তো আমি সেই ভয়াবহ ঝড়ের এমন দুর্লভ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিয়াছিলাম।

বাস্তবিকই, ঝড়ের এমন দুর্লভ অভিজ্ঞতা আমার আর কখনও হয় নাই। ঝড়ের রাজির সেই নিদারুণ অভিজ্ঞতায় আমি বুঝিতে শিখিয়াছি যে, প্রকৃতির মধ্যে যেমন শান্তির প্রলেপ আছে, তেমনি আছে ধ্বংসের তাগব নৃত্য। শুভ উপলব্ধি

জ্যোৎস্না-পুলকিত ঘামিনী দেখিয়া কখনও ভাবিতে পারি না যে, তাহার অন্তরালে অন্ধ তমসাময়ী বটিকা-সংস্কৃতা রাজি লুকানো রহিয়াছে। ইহারা প্রকৃতিরই দুইটি রূপ। সেই ঝড়ের রাজির নিদারুণ অভিজ্ঞতা আমি জীবনে তুলিব না।

এই প্রবন্ধের অন্তঃসরণে লেখা যায় :

- তোমার জীবনের শরীর ঘটনা
- একটি ঝড়ের অভিজ্ঞতা
- একটি ঝড়ের বর্ণনা
- তোমার বাল্যস্মৃতি, ক. প্রা. '৩২

**প্রশ্ন-মুদ্রা :** নৃচনা। জীবনের লক্ষ্য স্থির  
করিবার প্রয়োজন কি? আমার লক্ষ্য কি?।  
এইরূপ লক্ষ্য স্থির করিবার কারণ। বেশের  
অবস্থার সহিত আমার লক্ষ্যের যোগ। সার্থকতা।  
সংকল্পের সাধনা। উপসংহার।

## লক্ষ্যহীন জীবন নোঙরহীন নোকার মতো

শৈশবে বা কৈশোরে মানুষ যে অগ্নি দেখে, তাহা কি কখনও সার্থক হয়? কাহারও  
হয়, কাহারও হয় না। সকলেই জীবনে সকলতা লাভ করিতে পারে না। তবু বড়  
হইবার জন্য সকল মানুষেরই অগ্নি ধাকা দরকার। শৈশব হইতেই জীবনের একটি লক্ষ্য  
ধাকা উচিত। মহাসমুদ্রে নাবিক ধ্রুব-নক্ষত্রে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া  
নৃচনা

অকুল বারিধিবক্ষে দিক-নির্ণয় করিতে পারে। কলে, সে দিক-  
ভ্রষ্ট হইয়া অজানা উপকূলে গিয়া পড়ে না। তেমনি শৈশবেই জীবনের লক্ষ্য স্থির  
করিয়া, সেই লক্ষ্যকে জীবনের ধ্রুব-ভারা করিয়া জীবন-সমুদ্রে পাড়ি দিলে দিকভ্রষ্ট  
হইয়া বিপথগামী হইবার কোন আশংকা থাকে না। তবেই জীবনে প্রতিষ্ঠা আসে।

সেই সংকল্পের অভাবে এই সীমাহীন পৃথিবীতে কাণ্ডারীহীন তরলীর মতো কত  
জীবন ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। জীবনের সার্থকতা লাভ করিতে হইলে একটি দৃঢ় সংকল্প  
চাই। সেই সংকল্পই হইবে জীবন-তরলীর সঙ্গ-জাগ্রত কাণ্ডারী, জীবন-পথের ক্রান্তিহীন  
অভিভাবক। কবি গাহিয়াছেন—

‘মনরে, কৃষি কাজ জান না।

এমন মানব-জমিন রুইল পতিত

আবাদ করলে ফলতো সোনা।’

মানব-জমিনে সোনা ফলাইতে হইবে এবং তাহার জন্য যথাসময়ে বীজ-বপন এবং  
আত্মবল্লিক পরিশ্রম ও সাধনার দরকার। তেমনি জীবনের অগ্নিকে সার্থক করিয়া তুলিতে  
হইলে প্রয়োজন সাধনা, প্রয়োজন ব্রতানুষ্ঠান। জীবনের ধ্রুব-লক্ষ্য  
জীবনের লক্ষ্য স্থির  
করিবার  
প্রয়োজন কি? উপনীত হইবার পথে বহু বাধা, বহু বিঘ্ন। কিন্তু তাহাতে  
পশ্চাৎপদ না হইয়া সমুদ্রের স্থির-লক্ষ্যভিমুখে অগ্রসর হইয়া  
চলিতে হইবে। তাই জীবনের চলার পথে চাই নির্দিষ্ট এবং  
স্পষ্টকল্পিত পথ-রেখা। সেই পথ-রেখাই সকলতার তোরণ দ্বারা আমাকে উপনীত  
করিয়া দিবে। সেইজন্যই জীবনের নৃচনাতেই লক্ষ্য স্থিরীকৃত হওয়া উচিত।

আমি একজন কৃষক কৃষক হইব। অনেকে হয়ত হাসিবে, হয়ত উপহাস করিবে।  
কিন্তু আমার জীবনের স্থির লক্ষ্যই হইল কৃষক-বৃত্তি। আমার লক্ষ্যকে অনেকে সামান্য  
এবং দীন মনে করিতে পারে। বাহারা এইরূপ মনে করে, আমি  
আমার লক্ষ্য কি? তাহাদের দোষ দিই না; কারণ দোষ তাহাদের নয়, দোষ  
তাহাদের দৃষ্টির সংকীর্ণতার। কৃষক বলিলে সকলে আমাদের দেশের পভাষগতিক  
ধারণার মাস্তুলের আমলের সেই কৃষক, বাহাদের শিক্ষা নাই, স্বাস্থ্য নাই, ছই বেলা

হুই মূর্তা পেট ভরিয়া খাইবারও সংস্থান নাই, তাহাদের কথা ভাবিয়া থাকে। আমি সেইরূপ কৃষক হইতে চাই না। আমি আধুনিক যুগের শিক্ষিত, সুস্বক, বিজ্ঞান-নির্ভর প্রগতিশীল কৃষক হইতে চাই।

প্রাচীন ভারতে কৃষিকে লক্ষ্য মনে করা হইত। তাই কৃষি সেদিন জনসাধারণের নিকট ভগবতীরূপে পূজিত হইত। কিন্তু বর্তমানকালে সেই দৃষ্টিভঙ্গি আর নাই। আমার বন্ধুদের মধ্যে কেহ হইতে চায় ডাক্তার, কেহ ইঞ্জিনিয়ার, কেহ ম্যাজিস্ট্রেট, কেহ বা মূল্যক। সকলে চাকরিকেই জীবনের একমাত্র সাক্ষ্যরূপে স্থির করিয়াছে। ভারতে এই চাকরি-প্রিয়তা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, তাহার কলে সমগ্র দেশে কৃষি-বিমুখতা দেখা দিয়াছে। আমাদের দেশ আর কৃষির উপাসনা করে না। তাই দারিদ্র্য

এইরূপ লক্ষ্য হ্রাস  
করিবার কারণ

হইয়াছে তাহার নিত্য-সঙ্গী। যে কৃষি আমাদের দেশের অর্থনীতির মূল উৎস এবং যে কৃষি নানা উপায়ে আমাদের দেশের লোকসংখ্যার অধিকাংশের জীবিকার আয়োজন করিয়া দেয়, তাহার পরিচালন-দায়িত্ব মুষ্টিমেষ নিরক্ষর, রূগণ, পরিবর্তন-বিমুখ, দরিদ্র কৃষকদের হাতে তুলিয়া দিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছি। ইহা অভ্যস্ত পরিতাপের বিষয়। কৃষিক্ষেত্রে অহল্যার মতো কিছু নৃতনের আবির্ভাব-প্রত্যাশায় পথ চাহিয়া বসিয়া আছে। আমাদের শিক্ষিত যুব-সমাজের কেহ কি সেই মাটির ডাকে সাড়া দিবে না? বাস্তবিক পক্ষে, আমার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পশ্চাতে আছে কবিশঙ্কর একটি গানের স্মৃতিশ্রবণ। তাহা হইল—

‘কিরে চল মাটির টানে।’

আমি কবিশঙ্কর বাণীর নির্দেশে মাটির কোলেই কিরিয়া বাইতে চাই।

ইংরেজরা ভারতের বাহা কিছু ছিল, সমস্ত শোষণ করিয়া দেশটাকে দীনতার আবের্জনা-তুপনরূপে ফেলিয়া গিয়াছে। আজ তাহার শিল্প বিধ্বস্ত, তাহার কৃষি অতি-ভারগ্রস্ত। দিনের পর দিন শোষণ-শাসকেরা তাহাকে কামখেজুর মত দোহন করিয়া লইয়া গিয়াছে। ক্ষমতার অতিরিক্ত উৎপাদন করিয়া ভারতের কৃষি আজ সর্বস্বান্ত। অধচ স্বাধীনতা-লাভের পর ভারত-গঠনের বিপুল আয়োজন করা হইয়াছে, বহু ব্যয়ও করা হইতেছে। কিন্তু ভারতের কৃষির অবস্থা ‘যথা পূর্বম্’। বাহা হইয়াছে, তাহা কাগজে-কলমে, হালে-লাঙ্গলে নয়।

কৃষিক্ষেত্রের দিকে চাহিয়া দেখি, আজও ভারতের সেই চির-পরিচিত হাসিম শেখ ও রামা কৈবর্তের দল তাহাদের চিত্রাচারিত পদ্ধতিতে চাষাবাদ করিয়া চলিয়াছে। ভোঁতা লাঙ্গল, রূগণ হালবলদ, নিকুটে বীজ লইয়া তাহারা সারহীন জমিতে বধাসক্ত বয়-পরিমাণ কসল কলাইয়া চলিয়াছে। সেচের জল তাহারা পায়-সার্থকতা

না। চোখের জলে আর বামে মাটি ভিজিয়া উঠে, তথাপি নদী-পরিকল্পনার জল আসিয়া তাহাদের জমিতে পৌঁছায় না। আমি আবার বুক বাধিয়া মাথা উচু করিয়া সেই হতাশাক্রিষ্ট কৃষকদের পাশে দাঁড়াইতে চাই। আমার কৃষি-সেবার মাধ্যমে বতটুকু সাধ্য বেশ-সেবা করিয়া বাইব। ইহাই আমার জীবনের স্বপ্ন।

ইপ্সের সিদ্ধির জন্ত চাই সাধনা। তাই আমি বিজ্ঞান পড়িতে মনস্থ করিয়াছি।  
 বিত্তহীন বিজ্ঞান নয়, কৃষি-বিজ্ঞানই আমার পাঠ্য। কৃষি-বিজ্ঞান লইয়া স্নাতক পরীক্ষায়  
 উত্তীর্ণ হইয়া আমি আমাদের কৃষিক্ষেত্রে নামিয়া পড়িব। আমাদের যেটুকু জমি বিক্ষিপ্ত  
 ও বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আছে, সন্নিহিত জমির মালিকদের সহিত বিনিময়ের মাধ্যমে  
 তাহাদের একজোট করিবার চেষ্টা করিব। আমার সেই চেষ্টা সফল হইলে উঁচু বাঁধ  
 দিয়া মধ্যবর্তী সকল আলবাঁধ অপসারিত করিয়া ফেলিব। তারপর আমাদের সামান্য  
 যে পুঁজি আছে, তাহা দিয়া একটু ট্রাক্টর কিনিবার ব্যবস্থা করিব। আমি নিজেই উহা  
 চালনা করিবার কৌশল শিখিয়া লইব। একটা অগভীর নলকূপ বসাইবার ব্যবস্থা করিতে  
 হইবে এবং সেই সঙ্গে একটু উঁচু করিয়া একটি মাপসই জলাধার নির্মাণ করিয়া লইতে  
 হইবে। নলকূপ হইতে উত্তোলিত জল উহাতে সঞ্চিত থাকিবে  
 সংকলের সাধনা।

এবং প্রয়োজনমতো ব্যয় করা হইবে। আমি উৎকৃষ্ট বীজ ও  
 সার ক্রয় করিয়া আনিব এবং কসলের রকমকরের ব্যবস্থাও করিব। অর্থাৎ, একই  
 কসল বারবার উৎপাদন না করিয়া মাটির গুণাগুণ বিবেচনা করিয়া নানা প্রকার কসলের  
 উৎপাদনের ব্যবস্থা করিব। ইহাতে জমির ক্ষয় দূরীকৃত হইবে এবং উর্বরতা-শক্তিও  
 বৃদ্ধি পাইবে। আসল কথা, আমি আমাদের এলাকার কৃষকদের সম্মুখে কৃষি-উৎপাদন-  
 পদ্ধতির একটা উজ্জল ও আশাপ্রদ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিব। তাহারা আমার পদ্ধতি  
 অনুসরণ করিলে তাহাদের সম্মুখে রাখিব সমবায়-কৃষি-ধামারের প্রস্তাব; আমি  
 তাহাদের সকলের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া বাঁচিতে চাই। ইহাতে তাহাদের কল্যাণ  
 হইবে, দেশেরও কল্যাণ হইবে।

আমার সাধনা তাই কৃষির সাধনা। কারণ কৃষি-সাধনাই দেশের সবুজি-সাধনার  
 মূল চাবিকাঠি। কৃষিই দেশের সকল উন্নয়নের কড়ম্বার খুলিয়া দিবে। কৃষি-লব্ধীর  
 আশীর্বাদে দেশের সকল মানুষের মুখে হাসি ফুটিবে, বৃকে জাগিয়া উঠিবে নব নব  
 আকাঙ্ক্ষা। আমার বিশ্বাস, যদি আমার চেষ্টায় কোন ক্রটি না  
 উপসংহার থাকে এবং য়নের একাগ্রতা অটুট থাকে, তবে আমি এ বিষয়ে  
 নিশ্চয়ই সফলতা লাভ করিব। কবি বলিয়া গিয়াছেন—‘মস্তকের সাধন কিংবা শরীর  
 পাতন।’ এই শপথ-বাক্য আমাকে সাক্ষ্যের সিংহাসনে পৌঁছাইয়া দিবে, আমার  
 প্রাণে নূতন উদ্ভব ও নূতন প্রেরণা জোগাইবে। আর দেশেরের কাছে প্রার্থনা করিব—  
 ‘তোমার পতাকা ধারে দাও

তারে বহিবারে দাও শক্তি।’

আমাকে শক্তি দাও, সামর্থ্য দাও; প্রাণে আর মনে দাও স্বপ্ন-সাধনার উৎসাহ।

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- জীবনের লক্ষ্য
- আমার জীবনের লক্ষ্য
- তোমার জীবনের লক্ষ্য
- তোমার জীবনের প্রধান আকাঙ্ক্ষা ও তাহা সফল করিবার উপায়, উ. দা. '৩৪

এবং-সুখ : হুনা। সভার সময় ও উদ্দেশ্য।  
 পুরস্কার-দানের উপকারিতা। অপকারিতা।  
 প্রভৃতি। সভাপতি ও প্রধান অতিথি। উৎসব-  
 বর্ণনা। প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের ভাষণ। সভাপতি  
 মহাশয়ের ভাষণ। সমাপ্তি। উপসংহার।

৫২.

## স্কুলের পুরস্কার-বিতরণী সভা

উ. মা. '৬৪ ; ক. প্রা. '৬১

আনন্দ ও আবেগ আর কোন বাধা মানিতেছিল না। দিনরাত কেবল চিন্তা।—  
 কেমন করিয়া সভাপতি মহাশয়ের হাত হইতে শ্রেষ্ঠ পুরস্কারগুলি ছিনাইয়া আনিব।—  
 কেমন করিয়া দর্শকবৃন্দের সপ্রশংস করতালি জয় করিব।—কেমন করিয়া নিজের কৃতিত্ব  
 প্রদর্শন করিয়া সকলের প্রীতি ও আশীর্বাদ কুড়াইব! ভাবিতে ভাবিতে রাত্রির নিভ্রা  
 তিরোহিত হইল, দিনের বেলায়ও স্বপ্তি নাই। আমাদের স্কুলের পুরস্কার-বিতরণী  
 সভাটিকে ঘিরিয়া এইভাবে আমাদের কত স্বপ্ন, কত কল্পনাই না মুকুলিত হইতেছিল।

মাসাধিক কাল হইতে প্রত্যহ পাঠান্তে শিক্ষক মহাশয়গণের  
 হুচনা পরিচালনায় বিজ্ঞালয়ের কক্ষে কক্ষে চলিতে লাগিল সংগীত, আবৃত্তি  
 ও নাটকের অল্পাংশ মহড়া। কয়টা দিন আমরা ঠিকমতো পড়াভ্যাস মন দিতে পারি  
 নাই। আহার-নিদ্রারও ছুটি। কিভাবে সভামঞ্চ সাজানো হইবে, কিভাবে স্টেজ  
 নির্মিত হইবে এবং আমাদের অংশ-গ্রহণ কিভাবে ও কতখানি সাকল্যমণ্ডিত হইবে—  
 ইত্যাদি চিন্তা আমাদের মনকে ঘিরিয়া রাখিয়াছিল। উৎসাহ-উদ্বীপনা-সহকারে  
 প্রস্তুতি তো হইল। এখন কবে আসিবে আমাদের স্কুলের পুরস্কার-বিতরণ দিবস ?  
 সে আর কত দেরী ?

প্রতি বৎসর পূজাবকাশের পূর্বে আমাদের স্কুলের বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণ  
 উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলের উপরই এই পারিতোষিক দেওয়া হয়।

শ্রেণীর প্রথম তিনজন একটি করিয়া পুরস্কার পায়। তাহা ছাড়া,  
 সভার সময় ও উদ্দেশ্য কয়েকটি বিষয়ে কৃতিত্বের জন্ত ও কয়েকটি পুরস্কার আছে। এ ছাড়া  
 নিয়মিত উপস্থিতির জন্ত পুরস্কার, উত্তম স্বাস্থ্যের জন্ত পুরস্কার, ভাল 'মনিটর'র জন্ত  
 পুরস্কার এবং ঐ দিনের অভিনয় ও আবৃত্তির উপর কয়েকটি পুরস্কার দেওয়া হয়।

কাজ করিবার একটি আনন্দ আছে। কিন্তু কাজে উৎসাহ দিলে, উপযুক্ত প্রেরণা  
 দিলে, কৃতিত্বের পুরস্কার দিলে কর্মোত্তম বিভূষিত হয়। তাহা ছাড়া, কোন পুরস্কার  
 ঘোষণা করা হইলে সকলের মধ্যে যে একটা হুহু প্রতিধ্বিত্যের  
 পুরস্কার-দানের পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়, তাহাতে সকলের অন্তর্নিহিত কর্মশক্তি উৎকর্ষ  
 উপকারিতা লাভ করে। সেদিকে দৃষ্টি রাখিয়া স্কুলে পারিতোষিক দেওয়ার  
 প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছে। পুরস্কার মাহুষের কর্মশক্তিকে উৎসাহ করে, কর্মে অগ্রপ্রাণিত  
 করে, অংশ-গ্রহণকারীকে প্রতিযোগিতাপূর্ণ জীবনের বোধ্য করে।

অনেকের মতে, পুরস্কার-দানের একটি কুফলও আছে। বাহ্যিক পুরস্কার-লাভে  
 বশিত হয়, তাহাদের মনে ইহাতে লাগে একটা পরাজয়ের মানি। তাহার ফল তাহার

জীবনে ভাল হয় না। আত্মধিকার এবং নৈরাশ্রবোধ তাহার জীবনকে অর্থহীন করিয়া তোলে। কিন্তু তাই বলিয়া শ্রেষ্ঠত্বের জন্ত মাহুৎ পুরুত্ব হইবে না, কৃতিত্বের স্বীকৃতি পাইবে না—ইহা অস্বচিত। আমাদের অভিজ্ঞতা হইল, পুরুত্ব অপকারিতা হইবার কল আমাদের মধ্যে ভালই হয়—আমরা নূতন উদ্ভবে কোমর বাধিয়া কাজে লাগি এবং পুরস্কার-প্রাপ্ত বালকদের আদর্শে পড়াশুনা করিবার অল্পপ্রেরণা লাভ করিয়া থাকি।

দেখিতে দেখিতে আমাদের স্কুলের পারিতোষিক-বিভরণ উৎসবের দিন আসিয়া পড়িল। দুই সপ্তাহ পূর্বে প্রধান শিক্ষক মহাশয় ঘোষণা করিলেন যে, বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরেজি তিন রকম আবৃত্তির জন্ত ছাত্রদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হইবে। দশম শ্রেণীতে একটি ইংরেজি কবিতা আবৃত্তি এবং নবম শ্রেণীর বালকদের জন্ত একটি নাটকাত্মক কথোপকথনের প্রতিযোগিতা হইবে। প্রতিদিন স্কুলের ছুটির পর পূর্ণোন্মমে মহড়া চলিতে লাগিল।

পারিতোষিক-বিভরণ উৎসবের দিনে একজন বিশিষ্ট দেশ-হিতৈষীকে সভাপতি করা হইল। প্রধান অতিথি হইলেন কলিকাতা হাইকোর্টের একজন প্রখ্যাত ব্যারিস্টার। পুরস্কার বিভরণ করিবেন ঐ ব্যারিস্টার মহোদয়ের পত্নী। সেদিন স্কুলের হলঘরে নিমন্ত্রিত বহু গণ্যমান্ত লোকের ভিড়। স্কুলের কার্যনির্বাহক সমিতির সভাপতি ও প্রধান অতিথি সম্পাদক, সভাপতি প্রমুখ আসিলেন। আমরা পরিচার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিয়া সেদিন স্কুলে গিয়াছিলাম। সামনে সারিবদ্ধভাবে স্কুলের ছাত্ররা এবং তাহাদের পাশাপাশি অন্যান্য স্কুলের নিমন্ত্রিত ছাত্ররা আসন গ্রহণ করিল। সামনে মঞ্চের উপরে বসিলেন সভাপতি, প্রধান অতিথি এবং তাহার পত্নী। যবনিকা উত্তোলিত হইল। সহসা দর্শকগণের কোলাহল শুরু হইয়া গেল।

প্রথমে মালা ও চন্দনের ফোঁটা দিয়া সভাপতি ও প্রধান অতিথিকে বরণ করিয়া লওয়া হইল। তারপর উদ্বোধনী সংগীত। উদ্বোধনী সংগীতের পর প্রধান শিক্ষক মহাশয় স্কুলের বিবরণী পাঠ করিলেন। তারপর আবৃত্তির পালা। হলঘরটি স্তব্ধ করিয়া সাতানো হইয়াছে—আমরা মঞ্চের উপর নির্দিষ্ট স্থানে একে একে গিয়া আবৃত্তি শুরু করিলাম। আবৃত্তি প্রতিযোগিতার জন্ত চারজন বিচারক আমাদের দিকে স্তেন্দ্রষ্ট মেলিয়া বসিয়াছিলেন। আমার পালা দুইবার আসিল—সংস্কৃত তোত্র

ও ইংরেজি কবিতা। উত্তর আবৃত্তির শেষে আমার ভাগ্যে প্রচুর উৎসব-বর্ণনা হাততালি জুটিয়াছিল। ক্রমে সব আবৃত্তি শেষ হইল। তারপর পুরস্কার গ্রহণের জন্ত আমরা প্রস্তুত হইলাম। একে একে শ্রেণীগুলির সাধারণ পুরস্কার দেওয়া হইতে লাগিল। আমি দ্বিতীয় পুরস্কার পাইয়া তেমন উল্লসিত হই নাই। কিন্তু যখন সংস্কৃত ও ইংরেজি আবৃত্তিতে প্রথম পুরস্কার পাইলাম, তখন মনের সব রানি কাটিয়া গেল। অন্ত ছেলেরাও অনেক পুরস্কার পাইল। সবশেষে প্রধান অতিথি মহোদয় সর্বশ্রেষ্ঠ আবৃত্তির জন্ত আমাকে যখন একটি সর্পদক দিবার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করিলেন এবং আমাকে কাছে ডাকিলেন, তখন আমার বালক-কল্প এক গভীর আনন্দে ও

বিশ্বাসে ছলিয়া উঠিতে লাগিল। আমি মকের একধারে গিয়া দাঁড়াইলাম এবং ভয়ে ভয়ে তাঁহার সহিত পরিচিত হইলাম।

তারপর প্রধান অতিথি মহোদয় আমাদের উদ্দেশ্যে একটি স্বন্দর বক্তৃতা দিলেন। তিনি আমাদের সকলের প্রাণে এক বিপুল আশা ও বিশ্বাসের বাণী শুনাইলেন। রূর-তালি দিয়া আমরা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলাম। প্রধান শিক্ষক মহাশয়ও একটি স্বন্দর নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। সবশেষে স্কুলের কাৰ্যনির্বাহক সমিতির সম্পাদক মহাশয় আমাদের স্কুল প্রতিষ্ঠার ইতিহাস এবং তাঁহার ছাত্র-জীবনের কয়েকটি মজার গল্প বলিলেন।

পরিশেষে, সভাপতি মহাশয়ের ভাষণ। তিনি সকলকে দেশ-সেবক ও সমাজ-সেবক হইতে উপদেশ দিলেন। তিনি তাঁহার উদ্দীপনাময় ভঙ্গীতে আমাদের তরুণ প্রাণে দেশভক্তির এক বিপুল প্লাবন বহাইয়া দিলেন। তাঁহার ধন্দর-পরিহিত সাধারণ বেশ এবং অনাড়ম্বর বাক্যমালা আমাদের কাছে অমিত্যুত করিয়া দিল। অবশেষে তিনি যখন স্বামী বিবেকানন্দের বাণী উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন, ‘তুলিও না, তুমি মায়ের জন্ত বলি-প্রদত্ত,’ তখন সভাই আমাদের দেহ ও মন রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। সবশেষে সমাপ্তি-সংগীত।

সভাস্ত্রে প্রধান শিক্ষক মহাশয় সভাপতিকে ধন্যবাদ দিলেন। সভা শেষ হইল। আমরা বিপুল কলরব করিতে করিতে যে বাহার পুরস্কার লইয়া বাড়ির পথ ধরিলাম। এই পুরস্কার-বিতরণ উৎসবটির কথা আমার স্মৃতিপটে চির-উজ্জ্বল হইয়া আছে। এই জাতীয় উৎসব আমাদের মনে বড় হইবার আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দিয়া সভাই আমাদের চরিত্র-গঠনে সাহায্য করে, আমাদের মনের মধ্যে আদর্শবাদের দীপ-বর্তিকা জ্বালাইয়া ধরে।

পুরস্কার-বিতরণী সভা সমাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ইহা আমাদের জীবনে ব্যর্থ হয় নাই। পুরস্কার-লাভের জন্ত ছাত্রদের মধ্যে চলিয়াছে কঠোর প্রস্তুতি, তীব্র প্রতিযোগিতা। কেবল লেখাপড়াতেই নয়, খেলাধুলায়, নিয়মিত উপস্থিতিতে, সদ্যবহারে—সর্ব বিষয়ে প্রস্তুতি চলিতে লাগিল। ইহাতে ছাত্রদের মধ্যে সঞ্চারিত হইল উপসংহার এক প্রাণোচ্ছল উৎসাহ-উদ্দীপনা, যাহা আমাদের গতাজুগতিক স্কুল-জীবনে ছিল অভূতপূর্ব। পুরস্কার-বিতরণী সভার মধ্য দিয়া আমাদের স্কুলে যেন নতুন প্রাণোচ্ছলতা, নতুন জীবনী-শক্তি ফিরিয়া আসিল। এবং তাহা যে আমাদের জীবনে ব্যর্থ হয় নাই, তাহা পরবর্তীকালে প্রমাণিত হইয়াছে।

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- তোমার জীবনের একটি আনন্দময় অভিজ্ঞতা বা স্মৃতি
- একটি সভার অনুষ্ঠান, ক. প্রা. '৩১
- তোমার স্কুলের যে কোনও একটি উৎসবের বিবরণ, উ. মা. '৩৪
- একটি গ্রন্থীর উৎসব
- একটি উৎসবের দিন
- উৎসবমুখর একটি দিনের স্মৃতি



এবং-সূত্র : হুচনা। বিকোরণ : ১৮ই মে,  
১৯৭৪। বিকোরণের বৈজ্ঞানিক কলাকল। সাকলোর  
সাধনা। আন্তর্জাতিক কলাকল। অর্থনৈতিক  
কলাকল। উপসংহার।

## ভারতের প্রথম পরমাণু-বোমা

এতদিনে ভারত সাকলোর সহিত তাহার প্রথম পরমাণু-বোমাটির বিকোরণ  
ঘটাইল। সে পরমাণু-বোমার ধ্বংসাত্মক ভূমিকার সহিত সম্যক পরিচিত। শাস্তির  
একনিষ্ঠ পূজারী ভারত তাই পরমাণু-বোমার নির্মাণ হইতে এতদিন বিরত ছিল এবং  
বিশ্বে পরমাণু-শক্তির রাষ্ট্রগুলিকে পরমাণু-বোমার নির্মাণ হইতে বিরত থাকিবার  
জন্ত বহু অত্যাচার-উপায় করিয়াছে। সে পরমাণু-বোমার ধ্বংসাত্মক লীলার

হাত হইতে বিশ্বকে, বিশ্বের মানব-জাতিকে রক্ষা করিবার জন্ত  
পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের নিকট নিরস্ত্রীকরণ-চুক্তির প্রস্তাব উপস্থাপন

করিয়াছে। কিন্তু পরমাণু-বোমার শক্তিতে গর্বাঙ্ক রাষ্ট্রগুলি তাহার প্রস্তাবকে দুর্বলের  
প্রলাপ বলিয়া হেলাভরে উপেক্ষা করিয়াছে। বিশ্বের মানব-জাতির কল্যাণ ও বিশ্ব-  
শাস্তির মুখের দিকে চাহিয়া ভারত এতকাল পরমাণু-বোমার নির্মাণ হইতে বিরত ছিল।  
কিন্তু এবার তাহার সেই বৈরাগ্যের অবসান হইল। সে পরমাণু-বোমার বিকোরণ  
ঘটাইয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাশিয়া, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও চীন—বিশ্বের পরমাণু-  
শক্তির এই রাষ্ট্রগুলির পাশে নিজের আসনটি আদায় করিয়া লইল।

১৮ই মে, ১৯৭৪। সময় : সকাল ৮টা ৫মি। রাজস্থানের মরুভূমির ভূগর্ভে  
ভারতের প্রথম পরমাণু-বোমার বিকোরণের স্বাক্ষর সাকলোর সহিত মুদ্রিত হইল।  
এই বিকোরণের জন্ত মরুভূমির বৃক ১০০ মিটার গভীর একটি গর্ত খনন করিয়া রাখা  
হইয়াছিল। গর্তটির আকৃতি ছিল ইংরেজি 'এল' হরকের মতো। গর্তটির বাকের মুখে  
বোমাটি রাখা হইয়াছিল। ঘটনাক্ষলের চার কিলোমিটার দূরে নির্মিত হর একটি

উচ্চ পর্যবেক্ষণ-মঞ্চ। পর্যবেক্ষণরত বিজ্ঞানীদের মধ্যে যোগাযোগ  
বিকোরণ : ১৮ই মে,  
১৯৭৪

রক্ষার জন্ত টেলিকোনের ব্যবস্থা রাখা হয়। অত্যন্ত শক্তিশালী  
টেলিভিশন-ক্যামেরা ছাড়া ডুক্সন-মাপক যন্ত্র, তাপমাত্রা-মাপক যন্ত্র  
ইত্যাদি পরিকল্পনা অনুসারে বসানো হইয়াছিল। নির্দিষ্ট সময়সূচী ছিল ৮টা ১৫ মি।  
কিন্তু আবহাওয়া-বিজ্ঞানীর নিকট হইতে আবহাওয়ার সবুজ-সংকেত পাইয়া চরম  
মুহূর্তটিকে দশ মিনিট আগাইয়া আনা হইল। ইংরেজি ১৮ই মে, ১৯৭৪ সাল ; ভারতীয়  
সময় সকাল ৮টা ৫ মিনিটে ভারত নতন যুগে পদার্পণ করিল। নতন অস্ত্র, নতন শক্তি  
ও নতন সম্মানের অধিকারী হইল সে। সেই নতন যুগের নাম পারমাণবিক যুগ। সঙ্গে  
সঙ্গে বিশ্বের পরমাণু-শক্তির একচেটিয়া দস্তের প্রাচীর তাকিয়া পড়িল।

ভূমিকম্পের প্রচণ্ড আবেগে চার কিলোমিটার দূরের পর্যবেক্ষণ-মঞ্চটি হুলিয়া উঠিল।  
ঘটনাক্ষলের ভূগর্ভ হইতে উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইল রাশি রাশি ধূলি, মাটি এবং পাথরের

খণ্ড। সেখানে একটি বিরাট গর্ত হুই হইয়া ভূগর্ভের কিয়দংশ একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের আকারে উপরে ঠেলিয়া উঠিয়া আসিল। ভূকম্পন-মাপক যন্ত্রে ভূকম্পনের রাজ্য ধরা পড়িল ৪.৮। সঙ্গে সঙ্গে হানটির তেজস্ক্রিয়তা প্রায় দশ কোটি বিকিরণের বৈজ্ঞানিক কলাকল সেক্টিমিটারে উঠিয়া যায়। তাহার কলে ভূগর্ভের সমস্ত বস্তু গলিয়া গিয়া ও পরে শীতল হইয়া একটি কঠিন আবরণের সৃষ্টি করে। এই প্রচণ্ড তেজস্ক্রিয়তার কলে রাজস্থানের মরুভূমির এই স্থানের বালিকণাগুলি ক্ষটিকে পরিণত হইয়াছে।

এই সাকল্যের কারিগর হইলেন ভারতীয় পরমাণু-বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদেরা। ইহার উপাদান-উপকরণের সমস্তই ভারতীয়, নির্মাণ-কৌশলও সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়। এই সাকল্যের পশ্চাতে রহিয়াছে দীর্ঘ পচিশ বছরের প্রস্তুতি। সীমিত সামর্থ্য ও সংক্ষিপ্ত কার্যকালী লইয়া ১৯৫৬ সালে ট্রেন্ডেতে চালু হইয়াছিল প্রথম পারমাণবিক চুল্লী—অম্বর। তারপর চালু হইয়াছে সাইরাস, জারলিনা এবং পূর্ণিমা পারমাণবিক চুল্লী। অম্বরার ক্ষেত্রে বিদেশী সাহায্য ছিল। কিন্তু অন্তান্তগুলির ক্ষেত্রে বিদেশী সাহায্যের পরিমাণ নামমাত্র। এই পারমাণবিক চুল্লীগুলিতে এতদিন চিকিৎসা ও কৃষি-বিজ্ঞানের ক্ষয় নানা আইসোটোপ তৈয়ারী হইয়াছে। কিন্তু ১৯৭৪ সালের ১৮ই মে রাজস্থানের মরুপ্রান্তরে বাহা ঘটিয়াছে, তাহা ভারতীয় বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের স্বদীর্ঘ এক সাধনার বিশ্বকর সাকল্য।

ভারতের প্রথম পরমাণু-বোমার বিস্ফোরণ রাজস্থানের মরুভূমিতে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইয়াছে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে। সোভিয়েট রাশিয়া ও ফ্রান্স ভারতের এই ঘটনাকে মোটামুটি সমর্থন করিলেও ব্রিটেন সমালোচনা করিয়াছে। কানাডা চুক্তিভঙ্গের অভিযোগ আনিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কঠোর সমালোচনা করিয়াছে। চীন অবশ্য কোন রকম আমলই দেয় নাই। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বেশী হৈ-চৈ করিয়াছে পাকিস্তান। তাহার আশঙ্কা, ভারতের পরমাণু-বোমার লক্ষ্যস্থল হইল পাকিস্তানের হৃৎপিণ্ড। কিন্তু ভারতের পক্ষ হইতে জানানো হইয়াছে যে, সেই আশঙ্কা অমূলক। চীনের পরমাণু-বোমা বিস্ফোরণে

যে পাকিস্তান আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিয়াছিল, ভারতের আন্তর্জাতিক কলাকল সাকল্যে তাহার এই আত্মনাশ অবশ্যই অভিসম্বুলক। অন্তান্ত সমালোচকদের কেউ কেউ বলেন, ভারত পরমাণু-বোমা আবিষ্কার করিলেও লক্ষ্য-ভূমিতে তাহা বহন করিবার সামর্থ্য তাহার নাই। কেউ কেউ বলেন, ভারতের বর্তমান অর্থনৈতিক দৈন্তদশার মধ্যে পরমাণু-বোমা নির্মাণ এক ধরনের বিলাসিতা। কেউ কেউ আবার বলেন, ভারতের এই সাকল্য নিতান্তই ভুল। যদি তাহাই হত, তাহা হইলে ভারতের এই ভুল সাকল্যকে সমালোচকেরা উপেক্ষা করিলেই তো পারেন। কিন্তু আসল কথা হইল, বাহাদের ধরে পরমাণু-বোমা আছে, তাহাদের একচেটিয়া পারমাণবিক মাতব্বিতে আজ ভারতের পরমাণু-বোমার তেজস্ক্রিয়তার আঁচ লাগিয়াছে। তাই আজ তাহারা বেসামাল হইয়া উঠিয়াছেন।

সত্যকথা, ভারতে পণ্যমূল্য অর্থনীতির কোন বিষয় না মানিয়া জ্ঞত বাড়িয়া বাইতেছিল। তাহাতে অনেকের মনে এই ধারণা হইয়াছিল যে, ব্যয়বহুল পরমাণু-বোমার বিস্ফোরণই বুঝি বা ইহার জন্ত দায়ী। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ঘোষণা করেন যে, ইহাতে ৩২ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। অর্থনৈতিক দলানকল ইহার জন্ত কোন বিশেষ ব্যয়বরাদ্দও করা হয় নাই। কাজেই, পরমাণু-বোমার বিস্ফোরণ পণ্যমূল্য-বৃদ্ধির জন্ত দায়ী—এ অভিযোগ মিথ্যা। পরমাণু-বোমার বিস্ফোরণ ছাঁড়াই পণ্যমূল্যের বিস্ফোরণ যে অনিবার্যরূপে দেখা যাইত, তাহাতেও সন্দেহ নাই।

সে বাহাই হউক, এই বৈজ্ঞানিক যুগে বিজ্ঞানকে প্রত্যাখ্যান করিয়া অধিক দূর অগ্রসর হওয়া যায় না। বিশেষতঃ, পৃথিবীর অত্যন্ত শক্তিমান জাতিগুলি যখন পরমাণু-বোমা করতলগত করিয়া দুর্বলতর জাতিগুলিকে পদানত করিবার চক্রান্তে লিপ্ত, তখন ভারতের পক্ষে মাদ্ভাতার আমলের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থায় সঙ্কট থাকিয়া বসিয়া থাকা এক ধরনের মূঢ়তা। আধুনিক সমরাস্ত্রের অভাবে পূর্বে ভারতকে বহু খেসারত দিতে হইয়াছে। ভারত আর সে ভুল করিবে না। বিধ্বংসী পারমাণবিক অস্ত্র যদি ত্যাগ করিতেই হয়, তবে সকল রাষ্ট্রকেই তাহা একসঙ্গে করিতে হইবে। কিন্তু ভারতের নিরস্ত্রীকরণ-প্রস্তাব সকলেই উপেক্ষা করিয়াছে। ভারতকে তাই আজ অস্ত্র পথ ধরিতে হইয়াছে। তবুও ধ্বংসাত্মক কর্মে ব্যবহার না করিয়া পরমাণু-বোমাকে শান্তিপূর্ণ

সংগঠনমূলক কার্বে ব্যবহার করিয়া সে আজ বিশ্বের সম্মুখে নূতন উপসংহার দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতে চলিয়াছে। ইহার দ্বারা ধনির বিস্ফোরণ, কৃত্রিম জ্বালাধার বা পোতাশ্রয় নির্মাণ অথবা বড় বড় নদীর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা যাইতে পারে। তাহা ছাড়া, ইহার দ্বারা ভারত যে আত্মবিশ্বাস ও আত্মজাতিক মর্যাদা লাভ করিয়াছে, তাহার মূল্য অপরিমিত। আজ বিশ্বের অহুন্নত জাতিগুলি এই বিশ্বাস অর্জন করিয়াছে যে, চরম দুদিনে আজ তাহাদের পাশে কেহ না থাকুক, পরমাণু-শক্তিতে শক্তির ভারত নিশ্চয়ই আছে।

এই প্রবন্ধের অন্তঃসরণে লেখা যায় :

- ভারতের সাম্প্রতিক একটি বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য
- ভারতের পরমাণু-বোমা নির্মাণ করা উচিত হইয়াছে কিনা ?
- পরমাণু-বোমা নির্মাণ করিয়া ভারতের কি লাভ হইয়াছে ?

## বর্ষার বাংলাদেশ

ক. প্রা. '৩২

**সূচনা** ॥ ঈশ্বরের জালাময় হোম-হত্যাশনের পর 'অতি ভৈরব হরষে' সজল সঘন নব-বর্ষার আবির্ভাব। সে বাংলাদেশের আকাশে ও মাটিতে আনে রং ও রসের অক্ষুরন্ত উপহার। বর্ষার আবির্ভাব ॥ বাংলাদেশে বর্ষার আগমন রাজসিক। শুকু তাপের দৈত্যপুত্রের ঘার ভাজিবে বলিয়া সে রূপকথার রাজপুত্রের মতো ছুটিয়া আসে। তাহার রথের বর্ষরথনি শোনা যায়, তাহার বাঁকা তলোয়ার বলসিয়া উঠে। রূপবিস্তার ॥ মাঠঘাট, পথ-প্রান্তর, নদীনালা, খালবিল জলপূর্ণ হইয়া উঠে। পৃথিবীর ধরতপ্ত দিনের হয় অবসান। মাটির কঠিন বাধা ছিন্ন করিয়া শস্তশিল্পের দল আবির্ভূত হয়। তাহাদের হাতে নব-অক্ষুরের জয়গতাকা। আসে পুষ্প-বিকাশের লগ্ন। কদম্ব-কেতকী-বৃথিকা-গন্ধরাজ-হাসনাহানার গন্ধবাহারে বর্ষা-প্রকৃতির অনির্বচনীয় প্রকাশ। গ্রাম-বাংলার রূপশ্রী ॥ দূরে গ্রামায়মান গ্রাম-রেখা, আঙ্গিস্ত জলবিস্তারে শস্তশিল্পের নৃত্য, আকাশে কৃষ্ণধূসর মেঘ-বিস্তার, দিগন্ত-বিলাসী বক-পঙ্ক্তির নিরুদ্দেশ-বাজা। শস্ত-বিচিত্রা পৃথিবীর জালাময় প্রান্তরে কৃষকদের সংগীতমুখরতা। বাঙ্গালীর অর্থনৈতিক জীবনে বর্ষা ॥ বাংলার কৃষক এই ঋতুতে বীজ বোনে, চারাগাছ তোলে এবং রোপণ করে। হেমন্তের ধামারে যে রাশি রাশি গোনীর ধান উঠিবে, এখন চলে তাহার প্রস্তুতি। বর্ষাই বাংলাকে করিয়াছে শস্তশ্রামল। বাংলার অন্নবস্ত্র—তাহার সমস্ত ঐশ্বর্য বর্ষার দাক্ষিণ্যের উপর নিভরশীল। সাংস্কৃতিক জীবনে ॥ বর্ষা বাঙ্গালীর মনোভূমিকে করিয়াছে সরস ও কাব্যময়। অর্থনৈতিক জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিয়া সে তাহার সাংস্কৃতিক জীবনকে মুক্ত করিয়া দিয়াছে। মেঘকঙ্কল বর্ষার সজল পটভূমিকায় রথযাত্রা, জম্মাটমী, ঝুলন, রাশীবন্ধন, বর্ষামঙ্গল, বৃক্ষরোপণ, শেষবর্ষণ অনবচ্ছ সৌন্দর্যমণ্ডিত হইয়া উঠে। তাহার কাব্যে ॥ কবি জয়দেব হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাঙ্গালী কবির কণ্ঠ বর্ষার সংগীতে মুখর। আবাত্ত প্রথম দিবসে মেঘোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার কবিচিন্তে লাগে জলসিক্ত পুবািল হাওয়া। বর্ষা বাংলার কাব্য-সাহিত্যকে করিয়াছে সমৃদ্ধ, তাহার সংগীতকে করিয়াছে অপূর্ণ লাভময়। উপসংহার ॥ বর্ষার মায়ামন্ত্রবলে পাবণ গলিয়া কসল কলে। মরুবিজয়ের কেতন উড়াইয়া, মেঘের গুরুগুরু মাদল বাজাইয়া সে আসে। তাহার দক্ষিণ কর হইতে বরিয়া পড়ে বরাডয়, বাম কর হইতে নাহিয়া আসে মরণ-ঢালা ভয়ঙ্করী বস্ত্রা। তবু বর্ষা বাংলার প্রিয় ঋতু, বাঙ্গালীর প্রাণের ঋতু।

**সূচনা** ॥ 'এল যে শীতের বেলা বরষ পরে। এবার কসল কাটো, লওগো ঘরে।  
করো ঘরা, করো ঘরা, কাজ আছে মাঠ-ভরা—' শীত কর্মী ঋতু। কিন্তু সে সর্বদেশে  
কাবো উপেক্ষিত, জীবনে উপেক্ষিত, ঋতুর সমাজেও উপেক্ষিত। তাহার সর্বাঙ্গে  
বার্ষিকের স্ববিরতা, নিকর বৈরাগ্য। মুখে শুক কাঠিন্ত, চোখে ধুমল কুস্মটিকা, শীতল  
নীরক্ত দুই হাতে সুদূর রিক্ততা। সেই রিক্ততা রূপণের রিক্ততা নয়, সমস্ত বিলাইয়া  
দিবার রিক্ততা—ঐশ্বের্যের রিক্ততা। শীতের বিরল-বর্ণ সৌন্দর্য ॥ শীতের প্রাণোচ্ছল  
রূপমাধুরী নাই। ধানময় ধূজটির মতো তাহার অসীম বৈরাগ্য। মহাধানী মহাতাপস  
যেন তাহার সকল আবেগ ও উচ্ছ্বাস সংহরণ করিয়া তপস্তায় বসিয়াছেন। কোথাও  
তারুণ্যের চঞ্চলতা নাই, কৈশোরের বিকোমল নাই, যৌবনের প্রগলভতা নাই; আছে  
বার্ষিকের পরিপূর্ণতার বিরল-বর্ণ শূন্যতা। সে পাকা কসল ধরিজীর ভাঙারে তুলিয়া দিয়া  
নিজেকে নিঃশব্দ, সর্বরিক্ত করিয়া দেয়। শীতের কর্ম-ব্যস্ততা ॥ 'পৃথিবীর ডালাটি  
পাকা কসলে পূর্ণ করিয়া দিবার জন্ত সে ব্যস্ত। তাহার পাকাধান কাটাই-মাড়াইয়ের  
আয়োজনে চারিটি প্রহর ব্যস্ত, কলাই যব ছোলার প্রচুর আশ্বাসে ধরিজীর ডালা পরিপূর্ণ।  
প্রান্তরে ডালা ভরিয়া উঠিয়াছে, ...বাটে বাটে নোকা বোকাই হইল, পথে পথে তারে ময়ূর  
হইয়া গাড়ি চলিয়াছে; আর ঘরে ঘরে নবায় এবং পিঠাপার্বণের উদ্ভোগে ঢেঁকিশালা  
মুখরিত।—রবীন্দ্রনাথ। শীতের বৈরাগ্য-ধূসরতা ॥ উত্তরের নির্মম হিমগর্ভ বাতাস  
গছের ডালে ডালে পাতা করাইয়া দিল। বনশ্রেণী রিক্ত, নিম্প্রজ। ধরিজীর বৃকের উপর  
মৃত পত্রের মৃত্যুশব্দা রচিত হইল। ধানকাটা প্রান্তরে নিরাতরণ্য প্রকৃতির বৈধব্যের কী  
করুণ নৃতি! শীত নববসন্তের আগ্রদূত ॥ শীত-প্রকৃতির এই মৃত্যু-যন্ত্রণার মধ্যে  
আছে ঋতুচক্রের জীর্ণ পুরাতনকে অপসারিত করিয়া নববসন্তের অর্ধা-রচনা করিবার এক  
সুগভীর চক্রান্ত। শীত বসন্তের আগ্রদূত। শীত নিজে রিক্ত, কিন্তু তাহার ডালি  
রিক্ত নয় ॥ তাহার ফুলের ডালিতে আছে ডালিয়া, গাঁদা, কুল ও নানা মরুতমী ফুল;  
আছে আম্রমুকুলের সমাহার। তাহার উৎসবের ডালিতে নবায় উৎসব, যৌব-পার্বণের  
পিঠাপুলি, লক্ষী ও সরস্বতী পূজা; আর আছে মকর-সংক্রান্তির গুণ্যস্থান। পৌষলক্ষী  
সমৃদ্ধির ধাত্রী অন্নপূর্ণার মতো ঘরে ঘরে সোনার ধান বিলাইয়া দিয়া প্রস্তুত হয় বিদায়ের  
জন্ত। ধানের পাতায় পাতায় বাজে তাহার সোনার মঞ্জীর, পাকা ধানের মঞ্জীরিতে  
উপচিয়া পড়ে তাহার মুখের হাসি। উত্তরে বাতাসের একতারায় বাজে তাহার বিদায়-  
সংগীত। উপসংহার ॥ বাংলার অর্ধনৈতিক সমৃদ্ধি রচনার শীতের অবদান অসীম।  
তাহার বার্ষিকের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে এক মেহশীলা জননীর ত্যাগভঙ্গ হৃদয়ের  
মহিমময় প্রকাশ। বাঙ্গালীর কাছে শীতকতু তাই প্রাচুর্যের ঋতু, দারিদ্র্য-মোচনের ঋতু ॥

## একটি বর্ষগমুখর সন্ধ্যা

**সূচনা** ॥ আজ সারাদিন ধরিয়া চলিয়াছে অবিভ্রান্ত বৃষ্টির উৎসব। মেঘাবৃত আকাশের রঙ অলসিত্ত মহিষের গায়ের রঙের মতো— বিষণ্ণ, অস্বাভাবিক। মেঘের গুরুগৰ্জনে ও বিদ্যুৎ-বিকাশের মধ্য দিয়া কখন স্বর্ষদেবতা অন্ত গেলেন। **প্রকৃতির বিষণ্ণতা** ॥ শ্রাবণ-সন্ধ্যার দুর্ধোগপূর্ণ অন্ধকারে কেহ পথে বাহির হয় নাই। গ্রামান্তের পথ নির্জন। বাদল-বাতাসের দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে বোবা-প্রকৃতির চোখের জল করিয়া পড়িতেছে। **বৃষ্টি-পতন ধ্বনির ভাষা** ॥ ভাষাহীন অন্ধকারে বৃষ্টিপাতের অবিরাম শব্দ যেন বোবা-প্রকৃতির বহুদিনের সংগীতমুখর অব্যক্ত ভাষা। **মেঘদূত-পাঠের স্মৃতি** ॥ একবার এক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের কণ্ঠে মেঘদূতের আবৃত্তি শুনিয়াছিলাম; আজ এই বর্ষ-ক্লান্ত সন্ধ্যায় তাঁহার সেই ধীর-গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠস্বর যেন শুনিতে পাইতেছি। **মেঘদূতের সৌন্দর্য-চিন্তা** ॥ মেঘমেঘের নববর্ষা আমাকে রামগিরি আশ্রমের জনশূন্য শৈলশৃঙ্গের শিলাতলে সজ্জা করিয়া ছাড়িয়া দেয়। ‘হৃদয় সেই পৃথিবীতে বনে বনে গ্রামে গ্রামে শূদ্রে শূদ্রে নদীর কূলে কূলে কিরিতে কিরিতে অপরিচিত স্বপ্নের পরিচয় লইতে লইতে দীর্ঘ বিরহের শেষ যোক্ষণ্যে বাইবার জগৎ মানসোৎকংসের জ্বালা উৎসব হইয়া উঠে।’ **পথের নিঃসঙ্গ গোবুর গাড়ি** ॥ বৃষ্টি-বিষণ্ন নির্জন পথে চাকার তীব্র আর্ত হাহাকার ছড়াইয়া একটি গোবুর গাড়ি চলিয়া গেল। দূরে ক্লান্ত চাকার আর্তধ্বনি বৃষ্টি-মুখরতার মধ্যে মিলাইয়া গেল। পথের পাশে ভোবার ধারে ব্যাঙ ডাকিতেছে। ব্যাঙের ডাক যেন এই শ্রাবণ-সন্ধ্যার হৃদয়ের ব্যথিত সংগীত। **বর্ষগমুখর অন্ধকারের সৌন্দর্য-উপভোগ** ॥ আজ এই শ্রাবণ-সন্ধ্যায় প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথের ‘সঞ্চয়িতা’ লইয়া বর্ষার কবিতাগুলি পড়িতে ইচ্ছা করিতেছে। ‘গৃহত্যাগী মন মূকগতি মেঘপৃষ্ঠে লয়েছে আসন।’ আমার ছিন্নবাধা পলাতক মন লঘুপক্ষ হংস-বলাকার মতো মেঘের সজ্জা হইয়া দিক্ হইতে দিগন্তরে ঘুরিয়া বেড়ায়। কোথাও বা প্রস্ফুটিত কেতকীর বেড়া-দিয়া ঘেরা বর্ষগসিক্ত দশার্ণ গ্রাম, কোথাও-বা পরিণতকলশ্রাম অশ্ববন, কোথাও-বা বৃষ্টি-স্নাত ভ্রামলী-ধবলী গোহালে প্রত্যাগমনরত, কোথাও-বা নিঃসঙ্গ পথিক পারে বাইবে বলিয়া বর্ষ-ক্ষীত নদীতীরে মাঝিকে ঘন ঘন ডাকিতেছে। **উপসংহার** ॥ কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে ক্লান্তিতে ঘুম পায়। মনে পড়ে, পরীক্ষার আর বেশী দেরী নাই। মনের সকল ক্লান্তি, সকল অবসাদ হুছিয়া ফেলিয়া আলো জালিয়া পড়িতে বসি। বাহিরে অবিভ্রান্ত পত্র-মর্মরে বাদল-বাতাস হা-হতাশ করিয়া কাঁদিয়া যায়। আম-কাঁঠাল ও দীর্ঘ স্থপারির সারি এবং ক্রন্দনাভূর বাঁশের বন বুককাটা আর্তনাশে হাহাকার করিতে থাকে ॥

## বাংলার বিচিত্র ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব

**সূচনা।** বাংলাদেশ উৎসব-প্রাচুর্যের দেশ। তাহার অতিরিক্ত উৎসব-প্রিয়তার পশ্চাতে আছে তাহার অফুরন্ত প্রাণ-প্রাচুর্য, বন্ধ-প্রকৃতির অহুপম রূপশ্রী; আর আছে তাহার অর্থনৈতিক সচ্ছলতা। ঋতুর পর ঋতু আসে; তাহার স্বরে স্বর মিলাইয়া বাকালী মাতিয়া উঠে 'বারো মাসে তেরো পার্বণ' রচনায়। 'এত ভদ্র বন্ধদেশে তবু রক্তভরা।' কত বস্তা-দুর্ভিক্ষ-মহামারীতে, কত দৈব-দুর্বিপাকে, কত রাজনৈতিক বড়বড়ার বাকালীর ঘর ভাঙ্গিয়াছে। কিন্তু বাকালী তাহার ধ্বংসস্তূপের উপর আবার রচনা করিয়াছে তাহার উৎসবের নিত্য-নূতন পরিকল্পনা। **বাকালীর উৎসব একটি সুবর্ণময় জীবনের অভিব্যক্তি।** সুকলা-সুফলা বাংলার ঘরে ঘরে তখন ছিল শত-প্রাচুর্য; মৃত্তিকার 'স্বাভাবিক' উর্বরতায় জীবন-সংগ্রামের তীব্রতা ছিল অহুপহিত। উৎসবগুলি ছিল তাহারই উত্তম অবকাশের সজীব অভিব্যক্তি। প্রাচীন বাংলার **প্রাণবন্ত উৎসব-চিত্র।** পূর্বে উৎসব-উপলক্ষে কুস্তকার-পত্নী আনিত নূতন বরণডালা, মালিনী আনিত ফুল ও ফুলসজ্জার ফুলের গহনা, তাঁতিনী নীলাশ্বরী ও বিবিধ বর্ণের শাড়ি। নাপিতাণী বহুদিগের পায়ে আলতা পরাইয়া দিত, ব্রাহ্মণ-ঠাকুরাণী কয় গাছি পৈতর নুতা আনিয়া গল্প শুনাইয়া যাইত। এইভাবে প্রাচীন বাংলার উৎসবের মধ্যস্থতার পারম্পরিক শুভ-কামনা বড় চইয়া উঠিত। **বাংলার ধর্মীয় উৎসব।** বাংলার উৎসবগুলি চার শ্রেণীতে বিভক্ত : ধর্মীয় উৎসব, ঋতু-উৎসব, সামাজিক উৎসব এবং জাতীয় উৎসব। হিন্দুধর্মে সিদ্ধিদাতা গণেশের পূজা, দশহরা, রথযাত্রা, রাধী-পূর্ণিমা, মনসা-পূজা, বিশ্বকর্মা-পূজার পর আসে বাকালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা। তারপর আসে লক্ষ্মীপূজা ও শ্রামাপূজা। ত্রৈদিন বাকালীর দীপাবিত্তা উৎসব। কান্তিক পূজা ও জগদ্ধাত্রী পূজার পর মঘ মাসে আসে সরস্বতী পূজা ও চড়ক উৎসব। মুসলমান-সমাজের মহরম, ইদল-ক্ষেতর, শবেরাং ইত্যাদি প্রধান ধর্মীয় অহুষ্ঠান। বুদ্ধ-পূর্ণিমা বৌদ্ধদের প্রধান উৎসব। খ্রীষ্টানদের বড় উৎসব হইল বড়দিন, ইস্টার সাতার ভে, শুভ্, ফ্রাই ডে ইত্যাদি। **বাংলার ঋতু-উৎসব।** প্রকৃতির পটভূমিকায় ঋতু-উৎসবগুলি বাংলায় বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। বর্ষা-সমাগমের সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হইত বীজবপন, ধান্তরোপণ ও বৃক্ষরোপণ উৎসব। বর্ষামঙ্গল, শেষ-বর্ষণ ইত্যাদি আধুনিক সংযোজন। শারদীয় উৎসব বাকালীর শ্রেষ্ঠ ঋতু-উৎসব। অগ্রহায়ণ মাসে নবান্ন উৎসব, পৌষ মাসে পৌষ-মেলা, পিঠা-পার্বণ, তুষ-তুষালি উৎসব। দাস্তন মাসে প্রকৃতির বর্ণাঢ্য রূপসজ্জায় আসে হোলি। তারপর চৈত্রের শূন্য প্রান্তরে গাজনের বাজনা বাজাইয়া পুরাতন বৎসর বিদায় গ্রহণ করে। **সামাজিক উৎসব।** সামাজিক উৎসবের বৈচিত্র্য বাকালীর প্রাণ-প্রাচুর্যেরই প্রতিচ্ছবি। অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, বিবাহ, জাঙ্-শান্তি, জামাই-বষ্ট, ভাত-খিচীরা ইত্যাদিতে সেই অনাবিল প্রাণ-শক্তিরই

প্রকাশ। জয়গ্রহণে উৎসব, বৃত্তান্তে উৎসব, উৎসব জীবনের প্রতি পদক্ষেপে। প্রতিটি উৎসবের জন্য স্বতন্ত্র সংগীত। এইখানেই সর্ব-ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা হইতে বঙ্গ-সংস্কৃতির ধারা পৃথক্। জাতীয়-উৎসব ॥ সাম্প্রতিক কালে তাহার কতকগুলি নবগত উৎসব জাতীয় মর্যাদা লাভ করিয়াছে। তাহারাই হইল—পনেরই আগস্ট, ছাব্বিশে জাহ্নুয়ারী, পঁচিশে বৈশাখ এবং তেইশে জাহ্নুয়ারী। উপসংহার ॥ বাংলার এই উৎসবময়তার পশ্চাতে ছিল প্রাচীন বাংলার অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য। আজ আর সেদিনের বাংলা নাই। আজও বঙ্গালীর ঘরে উৎসবের আহ্বান আসে। শুধু নীরস প্রাণহীন উৎসবে মাইক্রোফোনে হিন্দী গান বাজান হয়, ঘটা করিয়া মণ্ডপসজ্জা এবং আলোকসজ্জাও হয়। কিন্তু বহিরঙ্গ বিলাসে উৎসবের আত্মা আজ যেন হারাইয়া গিয়াছে।

‘যেখানে শুকায় পদ্ম—বহুদিন বিশালাক্ষী  
যেখানে একদিন শঙ্খমালা চন্দ্রমালা মানিকমালার  
কাকন বাজিত, আহা, কোনদিন বাজিবে কি আর !’

বারো মাসে তেরো পার্বণ  
‘এত ভল্ল বঙ্গদেশে তব রক্তভরা’  
বাংলার উৎসব  
বাংলার সামাজিক উৎসব

৫

## নববর্ষ উৎসব

সূচনা ॥ ‘পুরাতন বৎসরের জীর্ণ ক্লান্ত রাজি’র অবসানে উদয়-দিগন্তে নববর্ষের উদার অভ্যুদয়। আজ আকাশ কী মহিমময়! নববর্ষের দার্শনিক তাৎপর্য ॥ নৃত্যে মাতিয়াছেন নটরাজ। হুই হাতে তাঁহার বাজিতেছে কালের মন্দির। তাঁহার এক পদপাতে ধ্বংস, অল্প পদপাতে সৃষ্টি। এক পদপাতে আবরণ, অল্প পদপাতে উন্মোচন। পুরাতন বৎসরকে বিদায় দিয়া তিনি আমাদের জীবনে নূতন বৎসরকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। নৃত্যরত মহাকালের দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলির অগ্রভাগ বাহিয়া একটি বৎসর বিপুল অঙ্ককারের ‘কাল-সিন্দুরী’র খসিয়া পড়িল। তাঁহার করণ্ডে রক্তাক্তের মালা একবার ঘুরিয়া গেল। নববর্ষের বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য ॥ ‘গমন করে’ বলিয়াই পৃথিবীর আর-এক নাম ‘জগৎ’। আর্থিক গতি ও বার্ষিক গতির হৃদে পৃথিবী তাঁহার সূর্য-প্রদক্ষিণ-ত্রয় একবার সমাপ্ত করিল। প্রাচীন ভারতে অগ্রহায়ণ মাসকেই বর্ষারম্ভ বলা হইত। ‘অগ্র’ অর্থাৎ প্রথম, ‘হায়ন’ অর্থাৎ বৎসর। কিন্তু এ বেশের দ্বিগুণ কৃষক-সমাজের মহাজনের ঘেনা-পাওনা মিটাইতে বৈশাখ মাস আদিয়া।



পড়িত। মহাজনেরাও তাই এই মাসটিকে ধরিয়া লইলেন বর্ষারস্ত—তথা হালধাতা। মানসিক তাৎপর্য ॥ স্বর্ষ প্রতিদিনই উঠে। নববর্ষের দিনটিও প্রতিদিনের মতো একটি সাধারণ দিন মাত্র। মাহুব তাহার ‘আপন মনের মাধুরী’ মিশাইয়া এই দিনটিকে স্বতন্ত্ররূপে রচনা করিয়া লইয়াছে। নববর্ষের প্রতিশ্রুতি ॥ সারা বৎসর ধরিয়া আমরা নিজেদের প্রয়োজন-বোধের সীমিত পরিসরের মধ্যে ক্ষুদ্র ‘অহং’-এর পূজা করিয়াছি। নববর্ষের পুণ্য প্রভাতে আমরা মহাজীবনের উদার সান্নিধ্য অল্পতব করিব। ‘তুমি আজ আমাদেরকে আহ্বান কর!—বৃহৎ মহুগ্ৰন্থের মধ্যে আহ্বান কর! আজ উৎসবের দিন, আজ বৃহৎ সম্মিলনের মধ্যে শক্তি-উপলব্ধির দিন, শক্তি-সংগ্রহের দিন। নববর্ষ উদ্‌যাপন : পল্লী-অঞ্চলে ও শহরাঞ্চলে ॥ বাংলার পল্লী-অঞ্চলে কোথাও কোথাও নববর্ষে বেশ বর্ণাঢ্য মেলা বসে। নানা বিক্রয়-প্রতিষ্ঠানে হালধাতার শুভ-মহরং উপলক্ষে সিদ্ধিদাতা গণেশের পূজা। মিঠারসহযোগে সৃচিত হয় নববর্ষের শুভ বিক্রয়ারম্ভ। তাহা ছাড়া দরিদ্র-ভোজনে, নৃত্য-গীতে শোভাযাত্রায়, সভাসমিতিতে, খেলাধুলায়, আনন্দ-অহুষ্ঠানে ও প্রমোদ-উৎসবে দিনটি অনবদ্য হইয়া উঠে। শহরাঞ্চলে স্নাত-বাস্তবযোগে প্রভাত-কেরীর মধ্য দিয়া দিনটির শুভ সূচনা হয়। পল্লীতে পল্লীতে রচিত হয় উৎসব-মণ্ডপ। অপরাহ্নে নানা সাংস্কৃতিক অহুষ্ঠান। জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও অভিষেক। তাহা ছাড়া, চতুর্ভুজাতির আমন্ত্রণ তো আছেই। উপসংহার ॥ আধুনিক যান্ত্রিকতার বিষ-নিঃশ্বাস হইতে নববর্ষ-অহুষ্ঠানটিও মুক্তি পায় নাই। নববর্ষের অরুণোদয়ের পূর্বেই বিকট যান্ত্রিক আওহায়ে ‘লাউড-স্পীকারে’ বাজিতে থাকে চটকদার সিনেমার গান। আমরা যে অন্তরে অন্তরে এমন দেউলিয়া হইয়া পড়িয়াছি, তাহা আগে কে জানিত ?

বছরের প্রথম দিন

৬.

### শহর ও পল্লীর ব্যববাব অগসারণ

সূচনা ॥ বাবাবর আর্ষজাতির মাহুবেরা একদা তারতবর্ষে আসিয়া রচনা করিল ‘ছায়া-হুনিবিড়, শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি’। তারতে পল্লী ও নগরের বিকাশ ॥ ঈশ্বরের হাতে রচিত হইয়াছিল প্রথম ভূবন। মাহুবের হাতে গ্রাম, তাহা দ্বিতীয় ভূবন। সুসভ্য মাহুব রচনা করিল নগর—তাহা হইল তৃতীয় ভূবন। আজ নগর তাহার শুক মরু-রসনা ব্লাইয়া গ্রামগুলির প্রাণরস শোষণ করিয়া তাহাদের নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ঠেলিয়া দিয়াছে। কিন্তু তারতের জনগণ্যার আশি-পতাংশ বাস করে গ্রামে। কাজেই, সেখানে বৈষয়িক উন্নয়নের কাজ অবিলম্বে শুরু করিতে হইবে। গ্রাম তারতের পঠন-বৈশিষ্ট্য ॥ জোত-জমি, খেত-বাঘার এবং সংলগ্ন বিভিন্ন জমির কেন্দ্রস্থলে মাটির দেওয়াল ও খড়ের চাল দিয়া তৈয়ারী ছোট ছোট হুটিং,

সারিখে স্নেহশালিনী নদী, তাহার কলতানে পল্লীর শ্রামল বক্ষ সংস্কৃত-মুখরিত। গ্রামগুলিতে বিভিন্ন বৃত্তির মাল্লবের বাস। সেদিন পল্লী-ভারতের বৈশিষ্ট্যই ছিল প্রাচুর্য ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা। গ্রাম-ভারতের ভাঙনের চিত্র ॥ তারপর আসিল পররাপহারী সাম্রাজ্যবাদীর দল। সর্বগ্রাসী পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের পঞ্চবটী-ছায়াচ্ছন্ন গ্রামগুলিকে ধ্বংস করিল। পল্লী-ভারতের কৃৎসন্মন তিমিত হইয়া আসিল। ভাঙনের পরিণতি ॥ তাহার সমৃদ্ধ জনপদ ধ্বংসভূপে পরিণত হইল, পঞ্চবাট জললাকীর্ণ হইয়া উঠিল, আর সেই দিগন্তশায়ী শ্রামল শস্ত-প্রান্তর বক্ষা, পতিত, অনাবাদী হইয়া পড়িয়া রহিল। কোথায় গেল তাহার সেই কুটির-শিল্প? কোথায় গেল তাহার সেই সার্বিক আর্থিক সচ্ছলতা? অনশন, অধীন, স্বাস্থ্যহীনতা, অকালমৃত্যু, অশিক্ষা ও কুশিক্ষা তাহার নিত্য-সহচর। গ্রামের লোক বলিতে হতভাগ্য, নিরক্ষর 'চাষা' এবং শহরের লোক বলিতে সভ্যতাভিমानी 'বাবু'। পল্লীর প্রাণরসে উজ্জীবিত শহরগুলি আজ পল্লীগুলিকে করে নির্লজ্জ ঘৃণা। গ্রাম ও নগরের সংঘাত ॥ নগরে জলু বেনী, আমোদ-প্রমোদের আয়োজন অফুরন্ত। কিন্তু নাগরিক সভ্যতা মাহুকে পশুদের পর্ষায়ে নামাইয়া আনিয়াছে। তাই রবীন্দ্রনাথ নগরের শুকতার প্রতি খিকার জানাইয়া বলিয়াছিলেন—'দাও কিরে সে অরণ্য, লও এ নগর।' গ্রাম ও নগরের ব্যবধান অপসারণ ॥ আজ গ্রাম ও শহরের মাঝধানের বৈষম্য ও ঘৃণা দূর করিয়া গ্রামগুলিকে বাসযোগ্য করিয়া তুলিতে হইবে। সেখানে আজ 'অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্তবায়ু, চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জল পরমায়ু সাহস-বিস্তৃত বক্ষপট।' উপসংহার ॥ এতদিন গ্রাম-দেবতাকে অবহেলা করিয়া আমরা যে পাপ করিয়াছি, আজ তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিবার পালা। মহাত্মা গান্ধী তাঁহার 'India of My Dreams' গ্রন্থে যে বলিষ্ঠ গ্রাম-ভারতের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, ১৯৫২ সালের ২রা অক্টোবর হইতে শুরু হইয়াছে তাহার রচনার কাজ। আজ যুম ভাঙিতেছে ভারতের নুপ্তিময় পঞ্চাশ লক্ষ গ্রামের ॥

#### ● গ্রাম-উন্নয়ন

৭.

### একটি গ্রামা মেলা

সূচনা ॥ 'যেমন আকাশের জলে জলাশয় পূর্ণ করিবার সময় বর্ষাগম, তেমনি বিশ্বের ভাবে পল্লীর হৃদয়কে ভরিয়া দিবার উপযুক্ত অবসর মেলা। মেলা ভারতের পল্লীর সার্বজনীন উৎসব। কোন উৎসব-প্রাঙ্গণের মুক্ত অঙ্গনে সরল গ্রামবাসীর মনের উজ্জ্বলিত মিলনস্থল হইল মেলা।' 'মেলার' আক্ষরিক অর্থ মিলন। প্রাচীনকাল হইতে মেলার গুরুত্ব ভারতে তাই অসীম। কোন দেব-মন্দিরে কিংবা নদী কিংবা সমুদ্রোপকূলের কোন তীর্থস্থানে কিংবা গ্রামের কোন বিশিষ্ট জায়গায় কোন উৎসব উপলক্ষে মিলিত হই অগণিত জনতা। মেলার তাৎপর্য দুইটি : মনস্তাত্ত্বিক ও

**অর্থনৈতিক** ॥ মেলার আছে দুইটি দিক : মনস্তাত্ত্বিক ও অর্থনৈতিক। মনস্তাত্ত্বিক বলিতে ভাবের আদান-প্রদান, পারস্পরিক চিন্তা-বিনিময়। অর্থনৈতিক দিকটি হইল পণ্য-বিক্রিনি। **শান্তিনিকেতনের পৌষ-মেলায় যাত্রার প্রস্তুতি** ॥ শান্তিনিকেতনের পৌষ-মেলার অমূল্য স্মৃতি আমার মনের মণিকোঠায় অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে। এই পৌষ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাধন-জীবনের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। ঐ দিবসে শান্তিনিকেতনে বসে পৌষ-মেলা এবং সেই সঙ্গে শান্তিনিকেতনের আত্মকৃত্তে অঙ্কিত হয় বিশ্বভারতীর বার্ষিক সমাবর্তন উৎসব। পৌষ-মেলা, কবিকঙ্কর স্মৃতি-বিজড়িত শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতীর বার্ষিক সমাবর্তন উৎসব দেখিব বলিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। যাত্রা ॥ রাত্রি বারোটার সময় ট্রেন বোলপুর স্টেশনে পৌছিল। প্রচণ্ড ঈতে কঁপিতে কঁপিতে আমরা সকলে স্টেশনের বাহিরে আসিলাম। স্বল্পে বন্ধুর বাড়ি। কয় বন্ধুতে আমরা ভূতের গল্প করিতে করিতে অবশেষে বন্ধুর বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। **মেলার পথে** ॥ পরদিন হইতে মেলা—মেলা চলিবে তিন দিন। রাত্রি প্রভাত হইল। চা-খাবার ইত্যাদি খাইয়া আমরা শান্তিনিকেতনের পথে বাহির হইয়া পড়িলাম। বিশাল প্রাস্তরের মধ্য দিয়া রাঙা ধুলির পথ ঝাঁকিয়া-ঝাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে। ধোপছুরন্ত জামাকাপড় অল্পকণের মধ্যেই গৈরিক হইয়া উঠিল। আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল এক বাড়িলের। আমাদের দেখিয়া সে প্রশ্ন করিল : ‘কি গো, কোথায় চলেছ তোমরা? রবি বাড়িলের মেলায়?’ বলিলাম : ‘হ্যাঁ গোসাজি।’ **মেলার নিকটে** ॥ মেলার দূরগত গুহন। দূর হইতে তেলেভাজার গন্ধ। পিপীলিকার স্তায় মাছবের দল মেলার উদ্দেশে দিক-দিগন্তর হইতে আসিতেছে। মাঝে-মাঝে কাঁকা-মাখায় বেপারী। **মেলার বর্ণনা** ॥ শান্তিনিকেতনের সংলগ্ন প্রান্তরে বৃত্তাকারে মেলার পরিকল্পনা। বৃত্তাকারে দোকানের সারি। মাঝখানে কবি-গান ও যাত্রাগানের আসর। শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীরা গলায় হলুদ কম্বল বাধিয়া ভিড় নিরন্তরে ব্যস্ত। সকলের মতো আমরাও ছড়ি ও তালপাতার টুপি কিনিলাম। সমাবর্তনে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ। **মেলার অভিজ্ঞতা** ॥ মেলায় ধোপছুরন্ত শহরে বাবুয়া আসিয়াছেন, আসিয়াছে সাওতালী দম্পতিরা। যাত্রা-গান ও কবি-গান শুনিলাম, দেখিলাম সাওতালী নৃত্য। কিন্তু বাড়িল গানের বুঝি তুলনা নাই। গায়ে বৃঙ্কর, কোমরে ডুগডুগি, হাতে একতারা, গায়ে রঙ-বেরঙের আলখালা—বাউল ঠাকুর নাচিয়া নাচিয়া গান গাহিতেছেন : ‘কে বেঁধেছে এমন বর ধস্ত কারিগর। ঘরের মাপ চৌদ্দপোয়া চৌদ্দ ভুবন তার তিতর।’ **উপসংহার** ॥ মেলার স্মৃতি মনের মণিকোঠায় লইয়া ফিরিয়া আসিলাম। মনে এখনও বাজে বাউল-ঠাকুরের গান : ‘খাঁচার তিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়।’ আজও আমার মনের তিতর ‘অচিন পাখি’র নিত্য বাওয়া-আসা চলে ॥

## নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

**সূচনা ॥** নাগরিকই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-কাঠামোর কেন্দ্র-বিন্দু। নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্যের উপর দাঁড়াইয়া থাকে রাষ্ট্রীয় ইমারৎ। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রমাত্রেই নাগরিকদের রহিয়াছে কতকগুলি পবিত্র ও মূল্যবান অধিকার। সেই সমস্ত অধিকার সংরক্ষণের জন্ত রাষ্ট্রের হইল সদা-জাগ্রত প্রত্নরীর ভূমিকা এবং সংবিধান হইল তাহার পবিত্র সংহিতা। **রাষ্ট্রীয় অধিকার : পৌর অধিকার ও রাজনৈতিক অধিকার ॥** রাষ্ট্রস্বীকৃত অধিকারগুলি দুইভাগে বিভক্ত : পৌর অধিকার এবং রাজনৈতিক অধিকার। পৌর অধিকারগুলি হইল : জীবন-রক্ষণের অধিকার, সম্পত্তি-গঠন ও সম্পত্তি-সংরক্ষণের অধিকার, ভাষা ও সংস্কৃতি-চর্চার অধিকার, ধর্মাচরণ, মতপ্রকাশ, কর্তব্য-সম্পাদন এবং শিক্ষা-লাভের স্বাধীনতা। রাজনৈতিক অধিকার হইল : ভোট-প্রদানের অধিকার, সরকারী চাকরী-লাভের অধিকার, সরকারের নিকট আবেদন করিবার অধিকার ইত্যাদি। **অধিকার এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য পরস্পর-সম্পর্কযুক্ত ॥** অধিকার-ভোগ এবং দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। নিজের ব্যক্তি-স্বাধীনতা ভোগের প্রতিদানে নাগরিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হইল অন্য নাগরিকের ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখা। বিনা প্রতিদানে কোন অধিকার ভোগ করা যায় না। **কর্তব্য : রাষ্ট্রীয় আনুগত্য, দেশরক্ষা, আইনরক্ষা ও করপ্রদান ॥** রাষ্ট্রের প্রতি বিশ্বাসী আনুগত্য প্রত্যেক নাগরিকেরই প্রধান কর্তব্য। বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা, সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলার স্বার্থে রাষ্ট্রীয় আইন মানিয়া চলা এবং কর-প্রদানও নাগরিকদের কর্তব্য। **ভোটাধিকার : আধুনিক হ্রসভ রাষ্ট্রের ভোটাধিকার একটি পবিত্র অধিকার।** তাই বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া নাগরিক তাহার ব্যক্তিগতম ব্যক্তিকেই শাসন-ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করিবে, ইহাই কাম্য। ব্যক্তিস্বার্থ বনাম রাষ্ট্রস্বার্থ ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা। সকল নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্যব্যোধের কেন্দ্রস্থলে থাকিবে জনসেবা, দেশসেবা ও রাষ্ট্রসেবা। রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ-সাধনের মধ্য দিয়া ব্যক্তির কল্যাণও সংসাধিত হয়। কাজেই, ব্যক্তিস্বার্থ নয়, সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রীয় কল্যাণই প্রত্যেক নাগরিকের অবশ্য কাম্য। **উপসংহার ॥** দুই-শতাব্দীর পরাধীনতার অবসানে ভারতে এখন চাই সচেতন নাগরিকতা। দারিদ্র্য ও অশিক্ষা তাহার মর্মমূলে বাসা বাধিয়া আছে। তাহাদের দূরীকরণের জন্ত এখন সদা-জাগ্রত নাগরিকতার বিকাশ জরুরী প্রয়োজন ॥

## জনমত গঠন ও প্রকাশ

**সূচনা** ॥ জনমত হইল জনমানসের নিবোধ অভিব্যক্তি। ইতিহাসের নির্মম বিধানে জনগণই আজ নিজেদের ভাগ্য-নিয়ন্তা। সেই কঠোরিত, দুঃখ-লব্ধ গণতন্ত্রের ভিত্তি স্বল্প জনমতের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। সাম্প্রতিক জগতে সংগঠিত জনমতই গণতন্ত্রের প্রকৃত নিয়ামক শক্তি। জনমতের কার্যকারিতা: গণতন্ত্রে ও স্বৈরতন্ত্রে ॥ প্রত্যেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই জনমত গঠন ও প্রকাশের অধিকার সংবিধান-স্বীকৃত। তাহার ফলেই গণতন্ত্রের পবিত্রতা সংরক্ষিত থাকে। গণমানসের সচেতন এবং সোচ্চার অভিব্যক্তিতে গণতন্ত্র স্বৈরতন্ত্রের পক্ষিণ আবর্তে তাহার ধারা হারাইয়া ফেলিতে পারে না। জনমত গঠন ও প্রকাশের উপায়: বক্তৃতা-মঞ্চ ॥ জনমত গঠন ও প্রকাশের কতকগুলি বিশেষ মাধ্যম আছে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সেই মাধ্যমগুলিকে আরও ব্যাপক ও কার্যকর করিয়া তুলিয়াছে। সভ্যতার শৈশবাবস্থায় জনমত গঠন ও প্রকাশের ব্যবস্থা ছিল কেবল বক্তৃতা-মঞ্চ। সভা-সমিতিতে আজও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ নানা সমস্যা ও তাহার সমাধানের বিষয়ে আলোচনা করেন। গণমত তাহাতে সংগঠিত ও প্রচারিত হয়। মুদ্রণ-যন্ত্র ॥ পূর্বে মাহুষ শিলালিপিতে, প্রস্তর-কলকে আপন চিন্তাকে ব্যক্ত করিত। মুদ্রণ-যন্ত্রের কল্যাণে ইস্তাহার, প্রচার-পত্র, প্রচার-পুস্তিকা, প্রাচীর-পত্র ইত্যাদি সেই ধারা বহন করিয়া চলিয়াছে। সেই ধারার নিয়মিত এবং সম্প্রসারিত রূপ হইল সংবাদপত্র। 'It is the people's Parliament always in session'. সত্যই সংবাদপত্র বিশ্বের সদাভাগ্রত 'লোকসভা'। ভারতে নিরক্ষরের সংখ্যা অত্যধিক। কাজেই, নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য দেশে দ্রুত শিক্ষা-প্রসার একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ॥ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিও জনমত গঠনের প্রকৃষ্ট স্থান। ছাত্র-জীবনে শিক্ষক-অধ্যাপকবৃন্দ ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট যে সকল মতামত ব্যক্ত করেন, তাহার মূল যেমন স্বগতীয়ভাবে প্রোথিত হয়, তেমনি হয় দীর্ঘস্থায়ী। পরবর্তী জীবনে নিজস্ব অভিমত গঠনে সেই শিক্ষালব্ধ মতামত ও বিভিন্ন গ্রন্থ-কেতাবের মধ্যস্থতায় বিশিষ্ট চিন্তাবিদদের মতামত বিশেষ কার্যকরী হয়। বেতার, চলচ্চিত্র, টেলিভিশন, যাত্রা, কথকতা ইত্যাদি ॥ জনমত গঠন ও প্রকাশের অন্যান্য মাধ্যমগুলির মধ্যে বেতার, চলচ্চিত্র, রঙ্গমঞ্চ, ম্যাজিক লণ্ডন, টেলিভিশন, আইনসভা, যাত্রা, কথকতা ইত্যাদি অন্ততম। উপসংহার ॥ গণদেবতার বিচারশালায় জনগণই অবিচারের নির্মম বিচারক। পরিচ্ছন্ন বিবেক ও বুদ্ধি-দীপ্ত মনীষার আলোকেই তাহার নিজেস্ব নিজেদের ভাগ্যের নিয়ামক। তাহাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার প্রয়োজনে তাই প্রথমেই চাই শিক্ষার অবাধ সম্প্রসারণ এবং জনমত সংগঠনের অকুণ্ঠ স্বাধীনতা।

## শিষ্টাচার ও সৌজন্যবোধ

**সূচনা ॥** ‘Courtesy costs nothing’. দেহের সৌন্দর্য অলংকার, আত্মার সৌন্দর্য শিষ্টাচার। সমাজের প্রয়োজনে শিষ্টাচারের জন্ম। শিষ্টাচার বা সৌজন্যবোধ সমাজ-সরসীর বিকশিত শতদল। আত্মীয়তা ও সামাজিকতার সেতু ॥ ‘ভক্ততা আত্মীয়তার চেয়ে কিছু কম এবং সামাজিকতার চেয়ে কিছু বেশী। আত্মীয়তা আন্তরিক, সামাজিকতা আত্মীয়তানিক। ভক্ততা উভয়ের মধ্যে সুদূর-স্বরূপ, এবং উত্তর।’ সামাজিক রীতি ও শিষ্টাচার ॥ শিষ্টাচার সভ্যতার অবদান। ইহা যুগ যুগ ধরিয়া অশূন্যলিত মানব-সভ্যতার শ্রেষ্ঠ সম্পদের ক্রমপুঞ্জিত যোগফল—মানুষের অন্তর-সমুদ্র-মহন-সজ্জাত দুর্লভ অমৃত ফল। স্পষ্টবাদিতা ও শিষ্টাচার ॥ আশৈশব আত্ম-সংযম ও মার্জিত প্রকাশভঙ্গির অশূন্যলনের ফল হইল শিষ্টাচার। কিন্তু স্পষ্টবাদিতার সঙ্গে ইহার মৌলিক গরমিল। অপ্রিয় সত্যভাষণে নিজেকে জাহির করিবার প্রয়াস প্রচ্ছন্ন থাকে। শিষ্টাচার ও চাটুকার-বৃত্তি ॥ আবার শিষ্টাচার ও চাটুকার-বৃত্তিও এক নয়। চাটুকার-বৃত্তির পশ্চাতে থাকে স্বার্থসিদ্ধির কূট অভিসন্ধি। চক্ষুলাজ্ঞা ও শিষ্টাচার ॥ চক্ষুলাজ্ঞা একটা সামাজিক ব্যাধি; এবং তাহার সঙ্গেও শিষ্টাচারের বিরোধ। শিষ্টাচারই সেই ব্যাধির একমাত্র চিকিৎসা। উপসংহার ॥ বিংশ শতাব্দীর অপরাধে সভ্যতা একেবারে দেউলিয়া হইয়া গিয়াছে। সমাজের দুর্বিনীত ছুঁয়ে দল আজ পুঞ্জিত হইতেছে। শিষ্টাচার ও সৌজন্যবোধ আজ উপহাসের বিষয়। শিষ্টাচার ও সৌজন্যবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সার্থক হউক মানব-সভ্যতা ॥

ভক্ততা

## ইতিহাস-পার্শ্বের প্রয়োজনীয়তা

**সূচনা ॥** সাধারণ ধারণা, ইতিহাস মৃত, ইতিহাস মুক। কিন্তু ইতিহাস হইল মানব-সভ্যতার ক্রমাগতির জীবন্ত কাহিনী। সে যুগ-যুগান্তরের ঘটনাপুঞ্জের নীরব সাক্ষী। ইতিহাস কি ? ইতিহাস অতীতের নিছক ঘটনাপঞ্জী নয়। ইহা কেবল রাজা-মহারাজাদের বংশলতিকার তুণীকৃত বিবরণ নয়, যুদ্ধবিগ্রহ ও সাম্রাজ্য-বিস্তারের রোমাঞ্চকর কাহিনীও নয়; ইহা চলমান সভ্যতার ক্রমাভিব্যক্তির সামগ্রিক বাণী-বিগ্রহ। রাজ্য ভাঙ্গাগড়া বা মাল-তারিখ-কণ্টকিত তথ্যপুঞ্জের কংকাল-স্থূপ ইতিহাস নয়, ইহা সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারাবাহিক স্বর্ণস্থূপ। ‘শব হতে উৎসারিত স্বর্ণের বিস্ময়’ ॥ ইতিহাসের স্বর্ণ-তরণীতে মিথ্যা ও অর্থহীনতার স্থান নাই। মহৎ, স্পন্দন ও শাস্ত্রত্বকে ইতিহাস গ্রহণ করে, আর সভ্যতার ঘাটে ঘাটে কুশ্রীতার জঞ্জালভার নামাইতে নামাইতে সেই তরণীর অগ্রগতি। ইতিহাসের উপজীব্য বিষয় ॥ জনজীবনের

কাহিনীই প্রকৃত ইতিহাস। স্থায়ী ও সচ্ছল সমাজ-প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষের সংগ্রামের কাহিনীই তাহার মূল উপজীব্য বিষয়। ইতিহাস-পাঠের সার্থকতা ॥ ইতিহাস মানুষ ও সমাজ-গঠনের সুযোগা শিক্কক। ইহা ভবিষ্যতের অজ্ঞান পথ-প্রদর্শক। ইতিহাস-রচনার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ॥ ভারতের ইতিহাস নাই। সেজন্য বক্ষিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীদের ক্ষোভ। বিদেশী-হস্তে ভারতের বিকৃত ইতিহাস। বর্তমানে স্বদেশীয় ঐতিহাসিকদের হাতে ভারতের প্রকৃত ইতিহাস রচিত হইতেছে। উপসংহার ॥ ইতিহাস মানুষের সুন্দরতম জীবন রচনার স্বপ্নকে একদিন সার্থক করিয়া তুলিবে ॥

ইতিহাস-পাঠের উপকারিতা

১২.

## বিতর্ক-সভা

সূচনা ॥ বিশ্বের সকল দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মূলে রহিয়াছে মানুষের বিচিত্র ভ্রান্তি-বিলাস। সংকীর্ণ দৃষ্টি এবং সীমাবদ্ধ জ্ঞান-অভিজ্ঞতার জন্য মানুষ নিজের অন্তরালে নিবোধের স্বর্গলোক রচনা করিয়া তথায় বাস করে। বাদ-প্রতিবাদ ও সমন্বয়ী-সিদ্ধান্ত ॥ মানুষকে সেই ভুলের স্বর্গ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বিভিন্ন মতবাদ ও যুক্তিতর্কের স্বর্ণে নিজস্ব মতবাদের মূল্য নিরূপণ করিতে হয়, বাদ-প্রতিবাদের মধ্য দিয়া সমন্বয়ী সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। বিতর্ক-সভা সেই প্রক্রিয়ারই অমূল্য-সভা। দ্বন্দ্ব-সংঘাত পরিহারের আধুনিক রীতি ॥ বিতর্ক-সভার মধ্যস্থতায় বহু রক্ত-শিঞ্চিত দ্বন্দ্ব-সংঘাত পরিহার করা সম্ভব হয়। সভাভার অগ্রগতির সঙ্গে বিতর্ক-সভা তাই অত্যন্ত সংগতিপূর্ণ। বিতর্ক-সভার অনুষ্ঠান ॥ কলে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, ক্লাবে ও লাইব্রেরীতে বিতর্ক-সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিতর্ক-সভায় থাকেন সভাপতি ও বিচারকমণ্ডলী। বিষয় থাকে পূর্ব-নির্ধারিত। সপক্ষে বা বিপক্ষে যোগদান। প্রত্যেক দলে থাকে দলপতি। সভাপতির প্রস্তাব অনুযায়ী উভয় পক্ষের দলপতিই বিতর্কের সূচনা করে। অবশেষে তাহারাই করে উপসংহার। বিচারকমণ্ডলীর রায় বা প্রোতাসের মতামতই এ বিষয়ে চূড়ান্ত। নিম্নমাবলী ॥ যুক্তিনিষ্ঠ উপায়ে নীতি-সংক্ষিপ্ত, নীতিদীর্ঘ ভাষণে প্রোতঃ ও বিচারকমণ্ডলীর উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিতে পারা চাই। জোপ, কটুক্তি ও ব্যক্তিগত আক্রমণ অবৈধ। প্রকাশ-ভঙ্গিতে চাই মার্জিত কচি। উপকারিতা ॥ বাক্য-দৃষ্টি, যুক্তিনিষ্ঠতা ও মার্জিত কচির বিকাশ হয়। বিষয়টি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান জন্মে। আগামীকালের রাজনীতিক, শিক্ষক-অধ্যাপক-অইন-ব্যবসায়ীর হায়ে বাক্য-ব্যবসায়ীর সাক্ষাৎ মেলে। উপসংহার ॥ এই গণতান্ত্রিক যুগে বিপক্ষীয় যুক্তিতর্ক ও মতবাদের কঠিনাধারে স্বমতের মূল্য বাচাই করা প্রয়োজন। বিতর্ক-সভা তাই পারম্পরিক বোঝাপড়ার যথার্থ বিচারালয় ॥

● বিতর্ক-সভার প্রয়োজনীয়তা

## কর্তব্যপরায়ণতা

**সূচনা** ॥ ‘বিশ্ব যদি চলে যায় কঁাদিতে কঁাদিতে/একা আমি বসে রব কর্ম-সমাধিতে।’ কর্ম-নিষ্ঠার মধ্যে মানুষ নিজেকে খুঁজিয়া পায়, কর্তব্যপরায়ণতার মধ্যে মানুষ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। **কর্তব্যপরায়ণতার মূল কথা** ॥ পৃথিবীর অলস ও কর্ম-বিমুখেরা কর্ম-পাগল মানুষদের উপহাস করে। কিন্তু কর্ম-পাগল তথা কর্তব্য-পরায়ণেরাই জানেন, এই পৃথিবী বিশাল কর্মশালা। এখানে প্রত্যেকের যথানির্দিষ্ট কাজ আছে; প্রত্যেককে সেই কর্ম-সম্পাদন করিয়া যাইতে হইবে। তাহার সাকল্যই জীবনের সার্থকতা। **কাজ বা কর্তব্য কি ?** ॥ প্রত্যেক মানুষকেই কিছু-না-কিছু কাজ করিতে হইবে। এই পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য কাজ করিতে হয়। কিন্তু সমস্ত কাজই বিশ্বদেবতার কাজ। নিজ নিজ কর্তব্য-সমাপনের মধ্যে বিশ্বদেবতার কাজ তথা বিশ্বদেবতার সেবা করিবার সুযোগ লাভ। তাহাই বিশ্বদেবতার পূজা। **কর্তব্য-পরায়ণতার মূল্য** ॥ যথানির্দিষ্ট কর্মে নিষ্ঠাই কর্তব্যপরায়ণতা। মানুষের উপরে যে কর্মভার গুস্ত থাকে, তাহা তাহাকে নির্দিষ্ট সময়ে সমাধা করিতে হইবে। কর্তব্য-কর্ম পরিত্যাগ করিয়া আলস্যে যাহারা কালাতিপাত করে, তাহারা অপদার্থ। **উপসংহার** ॥ বিশ্বদেবতার কর্মের মহায়জ্ঞশালায় কর্তব্য-সম্পাদনেই মানুষের জীবনের সার্থকতা ॥

কর্মই জী-ন

## অধ্যবসায়

**সূচনা** ॥ সংগ্রামই জীবনের মর্মবাণী। অন্তহীন সংগ্রামের ইতিহাসই জীবনের ইতিহাস। **জীবনের চিরায়ত সংগ্রামী শক্তি** ॥ জীবনের বিকাশের মূলে রহিয়াছে যে অভিব্যক্তিবাদ বা বিবর্তনবাদ, তাহা সেই সংগ্রামেরই কাহিনী। নানা বিরুদ্ধ-শক্তির চক্রান্তকে বাথ করিয়া আদিম এককোষী জীব আজ বহুকোষীতে পরিণত হইয়াছে এবং তাহা সম্ভব হইয়াছে জীবনের চিরায়ত সংগ্রামী শক্তির দ্বারা। **সংগ্রাম ও সভ্যতার ক্রমাভিব্যক্তি** ॥ মানব-সভ্যতার ক্রমাভিব্যক্তির মূলেও আছে এই ঐতিহাসিক ইতিহাস। সেই সংগ্রাম তাহার আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মবিকাশের সংগ্রাম। অধ্যবসায়ই সেই সংগ্রামের মৌল প্রেরণা। **ব্যর্থতাই সাকল্যের জননী** ॥ সংগ্রামে জয় আছে, আছে পরাজয়। কিন্তু পরাজয়ই শেষ কথা নয়, তাহা নূতন জয়েরই পথিকৃৎ। অতএব ‘ধৈর্য ধরো, ধৈর্য ধরো, বাঁধো বাঁধো বুক।’ **অধ্যবসায়** ॥



রবার্ট ব্রুস ॥ অধ্যবসায় সাহস, সাহসুতা ও আত্মবিশ্বাসের ভিত্তি। স্বচল্যাত্তের স্বাধীনতার মহা-দৈনিক রবার্ট ব্রুস ইংরেজ-হস্তে বহুবার পরাজিত হইবার পর গিরিগুহার একটি মাকড়সার অধ্যবসায়ের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া ইংরেজদের হাত হইতে স্বদেশের স্বাধীনতা চিনাইয়া আনিয়াছিলেন। অধ্যবসায় : নেপোলিয়ন ॥ পুরুষকারের মূর্ত প্রতীক নেপোলিয়ন ‘মুখের অভিধান’ হইতে ‘অসম্ভব’ শব্দটি তুলিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। ‘আলপ্স পর্বতের দুর্নজ্বাতা ? ‘There will be no Alps’.

উপসংহার ॥ অতএব অধ্যবসায়ই শক্তি। ‘মস্তের সাধন কিংবা শরীর পাতন ॥’

- ‘যৈষ ধরো, ধৈষ ধরো, বাধো বাধো বুক’
- ব্যর্থতাই সাধনোর জননী
- মস্তের সাধন কিংবা শরীর পাতন

১৫.

## মিতব্যয়িতা

সূচনা ॥ সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনই আদর্শ জীবন। সেই সামঞ্জস্য আয়ের সহিত ব্যয়ের সামঞ্জস্য, বর্তমানের সহিত ভবিষ্যতের সামঞ্জস্য। মিতব্যয়িতাই সেই সামঞ্জস্য-পূর্ণ জীবনের পথিকৃৎ। আবাল্য-অশুশীলিত মিতব্যয়িতাই জীবনে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির বনিয়াদ রচনা করিয়া দেয়। জীবনের দুঃখের জন্ম দায়ী কে ? ॥ জীবনে দুঃখের জন্ম লাঘী মানুষ মিছেই। তাহার অভাববোধ কোনদিনই পূর্ণ হইবার নয়। আয়ের সহিত ব্যয়ের, বর্তমানের সহিত ভবিষ্যতের সংগতি স্থাপন করিতে পারে না বলিয়াই চিরজীবন সে দুঃখ পায়। মিতব্যয়িতার মূলে জীবন-বৈশিষ্ট্য ॥ ‘অনিচ্ছয়তা’য় পূর্ণ মানব-জীবন, তাহার ভবিষ্যৎ তিমিরারত। তাই সে তাহার উপার্জিত রুজি-রোজগারের সমস্তটাই বর্তমানের গল্পের নিক্ষেপ না করিয়া তাহার কিয়দংশ ভবিষ্যতের জন্ম সঞ্চয় করিয়া রাখে। মিতব্যয়িতার অর্থ ॥ মিতব্যয়িতার অর্থ আয় বৃদ্ধি বায় করা। আয়ের অপেক্ষা বায় বেশী করিলে অচিরেই ঋণজালে জড়াইয়া পড়িতে হয়; বায় কম করিলে ভবিষ্যতের চন্দ্ৰ কিছুটা স্পষ্ট হয়। লক্ষ্মী ও কুবের ॥ কিন্তু মিতব্যয়িতার অর্থ কার্পণ্য নয়। কৃপণেরা কুবেরের মতো নিজে না থাইয়া, পরিবার-পরিজনকে উপবাসী রাখিয়া সঞ্চয়ের নেশায় মাতিয়া উঠে। তাহাতে সুখ নাই, ত্রি নাই। লক্ষ্মীই ধন্যদিষ্টাত্ত দেবী; লক্ষ্মীর অস্তরের কথা হইল কল্যাণশ্রী। অমিতব্যয়িতার পরিণাম ॥ অমিতব্যয়িতার পরিণাম বিষময়। মিতব্যয়িতার অভাবে বহু চন্দন-তরু বিষবৃক্ষে পরিণত হয়। দুঃখ-লাহুনা হয় অমিতব্যয়ীর জীবনের ভাগ্যালিপি। উপসংহার ॥ শৈশবকাল হইতে মিতব্যয়িতার অশুশীলনের কলে শুধু হাতেই সোনা অমে না, জীবনের ক্ষেত্রেও সোনা কলে ॥

## খেয়াল-খুশির মূল্য

**সূচনা ॥** প্রত্যেক মানুষের মতোই আছে একটি আত্মভোলা চিরশিশু। সে চির নবীন, চিরকালের অনিয়ম। বয়স ও গুরুগম্ভীর জীবনের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া সে শুক সাংসারিকতার জলহীন, ছায়াহীন মরুপ্রান্তরকে শ্রামল সরস করিয়া রাখিয়াছে। **মানব-অন্তরের চিরশিশু ॥** দৈনন্দিন কর্মক্লাস্ত, ধূলিময় জীবনের অন্ধ আবর্তে প্রাণ হাঁপাইয়া উঠে। সে চায় ছুটি, চায় বিশ্রাম। মানব-অন্তরের চিরশিশুটি সেই বিশ্রামের অবকাশটিকে খেয়াল-খুশির সৌন্দর্য ও মাধুর্যে পূর্ণ করিয়া দেয়। **অবকাশ ও বিমল আনন্দের আয়োজন ॥** কর্মময় জীবনে দক্ষিণের এক বলক বাতাসের মতো আসে অবকাশ। তখন অপরকে আহঁত না করিয়া সে বিমল আনন্দের আয়োজনে মাতিয়া উঠে। **অবকাশ-যাপনের বিচিত্র আয়োজন ॥** মানবের অন্তরচরী সেই চিরশিশুর খেয়ালের অন্ত নাই। সে ক্যামেরার তোলে ছবি, বই পড়ে, ছবি আঁকে, বাগান রচনা করে, ডাকটিকিট জমায়, তাস খেলে, গল্প-কবিতা লেখে, নাটক মঞ্চস্থ করে, সাজায় পুতুলের ঘর। কখনও-বা সে দল বাঁধিয়া বাতির হইয়া পড়ে দেশভ্রমণে। **নব নব সৃষ্টির আনন্দ ॥** এই সব খেয়াল-খুশির মধ্যে সৃষ্টির অনাবিল আনন্দ উজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। ইহা কেবল অলস প্রমোদ নয়, সৃষ্টির একনিষ্ঠ কারিগরও। **প্রয়োজনীয়তা ॥** খেয়াল-খুশি যান্ত্রিক ধূসর জীবনকে শ্রামল-সরস করিয়া তোলে, সৃষ্টির নব নব দ্বার উন্মোচিত করে। **উপসংহার ॥** জীবন মধুময় হয়। খেয়াল-খুশি তাই আত্মিক বিকাশ ও আনন্দ-যজ্ঞের হোম-উপচার ॥

● অবকাশ-যাপনের উপায়

● ছুটির সম্ভাবনার

## ধর্মঘট

**সূচনা ॥** শ্রমিক-সাধারণই বিশ্বের বিশাল কর্মযজ্ঞের পুরোহিত। বাদের মাংসপেশীর জোরে কল-কারখানার ঢাকা ঘোরে, সভ্যতার রথ ছুটে চলে, তাদের অন্নবস্ত্র আর বাসগৃহের সংকট কোনকালেই ঘোচেনি। তাদের সেই সংকট-মোচনের জন্তে একদিন এলো ধর্মঘটের ডাক। শোষিত, সর্বহারা শ্রমিকের দল সেই ধর্মঘটকে করলো হাতিয়ার। **শ্রেণী-সংঘাত ও ধর্মঘট ॥** ধনতান্ত্রিক সমাজে ধনপতি-গোষ্ঠীর স্বার্থকে কেন্দ্র করে আর্থিক জগতের ঢাকা ঘোরে। শ্রমিক-স্বার্থ চিরকাল অবহেলিত। একদিকে শোষণের উল্লাস, অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ ও বিক্ষোভ। এই হলো

শ্রেণী-সংঘাতের গোড়ার কথা। আজ নব-জাগ্রত শ্রমিক-শ্রেণী চিনে নিতে পেরেছে তার সংঘর্ষশক্তিকে। ধর্মঘট সেই সংঘর্ষশক্তির দুর্জয় প্রকাশ। শিল্প-বিপ্লব ও ধর্মঘট ॥ যুরোপের শিল্প-বিপ্লব যেদিন কুটির-শিল্পের স্বাধীন কারিগরদের হাতের কাজ কেড়ে নিয়ে তাদের বাধ্য করলো কলকারখানার শ্রমিক-জীবন গ্রহণে, সেদিন থেকেই শুরু হলো দুই পরস্পর-বিরোধী স্বার্থের সংঘাত। সেই পশ্চিমা ঝড় একদিন এদেশের মাটি স্পর্শ করলো। ধর্মঘট ও প্রতিক্রিয়াপন্থী ॥ ধর্মঘটে উৎপাদন ব্যাহত হয়। তাই ধনপতিগোষ্ঠী শ্রমিক-ঐক্য ফাটল ধরাবার জন্তে তৎপর হয়ে ওঠে। তাতে ধর্মঘট বানচাল হয়ে যায়। ধর্মঘট অবাঞ্ছিত ॥ ধর্মঘটে শুধু মালিক-পক্ষেরই ক্ষতি হয় না, সামাজিক সম্পদ-বৃদ্ধিও ব্যাহত হয়—জনজীবনের দুঃখকষ্ট বৃদ্ধি পায়। উপসংহার ॥ কিন্তু শ্রমিক-স্বার্থ পদচলিত হোক, তাও কাম্য নয়। মালিক-শ্রেণী ও সরকার প্রকৃত সংবেদনশীল হলে এই উপসর্গকে এড়িয়ে যাওয়া যায় ॥

● শ্রমিক-অশান্তি ও শ্রমিক-সংঘ আন্দোলন

১৮.

## একটি নদীর আত্মকথা

সূচনা ॥ আমি একটি নদী। গঙ্গা আমার নাম। অবশ্য তোমরা ভালোবেসে আমাকে নানা নামে ডাকো—জাহ্নবী, সুরধুনী, ভাগীরথী। জন্মকাহিনী ॥ আমি তোমাদের ঘরের পাশ দিয়ে কুলুকুলু শব্দে গান গাইতে গাইতে ছুটে বাই। আমার গানে আমি আমার জন্মকাহিনী শোনাই। পৌরাণিক কাহিনী ॥ আমি ছিলাম স্বর্গের সুরধুনী। ভয়ঙ্কর সত্তা-সন্তানদের উদ্ধার করতে আমাকে মর্ত্যে আনবার জন্তে ভগীরথের কঠোর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে মর্ত্যাবতরণের জন্তে প্রস্তুত হই। ভগীরথের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে মর্ত্যাবতর তাঁর ভটাবন্ধনে আমাকে অবতরণের স্থান করে দিলেন। তারপর মদমত্ত ঐরাবতকে ভাসিয়ে ভরু-মুনির পাশ দিয়ে ছুটে যাবো, এমন সময় ভরু-মুনি আমাকে পান করে ফেললেন। পরে অবশ্য ভগীরথের বন্দনায় তুষ্ট হয়ে মুনিবর আমাকে দিলেন মুক্তি। আমি বত পাপী-ভাপীকে মুক্তি দান করে সত্তা-সন্তানদের পুনর্জীবন দান করলাম। আমার নাম তাই হলো ভাগীরথী। প্রকৃত কাহিনী ॥ আসলে হিমালয়ের কোলে গোনুখী হিমবাহ থেকে আমার জন্ম। হরিষাধের কাছে আমি সমভূমিতে অবতরণ করি। তারপর সমগ্র উত্তর-ভারতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হই। তীর্থস্থান ॥ আমার কূলে কূলে কত তীর্থক্ষেত্র। আর বাংলাদেশ—সে তো আমার অন্তত তৈরী। উপসংহার ॥ তোমাদের ভালোবাসার বিনিময়ে আমি তোমাদের জোগাই অরুণল, দান করি মুক্তি।

## ভগবান বুদ্ধ

**সূচনা ॥** ভারতে বৈদিক যুগের শেষে ধর্মের অনাচার দূর করিয়া রক্তাক্ত পৃথিবীকে কলঙ্কশূন্য করিবার জন্য উদার অহাদায় ঘটিল ভগবান বুদ্ধের। **জন্ম ও বংশ-পরিচয় ॥** হিমালয়ের পাদদেশে কপিলবাস্তু নগর। পিতা রাজা শুদ্ধোদন, মাতা মায়াদেবী। মাতার মৃত্যুর পর পিতৃষমা গৌতমী প্রতিপালন করেন; তাই আর এক নাম গৌতম। পুত্র-লাভের উদ্দেশ্যে সিদ্ধ হওয়ায় শুদ্ধোদন পুত্রের নাম রাখেন সিদ্ধার্থ। **কৈশোর ও যৌবন ॥** সিদ্ধার্থ কৈশোরে অত্যন্ত ভাবুক ও স্বপ্নভাবী ছিলেন। অল্পবয়সে যশোধরা নামে এক সুন্দরী কন্যার সাহিত বিবাহ হয়। একটি পুত্রসন্তান জন্মলাভ করিল—নাম রাহুল। সিদ্ধার্থ এবার মায়াবন্ধন ছিন্ন করিতে উত্তত হইলেন। **বৈরাগ্যের উন্মেষ ॥** কথিত আছে, তিনি ভ্রমণে গিয়া প্রথম দিনে এক জরাজীর্ণ বৃদ্ধ, দ্বিতীয় দিনে এক ব্যাধিগ্রস্ত মূর্খ, তৃতীয় দিনে একটি শবদেহ এবং চতুর্থ দিনে এক সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী দেখিয়া সন্ন্যাস-গ্রন্থকেই মুক্তির উপায় বলিয়া মনে করিলেন। **সন্ন্যাস-গ্রহণ ॥** তিনি মস্তক মুণ্ডন করিয়া গৈরিক বসন পরিধান করিয়া একাকী চলিলেন মুক্তির সন্ধানে। **সিদ্ধিলাভ ॥** বৈশালীতে এক ব্রাহ্মণের গৃহে, তারপর রাজগৃহে অপর এক ব্রাহ্মণের গৃহে চলিল তাঁহার দর্শন অধ্যয়ন। অবশেষে এক ব্রাহ্মণের নির্দেশে নিরঞ্জন নদীতীরে বোধিচক্রমতলে লাভ করিলেন জ্যোতির্ময় সিদ্ধি। সিদ্ধার্থ হইলেন ভগবান বুদ্ধ। **বুদ্ধের বাণী ॥** অবিজ্ঞা হঃস্বের মূল। অবিজ্ঞা জয় করিতে হইবে। **প্রার্থনা সংগীত ॥** 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। ধম্মং শরণং গচ্ছামি। সজ্জং শরণং গচ্ছামি।' **দেহত্যাগ ॥** আশি বৎসর বয়সে এই মহাতাপস কুশীনগরে দেহত্যাগ করিলেন। **বৌদ্ধতীর্থ ॥** কপিলবাস্তু, বুদ্ধগয়া, সারনাথ এবং কুশীনগর বৌদ্ধদের পরম তীর্থক্ষেত্র। **বৌদ্ধগ্রন্থ ॥** বুদ্ধর দেহাবসানের পর 'ত্রিপিটক' রচিত হয়—সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম। **উপসংহার ॥** তিব্বত, চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ, সিংহল প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধধর্ম বিস্তৃত।—'আজিও জুড়িয়া অর্ধজগৎ ভক্তি প্রণত চরণে ধীর ॥'

বুদ্ধের জীবন ও বাণী

## বীর-সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ

**সূচনা ॥** পরাধীন স্বাভিকের পরাস্থকরণ ত্যাগ করিয়া আত্মসন্ধানে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য কে তাহাকে বজ্রগত অগ্নিসম্মে উজ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছিলেন? তিনি মহা-সন্ন্যাসী বীরেশ্বর বিবেকানন্দ। **জন্ম ও বংশ-পরিচয় ॥** ১৮৬৩। কলিকাতার সিমলার দত্ত-পরিবার। পিতা—শিবনাথ দত্ত। মাতা—ভুবনেশ্বরী। বাল্যনাম—নরেন্দ্রনাথ। বীরেশ্বরের কৃপালব্ধ নরেন্দ্রনাথের অন্য নাম বীরেশ্বর; ডাক নাম—'বিলে'। শৈশব ও বিদ্যালয়িক ॥ শৈশবে নরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত দুর্বল ছিলেন। 'শিব'নাম উচ্চারণে শক্ত

হইতেন। ধ্যানের নেশা। মেট্রোপলিটন স্কুল হইতে প্রবেশিকা এবং জেনারেল এসেম্‌ব্লি হইতে বি. এ. পাস। আবাল্য ব্যায়াম, খেলাধুলা এবং সংগীত-চর্চায় প্রতি ছিল বিশেষ আকর্ষণ। শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শন ও শিষ্যত্ব লাভ ॥ আকস্মিকভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত তাঁহার এক ভক্তগৃহে নরেন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার দিব্য সান্নিধ্যে আসিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ। বিবেক-বাণী ॥ তিনি জীবন্মৃত জ্ঞাতিকে ‘অভীঃ’ মন্ত্রে জাগাইয়া তুলিলেন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় অনুষ্ঠিত ধর্ম-মহাসম্মেলনে হিন্দুধর্মের বিজয়-পতাকা উড়াইয়া দিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন। বহু বিদেশী গুণী ব্যক্তির তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ। রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা ॥ ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র উনচল্লিশ বৎসর বয়সে পরলোক গমন। বলিষ্ঠ ভারত-গঠন ॥ জাতিভেদহীন বলিষ্ঠ ভারত-গঠনই ছিল তাঁহার ব্রত। উপসংহার ॥ আমরা যেন তাঁহার বীরবাণী না তুলি—‘নাশমায়া বলহীনের লভা’ ॥

একজন দুরদ্বৈর নাথকের জীবন-কাহনী

২১.

## ভগিনী নিবেদিতা

সূচনা ॥ ভারতে লাক্ষিত মানবতার পূজায় আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। জন্ম ও বংশ-পরিচয় ॥ ২৮শে অক্টোবর, ১৮৬৭। আয়র্লণ্ডের জনগ্যানন শহর। পিতা স্যামুয়েল রিচমণ্ড, মাতা মেরী ইজাবেল হামিলটন। পিতামহ ছিলেন আর্লও মুক্তি-সংগ্রামের সৈনিক। বাল্য-জীবন ও শিক্ষা ॥ বাল্যনাম মার্গারেট এলিজাবেথ নোব্ল। শৈশব কালে পিতামহীর নিকট। পিতামহী ও পিতার মৃত্যু। নিঃসরণ দারিদ্র্য। মাতামহ হামিলটনের বাড়িতে থাকিয়া স্কুল ও কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া শিক্ষাদান ব্রত গ্রহণ করেন। ভারত-আগমন ॥ সংসারের নানা আঘাতে মার্গারেটের চন্দ্র চকল হইয়া উঠিয়াছিল। এমন সময়ে ইংলণ্ডে আসিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি মার্গারেটকে আলো দেখাইলেন। ভারতে লাক্ষিত মানবতার পূজায় আত্মনিবেদনের জন্য মার্গারেট ভারতে আসিলেন। ‘ভগিনী-নিবেদিতা’ ॥ তাঁহার ‘ভগিনী-নিবেদিতা’ নাম সার্থক হইল। কর্ম-জীবন ॥ তাগ ও সেবাপর্য্যই তাঁহাকে দেশত্যাগী করিয়াছিল। ভারতের নারীজাতির মুক্তির দূতী। নারীশিক্ষার পথ-প্রদর্শিকা! এ দেশের শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, স্বদেশসেবক—সকলেই তাঁহার নিকট গুণী। উপসংহার ॥ তাঁহার রচিত গ্রন্থ—‘The Master as I saw Him’ এবং ‘Notes on Some Wanderings with the Swami Vivekananda.’ ১৯১১ সালের ১১ই অক্টোবর পরলোক গমন। আমরা ত্রিনি ভারতকেই স্বদেশ মনে করিয়াছেন। বিদেশিনী ভগিনী আজ আমাদের ঘরের ভগিনী ॥

একজন মহিষী মচিলা

**সূচনা** ॥ প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান-সাধনার রুদ্ধতার উন্মুক্ত করিবার জন্য উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগৃতি-লগ্নে বিজ্ঞানার্চ্য জগদীশচন্দ্রের আবির্ভাব। তাঁহার সাধনায় প্রাচ্যের দর্শন এবং পশ্চাত্যের বিজ্ঞানের সেতু-বন্ধন। জন্ম, পিতৃ-পরিচয় ও বাল্যজীবন ॥ ১৮৫৮ সাল, ৩০শে নভেম্বর। ঢাকার রাড়িখাল। পিতা করিমপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ভগবানচন্দ্র বসু। পিতার স্বদেশানুরাগ ও শিল্পোৎসাহ, মাতার রামায়ণ-মহাভারত-প্রীতি এবং সাধারণ মানুষের শিশু-সন্তানদের সখ্যতা তাঁহার জীবনে বার্ষ হয় নাই। **উচ্চশিক্ষা লাভ** ॥ হেয়ার স্কুল ও সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ হইতে বি. এ. পাস। বিদ্যাত-যাত্রা। ত্রাণবিদ্যা ও উদ্ভিদ-বিদ্যায় পাঠ-গ্রহণ; কিন্তু অসুস্থতার জন্য পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন-বিদ্যা ও উদ্ভিদ-বিদ্যায় ট্রাইপোস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. এস্. সি. উপাধি লাভ। **অধ্যাপনা-জীবন** ॥ প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা ও গবেষণা। খেতাজ ও ভারতীয় অধ্যাপকদের বেতন-বৈষম্যের প্রতিবাদ। **পদার্থ-বিদ্যায় আবিষ্কার** ॥ বিদ্যুৎ-তরঙ্গ বিষয়ে আবিষ্কারের জন্য লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. এস্. সি. উপাধি লাভ। বেতার-যন্ত্র আবিষ্কারের সম্ভাব্যতার বিষয়ে বক্তৃতা দান। রবীন্দ্রনাথের শুভেচ্ছা-বাণী—‘আজি মাতা পাঠাইছে অশ্রুসিক্ত বাণী আশীর্বাদসংগিনী’ জগদীশচন্দ্রের ব্যথিত অভিজ্ঞতা—‘যাঁহারা আমার বিরুদ্ধপক্ষ ছিলেন, তাঁহাদেরই একজন আমার আবিষ্কার পরে নিজের বলিয়া প্রকাশ করেন।’ **উদ্ভিদ-বিদ্যায় আবিষ্কার** ॥ পদার্থ-বিদ্যায় গবেষণা ত্যাগ ও উদ্ভিদ-বিদ্যায় মনোনিবেশ। আবিষ্কার—জড় ও চেতনের সর্বত্র প্রাণের নির্বাধ প্রকাশ। **সাহিত্য-চর্চা** ॥ তিনি একাধারে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও সাহিত্যিক। ‘অব্যক্ত’ গ্রন্থে তাহার স্বাক্ষর আছে। **বসু-বিজ্ঞান মন্দির** ॥ ১৯১৭ সালের ৩০শে নভেম্বর বসু-বিজ্ঞান মন্দিরের প্রতিষ্ঠা। ১৯৩৭ সালের ২৩শে নভেম্বর পরলোক গমন। **উপসংহার** ॥ ভারতে বিজ্ঞান-সাধনার অসুস্থ পরিবেশ রচনা ছিল তাঁহার অগতম সাধনা। সেখানে মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের আবির্ভাব। জগদীশচন্দ্রের দুঃখের সাধনা জাতির স্বপ্নের মধ্যে সফলতা লাভ করুক ॥

ভারতের একজন বিজ্ঞান-সাধকের জীবনী

**সূচনা** ॥ মহাত্মা গান্ধী সত্য, স্বাধীনতা ও অহিংসার প্রতিমূর্তি। জন্ম ও বংশ-পরিচয় ॥ ২রা অক্টোবর, ১৮৬৯। গুজরাটের পোরবন্দরের এক বণিক-বংশ। পিতা—মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। মাতা—পুতলী বাঈ। সত্যানুরাগ, তেজস্বিতা, ধর্ম্মানুরাগ, দয়া, কমা—এই সব ছিল তাঁহার উত্তরাধিকার। শিক্ষা ॥ প্রবেশিকা

পরীক্ষার পাশ করিয়া বিলাতে বান এবং ব্যারিস্টার হইয়া আসেন। কর্ম-জীবন ॥ বোম্বাই হাইকোর্টে আইনের ব্যবসায়ের শুরু। কয়েকজন ভারতীয় ব্যবসায়ীর আমন্ত্রণে নাটলে যাত্রা। সেখানে ভারতীয় ব্যবসায়ী ও প্রমিকবের উপর নাটাল সরকারের অস্বাভাবিক জুলুমের প্রতিবাদ। সভাপতি-সংগ্রামের সূচনা। জয়লাভ। একশ বছর পরে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন। সর্বস্বতী আশ্রম প্রতিষ্ঠা। কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ। অহিংস সংগ্রাম। হরিলোক-আন্দোলন। লবণ-সভাপতি—‘তাতি অভিযান’। ‘ভারত ছাড়’ আন্দোলন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার শান্তি পক্ষপাত। ‘ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম’। ৩০-৭ জাভহারী, ১৯৪৭ নাথুরাম বিনায়ক গডসের পিটলের গুলিতে প্রাণত্যাগ। উপসংহার ॥ তিনিই নবভারতের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা। ‘একজাতি, একপ্রাণ, একভাষা’ প্রেরিত।

❖ ভারত-গঠনে মহাত্মা গান্ধী

২৪.

## শান্তির দূত জওহরলাল

সূচনা ॥ নেহরু ভারত স্বাধীন নৃত্য বিগ্রহ। স্বাধীনতা-আন্দোলনে এবং স্বাধীন ভারতে দেশগঠনে তিনি নিয়ন্ত্রণে তাঁহার সম-ভাগ্য নেতৃত্ব। শৈশব ও শিক্ষা ॥ জন্ম ১৮৮৯ সালের ১৪ই নভেম্বর। এলাহাবাদ। পিতা মতিলাল নেহরু, মাতা স্বরূপরাণী। পনেরো বৎসর বয়সে অধ্যয়নের জন্য বিলাতে যাত্রা। ১৯১০ সালে রসায়ন, ভূতত্ত্ব ও উদ্ভিদ-বিজ্ঞান অনার্স সহ ডিগ্রি লাভ। ফ্রান্স ও জার্মানী পরিভ্রমণ। ১৯১২ সালে ব্যারিস্টারি পাশ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন। কর্মময় জীবন ॥ এলাহাবাদ কোর্টে আইন-ব্যবসায় শুরু। কংগ্রেসের স্বাধীনতা-সংগ্রামে তিনি গ্রহণ করিলেন বীর সৈনিকের ভূমিকা। জাতীয় কংগ্রেস ও নেহরু ॥ ১৯১৬ সালে কমলা কান্তিবের সচিব-নির্বাচন। মহাত্মা গান্ধীর সচিব প্রথম থাকিল। যৌবনের সচিব মিসন হটল সন্তান স্বতন্ত্র স্বাধীনপ্রভাবের, নির্ভর সচিব আবেগের। স্বাধীনতা-সংগ্রামে নেহরু ॥ ১৯১৯ সালে জলিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের তথ্য-সংগ্ৰহে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে সাহায্য। ১৯২১ সালে প্রিন্স অব ওয়েল্সের ভারত-আগমন উপলক্ষে প্রথম কারাণ্ডিও ভোগ। মুক্তিলাভ করিলেও তাঁহাকে জীবনে ১২ বৎসরেরও কম কারাবাসে কাটাতে হয়। ১৯৪১ সালে স্যার হিল্ কৌজের ঐতিহাসিক বিচারে অষ্টমজীবী হিসাবে তাঁহাদের পক্ষবলপন করিয়া পদেশপ্রোমের এক বিশিষ্ট দৃষ্টি স্থাপন। প্রধানমন্ত্রী নেহরু ॥ ১৯৪৭ সালে স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। সেই দায় তিনি পরিচালিতেন আমরণ—দীর্ঘ সত্তেরো বৎসর। ১৯৬৪ সালের ২৭শে মে এই ভাষার ভারত-পূর্ব অন্তিমিত হইলেন। কংগ্রেস ও নেহরু ॥ ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সহিত নেহরুর সম্পর্ক ছিল যেমন স্বদীর্ঘ, তেমন

নিবিড়। তিনি জীবনে মোট পাঁচবার কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। নেহরুই কংগ্রেসের স্ববিরতার চোখে আনিয়া দিলেন সমাজতন্ত্র, তথা প্রগতিশীলতার স্বপ্ন। সাহিত্য-কীর্তি, ইতিহাস-চেতনা ও দার্শনিকতা ॥ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডিস্ট্রেলি, উইনস্টন চার্চিলের মতো তিনি ছিলেন অসাধারণ সাহিত্যিক-প্রতিভার অধিকারী। কারান্তরালে রচিত তাঁহার ‘লেটার্জ ক্রম কাণার টু হিজ ডটার’, ‘প্লীম্প্‌টন অব ওয়ার্ল্ড হিষ্ট্রি’, ‘আত্মজীবনী’ এবং ‘ডিসকভারি অব ইণ্ডিয়া’ গ্রন্থগুলি তাঁহার সাহিত্য-কীর্তি, ইতিহাস-চেতনা ও দার্শনিকতার অবদান-রূপে ভাস্বর হইয়া আছে। ছ শিল্পার কাণ্ডারী ॥ তিনি ছিলেন উত্তাল জন সমুদ্রের তঁহার কাণ্ডারী। তাহা ছাড়া, এমন হুনিপূর্ণ বাগ্মিতাও বিশ্ব-রাজনীতির ক্ষেত্রে বিরল-দৃষ্ট। বিশ্ব-শান্তির মহান প্রবক্তা ॥ বিশ্ব-শান্তির সমতান প্রবক্তা নেহরু বলিয়াছিলেন—‘লজ্জার কথা! এতদূর এগিয়ে এসেও আমরা মাটির নিচ হর খুঁজছি, বিঘবাপ্প থেকে বাঁচার ভুলে ইত্বরের মতো আশ্রয় গড়ছি।’ নেহরুর আশ্রয় করিয়া স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত আইনস্টাইন বলিয়াছিলেন—‘আমাদের একমাত্র ভরসা তুমি। তোমার পদচিহ্ন আগামী কালের পরিণাম কক্ষপথ।’ উপসংহার ॥ নেহরুর সেই পদচিহ্ন যেন আগামীকালের গুণিণী মুছিয়া না কেলে।

ভারতের একজন-স্বাভাৱ প্রধানমন্ত্রী

২৫.

## দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

সূচনা ॥ পরধীন ভারতে জাতির পূর্বদর ঠিকইয়া যিনি তাহাদের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য পরিচালিত করিয়াছিলেন, তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। কল, পরাধীনতার বন্ধন-মোচনের লক্ষ্য হইল সমাজত, আবির্ভাব ॥ চিত্তরঞ্জনের আবির্ভাবের প্রাকালে বিদ্যুৎ যুগলজি ধরিয়াছিল নৈরাজ্যবাদের পথ। এমন সময় আসিলেন চিত্তরঞ্জন, স্বতন্ত্রতা ধরিলেন নেতৃত্ব দাল, পথপ্রদ যুব সমাজকে দিলেন সুনির্দিষ্ট পথ-নির্দেশ। বংশ-পরিচয় ॥ জন্ম ১৮৭০ সালের ৫ই ১১-ভদ্র। পিতা ভুবনমোহন দাস, মাতা স্ত্রীমণি দেবী। প্রাথমিক শিক্ষার পর চিত্তরঞ্জন ভবানীপুরে লণ্ডন মিশনারী স্কুলে ভর্তি হইলেন। ১৮৮৬ সালে এন্ট্রান্স পাস। ১৮৯০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক হইয়া তিনি বিলাতে যান। কিন্তু রাজনৈতিক মতবাদের জন্ত আই. সি. এস. পরীক্ষা দিবার অক্সমতি না পাইয়া তিনি ১৮৯৪ সালে ব্যাবিস্টারি পাস করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং কলিকাতা হাইকোর্টে আইনের ব্যবসায় শুরু করিলেন। ছাত্র-জীবনে কৃতিত্ব ॥ ছাত্র-জীবনেই চিত্তরঞ্জন অসাধারণ বাগ্মিতায় এবং সাংগঠনিক প্রতিভায় ছিলেন অনন্ত। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে সদস্ত-পদপ্রার্থী লাকডাই নোরসী সম্পর্কে পার্লামেন্ট-সভায় জন ম্যাকলিনের দৃঢ়া মন্তব্যের প্রতিবাহে তিনি



তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ডকে সভাপতি করিয়া বিলাতে যে অরণীয় সভার আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহাতে সমগ্র ব্রিটিশ জাতি শুভিত হইয়া যায়। কর্ম-জীবনে কৃতিত্ব ॥ তাঁহার বারিস্টারিতে মুরারিপুত্রের বোমার মামলার শ্রীঅরবিন্দ নিগম প্রমাণিত হইয়া মুক্তিলাভ করেন। দেশ সেবায় চিত্তরঞ্জন ॥ চিত্তরঞ্জন এবং তাঁহার খ্যাতি, প্রতিপত্তি এবং ঐশ্বর্য—সমস্ত ভাগ করিয়া কাঁপাইয়া পড়িলেন গান্ধীজী-প্রবর্তিত অহিংস আন্দোলনে। চিত্তরঞ্জন হইলেন জনগণের মনের অধিনায়ক—সকলের প্রিয় 'দলবন্ধু'। এই সময় বিলাত হইতে কিরিয়া আশিলেন দেশ-সেবীর সুভাষচন্দ্র। দেশবন্ধু ও দেশ-সেবীর মিলন হইল। এমন সময় স্বৈরাচারী শাসক দেশবন্ধুকে হেপার দবিল। কারামুক্তির পর কংগ্রেসে মতান্তর উপস্থিত হওয়ায় তিনি গঠন করিলেন 'স্বাভা দল'। তাঁহার সম্পাদিত 'করওয়ার্ড' পত্রিকায় ইংরেজদের স্বৈর-শাসনের বিরুদ্ধে গর্জন করিয়া উঠিল তাঁহার লেখনী। ১৯২৪ সালে 'ক্যালকাটা ইউনিমিটাল আক্ট' বিধিবদ্ধ হয়। চিত্তরঞ্জন প্রথম মেয়র নির্বাচিত হইলেন। ১৯২৫ সালে হইলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতি। মহাপ্রয়াণ ॥ অতিরিক্ত পরিশ্রমে কল তিনটি গুরুত্বক্ৰমে অসুস্থ হইয়া পড়েন। ১৯২৫ সালের ১৬ই জুন শৈশব-শরৎ দাঙ্গা—এ তিনি পরলোক গমন করেন। কাব্য-সাধনায় চিত্তরঞ্জন ॥ বাংলা কাব্যে চিত্তরঞ্জন প্রতিভার অমূল্য স্বাক্ষর বাসিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কাব্যগ্রন্থ : 'মালক', 'মালক', 'অন্তর্যামী', 'কিশোর কিশোরী' ও 'সাগর সংগীত'। কাব্য-কীর্তির স্বীকৃতি-স্বরূপ ১৯১৫ সালে তিনি বীকিপুর বঙ্গসংস্কৃতি সম্মানে লাভ করেন সভাপতির পদ। উপসংহার ॥ দেশকে ভালোবাসিয়া এই মহা ভাগী মহানায়ক সমস্তই দান করিয়া ছিলেন, অবশিষ্ট ছিল তাঁহার প্রাণ। মৃত্যুর শবে ক বিফল রবীন্দ্রনাথ তাই শোক নিবদন করিলেন :

‘এনেছিল মাঝে কবে মৃত্যুহীন প্রাণ।

মরণে তাহাই ভূমি করে গেলে দান ॥’

২৬.

শ্রী অরবিন্দ

সূচনা ॥ মহাভারত শ্রীঅরবিন্দ ভাষ্যের আধ্যাত্মিক সাধনার মূর্ত বিগ্রহ। শ্রীঅরবিন্দের সাধনার ভারতব্রহ্ম গোরাবাসিত। জন্ম ও বংশ-পরিচয় ॥ ১৮ই অক্টো, ১৮৭২। পিতা কৃষ্ণবন দোষ, মাতা রতনারায়ণ বহুর কন্যা স্বর্ণলতা দেবী। শিক্ষা-ভাবন ॥ সাত বছর বয়সে শিকশাভাষে বিলাতযাত্রা। সেখানে উচ্চ-শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া আই সি. এস. পরীক্ষায় সাকল্য, কিন্তু অর্ধাৎ রাহণ-পরীক্ষায় অগ্রপস্থিতর অন্ত সরকারী চাকরি লাভে ব্যর্থ। অদেখে প্রত্যাভর্তন। কর্ম-জীবন ॥

১৮৯৩ সালে বরোদা রাজ্যের শিক্ষাবিভাগে কর্মগ্রহণ। কলিকাতায় আগমন। 'বন্দেমাতরম' পত্রিকা সম্পাদনা। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পটভূমিকার বিপ্লব-বাণের মন্তোচ্চারণ। কারাবরণ। মুবারিকুব বোমা মামলার প্রধান আসামী। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনর ব্যারিস্টারিতে নির্দােষ প্রমাণিত। পুলিশের তীক্ষ্ণদৃষ্টি এড়াইয়া ব্রিটিশ-শাসিত ভারতের মুক্তিকা হইতে অস্থগ্ন। নূতন সাধনা। তদানীন্তন কংগ্রেসী উপনিবেশ পণ্ডীচেরীতে ভারতের মুক্তির জন্য আধ্যাত্মিক সাধনা। দেশ বিদেশের বহু সাধকের আগমন। পণ্ডীচেরীতে অশ্রম প্রতিষ্ঠা ও লেহাবসান। উপসংহার। শ্রী অরবিন্দ ভারতীয় আধ্যাত্মিক সাধনার নূর বিগ্ৰহ। তাঁহার সাধনাকে ববীন্দ্রনাথের স্বীকৃতি দান—'অরবিন্দ, ববীন্দ্রের ল.হা নমস্কাব'।

● ভারতের শ্রী অরবিন্দ

২৭.

## আমার প্রিয় উপন্যাস : পথের পাঁচালী

সূচনা ॥ অমাব পিয় উপন্যাস বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী'। উপন্যাসখানি ভাবেব কোমল সুষমাঃ এবং ভাষার অপকল্প মাধুর্যে আমার মনোহরণ করিয়াছে। প্রিয় হইবার কারণঃ কাহিনী ॥ 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের কাহিনীর সৌন্দর্য তুলনাবহিত। একটি শিশুর জীবনে তাহার পারপার্শ্ব কল্পনার বণ্ডে রঙীন হইয়া দেখা দিয়াছে। পল্লী-প্রকৃতির স্নিগ্ধায়ায অবগাহন করিয়া কল্পনার রঙে বিচিত্র সুষমায় মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে ইহাব অনবচ্চ কাহিনী। চরিত্র ॥ অতীত স্মৃতির বেদনাতির মতে ইন্দর ঠাকরুণ, হবিহরের প্রথম যৌবনে যে তাহার বাস্তবচিহ্ন যকের মতো আগলাইয়া বসিয়াছিল, সর্বজন্মের আগমনের পর তাহার আব মাধা স্তম্ভিবার মতো স্থান বাহিন না। হবিহব সংসারী হইয়াও তাহার বিষম-বুদ্ধিহীনতা এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাহার কল্পনা প্রবণতা, সর্বজন্মাব অতিবিক্ত সাংসারিকতা—এই পটভূমিতে দুর্গা যেন নিশ্চিন্দপুরের পল্লী-প্রকৃতিবই একটি অনবচ্চ প্রকাশ। আর অপু তাহার কোতুলি দুইটি চোখ মোলিয়া ভক্তিকের ক্ষুধার আগ্রহে চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছে, পরম বিষয়ে মুগ্ধ হইয়াছে। শেষে তাহার সেই কল্পনার সাম্রাজ্য হইতে তাহাকে চলিয়া যাইতে হইয়াছে। একলেই চলিয়া গেল, যাইতে পারিল না শুধু দুর্গা। অপু তাহাকে বড় হইয়া বেলগাডি দেখাইবে কথা দিয়াছিল। তাহার সেকথা সে রাখিতে পারে নাই। তাহার পূর্বেই দুর্গা পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল। উপসংহার ॥ কিন্তু 'পথের পাঁচালী'র সৌন্দর্য লুকানো বহিয়াছে নিশ্চিন্দপুরের স্নিগ্ধ শীতল আকাশে, শ্রামল পল্লী প্রকৃতির গোপন মণিকোঠায় ॥

● তোমার গড়া কোন বিখ্যাত লেখকের বই

● তোমার প্রিয় গ্রন্থ

## বাংলার লোক-সাহিত্য

**সূচনা ॥** লোক-সাহিত্যেই পাওয়া যায় জাতির হৃদয়ের অন্তরতম পরিচয়। বাংলার লোক-মানসের সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনার অপরূপ পসরায় সাজান হইয়াছে তাহার লোক-সাহিত্যের সোনার তরী। শত উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া পদ্মা-মেঘনা-ভাগীরথী-মহানন্দা-ইছামতীর স্রোত বাহিয়া সেই সোনার তরী আসিয়া ভিড়িয়াছে বর্তমানের উপকূলে। **বাংলার লোক-সাহিত্যের পরিচয় ॥** তাহার শিবায়ন-মকলকাব্যে, যাত্রা-পাঁচালী ও কবিগানে, বাউল-ভাউয়ালি-জারি-সারি-মুশিলা ও কীর্তনের গানে বাঁচিয়া রহিয়াছে ফুলুরা-খুলনা, বেহলা-লখীন্দর, কালু-লখা, মেনকা-উমা, মহুয়া-মলুয়া, লীলা-কহু, সোনাই-কাজলরেখা এবং রাধা ও কৃষ্ণ। ইহাদের আশ্রয় করিয়া বাঙ্গালী বসে কাঁদিয়াছে, কোথাও তাহার তুলনা নাই। সেই রূপস্বস্তির মাস্তা-কাজলে অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে তাহার ব্রতকথা, রূপকথা ও ছেলে-ভুলানো ছড়াগুলি। **শ্রেণী-বিভাগ ॥** বাংলার লোক-সাহিত্যকে অসংখ্য শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় : শিশুসাহিত্য, মেয়েলি ব্রতকথা, ধর্ম-সাহিত্য, পল্লী-সাহিত্য, সভা-সাহিত্য, ইতিবৃত্তমূলক সাহিত্য ও প্রবচন-সাহিত্য। **উপসংহার ॥** বাংলার লোক-সাহিত্য হিন্দু-মুসলমানের বোধ সম্পত্তি। কৃত্রিম দেশ-বিভাগের ফলে সেই লোক-সাহিত্যও আজ বিখণ্ডিত। এপারে কাঁদিতেছে ফুলুরা-খুলনা, ওপারে কাঁদিতেছে মহুয়া-মলুয়া-কাজলরেখার লল।

বাংলার পল্লী-সাহিত্য

## বিজ্ঞান-সাধনার বাঙ্গালী

**সূচনা ॥** বাংলাদেশ শ্রাব-প্রবণতার দেশ, অন্ধ-বিশ্বাসের দেশ। এতদিন তাহার বিজ্ঞান-চর্চা ছিল দৃষ্টিভ্রম। আধুনিক যুগ : বাঙ্গালীর বিজ্ঞান-সাধনা ॥ বিজ্ঞান-ব্রতী যুরোপের সম্পর্কে তাহার বিজ্ঞানের অচলায়তনের কদম্বার তাকিয়া গেল। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানচর্চার অসংখ্য মানসিকতা গড়িয়া উঠিল। **আচার্য জগদীশচন্দ্র ॥** বিজ্ঞানের অনড় সিংহদ্বারে প্রথম করাঘাত হানিলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র। জড় ও চেতনের স্পর্শকাতরতা, উদ্ভিদের প্রাণ-স্পন্দন এবং বিনাভারে বার্তা-প্রেরণের সম্ভাব্যতা তাঁহারই আবিষ্কার। বহু-বিজ্ঞান মন্দির ॥ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বহু-বিজ্ঞান মন্দির হইল বাঙ্গালীর বিজ্ঞান-সাধনার প্রেষ্ঠ পীঠস্থান। **আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ॥** আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র আবিষ্কার করিলেন মার্জারিয়াস নাইট্রেট। **সত্যেন্দ্রনাথ**

বহু, মেঘনাদ সাহা ও অন্যান্য বিজ্ঞানীগণ ॥ আচার্য জগদীশচন্দ্রের শিষ্যদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ বহু ও মেঘনাদ সাহার নাম সর্ববিদিত। সত্যেন্দ্রনাথ বহুর নাম আইনস্টাইনের নামের সহিত যুক্ত। পরমাণু-গবেষণায় মেঘনাদ সাহার অবদান অস্বরণীয়। অন্যান্য বাঙ্গালী বিজ্ঞানীদের মধ্যে বি. ডি. নাগচৌধুরী, দেবেন্দ্রনাথ বহু, সহায়রাম বহু, বিভা চৌধুরীর নাম সর্বাগ্রে অস্বরণীয়। উপসংহার ॥ স্বাধীন ভারতে বাঙ্গালী বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানের নতুন নতুন দারোদ্যাটনের সাধনায় আজ নিমগ্ন ॥

বাঙ্গালীর বিজ্ঞান-সাধনা

৩০.

## বাঙ্গালীর বাণিজ্য-সাধনা

সূচনা ॥ বাংলাদেশ শিল্প ও বাণিজ্য-সম্ভাবনাময়। তাহার কৃষি-প্রান্তরে, লোহ ও কয়লাখনিতে সম্পদের প্রাচুর্য, নদীগুলিতে জলবিদ্যুতের প্রচুর সম্ভাবনা। তবুও বাঙ্গালী শিল্প-বাণিজ্যে অনগ্রসর জাতি। বাঙ্গালীর শিল্প-বাণিজ্যের ইতিহাস : প্রাচীন যুগ ॥ ইতিহাস সাক্ষী, ধনপতি-চাঁদসদাগর-শ্রীমন্ত সদাগর-বিহারী দত্তের বাংলাদেশ কোনকালেই শিল্প-বাণিজ্যে পশ্চাৎগত ছিল না। অতি প্রাচীনকালে তাহার বাণিজ্য-সাধনাব শ্রেষ্ঠ বন্দর তাম্রলিপ্ত গড়িয়া উঠিয়াছিল। আধুনিক যুগ ॥ তারপর সপ্তগ্রাম, সপ্তগ্রামের পর হুগলী, হুগলীর পর কলকাতা। যুরোপীয়, পার্শী, মাড়োয়ারী, চীনা, পাঞ্জাবী ব্যবসায়ীদের কাছে বাঙ্গালী আজ পরাজিত—নিজভূমে পরবাসী। পরাভবের কারণ ॥ বাঙ্গালীর ব্যবসা-বৃদ্ধির অভাব, শ্রমবিমুখতা এবং শিক্ষার ক্রটি। কৃষি ও শিল্পের অবনতি, বিজ্ঞান-চর্চার অভাব, দুঃসাহসিকতার অভাব, মূলধনের অভাব, স্বাস্থ্যহীনতা ও অতিরিক্ত ভাব-প্রবণতা। ত্রুটি-মোচন ॥ শিক্ষার সংস্কার ও সমবায়ের মাধ্যমে পুঁজি সংগঠন চাই। অতিরিক্ত উৎসব-উচ্ছ্বাস নয়, ভাব-প্রবণতা নয়, চাই উপযুক্ত বৈষয়িক শিক্ষা। বাঙ্গালীর নব-জাগরণ ॥ দেশবিভাগের পর জীবন-সংগ্রামের মধ্য দিয়া বাঙ্গালীর নব-জাগরণ সম্ভব হইয়াছে। ঘরছাড়া বাঙ্গালী আজ শ্রমবিমুখতা পরিহার করিয়া বাণিজ্যে দুঃসাহসিকতা অর্জন করিয়াছে। উপসংহার ॥ আজ বাঙ্গালী তাহার বহুকালের পরিত্যক্ত মধুকর-সমুদ্রিঙাকে নবযুগের পণ্যসম্ভারে সাজাইবে। সে দেশ-দেশান্তরে পূর্ব-পরিচয়ের নূতন ধরিয়া গিয়া প্রশ্ন করিবে—‘দেখো তো চেয়ে আমারে তুমি চিনিতে পারো কিনা?’

● বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্যী:

● বাণিজ্যে লক্ষ্যীভূত

## বাংলা মধ্যবিত্তের জীবন-সংকট

**সূচনা ॥** ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে মধ্যবিত্ত সমাজের জ্ঞান-সাধনা, কর্ম-সাধনা ও ভাব-সাধনার রচিত হইয়াছে ভারতের উজ্জল ইতিহাস। আজ নিরন্তর নির্মম পরিহাসে তাহারা চরম সংকটের সম্মুখীন। **মধ্যবিত্ত সমাজের ইতিহাস : উদ্ভব ও ক্রমপরিণাম ॥** মধ্যবিত্ত সমাজ ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার সৃষ্টি, বিদেশী শিক্ষা ও সভ্যতার কলসে আকৃষ্ট হইয়া ইহারা স্বদেশ ও সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়াছিল এবং ইংরেজ-আত্মগতাকেই সর্বমুখে মনে করিয়াছিল। পরে মনস্তাপে ইহারা উচ্চারণ করিল—‘অ’শার ছলনে তুলি কি কল লভিছ হার, তাই ভাবি মনে।’ **সমাজের নব-বিস্তার ও মধ্যবিত্ত সমাজ ॥** কালক্রমে ইংরেজ বিদ্যায় গ্রহণ করিল। নতুন সমাজ-বিস্তার ইহাদের জীবন-সংকট মৃত্যু-যন্ত্রণার রূপ পরিগ্রহ করিল। ধনিক-শ্রেণী ও শ্রমিক-শ্রেণী—এই শ্রেণী-বিস্তার শ্রমিক-শ্রেণীর দিকেই তাহাদের সমর্থন প্রসারিত। তবু ইহারা ঠিক শ্রমজীবী নয়, বুদ্ধিজীবী-সম্প্রদায়। **সংকটের রূপ ॥** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, পঞ্চাশের মহাস্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দেশবিভাগ তাহাদের মেরুদণ্ড ভাঙিয়া দিয়াছে। কিন্তু স্বাধীনতার কাছে তাহারা সর্বাধিক প্রতারিত। ইচ্ছাবাহি ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোহিত। কিন্তু স্বাধীন ভারতের সমাজ-মন্ডলের সমস্ত বিষ পান করিয়া আজ তাহারা নীলকণ্ঠ। ডাক্তার, শিক্ষক, আইনজীবী, ইঞ্জিনিয়ার, সাধারণ ব্যবসায়ী, দোকানদার—সকলেই সমাজের উপেক্ষার পাত্র। **সংকট-মুক্তির উপায় ॥** অর্থভিত্তিক সমাজে অর্থ-সংকটকে জয় করিবার জন্য মধ্যবিত্ত-সমাজকে প্রয়াস চালাইতে হইবে। সাধারণ শিক্ষার মোহ ও জ্ঞান সামাজিকতা বর্জন করিয়া সমবায়িক প্রয়াস, নারী-প্রগতি, সরকারী আত্মকল্যাণ ইত্যাদির মাধ্যমে এই সমাজের সংকট-মুক্তি সম্ভব। **উপসংহার ॥** মধ্যবিত্ত সমাজ বঁচার জন্য আজ প্রকৃতই সংগ্রামশীল। সকল সংগ্রামে সে জয়ী হইয়াছে। এই সংগ্রামেও তাকে জয়লাভ করিতে হইবে ॥

● মধ্যবিত্তের দশ

## জগৎ জুড়িয়া একজাতি শুধু সে জাতির নাম মানুষ-জাতি

**সূচনা ॥** মানুষ মানুষই। তাহাদের কোন জাতিভেদ নাই। মানুষ ঈশ্বরের সৃষ্টি, জাতি মানুষের ॥ রাষ্ট্রীয় ও ভৌগোলিক সীমানা বা শালা-কালো-হলুদ গায়ের রঙের ভিত্তিতে পৃথিবীতে কত জাতি-ভেদ। কিন্তু মানুষ বিধাতার সন্তান। কাজেই, বাহিরের এই ভেদভেদ মিথ্যা। ‘সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।’ **বিবেকের পরিণাম ॥** কৃত্রিম ভেদভেদের প্রাচীর নির্মাণ করিয়া মানুষ আজ আত

জাতি-বিষয়ের ব্যাধিতে ভুগিতেছে। মানুষ আজ মানুষের রক্ত লইয়া হোলি খেলিতেছে। তাহার এতদিনের সভ্যতার বৃকে ছুরিকাঘাত করিয়া সে ছিন্নমস্তার মতো আজ আপন রুখির-পানে উন্নত। জাতি-বিষয়, ধর্ম-বিষয় ও বর্ণ-বিষয়ের নির্লজ্জ প্রকাশে আজ মানুষ তাহার মনুষ্যত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছে। ভারতের জাতি-ভেদ প্রচার বিরুদ্ধে অপমানের ধূলিশয্যা হইতে লাহিত মানবতা আজ উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে আমেরিকা ও দক্ষিণ-আফ্রিকার অশ্বত্থকায়া। উপসংহার ॥ জানি না, আজ আমেরিকা ও দক্ষিণ-আফ্রিকা ইতিহাসের বিচারশালায় কি জবাব দিবে। তবে একদিন এই অবমানিত মানবতার কাছে নতজাহ্ন হইয়া ক্ষমাভিক্ষা করিতে হইবে মানবতার শত্রু এই বর্ণ-বিষয়ীদের। সেদিন তাহাদের স্বীকার করিতে হইবে : 'কালো আর ধলো বাহিরে কেবল ভিতরে সবারই সমান রাঙা।'

১৭১ উপরে মানুষ সভ্য, তাহার উপরে নাই।

৩৬.

### ব্যক্তি ও জাতির জীবনে আদর্শের ভূমিকা

সূচনা ॥ বিংশ শতাব্দীর অপরূপ-বেলায় আজ সত্য-সত্যই মানবতার আদর্শের কবরশয্যা রচিত হইতে চলিয়াছে। সমাজের সর্বত্রই আজ আদর্শহীনতা ও অসাধুতার বিজয়-উল্লাস। মানুষের ন্যায়বোধ, নীতিবোধ, আদর্শ ও সত্যতা আজ ধূলিনুষ্ঠিত। সভ্যতার চরম শিখরে আরোহণ করিয়া মানুষ এভাবে দেউলিয়া হইয়া বাইবে, কে ভাবিয়াছিল? সমাজ-গঠনের মূল উদ্দেশ্য ও সত্যতা ॥ মানুষ বড় আশা লইয়া একদিন সমাজবদ্ধ হইয়াছিল। মানুষের সভ্যতার উপর আস্থা রাখিয়াই সে সমাজে আসিয়া ঘর বাধিয়াছিল। কিন্তু আজ তাহার সেই বিশ্বাস দেউলিয়া হইয়া গিয়াছে। অসং ব্যক্তির সমাজের শত্রু ॥ আজ বন্ধুর ছদ্মবেশে মানবতার শত্রুরা বৃত্তকু ও রোগার্তের হাতে অমৃতের নামে বিষপাত্র তুলিয়া দিতেছে। ইহারা নৃশংসতার দিক হইতে মানবতার নৃশংসতম শত্রু বাহারা, সেই তৈমুরলঙ্গ, চেঙ্গিস খাঁকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। বর্তমানকাল তাহাদের ক্ষমা করিতে পারে, ইতিহাস কোনদিন ক্ষমা করিবে না। অন্ধকারে আলো ॥ মানব-জাতির এই দুর্দিনে আজ কোথায় গেলেন বুদ্ধ, যীশু, খ্রীষ্টচৈতন্য? তাহারা আজ সভ্যতার এই মধ্যাহ্ন-প্রহরের অন্ধকারে আলো দেখাইয়া মানব-জাতিকে পাপমুক্ত করুন। উপসংহার ॥ স্বার্থান্ধ মানুষ আজ বুকে না যে, অসংপথে সাময়িক জয় বা ক্ষুদ্র জয় হইতে সম্ভব; বৃহত্তর জয় কিছুতেই সম্ভব নয়। আর, অসংপথে জয়লাভের আত্মবিকারের হাত হইতে নিষ্কৃতি কোথায়? অন্তঃস্ব "আবিয়াবির্মএধি।" হে আলোর দেবতা, তুমি এসো। পাপমোচন কর এই পঙ্কিল পৃথিবীর।

## দশে ঘিলি করি কাজ হারি জিতি নাই লাজ

**সূচনা ॥** একতাই শক্তি। একক মানুষ বড় একা, দুর্বল এবং অসহায়। একাকী সে কতটুকু কি করিতে পারে? কিন্তু সংঘবদ্ধ হইলে তাহারা অসীম শক্তিশ্বর। তখন তাহারা কত অসাধ্য সাধন করিতে পারে। একতা তাই অসাধ্য-সাধনের হাতিয়ার। আদিম মানব ও ঐক্য-সাধনা ॥ মানব-সভ্যতার সাধনাই ঐক্যের সাধনা। অরণ্যচারী মানব স্থাপন-সংকল্পতার মধ্যে যখন একা ছিল, তখন সে ছিল অসহায় ও ভয়ানক। কিন্তু মানুষ ক্রমে তাহার ঐক্য-শক্তির সন্ধান লাভ করিল। তখন হইতেই প্রকৃতির রাজ্যে সে দুর্জয় হইয়া উঠিল। ঐক্য-সাধনা ও মানব-সভ্যতার বিকাশ ॥ আজ বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার গগনচুম্বী ইমারতের দিকে চাহিয়া আমরা বিস্মিত চই। কিন্তু ইহা তো মানুষের সেই ঐক্য-শক্তিরই সমারুত যোগফল। মানুষের ঐক্য-শক্তির জোরে আজ পৃথিবী সুন্দর ও বাসযোগ্য হইয়াছে। ‘একত্রে বরেন্য তুমি’ ॥ সৃষ্টির সেই আদিম প্রভাতে মানুষ ঐক্যবদ্ধ না হইলে কবে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইত। তাহার সমাজ, রাষ্ট্র ও সভ্যতার বিকাশ কখনই সম্ভব হইত না। তাই কবি মানুষকে প্রদা জানাইয়া বলেন—‘একত্রে বরেন্য তুমি, শরণ্য এককে, আশ্বাস আশ্রয়’ উপসংহার ॥ সংঘ-শক্তির পরাভবও গৌরবজনক। ইহাতে ব্যক্তির দায়িত্ব থাকে না। তাই আজ পৃথিবীতে নিপীড়িত জনতা সংঘ-শক্তিতে শক্তিমান হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেছে। এতদিনে সংঘ-শক্তির মধ্যে তাহারা পাইয়াছে দুর্জয় শক্তির সন্ধান। তাহাদের রোদ করা ভূঃসাধ্য ॥

‘দশের ১০০ দশকে ১০০০, ১০০০০ জনের ১০০০০০’

## যে সাহে সে রাহে

**সূচনা ॥** সহিষ্ণুতাই এ ভগতে অস্তিত্ব-রক্ষার নিতুল উপায়। দৈর্ঘ্য-সহকারে তাহারা ভগতের দুঃখ-গষ্ট সহ্য করিয়া টিকিয়া থাকিতে পারে, জয়মালা শেষ পর্যন্ত তাহাদের ললাটেই ভোটে। দৈর্ঘ্য ধারণ করিলে জীবন-যুদ্ধে জয়লাভ সম্ভব হয়। হুঃখমগ্ন পৃথিবীতে সহিষ্ণুতা ॥ এই সংসারে দুঃখ আছে, বিপদ-বাধা আছে, আছে লাজনা ও অপমান। তাহা হইলেই মানুষের মনে আসে আলা-নিরাশার দন্দ। ইহাতে তাদিহা পড়িলে মানব-কাবনের ঘ ট পরাজয়। ‘দৈর্ঘ্য ধর’ দৈর্ঘ্য ধরো, বাধো বাধো বুক।’ লহনশীলতাই টিকিয়া থাকিবার উপায় ॥ বন্যবিলসত বৈজ্ঞানিক ডারউইনের

বিবর্তনবাদ বা অভিব্যক্তিবাদের সারকথাই হইল সহনশীলতা। এই সহনশীলতার সাহায্যে যে প্রাণী পারিপার্শ্বিকের সহিত অভিযোজন করিতে পারিয়াছে, কেবলমাত্র তাহারাই পৃথিবীতে টিকিয়া থাকিতে পারিয়াছে। অবশিষ্টই ধরাপৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। **সহিষ্ণুতার শক্তি** ॥ সহিষ্ণুতা জীব-জগতের দুর্জয় অস্ত্র। ইহা শত্রুরকে করে ঘাতসহ, আত্মাকে করে মহাশক্তির। **সহনশীলতা ও জীবন-সংগ্রাম** ॥ জীবনের পথ কুসুমাতীর্ণ নয়, সংগ্রামময়। সহনশীলতা সেই সংগ্রাম-জয়ের মহাস্ত্র। **সহনশীলতার জয়** ॥ পৃথিবীতে বৃদ্ধ, যৌৱণী, মহম্মদ, খ্রীষ্টচর্চকৃৎ হুংখের বারিধি উত্তীর্ণ হইয়া মাহুয়ের জন্ত অমৃতের সন্ধান করিয়াছিলেন। শেষ পর্যন্ত সহনশীলতারই জয় হইয়াছে। **উপসংহার** ॥ মহাত্মা গান্ধীর অহিংস সংগ্রাম আতিকে সেই শক্তির সন্ধান দিয়াছে। সমগ্র পৃথিবী সেই শক্তিতে আত্ম বিশ্বাস অর্জন করিয়াছে ॥

● সহিষ্ণুতা বা সহনশীলতা

৩৬.

## এ জগতে হায় সেই বেশী চায় আছে যার ভুরি ভুরি

**সূচনা** ॥ মাহুয়ের ঐশ্বৰ্যের আকাজক্ষা অন্তহীন। যাহার যত আছে, সে তত চায়। কাজেই, নিজের ধর ঐশ্বৰ্যে ভরিয়া তুলিতে তাহাকে অপরের ঐশ্বৰ্যে হাত দিতে হয়। কিন্তু শক্তিমানের ঐশ্বৰ্যে হাত দিবার শক্তি তাহার নাই। তাই ঐশ্বৰ্যবানরা গরীবের সম্পদ বলপূর্বক অপহরণ করিয়া নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধি করে। **ধনিকের ধনবৃদ্ধির উপায়** ॥ স্নেহময়ী মাতা ধরিত্রী তাঁহার সন্তানের আগমনের পূর্বেই তাহার খাদ্য-বস্ত্র-বাসভূমির আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সন্তানদের মধ্যে যাহারা শক্তিমান ও বুদ্ধিমান, তাহারা অপরের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া তাহাদের ক্ষুধার মুখে ঠেলিয়া দিয়াছে এবং অপর পক্ষে নিজেদের ঐশ্বৰ্যের ইমারত গড়িয়া তুলিয়াছে। **দরিদ্রের দারিদ্র্যের কারণ** ॥ আজ কে জবাব দিবে, পৃথিবীর বিশাল জনসমষ্টি অতুল কেন? তাহাদের মুখের গ্রাস কে কাড়িয়া লইয়াছে? তাহাদের ধরের সম্পদের গোঁজে ধনিকের অট্টালিকায় প্রবেশ করিতে হইবে। দরিদ্রের সম্পদেই ধনিকের গগনচুম্বী অট্টালিকা ভরিয়া উঠে। **ধন-বৈষম্যের চিত্র** ॥ আজ তাই সমাজের এক শ্রেণীর মাহুয় প্রাচুর্য ও বিলাসিতায় ভোগসর্বস্ব পণ্ডতে পরিণত হইয়াছে, অল্প এক শ্রেণী দারিদ্র্যে ও হতাশায় পরিণত হইয়াছে বুকুকা-কাঁড়র আহ্বানধ্বনি আনোয়ারে। **লোভ-সর্বস্বতা** ॥ ইহার মূলে রহিয়াছে মাহুয়ের লোভ-সর্বস্বতা। সেই লোভের তাড়নায় রাজার হস্ত করে সমস্ত কাকালোর ধন চুরি।



**উপসংহার ॥** কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, মানুষ এই পৃথিবীতে বাচিবার জন্য আসিয়াছে। ‘অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।’ সর্ব-হারাদের কবিও তাই ঘোষণা করেন : ‘প্রার্থনা করো, যারা কেড়ে খায় তেজিৎ কোটি মুখের গ্রাস। যেন লেখা থাকে আমার রক্তলেখায় তাদের সর্বনাশ ॥’

‘রাজার হস্ত করে সমস্ত কাজালের ধন চুরি’

৩৭.

### ভারতের কৃষি ও কৃষক

**সূচনা ॥** স্বাধীন ইংরেজ-জাতি ভারতের কৃষিকে কামধেনুর মত দোহন করিয়া তাহাকে সব্বাস্ত্র অবস্থায় ফেলিয়া গিয়াছে। ভারতের কৃষিলক্ষী একদিন ক্ষুধার্ত বিশ্বের ক্ষুধারত্নের ত্রুত গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু অল্পপূর্ণার দেশে আসিল অন্নাতাব। **কৃষির বিপর্যয়ের কারণ ॥** ভারতের কৃষির সমস্তা মূলতঃ ত্রিবিধ : ভূমি-সমস্তা, কৃষি-সমস্তা ও কৃষক-সমাজের সমস্তা। ভারতের কৃষকদের নিজেদের জমি নাই। তাহারা অন্যের জমিতে চাষ করে। কাজেই, যাহারা জমির মালিক, জমির সহিত তাহাদের সম্পর্ক কেবল অর্ধগত। এদিকে, জমির ষড়-বিধগুণায় এবং সেচ ও সারের অভাবে উন্নত কৃষি-পদ্ধতির প্রচলন সম্ভব হয় নাই। তাহার উপর দরিদ্র কৃষক-সমাজের হাতে এদেশের কৃষির ভার ছাড়িয়া দিয়া সরকার এতদিন দেশে সহৃদয়ের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। কিন্তু জমি কৃষকদের হাতে না আসিলে এবং কৃষকদের দারিদ্র্য দূর না হইলে সেই স্বপ্ন নিফল হইতে বাধ্য। **প্রতিকার ॥** কৃষির উন্নতির জন্য অবিলম্বে মাটিতেই হাত লাগাইতে হইবে। বিশদক কর্মসূচীতে কৃষকদের হাতে জমি তুলিয়া দিয়া উন্নত কৃষি-ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইতেছে। **বর্তমান অবস্থা ॥** সম্প্রতি উচ্চ-কলনশীল বীতের সাহায্যে এবং ব্যাক ও সমবায়ের ঋণ-বর্ষণের পরিণামে কৃষির কলন-বৃদ্ধি ঘটয়াছে। তাহার উপর কৃষিপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির ফলে কৃষিপণ্যের মূল্যবৃদ্ধিও ঘটয়াছে। কিন্তু তাহার স্বকল পাইয়াছে কাহারো? যাহারা জমির মালিক, কেবল তাহারাই লাভবান হইয়াছে। **উপসংহার ॥** আর, ভারতের সেই চিরাচরিত দরিদ্র কৃষক-সম্প্রদায়, যাহারা অবর্ণনীয় দারিদ্র্যের মধ্যে কায়ক্লেশে বাঁচিয়া যোদে পুড়িয়া, জলে ভিজিয়া কল কলার, তাহারো ‘যেই তিমিরে সেই তিমিরে’। বিশদক কর্মসূচী তাহাদের সম্মুখে আশার আলো তুলিয়া ধরিয়াছে।

## ভারতের খাদ্য-সংকট

**সূচনা ॥** যে দেশ একদা অন্নপূর্ণার মতো সারা পৃথিবীর ক্ষুধারঞ্জন ত্রুট গ্রহণ করিয়াছিল, আজ সেই ভারতবর্ষ ক্ষুধার তাড়নায় অন্তরে দুয়ারে ভিক্ষুক ।। ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস ! ভারতে খাদ্য-সমস্যার মূলগত রূপ ॥ মাহুকের স্বপ্ন প্রাণ-ধারণের জন্য যে পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করা উচিত, ভারতের মানুষ প্রায়ই তাহার কম পায় । কাজেই, এমনিতেই এদেশের বহু লোক অভুক্ত থাকে । যাহারা ভুক্ত, তাহারা প্রকৃতপক্ষে অর্ধভুক্তই থাকে । **ঐতিহাসিক পটভূমি ॥** বিদেশীর চক্রান্তে খাদ্যশক্তে সমৃদ্ধ ব্রহ্মদেশ, সিংহল [ শ্রীলঙ্কা ], পূর্ববঙ্গ [ বাংলাদেশ ] এবং সিন্ধু-উপত্যকা ভারতের অঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভারতে খাদ্য-সংকট ডাকিয়া আনে । **সমাধান ॥** ভারতের খাদ্য-সংকটের চারটি দিগন্ত : কৃষি, শিল্প, পরিবহণ ও জনগণ । এই চার দিগন্তের সমাধানে সংকটের প্রকৃত সমাধান আছে । **কৃষি ॥** ভারতের কৃষি এখনও দৈবাধীন । অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টিজনিত শত্রুহানি বার্ষিক ঘটনা । সেচ এবং সার প্রয়োগের দ্বারা উচ্চফলনশীল বীজকে সফল করিয়া তুলিতে পারিলে সোনা কলিবে । কিন্তু সর্বত্রই কৃষককে জমি দিতে হইবে । **শিল্প ॥** শিল্প কৃষি-উৎপাদনবৃদ্ধির যন্ত্রপাতি ও সার ইত্যাদি দিয়া কৃষিকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে পারে । তাছাড়া, শিল্পজাত সামগ্রী বিদেশে রপ্তানি করিয়া বিদেশ হইতে খাদ্য-সংগ্রহও করা যায় । **পরিবহণ ॥** সারা দেশে খাদ্য-চলাচল অব্যাহত রাখার জন্য পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতি প্রয়োজন । **জনগণ ॥** খাদ্য-সংকটের মোকাবিলার জন্য জনগণকে বিকল্প খাদ্য-গ্রহণে প্রস্তুত থাকিতে হইবে এবং জনসংখ্যাবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে । **বণ্টন-ব্যবস্থা ॥** ভারতে খাদ্য-সংকট বতর্তা প্রকৃতির সৃষ্ট, তাহার বেশী মনুষ্য-সৃষ্ট । উৎপন্ন খাদ্যের সবটা বাজারে আসে না ; তাহার বিশাল অংশ মজুতদার ও চোরাকারবারীদের অঙ্ককার গহ্বরে চলিয়া যায় । ভারতের এই কুখ্যাত বণ্টন-ব্যবস্থার পূর্ণ রাষ্ট্রীয়করণ প্রয়োজন । **উপসংহার ॥** সকলের সদিচ্ছা ও সমবেত চেষ্টায় দূর হইবে ভারতের দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা, বুড়কার হাত হইতে চিরমুক্তি ঘটিবে ভারতের ॥

● আমাদের খাদ্য-সমস্যা ও তাহার সমাধানের উপায়

● দুর্ভিক্ষ ও তাহার প্রতিরোধ

## ভারতের খরা ও বন্যা-নিয়ন্ত্রণ

**সূচনা ॥** অতিবৃষ্টি এবং অনাবৃষ্টি ভারতে প্রায় বার্ষিক ঘটনা । কলে, কৃষি-বিপর্যয়জনিত শত্রুহানি প্রায় তাহার প্রতিবছরেরই ভাগ্যলিপি । অথচ বঙ্গাঙ্গীত নদীর জলধারাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া তৃষ্ণার্ত শত্রু-প্রান্তরে পৌঁছাইয়া দিতে পারিলে খরা এবং বঙ্গাকে একই সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব । প্রাচীন ভারতের সেচ-ব্যবস্থা ॥

প্রাচীন ভারতেরও একটা নিজস্ব সেচ-ব্যবস্থা ছিল। বিশালাকার জলাশয়, কূপ, দীঘি এবং বহু-শাখাপ্রশাখায়ুক্ত খাল ছিল তাহার অঙ্গ। কিন্তু ইংরেজ-আমলে সেগুলি অবহেলায় মজিয়া গেল। ইংরেজ-আমলে সেচ-ব্যবস্থা ॥ ইংরেজ-রাজত্বের শেষার্ধ্বে ভারতের সেচ-ব্যবস্থার হাত লাগানো হয়। কিন্তু দেশবিশিষ্টতার কলে তাহার অধিকাংশই পড়ে পাকিস্তানের তাগে। স্বাধীন ভারতে সেচ-ব্যবস্থা ॥ বৃষ্টিহীন মরুভূমি এবং বস্তাবিক্ষুন্ন নদনদী লইয়া ভারত স্বাধীন হইল। খরা এবং বস্তা জয় করিবার জন্য বহুমুখী নদী-প্রকল্পগুলির হইল যাত্রা-শুরু। ভাকরা-নাঙ্গাল, হীরাবুদ বাঁধ, রাজহান খাল, দামোদর উপত্যকা, তুঙ্গভদ্রা, চমল, কুশী, গওক-পরিকল্পনা ইত্যাদি তাহার অন্তর্গত। পশ্চিমবঙ্গে ময়ূরাক্ষী, কংসাবতী ও জলঢাকা-প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত। যেখানে নদনদীর জল পৌছাইতে অসুবিধা, সেখানে নলকূপের সাহায্যে ক্ষুদ্র সেচ-প্রকল্পের রূপায়ণে হাত দেওয়া হইয়াছে। উপসংহার ॥ এইভাবে খরাপ্রবণ ও বস্তাপ্রবণ অঞ্চলকে খরা এবং বস্তার কবল হইতে রক্ষা করিয়া কসলের সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিবার জন্য নতুন প্রয়াস মূচিত হইয়াছে। এই সীমিত প্রয়াসকে আরও সম্প্রসারিত করিয়া দিতে হইবে। এইভাবে ভারতের স্বাধ-সমৃদ্ধির স্বপ্ন সার্থক হোক, সকল হোক ভারতের মৃত্তিকা এবং তাহার নদীসমূহের পুণ্য জলধারা ॥

● খরা ও তাহার প্রতিকার

৪০.

## ভারতের সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা

সূচনা ॥ প্রাচীন ভারতের সমৃদ্ধির উৎস ছিল তাহার স্বয়ংসিদ্ধ গ্রামগুলি। কিন্তু বিদেশী রাজত্ব তাহার গ্রামগুলিকে ধ্বংস করা হইল। তাহার স্বর্ণপ্রসূ শত্রুপ্রান্তর, তাহার কুটির-শিল্প রিক্ত, পরিত্যক্ত হইল। স্বাধীন ভারত বৈষয়িক উন্নতির পথে যাত্রা করিয়া প্রথমেই সেই গ্রাম-ভারতে হাত লাগাইয়াছে। সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার সূত্রপাত ॥ তাহার কর্মোদ্দীপনায় ঘুম ভাঙিতেছে ভারত-আত্মার, ঘুম ভাঙিতেছে অবহেলিত গ্রাম-ভারতের। গ্রাম ভারতের সংগঠনের স্বপ্ন ছিল মহাত্মা গান্ধীর। ১৯৫২ সালের ২রা অক্টোবর, মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিবস হইতেই তাঁতার স্বপ্নের মহাতারত রচনার যাত্রা-শুরু, ভারতের সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার মূচনা। গঠন-বিস্তার ॥ সমগ্র দেশকে সংগঠন-কার্যমুখী রূপায়ণের সুবিধার জন্য কেন্দ্র হইতে গ্রাম পর্যন্ত কয়েকটি পর্বতে বিভক্ত করা হইয়াছে : কেন্দ্রীয় পর্বত, রাজ্য-পর্বত, জেলা-পর্বত, অঞ্চল-পর্বত ও গ্রাম-পর্বত। কার্যাবলী ॥ গ্রামই এই পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দু। সেখানে বাস করিবে অন্ততঃ পাঁচশত লোকের একশতটি পরিবার। সেখানে থাকিবে পানীয় জলের সুব্যবস্থা, সেচ-ব্যবস্থা, গৃহনির্মাণের স্থান, গোচরণ-ভূমি, জালানী কাঠের বন, প্রাথমিক বিদ্যালয়, পাকা রাস্তা, কৃষির ব্যবস্থা এবং কৃষি-মজুর, কুটির-শিল্পী, গৃহনির্মাণ-শিল্পী,

বণিক, পরিবহণ-কর্মী, দোকানদার, শিক্ষক, স্বাস্থ্যরক্ষার কর্মী, নাগিত, মুচি, শাভিরকী-কর্মী ইত্যাদি বিভিন্ন বৃত্তির পরিবার। অঞ্চল-কেন্দ্রে থাকিবে বাজার, বিদ্যালয়, ছোট চিকিৎসা-কেন্দ্র, কৃষি-কার্যালয়, ডাকঘর, পরিবহণ-কেন্দ্র, প্রমোদ-গৃহ, পশু-চিকিৎসালয় ও আদর্শ গোলার। অর্থের সংস্থান ॥ অর্থের সরবরাহ আসিবে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের নিকট হইতে ৩ : ১ আনুপাতিক হৈতে প্রবাহে। সমবায় হইবে এই সংগ্রামের বড় হাতিয়ার। উপসংহার ॥ এতদিনে ভারতের সুখ গ্রাম-দেবতা জাগিতেছেন। এতদিন আমরা গ্রাম-দেবতাকে অবজ্ঞা করিয়া যে পাপ করিয়াছি, আজ তাহার প্রায়শ্চিত্ত শুরু হইয়াছে। লুপ্ত-গৌরব গ্রামকে আজ তাহার সমস্ত কিরাইয়া দিতে হইবে। ‘অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু’ ॥

গ্রামীণ সমাজের উন্নয়ন

৪১.

## সাম্প্রতিক পণ্যমূল্য-বৃদ্ধি ও গণ-জীবন

সূচনা ॥ দ্রব্যমূল্য-বৃদ্ধির চাপে আজ জনগণের প্রায় নাভিস্থাস উঠিয়াছে। একদিকে আকাশস্পর্শী মূল্যরেখা, অন্যদিকে জনগণের ক্রয়শক্তির সীমাবদ্ধতা। উভয়ের মধ্যে সংগতি-স্ব পনের চেষ্টায় চাপে জমিতেছে ব্যর্থতার কালি। দ্রব্য-মূল্যবৃদ্ধির কারণ ॥ পৰিষ্কৃত অর্থনীতির গত পঁচিশ বছরে যোজনাব প্রয়োজনে করের বোঝা চাপানো হইয়াছে অত্যধিক। পণ্যের উপর চাপানো কর জনগণের কাঁধেই স্থানান্তরিত হয়। তাহার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে মুদ্রাস্ফীতি। সবকিছু নোট ছাপাইয়া ঘাটতি পূরণ করেন। তাহাতে টাকার মূল্য যায় কমিয়া। এদিকে, কি কৃষিতে, কি শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় নাই। অথচ জনসংখ্যা ক্রমাগত উধামুখী। অর্থাৎ, চাহিদা বাড়িয়াছে, কিন্তু যোগান বাড়েনা। অবধাবিতভাবে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্ত্যান্ত প্রধান কারণ ॥ ভারতে বড়বে দুইবার পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পায় : একবার বাজেট ঘোষণার পূর্ব মুহূর্তে ; আর একবার ফসল বুনবার মরশুমে। কিন্তু বাজেটে যে হারে কর বসানো হয়, তাহার বহুগুণে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। বাজেট-ঘোষণার মাসাধিককাল আগে হইতেই ভোগ্যপণ্য বাজার চইতে উদার হইয়া মজুতদারের গোপন কক্ষে আশ্রয় নেয়। তেমনি ফসল বোনার মরশুমে মজুতদার ও চোরাকারবারীরা সক্রিয় হইয়া উঠে। বাজারে পণ্যভাণ্ডার হুজুগ ভুলিয়া পণ্যমূল্যকে উর্ধ্বমুখী করিয়া তোলে। এ অবস্থায় পণ্য পাওয়া যায়, কিন্তু আশাতিরিক্ত উচ্চমূল্যে। উপসংহার ॥ সাম্প্রতি জরুরী অবস্থা প্রয়োগ করিয়া সরকার মুদ্রাস্ফীতি ও পণ্যমূল্য-বৃদ্ধিকে প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। মজুতদারি ও চোরা-কারবার বন্ধ করিয়া এবং উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটাইয়া সরকার পণ্যমূল্যকে স্থিতিশীল রাখিতে কৃত-সংকল্প।

পণ্যমূল্যের মূল্যবৃদ্ধির কারণ ও কলাকল

## ফুল-ম্যাগাজিন

**সূচনা ॥** শিশু-হৃদয় অদম্য গ্রাণ-প্রেরণার অফুরন্ত নিব্বার। তাহাদের বুকের মধ্যে মাথা কুটিয়া মরিতেছে কত রবীন্দ্রনাথ, কত নজরুল, কত সুকান্ত। তাহাকে প্রকাশের সুযোগ দিলে ‘ধন্য রাজার পুণ্য দেশ।’ প্রকাশের সুযোগ ॥ ফুল-ম্যাগাজিনেই ছাত্রদের নিজস্ব রচনার হাতে-খড়ি। এখানেই তাহাদের হৃদয়ের দ্বার প্রথম উন্মুক্ত হয়, এখানেই স্বপ্নভঙ্গ হয় স্থিতিময় নিব্বারের। রচনার বিচিত্রতা ॥ কিশোর-হৃদয় প্রকাশ-ব্যাকুলতায় থাকে উন্মুখ। এই সময় তাহাদের হৃদয়কে স্ফুটতার দিকে অনুপ্রাণিত করিলে তাহাদের জীবনে সোনা ফলিতে পারে। কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, ব্যঙ্গ-কবিতা, খাঁখা, ছবি, কাটুন—নানাভাবে তাহারা আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজিয়া পাইবে। **সংগঠনী ও স্বজনী-প্রতিভার বিকাশ ॥** ফুল-ম্যাগাজিন ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত, সম্পাদিত ও প্রকাশিত হওয়া উচিত। দুই-একজন উৎসাহী শিক্ষক-উপদেষ্টা থাকিলে কাজটি সুস্থল হয়। পাক্ষিক বা মাসিক হাতে-লেখা দেওয়াল-পত্রিকা বাহির করিয়া মূজিত আকারে বার্ষিক পত্রিকা বাহির করা ভালো। **বিরুদ্ধ সমালোচনা ॥** অনেকে ইহাকে ছাত্রদের পাক্ষিক মনে করেন। উপসংহার ॥ কিন্তু ইহা যে শিশু-প্রতিভার প্রস্তুতির আখড়া, ভাবীকালের শিল্পী-সাহিত্যিকের বৈঠকখানা, তাহা কে অস্বীকার করিবে ?

● ফুল-পত্রিকা

☞ ফুলের বার্ষিক পত্রিক

## পল্লী-সংগঠনে ছাত্র-সমাজের দায়িত্ব

**সূচনা ॥** ছাত্ররা সমাজের একটি বলিষ্ঠ অংশ, সর্বাপেক্ষা সজীব অংশ। তাহারা সুসংগঠিত হইয়া অসাধ্য সাধন করিতে পারে। **গঠনমূলক কাজে ছাত্র-সমাজ ॥** কিন্তু এই হতভাগ্য দেশে ছাত্র-সমাজকে মহৎ কর্মে উদ্বুদ্ধ না করার ফলে দেশের এই তরুণ গরুড়ের দল নানা ধ্বংসমূলক কাজে মাতিয়া উঠে। **পল্লী-সংগঠনে ছাত্র-সমাজ ॥** ছাত্র-সমাজকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্ত রাষ্ট্রকে শিক্ষাধাতে প্রচুর ব্যয় বহন করিতে হয়। বিনিময়ে ছাত্র-সমাজের নিকট হইতে রাষ্ট্র কিছু আশা করে। ভারতের পল্লী-সমাজ উপেক্ষিত। ছাত্রদের গ্রামে গিয়া পল্লী-সংগঠনে আত্মনিয়োগ করা উচিত। পথঘাট-নির্মাণ ও সংস্কার, জলাশয় ও জননিষ্কাশন-পদ্ধতির সংস্কার,

অবশ্যকর জলাভূমি ও ভোবা ইত্যাদির বিলোপসাধন, নৈশবিভাগীয় স্থাপন করিয়া এবং বন্য-শিকার ব্যবস্থা ইত্যাদির মধ্য দিয়া ছাত্রদের সাহায্যে পল্লী-সংগঠন সম্ভব।  
উপসংহার ॥ বন্য শিকার মাধ্যমে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান ও কৃষি-বিজ্ঞানে শিক্ষালাভ করিয়া আমাদের স্বস্থ ও সম্বল পল্লী-সমাজ ছাত্র-সমাজকে আশীর্বাদ করিবে ॥

❖ 'গ্রামে কিরিয়া বাও'

❖ পল্লী-সমাজ উন্নয়নে ছাত্র-সমাজের কর্তব্য

৪৪.

### সমস্যা-জর্জর পশ্চিমবঙ্গ

সূচনা ॥ পশ্চিমবঙ্গই ভারতের স্বাধীনতা সমগ্র-জর্জর রাজ্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হইতে তাহার দুর্ভাগ্যের সূচনা। দেশবিভাগ ও তাহার প্রতিক্রিয়া ॥ স্বাধীনতা যে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা তাহাকে মর্মান্তিক আঘাত করিয়াছে, তাহা দেশ-বিভাগ। পূর্ববঙ্গ হইতে লক্ষ-লক্ষ মানুষ এপারে চলিয়া আসিল, তাহাদের ঋণাত্মক পড়িয়া রহিল পশ্চাতে। ভাগীরথীতীরের চটকলগুলি কর্মহীন হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহাদের কাঁচামালও পড়িয়া রহিল ওপারে। বর্তমান সমস্যার রূপ ॥ পশ্চিমবঙ্গের কৃষি-উন্নয়ন ব্যর্থ, শিল্প-উন্নয়ন মন্থর। গত আঠারো বছরের মধ্যে এপারে বছরেই এরাজো খরা কিংবা বন্যার উপস্থিতি—অর্থাৎ প্রকৃতিও বিমুখ। জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান—বর্তমানে প্রায় সাড়ে চারকোটি। তাহার বিরাট অংশ বহিরাগত। বেকার-সমগ্র ভয়াবহ। সর্বত্র হতাশা। পরিণামে আইন ও শৃঙ্খলার অবনতি। রাজনৈতিক অস্থিরতা। পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নে কেন্দ্রেরও বিমাতৃহুল্লভ মনোভাব। উন্নয়ন প্রয়াস ॥ দুর্গাপুর, হলদিয়া, ফরাক্কা, শিলিগুড়ি ও সাওতালডিহিতে উন্নয়নের স্বাক্ষর পড়িয়াছে। কিন্তু গতি অতি মন্থর। উপসংহার ॥ শুধু মুখের কথাই নয়, কালবিলম্ব না করিয়া অবিলম্বে কেন্দ্র ও রাজ্যসরকারের পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নে আন্তরিকভাবে হাত লাগানো দরকার। কারণ 'আজ যদি পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুঃ হয়, আগামীকাল ক্ষুঃ হইবে সমগ্র ভারত ॥'

❖ পশ্চিমবঙ্গের নানাস্থি সমগ্র

❖ পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের উপায়

৪৫.

### কৃষিকার্ষে বিজ্ঞান

সূচনা ॥ একদা কৃষি ছিল দৈব-নির্ভর; কৃষিকে বলা হইত কৃষি-লক্ষ্মী। আজ বিজ্ঞান আসিয়া কৃষির দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছে। সেদিন জনসংখ্যা ছিল সীমিত। কৃষি তাহার মুখে খাদ্য বোগাইতে অসমর্থ ছিল না। কিন্তু বর্তমান বিশ্বের জনসংখ্যা

ক্রমবর্ধমান। তাহার মুখে খাণ্ড যোগাইবার জন্য বিজ্ঞানের হাতে কৃষিকে, তুলিয়া না দিয়া উপায় নাই। **কৃষি-বিজ্ঞান** ॥ এই কারণে কৃষি আজ আর মাদ্ধাতার আমলের চাষবাস মাত্র নাই। উহা আজ কৃষি-বিজ্ঞানে পরিণত। **আবিষ্কার** ॥ রসায়ন এবং উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার কৃষিকে আজ কৃষি-বিজ্ঞানে উন্নীত করিয়াছে। **কৃষি-বিজ্ঞানে উন্নত দেশ** ॥ বিশ্বের কর্ষণযোগ্য সীমিত জমিতে ক্ষুধার্ত মানব-জাতির ক্ষুধা মিটাইবার জন্য বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে উন্নতি না করিয়া উপায় নাই। সীমিত জমির দেশ আপান সেই উপায়ে তাহার অন্ন-সমস্তার সমাধান করিয়াছে। বর্তমানে আমেরিকা, সোভিয়েট রাশিয়া, ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং যুরোপের অগ্রান্ত দেশগুলি কৃষি-বিজ্ঞানে বিশ্বব্যপক উন্নতি লাভ করিয়াছে। **ভারত** ॥ ভারতও তাহার বিশাল জনসংখ্যার মুখে অন্ন যোগাইবার জন্য সেই পথে বাজা করিয়াছে। **উপসংহার** ॥ উন্নত কৃষি-যন্ত্রপাতি, জলসেচ, উন্নত সার-প্রয়োগ ও শস্তের চিকিৎসা—এই সব কৃষি-বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয় বিষয়। বিজ্ঞানই আজ ভারতের সবুজ-বিপ্লবের সার্থক কারিগর ॥

- কৃষি-বিজ্ঞান
- ভারতে সবুজ-বিপ্লব

৪৬.

### একটি রেল-স্টেশন

**সূচনা** ॥ সারা ভারতময় রেলপথের যে বিশাল জাল বিস্তৃত, আমাদের রেল-স্টেশন ফুলিয়া যত ছোট স্টেশনই হউক না কেন, উহার অঙ্গীভূত। **বর্ণনা** ॥ গ্রামের সঙ্গে স্টেশনের যোগসূত্র বড় রাস্তা। উচু রেললাইন, পাশে টেলিগ্রাফের থাম একরাশ তার গলায় জড়াইয়া সারাদিনরাত যেন সেতার বাজায়। দুই পাশে প্রাটিকর্ম, লালরঙের স্টেশন-ঘর, যাত্রীদের বিশ্রাম-কক্ষ, একটি অধিসেতু বা ওভারব্রিজ, তাহার একপাশে টিকিট-ঘর, স্টেশন-মাস্টারের অফিস ইত্যাদি। অন্ত্রপাশে চায়ের স্টল। স্টেশনের উভয় প্রান্তে সিগন্যাল—লাল নীল আলোর সংকেত। **কর্ম-ব্যস্ততার রূপ** ॥ রাত্রির অন্ধকার অপমৃত হইবার পূর্ব হইতেই যাত্রী-ট্রেন এবং মাল-গাড়ির যাতায়াত শুরু হইয়া যায়। পূর্বে সবই ছিল কয়লার ইঞ্জিন। এখন মালগাড়ি ছাড়া সব ট্রেনই ইলেকট্রিক-বাহিত। বেলা নয়টা-দশটার দিকে ট্রেনের যাতায়াত বাড়ে। আবার, বিকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত অনেকগুলি ট্রেন যাতায়াত করে। মধ্যরাত্রিতে স্টেশন নির্জন হইয়া নিঃসাড়ে ঘুমাইয়া পড়ে। **উপসংহার** ॥ কত লোক যায়, কত লোক আসে। আমাদের রেল-স্টেশন শহর ও গ্রামের মধ্যে যাতায়াতের যেন একটি সেতু। এক্সপ্রেস গাড়িগুলি দূরের মানুষ—একটুও থামে না, উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যায়। লোক্যাল ট্রেনগুলি যেন অনেকটা ঘরের মানুষ। আমাদের স্ব্থ-দুঃখের সঙ্গে জড়িত ॥

- নিকটবর্তী রেল-স্টেশন
- একটি রেল-স্টেশনের বর্ণনা

## তোমার একটি রেল-স্রমণের অভিজ্ঞতা

**সূচনা ॥** রেলগাড়ি হইল এই গতি-সর্বস্ব যুগের গতির প্রতীক। শৈশব হইতে রেলগাড়িতে চড়িয়া কোথাও যাইবার করনা মনের মধ্যে অত্যন্ত প্রবলভাবে মাথা কুটিত। **স্বযোগ ॥** সেবার গরমের ছুটি পঙ্খিতেই বাবা আমাদেরকে রেলের করিয়া আমার বাড়ি লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। প্রস্তাব শুনিয়া আমাদের হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল। আনন্দের উত্তেজনায় রাজির নিদ্রা তিরোহিত হইল। **যাত্রা ॥** সেদিন ভোরবেলা ভালো পোশাক-পরিচ্ছদ পরিয়া আমরা সাইকেল-রিক্‌শায় চড়িয়া স্টেশনে গিয়া উপস্থিত হইলাম। আলোয় উদ্ভাসিত স্টেশন আমার নিকট অজ্ঞানার দূত বলিয়া বোধ হইতেছিল। বাবা খবর লইয়া জানিলেন, ট্রেন আসিতে 'লেট' হইবে। বড় রাগ হইল :—ট্রেন এত লেট করে কেন? বাহা হউক, ট্রেন আসিল। কত ভয় ছিল, ঠিকমতো উঠিতে পারিব কিনা। কিন্তু আমরা সহজেই উঠিয়া আসন সংগ্রহ করিয়া বসিয়া পড়িলাম। ট্রেন বাঁশি বাজাইয়া চলিতে শুরু করিল। কেমন হৃন্দরভাবে হুলিতে হুলিতে, শব্দ করিতে করিতে ট্রেন ছুটিয়া চলিল। দুই ধারের গাছপালা, টেলিগ্রাফের খাম এবং লোকজন ও স্টেশন-ঘরগুলি বিপরীতমুখে ছুটিয়া যাইতেছিল। **উপসংহার ॥** কেরিওয়ালাদের বিচিত্র বক্তৃতা আর ভিখারীদের গান হুলিতে পারি না ॥

রেল-স্রমণ

৪৮.

## একটি ফুটবল-খেলার বর্ণনা

**সূচনা ॥** ফুটবল খেলার মতো উত্তেজনাপূর্ণ এবং রোমাঞ্চকর খেলা আর নাই। ইহার প্রতিটি মুহূর্তে আনন্দ ও রোমাঞ্চ। **প্রতিষন্দ্বিতা ॥** রামনগর স্কুলের সঙ্গে আমাদের স্কুলের ফুটবল ম্যাচ একটি বার্ষিক অহুষ্ঠান। প্রতি বৎসর এই ম্যাচকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের কত উৎসাহ, কত উত্তেজনা। **পূর্বসূত্র ॥** গত বৎসর রামনগর স্কুলের নিকট আমরা পাঁচ গোলে পরাজিত হইয়াছিলাম। এ বছর তাহার সমুচিত জবাব দিবার জন্য আমাদের খেলোয়াড়েরা প্রস্তুত। **যাত্রা ॥** একখানা লরীতে খেলোয়াড় এবং অন্যান্য ছাত্ররা। বাসে কয়েকজন শিক্ষক মহাশয় ও বহু ছাত্র। **ম্যাঠের বর্ণনা ॥** এই ফুটবল ম্যাচকে কেন্দ্র করিয়া স্থানীয় অঞ্চলে খুব উত্তেজনা দেখা দেয়। মাঠ ছিল লোকে লোকারণ্য। চারদিকে বেঞ্চ পাতা; দাঁড়াইয়াও খেলা দেখিবার সুব্যবস্থা। **আমন্ত্রিত দলের আপ্যায়ন ॥** স্কুলের সেক্রেটারী, প্রধান শিক্ষক, অন্যান্য শিক্ষক মহাশয়গণ এবং ছাত্র-বন্ধুরা আপ্যায়ন করিল। **আর্গিসিং বর্ণনা ॥** রামনগরের লাল-সাধা, আমাদের কালো-হলুদ। খেলার বর্ণনা ॥



দেখারি হইল—খেলার আরম্ভ। প্রথম পাঁচ মিনিটের মাঝায় আমাদের দল গোল দিল। তারপর রামনগর খুলে পর পর দুইটি গোল দেখে। হাক্-টাইম। পরে আমাদের খুলে দুইটি গোল দিয়া এক গোলে জয়লাভ করিল। খেলার শেষে কাপ বিতরণ ও জলযোগ। উপসংহারে বিজয়-উল্লাসে সারাপাশ সচকিত করিয়া আমরা কিরিয়া আসিলাম।

- তোমার দেখা একটি ফুটবল খ্যাচ
- খেলার মাঠে একদিন

৪৯.

### তোমার ভালো-ভাগা একটি চলচ্চিত্র

সূচনা ॥ চলচ্চিত্র একটি নবাগত শিল্পকর্ম। ছবিই ইহার মাধ্যম। ছবিই ইহার ভাষা। একটি ছবির খুঁটিনাতি ॥ বিশ্বের অন্ততম প্রখ্যাত পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের ‘পথের পাচালী’ ছবিটি আমার মনোহরণ করিয়াছে। এরূপ অনবদ্য ছবি কদাচিৎ দেখা যায়। কাহিনী—বাংলার বিখ্যাত সাহিত্যিক ‘বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ভালো-ভাগার কারণ ॥ একটি দরিদ্র গ্রাম্য পরিবারের গ্রামভ্যাগের কাহিনী অপূর্বভাবে চিত্রিত। গ্রামের সহজ-সরল জীবনের মধ্যে অপূ ও দুর্গার অনাবিল সারল্য এবং অজানাকে জানিবার শিশুহুলত কোতূহল। ইন্দির ঠাকুরণের বার বার গৃহভ্যাগ ও প্রত্যাবর্তন, সর্বজয়ার গৃহিণীপনা, হরিহরের বাউতুলে জীবন ও টিকিয়া থাকিবার জন্ত জীবন-সংগ্রাম এবং শেষ পর্যন্ত গ্রামভ্যাগ—সমস্ত মিলিয়া ছবিখানি এক অরূপ তাৎপর্ষে মণ্ডিত। ইন্দির ঠাকুরণ ও দুর্গার মৃত্যু এবং হরিহরের নিকট সর্বজয়া কর্তৃক দুর্গার মৃত্যু-সংবাদ জ্ঞাপনের দৃশ্যগুলি শিল্পের চরম শিখরে উন্নীত। উপসংহারে ॥ দেখিতে দেখিতে মনে হয়, যেন দৃশ্যগুলি নিজস্ব ভাষায় কথা বলিয়া উঠিয়াছে। আর, বাহারা ইহাতে অভিনয় করিয়াছে, তাহারা যেন অভিনয় করে নাই; চরিত্রগুলিকে এমনই স্বাভাবিক ও জীবন্ত মনে হইয়াছে। তাহা ছাড়া, বিশ্ববিখ্যাত মেতার-শিল্পী রবিশংকরের সুরারোপে ছবিখানি অপূর্ণপ স্বেচ্ছায় মণ্ডিত ॥

- তোমার একটি উৎকৃষ্ট চলচ্চিত্র দেখার অভিজ্ঞতা

৫০.

### ভারতীয় জীবনে রামায়ণের প্রভাব

সূচনা ॥ রামায়ণ ভারতীয় জীবনের কদম্বক। পরিবার, সমাজ ও রাজ্য-গঠনে রামায়ণের সর্বতোমুখী প্রভাব। জীবন-গঠনে রামায়ণ ॥ রামায়ণের শিক্ষা হলো আত্মপন্থের শিক্ষা। বৈরাগ্যের শিক্ষা। যুগ যুগ ধরে ভারতবাসীকে রামায়ণ সেই শিক্ষাই

দিয়ে এসেছে। জ্ঞান ও 'সত্যজ্ঞান' শিক্ষা। তারের প্রভাৱে সত্যের প্রতিষ্ঠা, অসত্যের বিলুপ্তি—রামায়ণের রাব-রাবণের যুদ্ধ ও তার পরিণতি দিয়ে এই আদর্শই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভারতবাসী ভায় ও সত্যের অন্বেষণে থাকেই দীক্ষা নিয়েছে। পরিবার-গঠনে রামায়ণ ॥ রামায়ণ জে আমায়ের পরিবারের কথা বিশাল-আকারে পরিবেশন করেছে। আমাদের পরিবার একরকম পরিবার। পিতামাতা, ভ্রাতাভগ্নী, স্বামী-স্ত্রী, দাসদাসী—এই সব নিয়েই আমাদের পরিবার। প্রত্যেকের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ও আচরণের কথা রামায়ণে বর্ণিত। রামায়ণে আমরা পাই আদর্শ পিতামাতা, আদর্শ ভ্রাতা-ভগ্নী, আদর্শ স্বামী-স্ত্রী এবং আদর্শ দাসদাসী। ভারতবাসী যুগ যুগ ধরে সে রকম হয়ে ওঠার জন্তে চেষ্টা করে এসেছে। সমাজ-গঠনে রামায়ণ ॥ আদর্শ পরিবারই আদর্শ সমাজের মূল ভিত্তি। আদর্শ শিক্ষাগুরু, ধর্মগুরু, কাব্যগুরু, বন্ধুবান্ধব—এ সব আমরা রামায়ণে পাই। রামায়ণ শুধু সামাজিক সম্পর্কই নয়, সামাজিক শ্রীতি ও তত্ত্ব শিক্ষা দিয়ে হৃদয়ের সমাজ-গঠনের সহায়তা করেছে। রাজ্য-গঠনে রামায়ণ ॥ মহাকবি বাস্কীকি যে প্রজাবংশল রামচন্দ্রকে সৃষ্টি করে গেছেন, তাঁর মতো প্রজাবংশল রাজাকেই ভারত চিরকাল কামনা করে এসেছে। ভারতীয় রাজা তাই চিরকাল রামচন্দ্রের মতো প্রজাবংশল হবার জন্তে চেষ্টা করেছেন। রামায়ণে জীবন-দর্শন ॥ জীবনে দুঃখ-কষ্টের প্রয়োজন আছে। রামচন্দ্র 'হৃদী রাজপুত্র' ছিলেন না। তাঁকে অচ্যুতবল পরে চৌদ্দ বছর বনবাসে কাটাতে হয়েছে। দুঃখকে মেনে নিই, তাকে জয় করে রামচন্দ্র 'রামচন্দ্র' হয়ে উঠেছেন। তাছাড়া, 'বাম' মানে তো হৃদয়ের আর 'রামায়ণ' মানে হৃদয়ের করে তোলা। রামায়ণ ভাবতবাসীর- দুঃখ-জয়ের, মৃত্যু-জয়ের বেদগ্রন্থ। উপসংহার ॥ আদর্শ জীবন, আদর্শ পরিবার, আদর্শ সমাজ, আদর্শ রাজ্য-গঠনে যা যা প্রয়োজন, যুগ যুগ ধরে রামায়ণ ভাবতবাসীকে তাই দিয়ে এসেছে ॥

● রামায়ণের শিক্ষা

● রামায়ণ ও ভারতীয় সমাজ

৫১.

গৃহসজ্জা

সূচনা ॥ মানুষের চরিত্রের ওপর তার বাসগৃহের প্রভাব অনস্বীকার্য। গৃহসজ্জার উপকারিতা ॥ সুসজ্জিত গৃহ মানুষের মনকে সুস্থ ও প্রফুল্ল রাখে। গৃহসজ্জা মানুষের চরিত্র পরিচায়ক। গৃহসজ্জা সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতীক। মানুষের গৃহসজ্জার ইতিহাস ॥ গৃহবাসী মানবও গৃহ-প্রাচীর চিত্রিত ও অলংকৃত করতো। তারপর যুগে যুগে মানুষ ছবি ও মূর্তি দিয়ে নানাতাবে তার বাসগৃহকে সুসজ্জিত ও অলংকৃত করে এসেছে। গৃহসজ্জার বিভিন্নতা ॥ মানুষ তরুণতলে বাস করলেও সে সেই তরুণটিকেও সুসজ্জিত করে। কারণ, তার সৌন্দর্য-প্রিয়তা। অট্টালিকাই

হোক বা পর্ণকুটিরই হোক, মানুষ তাকে নিজের মতো করে সাজিয়ে নেয়। **বাঙালীর গৃহসজ্জা** ॥ বাংলার নিমিত্ত কুটিরেরও একটি অনবদ্য সৌন্দর্য আছে। মাটির দেয়ালের গায়ে বিচিত্র অলংকরণ। বর্তমান কালে ছিমছাম বাসগৃহই সৌন্দর্যের প্রতীক। ঘরে হালকা পর্দা, একটি ফুলদানি, ফুলদানিতে কয়েকটি ফুল এবং একখানা রবীন্দ্রনাথের ছবি যে-কোন বাঙালী গৃহস্থের কাম্য। **উপসংহার** ॥ গৃহসজ্জার গুরুত্ব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। গৃহসজ্জা আজ পঠন-পাঠনের বিষয়। গৃহসজ্জা আজ কোন কোন দেশে ব্যবসায়ের পরিণত হয়েছে ॥

● মানুষের মনের উপর বাসগৃহের প্রভাব

৫২.

## নগর-সজ্জা

**সূচনা** ॥ নগর-সজ্জা মানুষের উন্নত রুচি, সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচায়ক। **উপযোগিতা** ॥ শহরের সুন্দর পথঘাট, পথের দুধারের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য মানুষের মনকে প্রফুল্ল ও পবিত্র করে। মানুষের ব্যক্তি-জীবনেই শুধু নয়, তার সামাজিক ও জাতীয় জীবনেও তার প্রতিফলন ঘটে। **নগর-সজ্জার ইতিহাস** ॥ যুগে যুগে মানুষ যে সব শহরে বাস করেছে, তাকেই সুন্দর করে সাজিয়ে তোলার চেষ্টা করেছে। গ্রীসের এথেন্স, রোম, ব্যাবিলন নগর-সজ্জার ইতিহাসে কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে। **নেপোলিয়নের নগর-সজ্জা** ॥ দ্বিবিজয়ী নেপোলিয়ন সারা ইউরোপ থেকে সৌন্দর্যের উপকরণ সংগ্রহ করে এনে প্যারিস ও ভার্সাই নগরীকে সাজিয়েছিলেন। **ভারতের নগর-সজ্জা** ॥ ভারতের মোগল-সম্রাটেরা বিশেষত আকবর, জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান আগ্রা ও কতেপুরসিক্রিকে যে-ভাবে সাজিয়েছিলেন, তা আজও বিশ্বের সম্মুখ উদ্রেক করে। **ভারতের বর্তমান নগর-সজ্জা** ॥ জাতীয় সরকার ভারতের বিভিন্ন নগরীর সৌন্দর্য-বৃদ্ধির জগ্রে আগ্রহী। পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নতুন দিল্লীকে সাজানো হয়েছে। **কলকাতার সৌন্দর্য-বৃদ্ধি** ॥ সম্প্রতি কলকাতা-মহানগরীর সৌন্দর্য-সম্পাদনের জগ্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও সি. এম. ডি. এ. দশ লক্ষ টাকার একটি পরিকল্পনা দ্রুত রূপায়িত করছেন। কলকাতার প্রধান প্রধান রাস্তাগুলির পাশে ও পার্কে-পার্ক ফুলের বাগান স্থাপিত করা হচ্ছে। সুসজ্জিত বিধান শিল্প-উদ্যান নির্মিত হয়েছে। রবীন্দ্র সরোবরের সৌন্দর্য-বৃদ্ধির প্রয়াস স্থগিত হয়েছে। নাগরিকদের কর্তব্য ॥ নগরকে সুন্দর রাখার দায়িত্ব কেবল যে পৌর কর্তৃপক্ষ, ডি. এম. ডি. এ. বা সরকারের, তা নয়; এতে প্রত্যেক নগরবাসীর রয়েছে যৌথ দায়িত্ব। **উপসংহার** ॥ সকলের সমবেত প্রয়াসে কলকাতা হয়তো একদিন 'কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে ॥'

● নগরীকে পরিচ্ছন্ন রাখার নাগরিকদের কর্তব্য

## ব্যাকরণ

“আমরা যেমন বিদ্যালয়ে ভারতবর্ষের নাম  
দিয়া মহম্মদ ঘোরী, বাবর, হুমায়ূনের  
ইতিহাস পড়ি, তাহাতে অতি অল্প পরিমাণ  
ভারতবর্ষ মিশ্রিত থাকে, তেমনি আমরা  
বাংলা ব্যাকরণ নাম দিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণ  
পড়িয়া থাকি, তাহাতে অতি অল্প পরিমাণ  
বাংলার গন্ধ থাকে মাত্র।” —রবীন্দ্রনাথ



“বাংলাদেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশে বসন্তগুলি উপভাষা  
প্রচলিত আছে তাহারই তুলনাগত ব্যাকরণই বর্ধাৎ  
বাংলার বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ।” —রবীন্দ্রনাথ

## রচনা বিচিন্তা

### ভাষা ও ব্যাকরণ

#### প্রস্তাবনা

ভাষা জনসমাজের প্রয়োজনেরই সৃষ্টি। সভ্যতার আদিম লয়ে ভাষাহীন জনগণ তাহাদের দৈনন্দিন জীবনাচরণের প্রয়োজনে পরস্পরের মধ্যে ভাব-বিনিময়ের জন্য কতকগুলি মৌখিক ধ্বনির [Sound] সাহায্য গ্রহণ করে। এই ধ্বনিগুলির সাহায্যে তাহারা তাহাদের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, হর্ষ-ক্রোধ ইত্যাদি মনের ভাবগুলিকে অপরের নিকট প্রকাশ করিত। কিন্তু কল্পনা করা যাক, কণ্ঠে ভাষা নাই, অথচ মনের মধ্যে ভাব মাথা কুটিয়া মরিতেছে! এই অবস্থাটি বোবাদের অবস্থার সহিত তুলনীয়। কাজেই, কণ্ঠের ধ্বনি হইল নিঃসন্দেহে মানুষের একটি মূল্যবান সম্পদ। ধ্বনি-সম্পদ লাভের পূর্বে মানুষ কেবলমাত্র ইশারা-ইঙ্গিত বা সংকেতের দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করিত। ধ্বনি-সম্পদ লাভের পর সে সেই সংকেতকে ধ্বনিতে আরোপ করিল। অর্থাৎ, এক বা একাধিক ধ্বনির সাহায্যে এক-একটি ভাব বা অর্থ সংকেতিত হইতে লাগিল। রবীন্দ্রনাথের মতে, ভাষায় কেবল এই সংকেতেরই কারবার। আবার, মৌখিক সাংকেতিক ধ্বনি-সমষ্টি হইতেই উত্তরকালে ভাষার উদ্ভব। কাজেই, বাগ্‌যন্ত্রের দ্বারা উচ্চারিত সাংকেতিক ধ্বনি-সমষ্টিই হইল ভাষার আদিমতম রূপ।

আবার, বিশেষ বিশেষ জন-গোষ্ঠী এক-একটি ভাষার স্রষ্টা। বিশেষ ভৌগোলিক পরিবেশে-বিশেষ বিশেষ ভাষার উদ্ভব লক্ষণীয়। বিভিন্ন ভৌগোলিক ও সামাজিক প্রতিবেশ ভিন্ন ভিন্ন ভাষাকে লালন করে এবং কালক্রমে সেই ভাষাকে অবলম্বন করিয়া সেই অঞ্চলের সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিকশিত হইয়া উঠে। দেশে দেশে জনগণের কথ্য ভাষাই কালক্রমে সাহিত্যিক ভাষায় রূপান্তরিত হয়। অর্থাৎ, কথ্য ভাষাই সাহিত্যিক ভাষার আদি-জননী। সেইজন্য পৃথিবীতে ভাষার সংখ্যা বহু এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতির সংখ্যাও সেইজন্য অনেক।

কাজেই, মানব-সভ্যতার জন্ম এক-একটি শব্দও বহু প্রাচীন। এক-একটি শব্দের পিছনে বহু সহস্র বৎসরের ইতিহাস নীরব হইয়া আছে। সেই সব শব্দের আদিমতম রূপ আজ হয়ত বিচ্যমান নাই, কিন্তু তাহার নানা রূপ-রূপান্তরের মধ্যেও হৃদয় কোন অতীতের স্পর্শ মিশিয়া রহিয়াছে। গতিই হইল ভাষার জীবনী-শক্তি এবং জনগণই হইল তাহার প্রকৃত ধারক ও বাহক। জনগণের মুখে ভাষা প্রবাহিত হইয়া চলে। কিন্তু কোন কারণে ভাষা যখন জনগণের সহিত তাহার সকল সংযোগ ছিন্ন করিয়া

আবিষ্কারের পূর্বে দূরে সরিয়া গিয়াছে, তখনই ঘটিয়াছে তাহার অপসৃত্য। এইভাবে সংস্কৃত, গ্রীক, ল্যাটিন প্রভৃতি ভাষা আজ ইতিহাসের ষাটখরে স্থান পাইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও সেই ভাষাগুলি একেবারে নিষ্ফল হইয়া নাই। আজ আধুনিক যুরোপীয় এবং ভারতীয় ভাষাগুলির উৎস-সন্ধানের যাত্রা করিলে সেই অধুনা-বিলুপ্ত ভাষাগুলির উপকূলে গিয়া অবশ্যই উপস্থিত হইতে হইবে।

ভাষা মনের ভাব প্রকাশ করে; আর, ব্যাকরণ<sup>১</sup> সেই মনের ভাবকে শুদ্ধরূপে প্রকাশে সাহায্য করে। কাজেই, ভাষা আগে সৃষ্টি হয়, ব্যাকরণ সৃষ্টি হয় পরে। জনসাধারণের মুখে মুখে ভাষা নানা রূপ-রূপান্তরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া চলে। ব্যাকরণ ভাষার সেই মৌল প্রবণতা, সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও উচ্চারণ-পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে নিয়ম রচনা করিয়া ভাষার বিপুল প্রয়োগের পথ অঙ্কিত করিয়া দেয়; ভাষা হৃদয়-মনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ এবং ব্যাকরণ তাহার শাসন-শৃঙ্খলা। কাজেই, কোন ভাষা শুদ্ধভাবে লিখিবার জন্য, পড়িবার জন্য, বলিবার জন্য এবং বুঝিবার জন্য সেই ভাষার ব্যাকরণ-পাঠ অবশ্যই প্রয়োজন।

অতএব বাংলা ভাষা শুদ্ধভাবে লিখিবার জন্য, পড়িবার জন্য, বলিবার জন্য এবং বুঝিবার জন্য যে গ্রন্থ পাঠ একান্তভাবে অপরিহার্য, সেই গ্রন্থকে বাংলা ব্যাকরণ<sup>২</sup> বলা হয়। বাংলা ভাষার বয়স হাজার বছরেরও বেশী; কিন্তু তাহার রচিত ব্যাকরণের বয়স মাত্র দুইশত বছর। ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়, বাংলা ব্যাকরণের সূচনা হয় পতুর্গীজ ও ইংরেজদের হাতে। পরবর্তী পথিকৃৎ রাজা রামমোহন রায়।

ভাষা-বিজ্ঞানে ব্যাকরণ তিন প্রকার : এক. বর্ণনামূলক ব্যাকরণ, দুই. ঐতিহাসিক ব্যাকরণ ও তিন. তুলনামূলক ব্যাকরণ। আবার, ভাষা-বিজ্ঞান অল্পসারে ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয় প্রধানতঃ চারটি : এক. ধ্বনি-বিজ্ঞান [ Phonetics ], ধ্বনি-বিচার [ Phonemics ] ও ধ্বনিতত্ত্ব [ Phonology ], দুই. রূপতত্ত্ব [ Morphology ]; তিন. পদতত্ত্ব বা বাক্যরীতি [ Syntax ] এবং চার. শব্দার্থতত্ত্ব [ Semantics ]।

১. “ব্যাকরণ” একটি সংস্কৃত শব্দ। ইহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতেছে বিশ্লেষণ, বিশেষরূপে এবং সমাগুরূপে বিশ্লেষণ করা।...ইংরেজী Grammar শব্দটি গ্রীক ভাষা হইতে আসিয়াছে, ইহার অর্থ ‘শব্দ-শাস্ত্র’। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে ‘ব্যাকরণ’ শব্দটি ইংরেজী Grammar-এর অর্থেই প্রযুক্ত হইয়া আসিয়াছে। ‘বাংলা ভাষার ব্যাকরণ’ বলিতে বাংলা ভাষার ‘Grammar’ বুঝায়, এই অর্থেই চলিয়া আসিতেছে।”

—আচার্য হুম্মিতকুমার

২. “সংস্কৃত বা বাংলা ব্যাকরণ ও ইংরাজী Grammar এক জিনিস নয়। Grammar is the art of speaking and writing a language correctly. সংস্কৃত ব্যাকরণের মানে কিন্তু আর কিছু। ‘বাস্তব-মুখে ব্যুৎপাদনশে শব্দা অনেক ব্যাকরণঃ’ অর্থাৎ শব্দটি শুদ্ধ করা পর্যন্তই ব্যাকরণের সীমা। ইংরাজীতে গ্রামারের মধ্যে উচ্চারণ পড়ে। উচ্চারণের জন্য সংস্কৃততে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র আছে—তাহার নাম শিক্কা। ইংরাজীতে গ্রামারে Syntax থাকে—সংস্কৃততে Syntax-এর মোটা মোটা গোটাকতক কথা যা নহিলে ব্যাকরণ চলে না, তাহাই ব্যাকরণে থাকে—বাকীটা বাদ্যর্থশাস্ত্রে গিয়া পড়ে। ইংরাজী গ্রামারে ছন্দের উপর একটা অধ্যায় থাকে, সংস্কৃততে চন্দ্রশাস্ত্র স্বতন্ত্র। গ্রামারে figure of speech থাকে, সংস্কৃততে অলঙ্কারশাস্ত্র স্বতন্ত্র। ‘সুহৃৎ’, ইংরাজী গ্রামার ও সংস্কৃত ব্যাকরণ এক নহে। ইংরাজী গ্রামারকে শব্দশাস্ত্র বলা যাইতে পারে, সংস্কৃত ব্যাকরণ শুধু পদের আকার লইয়া।”

—মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

বাংলা ভাষা আৰ্যভাষা-সম্ভূত আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির অন্যতম। আৰ্যভাষা আৰ্যদেব সহিত প্রথমে ভারতে আসিয়াছিল বৈদিক ভাষারূপে। ভারতের জল-বায়ুর গুণে এবং ভাবতের প্রাপ্ত-আৰ্য জাতিগুলির ভাষাসমূহের সহিত অনিবার্য আদান-প্রদানের পরিণামে আৰ্যভাষার অবনতি ঘটিলে পরবর্তীকালে তাহার সংস্কার সাধনের ফলে যে ভাষার সৃষ্টি হইল, তাহার নাম সংস্কৃত ভাষা। সংস্কৃত ভাষা পরিণত হইল কেতাবী ভাষায়। ইহা হইল সমাজেব অভিজাত শ্রেণীর তথা শিক্ষিত শ্রেণীর ভাষা। আবার, বর্ণ-বিভাগের ফলে বেদে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণেরই অধিকার স্বীকৃত ছিল। অর্থাৎ, অত্রাহ্মণেব সম্মুখে শিক্ষাব দাব উন্মুক্ত ছিল না। এইভাবে দেশের জনসাধারণের সম্মুখে সংস্কৃতের দাব ক্ষুদ্র হইল। কিন্তু 'প্রকৃতি' অর্থাৎ লোক-সাধাবণের মুখে মুখে নিত্য পরিবর্তিত হইয়া প্রবাহিত হইয়া চলিল কথ্য 'প্রাকৃত' ভাষা [ জনসাধারণের ভাষা ]। ভারতেব বিভিন্ন অঞ্চলে উচ্চারণেব বশিষ্ট ভঙ্গি এবং কথ্য ভাষাব রীতি-অনুসারে তাহা ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ কবিল। তাহাদের নাম হইল. শৌবসেনী প্রাকৃত, পৈশাচী প্রাকৃত, মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত ও মাগধী প্রাকৃত। কালক্রমে মাগধী প্রাকৃত হইতে উদ্ভূত হইল মগধী অপভ্রংশ বা মাগধী অবহট্ট [ এই নামটি পণ্ডিত গ্রীষ্মসেনেব দেওয়া ]; এবং এই মাগধী অপভ্রংশ হইতে উদ্ভব হইল বাংলা ভাষার। কাজেই, একপ্রান্তে প্রাচীন ভাবতের আৰ্যভাষা, অন্যপ্রান্তে আধুনিক বাংলা ভাষা; মাঝখানে হাজার হাজার বছরের ইতিহাস।

## বাংলা ব্যাকরণ

বাংলা ভাষার উদ্ভব আজ হইতে প্রায় সহস্র বৎসর পূর্বে। কিন্তু বাংলা ব্যাকরণের সৃষ্টি মাত্র দুইশত বৎসর পূর্বে। বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ-রচয়িতা পত্নীগীজ পাণ্ডী মানোএল-দু-আল্ফ্রামসাম।<sup>১</sup> তারপর ইংরেজ পণ্ডিত হ্যালহেড ইংরেজিতে বাংলা ব্যাকরণ<sup>২</sup> রচনা করেন। রামমোহনও<sup>৩</sup> বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন; কিন্তু ইংরেজিতে। তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল আধুনিক এবং বাংলায় গ্রন্থটির অনুবাদও হইয়াছিল। তারপর বাংলা ব্যাকরণ রচনায় হাত দিয়াছেন নকুলেশ্বর বিহাভূষণ, আচার্য যোগেশচন্দ্র বিহানিধি, রামেন্দ্রচন্দ্র জিবেদী, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বরেণ্য পণ্ডিতগণ। কিন্তু প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে আজও বাংলা ব্যাকরণ রচিত হয় নাই।

১ Vocabulario em Idioma Bongalla em Portuguez—পত্নীগীজ-বাংলা ব্যাকরণ ও শব্দকোষ।

২. The Grammar of the Bengali Language : 1778

৩. পৌড়ীয় ব্যাকরণ : ১৮৩৩; রামমোহনের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত।



পৃথিবীর সকল উন্নত ভাষারই আছে দুইটি পৃথক্ রূপ : একটি তাহার সাহিত্যিক [Standard Literary] রূপ, অল্পটি তাহার কথ্য [Standard Colloquial] রূপ। প্রথমটি দিয়া তাহার সমৃদ্ধ সাহিত্য রচিত হয়, দ্বিতীয়টি ফেরে লোকমুখে, ব্যবহৃত হয় দৈনন্দিন জীবনাচরণে। বাংলা ভাষারও আছে তেমনি দুইটি রূপ : সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা। বর্তমানে বাংলা চলিত ভাষাও উৎকৃষ্ট সাহিত্যিক ভাষা।

**ভাষা ও উপভাষা :** একটি বিশেষ ভৌগোলিক পরিবেশে কোন জনগোষ্ঠীর মুখে মুখে যে ভাষা গড়িয়া উঠে, তাহাকে বলা হয় উপভাষা [Dialect]। সাধারণতঃ প্রাকৃতিক বন্ধুরতার জন্ত সন্নিহিত বিভিন্ন উপভাষাগুলির মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। বাংলা দেশে বিভিন্ন অঞ্চলে এইরূপ বহু উপভাষা গড়িয়া উঠিয়াছে। অঞ্চল-ভেদে বাংলার উপভাষাগুলিকে প্রধানতঃ চারভাগে বিভক্ত করা যায় : রাঢ়ী, বরেন্দ্রী, বঙ্গালী ও কামরূপী। ভৌগোলিক বিচারে সহজেই এই উপভাষাগুলির সীমা নির্দেশ করা যায়। গঙ্গা ও ভাগীরথীবেষ্টিত পশ্চিমবঙ্গের উপভাষা ‘রাঢ়ী’, পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্রবেষ্টিত উত্তরবঙ্গের উপভাষা ‘বরেন্দ্রী’, পদ্মা ও ভাগীরথীর দ্বারা বিচ্ছিন্ন পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গের উপভাষা ‘বঙ্গালী’ এবং ব্রহ্মপুত্রের দ্বারা বিচ্ছিন্ন উত্তর ও পূর্ববঙ্গের উপভাষা ‘কামরূপী’।

‘ভৌগোলিক, রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি কারণে ভাষা হইতে যেমন উপভাষা উদ্ভব হয়, তেমনি নানা কারণে কোন একটি উপভাষা শক্তিশালী হইয়া অপর ভাষা-গুলিকে আওতায় ফেলিয়া বা বিনষ্ট করিয়া ভাষায় পরিণত হইতে পারে।... যে-যে কারণে একটি বিশেষ উপভাষা উন্নীত হয়, তাহার মধ্যে প্রধান হইতেছে সেই উপভাষায় উন্নত সাহিত্যের সৃষ্টি,...অপর প্রধান কারণ হইতেছে, অঞ্চল-বিশেষের রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি। এমনি করিয়াই পশ্চিমবঙ্গের উপভাষা বাংলা ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এমনি করিয়াই কলিকাতার উপভাষা আজ সমগ্র শিক্ষিত বাঙালী সমাজের কথ্যভাষা হইয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন বাংলার অধিকাংশ কবি পশ্চিমবঙ্গের লোক ছিলেন, সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের উপভাষাই বাংলা সাহিত্যে প্রাধান্য লাভ করিয়া পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে সাহিত্যের ভাষায় পরিণত হইয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে গল্প রচনার প্রথা প্রচলিত হয় এবং বাংলা আধুনিক সাহিত্যের উদ্ভব হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি-সাহিত্যিকগণ প্রায় সকলেই পশ্চিমবঙ্গের সন্তান, সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের উপভাষা হইতে জাত বাংলা সাহিত্যের ভাষার পক্ষে বাংলা সাধু ভাষায় পরিণত হইতে কোনই বাধা রহিল না।’

ঊনবিংশ শতাব্দীতে রামমোহন, বিজ্ঞানাগর, অক্ষয়কুমার, ভূদেবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর প্রমুখ খ্যাতিমান লেখকদের হাতে বাংলা সাধুভাষা যথেষ্ট সমৃদ্ধি লাভ করে। কিন্তু পরবর্তীকালে ঊনবিংশ শতাব্দী হইতে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত বাংলা

চলিত ভাষা বা কথ্য ভাষায় উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, প্রমথ চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ ও রাজশেখর বসু হইতে শুরু করিয়া অতি আধুনিক লেখকগোষ্ঠী পর্যন্ত সকলেই চলিত ভাষার অনুরাগী। চলিত ভাষার বর্তমান সমৃদ্ধির কাছে সাধুভাষা দিনে দিনে নিশ্চয় হইয়া পড়িতেছে।

বাংলা চলিত ভাষার শক্তির সন্ধান করিতে উইলিয়ম কেরী [দৃষ্টান্ত—‘কথোপকথন’] খুব সচেষ্ট ছিলেন। যত্নস্বয় বিজ্ঞানস্বয়ও তাঁহাকে সে বিষয়ে সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু যে কারণেই হউক, চলিত ভাষায় শক্তির সন্ধান তাঁহারা লাভ করিতে পারেন নাই। এ বিষয়ে সাফল্য লাভ করিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র। তিনিই প্রথমে বাংলা চলিত ভাষায় শক্তির সন্ধান লাভ করেন এবং তাঁহার ‘আলালের ঘরের দুলাল’ সেই সাফল্যের স্বাক্ষরবাহী। তারপর কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁহার ‘হতোম পেঁচার নকশা’য় সেই শক্তিরই চর্চা করিলেন। অবশ্য, প্রায় সমসাময়িক কালে মধুসূদন তাঁহার প্রহসন-যুগলে [‘বুড়ে শালিকের ঘাড়ে রোঁ’ ও ‘একেই কি বলে সভ্যতা’] বাংলা চলিত ভাষার সার্থক প্রয়োগ করেন। ইহার পর রবীন্দ্রনাথ বাংলা চলিত ভাষার শক্তির সহিত উহার সৌন্দর্যও আবিষ্কার করিলেন। বিবেকানন্দ বাংলা চলিত ভাষার শক্তি সম্পর্কে ছিলেন অত্যন্ত আশাবাদী। তাহা ক সঙ্গমাণ করিলেন প্রমথ চৌধুরী [বীরবল]। তারপর হইতে অতি-সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত বাংলা লেখকগণের সাহিত্য-সাধনা বাংলা চলিত ভাষাকেই অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

**সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য :** কতকগুলি দিক দিয়া সাধু ও চলিত ভাষার মধ্যে পার্থক্য অতি স্পষ্ট। ১. সাধুভাষায় তৎসম শব্দের প্রাধান্য বেশী ; পদান্তরে, চলিত ভাষায় তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী শব্দের প্রাধান্য অধিক। কিন্তু চলিত ভাষায় স্বরসঙ্গতি, অভিশ্রুতি ও সমীকরণ প্রভৃতি নিয়মাত্মসারে তৎসম শব্দগুলির অল্পবিস্তর পরিবর্তিত রূপই ব্যবহৃত হয়। যেমন : ব্যাঘ্র>বাঘ, ভল্লুক>ভালুক, চন্দ্র>চাঁদ, স্বর্ণ>সোনা, কণ্টক>কাঁটা, পক্ষ>পাখী, দধি>দৈ, দুগ্ধ>দুধ, অহু>আহু, কার্ঘ>কাজ, দ্বিপ্রহর>দুপুর, বৃত্তিকা>মাটি, জীবিত>জ্যান্ত, পত্র>পাতা, মক্ষিকা>মাছি ইত্যাদি। [তাছাড়া আরো কিছু তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী শব্দের অল্পরূপ পরিবর্তন ঘটে—বাহিরে>বাইরে, বাহির>বা’র, বের ; উঠান>উঠোন, ভিতর>ভেতর, উনান>উনুন, দেশী>দিশি, বিলাত>বিলিতি, নাই>নেই, কলিকাতা>কলকাতা, বোম্বাই>বোম্বে ইত্যাদি।] ২. সাধুভাষায় পত্র, লেখনী সংবাদ, পুস্তক, বাতায়ন, শয্যা, বিপণি ইত্যাদি তৎসম শব্দের বিদেশী প্রতিশব্দ বখাক্রমে চিঠি, কলম, খবর, বই, জানালা, বিছানা, দোকান, ইত্যাদি চলিত ভাষায় ব্যবহৃত হয়। ৩. সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়াপদে এই পার্থক্য স্পষ্ট। যেমন : সমাপিকা ক্রিয়া—করিতেছে>করছে, করিয়াছি>করেছি, করিয়াছিল>করেছিল, করিলাম>করলাম, করলেম, করলুম ; করিতাম>করতাম, করতেন ; করিতেছিল>করছিল, করিবে>করবে ইত্যাদি। অসমাপিকা ক্রিয়া—পড়িয়া>পড়ে, চলিতে>চলে, বসিয়া>

বলবার, ধরিবার>ধরবার ইত্যাদি। ৪. ক. বৌগিক বা সংযোগমূলক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে সাধুভাষায় ‘কিণ্ড হইয়া উঠিল’, ‘লড়াই করিতে’, ‘বিক্রয় করিয়া দিল’, ‘পাঠ করিতে’, ‘বৃত্তান্তে পতিত হইল’, ‘স্বোদন করিতে’, ‘অঙ্কন করিতে’, ‘দর্শন করিয়া’, ‘পলায়ন করিল’ ইত্যাদি চলিত ভাষায় হইবে যথাক্রমে ‘ক্ষেপে উঠলো’, ‘লড়তে’, ‘বেচে দিল’, ‘পড়তে’, ‘মারা গেল’, ‘কাঁদতে’, ‘আঁকতে’, ‘দেখে’, ‘পালালো’ ইত্যাদি। ৪. সর্বনাম পদেও এই পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে। যেমন : তাহারা>তারা, বাহারা>বারা, কাহারা>কারা, তাহার>তার, বাহার>বার, কাহার>কার, তাহা>তা, সেই>সে, এই>এ ইত্যাদি। ৫. অমুসর্গ ব্যবহারের ক্ষেত্রে তদ্ভব-প্রাধান্ত লক্ষণীয়। যেমন : জ্ঞাত>জ্ঞাতে, হইতে>হতে [থেকে], দ্বারা>দ্বারা, দিয়া>দিয়ে, অপেক্ষা>চেয়ে ইত্যাদি। ৬. চলিত বাংলায় সংস্কৃত অব্যয়গুলির তদ্ভব রূপই ব্যবহার করিতে হয়। যেমন : অনন্তর>তারপর, যতপি>যদি, তথাপি>তবুও, বরঞ্চ>বরং, অতঃ>অতঃ ইত্যাদি। ৭. চলিত বাংলায় ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রাধান্তও যথেষ্ট। যেমন : হনহন, ধম্‌ধম্‌, গম্‌গম্‌, পৌ পৌ ইত্যাদি।

এইগুলি সাধারণ পার্থক্য; কিন্তু ইহা ছাড়া রহিয়াছে আরও বহু অল্প পার্থক্য। যেমন : সাধু ভাষার চাল গুরুগম্ভীর; চলিত ভাষার চাল অপেক্ষাকৃত লঘু। কিন্তু সাধুভাষা অপেক্ষা চলিত ভাষার গতি স্বচ্ছন্দ, সাবলীল এবং সহজবোধ্য। বাংলা গণের উন্মেষ-লগ্নে তাহার ভাগ্য-রচনার কাজ ঐতিহাসিক কারণেই সংস্কৃত পণ্ডিত-গণের হস্তেই পড়িয়াছিল। ফলে, তাহাদের হস্তে সংস্কৃতের প্রাধান্ত-বতল সাধু ভাষার উদ্ভব হয়। পরে প্যারীচাঁদ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহের যথাক্রমে ‘আলালের ঘরের দুলাল’ ও ‘হতোম পেঁচার নকশা’ প্রকাশিত হওয়ায় চলিত ভাষার পথ খুলিয়া যায়। উল্লিখিত গ্রন্থ দুইখানি ‘কলিকাতা কক্‌নি’ বা ‘কলিকাতার ঈষৎ নিম্নস্তরে ব্যবহৃত চলিত বুলি’তে প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ লণ্ডন শহরের সাধারণ লোকের কথা ভাষা—‘London Cockney’র অচকরণে ‘কলিকাতা কক্‌নি’ শব্দটি গড়িয়া উঠিয়াছে এবং বাংলা ভাষাতত্ত্বে গৃহীত হইয়াছে।

● বাংলা সাধু ভাষার দৃষ্টান্ত : ১. কুপক্ষেত্রে এক অবাচক বিশ্র ছিলেন। তিনি অবাচিত-প্রাপ্ত অরবস্তাধিতে যথাক্রমে প্রাসাদে নদ ও পরিবার-পরিচালন করত কালক্ষেপ করেন। দৈবাৎ এই কুরুক্ষেত্রে পঙ্গপাল পক্ষীতে ভাবঃ শত নট হওয়াতে অত্যন্ত দুঃখিত হইল, তৎপ্রযুক্ত ঐ অবাচক ব্রাহ্মণের বড় অগ্রভুল হইল এবং পরিবার পরিপোষণে অনির্বাহ হইল। প্রবেশচক্রিকা : ব্রাহ্মণের বিভ্রান্তকার

২. শতাব্দী বৎসর হইতে অধিককাল এদেশে ইংরেজের অধিকার হইয়াছে তাহাতে প্রথম ত্রিংশ বৎসরে তাহাদের বাকের ও ব্যবহারের দ্বারা ইহা সর্বত্র বিখ্যাত ছিল যে তাহাদের নিয়ম এই যে কাহারও ধর্মের সহিত বিপক্ষতাচরণ করেন না ও আপনার ধর্ম সকলে করুক ইহাই তাহাদের যথার্থ কামনা। : রামমোহন

৩. এই সেই জনহীনমধাবর্তী প্রশ্রবণ গিরি। এই গিরির শিখরদেশে আকাশপথে সতত সক্ষরমান অলধরমণ্ডলীর যোগে, নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত; অধিত্যাকা প্রবেশ ঘন স্রিকিষ্ট বনপাদপসমূহে নিবৃত্ত, শীতল ও রমণীয়, পাদবেশে প্রশ্রবণসলিলা গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া প্রবল বেগে গমন করিতেছে।

সীতার বনবাস : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

৪. বান্দীকির বামপার্শ্বে এক পরম রূপবান যুগ্মপুত্র চিত্রিত পরিচ্ছন্ন পরিধান করিয়া বিবিধ বর্ণবিভূষিত কুৎসাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। ঐ আসনের সৌরভে সর্বদান আমোদিত হইতেছিল। তিনি

## সাদু ও চলিত ভাষা

নাকি উজ্জয়িনীনিবাসী নৃপতি-বিশেষের সভাসদ থাকিয়া, নৃপতি অপেক্ষা শতগুণে কীর্তিদেবীর প্রিয়গাত্র হইয়াছেন।

স্বপ্নবর্ণন : অক্ষয়কুমার দত্ত

৫. জলের ধারে তীরে তীরে, মাঠে মাঠে রাখালেরা গোরু চরাইতেছে, কেহ বা বৃকের তলায় বসিয়া গান করিতেছে, কেহ বা ভামাকু খাইতেছে, কেহ বা মাঝামাঝি করিতেছে, কেহ বা ভুজা খাইতেছে। কৃষকেরা লাঙ্গল চবিত্তেছে, গোরু ঠেসাইতেছে, গোরুকে মানুষের অধিক করিয়া গালি দিতেছে।...ঘাটে ঘাটে কৃষকের মহিষীরাও কলসী, ছেঁড়া কাঁথা, পচা মাদুর, কপাট তাবিল, নাকছাবি, পিতলের পৈছে, দুই মাসের মথলা পরিধেয় বস্ত্র, মস'নিষিত গায়ের বর্ণ, রুক্ষ কেশ লইয়া বিরাজ করিতেছেন। বিষয়ক : বঙ্কিমচন্দ্র

● বাংলা চলিত ভাষার দৃষ্টান্ত : ১. আপনি না শুনিতে কহে কে। আমিই যেন মিথ্যা ব'হলাম। গ্রামে আব লোক আছে জিজ্ঞাসা করুন না দিকি তাঁহাধিককে তাঁহারা কি বলেন।

কথোপকথন : উইলিয়ম কেরী

২. মোবা চাব করিব, কলস পাও। রাজস্ব দিয়া যা থাকে তাহাতেই বছর শুদ্ধ অন্ন কবিতা খাবো, ছেলপিলেগুলি পুঁষিব।...শাকভাত পেট ভরিয়া যেদিন পাই সেদিন তো জন্মদিন। : মুতুসুখ বিজ্ঞানস্বার

৩. বাবুদামবাবু চৌগোপ.পা—নাকে তিনক—কস্তাপেড়ে ধুতিপবা—ফুলপুকে জুশ পায়—উদরটি গগণেশেব মন—কোচান চাষবাখনি কাঁধে—একগাল পান—ইতস্ততঃ বেড়াইবা। চাকবকে বলছেন—ওর হরে। শীঘ্র বালি ঘাইতে হলেব, দুই চার পয়স'য় একখান চলুতি পানসি ভাড়া কব তো। বড় মানুষেরে খানসামার মাথো মাথো বেধ'দপ হব। হবে বলিল, মোদায়েব যেমন কাণ্ড। ভাত খেতে বসেছিল—ডাকাডাকিতে ভাত ফেবে রেখে এসেছে।...চলুতি পানসি চার পয়সার ভাতা করা আমার কম নব—একি খুতকুড়ি দিয়ে ছাছু গোলা ? : পানবীচ, মিত্র

৪. অমাবস্ত্যর বাতির—অন্ধকার ঘুবুটি—গুরগুর কবে মেঘ ডাকছে—থেকে থেকে বিদ্যুৎ নলপাচ্ছে—গাছের পাতাটি নড়ে না—মাটি থেকে যেন আগুনের ভাপ বেরচ্ছে—পথিকেরা এক একবার আকাশের পানে চাচ্ছেন, আর হন হন করে চলেছেন। কুবুসগুলো দেউ ঘেঁড় কচ্ছে—শাকানীরা ঝাঁপতাদা বন্ধ করে বাবার ডঙ্কুগ কচ্ছে—গুড়ুম করে নটার তোপ পড়ে গালা। : কালীপ্রসন্ন সিংহ

৫. ছুটির রবিবার। আগের সন্ধ্যাবেলায় ঝাঁঝি ডাকছিল বাইরের দৃষ্টির বাগানেব ঝোপে, গুলটা ছিন্ন গুড়াকাতেব। ছায়া-কাঁপা ঘরে মিটমিট আলোতে বুক করছিল ধুকধুক। পরদিন ছুটির ঝাঁকে পাকি: ৩ চড়ে বসলুম। সেটা চলতে শুরু করল বিনা চলায়, উড়ে ঠিকানায, গল্পের জালে জড়ানো মনটাকে ভয়ের পায় দেবার জন্তে। : রবীন্দ্রনাথ

৬. এই বেলা গঙ্গার শোভা যা দেখবার দেখে নাও। আব বড় একটা কিছু থাকছে না। দৈত্যদানবের হাতে পড়ে এ সব যাবে। ঐ ঘাসের জায়গায় উঠবেন ইটের পাঁজা, আর না'বেন ইটখোলাব গর্ভকুল। যেখানে গঙ্গার ছোট ছোট ঢেউগুলি ঘাসের সঙ্গে খেলা করছে, সেখানে দাঁড়বেন পাটোবাঝি ফ্লাট আর সেই গাধাবোটা, আর তালতমাল আমনীচুর রঙ, ঐ নীল আকাশে মেঘের বাহার ও সব। আর দেখতে পাবে ? : স্বামী বিবেকানন্দ

৭. লিখিত ভাষার আর মুখেব ভাষার মূলে কোন প্রভেদ নাই। ভাষা দুয়েরই এক। শুধু প্রকাশের উপায় ভিন্ন। একদিকে শব্দের সাহায্যে, অপরদিকে অক্ষরের সাহায্যে। বাণীর বসতি রসনার। শুধু মুখের কথাই জীবন্ত। বস্তুর পারা যায়, যে ভাষার কথা কই সেই ভাষার লিখতে পারলেই যেন লেখা গ্রাণ্ড পার। : প্রমথ চৌধুরী

৮. পরদিন সকালে ক'জন চাষা দেখতে গেলে, একটা বৃদ্ধ বাঘ পগারের ভেতর ধুকছে। চাষাবোলা করে নিয়ে গেল ডেপুটি বাবুর বাড়ি। তিনি বললেন—'এমন বাঘ তো দেখিনি, গাঘার মতো রং। আহা শেরালাে কামড়েছে, একটু হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দি'। : রাতুলেশ্বর বসু

• সাধু ভাষা হইতে চলিত ভাষায় রূপান্তর :

১. সাধু ভাষা : “যখন জলবেগ এমন মন্দীভূত হইয়া আসিল যে, নৌকার গতি সংযত করা বাইতে পারে, তখন যাত্রীরা রহুলপুরের মোহানা অতিক্রম করিয়া অনেক দূরে আসিয়াছিলেন। এখন নবকুমারের জন্ত প্রত্যাবর্তন করা বাইবে কি না, এ বিষয়ের মীমাংসা আবশ্যক হইল।” : বঙ্কিমচন্দ্র

চলিত ভাষা : যখন জলের বেগ এমন শান্ত হয়ে এলো যে, নৌকার গতি সামলানো যেতে পারে, তখন যাত্রীরা রহুলপুরের মোহানা পেরিয়ে অনেকদূর চলে এসেছিলেন। এখন নবকুমারের জন্তে ফেরা যাবে কি না, এ বিষয়ে ঠিক করা দরকার হলো।

২. সাধু ভাষা : “পরদিবস প্রাতঃকালে সেই পর্বতশ্রেণীর মধ্যে যে পর্বত বনাকীর্ণ, সেই পর্বতের পথ দিয়া নিয়ে পদব্রজেই আরোহণ করিতে লাগিলাম। পর্বত আরোহণ করিতে যেমন কষ্ট, অবরোহণ করা তেমনি সহজ।” : দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

চলিত ভাষা : পরের দিন ভোরবেলায় সেই পাহাড়ের সারির মধ্যে যে পাহাড় বনে ঢাকা, সেই পাহাড়ের পথ দিয়ে নিচে পায়ে হেঁটেই নামতে লাগলাম। পাহাড়ে ওঠা যেমন কষ্ট, নামা তেমনি সহজ।

চলিত ভাষা হইতে সাধু ভাষায় রূপান্তর :

১. চলিত ভাষা : “তখন ভোর হয়েছে, মেলা-শেষে মলিন মুখে যে বার ঘরে ফিরছে, বাপ্পা সেই যাত্রীদের সঙ্গে ঘরে ফিরলেন।” : অবনীন্দ্রনাথ

সাধু ভাষা : তখন প্রভাত হইয়াছে, মেলাস্তে মলিন মুখে যে বাহার গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেছে, বাপ্পা সেই যাত্রীদের সহিত গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

২. চলিত ভাষা : “ছিনাথ কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিল ; কিন্তু পিসেমশায়ের আর রাগ পড়ে না। পিসিমা নিজের উপর হইতে কহিলেন, তোমাদের ভাগ্য ভালো যে, সত্যিকারের বাব-ভালুক বার হয়নি। যে বীরপুরুষ তোমরা, এবং তোমার দারওয়ানরা ! ছেড়ে দাও বেচারিকে, আর দূর করে দাও দেউড়ির ঐ খোঁটোগুলোকে। একটা ছোট ছেলের বা সাহস, একবাড়ি লোকের তা নেই।” : শরৎচন্দ্র

সাধু ভাষা : ছিনাথ কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিল ; কিন্তু পিসামহাশয়ের আর ক্রোধের উপশম হয় না। পিসিমা স্বয়ং উপর হইতে কহিলেন, তোমাদের ভাগ্য প্রসন্ন যে, সত্যিকারের ব্যাঘ্র-ভালুক বাহির হয় নাই। যে বীরপুরুষ তোমরা আর তোমার দারবানেরা ! ছাড়িয়া দাও বেচারাকে [ হতভাগ্যকে ], আর দূর করিয়া দাও দেহলীর হিন্দুহানীগুলোকে। একটি ছুজ বালকের যে সাহস একগৃহ মহন্তের তাহা নাই।

●শ্রবণ রাখিতে হইবে যে, একই রচনায় সাধু ও চলিত ভাষার সংমিশ্রণ অসংগত, অশিষ্ট ও অশুভ। বৈয়াকরণেরা সাধু ও চলিত ভাষার এই অশিষ্ট প্রয়োগকে গুরুচণ্ডাল দোষ বা গুরুচণ্ডালী দোষ নামে অভিহিত করিয়াছেন। যেমন : ‘শব দাহ’ কিংবা ‘মড়া পোড়ান’ শুভ। কিন্তু ‘শব পোড়ান’ বা ‘মড়া দাহ’ অশুভ।

**ভাষাগোষ্ঠী :** একই ভাষায় যে জনসমষ্টি কথাবার্তা বলে এবং ভাব-বিনিময় করে, সেই জনসমষ্টিকে বলে ভাষাগোষ্ঠী [ Speech Community ]।

**অপভাষা :** আবার এক ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ ভালোভাবে না শিখিয়া যদি অন্য ভাষাগোষ্ঠীর ভাষা ব্যবহার করে, তবে তাহার সেই ভাষা ব্যবহার, বলা বাহুল্য, নিতুল হইবে না। ভাষার এই বিকৃত ব্যবহারকে বলা হয় অপভাষা।

## ● খাটি বাংলা শব্দের সন্ধি

পরস্পর-সন্নিহিত দুইটি বর্ণের মিলনকে সন্ধি বলা হয়।

উচ্চারণ-প্রকৃতিই সন্ধির মূল। আবার, বাংলা উচ্চারণ-প্রকৃতি সংস্কৃত উচ্চারণ-প্রকৃতি হইতে ভিন্ন। সেইজন্য বাংলা-সন্ধির বৈশিষ্ট্য সংস্কৃত-সন্ধির বৈশিষ্ট্য হইতে ভিন্ন। তবে তৎসম শব্দগুলি সংস্কৃত হইতে গৃহীত বলিয়া সংস্কৃত-সন্ধির নিয়ম সেই শব্দগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অতএব বাংলার নিজস্ব রীতিতে সন্ধি সংঘটিত হয়।

১. সংস্কৃতে বাক্য-মধ্যস্থিত সন্নিহিত পদগুলি সন্ধিহীন মিলিত হয়; কিন্তু বাংলায় তাহা হয় না। যেমন : সংস্কৃতে—কুশলম্+ইচ্ছসি=‘কুশলমিচ্ছসি’। কিন্তু বাংলায়—কুশল+ইচ্ছাকর=‘কুশলেচ্ছাকর’ হয় না। ‘কুশল’ অ-কারান্ত হইলেও বাংলায় হসন্তরূপে উচ্চারিত হয়। তাহার সহিত পরস্থিত ‘ই’-র মিলনে বাধা নাই। কিন্তু তাহা হয় না। সন্নিহিত স্বর ও ব্যঞ্জনগুলি এরূপ সন্ধিহীন আবদ্ধ না হইয়া নিজের স্বতন্ত্রতা লইয়া সহাবস্থান করে।

২. সংস্কৃতে সন্ধি উচ্চারণ-জনিত হইলেও লেখায় অবিধা নাই; কিন্তু বাংলায় উচ্চারণ-জনিত সন্ধি সংঘটিত হইলেও লেখা যায় না, লেখা হয়ও না। যেমন : সংস্কৃতে—আনন্দাৎ+হি+এব=‘আনন্দাৎহ্যেব’ বলাও ‘বায়, লেখাও বায়। সেইভাবে বাংলায়—হাত+ধরা=হাদধরা বা হাঙ্করা কিংবা কচু+আলু+আদা=কচুআদা হয়তো বলা বায়, লেখা বায় না। কারণ, তাহা বাংলা ভাষার রীতি-প্রকৃতির বিরোধী।

৩. সংস্কৃতে পদান্ত বিভক্তি ও প্রত্যয়ের সহিত পরবর্তী শব্দের আদিবর্ণের সন্ধিতে কোন বাধা নাই। যেমন : সংস্কৃতে—কর্মণি+এব+অধিকারঃ+তে=‘কর্মণ্যেবাধিকারন্তে’ ব্যাকরণ-সম্মত এবং নিতুল। কিন্তু বাংলায়—‘নতুন-দাদার অভিজ্ঞতার ইচ্ছা জন্ম গ্রান হাসিয়া কহিল’ কখনও ‘নতুন-দাদার অভিজ্ঞতার ইচ্ছা জন্ম গ্রান হাসিয়া কহিল’ হইবে না। সংস্কৃতে—ভবামি+অহম্=‘ভবাম্যহম্’ হয়, কিন্তু বাংলায়—হব+আমি=‘হবামি’ হয় না। তবে লৌকিক উচ্চারণের ফলে ‘আর না কালী’=‘আলাকালী’ বা ‘বা ইচ্ছে তাই’=‘বাচ্ছেতাই’ হইয়া থাকে। বলাবাহুল্য এইগুলি সমীকরণ-ঘটিত এবং দুর্লভ দৃষ্টান্ত।

৪. সংস্কৃতে লম্বাসব্দ পদে সম্ভব হইলে সন্ধি সংঘটিত হয়। যেমন : লবণাধ্বরাশেঃ+ধারানিবন্ধেব=‘লবণাধ্বরাশেধারানিবন্ধেব’। কিন্তু বাংলায় লম্বাসব্দ পদে এইরূপ হয় না। যেমন : লবণজলরাশির+ধারা=লবণজলরাশিধারা হয় না। অবশ্য, ষোড়শ

+ডিম = 'বোড়াডিম' হয়। কিন্তু কোন কোন বৈয়াকরণ ইহাকে অশুদ্ধ বলিয়া গণ্য করেন।

### সন্ধির প্রকার ভেদ

বাংলায় সন্ধি মূলতঃ দুই প্রকার : স্বরসন্ধি ও ব্যঞ্জনসন্ধি।

স্বরবর্ণের সহিত স্বরবর্ণের মিলনকে স্বরসন্ধি বলা হয়। স্বরবর্ণের সহিত ব্যঞ্জনবর্ণের বা ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত ব্যঞ্জনবর্ণের মিলনকে ব্যঞ্জনসন্ধি বলা হয়।

### খাঁটি বাংলা স্বরসন্ধি

বাংলা ভাষার নিজস্ব প্রকৃতি-অনুযায়ী বাংলা ভাষার সন্ধির নিয়মগুলিও অনেকটা শিথিল। বাংলা সন্ধির নিয়মগুলি মূলতঃ উচ্চারণ-নির্ভর। সমীকরণ, স্বরসন্ধি, বর্ণলোপ ইত্যাদি প্রধানতঃ এই সন্ধির মূল ভিত্তি।

ক. বাংলা স্বরসন্ধির কতকগুলি ক্ষেত্রে তৎসম শব্দের নিয়ম অনুসৃত হয়। যেমন : চাষ+আবাদ=চাষাবাদ, জেঠা+আমি=জেঠামি, নষ্ট+আমি=নষ্টামি, হুট+আমি=হুটামি, ঠাকুর+আলি=ঠাকুরালি, মিতা+আলি=মিতালি, দূত+আলি=দূতালি, ভান্স+আনি=ভান্সানি, বঙ্গ+আল=বঙ্গাল।

ঋ স্বরগীয় যে, সংস্কৃত ও অসংস্কৃত শব্দে সন্ধি হয় না। তবে কতকগুলি ক্ষেত্রে এরূপ অশুদ্ধ সন্ধি চলিয়া আসিয়াছে। যেমন : দিল্লী+ঈশ্বর=দিল্লীশ্বর, ঢাকা+ঈশ্বরী=ঢাকেশ্বরী, ইংলণ্ড+অধিপতি=ইংলণ্ডাধিপতি, আইন+অনুসারে=আইনানুসারে, আইন+অনুগ=আইনানুগ, হিসাব+আদি=হিসাবাদি, গ্যাস+আলোক=গ্যাসালোক।

খ. কাছাকাছি, মোটামুটি অর্থে 'এক' প্রত্যয়ের পূর্ববর্তী 'অ'-কার লুপ্ত হয় এবং 'এ' পূর্ববর্ণের সহিত যুক্ত হয়। যেমন : তিল+এক=তিলেক, অর্ধ+এক=অর্ধেক, বার+এক=বারেক, আধ+এক=আধেক, ষত+এক=ষতেক, দশ+এক=দশেক, শত+এক=শতেক, চার+এক=চারেক, পাঁচ+এক=পাঁচেক।

গ. 'এক' ও 'এর' প্রত্যয়ের পূর্বে 'অ' ভিন্ন স্বরবর্ণ থাকিলে 'এ'-কার লুপ্ত হয়। যেমন : থানি+এক=থানিক, কোটি+এক=কোটিক, গুটি+এক=গুটিক, কুড়ি+এক=কুড়িক, কলকাতা+এর=কলকাতার, দিল্লী+এর=দিল্লীর।

ঘ. 'ই'-কার ও 'ও'-কারের পূর্ববর্তী 'অ'-কার লুপ্ত হয় এবং ই অথবা ও পূর্ববর্ণের সহিত যুক্ত হয়। যেমন : আমার+ই=আমারি, সবার+ই=সবারি, তোমার+ই=তোমারি, বখন+ই=বখনি, তখন+ই=তখনি, এখন+ই=এখনি, আমার+ও=আমারো, তোমার+ও=তোমারো, তখন+ও=তখনো, এখন+ও=এখনো, কখন+ও=কখনো, কোন+ও=কোনো, আর+ও=আরো, কার+ও=কারো।

ঙ. সন্নিহিত দুইটি স্বরবর্ণের পরবর্তী স্বরটি লুপ্ত হয়। যেমন : বা+ইচ্ছে+তাই=বাচ্ছেতাই।

খাঁটি বাংলা ব্যঞ্জনসন্ধি : বাংলার নিজস্ব উচ্চারণ-রীত অল্পসংখ্যক বাংলা ব্যঞ্জনসন্ধি সংঘটিত হয়।

ক. বর্ণের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ বা য়, র্, ল্, ব্, হ্ পরে থাকিলে বর্ণের প্রথম বর্ণের স্থানে তৃতীয় বর্ণ হয়। যেমন : ছোট+দি=ছোড়দি, এত+দূর=এদূর, পাঁচ+জন=পাঁজ্জন, রাত+দিন=রাদিন, এক+গা=এগ্গা, এক+ঘা=এগ্ঘা, ডাক+ঘর=ডাগ্ঘর, পাপ+ভয়=পাব্ভয়, চাক+ভাড়া=চাগ্ভাড়া, নাত+বউ=নাদবৌ, ভাত্র[=ভাত্ ]+বধু=ভাত্রবধু, বট+গাছ=বড্গাছ, হাত+দেখা=হাদ্দেখা।

খ. বর্ণের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ পরে থাকিলে তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণের স্থানে সেই বর্ণের যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ হয়। যেমন : বড়+ঠাকুর=বট্ঠাকুর, আধ+খানা=আংখানা, রাগ+করোনা=রাক্করোনা, মেঘ+করেছে=মেক্কারেছে।

গ. শ্, ষ্, স্ পরে থাকিলে চ্ স্থানে ‘শ্’ হয়। যেমন : পাঁচ+সের=পাঁশ্‌সের, পাঁচ+সিকে=পাঁশ্‌সিকে।

ঘ. চ-বর্ণ পরে থাকিলে পূর্ববর্তী ত-বর্ণ স্থানে ‘চ’ বর্ণ হইয়া যায়। যেমন : নাতি [ নাত্ ]+জামাই=নাজ্জামাই, ভাত+জল=ভাজ্জল, বদ+জাত=বজ্জাত, সাত+জোড়া=সাজ্জোড়া, হাত+জোড়া=হাজ্জোড়া, দুধ+জাল=দুজ্জাল।

ঙ. চ-বর্ণ পরে থাকিলে পূর্ববর্তী স্বর লুপ্ত হয় এবং চ-বর্ণের ‘দ্বিহ’ হয়। যেমন : জুয়া+চোর=জোচ্চোর।

চ. ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্ববর্তী স্বরবর্ণ লুপ্ত হয়। যেমন : কাঁচা+কলা=কাঁচকলা, মিশি+কালো=মিশ্‌কালো, বেশী+কম=বেশকম, সারি+বন্দী=সারবন্দী, টাকা+শাল=টাকশাল, ঘোড়া+দৌড়=ঘোড়দৌড়, ঘোড়া+গাড়ি=ঘোড়গাড়ি, ঘোড়া+সওয়ার=ঘোড়সওয়ার, ভরা+সাঁঝ=ভরসাঁঝ, ভরা+দুপুর=ভরদুপুর, পিসি+শাওড়ি=পিসিশাওড়ি, বোকা+চন্দ্র=বোকচন্দ্র।

ছ. র্-কারের পর ব্যঞ্জনবর্ণ থাকিলে র্-এর লোপ হয় এবং ব্যঞ্জনবর্ণের ‘দ্বিহ’ হয়। যেমন : ঘর+জামাই=ঘজ্জামাই, ঘোড়ার+ডিম=ঘোড়াডিম, চার+টি=চার্টি, মার+না=মার্না, কর+তাল=কর্তাল, হর+তাল=হর্তাল, বাপের+জন্মে=বাপেজ্জন্মে, ব্যাটার+ছেলে=ব্যাটাছেলে, দর+জাল=দজ্জাল [ দজ্জাল ], দূর+ছাই=দুজ্ছাই, দূর+তোর=দুতোর।

জ. ট-বর্ণ পরে থাকিলে ত-বর্ণ স্থানে ‘ট-বর্ণ’ হয়। যেমন : হাত+টান=হাট্টান, পুরুত+ঠাকুর=পুরুট্ঠাকুর, এত+টুহু=এট্‌টুহু।



•৬. ত-বর্ণের পর 'স' থাকিলে উভয়ে মিলিয়া 'চ্ছ' হয়। যেমন : উৎ+সন্ন=উচ্ছন্ন, বৎ+সন্ন=বচ্ছন্ন, কুৎ+সিত=কুচ্ছিত, উৎ+সব=উচ্ছব, মহা+উৎ+সব=মোচ্ছব।

•৭. 'হ' পরে থাকিলে বর্ণের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণের স্থানে যথাক্রমে দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ হয়। যেমন : কাত+হও=কাথও, লাজ+হীন=লাধীন, রাগ+হয়=রাঘয়, বাপ+হারা=বাফারা, সব+হয়=সভয়, ভাত+হয়েছে=ভাথয়েছে।

## ॥ অনুসরণী ॥

১. সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা কাহাকে বলে? কয়েকটি বাক্যের দৃষ্টান্ত সহযোগে ইহাদের পার্থক্য বুঝাইয়া দাও। মা. [কম্পার্ট.] '৩১

২. সাধু ভাষা ও চলিত ভাষার পার্থক্য নির্দেশ কর। মা. '৬৫

৩. চলিত ভাষার রূপান্তরিত কর :

ক. আমি সায়ংকালে এই নদীর সৌন্দর্যে মোহিত হইয়া একাকী তাহার তীরে বিচরণ করিতেছিলাম, হঠাৎ উপরে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি যে 'পর্বতো বহিমান', পর্বতের উপরে স্বীপমালা শোভা পাইতেছে। —বেবেলনাথ

খ. পিতৃদেবের মুখে এই হৃদয়বিহারণ উপাখ্যান শুনিয়া, আমার অন্তঃকরণে যেমন দুঃসহ দুঃখানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, স্ত্রীজাতির উপর তেমনই প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিয়াছিল। —বিদ্যাসাগর

গ. প্রায় দুইশত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে একদিন মাঘমাসের রাত্রিশেষে একখানি বাজীর নৌকা বঙ্গোপসাগর হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিল। —বক্সিসল্ল

ঘ. 'আহা কি দেখিলাম। এমন অদ্ভুত স্বপ্ন কখনও দেখি নাই। এমন কলরব-পরিপূর্ণ লোকাকীর্ণ স্থান কোথাও দৃষ্টি করি নাই। এই অসীম ভূমিখণ্ডের মধ্যস্থলে, এক পরম শোভাকর অপূর্ব পর্বত বর্ণন করিলাম।' —

ঙ. মনুষ্য কতকদূর পশ্চরিজ ত্যাগ করিয়া উন্নতাবস্থার দাঁড়াইয়াছে। অনেক সময়ে মনুষ্য ভয়ে ভীত না হইয়াও সংকম্পানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়।

৪. সাধুভাষার রূপান্তরিত কর :

ক. কাল এসে পৌঁছেছি শিলং পর্বতে, পথে কত যে বিঘ্ন ঘটল তার ঠিক নেই। মনে আছে বোলপুর থেকে আসবার সময় মা গঙ্গা আনাকে জল-কাঁটার মধ্যে হিঁচড়ে এনে সাবধান করে দিয়েছিলেন।

খ. তার পরে দু বছর যায়। ইতিমধ্যে বলাইয়ের কাকি গোপনে চোখের জল মোছেন, আর বলাইয়ের জন্ত শোবার ঘরে গিয়ে তার ছেঁড়া একপাটি জুতো, তার রবারের কাটা গোলা, আর আনোয়ারের ছবির বই নাড়েন চাড়েন। —রবীন্দ্রনাথ

গ. সেজেগুজে বসে থাকলে কি হবে বল? ও টুপি-টাপা মাথার দিগে আর কি হবে বল? যত ঘোব হিঁহুর ঘাড়ে ফেলে সাহেবের গা ঘেঁষে দাঁড়াতে গেলে, লাথি ঝাঁটার চোটটা বেশি বই কম পড়বে না। —স্বামী বিবেকানন্দ

ঘ. সকালে পৃথীরাজ সেজেগুজে সজ্জকে ধরবার জন্ত বার হবেন, এমন সময় শিরোহি থেকে পৃথীরাজের ছোট বোন এক পত্র পাঠালেন। —অবনীন্দ্রনাথ

ঙ. কানাল নিরস্ত্র হয়ে বোকার রত দাঁড়িয়ে আছে। তখন ঈশ্বর বললে, 'যে লকড়ি হাতে ধরে রাখতে পারে না, সে আবার খেলবে কি।' উ. মা. '৬৬ [লকড়ি—লাঠি, লণ্ড]

চ. বিনি গড়তে জানেন তিনি শিবও গড়তে পারেন, বাঁধও গড়তে পারেন। আমাঘের সঙ্গে বড় বড় শিল্পীদের তফাৎ এটুকু যে, তাঁদের হাতে এক করতে আর হয় না। সম্ভবতঃ এই কারণে কলারাগের ফলাফলদের বা খুলি তাই করবার যে অধিকার আছে, ইতর-শিল্পীদের সে অধিকার নেই।

৫. 'আমরা বর্জিপাড়ার ছেলে—বকে ভর করিনে তা জানিস? কিন্তু তা বলে হোটেলোকদের dirty পাড়ার মধ্যে আমরা বাইনে। ব্যাটাদের গায়ের গন্ধ নাকে গেলে আমাদের ব্যামো হয়। উ. মা. '৩৪ [ হোটেলোকদের—ইতর ব্যক্তির, dirty—জ্ঞানপূর্ণ, ব্যাটা—বৎস, ব্যামো—ব্যধি ]

৬. 'তুমি আমর পাণ্ডবের সঙ্গে দুর্বারহার করে আসছ, কিন্তু তাঁরা তা সরেছেন। পাণ্ডবরা যে রাজ্য জয় করেছিলেন, তা এখন তুমি ভোগ করছ।' উ. মা. '৩৭

[ পাণ্ডবের—পাণ্ডবগণের, সঙ্গে—সহিত, করে আসছ—করিয়া আসিতেছ, তাঁরা তা সরেছেন—তঁহারা তাহা সঙ্করিয়াছেন, পাণ্ডবরা—পাণ্ডবগণ, করেছিলেন—করিয়াছিলেন, তা—তাহা, করছ—করিতেছ। ]

৭. গুচগুলাী দোব কাহাকে বলে? উদাহরণসহ বুঝাইয়া দাও।

৮. কোন্ কোন্ বিষয়ে সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য নির্ভর করে দৃষ্টান্তসহ আলোচনা কর।

৯. কাহাকে বলে লিখ ও উদাহরণ দাও:

উপভাষা অপভাষা ও ভাষাপোত্তী।

১০. ষাঁটি বাংলা সন্ধি কাহাকে বলে? দৃষ্টান্ত দাও।

১১. সন্ধি-বিচ্ছেদ কর: ঠাকুরালি, নষ্টামি, মিতালি, কাঁচকলা, ভান্ধানি, বারেক, অর্ধেক, শতেক, খানিক, কলকাতার, হোড়পি, ভাত্রবধু, মাল্লা, চাট্টি, দুচ্ছাই, নাজ্জামাই, ভান্ধজল, বজ্জাত, হাটান, উচ্ছন্ন, মোচ্ছব, কুচ্ছিং, দজ্জাল, বেশকম, সারবন্দী, টাকশাল, যোডনওয়ার, ভরসাঁব।

১২. সন্ধি কর: কর+তাল, চুব+আবাব, দূত+আলি, দিল্লী+এর, ডাক+ঘর, চাক+ভান্ধা, পাপ+ভব, বড+ঠাকুর, আধ+খানা, পাঁচ+জন, ঘেঘ+করেচে, পাঁচ+সের, নাতি+জামাই, জুয়া+চোর, বাপের জয়ে, দুব+তোর, বা+ইচ্ছো+তাই, হর+তাল, বং+সর, মহা+উৎ+সব, পুস্ত+ঠাকুর।

১৩. সন্ধি কব: ভাত+হয়েছে, নাচ+হবে, রাত+হবে, নাটক+হচ্ছে, আলাপ+হলো, রাগ+হবেছে, কাজ+হলো।

১৪. ষাঁটি বাংলা সন্ধির বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে লিখ। সংস্কৃত সন্ধি সহিত তাহার পার্থক্য কোথায়?

২.

বর্ণ ও  
বর্ণের উচ্চারণ

বর্ণ

ধ্বনিই হইল ভাষার মূল উপকরণ।' মাহুষের বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনি হইতে ভাষার স্রষ্টি। কাজেই, বহু ধ্বনিব সমবায়ে মাহুষের মনের এক-একটি ভাব ব্যক্ত হয়। কালক্রমে মাহুষ মুখের ভাবকে দূরে প্রেরণ করিতে বা স্থায়িত্ব দান করিতে চাহিল। সেই তাগিদ হইতে স্রষ্টি হইল লিপি। 'আদিম স্তরে দেখা দিয়াছিল চিত্রাঙ্কন প্রকৃতি।' মাহুষ ছবি আঁকিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিতে শিখিল।' সেই চিত্রলিপি [ pictogram ] বিবর্তিত হইতে হইতে ধ্বনিলিপি [ alphabetic script ] রূপ পরিগ্রহ করিল। তখন তাহার নাম হইল ধ্বনি-চিহ্ন বা বর্ণ [ letter ]। কাজেই, বর্ণ হইল ধ্বনির প্রতীক বা রূপচিত্র। এক-একটি ধ্বনির জন্য এক-একটি পৃথক বর্ণ রচিত হইল। এইভাবে রচিত হইল বর্ণমালা [ alphabet ]। ভাবাত্মক-গণের মতে, অশোকের ব্রাহ্মীলিপি হইতেই কালক্রমে বাংলা লিপির উদ্ভব। বাগ্‌যন্ত্র ও নিঃশব্দবাহুর সমবায়ের উচ্চারিত বর্ণকে ধ্বনি বলা হয়। আবার, ধ্বনির লিখিত

রূপকেই বলা হয় বর্ণ। ধ্বনি বা বর্ণই শব্দের [ word ] মূল উপকরণ। কাজেই, উচ্চারিত শব্দসমূহকে বিশ্লেষণ করিলে ধ্বনি [sound] বা বর্ণ [letter] পাওয়া যায়।

কাজেই, ধ্বনিকে লিখিত আকারে ব্যক্ত করিবার জন্য যে চিহ্ন বা প্রতীক ব্যবহার করা হয়, তাহাকে বলা হয় বর্ণ। ধ্বনি হইল বর্ণের উচ্চারিত রূপ এবং বর্ণ ধ্বনির লিখিত রূপ। যেমন : ‘আম’ শব্দটি বিশ্লেষণ করিলে ‘আ’ ও ‘ম’ দুইটি পৃথক ধ্বনি বা বর্ণ পাওয়া যায়। তেমনি, ‘রবি’ শব্দটি বু+অ+ব্+ই—এই চারটি ধ্বনি বা বর্ণের সমবায়ে গঠিত।

বাংলা লিপি মূল ব্রাহ্মীলিপি হইতে জাত। কিন্তু বাংলায় ব্রাহ্মীলিপির রূপ পরিবর্তিত হইয়াছে। অন্ত্যদিকে, কোন কোন সংস্কৃত ধ্বনিও বাংলায় লুপ্ত হইয়াছে। যেমন : ঞ, ঞ, ষ ও ণ। বাংলায় সংস্কৃত শব্দের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ হাজার। কাজেই, অনাবশ্যক হওয়া সত্ত্বেও ঐ শব্দগুলির জন্য বাংলায় বহু সংস্কৃত বর্ণকে স্বীকৃতি জানাইতে হইয়াছে। সেই হিসাবে বাংলা বর্ণমালায় [ alphabet ] আছে মোট একাশটি বর্ণ।

### বর্ণ ও অক্ষর

বর্ণ ও অক্ষর দুই স্বতন্ত্র বস্তু। ধ্বনি-নির্দেশক প্রতীক বা চিহ্নকে বলে বর্ণ। আর, একটি শব্দের যতখানি অংশ বাগ্‌যন্ত্রের স্বল্পতম প্রয়াসে একসঙ্গে সহজে উচ্চারিত হয়, তাহাকে বলা হয় অক্ষর [ Syllable ]। স্বরধ্বনি ছাড়া কোন ধ্বনি কিংবা কোন অক্ষর উচ্চারিত হইতে পারে না। কাজেই, অক্ষরের মধ্যে অন্তত একটি স্বরধ্বনি থাকিবে। ব্যঞ্জনবর্ণ ছাড়া কেবল একটি স্বরবর্ণেই অক্ষর হইতে পারে। কিন্তু স্বরবর্ণ ছাড়া কেবল ব্যঞ্জনবর্ণে কোন অক্ষর হইতে পারে না। যেমন : ‘রবি’ শব্দের মধ্যে বু+অ+ব্+ই—এই চারটি বর্ণ আছে; কিন্তু ইহাতে অক্ষর আছে মাত্র দুইটি : ‘র’ ও ‘বি’। কিন্তু লক্ষণীয় যে, প্রতি অক্ষরেই স্বরবর্ণ আছে। অক্ষর দুই প্রকার : স্বরান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত বা হলন্ত। যে অক্ষরের অন্তে স্বরধ্বনি উচ্চারিত হয়, তাহাকে স্বরান্ত অক্ষর বলে। যেমন : থাকো—থা+কো। অক্ষর দুইটির প্রত্যেকটির অন্তে স্বরধ্বনি উচ্চারিত হইতেছে; কাজেই, ইহারা স্বরান্ত অক্ষর [ open syllable ]। আবার, যে অক্ষরের অন্তে স্বরধ্বনি উচ্চারিত হয় না, তাহাকে ব্যঞ্জনান্ত বা হলন্ত অক্ষর বলে। যেমন : থাক্—থা+ক্। শেষ অক্ষরটির অন্তে স্বরধ্বনি উচ্চারিত হয় নাই; কাজেই, ইহা ব্যঞ্জনান্ত বা হলন্ত অক্ষর [ closed syllable ]। এক-একটি অক্ষরের উচ্চারণ-কালকে বলা হয় মাত্রা [ mora ]।

### স্বরবর্ণ

বর্ণ দুই প্রকার : স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ।

যে সকল বর্ণ অল্প বর্ণের সাহায্য ছাড়া উচ্চারিত হইতে পারে, তাহাদের স্বরবর্ণ মাত্র। অর্থাৎ, উচ্চারণ-ব্যাপারে স্ব-নির্ভর বর্ণকে বলা হয় স্বরবর্ণ। বাংলায়

প্রচলিত বর্ণমালার রহিয়াছে—অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, [২], এ, ঐ, ও, ঔ—এই বারোটি স্বরবর্ণ। ইহাদের মধ্যে ২-র ব্যবহার বাংলায় নাই। কাজেই, বাংলায় ব্যবহৃত স্বরবর্ণের সংখ্যা এগারো। আবার, ঋ বাংলায় গৃহীত সংস্কৃত শব্দগুলিতেই শুধু ব্যবহৃত হয়। বাংলা উচ্চারণে ঋ-র স্থান লইয়াছে ‘রি’।

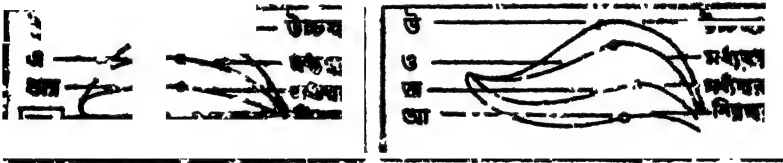
স্বরধ্বনি প্রধানতঃ দুই প্রকার : হ্রস্বস্বর ও দীর্ঘস্বর। যে সকল স্বরধ্বনি উচ্চারণ করিতে অল্প সময় লাগে, তাহাদিগকে বলে হ্রস্বস্বর। সংস্কৃতে হ্রস্বস্বর পাঁচটি : অ, ই, উ, ঋ, ২। আর, যে সকল স্বরধ্বনি উচ্চারণ করিতে বেশী সময় লাগে, তাহাদিগকে বলে দীর্ঘস্বর। সংস্কৃতে দীর্ঘস্বর আটটি : আ, ঈ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ। বাংলায় ধরা-বাঁধা দীর্ঘস্বর নাই। কিন্তু সংস্কৃতে আছে।

সংস্কৃতে স্বরধ্বনির উচ্চারণের হ্রস্বতা বা দীর্ঘতার উপরে শব্দের অর্থ নির্ভর করে। কিন্তু বাংলায় তাহা নির্ভর করে না। তবু বাংলায় স্বরধ্বনির হ্রস্বতা-দীর্ঘতা সম্পর্কে কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। সাধারণতঃ শব্দের অন্তর্গত অক্ষর [syllable]-সংখ্যার উপর স্বরধ্বনির হ্রস্বতা বা দীর্ঘতা নির্ভর করে। এক-অক্ষর-বিশিষ্ট শব্দের স্বরধ্বনির উচ্চারণ দীর্ঘ। যেমন : এক. ‘জল’ [জ+ল] শব্দের অ-কার দীর্ঘ, কিন্তু ‘জলা’ শব্দের অ-কার হ্রস্ব। আবার ‘কাক’ শব্দের আ-কার দীর্ঘ। কিন্তু ‘কাকা’ শব্দের আ-কার হ্রস্ব। দুই. ‘দিন’, ‘দীন’ ও ‘দিন’ [দান করুন]—এক-অক্ষর-বিশিষ্ট এই তিনটি শব্দ যখন এককভাবে উচ্চারিত হয়, তখন ইহাদের ‘ই’ বা ‘ঈ’ দীর্ঘ। কিন্তু অত্রপদে যুক্ত হইলে বা কোন বাক্যে প্রযুক্ত হইলে ইহাদের উচ্চারণ হয় হ্রস্ব। যেমন : ‘দিন’-রাত, ‘দীন’-দুনিয়ার মালিক, ওকে বলে ‘দিন’ তো। তিন. ‘গুণ’ [quality]-এর ‘উ’-কার দীর্ঘ, কিন্তু ‘গুণী’-র ‘উ’-কার হ্রস্ব। তেমনি—‘রূপ’-এর ‘উ’-কার দীর্ঘ হইলেও ‘কপা’র ‘উ’-কার হ্রস্ব। চার. ‘এক’ শব্দের উচ্চারণ ‘অ্যাক’ হওয়ায় এখানে ‘এ’ দীর্ঘ, কিন্তু ‘একটি’ শব্দের উচ্চারণ স্বাভাবিক হওয়ায় তাহাতে ‘এ’-র উচ্চারণ হ্রস্ব। পাঁচ. ‘লোক’ শব্দের ‘ও’-কার দীর্ঘ; ‘লোকটি’ শব্দের ‘ও’-কার হ্রস্ব। বাংলা স্বরধ্বনির উচ্চারণের ধরা-বাঁধা নিয়ম না থাকায় ‘ই’ ও ‘ঈ’ এবং ‘উ’ ও ‘ঊ’-র বানানের ক্ষেত্রে সংস্কৃত নিয়ম-মতে প্রায়ই বিভ্রাট ঘটে। যেমন : দিঘি—দীঘি—দিঘী; চুন—চূন। [অণ্ডাক্ষ সংশোধন পন্থায় উক্তব্য]

হ্রস্ব ও দীর্ঘস্বর ছাড়া আর এক প্রকার স্বরধ্বনি আছে, তাহা প্লুতস্বর। কান্নার সময় বা দূর হইতে কাহাকেও ডাকিতে গেলে ডাকের রেশ অনেকক্ষণ ধরিয়ী টানিয়া রাখিতে হয়। যেমন : কেঁটা—আ-আ; হরে—এ-এ। দূর হইতে ডাকা, কান্না, গান ও আবৃত্তির সময় টানিয়া টানিয়া যে স্বরধ্বনিকে উচ্চারণ করিতে হয়, তাহাকে বলে প্লুতস্বর। যেমন : ‘হে ভবেশ’—হে-এ-এ ভবেশ, ‘এসো হে আর্থ’—এঁসো হে আর্থ-অ-অ।

স্বরধ্বনিকে অত্রদিক দিয়া দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায় : মৌলিক স্বরধ্বনি ও যৌগিক স্বরধ্বনি বা সন্ধ্যক্ষর। যে স্বরধ্বনিগুলিকে আর বিশ্লেষ করা যায় না, তাহাদের বলা হয় মৌলিক স্বরধ্বনি। সংস্কৃত ভাষায় স্বরধ্বনির সংখ্যা তেরো। তন্মধ্যে র. বি. (২য়)—২

বাংলা ভাষায় গৃহীত স্বরধ্বনির সংখ্যা এগারো। কিন্তু মৌলিক স্বরধ্বনি আছে মাত্র সাতটি। যেমন : অ, আ, ই, উ, এ, অ্যা, ও। আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক উচ্চারণে এক প্রকারের বিকৃত ‘আ’ ধ্বনির পরিচয় পাওয়া যায়। উচ্চারণে ভিন্নতার অবস্থান অনুসারে ইহাদের দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যেমন : সম্মুখস্থ স্বরধ্বনি ও পশ্চাত্তাগস্থ স্বরধ্বনি। ই, এ, অ্যা, আ—ইহাদের উচ্চারণে জিহ্বা সম্মুখদিকে প্রসারিত হয়, সেইজন্য ইহাদের বলা হয় **সম্মুখস্থ স্বরধ্বনি** বা **প্রসারিত স্বরধ্বনি** [Refracted vowels]। আবার, উ, ঞ, অ, অ—ইহাদের উচ্চারণে জিহ্বা পশ্চাত্তাগের দিকে আকৃষ্ট হয়, সেইজন্য ইহাদের নাম **পশ্চাত্তাগস্থ স্বরধ্বনি**। ইহাদের মধ্যে অ, উ, ও—এই তিনটি স্বরধ্বনি উচ্চারণ করিবার সময় ওষ্ঠদ্বয় কুঞ্চিত হয় বলিয়া ইহাদের বলা হয় **কুঞ্চিত স্বরধ্বনি** [Rounded vowels]। ই, উ—এই স্বরধ্বনি-যুগলের উচ্চারণে মুখবিবর সম্মুখ বা সংকুচিত থাকে ; তাই ইহাদের বলা হয় **সংকুচিত স্বরধ্বনি** [Closed vowels]। অ্যা এবং আ-র উচ্চারণে মুখবিবর বিকৃত বা প্রসারিত হয়, সেজন্য ইহাদের বলা হয় **বিকৃত স্বরধ্বনি** [Open vowels]। সম্মুখস্থ স্বরধ্বনির মধ্যে ই উচ্চস্বর, এ, অ্যা মধ্যস্বর, আ নিম্নস্বর। পশ্চাত্তাগস্থ স্বরধ্বনির মধ্যে উ উচ্চস্বর ; ও, অ মধ্যস্বর ; অ নিম্নস্বর। নিম্নে চিত্রের সাহায্যে বাংলার মৌলিক স্বরধ্বনিগুলির উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হইল :



### সম্মুখস্থ স্বরধ্বনি

### পশ্চাত্তাগস্থ স্বরধ্বনি

অপর পক্ষে, ভিন্ন ভিন্ন স্বরের সাহায্যে গঠিত স্বরধ্বনিকে বলা হয় যৌগিক স্বরধ্বনি বা মিশ্র স্বরধ্বনি বা সংযুক্তস্বর বা সন্ধিস্বর বা দ্বিস্বর ধ্বনি বা সঙ্ঘাক্ষর [Diphthong]। যেমন : ‘ঐ’ এবং ‘ও’। বাংলার এই দুইটি যৌগিক স্বরের উচ্চারণ বথাক্রমে ও+ই=ওই এবং ও+উ=ওউ। আচার্য সুনীতি-কুমার বাংলার দুই স্বরধ্বনির সহাবস্থানে সর্ব-মোট পঁচিশটি যৌগিক স্বর বা সঙ্ঘাক্ষরের অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। যেমন : অয়=বয়, ভয়, কয়, নয় ; অ আ [ অওয়া ] =লওয়া ; অও=হও, বও ; আয়=ষায়, খায়, দায় ; আউ=খাই, ভাই ; আউ=ঢাউল, চাউল, বাউল ; আও=দাও, নাও ; অ্যাও=ম্যাও ; ইয়া=নাইয়া, খাইয়া ; ঐএ, ইয়ে=বিয়ে, টিয়ে ; ঐউ=শিউলি, বিউলি ; ইয়, ঐও, ইয়ো=প্রিয়, দিও, নিয়ো ; উয়া=ভূয়া, হালুয়া ; উই=ঘুঁই, কুই, গলুই ; উয়ে=ভুঁয়ে, কুঁয়ে ; উও, উয়ো=কুয়ো, দুও ; এয়, আয়=নেয়, দেয় [ জায় ] ; এয়া=দেয়া [ মেঘ ]। থেয়া, কেয়া ; এই=বেই, সেই ; এও=বেও, সেও, এসো ; এউ=চেউ, কেউ, কেউ ; ওয়=শোয়, দোয় ; ওআ, ওয়া=মোয়া, সোয়া ; ওউ, অউ=হউক, বউ ; ওঈ=কই, রই, সই।

তাহা ছাড়া, তিন স্বরধ্বনির সহাবস্থান=গিয়েও ; চার স্বরধ্বনির সহাবস্থান= আনাইয়াও ; পাঁচ স্বরধ্বনির সহাবস্থান=ধোওয়াইয়া ; ছয় স্বরধ্বনির সহাবস্থান= খাওয়াইয়াও ইত্যাদি দেখা যায়।

নাসিকার সাহায্যে উচ্চারণের ভিত্তিতে স্ববধ্বনিকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায় : সানুনাসিক বা অনুনাসিক স্ববধ্বনি ও নিরনুনাসিক স্ববধ্বনি। নাসিকার সাহায্যে উচ্চার্য স্ববধ্বনিকে সানুনাসিক বা অনুনাসিক স্ববধ্বনি বলে। যেমন : ঝাঁকা, বাঁকা, ফাঁকা, শাঁখা ইত্যাদি। নাসিকাব সাহায্য ব্যতীত উচ্চার্য স্ববধ্বনিকে বলে নিরনুনাসিক স্ববধ্বনি। যেমন : শাখা, হাসা, কাদা ইত্যাদি। আবার, শব্দের মধ্যস্থিত কোন বিশেষ অক্ষরের উচ্চারণকালে নিঃশ্বাসবায়ু তীব্রতর বেগে প্রবাহিত হইলে তাহাকে বলা হয় প্রাশ্বর, বল, শ্বাসাঘাত বা স্বরাঘাত [Accent]। যেমন : ‘এ কী করলেন প্রভু !’ ‘সেই আমাদের বাংলা দেশ।’

স্ববধ্বনির উচ্চারণের এই ঝোঁক বা প্রবলতাকে বলে অক্ষর-পরিবৃদ্ধি।

### স্বরবর্ণের উচ্চারণ-স্থান

উচ্চারণ-স্থান অনুযায়ী বিভিন্ন স্বরবর্ণের বিশেষ পরিচয় :

অ, আ : ইহাদের উচ্চারণ-কালে জিহ্বা কণ্ঠের দিকে আকৃষ্ট হয় ; সেইজন্য ইহারা কণ্ঠ্য বর্ণ [Gutturals]।

ই, ঈ : ইহাদের উচ্চারণ-কালে জিহ্বা তালুর দিকে আকৃষ্ট হয় ; সেইজন্য ইহারা তালব্য বর্ণ [Palatals]।

উ, ঊ : ইহাদের উচ্চারণ-কালে জিহ্বা ওষ্ঠের দিকে আকৃষ্ট হয় ; সেইজন্য ইহারা ওষ্ঠ্য বর্ণ [Labials]।

ঋ [ঋ] : ইহাদের উচ্চারণ-কালে জিহ্বা মূর্ধাকে স্পর্শ করে ; সেইজন্য ইহারা মূর্ধণ্য বর্ণ [Cerebrals]।

[৯] : ইহার উচ্চারণ-কালে জিহ্বা দন্তকে স্পর্শ করে ; সেইজন্য ইহা দন্ত্য বর্ণ [Dentals]।

এ, ঐ : ইহারা কণ্ঠ ও তালুর সাহায্যে উচ্চারিত হয়, অর্থাৎ, ইহাদের উচ্চারণ-কালে জিহ্বা তালুর গা ঘেঁষিয়া কণ্ঠের দিকে আকৃষ্ট হয়, সেইজন্য ইহারা কণ্ঠ্য-তালব্য বর্ণ।

ও, ঔ : ইহারা কণ্ঠ ও ওষ্ঠের সাহায্যে উচ্চারিত হয় ; অর্থাৎ, ইহাদের উচ্চারণ-কালে জিহ্বা ওষ্ঠের গা ঘেঁষিয়া কণ্ঠের দিকে আকৃষ্ট হয়, সেইজন্য ইহারা কণ্ঠ্য-ওষ্ঠ্য বর্ণ।

### ব্যঞ্জনবর্ণ

যে সকল বর্ণ স্বরবর্ণের সাহায্য ছাড়া স্বয়ং উচ্চারিত হইতে পারে না, তাহাদের ব্যঞ্জনবর্ণ বলে। অর্থাৎ, উচ্চারণ-ব্যাপারে পর-নির্ভর বর্ণকে ব্যঞ্জনবর্ণ বলা হয়। বাংলায় ব্যঞ্জনবর্ণ সংখ্যা ত্রিশটি।

ক, খ, গ, ঘ, ঙ ; চ, ছ, জ, ঝ, ঞ ; ট, ঠ, ড, ঢ, ণ ; ত, থ, দ, ধ, ন ; প, ফ, ব,

ঙ, ম; ষ, র, ল, [ব]; শ, ষ, স, হ; ড, ঢ, ঝ; ং, ঃ। ইহাদের মধ্যে ‘অন্তঃস্থ-ব’-এর ব্যবহার বাংলায় নাই; তাই ইহাকে অতিরিক্ত হিসাবে ধরা হয় না।

উচ্চারণ-রীতি অনুসারে বিভিন্ন ব্যঞ্জনবর্ণের বিশেষ বিশেষ পরিচয়:

**স্পর্শবর্ণ [Stops]:** বাংলা বর্ণমালার কুইহিতে মূ পৰ্বন্ত পঁচিশটি ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণের সময় জিহ্বার অগ্রভাগ, মধ্যভাগ বা মূলভাগ মুখের ভিতরের বিশেষ বিশেষ অংশকে স্পর্শ করে কিংবা ঠোটে ঠোটে স্পর্শ হয় বলিয়া ইহাদের স্পর্শবর্ণ বলা হয়। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের মতে, এইগুলির উচ্চারণ-কালে “কঠ-তন্ত্রী কাঁপাইয়া কঠনালী হইতে বায়ু মুখ-কোটরে আসিতেছে, এমন সময়ে স্পর্শকের মত জিহ্বার গোড়াকে উপরে তুলিয়া কঠের দুয়ার আটকাইয়া দিলাম, আর ধ্বনি বাহির হইল ‘ক’; জিহ্বামূলের স্পর্শকালে উহার উৎপত্তি; কাজেই, উহা জিহ্বামূলীয় স্পর্শবর্ণ।”

স্পর্শবর্ণগুলিকে আবার পাঁচটি করিয়া পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয়। এই ভাগগুলিকে বলা হয় বর্গ। বর্ণের আত্মকর দিয়া বর্ণের নামকরণ হয়। যেমন, ক-বর্গ—ক, খ, গ, ঘ, ঙ। চ-বর্গ—চ, ছ, জ, ঝ, ঞ। ট-বর্গ—ট, ঠ, ড, ঢ, ণ। ত-বর্গ—ত, থ, দ, ধ, ন। প-বর্গ—প, ফ, ব, ভ, ম।

**উষ্মবর্ণ [Spirants]:** শ, ষ, স ও হ—এই বর্ণগুলিকে উচ্চারণ করিবার সময় নিঃশাসবায়ুকে শিশ্বধ্বনির [sibilant] মতো প্রবাহিত করিতে হয় বলিয়া ইহাদিগকে উষ্মবর্ণ বলা হয়। অর্থাৎ, ‘শাসবায়ুর প্রাধান্ত-যুক্ত বর্ণ চতুষ্টয়’কে উষ্মবর্ণ বলে।

**অন্তঃস্থ বর্ণ:** স্পর্শবর্ণ ও উষ্মবর্ণের অন্তর্বর্তী ষ, র, ল, ব—এই বর্ণ-চতুষ্টয়কে অন্তঃস্থ বর্ণ বলে। ইহাদের মধ্যে ‘ষ’ ও ‘ব’-কে অর্ধস্বর [Semi-vowels] এবং ‘র’ ও ‘ল’-কে তরল স্বর [Liquids] বলা হইয়া থাকে।

**অর্ধ-ব্যঞ্জন [Sonant]:** ন, ম, র ও ল—ইহারা স্বরধ্বনির মতো একা অথবা ব্যঞ্জনধ্বনির সহিত যুক্ত হইয়া অক্ষর [syllable] গঠন করিতে পারে। আবার, ইহারা এককভাবে ব্যঞ্জনধ্বনির মতো এবং ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে যুক্তভাবে স্বরধ্বনির মতো আচরণ করে বলিয়া ইহাদের অর্ধ-ব্যঞ্জন বলা হয়।

**অনুনাসিক বর্ণ [Nasals]:** বর্ণের পঞ্চম বর্ণের বা অন্তিম বর্ণের [অর্থাৎ ঘ, ঞ, ণ, ন, ম] এবং অস্থব্বারের [ং] উচ্চারণ-কালে নিঃশাসবায়ু আংশিকভাবে নাসিকার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয় বলিয়া ইহাদের অনুনাসিক বর্ণ বা নাসিক্য বর্ণ বলা হয়।

**মহাপ্রাণ বর্ণ [Aspirate]:** কঠনালীর পেলী আকৃতি করিয়া অতিরিক্ত বাধা সৃষ্টি করিয়া বর্ণের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণকে উচ্চারণ করা হয় বলিয়া ইহাদের মহাপ্রাণ বর্ণ বলা হয়। ‘প্রাণ’ কথাটির অর্থ ‘নিঃশাস’; উচ্চারণ-কালে ‘হ’ জাতীয় ধ্বনিতেই তাহার প্রকাশ। যেমন: ক+হ=খ, গ+হ=ঘ, চ+হ=ছ, জ+হ=ঝ, ট+হ=ঠ, ড+হ=ঢ, ত+হ=থ, দ+হ=ধ, প+হ=ফ, ব+হ=ভ।

**অপ্রাণ বর্ণ [Unaspirated]:** বর্ণের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণের উচ্চারণে ‘হ’ জাতীয় ধ্বনির আকারে নিঃশাস বা প্রাণ যুক্ত হয় না বলিয়া তাহাদের অপ্রাণ বর্ণ বলে। যেমন: ক, গ; চ, জ; ট, ড; ত, দ; প, ব।

ইহাদের মধ্যে চ [ ক + শ ] ও জ [ গ + ঙ ] উচ্চারণের শুরুতে স্পর্শবর্ণের মতো এবং শেষে উষ্মবর্ণের মতো উচ্চারিত হয় ; সেইজন্য ইহাদের দ্বিধ্বনি [ Affricate ] বলা হয় ।

দুইটি ব্যঞ্জনধ্বনি একসঙ্গে উচ্চারিত হইয়া একটি ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ সম্পন্ন হইলে, তাহাকে দ্বিব্যঞ্জন ধ্বনি বলা হয়। যেমন : খ = ক + হ, চ = ক + শ । অর্থাৎ, মহাপ্রাণ ও সুষ্প্রাণি মাত্রই দ্বিব্যঞ্জন ধ্বনি ।

**অঘোষ বর্ণ [Unvoiced] :** উচ্চারণে বর্ণের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ মুহূ বা গাষ্ঠীর্ঘহীন বলিয়া ইহাদের অঘোষ বর্ণ বলা হয়। যেমন : ক, খ ; চ, ছ ; ট, ঠ ; ত, থ ; প, ফ ।

**ঘোষ বর্ণ [Voiced] :** উচ্চারণে বর্ণের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ গাষ্ঠীর্ঘযুক্ত বলিয়া ইহাদের ঘোষ বর্ণ বা নাদ বর্ণ বলা হয়। যেমন : গ, ঘ, ঙ ; জ, ঝ, ঞ ; ড, ঢ, ণ ; দ, ধ, ন ; ব, ভ, ম ।

নিম্নে অঘোষ, ঘোষ, অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ বর্ণের শ্রেণীবদ্ধ তালিকা প্রদত্ত হইল :

	অঘোষ বর্ণ	ঘোষ বর্ণ
অল্পপ্রাণ	ক চ ট ত প	গ জ ড দ ব
মহাপ্রাণ বর্ণ	খ ছ ঠ থ ফ	ঘ ঝ ঢ ধ ভ
অস্থানাসিক বর্ণ		ঙ ঞ ণ ন ম

**অযোগবাহ বর্ণ :** ং এবং ঃ—অন্ত বর্ণের সহিত সংযোগ ব্যতীত ইহাদের ‘বাহ’ বা প্রয়োগ হয় না। সেইজন্য ইহারা অযোগবাহ বা আশ্রয়স্থানভাগী বর্ণ ।

### ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ-স্থান

সংস্কৃত বর্ণমালা অত্যন্ত বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে গঠিত । বাংলা বর্ণমালা উত্তরাধিকার-স্বত্বে সংস্কৃত বর্ণমালার সেই বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে । মাহুষের বাগ্‌যন্ত্র অল্পক্রমিকভাবে কণ্ঠ, তালু, ঘূর্ধা, দন্ত ও ওষ্ঠ লইয়া গঠিত । নিঃশ্বাসবায়ু প্রথমে কণ্ঠদেশে, পরে তালুদেশে, তারপর ঘূর্ধাদেশে, তারও পরে দন্ত-পঙ্‌ক্তিতে এবং অবশেষে ওষ্ঠদেশে প্রকৃত হইয়া নির্গত হইয়া যায় । বাংলা বর্ণমালাও ঠিক পারস্পরিক রক্ষা করিয়া সংগঠিত ।

**ক-বর্ণ :** ক খ গ ঘ ঙ : ইহাদের উচ্চারণ-কালে জিহ্বামূল ও তালুর কোমল অংশের সাহায্যে অবরোধ স্থষ্টির ফলে নিঃশ্বাসবায়ু কণ্ঠদেশে প্রকৃত হয় । সেইজন্য ইহাদের কণ্ঠ্য বর্ণ [ Gutturals ] বলা হয় । ইহাদের জিহ্বামূলের স্মৃতিকা প্রধান বলিয়া আচার্য রামেন্দ্রচন্দ্র ইহাদের জিহ্বামূলীয় স্পর্শবর্ণ নামেও অভিহিত করিয়াছেন ।

**চ-বর্ণ :** চ ছ জ ঝ ঞ : ইহাদের উচ্চারণ-কালে জিহ্বার মধ্যভাগ তালুর কঠিন



অংশকে স্পর্শ করে এবং ইহাদের উচ্চারণে তালুর ভূমিকা প্রধান বলিয়া ইহাদের তালব্য বর্ণ [Palatals] বলা হয়।

ট-বর্ণঃ ট ঠ ড ঢ ণঃ ইহাদের উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগ উল্টাইয়া মূর্ধা [তালুর সামনের খাঁজ-কাটা অংশ] স্পর্শ করে এবং তাহাতে মূর্ধার ভূমিকা প্রধান বলিয়া ইহাদের মূর্ধন্ত বর্ণ [Cerebrals] বলা হয়। ইহাদের প্রতিবেষ্টিত বর্ণও বলা হয়।

ত-বর্ণঃ ত থ দ ধ নঃ ইহাদের উচ্চারণ-কালে জিহ্বার অগ্রভাগ উপরের দাঁতের গোড়ায় ঠোকর খায় এবং ইহাতে দাঁতের ভূমিকা প্রধান বলিয়া ইহাদের দন্ত্যবর্ণ [Dentals] বলা হয়।

প-বর্ণঃ প ফ ব ভ মঃ “তুই ঠোট পরস্পর স্পর্শ করিয়া তাহার মধ্য দিয়া জোরে বাতাস ছাড়িয়া দিলাম, অমনি ধ্বনি জন্মিল ‘প’।”—আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর। ইহাদের উচ্চারণ-কালে উপরের ওষ্ঠ নিম্নের অধরকে স্পর্শ করে এবং ইহাতে ওষ্ঠের ভূমিকা প্রধান বলিয়া ইহাদের ওষ্ঠ্যবর্ণ [Labials] বলা হয়।

ঙ, ঞ, ণ, ন, মঃ ইহাদের “উচ্চারণ-কালে মুখের মধ্যকার বাতাস কেবল মুখ দিয়া বাহির না হইয়া, মুখ ও নাক, উভয় পথ দিয়া বাহির হয়।” তাই ইহারা অনুনাসিক বর্ণ বা নাসিক্য বর্ণ [Nasals]। অন্তঃস্বর এবং চন্দ্রবিন্দু [°]-ও অহ্ননাসিক বর্ণ বা নাসিক্য বর্ণ। কিন্তু উহারা স্বর-সংযোগ ভিন্ন উচ্চারিত হইতে পারে না।

শ, ষ, স, হঃ ইহাদের মধ্যে শ=তালব্য বর্ণ, ষ=মূর্ধন্ত বর্ণ, স=দন্ত্য বর্ণ এবং হ=কণ্ঠ্য বর্ণ।

য, র, ল, বঃ ইহারা “না-স্বর, না-ব্যঞ্জন।” ইহাদের মধ্যে য=তালব্য বর্ণ, র, ল=দন্তমূলীয় বর্ণ এবং ব=দন্তোষ্ঠ্য বর্ণ।

বাংলা বর্ণ-সমূহের উচ্চারণ-স্থান অনুসারে শ্রেণীগত পরিচয়

বর্ণ	উচ্চারণ-স্থান	উচ্চারণ-স্থান অনুযায়ী নাম
অ আ ই	কণ্ঠ	কণ্ঠ্য
ক খ গ ঘ ঙ	জিহ্বামূল	জিহ্বামূলীয়
ই ঈ চ ছ জ ঝ ঞ ষ শ	তালু	তালব্য
ঋ ট ঠ ড ঢ ণ র য	মূর্ধা	মূর্ধন্ত
ত থ দ ধ ন ল স	দন্ত	দন্ত্য
উ ঊ প ফ ব ভ ম	ওষ্ঠ	ওষ্ঠ্য
ব [অন্তঃস্ব]	দন্ত ও ওষ্ঠ	দন্তোষ্ঠ্য
এ ঐ	কণ্ঠ ও তালু	কণ্ঠ-তালব্য
ও-ঔ	কণ্ঠ ও ওষ্ঠ	কণ্ঠোষ্ঠ্য

## বাংলা বর্ণের উচ্চারণ-বৈচিত্র্য

বাংলায় উচ্চারণ-প্রকৃতি বিবিধ : সহজ ও বিকৃত। অবিকৃতভাবে কোন বর্ণ স্মারিত হইলে তাহা সহজ উচ্চারণ। আর, বিকৃতভাবে কোন বর্ণ স্মারিত হইলে তাহা বিকৃত উচ্চারণ।

অ—বাংলায় অ-এর সহজ উচ্চারণ ফল, জল, অচল, রক, দধ ইত্যাদি শব্দে ক্ষণীয়। কিন্তু অ-এর বিকৃত উচ্চারণ গুরু [গোরু], মাণি [মোণি], বহু [বোহু], মিয় [ওমিও] প্রভৃতি শব্দে দেখা যায়। কাজেই, বিকৃত-অ ‘ও’-রূপে উচ্চারিত হয়। শব্দের অন্তস্থিত ‘অ’ আবার অনেক সময় উচ্চারিত হয় না। যেমন : বকুল [বকুল], মুকুল [মুকুল], জল [জল], ফল [ফল] ইত্যাদি। ইহাকে অ-এর হ্রস্ব উচ্চারণ বলা হয়।

আ—বাংলায় আ-এর সাধারণ উচ্চারণ হ্রস্ব। তবে একাক্ষর শব্দে [monosyllabic word] বা শব্দের প্রথমে আগত আ-এর উচ্চারণ দীর্ঘ হয়। যেমন : মা—, গা—ত, গা—ন, আ—জীবন, আ—মরণ ইত্যাদি।

ই, ঐ—বাংলায় ই, ঐ-এর উচ্চারণ সাধারণত : হ্রস্ব। তবে ‘কি’ এবং ‘কী’-এর উচ্চারণ স্বধাক্রমে হ্রস্ব ও দীর্ঘ। আর, হলন্ত [ব্যঞ্জনান্ত] অক্ষরের পূর্ববর্তী ‘ই’ ও ‘ঐ’-র উচ্চারণ দীর্ঘ হইয়া থাকে। যেমন : দীপ [দী—প], তিল [তি—ল] ইত্যাদি। কিন্তু ‘তিলক’-এর ‘ই’-র উচ্চারণ হ্রস্ব, ‘গুপী’-র ‘ঐ’-ও হ্রস্ব।

উ, ঊ—বাংলায় এই দুই বর্ণের উচ্চারণও সাধারণত : হ্রস্ব। কিন্তু ঊ-এর পূর্বে ‘উ’-র উচ্চারণ দীর্ঘ। যেমন : গু—চ, মূ—চ, কু—চ ইত্যাদি। আবার, হলন্ত অক্ষরের পূর্ববর্তী ‘উ’, ‘ঊ’ দীর্ঘ। যেমন : চূ—প, কূ—প ইত্যাদি।

ঋ—বাংলায় ‘ঋ’-র উচ্চারণ ‘রি’-এর মতো। যেমন : অমৃত [অম্রিত], যুগয়া [য়ুগিয়া], মষণ [মশিণ] ইত্যাদি।

ঋ, ৯—ইহাদের ব্যবহার বাংলায় নাই।

এ—এ-কালের সহজ উচ্চারণ কেশ, দেশ, বেণ, চেনা, শেখা, চেতন ইত্যাদি শব্দে পাওয়া যায়। এ-কালের বিকৃত উচ্চারণ ‘অ্যা’র মতো হয়। যেমন : বেলা [সময়] [ব্যালা], বেটা [ব্যাটা], নেড়া [ন্যাড়া], ফেন [ফ্যান], খেলা [খ্যালা], দেখা [খ্যাখা], বেচা [ব্যাচা], এমন [অ্যামন], কেমন [ক্যামন], কেন [ক্যান] ইত্যাদি। ‘এক’ শব্দের ‘এ’-র উচ্চারণ বিকৃত ; কিন্তু একটা, একাকী, একটি, একত্র, একতা ইত্যাদি শব্দের ‘এ’-র উচ্চারণ সহজ।

ঐ—ইহা সন্ধাক্ষর। বাংলায় ইহার উচ্চারণ ‘ওই’-র মতো। যেমন : ঐ দেখ, ঐখানে।

ও—হলন্ত অক্ষরের পূর্ববর্তী ‘ও’ দীর্ঘ। যেমন : রোগ। কিন্তু স্বরান্ত অক্ষরের পূর্ববর্তী ‘ও’ হ্রস্ব। যেমন : রোগা।

ঔ—ইহাও সন্ধাক্ষর। বাংলায় ইহার উচ্চারণ ‘ওউ’-র মতো। যেমন : সৌরভ, সৌমাহি, সৌরভ ইত্যাদি।

ঙ—‘ঙ’-এর সহজ উচ্চারণ ‘উ+অ’-এর মতো। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহা ‘ং’-এর মতো উচ্চারিত হয়। ইংরেজি ‘ring’-র ‘ng’-র মতো। যেমন : রঙ, সঙ, ডঙ, বাঙলা, ফড়িঙ ইত্যাদি। অনেক স্থলে জ [ঙ+গ]-এর পরিবর্তে শুধু ‘ঙ’ ব্যবহৃত হয়। যেমন : বাঙালী—বাঙালী।

ঞ—‘ঞ’-এর সহজ উচ্চারণ ‘ই+ঞ’ বা ‘ই+ঔ’-র মতো। যেমন : মিঞা—মিঞা ; মিঞ—মিয়েঁ। কিন্তু চ, ছ, জ, ঝ-এর পূর্বে অবস্থিত ‘ঞ’ দন্ত্য-‘ন’-এর মতো উচ্চারিত হয়। যেমন : পঞ্চ—পন্‌চ, বাঞ্ছা—বান্‌ছা, খঞ্—খন্‌জ, ঝঙ্কাট—ঝন্‌ঝাট।

ণ, ন—বাংলায় এই দুই বর্ণের উচ্চারণে পার্থক্য নাই।

শ—শব্দের আদিতে অবস্থিত শ বা স-এর সহিত যুক্ত হইলে উহাদের সাহুনাসিক উচ্চারণ হয়। যেমন : স্মরণ [ শঁরণ ], স্মৃতি [ স্মৃতি ], আশান [ শঁশান ] ইত্যাদি। পদমধ্যবর্তী ‘ম’ ‘স্’-এর সহিত যুক্ত হইলে দ্বিত্ব হইয়া সাহুনাসিক হইয়া যায় : বিস্মরণ [ বিশঁরণ ]। শব্দের শেষে ব্যঞ্জনের সহিত যুক্ত হইলে ‘ম’-এর উচ্চারণ কোথাও কোথাও লুপ্ত হয় এবং ব্যঞ্জনটির দ্বিত্ব হয়। যেমন : লক্ষ্মী [ লক্‌খী ], লক্ষণ [ লক্‌খন ], পদ্ম [ পদ্‌দো ], ভ্রম [ ভশঁশ ], ভীষ্ম [ ভীশঁশ ], রশ্মি [ রশঁশি ], আত্মা [ আত্‌ত্‌তা ], সূক্ষ্ম [ শুক্‌খ ] ইত্যাদি। অন্তঃস্থ ম-এর উচ্চারণ স্বাভাবিক।

ষ—বাংলায় ‘অন্তঃস্থ-ষ’-এর উচ্চারণ ‘বর্গীয় জ’-র মতো। তবে ‘ষ’ [ ‘য’ ]-ফলার ‘ষ’ উচ্চারিত না হইয়া পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনবর্ণের সংযুক্ত বর্ণের দ্বিত্ব আনে। যেমন : এক্ষ [ এক্‌ক ], মুখ্য [ মুখ্‌খ ], আলোচ্য [ আলোচ্‌চ ], বজ্রি [ বজ্‌দি ] ইত্যাদি।

র—বাংলায় ‘র’-এর উচ্চারণ দন্তমূলীয়। ইহার উচ্চারণ-কালে কম্পমান জিহ্বাগ্র-ভাগ দন্তমূলে প্রস্কৃত হয়। সেইজন্য ইহাকে কম্পিত ব্যঞ্জন বা কম্পন-জাত ধ্বনি বলা হয়। ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্বে ‘র’ থাকিলে রেফ্ হইয়া ব্যঞ্জনবর্ণের মন্তকে যায়, পরে থাকিলে ইহার ফলা হইয়া ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত যুক্ত হয়।

ল—ইহার উচ্চারণে জিহ্বার দুই পাশ দিয়া নিঃশ্বাসবায়ু নির্গত হয়। তাই ইহার নাম পার্শ্বিক [Lateral] ধ্বনি।

ব—‘অন্তঃস্থ-ব’-এর উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগ কম-বেশী কম্পিত হয় ; তাই ইহাকে কম্পিত [Trilled] ব্যঞ্জন বলা হয়। বাংলায় ‘অন্তঃস্থ-ব’-এর উচ্চারণ ‘বর্গীয়-ব’-এর মতো। তবে শব্দের আদিতে অবস্থিত ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত যুক্ত ‘অন্তঃস্থ-ব’ অনেক সময় ‘ঔয়’ বা ‘ওয়’-র মতো উচ্চারিত হয়। যেমন : দ্বার—দুয়ার, স্বাদ—সোয়াদ ইত্যাদি। অবশ্য, শব্দের আদিতে ব্যঞ্জনের সহিত যুক্ত ব-ফলা উচ্চারিত হয় না। যেমন : স্বার্থ [ শার্থ ], স্বভাব [ শভাব ], স্বত্ব [ শত্ব ], স্বরাজ [ শরাজ ] ইত্যাদি। কিন্তু শব্দের মধ্যস্থিত বা অন্তস্থিত ‘ব’ পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব আনে। যেমন : বিদ্বান [ বিদ্‌দান ], ঈশ্বর [ ঈশ্‌শর ], ভাস্বর [ ভাশ্‌শর ], অদ্বয় [ অদ্‌দয় ], অন্বয় [ অনন্‌য় ], স্বত্ব [ শত্ব ] ইত্যাদি। একাধিক সংযুক্ত ব্যঞ্জনে ‘ব’-এর উচ্চারণ লুপ্ত হয়। যেমন : শাস্তনা [ শাস্তনা ], উচ্চাস [ উচ্চাশ ], মহত্ব [ মহত্ব ] ; কিন্তু প-বর্ণের ক্ষেত্রে এই নিয়ম চলে না। যেমন : অবল, কবল, সবল ইত্যাদি।

শ, ষ, স—‘শ’ তালব্য এবং উষ্মবর্ণ, ‘ষ’ ঘূর্ণ এবং উষ্মবর্ণ, ‘স’ দন্ত্য এবং উষ্মবর্ণ, ‘হ’ কণ্ঠ্য এবং উষ্মবর্ণ। বাংলায় অবশ্য ষ ও স-এর উচ্চারণ ‘শ’-এর মতো। যেমন : হুম্মার—সুম্মার, ঝুখ—সুখ, কুবক—কুশক ইত্যাদি। তবে বাঁড়ের ‘ষ’-এর উচ্চারণ ঘূর্ণ। আবার, ঞ-কায় বা র-এর সহিত যুক্ত হইলে ‘শ’ ‘স’-এর মতো উচ্চারিত হয়। যেমন : শূগাল—সূগাল, মিশ্রণ—মিশ্রণ, স্রমিক—স্রমিক ইত্যাদি।

ড়, ঢ—সংস্কৃতে ড় ঢ় ছিল না, ছিল ড ঢ। ‘পীড়া’ ও ‘যুট’ যথাক্রমে ‘পীড়া’ ও ‘যুট’ রূপে উচ্চারিত হইত। বাংলায় উভয়ের নিম্নে একটি করিয়া বিন্দু যোগ করিয়া লওয়া হইয়াছে। কাজেই, ড় ও ঢ় বাংলায় নূতন। ইহারা উভয়েই স্পর্শবর্ণ। কিন্তু ড় অল্পপ্রাণ, ঢ় মহাপ্রাণ বর্ণ। ইহাদের উচ্চারণে জিহ্বার নিম্নাংশভাগ দিয়া আঘাত করিতে হয়। সেইজন্য ইহাদের তাড়িত [ Flapped ] ব্যঞ্জন বা তাড়ন-জাত ধ্বনি বলা হয়।

ং, ঃ, ং—স্বরের অন্ত্যে বা পশ্চাতে বসে বলিয়া অল্পস্বার নাম। ং এবং ঃ কোন বর্ণের সহিত যুক্ত না হইলে প্রযুক্ত হয় না, তাই ইহাদের অযোগ্যবাহ বর্ণ বলা হয়। ঙ, ঞ, ণ, ন ও ম-এর অপভ্রংশে চন্দ্রবিন্দুর উৎপত্তি। যেমন : শব্দ > শাঁখ, দন্ত্য > সঞা > সাঁঝ, কটক > কাঁটা, দন্ত > দাঁত, স্বরণ > সাঁরণ।

#### বাংলা যুক্তাক্ষরের উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য

ক্ষ—এই সংযুক্ত বর্ণের সংস্কৃত উচ্চারণ ‘ক+খ’। কিন্তু বাংলায় ইহার উচ্চারণ ‘ক+খ’-এর মতো। যেমন : রক্ষা—রক্খা, পক্ষী—পক্খী, শিক্ষা—শিক্খা ইত্যাদি।

জ্ঞ—বাংলায় এই সংযুক্ত বর্ণের উচ্চারণ গ্+গ্ন-র মতো। যেমন : যজ্ঞ—যগ্গ্‌গ্‌, বিজ্ঞ—বিগ্গ্‌গ্‌, প্রাজ্ঞ—প্রাগ্গ্‌গ্‌ ইত্যাদি।

হ্র, হ্র, ক্ষ, হ্র, হ্র—এই সংযুক্ত বর্ণগুলির উচ্চারণে ‘হ’ সর্বদাই পরে উচ্চারিত হয়। যেমন : অপরাহ্র—অপরান্‌হ্র, চিহ্র—চিন্‌হ্র, ত্রাহ্রণ—ত্রাম্‌হ্রণ, কহ্লার—কল্‌হার, আহ্লান—আওহান ইত্যাদি।

#### একই বর্ণের বিভিন্ন ধ্বনি

বাংলায় অ, এ, ঞ, শ, ষ ও স—এই বর্ণগুলির বিভিন্ন প্রকার উচ্চারণ হয়। যেমন :  
 অ—বাংলায় ‘অ’-এর সহজ উচ্চারণ ইংরেজি ‘ball’ শব্দের ‘a’-র মতো। যেমন : অশনি, অবনী, অরণ্য, জনম, মরণ, বসন, অঙ্ক ও বঙ্ক ইত্যাদি। তাছাড়া, ১. ‘নঞ-’ অব্যয়জাত ‘অ’-এর উচ্চারণ সহজ। যেমন : অচল, অনন্ত, অসীম, অপূর্ণ, অসময়, অমঙ্গল, অসত্য ইত্যাদি। ২. সহিত অর্থের ‘স’-এর ‘অ’-এর উচ্চারণ সহজ। যেমন : সপরিবারে, সহিত, সশরীরে, সজ্ঞানে, সজীব, সবিনয় ও সদল ইত্যাদি। ৩. পরে অ বা আ থাকিলে পূর্ববর্তী ‘অ’-এর উচ্চারণ সহজ। যেমন : চলন, বলন, সন্তরণ, দর্শন, বর্ষা, বর্ষা, অজ্ঞা, অজ্ঞা ও অজ্ঞতা ইত্যাদি। ৪. দুই-অক্ষর শব্দের ‘অ’-এর উচ্চারণ সহজ। যেমন : কর, খল, ঘট, জল, ফল, বট, মঠ ও দল ইত্যাদি। ৫. ধ্বন্যাত্মক শব্দের আদিস্থিত ‘অ’-এর উচ্চারণ প্রায়শঃ সহজ। যেমন : কল্কল, থল্‌থল, গল্‌গল, ঢল্‌ঢল, হন্‌হন, বন্‌বন ইত্যাদি।

১. বাংলায় ‘অ’-এর বিকৃত উচ্চারণ সাধারণতঃ ‘ও’-এর মতো। যেমন : ১. ই-কারান্ত বা উ-কারান্ত ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্ববর্তী ‘অ’-এর উচ্চারণ ‘ও’ হয় : রবি [রোবি], মতি [মোতি], মণি [মোণি], অতি [ওতি], বহু [বোহু], অমিয় [ওমিও], অমুক [ওমুক], অরিন্দম [ওরিন্দম], অরুণ [ওরুণ], করুণ [কোরুণ], চলিবে [চোলিবে] ইত্যাদি। ২. অপিনিহিতিজাত ‘ই’ ও ‘উ’ অভিক্রতি লুপ্ত হইলে ‘অ’-এর উচ্চারণ ‘ও’ হয় : বইল্যা > ব’লে [বোলে], কইল্যা > ক’রে [কোরে], মইল্যা > ম’রে [মোরে], ধইল্যা > ধ’রে [ধোরে], গইল্যা > গ’লে [গোলে], দইল্যা > দ’লে [দোলে] ইত্যাদি। ৩. ষ-ফলা পরে থাকিলে পূর্ববর্তী ‘অ’-এর ধ্বনি ‘ও’ হইয়া যায় : কল্যা [কোলা], ত্রব্য [ত্রোব্য], পঞ্চ [পোঞ্চ], গচ্ছ [গোচ্ছ], ভব্য [ভোব্য], সভ্য [সোভ্য], সহ্য [সোহ্য] ইত্যাদি।

৪. ঋ-কার-যুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী ‘অ’-এর ধ্বনি ‘ও’ হয় : মৃশ্ণ [মোশ্ণ], বক্তৃতা [বোক্তৃতা], কর্তৃক [কোর্তৃক], ভর্তৃকা [ভোর্তৃকা], সশ্রুত [সোশ্রুত], সমৃদ্ধি [সোমৃদ্ধি], সম্পৃক্ত [সোম্পৃক্ত] ইত্যাদি। কিন্তু ব্যতিক্রম : যকৃৎ।

৫. শব্দের আদিতে র-ফলার সহিত যুক্ত ‘অ’-এর ধ্বনি ‘ও’ হইয়া থাকে : শ্রোম [শ্রোম], ভ্রম [ভ্রোম], ভ্রমর [ভ্রোমর], ভ্রমণ [ভ্রোমণ], শ্রবণ [শ্রোবণ], গ্রহ [গ্রোহ] ইত্যাদি। ৬. ক এবং ঙ্গ-এর পূর্ববর্তী ‘অ’-এর ধ্বনি ‘ও’ হইয়া যায় : লক্ষ [লোক্ষ], যক্ষ [যোক্ষ], রক্ষ [রোক্ষ], অক্ষর [ওক্ষর], যজ্ঞ [যোজ্ঞ], দৈবজ্ঞ [দৈবোজ্ঞ] ইত্যাদি। ৭. প্র-উপসর্গের ‘অ’-এর ধ্বনি ‘ও’ হয় : প্রভাত [প্রোভাত], প্রগতি [প্রোগতি], প্রহার [প্রোহার], প্রকৃতি [প্রোকৃতি], প্রসঙ্গ [প্রোসঙ্গ], প্রণাম [প্রোণাম], প্রণতি [প্রোণতি], প্রতিমা [প্রোতিমা], প্রকাশ [প্রোকাশ] ইত্যাদি। ৮. একাক্ষর শব্দের অন্ত্য ন-এর পূর্ববর্তী ‘অ’ ‘ও’ হয় : মন [মোন], বন [বোন], জন [জোন], ধন [ধোন] ইত্যাদি। ৯. চলিত ভাষায় দুই অক্ষরের বিশেষণের অন্ত্য ‘অ’ ‘ও’ হয় : ছোটো, বড়ো, কতো, যতো, মতো, খাটো, কোনো, মেজো, সেজো, কালো, ভালো ইত্যাদি। ১০. তিন-অক্ষর শব্দের মধ্য-‘অ’ ‘ও’ হয় : কমল [কমোল], স্বপন [স্বপোন], বপন [বপোন], এমন [এমোন], ধমনী [ধমোনী], অশনি [অশোনি] ইত্যাদি। ১১. সাধু বা চলিত ভাষায় ক্রিয়াপদের অন্ত্য ‘অ’ ‘ও’-এর ধ্বনি প্রাপ্ত হয় : করিতেছিল [করিতেছিলো], বলেছিল [বলেছিলো], আসিত [আসিতো], ডাকত [ডাকতো], বলল [বললো], বাব [বাবো], দেখব [দেখবো], চল [চলো], ইত্যাদি।

তাছাড়া, ‘অ’-এর বিভিন্ন ধ্বনি লক্ষণীয় : ১. ‘অ’=[ɔ]। যেমন : ব্যবসায় [ব্যাবসায়], ব্যবহার [ব্যাবহার], ব্যয় [ব্যায়], ব্যত্যয় [ব্যাত্যয়], ব্যাখা [ব্যাখা], ব্যক্ত [ব্যাক্ত], ব্যর্থ [ব্যার্থ], ব্যসন [ব্যাসন] ইত্যাদি। ২. ‘অ’=[ə]। যেমন : ব্যক্তি [বেক্তি], ব্যথিত [বেথিত], ব্যতিক্রম [বেতিক্রম], ব্যতীত [বেতীত], ব্যতিহার [বেতিহার], ব্যাট [বেটি], ব্যয়িত [বেয়িত] ইত্যাদি।

কতকগুলি ক্ষেত্রে আবার ‘অ’-এর উচ্চারণ বর্জিত ; কতকগুলি ক্ষেত্রে অবর্জিত ।

আধুনিক বাংলা উচ্চারণে শব্দান্তের ‘অ’-এর উচ্চারণ বর্জন করাই রীতি । যেমন : গোবুল, অতুল, বলুন, আহুন, আকাশ, বাতাস, জন, কালিদাস ইত্যাদি । কিন্তু প্রাচীন ও মধ্যযুগের উচ্চারণে বাংলা শব্দান্তের ‘অ’ অবর্জিত ছিল ।

তবু কতকগুলি ক্ষেত্রে শব্দান্তের ‘অ’ উচ্চারিত হয় । যেমন : ১. শব্দান্তের ‘হ’ বা যুক্তাক্ষরের ক্ষেত্রে—দেহ, বিদ্রোহ, আরোহ, অবরোহ, অঙ্ক, বন্ধ, খণ্ড, সপ্ত, খণ্ডগ ইত্যাদি । ২. ‘ক্’ বা ‘ষ’ প্রত্যয়ান্ত বিশেষণে—নত, রত, বিরত, প্রণত, দেয়, হয়ে, বিধেয়, প্রেয়, প্রেয় ইত্যাদি । ৩. বিশেষণের ‘তর’ ‘তম’ প্রত্যয়ে—উচ্চতর, উচ্চতম, মহত্তর, মহত্তম, ক্ষুদ্রতর, ক্ষুদ্রতম, বৃহত্তর, বৃহত্তম ইত্যাদি । ৪. পদের অন্তে চ থাকিলে—গাঢ়, দৃঢ়, নিগূঢ় ইত্যাদি । ৫. অন্ত্য বর্ণের পূর্বে ং বা : থাকিলে—কংস, ধ্বংস, নৃশংস, বংশ, অবতংস, হংস, দুঃখ, দুঃস্থ, নিঃশ্ব ইত্যাদি । ৬. দুই-অক্ষর-বিশিষ্ট শব্দের প্রথম অক্ষরে ঞ, ঐ বা ঔ-কার থাকিলে—কৃশ, বুধ, ভৃগু, ঘৃত, বৃত, তৈল, ঘৈত, শৈল, বৈর, তৌল, মৌন, গৌণ, ধৌত ইত্যাদি । ৭. এগার হইতে আঠার পর্যন্ত সংখ্যাগুলিতে পদান্তের ‘অ’ উচ্চারিত হয় । ৮. ধনাত্মক শব্দের ‘অ’ প্রত্যয় যুক্ত হইলে ‘ও’ উচ্চারিত হয়—ছলছল [ ছলোছলো ], কাঁদকাঁদ [ কাঁদোকাঁদো ], ঢলঢল [ ঢলোঢলো ] ইত্যাদি । ৯. অল্পজায় পদের শেষে ‘ও’ উচ্চারিত হয়—চল, বল, কর, ধর, দেখ ইত্যাদি । তুচ্ছার্থে বা সম্ভবার্থে ‘অ’ বা ‘ও’ উচ্চারিত হয় না ।

এ—বাংলায় ‘এ’-র উচ্চারণ দুই প্রকার : সহজ ও বিকৃত । ‘এ’-র সহজ উচ্চারণে ইংরেজি ‘pet’-এর ‘e’-র মতো উচ্চারণ : আর, বিকৃত উচ্চারণে ইংবেজি ‘pat’-এর ‘a’-র মতো উচ্চারণ । ‘এ’-র সহজ উচ্চারণ—সে, কে, দেশ, বেশ, কেশ, শেষ, তেজ ইত্যাদি । ‘এ’-র বিকৃত উচ্চারণ—খেলা [ খালা ], দেখা [ ঢাখা ], বেচা [ ব্যাচা ], বেটা [ ব্যাটা ], পেচা [ প্যাচা ], লেজ [ ল্যাঙ্গ ] ইত্যাদি ।

‘এ’-র সহজ উচ্চারণ : ১. ই ঙ্গ বা উ উ-র পূর্ববর্তী ‘এ’—দেবী, দেশী, বেশী, ভেগ্নী, বেটি, কেলি, খেলি, পেটুক, সেতু, কেতু, লেবু, ডেবু ইত্যাদি । ২. শব্দান্তের ‘এ’—জলে, স্থলে, মনে, প্রাণে, চোখে, কানে, শেষে ইত্যাদি । ৩. তৎসম শব্দের আদিতে ‘এ’—মেঘ, বেগ, প্রেম, হেম, বেদ, ভেদ, ভেক, মেদ, মেদিনী ইত্যাদি । ৪. আ-কারান্ত দুই-অক্ষর ভাববাচক বিশেষ্য মূল ধাতু ‘ই’-যুক্ত হইলে—লিখ > লেখা, শিখ > শেখা, মিল > মেলা, কিন > কেনা ইত্যাদি । ৫. একাক্ষর সর্বনাম পদের ‘এ’—এ, কে, সে, যে । ৬. ‘হ’ কিংবা যুক্তাক্ষরের পূর্ববর্তী ‘এ’ শব্দের আদিতে অবস্থিত হইলে—কেহ, দেহ, গেহ, স্নেহ, লেহন, কেন্দ্র, কেটে, সেক ইত্যাদি ।

‘এ’-র বিকৃত উচ্চারণ : ১. আ-কারান্ত একাক্ষর শব্দের আদিতে ‘এ’—একা [ অ্যাকা ], জেঠা [ জ্যাঠা ], বেটা [ ব্যাটা ], পেচা [ প্যাচা ], নেকা [ ঙ্গাকা ], বেলা [ ব্যালা—সময় বুঝাইতে ] ইত্যাদি । ২. একাক্ষর তত্ত্ব শব্দের শেষে ক, খ, ঙ, চ, ন, ণ, র থাকিলে—এক [ অ্যাক্ ], দেখা [ ঢাখা ], বেঙ [ ব্যাঙ ], ঠেঙ [ ঠ্যাঙ ],

পেঁচ [ প্যাচ ], বেন [ যান ], ধের [ ছায় ] ইত্যাদি। আ-কারান্ত ভাববাচক বিশেষ্যের আদিস্থিত এ—বেচা [ ব্যাচা ], দেখা [ ছাধা ], ঠেলা [ ঠ্যালা ], হেলা [ হ্যালা ], ফেলা [ ফ্যালা ] ইত্যাদি। ৩. শব্দের আদিতে সাহুনাসিক এ—খোঁদা [ খ্যাঁদা ], ছোঁদা [ ছ্যাঁদা ], নেবা [ ন্যাবা ] ইত্যাদি।

এ—‘ঞ’-র উচ্চারণ দুই প্রকারের : ‘ই + ঞ’ এবং ‘ন’। ১. ‘ই + ঞ’ উচ্চারণ—মিঞা, যাচ্ঞা। ২. ন উচ্চারণ—অঞ্জন [ অনঞ্জন ], সঞ্জন [ সনচ্জন ], বঞ্জন [ বনচ্জন ], বাঞ্ছা [ বান্ছা ] ইত্যাদি।

শ, ষ, স—বাংলায় শ, ষ ও স-এর উচ্চারণ—‘শ’ [sh]-এর মতো একই রকম। যেমন : শেষ [ শেশ ], শোষণ [ শোশণ ], শাঁস [ শাঁশ ], শাসন [ শাশন ]; কিন্তু ঋ, র, জ পরে থাকিলে ‘স’-এর উচ্চারণ আসে : শৃগাল [ শৃগাল ], শ্রম [ শ্রম ], শ্রমিক [ শ্রমিক ], শ্রবণ [ শ্রবণ ], শ্রব [ শ্রব ], স্বজন, বৃষ্টি [ বৃষ্টি ] ইত্যাদি।

### বিভিন্ন বর্ণের একই ধ্বনি

বাংলায় ই ও ঈ, উ ও ঊ, ও ও ঔ, জ ও ঝ, ঞ ও ন এবং বর্গীয়-ব ও অন্তঃস্থ-ব—ইহাদের উচ্চারণ একই রকম।

ই ও ঈ—‘ইতর’ ও ‘ঈগল’ শব্দ দুইটিতে ই ও ঈ-র উচ্চারণে কোন পার্থক্য নাই। তবে ‘কি’ শব্দ জোর দিবার জন্য ‘কৌ’ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়।

উ ও ঊ—‘চূপ’ ও ‘কূপ’ শব্দ দুইটিতে উ ও ঊ-র উচ্চারণে কোন পার্থক্য দেখা যায় না। তবে ‘রূপা’ শব্দের উ ব্রহ্ম, রূপ শব্দের উ দীর্ঘ।

ও ও ঔ—ইহাদের উচ্চারণ একই রকম। ব্যাও [ ব্যাং ], রঙ [ রং ], মঙ [ মং ], চঙ [ চং ] ইত্যাদি।

জ ও ঝ—বাংলায় ইহাদের উচ্চারণে কোন পার্থক্য নাই। যেমন : বাজন [ জাজন ], যজ্ঞ [ জজ্ঞ ], যাত্রা [ জাত্রা ] ইত্যাদি।

বর্গীয়-ব ও অন্তঃস্থ-ব—বাংলায় উভয়েরই উচ্চারণ ‘b’-এর মতো। তবে অন্তঃস্থ-ব ব্যঞ্জননের সহিত যুক্ত হইলে উহা উচ্চারিত না হইয়া ব্যঞ্জনটি বিচ্ছিন্ন হয় : বিশ্বাস [ বিশ্শাস ], অদ্বয় [ অদ্দয় ] ইত্যাদি।

### ধ্বনি-বিলোপ

ধ্বনির সৃষ্টি বাগ্‌ধ্বন্য হইতে। শব্দ উচ্চারণকে বাগ্‌ধ্বন্য সব সময় সহজ করিয়া উচ্চারণ করিতে চায়। তাহাতে কখনও কখনও ধ্বনির বিলোপ ঘটে।

স্বরধ্বনির বিলোপ : উচ্চারণের সময় শব্দের অন্তর্গত কোন বর্ণের উপর অধিক পক্ষপাতহেতু বিশেষ জোর আরোপিত হইলে অনাদৃত কোন স্বরধ্বনি লুপ্ত হয় ; তাহাকে স্বরলোপ বলে। যেমন : অলাবু > অলাউ > লাউ, অপিধান > পিধান, উদ্ধার > উদার > দার, উড়ঘর > ডুমুর, অতসী > তিসি : এইগুলি আদি-স্বর-লোপের দৃষ্টান্ত। অন্ত্য-স্বর-লোপের দৃষ্টান্ত হইল : রাজি > রাতি > রাত > রাত্, হস্ত > হাত

## বাংলা বর্ণীকরণ

>হাত, ভক্ত>ভাত>ভাত্। মধ্যস্বর-লোপের দৃষ্টান্ত হইল: জানালা>জানলা, বসতি>বস্তি, ভগিনী>ভগ্নী, নাতিনী>নাত্‌নী, নারিকেল>নারকেল। উচ্চারণ-জনিত মধ্যস্বর-লোপকে বলা হয় সম্প্রকর্ষ।

**ব্যঞ্জনধ্বনি-বিলোপ বা বর্ণলোপ [Hapology]:** পদের মধ্যস্থিত স্বরধ্বনিসূক্ত বা স্বরধ্বনিহীন কোন বর্ণ যদি লুপ্ত হয়, তাহাকে বলা হয় বর্ণলোপ। যেমন: ফান্তন>ফাণ্ডন, আলাহিদা>আলাদা, গোষ্ঠ>গোঠ, নবধর>নধর, অশ্বখ>অশখ, হান>খান, মজ্‌ছুর>মজুর, বড়দিদি>বড়দি, বউদিদি>বউদি, ভাইশুভর>ভাশুর, ফটিক>ফটিক, আলোক>আলো, কাপাস>কাপাস।

বাংলায় সন্ধির কারণে অথবা উচ্চারণে সরলীকরণের জন্য অনেক সময় ধ্বনির লোপ হয়। যেমন: কাঁচা+কলা=কাঁচকলা, মিশি+কালো=মিশকালো, জগৎ+জন=জগজন, জগৎ+বন্ধু=জগবন্ধু ইত্যাদি। আধুনিক বাংলায় পদান্ত অ-কার উচ্চারিত হয় না। যেমন: হাত্‌, রাত্‌, মুখ্‌, চোখ্‌, কান্‌, কঠিন্‌, কোমল্‌, বলন্‌, কল্ক্‌, ইত্যাদি।

**শব্দ-মধ্যবর্তী র-কার ও হ-কার লোপ:** বাংলায় উচ্চারণ-কালে বহু শব্দ-মধ্যবর্তী র-কার ও হ-কার লুপ্ত হয়। যেমন: র-কার লোপ: কর্ম>কন্ম, ধর্ম>ধন্ম, করল>কল্ল, ধরল>ধল্ল, তেপ্রান্তর>তেপান্তর, শৃগাল>শিয়াল। [এইগুলি সমীকরণজনিত পরিবর্তনও বটে।] কিন্তু কল্ল, চল্ল, বল্ল ইত্যাদি লেখা উচিত নয়, ওগুলি স্বাভাবিক ক্রমে করল, চলল, বলল—এইভাবে লেখা উচিত। হ-কার লোপ: ফলাহার>ফলার, বাহির>বা'র [দরিয়া], চাহে>চায়, গাহে>গায়, শাহ্>শা, মহাশয়>মশায়, তাহার>তার, লোহা>লোয়া, বেহাই>বেয়াই।

## বিদেশী শব্দের বাংলা বর্ণীকরণ

বিদেশী ভাষা হইতে যে সকল শব্দ বাংলা ভাষায় গৃহীত হইয়াছে, তাহাদের বিদেশী শব্দ বলা হয়। বিদেশী ভাষাগুলির ধ্বনিসমূহ যেমন স্বতন্ত্র, তাহাদের রূপদানের জন্য তাহাদের বর্ণমালাও তেমন স্বতন্ত্র। আবার, বাংলা ভাষার ধ্বনি ও তাহার বর্ণমালা তেমন স্বাভাবিক। তাই সমস্ত দেখা দেয় বিদেশী শব্দগুলির বাংলা ধ্বনিতে উচ্চারণে এবং বাংলা বর্ণে রূপায়ণে। বিদেশী শব্দসমূহকে বাংলা বর্ণে প্রকাশ করাকে বিদেশী শব্দের বাংলা বর্ণীকরণ বলা হয়।

বাংলায় প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বিদেশী শব্দ আছে। তাহার মধ্যে প্রায় আড়াই হাজারই আরবী-ফারসী শব্দ, চারশত তুর্কী শব্দ, আটশত ইংরেজি শব্দ, দেড়শত পর্তুগীজ ও ফরাসী শব্দ এবং অবশিষ্টগুলি অন্যান্য বিদেশী শব্দ। বহু অ-বাংলা ভারতীয় শব্দ ইহার মধ্যে পড়ে। তাহারাও বাংলা ভাষার বিদেশী বা আগন্তুক শব্দ।

কিন্তু যে সমস্ত আমাদের বিব্রত করে, তাহা হইল ইহাদের উচ্চারণের সমস্তা, উচ্চারণ-অনুযায়ী বাংলা হরফে লিখিবার সমস্তা তথা বাংলা বর্ণীকরণের সমস্তা। লোভা কথায়, তাহাই বিদেশী শব্দের বাংলা বানানের সমস্তা।

এই সমস্তার মনীষী-স্বীকৃত সহজ সমাধান হইল, উহাদের প্রকৃত উচ্চারণ এবং



বানান মূল ভাষায় বাহাই হউক, উহাদের বাংলা উচ্চারণের দিকে নজর রাখিয়া বাংলা হরকে লিখিত হইবে। তবে দীর্ঘদিন ধরিয়া উহাদের যে বানান চলিয়া আসিতেছে, সেই প্রচলিত বানানকে অস্বীকার করাও উচিত নয়।

অরবীয় যে, ইংরেজি ‘o’, ‘f’, ‘v’, ‘w’, ‘z’ ইত্যাদির প্রতিবর্ণ বাংলায় নাই। এসব ক্ষেত্রে ইহাদের উচ্চারণের কাছাকাছি বাংলা বর্ণ ব্যবহার করিয়া কাজ সাহিয়া লইতে হয়। তবুও বিদেশী শব্দের বাংলা বানানের ক্ষেত্রে কতকগুলি নিয়ম মানিয়া চলা আবশ্যিক। যেমন :

অ আ—‘All’ শব্দটির উচ্চারণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ‘অল’ লেখাই উচিত। কিন্তু Allah শব্দটি ‘আল্লা’ লেখাই বাঞ্ছনীয়। কাজেই, ‘A’-র বানান কোথায় ‘অ’ হইবে এবং কোথায় ‘আ’ হইবে, তাহা উচ্চারণের উপর নির্ভর করে।

ঢা—ষ-ফলা + আ-কারকে রূপ দিবার মতো কোন একক বর্ণ বাংলায় নাই। অবশ্য বাংলা ‘আ’-এর বিকৃত উচ্চারণ ‘ঢা’-র মতো। কিন্তু বিদেশী শব্দে ‘আ’-র বিকৃত উচ্চারণ অসমীচীন। বাংলা উচ্চারণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শুধু ‘আ’ অথবা ‘অ্যা’ ব্যবহার করিতে হইবে। যেমন : ট্রাম [ tram ], মাস্টার [ master ], হাসপাতাল [ hospital ], ডাক্তার [ doctor ], ফাস্ট [ fast ], ক্লাস [ class ], গ্লাস [ glass ], অফিস [ office ] ইত্যাদি। আবার, অ্যাসিড [ acid ], স্যার [ sir ], প্রিন্সিপ্যাল [ principal ], হাফ-ব্যাক [ half-back ], ব্যারিস্টার [ barrister ], ব্যাটসম্যান [ batsman ], ল্যাম্পপোস্ট [ lamp-post ] ইত্যাদি।

ই ঈ—মূল উচ্চারণে ‘e’, ‘i’, ‘ea’, ‘ee’, ‘ei’ ও ‘ie’—ইহাদের উচ্চারণ যদি হ্রস্ব হয়, তবে বাংলায় হ্রস্ব-ই এবং যদি দীর্ঘ হয়, তবে দীর্ঘ-ঈ ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। যেমন : ইংরেজ [ The English ], ইংরেজি [ English ], ইন্টারেস্ট [ interest ], ইন্সিওরেন্স [ insurance ], ইন্সপেক্টর [ inspector ], ইনফরমেশন [ information ], ইম্পসিবল্ [ impossible ] ইত্যাদি। আর, ইস্ট [ east ], ইগল [ eagle ], ইজিচেয়ার [ easychair ], ইজেল [ easel ] [ বাংলায় অবশ্য ‘ইজেল’ বানানই প্রচলিত ]—ইত্যাদি। ‘y’-এর বাংলা উচ্চারণ কখনও কখনও ‘ই’ হয়। যেমন : পিরামিড [ Pyramid ]।

উ ঊ—মূল উচ্চারণ অল্পাধ্বাণী ‘w’, ‘u’, ‘oo’—ইহাদের ইংরেজি উচ্চারণ হ্রস্ব কিংবা দীর্ঘ হইলেও বাংলা বানানে উ হইবে। যেমন : উইলিয়াম [ William ], উইল [ will ], উইট [ wit ], উল [ wool ], উকিল, উজীর, ফুল্ট, ফুল [ full ], বুট [ boot ], ফ্লুট [ flute ] ইত্যাদি। আবার, স্পুন [ spoon ]—কিন্তু ইংরেজিতে দীর্ঘ-উ উচ্চারিত হইলেও বাংলা উচ্চারণে হ্রস্ব-উ উচ্চারিত হয় ; এবং বানানও হয় তদনুরূপ। যেমন : সেলুন [ saloon ], ফেস্টুন [ festoon ], বেলুন [ balloon ], বেবুন [ baboon ], লেগুন [ lagoon ] ইত্যাদি।

ঋ—বিদেশী শব্দে ঋ-কার বর্জনীয়। ঋ-কারের স্থানে যি বা র-ফলা+ই-কল্প ব্যবহৃত হওয়া উচিত। প্রেসক্রিপশান [ Prescription—প্রেসক্রিপশান অন্তর্ভুক্ত ], ক্রিস্টিয়ান [ Christmas—ক্রিস্টিয়ান অন্তর্ভুক্ত ], যীশু খ্রীষ্ট [ Jesus Christ—যীশু খ্রীষ্ট অন্তর্ভুক্ত ], খ্রীষ্টাব্দ [ খ্রীষ্টাব্দ অন্তর্ভুক্ত ], ব্রিটেন [ Britain—ব্রিটেন অন্তর্ভুক্ত ], ব্রিটিশ [ British—ব্রিটিশ অন্তর্ভুক্ত ] ইত্যাদি।

ঐ—বাংলা উচ্চারণ-অনুসারে ‘e’, ‘ai’ এবং ‘ae’-তে ‘এ’ প্রযুক্ত হয়।—যেমন : ফাউন্টেনপেন [ fountainpen ], ট্রেন [ train ], চেন [ chain ], মেন [ main ], এনকোর [ encore ], পেঙ্গুইন [ penguin ], এনামেল [ enamel ], এসপ্লানেড [ esplanade ], এরোপ্লেন [ aeroplane ], এক্সপার্ট [ expert ] ইত্যাদি। কিন্তু pain-এর বানান ‘পেইন’ লেখা উচিত।

ঔ—W-স্থানে প্রচলিত রীতি-অনুসারে ‘উ’ বা ‘ও’ ব্যবহৃত হওয়া উচিত। যেমন : উইলসন [ Wilson ], উইলিয়াম [ William ], ওয়ার্ডসওয়ার্থ [ Wordsworth ], সাব-ওয়ে [ sub-way ] ইত্যাদি।

ক ঋ—ইংরেজি ‘c’ ও ‘k’ বর্ণের স্থানে বাংলায় ‘ক’ হয়। যেমন : কংগ্রেস [ Congress ], কনস্টেবল [ constable ], কোম্পানী [ company ], আমেরিকা [ America ], কানাডা [ Canada ], কীটস [ Keats ], কিণ্ডারগার্টেন [ kindergarten ], কিমোনো [ Kimono ], কিলোমিটার [ Kilometre ] ইত্যাদি।

ইংরেজি kh স্থানে ‘খ’ হয়। যেমন : খরিফ [ kharif ], খলিফা [ khalifa ] ইত্যাদি।

গ ঘ—ইংরেজি ‘g’ বর্ণের স্থানে ‘গ’ এবং ‘gh’-এর স্থানে ‘ঘ’ হয়। যেমন : গ্যারান্টি [ guarantee ], গার্ড [ guard ], গার্ডেন [ garden ], গ্রামার [ grammar ], গল [ Gaul ], গ্র্যাণ্ড [ grand ], গ্রীন [ green ], গানা [ Ghana ] ইত্যাদি।

ঙ ঙ—ইংরেজি ‘ng’-এর স্থানে ‘ঙ’ বা ‘ং’ ব্যবহৃত হয়। যেমন : গ্যাংগ্রিন বা গ্যাংগ্রিন [ gangrene ], রঙ্‌রুট বা রংকট [ wrong-route ], লঙ্‌ম্যান বা লংম্যান [ longman ], ওরাঙ্‌-ওটাঙ্‌ বা ওরাং-ওটাং [ orang-outang ] ইত্যাদি।

চ ছ—ইংরেজি ‘ch’-এর স্থানে ‘চ’ এবং ‘chh’-এর স্থানে ‘ছ’ হয়। যেমন : চার্লস [ Charles ], চেম্বারলেন [ Chamberlaine ], চার্জ [ charge ], চেম্বার [ chamber ], চার্চিল [ Churchill ] ইত্যাদি। আবার ‘tu’-এর উচ্চারণ ‘তু’ বা ‘তা’ হয়। যেমন : মিউচুয়াল [ mutual ], স্ট্যাচার [ stature ]।

জ ঝ—ইংরেজি ‘j’ [ কখনও কখনও ‘g’ ] বর্ণের স্থানে ‘জ’ এবং ‘jh’-এর স্থানে ‘ঝ’ হয়। যেমন : জেমস [ James ], জন [ John ], জেরুজালেম [ Jerusalem ], জাপান [ Japan ], জ্যাক [ Jack ], জিল [ Jill ], মেজর [ Major ], জুডাস [ Judas ], জাস্টিস [ Justice ], জজ [ Judge ], জর্জিয়া [ Gorgia ], ম্যাজিস্ট্রেট [ Magistrate ], জেনারেল [ General ], জার্মানী [ Germany ], ম্যানেজার [ Manager ] ইত্যাদি। আবার, ইংরেজি ‘z’-এর স্থানে বাংলায় সাধারণত : ‘জ’

ব্যবহৃত হয়। যেমন : জেব্রা [ Zebra ], জু [ Zoo ], জুলু [ Zulu ] ইত্যাদি। বাংলায় 'Z'-এর শুদ্ধ উচ্চারণের জন্য 'জ' ব্যবহার করা উচিত ; কিন্তু বাংলা বর্ণমালায় এই বর্ণ নাই ; এমন-কি, বাংলা উচ্চারণেও এই ধ্বনি অহুপস্থিত। আবার, 'Z'-এর খাটি উচ্চারণ 'ৎস' করা হয়। যেমন : নাসী [ Nazi ]।

ট—ইংরেজি 't'-এর বাংলা বানান 'ট' হয়। যেমন : টম [ Tom ], টাইপ [ type ], টিম [ team ], ট্রেন [ train ], টেবিল [ table ] ইত্যাদি। কখনও কখনও 'th'-ও 'ট' উচ্চারিত হয়। যেমন : টমাস [ Thomas ], টেম্‌স [ Thames ] ইত্যাদি।

ড—ইংরেজি 'd'-এর বাংলা উচ্চারণ 'ড' হয়। যেমন : ডেভিড [ David ], ডাক্তার [ doctor ], ড্রিল [ drill ], ড্রেন [ drain ], ডন [ don ], ডবল [ double ], ব্যাণ্ড [ band ], গ্র্যাণ্ড [ grand ], ফ্রেন্ড [ friend ] ইত্যাদি।

ণ ন—ইংরেজিতে মৃধন্ত-'ণ' ও দন্ত্য-'ন'-এর পার্থক্য নাই ; শুধু 'n' দিয়া কাজ চলিয়া যায়। বাংলায়ও উচ্চারণে 'ণ' ও 'ন'-এর কোন ব্যবধান নাই ; আছে শুধু দন্ত্য-'ন'-এর উচ্চারণ। কাজেই বিদেশী শব্দের বানানের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিকতা বৃদ্ধি না করিয়া কেবল 'ন'-ই ব্যবহৃত হওয়া উচিত। যেমন : ব্রেন, ট্রেন, ড্রেন, সাইরেন, প্যাটার্ন, বায়রন [ Byron ], পেটাগন ইত্যাদি। তেমনি কোরান, দরুন, গুজরান, ফরমান, শিরনী, কুনিশ, কোরবানি ইত্যাদি।

ত [ ৎ ] থ : ইংরেজিতে 'ত'-এর উচ্চারণ নাই, কিন্তু 'থ' ধ্বনি আছে। কিন্তু ফরাসী, আরবী, ফারসী, তুর্কী ও অন্যান্য বিদেশী ভাষায় 'ত' ও 'থ'-এর উচ্চারণ আছে। যেমন : নতরদাম [ Notredome ], থিয়েটার [ theatre ], কাফুজ, কৈফিয়ত, মেরামত, তাবিজ, তামাদি, তোতা, দোয়াত, রাস্তা, থানা, থার্মোমিটার [ ইং ] ইত্যাদি। কিন্তু তথৎ, নেহাৎ, দৌলৎ, হিম্মৎ, ফুরসৎ ইত্যাদি না লিখিয়া যথাক্রমে তথুত, নেহাত, দৌলত, হিম্মত, ফুরসত ইত্যাদি লেখা উচিত।

দ—ইংরেজি 'th'-এর [ এবং ইতালীয় 'd'-এর ] বাংলা উচ্চারণ 'দ' হয়। যেমন : ব্রাদার, কাদার, মাদার, দান্তে [ Dante ], ওভিড [ Ovid ] ইত্যাদি। অন্যান্য বিদেশী শব্দ—দরবার, দলিল, আদালত, খোদা, মসজিদ ইত্যাদি।

প ফ—ইংরেজি 'p'-এর বাংলা উচ্চারণ 'প'। যেমন : পুলিশ [ police ], পালিশ [ polish ], সুপার [ super ], পেপার [ paper ] ইত্যাদি। ইংরেজি 'f' এবং 'ph'-এর বাংলা উচ্চারণ 'ফ' বর্ণের সাহায্যে ব্যক্ত হয়। যেমন : ফুল [ full ], ফ্রী [ free ], ফী [ fee ], লোফার [ loafer ], ফ্যান [ fan ], সালফার [ sulphur ], সালফেট [ sulphate ], ফিজিক্স [ physics ], ফিজিওলজি [ physiology ] ইত্যাদি।

ব ভ—ইংরেজি 'b'-এর বাংলা উচ্চারণ 'ব' এবং 'v'-এর বাংলা উচ্চারণ 'ভ'। যেমন : বক্স [ box ], বোর্ড [ board ], বিল [ bill ], বল [ ball ], ব্যাণ্ড [ band ], ভোট [ vote ], ভেইল [ veil ], ভ্যারাইটি [ variety ], ভ্যাকসিন [ vaccine ] ইত্যাদি।

ম—ইংরেজি ‘m’-এর বাংলা প্রতিবর্ণ ‘ম’। যেমন : মাদার [ mother ], মর্নিং [ morning ], মটন [ mutton ] ইত্যাদি।

য র জ ব—বিদেশী শব্দে ‘য’ ব্যবহার করা উচিত নয় ; বর্ণীয় ‘জ’ই ব্যবহৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে ‘য’-ফলা ব্যবহারে বাধা নাই। জন [ John—যোহন নয় ], জ্যাক [ Jack ] ব্যবহৃত হইতে পারে। ইংরেজি ‘r’-এর বাংলা উচ্চারণ ‘র’। যেমন : রিম্ [ rim ], রিস্ক [ risk ], রোমান [ Roman ] ইত্যাদি। ‘ল’ ইংরেজি ‘l’-এর প্রতিবর্ণ। যেমন : লাইন [ line ], স্কুল [ school ], লোয়ার [ lower ], লটারি [ lottery ], লোন [ loan ] ইত্যাদি। বাংলায় অন্তঃস্থ-ব-এর অন্তর্ভুক্ত নাই। তবে ইংরেজি ‘wa’-র বাংলায় উচ্চারণ ‘ওয়’ হওয়া বাঞ্ছনীয়। ওয়ার [ war ], হার্ডওয়ার [ hardware ], ওয়াল [ wall ] ইত্যাদি। ওয়ার্ডসওয়ার্থ [ Wordsworth ] লিখিতে হইবে, ওয়ার্ডস্বার্থ নয়।

শ য় স—বিদেশী শব্দের বাংলা উচ্চারণে ‘য’-এর অন্তর্ভুক্ত নাই। বিদেশী শব্দের উচ্চারণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শুধু ‘শ’ ও ‘স’ হইবে। যেখানে উচ্চারণ sh-এর মতো, সেখানে শ এবং যেখানে উচ্চারণ s-এর মতো, সেখানে ‘স’ লেখা উচিত। যেমন : শেক্সপীয়ার [ Shakespeare ], শেলী [ Shelley ], শো [ show ], শার্ট [ shirt ], পোলিশ [ polish ], পেনশন [ pension ] ; ক্লাস [ class ], পুলিশ [ police ], পেনসিল [ pencil ], সিমেন্ট [ cement ]। তেমনি সবুজ, সাদা, মসলা, মসজিদ, আসমান, আসল, বাদশাহ, শিকার, শহীদ, দরবেশ, পশম, রেশম, চণমা, রোশনাই, শাল ইত্যাদি হইবে। এমনকি ট-বর্গেও স্ট্রিট, স্টেশন, স্ট্রীমার, স্ট্রিয়ারিং, স্ট্রীল, ছুপিড, পোর্ট অফিস, ক্রীষ্ট ইত্যাদি না হইয়া যথাক্রমে স্ট্রিট, স্টেশন, স্ট্রীমার, স্ট্রিয়ারিং, স্ট্রীল, স্টুপিড, পোর্ট অফিস, ক্রীস্ট ইত্যাদি হইবে। তেমনি জিনিস, পোষাক, বারকোষ, তক্তপোষ ইত্যাদির পারিবাতে যথাক্রমে জিনিস, পোশাক, বারকোশ, তক্তপোশ হইবে।

হয়—‘হ’ ইংরেজী ‘h’ বর্ণের প্রতিবর্ণ। যেমন : হাউস [ house ], হোম, [ home ], হাই [ high ], হায়ার [ higher, hire ], হোটেল [ hotel ] ইত্যাদি। ‘য়’ ইংরেজি ‘y’ বা সমোচ্চারিত ধ্বনির প্রতিবর্ণ। যেমন : মেয়র [ Mayor ], চেয়ার [ Chair ], রেডিয়াম [ radium ], সোয়েটার [ sweater ] ইত্যাদি।

### ● কতকগুলি পরিচিত বিদেশী শব্দের বাংলা বর্ণীকরণ

Elizabeth [ এলিজাবেথ ], Britain [ ব্রিটেন, ‘ব্রুটেন’ নয় ], Christian [ খ্রীষ্টান, ‘খ্রুটান’ নয় ], Shakespeare [ শেক্সপীয়ার, ‘শেক্ষপীয়ার’ নয় ], John [ জন, ‘যোহন’ নয় ], Wordsworth [ ওয়ার্ডসওয়ার্থ, ‘ওয়ার্ডস্বার্থ’ নয় ], Century [ সেঞ্চুরি ], Germany [ জার্মানী, ‘জার্মানো’ নয় ], Renaissance [ রেনেসাঁস, ‘রেনেসাঁ’ নয় ], Restaurant [ রেস্তোরাঁ, ‘রেস্টুরেন্ট’ নয় ], Rousseau [ রুশো ], Paul [ পল ], Chemistry [ কেমিস্ট্রি ], Chemical [ কেমিক্যাল ], Cafe [ কাফে ], Eluard [ এলুয়ার ], Souvenir [ সউভেনিয়ার ], Canal [ ক্যানাল ], Bank [ ব্যাঙ্ক ],

‘ব্যাংক’ নয় ], League [ লীগ ], Picnic [ পিকনিক ], Puncture [ প্যাংচার ], Rickshaw [ রিকশা ], George Bernard Shaw [ জর্জ বার্নার্ড শ ], John Donne [ জন ডান ], Ballad [ ব্যালাড ], Ballet [ ব্যালে ] ।

## । অনুসরণী ।

১. নিম্নলিখিত শব্দগুলি অবলম্বনে বাংলা এ’ স্বরবর্ণের উচ্চারণগত বৈচিত্র্যনিক্রমণ কর : দেখা, শেখা, একদা, এক, কেন, বেলা [ সময় ] । মা. ’৬৮।

২. উদাহরণসহ নিম্নলিখিত পরিভাষাগুলি ব্যাখ্যা লিখ : হৃষিকার : সঙ্কাকর বা যৌগিক স্বর, মা. ’৫৯, ’৬০, ’৬১ ; উদ্বরণ, ম. ’৫৫, ’৬৩, উ. মা. [ কম্পাট. ], ’৬১, মহাপ্রাণ বর্ণ, উ. মা. ’৬৩, ’৬৪ ; বগীয় বর্ণ . নাসিক্যধ্বনি, ঘোষবর্ণ, উ. মা. ’২, অন্তঃস্থ বর্ণ, মা. ’৬০, ’৬২, উ. মা. ’৬০, অন্নপ্রাণ বর্ণ, মা. ’৫৪, উ. মা. ’৬৩, মহাপ্রাণ বর্ণ, মা. ’৫২, ’৫৮, উ. মা. [ কম্পাট. ], ’৬২, তালনা বর্ণ, মা. ’৫৩, ’৬১, স্বরাস্ত্র অক্ষর ; বাঞ্ছনাস্ত্র বা চলন্ত অক্ষর, কঠোর্য বর্ণ, কঠোর্য বর্ণ, মা. ’৬০, দস্তাবর্ণ, ক. প্রা. ’৬১ ; ল্পবর্ণ, মা. ’৫২, উ. মা. ’৬৩, অনুনাসিক বর্ণ, মা. ’৬৫, অযোগবাহ বর্ণ বা আশ্রয়স্থানভাগী বর্ণ, মা. ’৬৭, প্লুত স্বর, তরল স্বর, পার্থক্য ধ্বনি ।

৩. উদাহরণসহ পার্থক্য নির্দেশ কর . ধ্বনি, বর্ণ ও অক্ষর, স্বরধ্বনি ও বাঞ্ছন্যধ্বনি ; স্বরাস্ত্র অক্ষর ও বাঞ্ছন্যাস্ত্র বা চলন্ত অক্ষর ; হৃষিকার ও দ্ব্যর্থস্বর, মৌলিক স্বরধ্বনি ও যৌগিক স্বরধ্বনি, অন্নপ্রাণ ও মহাপ্রাণ বর্ণ, মা. ’৬০, মা. [ কম্পাট. ], ’৬০, . যান্ত্রবর্ণ ও অযান্ত্রবর্ণ . ল্পবর্ণ ও উদ্বরণ, হৃষিকার ও প্লুতস্বর, গিশ্মধ্বনি ও পার্থক্য ধ্বনি ।

৪. দৃষ্টান্তসহ আলোচনা কর : একই বর্ণের বিভিন্ন ধ্বনি ও বিভিন্ন বর্ণের একই ধ্বনি ।

৫. ধ্বনিবৈশিষ্ট্য কতটুকু বলে ? দৃষ্টান্তসহ আলোচনা কর ।

৬. উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর : আত্ম অ-কারের উচ্চারণ-বৈচিত্র্য, ম. ’৬৫, অ-কারের দ্বি-উচ্চারণ, উ. মা. ’৬০, অ-কারের বিচ্ছিন্ন ও সংযুক্ত উচ্চারণ, মা. ’৫৬, অ-কার ও ঐ-কারের বিভিন্ন উচ্চারণ-বৈচিত্র্য, মা. [ কম্পাট. ], ’৬০

৭. নিম্নলিখিত বর্ণগুলির উচ্চারণ-স্থান সম্বন্ধে টীকা লিখ : ঐ, ঐ, ঐ, ঐ, ঐ, ঐ, মা. ’৬০, ঐ, ও ঐ, ঐ, ঐ, ঐ, ঐ, ঐ, মা. ’৫২, ঐ, ঐ, ঐ, ঐ, ঐ, ঐ, ক. প্রা. ’১৩, ঐ, ঐ, ঐ, ঐ, ঐ, ঐ, ক. প্রা. ’৪৪, ঐ, ঐ, ঐ, ঐ, ঐ, ঐ, ক. প্রা. ’৬৭, ঐ ও ঐ, ক. প্রা. ’৪৮

৮. বাংলা বর্ণমালায় কোনগুলি উদ্বরণ ? কোন উচ্চারণ উদ্বরণ বলা হয় ? উ. মা. ’৬৮

৯. ক বাংলা বর্ণমালায় অনুনাসিক বর্ণগুলি কত প্রকার ? উ. মা. ’৬২। কোন কোন বর্ণের উপস্থিতি চন্দ্রবন্দুকের উৎপত্তি হয় ? একটি করিয়া, দৃষ্টান্ত দাও । অনুস্বারের উচ্চারণ বিকল্প ? উহাকে অনুস্বার বলা হয় কেন ?

খ. বাংলা বর্ণমালায় দস্তাবর্ণ কতগুলি ? উচ্চারণের ঐক্য বলা হয় কেন ? উ. মা. ’৬২

১০. বিদেশী শব্দের বাংলা বর্ণমালায় প্রবেশ প্রদান নিয়মগুলি দৃষ্টান্তসহ সংক্ষেপে লিখ ।

১১. বিদেশী শব্দের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বর্ণগুলির শুদ্ধ প্রয়োগ দেখাও : ই ও ঐ, উ ও ঊ, ঋ ও ঌ, ঋ ও ঌ, ঋ ও ঌ, ঋ ও ঌ, ঋ ও ঌ, ঋ ও ঌ ।

১২. ক বাংলা হরপে বা বর্ণ লিখ : Great Britain, Shakespeare, station, street, pencil, morning show, police, steamer, Thomas, Stephen, pyramid, chocolate, chalk, Thompson, Nazi, John, Mazzini, Wordsworth.

খ. শুদ্ধ করিয়া লিখ : নাজি, মীশুগুপ্ত, প্রেসবুশমান, ল্যান্সেট, ওয়াটবার্ণ, যোজন ।

বাক্যের অন্তর্গত কার্ধ-বোধক পদকে বলা হয় ক্রিয়াপদ। ক্রিয়াপদের অস্তিত্ব ব্যতীত বাক্য সংগঠিত হইতে পারে না। [আমি] ‘নদীকূলে বসে আছি’—বাক্যে ‘বসে আছি’ ক্রিয়াপদ উপস্থিত। কিন্তু ‘দুর্গম [হয়] গিরি, কান্তার [হয়] মরু, দুস্তর [হয়] পারাবার’—বাক্যটি তিনটি ক্রিয়াপদের সমষ্টি এবং তিনটি বাক্যেই ‘হয়’ ক্রিয়াপদ উহ। উপস্থিত থাকুক বা উহ থাকুক, বাক্যে ক্রিয়াপদের অস্তিত্ব থাকিবেই।

ক্রিয়াপদকে বিশ্লেষ করিলে পাওয়া যায় ধাতু-প্রকৃতি এবং প্রত্যয়-বিভক্তি। শব্দের মূল রূপকে বলা হয় প্রকৃতি। প্রকৃতি দুই প্রকার: নাম-প্রকৃতি ও ধাতু-প্রকৃতি। অর্থাৎ প্রাতিপদিক ও ধাতু। অর্থবোধক বর্ণ বা বর্ণ-সমষ্টির নাম প্রাতিপদিক।

কাজেই, প্রত্যেক ক্রিয়াপদকে বিশ্লেষ করিলে বা ভাঙিলে, শেষ পর্যন্ত এমন একটি মূল বা জড় পাওয়া যায়, যাহাকে আর বিশ্লেষ বা ভাগ করা সম্ভব নয়। ক্রিয়াপদের এই অবিভাজ্য জড় অংশ, ক্রিয়ার এই শুদ্ধ ভাব-স্বাতন্ত্র্য মূল—ইহাকেই বলা হয় ‘ধাতু’। যেমন: সে হাসে, আমরা কাঁদি, তুমি দেখ—বাক্য তিনটির ক্রিয়াপদ তিনটিকে বিশ্লেষ করিলে ‘হাসে=হাস্+এ’, ‘কাঁদি=কাঁদ+ই’, ‘দেখ=দেখ্+অ’ পাওয়া যায়। ‘হাসে’ ক্রিয়াপদটির মূল হইল ‘হাস্’-ধাতু, ‘কাঁদি’ ক্রিয়াপদটির মূল হইল ‘কাঁদ’-ধাতু, ‘দেখ’ ক্রিয়াপদটির মূল হইল ‘দেখ্’-ধাতু। কাজেই, ক্রিয়ার মূলই হইল ধাতু।

মূল ধাতুর সহিত প্রত্যয় ও বিভক্তি যোগে যে কার্ধ-বোধক পদ গঠিত হয়, তাহাই ক্রিয়াপদ। যেমন: ‘দেখ্’—ইহার সহিত ‘ই’ বিভক্তি যোগ করিলে ‘দেখি’—উত্তম পুরুষের এই ক্রিয়াপদটি গঠিত হয়। তেমনি, ‘দেখ্’+অ=‘দেখ’ [মধ্যম পুরুষের ক্রিয়াপদ], ‘দেখ্’+এ=‘দেখে’ [প্রথম পুরুষের ক্রিয়াপদ] ‘দেখ্’ ইতাম্=‘দেখিতাম্’, ‘দেখ্’+ইলাম=‘দেখিলাম’, ‘দেখ্’+ইব=‘দেখিব’। ‘দেখ্’+আ [প্রত্যয়]+ইব=‘দেখাইব’—ক্রিয়াপদগুলি এইভাবে গঠিত। কিন্তু লক্ষ্য কর, মূল ধাতুর যে অর্থ, তাহার দ্বারা গঠিত ক্রিয়াপদেও সেই অর্থ অন্তর্ভুক্ত থাকে।

গঠন-অনুসারে ধাতু প্রধানত: চার প্রকার: মৌলিক বা সিদ্ধধাতু, সাধিত ধাতু, বৌগিক ধাতু ও সংযোগমূলক ধাতু। ক. মৌলিক বা সিদ্ধ ধাতু: যে ধাতু স্বয়ংসিদ্ধ এবং যাহাকে আর বিশ্লেষ করা যায় না, তাহাকে মৌলিক বা সিদ্ধ ধাতু বলা হয়। যেমন: কর, চল, বল, দেখ, হাস, ডাক, পড়, নে, দে, পা, খা, চা, আন, শেখ ইত্যাদি। খ. সাধিত ধাতু: মৌলিক বা সিদ্ধ ধাতুর সহিত প্রত্যয় যুক্ত হইয়া নূতন ধাতু গঠিত বা সাধিত হইলে, তাহাকে বলা হয় সাধিত ধাতু। সাধিত ধাতুকে বিশ্লেষ করিলে মূল ধাতু ও প্রত্যয় পাওয়া যায়। যেমন:

[কর্ + আ =] করা, [চল্ + আ =] চলা, [বল্ + আ =] বলা, [দেখ্ + আ =] দেখা, [হাস্ + আ =] হাসা, [ডাক্ + আ =] ডাকা। গ. বৌগিক ধাতু: অসমাপিকা ক্রিয়ার সহিত সিদ্ধ বা মৌলিক ধাতু যোগ করিলে যে নতন ধাতু গঠিত হয়, তাহার নাম বৌগিক ধাতু। যেমন: শুকাইয়া যা, দাঁড়াইয়া থাক্, কাঁদিয়া ফেল্, বসিয়া পড়্, চলিয়া যা, ঘুরিতে লাগ্, বলিয়া দে, খালিয়া বল্ ইত্যাদি। সাধারণত: 'ইয়া' ও 'ইতে' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার সহিত মৌলিক ধাতু যুক্ত হইয়া বৌগিক ধাতু গঠিত হয়। ঘ. সংযোগমূলক ধাতু: বিশেষ্য, বিশেষণ ও ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের সহিত মৌলিক বা সিদ্ধ ধাতু যুক্ত হইয়া যে ধাতু গঠিত হয়, তাহাকে সংযোগমূলক ধাতু বলা হয়। যেমন: সাতার কাট্, ভিক্ষা দে, ক্ষুধা পা, শান্তি দে, আঁক কাট্, উদয় হ, অস্ত যা, তুফান তোল্, লেখাপড়া কর্, মাহুষ হ, স্থখী হ, হাড়ু খেল্, কপাড়ি খেল্, প্রশ্ন কর্, উত্তর দে, কষ্ট পা ইত্যাদি। [মৌলিক বা সিদ্ধ ধাতু, সাধিত ধাতু ও বৌগিক ধাতু সম্পর্কে আরো বিস্তারিত আলোচনা পরে করা হইয়াছে।]

মূল ধাতু হইতে কার্য-বোধক ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। অর্থ-প্রকাশের ক্ষমতা-অনুসারে ক্রিয়াপদ আবার দুই প্রকার: সমাপিকা ও অসমাপিকা। বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশক্ষম ক্রিয়াপদকে বলা হয় সমাপিকা ক্রিয়া। যেমন: 'জয় লভিবে কী বিশাল প্রাণ।'—'লভিবে' সমাপিকা ক্রিয়াপদ। তেমনি—'সেখানে ছুটিতাম সকালে উঠি', 'সহসা বনমধ্যে করুণ ক্রন্দনধ্বনি শ্রুতিতে পাইলাম', আমি এখন চিঠি লিখিতেছি, 'ডাকতেছিল গ্রামল ছটি গাই'—বাক্যগুলিতে 'ছুটিতাম', 'পাইলাম', 'লিখিতেছি', 'ডাকতেছিল' পদগুলি সমাপিকা ক্রিয়াপদ।

কিন্তু বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশে অক্ষম ক্রিয়াপদকে অসমাপিকা ক্রিয়াপদ বলা হয়। যেমন: 'তু:সহ বাপা হয়ে অবসান।'—'হয়ে' [হইয়া] অসমাপিকা ক্রিয়াপদ। তেমনি—'কাঙালী মায়ের বুকে ঠেস্ দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল,' সে আসিলে আমি যাইব, তাহারা সর্বান্ত দেখিতে গিয়াছে, নদী কুলকুল শব্দ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে—বাক্যগুলিতে 'দিয়া', 'বসিয়া', 'ভাবিতে', 'আসিলে', 'দেখিতে', 'করিয়া', 'ছুটিয়া'—পদগুলি অসমাপিকা ক্রিয়াপদ।

বাংলায় অসমাপিকা ক্রিয়াপদ তিন প্রকারে গঠিত হয়। ধাতুর উত্তর 'ইয়া' [পড়ে 'ই'], 'ইতে' ও 'ইলে' যোগ করিয়া: এক. কর্ + ইয়া = করিয়া, থা + ইয়া = থাইয়া, বল্ + ইয়া = বলিয়া: পাইবে বলিয়া জিদ করিয়া সে সব আম খাইয়া ফেলিয়াছে। উঠ্ + ই = উঠি', ধব্ + ই = ধরি', খুল্ + ই = খুলি': 'সেখানে ছুটিলাম সকালে উঠি', আরেকবার সমুখে এসে শ্রদীপখানি ধরি', দোখত আমি নটরাঙের দেউল-দ্বার খুলি।' ঠ-প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়া কেবলমাত্র পড়ে ব্যবহৃত হয়, গথে হয় না। দুই. পড়্ + ইতে = পড়িতে, আন্ + ইতে = আনিতে, দেখ্ + ইতে = দেখিতে: সে পড়িতে বসিল, সে জল আনিতে গিয়াছে, রাধারাণী মাহেণে রথ দেখিতে গিয়াছিল। তিন. হাস + ইলে = হাসিলে, ছুঁ + ইলে =

ছুঁইলে, হ+ইলে=হইলে: হাসিলে তাহার মুখ হইতে যেন মুক্তা ঝরিয়া পড়।  
ময়লা ছুঁইলে শান্তি পাইবে। অস্থির হইলে তিনি আসিবেন না।

স্বরধ্বনি পরিবর্তনের ফলে সাধু বাংলায় অসমাপিকা ক্রিয়া চলিত বাংলায় রূপান্তরিত হয়। যেমন: করিয়া>ক'রে, চলিয়া>চলে, গড়িতে>গড়তে, বলিতে>বলতে, হাসিলে>হাসলে, চলিলে>চললে ইত্যাদি।

অসমাপিকা ক্রিয়া কার্য-বোধক পদ হইলেও বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশে অক্ষম। যেমন: 'সে এখানে আসিয়া আত্মস্বরে ঝাঁদিল'—বাক্যাটিতে 'সে এখানে আসিয়া আত্মস্বরে'—অংশটুকু বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশে অক্ষম। 'ঝাঁদিল'—এই সমাপিকা ক্রিয়া যোগে বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ হইল।

**ক্রিয়া বিভক্তি:** ধাতুর সহিত যে সকল বিভক্তি যুক্ত হইয়া ক্রিয়াপদকে গঠন করিয়া তাহাকে রূপময় করিয়া তোলে এবং বাক্যে ব্যবহারের যোগ্যতা দান করে, তাহাকে বলা হয় ধাতু-বিভক্তি বা ক্রিয়া-বিভক্তি। যেমন: ছল্+ইতেছে [=ছলিতেছে], ফল্+ইতেছে [=ফলিতেছে], ভুল্+ইতেছে [=ভুলিতেছে]।

### ক. সিদ্ধ বা মৌলিক ধাতু:

সিদ্ধ বা মৌলিক ধাতুর সহিত ক্রিয়া-বিভক্তি [ইতেছে, ইয়াছে, ইল, ইত, ইব] যুক্ত হইলে মৌলিক ক্রিয়া গঠিত হয়। যেমন: [কর্+ইতেছে=] করিতেছে, [বল্+ইল=] বলিল, [চল্+ইত=] চলিত, [বস্+ইব=] বসিব। বাংলায় ব্যবহৃত সিদ্ধ বা মৌলিক ধাতু দুই প্রকারের: সংস্কৃত বা তৎসম সিদ্ধ ধাতু এবং তদ্ভব বা প্রাকৃতজ সিদ্ধ ধাতু। সংস্কৃত বা তৎসম সিদ্ধ ধাতু: ষা, চল, হহ, কৃ, ক্রী, লিখ্, সেব্, লভ্, দৃশ্, ঘট্, চব্, জল্, দল্, দা, পাল্, পিষ্, পুষ্, ক্ষল্, শ্বস্, সাধ্ ইত্যাদি। তদ্ভব বা প্রাকৃতজ সিদ্ধ ধাতু: কৃ [সংস্কৃত সিদ্ধ ধাতু] >কব্ [বাংলা সিদ্ধ ধাতু], ধৃ [সংস্কৃত সিদ্ধ ধাতু] >ধব্ [বাংলা সিদ্ধ ধাতু], বৃ [সংস্কৃত সিদ্ধ ধাতু] >বব্ [বাংলা সিদ্ধ ধাতু], মৃ [সংস্কৃত সিদ্ধ ধাতু] >মব্ [বাংলা সিদ্ধ ধাতু], খাদ্ [সংস্কৃত সিদ্ধ ধাতু] >খা [বাংলা সিদ্ধ ধাতু], পঠ্ [সংস্কৃত সিদ্ধ ধাতু] >পড়্ [বাংলা সিদ্ধ ধাতু], গৈ [সংস্কৃত সিদ্ধ ধাতু] >গাহ্ [বাংলা সিদ্ধ ধাতু], জাগৃ [সংস্কৃত সিদ্ধ ধাতু] >জাগ্ [বাংলা সিদ্ধ ধাতু], জ্ঞা [সংস্কৃত সিদ্ধ ধাতু] >জান্ [বাংলা সিদ্ধ ধাতু] ইত্যাদি। তাছাড়া, বাংলার নিজস্ব কিছু সিদ্ধ ধাতুও আছে, সেগুলির কোথাও উৎস নির্দেশ করা যায় না। যেমন: কাট্, খাট্, ডাক্, বাজ্, ভাজ্, ভাস্, ডুব্, বাঁচ্, বল্, এড়্, ঠেল্, রুখ্, জড়্, টুট্, গড়্, খুল্, ভুল্ ইত্যাদি। এগুলিকে খাঁটি বাংলা সিদ্ধ ধাতুও বলা হয়। আর আছে ধ্বনি হইতে জাত কিছু-সংখ্যক ধাতু। যেমন: কুট্, ঠুক্, ধুক্, ফুক্, ঠাঁচ্ ইত্যাদি। এগুলিও সিদ্ধ ধাতু।



### ৬. সাধিত ধাতু :

সাধিত ধাতু আবার চার প্রকার : ১. নাম ধাতু, ২. ধ্বজ্যাত্মক ধাতু, ৩. গিজন্ত ধাতু বা প্রেরণার্থক ধাতু বা প্রযোজক ধাতু ও ৪. কর্মবাচ্যের ধাতু ।

১. নামধাতু : বিশেষ্য, বিশেষণ ও অব্যয়—এই নামপদগুলির সহিত প্রত্যয় [সাধারণতঃ আ] যুক্ত হইয়া ধাতু গঠিত হইলে তাহাকে নামধাতু বলা হয় । যেমন : সংস্কৃত বা তৎসম নামধাতু—দমন [বিশেষ্য]+আ+ইয়া=দমনিয়া, পবিত্র+আ [বিশেষণ]+ইলা=পবিত্রিলা, দান [বিশেষ্য]+আ+ইলা=দানিলা, উত্তর [বিশেষ্য]+আ+ইল=উত্তরিল, জিজ্ঞাসা [বিশেষ্য]+আ+ইল=জিজ্ঞাসিল, কাতর [বিশেষণ]+আ+ইল=কাতরিল, চূর্ণ [বিশেষ্য ও বিশেষণ]+আ+ইবে=চূর্ণিবে, ঘন [বিশেষণ]+আ+ক্যঙ্+শানচ্=ঘনায়মান, শ্রাম [বিশেষণ]+আ+ক্যঙ্+শানচ্=শ্রামায়মান, ধূম [বিশেষ্য]+আ+ক্যঙ্+শানচ্=ধূমায়মান, দণ্ড [বিশেষ্য]+আ+ক্যঙ্+শানচ্=দণ্ডায়মান । আকাশে ঘনায়মান মেঘপুঞ্জে দণ্ডদিক অন্ধকার হইয়া আসিল । দূরে শ্রামায়মান বনশ্রেণী কাঁপিতে লাগিল । ধূমায়মান পর্বতশ্রেণী দণ্ডায়মান । বাংলা নামধাতু—ফেন [বিশেষ্য]+আ=ফেনা : ‘ফেনাইয়া উঠে বকিত বৃকে পুঞ্জিত অভিমান ।’ ঠেঙ [বিশেষ্য]+আ=ঠেঙা : গুকে গুরা খুব ঠেঙিয়েছে । বেত [বিশেষ্য]+আ=বেতা : সে তাকে বেতিয়ে লম্বা করে দেবে বলে শাসিয়েছে । জুতা [বিশেষ্য]+আ=জুতা : সে তোমাকে ধরলে জুতিয়ে ছাড়বে । কিল [বিশেষ্য]+আ=কিলা : কিলিয়ে কাঠাল পাকানো যায়, কিন্তু মাছ পাকানো যায় না । রাঙা [বিশেষ্য]+আ=রাঙা : ‘রঙে রঙে রাঙালো আকাশ ।’ ঘন [বিশেষণ]+আ=ঘনা : ‘ওপারে আঁধার ঘনিয়েছে [ঘনাইয়াছে] দেখ চাহিরে ।’ আগল [বিশেষ্য]+আ=আগলা : বাবা কাজে যায়, আর মেয়ে ঘর আগলায় । আঁচড় [বিশেষ্য]+আ=আঁচড়া : তুমি চুল আঁচড়াওনি কেন ? কামড় [বিশেষ্য]+আ=কামড়া : কুকুরটা কি কামড়ায় ? ধমক্ [বিশেষ্য]+আ=ধমকা : ছেলেটাকে মিঁছিমিঁছি ধমকাচ্ছ কেন ? বিদেশী নামধাতু—চাবুক [বিশেষ্য]+আ=চাবকা : তাকে পেলে সবাই চাবকাবে । তড়পা [বিশেষ্য]+আ=তড়পা : এত তড়পাচ্ছ কেন ?

বালা নামধাতুরূপে সংস্কৃত বিশেষ্য পদ : আরস্ত—‘আরস্তিলা ভয়দূত ।’ আদেশ—‘রাজা দূতপানে চাহি আদেশিলা ।’ বর্গর—‘ঘর্ঘরিল রথচক্র ।’ ভাতি—‘ভাতিল অসি ।’ নাদ—‘নাদিল কধু ।’ বিলাপ—‘বিলাপিলা আক্ষেপে রাক্ষস ।’ প্রভাত—‘রাত্রি প্রভাতিল ।’ কবি মধুসূদনের কাব্যে নামধাতুর বহুল প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় । ইহাদের প্রয়োগ কাব্যকে এক উদাস্ত গান্ধীর্ষ দান করে ।

২. ধ্বজ্যাত্মক ধাতু : ধ্বজ্যাত্মক অব্যয় বা অশুকারাত্মক অব্যয় প্রত্যয়যোগে ধাতুরূপে ব্যবহৃত হইলে, তাহাকে ধ্বজ্যাত্মক ধাতু বলে । যেমন : ফুঁস+আ=ফুঁসা :

‘নাগিনী ফুঁসিছে।’ ধুঁক্+আ=ধুঁকা : সে রাস্তার ধারে পড়ে ধুঁকছে। হাঁক্+আ=হাঁকা ; সে জোর গলায় হাঁকলো। হাঁচ+আ=হাঁচা : সে আজ খুব হাঁচছে। শনশন্+আ=শনশনা : শনশনিয়ে উঠলো গাছের পাতাগুলো। বম্+আ=বম্বা : বম্বম্বিয়ে বৃষ্টি এলো। হনহন্+আ=হনহনা : ‘বাচ্ছে কারা হনহনিয়ে?’ টগ্+আ=টগ্+বগা : ‘আমি যাচ্ছি রাস্তা বোড়ার’ পরে টগ্+বগিয়ে তোমার পাশে পাশে।’ ঝিল্মিল্+আ=ঝিল্মিলা : ‘রোদ উঠেছে ঝিল্মিলিয়ে বাঁশের ডালে ডালে।’ টন্টন্+আ=টন্টনা : পায়ের ব্যাথাটা আবার টন্টনায়। চড়্+আ=চড়চড়া : মাঠ ফাটছে চড়চড়িয়ে। মচ্+আ=মচ্+চা : বাবু যান জুতো পায়ের মচ্+চিয়ে। হক্+আ=হক্+কা : আমি ভয়ে হক্+কিয়ে গেলাম। ভন্+আ=ভন্+না : ‘উড়ছে মাছি ভন্+নিয়ে।’

৩. গিজন্ত ধাতু বা প্রেরণার্থক ধাতু বা প্রযোজক ধাতু : কর্তার প্রেরণায় [ প্রবর্তনায় বা চালনায় ] অন্য কেহ ধাতু নিষ্পন্ন করিলে, সেই ধাতুকে গিজন্ত ধাতু বা প্রেরণার্থক ধাতু বা প্রযোজক ধাতু বলা হয়। সিদ্ধ বা মৌলিক ধাতুর সহিত গিচ্+প্রত্যয় [ প্রেরণার্থে ] যুক্ত হইয়া গিজন্ত বা প্রেরণার্থক বা প্রযোজক ধাতু গঠিত হয়। বাংলায় ‘অ’ বা ‘ওয়া’ হইতেছে গিচ্+প্রত্যয়। যেমন : কর্+আ=করা, থা+আ=থাওয়া, বন্+আ=বলা, পড়্+আ=পড়া, খেপ্+আ=খেপা। মৌলিক ক্রিয়ায় : কর্+ই=করি : আমি স্নান করি ; থা+ই=থাই : আমি মিষ্টি খাই ; বন্+ব=বলব : আমি তোমাকে বলব ; পড়্+ছি=পড়ছি : আমি বাংলা পড়ছি, খেপ্+ছ=খেপছ : তুমি খেপছ কেন ? এই ধাতুগুলি গিচ্+প্রত্যয় যোগে গিজন্ত ক্রিয়ার রূপ লাভ করিলে দাঁড়ায় : কর্+আ+ই=করাই : আমি তাকে স্নান করাই ; থা+আ+ই=থাওয়াই : আমি সবাইকে মিষ্টি খাওয়াই ; বন্+আ+ব=বলাব : আমি তোমাকে বলাব ; পড়্+আ+ছি=পড়াছি : আমি তোমাদের বাংলা পড়াছি ; খেপ্+আ+ছ=খেপাছি ; পাগলটাকে তোমরা খেপাচ্ছ কেন ?

অতিরিক্ত দৃষ্টান্ত : আমাকে তুমি বকিও না। ‘অপু, আমি ভালো হয়ে উঠলে তুমি আমাকে রেলগাড়ি দেবাবি?’ সাপুড়ে সেদিন রাস্তায় সাপ খেলাচ্ছিল। ‘কাঁপাইয়া রণস্থল, কাঁপাইয়া গঙ্গাজল, কাঁপাইয়া বনস্থল উঠিল সে ধনি।’

৪. কর্মবাচ্যের ধাতু : কর্মবাচ্যের ক্রিয়া কর্ম-অঙ্গুসারে গঠিত হয়। সিদ্ধ বা মৌলিক ধাতুর সহিত কর্মবাচ্যের আ-প্রত্যয় যুক্ত হইয়া কর্মবাচ্যের ধাতু গঠিত হইয়া থাকে। পরে কর্মবাচ্যের ধাতুর সহিত ক্রিয়া-বিভক্তি যুক্ত হইয়া কর্মবাচ্যের ক্রিয়া গঠিত হয়। যেমন : শুন্+[কর্মবাচ্যের] আ=শোনা : কথাটা ভালো শোনান্ন না। দেখ্+[কর্মবাচ্যের] আ=দেখা : কাজটা খারাপ দেখান্ন। মান্+[কর্মবাচ্যের] আ=মানা : এ কাজ তোমায় মানান্ন না। বিক্+[কর্মবাচ্যের] আ=বিকা : ‘বাজারে বিকান্ন ফল তুল।’

### গ. ষৌগিক ধাতু :

অসমাপিকা ক্রিয়ার সহিত কোনও মৌলিক বা সিদ্ধ ধাতুর যোগে যে ধাতু গঠিত হয়, তাহাকে ষৌগিক ধাতু বলে। তাহাতে অসমাপিকা ক্রিয়াটির অর্থ ই প্রাধান্য লাভ করে। সমাপিকা ক্রিয়াটি সেই অর্থকে সম্পূর্ণতা দানে সাহায্য করে মাত্র। সাধারণতঃ ‘ইয়া’ এবং ‘ইতে’ প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার সহিত নে, দে, পা, যা, পড়, থাক, লাগ, উঠ, রাখ, আস, চল ইত্যাদি মৌলিক ধাতু যুক্ত হইয়া ষৌগিক ক্রিয়া গঠিত হয়।

ষৌগিক ক্রিয়ার দৃষ্টান্তগুলি লক্ষ্য কর :

বসিয়া [ অস. ক্রি. ]+পড় [ সিদ্ধ ধাতু ]=বসিয়া পড় : সে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়ল। থাইতে [ অস. ক্রি. ]+বস [ সিদ্ধ ধাতু ]=থাইতে বস : সে থাইতে বসিয়াছিল। গাইয়া [ অস. ক্রি. ]+নে [ সিদ্ধ ধাতু ]=গাইয়া নে : দিদি আমাকে এক মুঠো কুল দিয়ে বলল, ‘শীগগীর খেয়ে নে।’ দেখিতে [ অস. ক্রি. ]+পা [ সিদ্ধ ধাতু ]=দেখিতে পা : অন্ধ অবাঁক হইয়া বলিল, ‘আবার আমি পৃথিবীর মুখ দেখিতে পাইব?’ বলিয়া [ অস. ক্রি. ]+যা [ সিদ্ধ ধাতু ]=বলিয়া যা : ‘অনেক কথা যাও যে বলে কোন কথা না বলি।’ ঝারিয়া [ অস. ক্রি. ]+পড় [ সিদ্ধ ধাতু ]=ঝরিয়া পড়=শিশুর হালিতে ঘেন মুক্তো ঝরে পড়ে। বসিয়া [ অস. ক্রি. ]+থাক [ সিদ্ধ ধাতু ]=বসিয়া থাক : ‘আমি তরা নিয়ে বসে আছি নদী কিনারে।’ খুলিয়া [ অস. ক্রি. ]+রাখ [ সিদ্ধ ধাতু ]=খুলিয়া রাখ : ‘রাখো, রাখো, খুলে রাখো শিয়রের ঐ জানালা ছোটো।’ উঠিয়া [ অস. ক্রি. ]+বস=উঠিয়া বস : তাঁহার আঙ্গানে রুগুণরাও যেন উঠিয়া বসিল। চলিয়া [ অস. ক্রি. ]+আস [ সিদ্ধ ধাতু ]=চলিয়া আস : ‘চলে এসো ঘরে পরবার্সী।’

### ঘ. সংযোগমূলক ধাতু :

বিশেষ্য, বিশেষণ ও দন্ডাত্মক অব্যয় পদের সহিত সিদ্ধ বা মৌলিক ধাতু যোগ করিয়া যে নতুন ধাতু গঠিত হয়, তাহাকে সংযোগমূলক ধাতু বলে। ইংরেজিতে এগুলিকে ‘Group Verb’ বলা হয়।

বাংলায় কর, থাক, হ, দে, পা, থা, যা, বাস, উঠ, বস, মান প্রভৃতি মৌলিক বা সিদ্ধ ধাতু যোগে অল্পসংখ্যক প্রকার সংযোগমূলক ধাতু সংগঠিত হইয়া থাকে। এই সকল সংযোগমূলক ধাতুর পূর্বপদ বিশেষ্য, বিশেষণ বা দন্ডাত্মক অব্যয় হইয়া থাকে। যেমন : কষ্ট [ বি ]+পা [ সিদ্ধ ধাতু ]=কষ্ট পাওয়া : “দূরদেশে গিয়ে কেঁটারে লয়ে ‘কষ্ট’ অনেক ‘পাবে’।” মুখস্থ [ বিণ ]+কর [ সিদ্ধ ধাতু ]=মুখস্থ কর : কবিতাটি ‘মুখস্থ কর’। বন্দী [ বিণ ]+থাক [ সিদ্ধ ধাতু ]=বন্দী থাক : আমাদের ছেলেরা ব্রিটিশের কারাগারে বছরের পর বছর ‘বন্দী থেকেছে’। শাস্তি [ বি ]+পা [ সিদ্ধ ধাতু ]=শাস্তি পাওয়া : কোণায় গেলে ‘শাস্তি পাবো’ বলতে পারো? মাহুষ [ বি ]+হ [ সিদ্ধ ধাতু ]=মাহুষ হওয়া : “আবার তোরা মাহুষ হ’।” মন [ বি ]+দে [ সিদ্ধ ধাতু ]=মন দেওয়া : এবার লেগাপড়ায় ‘মন দাও’। ডিগ্বাঞ্চি [ বি ]+থা [ সিদ্ধ

ধাতু]=ডিগ্‌বাজি খাওয়া : পরীক্ষায় সে দু'বার 'ডিগ্‌বাজি খেয়েছে'। মুর্ছা [বি]+যা [সিদ্ধ ধাতু]=মুর্ছা যাওয়া : ওকে দেখলে ভয়ে তুমি 'মুর্ছা যাবে'। ভালো [বিণ]+বাস্ [সিদ্ধ ধাতু]=ভালোবাস্ : "সবারে 'বাস্‌রে ভালো'।" গজ্‌গজ্ [ধ্ব. অ.]+কব্ [সিদ্ধ ধাতু]=গজ্‌গজ্‌ কব্ : "পেটে বিত্তে 'গজ্‌গজ্‌ করছে'। রাগে তিনি 'গজ্‌গজ্‌ করছেন'।

● যৌগিক ক্রিয়া ও সংযোগমূলক ক্রিয়ার পার্থক্য : যৌগিক ক্রিয়া ও সংযোগমূলক ক্রিয়া উভয়েই সাধিত ক্রিয়ার অন্তর্গত। কিন্তু যৌগিক ক্রিয়ায় মৌলিক বা সিদ্ধ ধাতুটি অসমাপিকা ক্রিয়ার সহিত যুক্ত হয় এবং সংযোগমূলক ক্রিয়ায় মৌলিক বা সিদ্ধ ধাতুটি যুক্ত হয় বিশেষ্য বা বিশেষণ বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয় পদের সহিত। অর্থাৎ, যৌগিক ক্রিয়ায় অসমাপিকা ক্রিয়াপদটির প্রাধান্য এবং সংযোগমূলক ক্রিয়ায় বিশেষ্য বা বিশেষণ বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের প্রাধান্য লক্ষণীয়।

● ধ্বন্যাত্মক ক্রিয়া ও প্রয়োজক বা গিজস্ত ক্রিয়া : ধ্বন্যাত্মক ধাতু ও গিজস্ত ধাতুর উত্তর বিভক্তি যুক্ত হইয়া তাহাদের বাক্যে ব্যবহারের যোগ্যতা দান করিলে, তাহাদের যথাক্রমে ধ্বন্যাত্মক ক্রিয়া ও গিজস্ত ক্রিয়া [প্রেরণার্থক ক্রিয়া বা প্রয়োজক ক্রিয়া] বলা হয়। যেমন : 'ঢাল-তলোয়ার ঝন্ঝনিষ্যে বাজে' [ধ্বন্যাত্মক ক্রিয়া]। 'তাহারি ছায়ায় আমরা মিলাব জগতের শতকোটি' [গিজস্ত ক্রিয়া বা প্রেরণার্থক ক্রিয়া বা প্রয়োজক ক্রিয়া]।

### ● অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রকারভেদ●

নিমিত্তার্থক অসমাপিকা ক্রিয়া : নিমিত্ত বুঝাইতে ধাতুর উত্তর 'ইতে' প্রত্যয় যোগ করিয়া নিমিত্তার্থক অসমাপিকা ক্রিয়া গঠন করা হইয়া থাকে। যেমন : আমরা পড়িতে ইচ্ছুক ছাই। সে মাছ কিনিতে বাজারে গিয়াছে। ওরা যাবে মন্দিরে পূজা দিতে। 'ফুলের মালাগাছি বিকাতে আসিয়াছি।'

অনুসর্গরূপে অসমাপিকা ক্রিয়া : 'হুগের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিত অনলে পুড়িয়া গেল।' 'পাল্কি করে বৌ আনবে থোকন পরিপাটি।' 'যে পথ দিয়ে পাঠান এসেছিল, সে পথ দিয়ে ফিরলো নাকো তারা।' 'বায়ু দূর হতে আসিয়াছে।'

ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যরূপে অসমাপিকা ক্রিয়া : 'মরিয়া [মরণে] হবে জয়ী আমার 'পরে এমন করিয়াছ ফন্দি।' আর বাঁচিয়া [বাঁচনে] কি হইবে ?

ক্রিয়াবাচক বিশেষণরূপে অসমাপিকা ক্রিয়া : 'হেরো ঐ ধনীর ছায়ায় কাঁড়াইয়া কাঁড়ালিনী মেয়ে।'

পূর্বকালীনতা বুঝাইতে অসমাপিকা ক্রিয়া : 'স্বর্ঘ উঠিলে আমরা বাড়ি ফিরিলাম। চোর পালালে বন্ধি বাড়ে।

কর্মরূপে অসমাপিকা ক্রিয়া : সে বই পড়তে ভালোবাসে। তুমি অঙ্ক কষতে চাও না। 'যেতে দাও গেল যারা।'

**সম্ভাবনা অর্থে অসমাপিকা ক্রিয়া :** আজ বিকেলে বাড়ল হতে পারে ।  
সে ভবিষ্যতে একজন বড় লেখক হতে পারে ।

**বাধ্যবাধকতা অর্থে অসমাপিকা ক্রিয়া :** ‘আমায় যে সব দিতে হবে ।’  
‘নতন সমুদ্র-তীর পানে দিতে হবে পাড়ি ।’

**ধারাবাহিকতা অর্থে অসমাপিকা ক্রিয়া :** ‘হাসিতে হাসিতে খেলিতে  
খেলিতে নামিয়া এসেছি শেষ ।’ খালি বৃহ পড়ে পড়ে ছেলেটা পাগল হয়ে গেল ।

**ক্রিয়াবিশেষণরূপে অসমাপিকা ক্রিয়া :** সে গান গাইতে গাইতে হঠাৎ  
এসে হাজির । সে গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লো ।

**অসমাপিকা ক্রিয়ার বীজ্ঞা বা হিত্ত প্রয়োগ :** হিন্দী গান শুনে শুনে  
কান পচে গেল । ‘দেখিতে দেখিতে গুরুর মস্তে আগিয়া উঠিল শিখ ।’

● **ক্রিয়াবাচক বিশেষণ :** ধাতুর উত্তর প্রত্যয় যোগ করিয়া এমন কতকগুলি  
শব্দ গঠিত হয়, যাহারা একই সঙ্গে ক্রিয়া এবং বিশেষণের অর্থ প্রোত্টিত করে ;  
তাহাদের ক্রিয়াবাচক বিশেষণ [Participle বা Verbal Adjective] বলা হয় ।

**ক্রিয়াবাচক বিশেষণ গঠনের উপায় :** ১. কর্তৃবাচ্যের ধাতুর উত্তর সাধু  
ভাষায় ‘ইতে’ ও চলিত ভাষায় ‘তে’ প্রত্যয় যোগ করিয়া । ‘আপনি আমার স্বর্গীয়  
পিতা মহাশয়কে এই রামায়ণ পড়তে দেখেছেন ।’ সেইরূপ—‘আমরা অনেক দূর  
পর্বত তাঁহার সেই মেয়েলি নাকি স্বরে সংগীত-চর্চা শুনিতে শুনিতে গেলাম ।’  
২. ধাতুর উত্তর অন্ত, আ, আনো, তি প্রত্যয় যোগ করিয়া : পড়ন্ত বেলা, চলন্ত  
গাড়ি, ঘুমন্ত ছেলে, জীবন্ত [জ্যাস্ত] মানুষ, দেখা জিনিস, শোনা গান, জানা  
কথা, ভাঙা হাত, রাঁধা ভাত, ভাজা মাছ, বানানো গল্প, কৌচানো ধুতি,  
হারানো বই, জমানো টাকা, শেখানো বুলি, উঠতি গুণ্ডা, পড়তি বয়েস  
ইত্যাদি । ৩. বর্তমান বর্তমান [Present Continuous] কালের দ্বারা ।  
আসছে মাসে আমি দিল্লী যাবো । ৪. সংস্কৃত ধাতুর উত্তর ক্ত, শানচ্, তব্য,  
অনীম্ব ইত্যাদি প্রত্যয় যোগে : মৃত ব্যক্তি, কৃত কর্ম, বর্তমান কাল, ধুমাস্তমান  
পর্বত, বক্তব্য বিষয়, কর্তব্য কর্ম, মাননীয় ব্যক্তি, স্মরণীয় কথা, বরণীয় মানুষ ।

● **ক্রিয়াবাচক বা ভাববাচক বিশেষ্য :** ধাতুর উত্তর প্রত্যয় যোগ করিয়া  
এমন কতকগুলি শব্দ গঠিত হয়, যাহারা একই সঙ্গে ক্রিয়া ও বিশেষ্যের অর্থ প্রোত্টিত  
করে, তাহাদিগকে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য [Gerund বা Verbal Noun] বলা হয় ।  
**ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বা ভাববাচক বিশেষ্য গঠনের উপায় :**  
১. অ, আ [ও], ই, আনি, আনো, আই, আও প্রত্যয় যোগে : ছল্+অ=  
ছল : তার ছল-চাতুরি বোঝা ভার । দেখ্+আ=দেখা : ‘দেখাশোনা হয় নিতি  
নিতি ।’ যা+আ=যাওয়া : ‘আমার নাই বা হলো পারে যাওয়া ।’ হাস্+  
ই=হাসি : আমি তার হাসির অর্থ জানি । শাস্+আনি=শাসানি : তোমার  
শাসানিতে কেউ ভয় পায় না । সাজ্+আনো=সাজানো : তাদের ঘর-সাজানো

শেষ হয়েছে। লড়্+আই=লড়াই : ‘লড়াই গেছে থেমে।’ ঘেরা+আও=ঘেরাও : পুলিশ ডাকাতির আড্ডটাকে ঘেরাও করলো।

২. অন, অনা, অনি, অনী, উনি, উনী, নি, নী, তি প্রত্যয় বোগে : নাচ্+অন=নাচন : ‘খামাও তোমার পাগুলো নাচন।’ চাল্+অনা=চালনা : তিনি সেনাবাহিনীকে জয়ের পথে চালনা করিলেন। সর্+অনি=সরণি [পথ] ; কাঁদ্+অনী=কাঁদনী ; খাট্+উনি=খাটুনি ; পিট্+উনি=পিটুনি ; জল্+উনি=জলুনি ; নাচ্+উনি=নাচুনি ; কাট্+নি=কাটুনি [কাটুনী] ; কাট্+তি=কাটুতি।

৩. সংস্কৃত ধাতুর উত্তর অনট্, জল্, ঘঞ্ প্রভৃতি বোগে : গম্+অনট্=গমন, ভ্রম্+অনট্=ভ্রমণ, পা+অনট্=পান, জি+অল্=জয়, ভী+অল্=ভয়, ক্রী+অল্=ক্রয়, নট্+অল্=নাট, ভৃ+ঘঞ্=ভাব, পঠ্+ঘঞ্=পাঠ ইত্যাদি।

● পঙ্কু ক্রিয়া বা অসম্পূর্ণ রূপ ক্রিয়া : এমন কতকগুলি ধাতু আছে, বাহাদের সকল ভাবের [‘mood’] ও সকল কালের (tense) রূপ পাওয়া যায় না ; অত্যাধিকার সেই ভাবের বা সেই কালের রূপ ব্যবহার করিয়া কাজ চালাইয়া লইতে হয়। তাহাদের বলা হয় পঙ্কু ক্রিয়া বা অসম্পূর্ণ ক্রিয়া। যেমন : √ঘা ধাতুর পুরাধিত বর্তমানে ‘গিয়াছে’ এবং অতীতকালে ‘গিয়াছিল’ সংস্কৃত √‘গম্’ ধাতুরই বিবর্তিত বাংলা রূপ ‘গ’ ধাতু হইতে উৎপন্ন। √আহ্ ধাতুর ভবিষ্যৎকালে ‘থাকিবে’ √থাক্ ধাতুরই রূপ। √বট্ ধাতুর অতীতও নাই, ভবিষ্যৎও নাই। ইহারা পঙ্কু ক্রিয়া।

১. নঞর্থক ধাতু : ‘ন’ এই অব্যয়ের সহিত ‘হ্’ ধাতুর বোগে ‘নহ্’ ধাতু গঠিত হয় ; ইহাও সংযোগমূলক ধাতু। কিন্তু নেতিবাচক অর্থছোতক বাল্যে ইহাকে নঞর্থক ধাতু বলা হয়। ‘নহ্’ ধাতু হইতে উত্তম পুরুষে নহি>নই, মধ্যম পুরুষে নহে>নয়, নহেন>নন [সম্মমার্থে], নহিস্>নস্ [অবজ্ঞার্থে] এবং প্রথম পুরুষে নহে>নয়, নহেন>নন [সম্মমার্থে] গঠিত হয়। ‘নহ্’ ধাতু হইতে জাত অসমাপিকা ক্রিয়ার সাধু বাংলায় রূপ—‘নহিলে’, চলিত বাংলায় ‘নইলে’। যেমন : ‘নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কি স্বপ্নে?’

আবার, ‘না’ এই অব্যয়ের সহিত ‘হ্’ ধাতুর বোগে ‘নাহি’ ক্রিয়াপদটি গঠিত। ‘নাহি’ হইতে চলিত বাংলা ‘নাই’ ও ‘নি’ পদ দুইটি আসিয়াছে। ইহারা সকল পুরুষে ও সকল বচনে একই রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন : আমি নাই, তুমি নাই, সে নাই। আমি বলি নি, তুমি বলো নি, সে বলে নি। সেইজন্য ইহারা অব্যয় পদ।

সনস্ত ও যঙস্ত ধাতু : যে সকল ধাতুর উত্তর ইচ্ছার্থে ‘সন্’ প্রত্যয় যুক্ত হয়, তাহাদিগকে সনস্ত ধাতু বলে। সনস্ত ধাতুর প্রয়োগ বাংলায় নাই, কিন্তু সনস্ত শব্দটির ব্যবহার আছে। সনস্ত ধাতুর সহিত ‘আ’ বা ‘উ’ প্রত্যয় বোগে কৃদন্ত শব্দ গঠিত হয়। যেমন : জা+সন্+আ [উ]=জিজ্ঞাসা [জিজ্ঞাস্], পা+সন্+আ [উ]=পিপাসা [পিপাস্], যুচ্+সন্+আ [উ]=যুযুকা [যুযুক্], বৃ+সন্+আ [উ]=বৃযুধা [বৃযুধ্], ভৃজ্+সন্+আ [উ]=বৃজ্জা [বৃজ্জ্], হন্+সন্+আ

[ উ ] = জিহ্বাঃসা [ জিহ্বাঃস্থ ], লভ্ + সন্ + আ [ উ ] = লিপ্সা [ লিপ্সু ], জি + সন্ + ঐ = জিগীষা, ঞ্ + সন্ + আ = ঞ্জয়া, কিং + সন্ + আ = চিকিৎসা, বচ্ + সন্ + আ = বিবক্ষা।

যে সকল ধাতুর উত্তর পোনঃপুত্র বা আতিশয্য অর্থে ষঙ্ প্রত্যয় হয়, তাহাদিগকে **ষঙস্ত ধাতু** বলে। বাংলায় ষঙস্ত ধাতুর প্রয়োগ নাই, কিন্তু ষঙস্ত ধাতুর সহিত শানচ্ [ মান ] প্রত্যয় যোগ করিয়া যে পদ গঠিত হয়, বাংলায় কেবল তাহারই প্রয়োগ আছে। যেমন : জন্ + ষঙ্ [ জাজ্জ্য ] + শানচ্ [ মান ] = জাজ্জ্যমান, দুন্ + ষঙ্ [ = দৌহ্ল্য ] + শানচ্ [ মান ] = দৌহ্ল্যমান, ঋন্ + ষঙ্ [ = রোরুহ ] + শানচ্ [ মান ] = রোরুহমান, দীপ্ + ষঙ্ [ = দেদীপ্য ] + শানচ্ [ মান ] = দেদীপ্যমান।

কর্মের ভিত্তিতে ক্রিয়াকে আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। এক. সাকর্মক ক্রিয়া, দুই. অকর্মক ক্রিয়া এবং তিন. দ্বিকর্মক ক্রিয়া।

● **সাকর্মক ও অকর্মক ক্রিয়া :** যে সকল ক্রিয়াব কর্ম থাকে, তাহাদের বলা হয় সাকর্মক ক্রিয়া। যেমন : ‘রামানন্দ পেলেন গুরুর পদ।’ ‘এক ফল লাভিলু হায়।’ এখানে প্রথম বাক্যে ‘পেলেন’ ক্রিয়ার একটি কর্ম ‘পদ’ এবং দ্বিতীয় বাক্যে ‘লাভিলু’ ক্রিয়াবও একটি কর্ম ‘ফল’। কাজেই, ইহাবা সাকর্মক ক্রিয়া। তেমন— খাওয়া, লেখা, পড়া, করা, ধরা, মারা, বলা, বাজান, কাটা, ভাঙা, দেখা ইত্যাদি সাকর্মক ক্রিয়া। আবার, কোন কোন সাকর্মক ক্রিয়াব দুইটি কর্ম থাকে, তাহাদের বলা হয় দ্বিকর্মক ক্রিয়া। যেমন : তিনি আমাকে চিঠি লিখবেন। আমি তোমাকে একটি গল্প বলব। ‘গল্প, ভালো হয়ে উঠলে তুমি আমাকে বেলগাড দেখাবি?’ এই তিনটি বাক্যে প্রথমটিতে ‘লিখবেন’ ক্রিয়ার ‘আমাকে’ ও ‘চিঠি’ দুইটি কর্ম আছে, দ্বিতীয় টিতে ‘বলব’ ক্রিয়ার ‘তোমাকে’ ও ‘গল্প’ দুইটি কর্ম এবং তৃতীয়টিতে ‘দেখাবি’ ক্রিয়ার ‘আমাকে’ ও ‘বেলগাড’ দুইটি কর্ম আছে। কাজেই, এই ক্রিয়াগুলি দ্বিকর্মক। আবার, যে ক্রিয়াব কর্ম থাকে না, তাহাকে বলে অকর্মক ক্রিয়া। যেমন : এ পৃথিবীতে কেউ হাসে, কেউ কাঁদে। সে নাচে। শকুন্তলা ভাবে। এই বাক্যগুলিতে ‘হাসে’, ‘কাঁদে’, ‘নাচে’, ‘ভাবে’—এই ক্রিয়াগুলির কর্ম নাই। ইহারা তাই অকর্মক ক্রিয়া। তেমন—চলা, ইটা, বেডান, ঘুমান, মরা, ডোবা ইত্যাদি অকর্মক ক্রিয়া।

**অকর্মক ক্রিয়ার সাকর্মক ক্রিয়ায় রূপান্তর :** সমধাতুজ কর্ম যোগে অকর্মক ক্রিয়া সাকর্মক ক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয় : যেমন : ‘কহিলেন শেষে ক্রুর হাসি হেসে।’ আর মায়া-কান্না কাঁদতে হবে না। সে মণিপুরী নাচ নাচবে। তাছাড়া, আভ্যন্তরীণ কর্ম যোগ করিয়াও অকর্মক ক্রিয়াকে সাকর্মক করা হয়। যেমন—শকুন্তলা রাজা দুষ্টের কথা ভাবছিলেন।

**সাকর্মক ক্রিয়ার অকর্মক ক্রিয়ায় রূপান্তর :** বইটি পড় [ সাকর্মক ], মন দিয়া পড় [ অকর্মক ], ভাত খাও [ সাকর্মক ], তুমি একবেলা খাও [ অকর্মক ]।

● **মৌলিক ক্রিয়া, যৌগিক ক্রিয়া ও স যোগমূলক ক্রিয়া :** সিদ্ধধাতু বা মৌলিক ধাতুর উত্তর ক্রিয়া-বিভক্তি যোগ করিয়া যে ক্রিয়া গঠিত হয়, তাহাকে বলে

মৌলিক ক্রিয়া। যেমন : ‘ফুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ফুলিতেছে মাখি পখ।’ অসমাপিকা ক্রিয়ার সহিত মৌলিক ক্রিয়া যোগ করিয়া যে ক্রিয়া গঠিত হয়, তাহাকে বলে যৌগিক ক্রিয়া। যেমন : মেয়েটি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে। ‘ধানের ক্ষেতে বাতাস নেচে যায় চপল ছেলের মতো।’ ‘শিলা রাশি রাশি পড়িছে খসে।’ আবার, বিশেষ্য, বিশেষণ বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের সহিত মৌলিক ক্রিয়া যুক্ত হইয়া যে ক্রিয়া গঠিত হয়, তাহাকে বলে সংযোগমূলক ক্রিয়া। যেমন : ‘পরে মাস-দেড়ে ভিটেমাটি ছেড়ে বাহির হইলু পথে।’ ‘রামকানাই কাগজ কলম লইয়া প্রস্তুত হইলেন।’ ‘পুঁথির শুকনো পাতা খস্‌খস্‌ গজ্‌গজ্‌ করিতে লাগিল।’

## ॥ অনুসরণী ॥

\*১. উদাহরণসহ বুঝাইয়া দাও :

সাধিত ধাতু, মা. ‘৬৪, উ. মা. ‘৬০, ক. প্রা. ‘৬২ ; নামধাতু, মা. ‘৬৩ ; উ. মা. ‘৬১, ‘৬৪, ‘৬৮, ‘৭০ ; ক. প্রা. ‘৬১, ব. প্র. ‘৬২ ; যৌগিক ক্রিয়া, মা. ‘৬৮, ‘৬০, ‘৬২ ; উ. মা. ‘৬২, [কম্পাট.] ‘৬২ ; ক. প্রা. ‘৬৩ ; মৌলিক ক্রিয়া, ধ্বন্যাত্মক ধাতু, মা. ‘৬০ ; কর্মবাচ্যের ক্রিয়া, ক্রিয়াবাচক বিশেষণ, ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য, পদ্য ক্রিয়া বা অসম্পূর্ণ ক্রিয়া, প্রবোজক বা গিজন্ত ক্রিয়া, মা. ‘৬৬, ‘৬২, ‘৬৩ ; নঞর্থক ধাতু উদ্দেশ্যার্থক বা নিমিত্তার্থক অসমাপিকা ক্রিয়া, দিক্‌ধাতু, উ. মা. ‘৬০ ; অকর্মক ক্রিয়া। উ. মা. ‘৭০

\*২. নিম্নলিখিত শ্রেণীর ক্রিয়ার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া চারটি বাক্য রচনা কর। যৌগিক ক্রিয়া, প্রবোজক ক্রিয়া, ধ্বন্যাত্মক ক্রিয়া, দিকমক ক্রিয়া। মা. ‘৬১

\*৩. পার্থক্য বুঝাইয়া দাও : মৌলিক ক্রিয়া ও যৌগিক ক্রিয়া, উ. মা. ‘৬০ ; নাম-প্রকৃতি ও ধাতু-প্রকৃতি, সনস্ত ও যঙস্ত ধাতু ; অকর্মক ও সকর্মক ক্রিয়া ; যৌগিক ক্রিয়া ও সংযোগমূলক ক্রিয়া।

৪. কি কি উপায়ে অকর্মক ক্রিয়াকে সকর্মক ক্রিয়ায় রূপান্তরিত করা যায় ? ‘সে ঘুমিয়েছে’—এই বাক্যের অকর্মক ক্রিয়াটিকে সকর্মক ক্রিয়ায় পরিবর্তিত কর।

৫. ‘খা’ ও ‘পড়’ [বই পড়া]—এই সকর্মক ধাতু দুইটিকে অকর্মকরূপে ব্যবহার কর।

৬. দৃষ্টান্ত দাও :

ক্রিয়াবাচক বিশেষণের ভাবে প্রয়োগ, ক্রিয়াবাচক বিশেষণরূপে ঘটমান বর্তমান, অনুসর্গরূপে অসমাপিকা ক্রিয়া, নামধাতুরূপে বিশেষণ, ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যরূপে অসমাপিকা ক্রিয়া, ক্রিয়াবাচক বিশেষণ-রূপে অসমাপিকা ক্রিয়া, অসমাপিকা ক্রিয়ার দ্বিধ প্রয়োগ।

৭. ধাতু ও ক্রিয়াপদের পার্থক্য কি ? মৌলিক ও সাধিত ধাতু কাহাকে বলে ? দুইটি উদাহরণ সহযোগে বুঝাইয়া দাও। উ. মা. [কম্পাট.] ‘৭০

## ● ক্রিয়ার কাল ●

ক্রিয়া-সংঘটনের সময়কে ব্যাকরণে বলা হয় ক্রিয়ার কাল। সময়কে কাজের সুবিধার জন্য তিন ভাগে বিভক্ত করা যায় : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। কাজেই, ক্রিয়ার কাল তিন প্রকার : ক. বর্তমান, খ. অতীত ও গ. ভবিষ্যৎ।

ক. বর্তমান কাল : Present Tense.

যে ক্রিয়ার সংঘটন-কাল বর্তমান, অর্থাৎ যে ক্রিয়া এখন সংঘটিত হইতেছে,



তাহার কালকে বলা হয় বর্তমান কাল। বর্তমান কালের আবার নানা প্রকারের রূপভেদ আছে এবং সেই রূপভেদ অনুসারে একই কালে বিভিন্ন রূপের ক্রিয়া গঠিত হয়। যেমন : ‘জল পড়ে, পাতা নড়ে।’ ‘তুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ।’ ‘ছিঁড়িয়াছে পান।’ ‘কে আছে জোয়ান, হও আশুয়ান।’ দৃষ্টান্তগুলিতে ‘পড়ে’, ‘নড়ে’, ‘তুলিতেছে’, ‘ফুলিতেছে’, ‘ভুলিতেছে’, ‘ছিঁড়িয়াছে’, ‘আছ’ এবং ‘হও’—এই ক্রিয়াপদগুলি একই বর্তমান কালের ; কিন্তু ইহাদের রূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার।

ক্রিয়া-সংঘটনকালের হৃদয়তার বিচারে ক্রিয়ার বর্তমান কাল চার প্রকারের হইয়া থাকে : ১. সাধারণ বা নিত্য বর্তমান, ২. ঘটমান বর্তমান, ৩. পুরাঘটিত বর্তমান ও ৪. বর্তমান কালের অনুজ্ঞা।

১. ক সাধারণ বা নিত্য বর্তমান : Present Indefinite : যেখানে ক্রিয়াটি স্বভাবতঃ ঘটে বা বরাবর ঘটয়া থাকে, তাহার কালকে সাধারণ বর্তমান বা নিত্য বর্তমান বলে। সাধারণ বা নিত্য বর্তমানে মূল ধাতুর সহিত কোনও কালবাচক প্রত্যয় যুক্ত হয় না। উত্তম, মধ্যম ও প্রথম পুরুষে যথাক্রমে পুরুষবাচক বিভক্তি ‘ই’, ‘অ’ এবং ‘এ’ যুক্ত হয়। মধ্যম পুরুষে সম্মুখার্থে ‘এন’ এবং তুচ্ছার্থে ‘ইন্’ যুক্ত হইয়া থাকে। তাহা হইলে ‘কব্’ ধাতুর উত্তম পুরুষে ‘কর’+ই=করি, মধ্যম পুরুষে ‘কব্’+অ=কর, ‘কব্’+এন=করেন, ‘কব্’+ইন্=করিস্ এবং প্রথম পুরুষে ‘কব্’+এ=করে, ‘কব্’+এন=করেন [ সম্মুখার্থে ] হয়। যেমন : ‘তোমারে করি নমস্কার।’ ‘মন্ত্রশক্তিতে তোমরা বিশ্বাস কর না, কারণ আজকাল কেউ করে না, কিন্তু আমি করি।’ ‘রামচন্দ্র কি এখনও সেতুবন্ধনের কাজে ব্যস্ত আছেন।’

খ সাধারণ বর্তমান বা নিত্য বর্তমান কালের ক্রিয়াকে অতীত কালে সংঘটিত কোন ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনায় ব্যবহার করিলে তাহার কালকে ঐতিহাসিক বর্তমান বলে। যেমন : গৌতম বুদ্ধ কপিলাবস্ত্র নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু হয়। সম্রাট হইয়া অশোক কলিঙ্গ দেশ আক্রমণ করেন।

গ. অতীত কালের অর্থে বর্তমান কালের ক্রিয়ার ব্যবহার : সে বছর আমরা ভাগলপুর চলে যাই এবং এক বছর পরে আবার কলকাতায় ফিরে আসি।

২. ঘটমান বর্তমান : Present Continuous : যে ক্রিয়ার কার্য এখনও সংঘটিত হইতেছে, তাহার কালকে বলা হয় ঘটমান বর্তমান। ঘটমান বর্তমানে মূল ধাতুর সহিত ‘ইতে’ প্রত্যয় [অসমাপিকা ক্রিয়া-প্রত্যয়], ‘আছ’ ধাতু এবং পুরুষবাচক ক্রিয়া-বিভক্তি [ অর্থাৎ ‘ই’, ‘অ’ এবং ‘এ’ ] যোগ করিয়া ক্রিয়া-রূপ গঠিত হয়। উত্তম পুরুষে ‘কব্’ ধাতু+‘ইতে’+‘আছ’ ধাতু+‘ই’=করিতেছি, মধ্যম পুরুষে ‘কব্’ ধাতু+‘ইতে’+‘আছ’ ধাতু+অ [ এন, ইন্ ]=করিতেছ, [করিতেছেন, করিতেছিল] এবং প্রথম পুরুষে ‘কব্’ ধাতু+‘ইতে’+‘আছ’ ধাতু+এ [ এন্ ]=করিতেছে [করিতেছেন] হয়। ইহা হইল সাধু ভাষার রূপ। চলিত ভাষার রূপ হইল :

করছি, করছ [করছেন, করছিল], করছে [করছেন]। যেমন : ‘হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে।’ ‘ভুলিতেছে তরী, ভুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ।’

৩. **পুরাণতীত বর্তমান :** Present Perfect : যে ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার ফল এখনও বর্তমান, তাহার কালকে বলা হয় পুরাণতীত বর্তমান। পুরাণতীত বর্তমানে মূল ধাতুর সহিত ‘ইয়া’ প্রত্যয় [অসমাপিকা ক্রিয়া-প্রত্যয়], ‘আছ’ ধাতু এবং ক্রিয়া-বিভক্তি [‘ই’, ‘অ’ এবং ‘এ’] যুক্ত হইয়া ক্রিয়া-রূপ গঠিত হয়। ‘কব্’ ধাতুর উত্তম পুরুষে ‘কব্’ ধাতু+‘ইয়া’+‘আছ’+ই= করিয়াছি [>চলিত বাংলায়—করেছি], মধ্যম পুরুষে ‘কব্’ ধাতু+‘ইয়া’+‘আছ’+অ [এন, ইন্]=করিয়াছ [>চলিত বাংলায়—করেছ], করিয়াছেন [>চলিত বাংলায়—করেছেন], করিয়াছিল [>চলিত বাংলায়—করেছিল] এবং প্রথম পুরুষে ‘কব্’ ধাতু=‘ইয়া’+‘আছ’+এ [এন]=করিয়াছে [>চলিত বাংলায়—করেছে], করিয়াছেন [>চলিত বাংলায়—করেছেন] হয়। যেমন : ‘দেখিতে গিয়াছি পর্বতমালা, দেখিতে গিয়াছি সিদ্ধ।’ ‘ছিঁড়িয়াছে পাল।’ ‘আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা।’

৪. **বর্তমান কালের অনুজ্ঞা :** Present Imperative Mood : বর্তমান কালে প্রার্থনা, আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, অনুমতি ইত্যাদি বুঝাইতে বর্তমান কালের অনুজ্ঞা হয়। ইহা কেবলমাত্র মধ্যম পুরুষের এবং প্রথম পুরুষের ক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়। বর্তমান কালের অনুজ্ঞায় মূল ধাতুর সহিত ‘অ’, ‘উন’, ‘উক’, ‘ইন্’—এই প্রত্যয়গুলি যুক্ত হইয়া, আবার কখনও বা কোনও প্রত্যয় প্রযুক্ত না হইয়াই ক্রিয়া-রূপ গঠিত হইয়া থাকে। ‘কব্’ ধাতুর বর্তমান কালের অনুজ্ঞায় মধ্যম পুরুষে ‘কব্’+অ=কর, সম্ভ্রমার্থে ‘কব্’+উন=করুন, তুচ্ছার্থে কব্+০=‘কব্’, প্রথম পুরুষে ‘কব্’+উক্=করুক, সম্ভ্রমার্থে ‘কব্’+উন=করুন। যেমন : ‘অস্তর মম বিকশিত কর, অস্তরতর হে।’ ‘ভারতেরে সেই শর্গে করো জাগরিত।’ ‘অতএব দয়া করি কহো দয়াবতি।’ ‘ওঠো, প্রতিজ্ঞা পালন করো।’

খ **অতীত কাল :** Past Tense.

যে ক্রিয়ার সংঘটন-কাল অতীত কালে, অর্থাৎ যে ক্রিয়া অতীত কালে সংঘটিত হইয়া গিয়াছে এবং তাহার ফল বর্তমান নাই, তাহার কালকে অতীত কাল বলা হয়। যেমন : ‘পঁচিশ বৎসর পূর্বে একবার আমি কলকাতায় এসেছিলাম।’

ক্রিয়া-সংঘটনকালের স্মৃতির বিচারে অতীত কালকে চার ভাগে বিভক্ত করা যায় : ১. সাধারণ বা নিত্য অতীত, ২. ঘটমান অতীত, ৩. পুরাণতীত অতীত ও ৪. নিত্যবৃত্ত অতীত।

উল্লিখিত কাল-বিভাগ অনুসারে অতীত কালের ক্রিয়ায় ভিন্ন ভিন্ন রূপ রহিয়াছে।

১: **সাধারণ বা নিত্য অতীত :** Past Indefinite : যে ক্রিয়া অতীত কালে

সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে এবং তাহার ফল বর্তমান নাই, তাহার কালকে সাধারণ অতীত বা নিত্য অতীত বলা হয়। সাধারণ বা নিত্য অতীতে মূল ধাতুর সহিত অতীত কাল-বাচক ‘ইন্’ প্রত্যয় এবং পুরুষানুসারী ক্রিয়াবিভক্তি [আম, এ, অ, এন, ই] যুক্ত হইয়া ক্রিয়া-রূপ গঠিত হয়। ‘কব্’ ধাতুর উত্তম পুরুষে ‘কব্’+‘ইন্’+আম=করিলাম [ >চলিত বাংলায়—করলাম, করলুম, করলেম ], মধ্যম পুরুষে ‘কব্’+‘ইন্’+এ [এন, ই]=করিলে [ >চলিত বাংলায়—করলে ], সম্মুখার্থে—করিলেন [ >চলিত বাংলায়—করলেন ], তুচ্ছার্থে—করিলি [ >চলিত বাংলায়—করলি ], এবং প্রথম পুরুষে ‘কব্’+‘ইন্’+অ [এন]=করিল [ >চলিত বাংলায়—করল ], সম্মুখার্থে—করিলেন [ চলিত বাংলায়—করলেন ] ক্রিয়া-রূপ হয়। যেমন : ‘আনিলাম অপরিচিতের নাম ধরণিতে।’ “নদীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘নদী, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?’” ‘রামানন্দ পেলেন গুরু পদ।’

২. **ঘটমান অতীত :** Past Continuous : যে ক্রিয়া অতীত কালে সংঘটিত হইতেছিল, অর্থাৎ অতীতে যে ক্রিয়ার কাজ চলিতেছিল, তাহার কালকে **ঘটমান অতীত** বলা হয়। ঘটমান অতীতে মূল ধাতুর সহিত ‘ইতে’ প্রত্যয় ‘আছ্’ ধাতু, অতীত কালবাচক ‘ইন্’ প্রত্যয় এবং পুরুষানুসারী ক্রিয়া-বিভক্তি [আম, এ, অ, এন, ই] যুক্ত হইয়া ক্রিয়া-রূপ গঠিত হয়। ‘কব্’ ধাতুর উত্তম পুরুষে ‘কব্’+‘ইতে’+‘আছ্’+‘ইন্’+আম=করিতেছিলাম [ >চলিত বাংলায়—করছিলাম, করছিলুম, করছিলেন, করিতেছিলাম, মধ্যম পুরুষে ‘কব্’+‘ইতে’+‘আছ্’+‘ইন্’+এ [এন, ই]=করিতেছিলে [ >চলিত বাংলায়—করছিলে ], সম্মুখার্থে—করিতেছিলেন [ >চলিত বাংলায়—করছিলেন ] তুচ্ছার্থে—করিতেছিলি [ >চলিত বাংলায়—করছিলি ; কোথাও কোথাও—করছিলিস্ ] এবং প্রথম পুরুষে ‘কব্’+‘ইতে’+‘আছ্’+‘ইন্’+অ =করিতেছিল [ >চলিত বাংলায়—করছিল ] সম্মুখার্থে—করিতেছিলেন [ >চলিত বাংলায়—করছিলেন ]—এই ক্রিয়া-রূপগুলি হয়। যেমন : ‘বলিতেছিলাম বলি একধারে।’ ‘বাঁধিতেছিল সে দীর্ঘ চিকুর।’ ‘ডাকতেছিল শ্রামল দুটি গাই।’

৩. **পুরাঘটিত অতীত :** Past Perfect : অতীত কালে সংঘটিত হইয়াছিল, এমন ক্রিয়ার কালকে **পুরাঘটিত অতীত** বলা হয়। পুরাঘটিত অতীত মূল ধাতুর সহিত ‘ইয়া’ প্রত্যয়, ‘আছ্’ ধাতু+অতীত কালবাচক ‘ইন্’ প্রত্যয় এবং সর্বশেষে পুরুষানুসারী ক্রিয়াবিভক্তি [আম, এ, অ, এন, ই] যুক্ত হইয়া ক্রিয়া-রূপ গঠিত হয়। ‘কব্’ ধাতুর উত্তম পুরুষে ‘কব্’+‘ইয়া’+‘আছ্’+‘ইন্’+আম=করিয়াছিলাম [ >চলিত বাংলায়—করেছিলাম, করেছিলুম, করেছিলেন ], মধ্যম পুরুষে ‘কব্’+‘ইয়া’+‘আছ্’+‘ইন্’+এ=করিয়াছিলে [ >চলিত বাংলায়—করেছিলে ], সম্মুখার্থে—করিয়াছিলেন [ >চলিত বাংলায়—করেছিলেন ], তুচ্ছার্থে করিয়াছিলি [ >চলিত বাংলায়—করেছিলি ; কোথাও কোথাও—করেছিলিস্ ], প্রথম পুরুষে ‘কব্’+‘ইয়া’+‘আছ্’+‘ইন্’+অ=করিয়াছিল [ >চলিত বাংলায়—করেছিল ], সম্মুখার্থে—করিয়াছিলেন [ >চলিত বাংলায়—করেছিলেন ] এই ক্রিয়া-রূপগুলি হয়। যেমন :

‘চোখেয় আলোয় দেখেছিলেম।’ ‘দাঁড়িয়েছিলুম চণ্ডীমণ্ডপের বারাণ্ডায়।’  
‘ভূমি আমার ডেকেছিলে ছুটির নিমন্ত্রণে।’ ‘লোক জুটেছিল কম নয়।’

৪. নিত্যবৃত্ত অতীত : Habitual Past : অতীতে প্রায়ই ঘটিত এইরূপ অর্থে ক্রিয়ার যে কাল হয়, তাহাকে নিত্যবৃত্ত অতীত বলা হয়। নিত্যবৃত্ত অতীতে মূল ধাতুর সহিত অতীত কালবাচক ‘ইত্’ প্রত্যয় এবং পুরুষানুযায়ী ক্রিয়া-বিভক্তি [ আম, এ, অ, এন, ইস্ ] যুক্ত হইয়া ক্রিয়ারূপ গঠিত হয়। ‘কব্’ ধাতুর উত্তম পুরুষে ‘কব্’+‘ইত্’+আম=করিতাম [ >চলিত বাংলায়—করতাম, করতুম, করতেম ], মধ্যম পুরুষে ‘কব্’+‘ইত্’+এ=করিতে [ >চলিত বাংলায়—করতে ], সম্ভ্রমার্থে—করিতেন [ >চলিত বাংলায়—করতেন ], তুচ্ছার্থে—করিতিস্ [ >চলিত বাংলায়—করতিস্ ], প্রথম পুরুষে ‘কব্’+‘ইত্’+অ [ এন ]=করিত [ >চলিত বাংলায়—করত ], সম্ভ্রমার্থে—করিতেন [ >চলিত বাংলায়—করতেন ]—এই ক্রিয়া-রূপগুলি হয়। যেমন : ‘কুরঙ্গিণী সঙ্গে সঙ্গে নাচিতাম বনে, গাইতাম গীত শুনি কোকিলের ধ্বনি।’ ‘সেখানে ছুটিতাম সকালে উঠি।’

গ. ভবিষ্যৎ কাল : Future Tense.

যে ক্রিয়ার সংঘটন-কাল ভবিষ্যৎ কালে অর্থাৎ যে ক্রিয়া ভবিষ্যৎ কালে সংঘটিত হইবে, তাহার কালকে ভবিষ্যৎ কাল বলা হয়। যেমন : ‘প্রভাতেই যাব এই সীমা ছেড়ে, দেব আমার অহংকার দূর করে তোমার বিশ্বলোকে।’ ভবিষ্যৎ কালকে চার ভাগে বিভক্ত করা যায় : ১. সাধারণ ভবিষ্যৎ, ২. ঘটমান ভবিষ্যৎ, ৩. পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ ও ৪. ভবিষ্যৎ কালের অনুভূতি।

এই কাল-বিভাগ অল্পসারে ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া-রূপ গঠিত হইয়া থাকে।

১. সাধারণ ভবিষ্যৎ : Future Indefinite : যে ক্রিয়া এখনও সংঘটিত হয় নাই, কিন্তু পরে সংঘটিত হইবে, তাহার কালকে সাধারণ ভবিষ্যৎ বলে। সাধারণ ভবিষ্যতে মূল ধাতুর সহিত ভবিষ্যৎ কালবাচক ‘ইব্’ প্রত্যয় এবং পুরুষানুযায়ী ক্রিয়া-বিভক্তি [ অ, এ, এন, ই ] যুক্ত হইয়া ক্রিয়া-রূপ গঠিত হয়। ‘কব্’ ধাতুর উত্তম পুরুষে ‘কব্’+‘ইব্’+অ=করিব [ >চলিত বাংলায়—করব ], মধ্যম পুরুষে ‘কব্’+‘ইব্’+এ [ এন, ই ]=করিবে [ >চলিত বাংলায়—করবে ], সম্ভ্রমার্থে—করিবেন [ >চলিত বাংলায়—করবেন ], তুচ্ছার্থে—করিবি [ >চলিত বাংলায়—করিবি ], প্রথম পুরুষে ‘কব্’+‘ইব্’+এ [ এন ]=করিবে [ >চলিত বাংলায়—করবে ], সম্ভ্রমার্থে—করিবেন [ >করবেন ]—এই ক্রিয়া-রূপগুলি হয়। যেমন : ‘আমি ঢালিব করুণাধারা, আমি ভাস্করিব পাষণকারা।’ ‘প্রতিভার তপে সে ঘটনা হবে, লাগিবে না তার বেশি।’ ‘উদ্ভিবে সে রবি আমাদের খুনে রাঙিয়া পুনর্বীর।’

২. ঘটমান ভবিষ্যৎ : Future Continuous : যে ক্রিয়া ভবিষ্যতে সংঘটিত হইতে থাকিবে অর্থাৎ যে ক্রিয়ার কাজ ভবিষ্যতে চলিতে থাকিবে, তাহার কালকে ঘটমান ভবিষ্যৎ বলা হয়। ঘটমান ভবিষ্যতে মূল ধাতুর সহিত ‘ইতে’ প্রত্যয় [ অসমাপিকা ক্রিয়া-প্রত্যয় ] যুক্ত হয় এবং তাহার পরে ‘আচ্’ [ >‘থাক্’ র. বি. ( ২য় )—৪

পৌছিয়া থাকিবে। ৩. অতীতকালে বর্তমানকালের প্রয়োগ : আমি আজ বিকালেই আসছি। ৪. অতীত কালে ভবিষ্যৎ কালের প্রয়োগ : আসবেই যদি, তবে কাল এলে না কেন? ৫. ভবিষ্যৎ কালে বর্তমান কালের প্রয়োগ : কাল ভোরে আমি দিল্লী যাচ্ছি। ৬. ভবিষ্যৎ কালে অতীত কালের প্রয়োগ : সে এখনও এলো না, আমাদের ডোবালো দেখছি।

## ●ক্রিয়ার ভাব

বাক্যে ক্রিয়া-নিপ্পন্ন হইবার রীতিকে বলা হয় ক্রিয়ার ভাব বা প্রকার [Mood]। “বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদে কর্তার বিশেষ অবস্থা, অথবা কর্তৃ-সম্বন্ধীয় বিশেষ কোনও ক্রিয়া বুঝায় : এই ক্রিয়ার ভাব সাহায্যে স্থচিত হয়, তাহাকে বলা যাইতে পারে ক্রিয়ার ভাব [ইংরেজিতে Mood ; রামমোহন ইহাকেই বলিয়াছেন ‘ক্রিয়ার প্রকার’]।” ক্রিয়ার ভাব বা প্রকারকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায় : ১. নির্দেশক ভাব [Indicative Mood], ২. অনুজ্ঞা [Imperative Mood] ও ৩. আপেক্ষিক ভাব বা ঘটনাস্তরূপেপেক্ষিত ভাব [Subjunctive Mood]।

১. নির্দেশক ভাব [Indicative Mood]। যখন কোন ক্রিয়ার দ্বারা কোন কাজ হওয়া বা না-হওয়া বুঝায় কিংবা কোন প্রশ্ন বা বিশ্বাসের দ্বারা কাজটি নির্দেশিত হয়, তখন তাহাকে নির্দেশক বা নির্ধারক বা অবধারণক ভাব বলা হয়। যেমন : ‘সে গান গাহিত, শাস্ত্র পড়িত না।’ ‘ও কি আর লাকায়?’ ‘আহা, কী দেখিলাম!’

২. অনুজ্ঞা ভাব [Imperative Mood] : কিছু করিবার আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, অনুমতি, আশীর্বাদ, কামনা বা প্রার্থনা ইত্যাদি বুঝাইলে ক্রিয়ার যে বিশেষ রীতি প্রযুক্ত হয়, তাহাকে বলে অনুজ্ঞা ভাব। যেমন : ‘পাখিটাকে শিক্ষা দাও [আদেশ]।’ ‘যাত্রা করো যাত্রীদল [আদেশ]।’ ‘সদা সত্য কথা বলিও [উপদেশ]।’ ‘ঐরাগীর উত্তরীয় পতাকা করিয়া নিয়ো [উপদেশ]!’ তোমাদের কল্যাণ হোক [আশীর্বাদ]। ‘বল দাও, মোরে বল দাও [প্রার্থনা]।’ ‘তোমারি হউক জয় [কামনা]।’

৩. আপেক্ষিক ভাব বা ঘটনাস্তরূপেপেক্ষিত ভাব [Subjunctive Mood] : কোন যৌগিক বাক্যে যদি কোন একটি বাক্যের অর্থ অন্য একটি বাক্যের অপেক্ষায় থাকে, তবে তাহা যে বাক্যের অপেক্ষায় থাকে, তাহার ক্রিয়ার ভাবকে আপেক্ষিক ভাব বা ঘটনাস্তরূপেপেক্ষিত ভাব বলা হয়। যেমন : ‘যদি তোমার উইল করিবার ইচ্ছা থাকে তো বলা।’ ‘যদি মন দিয়া লেখাপড়া কর, তবে জীবনে উন্নতি করিবে।’ ‘যদি বারণ করো তবে গাহিব না।’ ‘যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলোরে।’

## ● ক্রিয়া-বিভক্তি

কাল ও পুরুষানুসারে যে বর্ণ বা বর্ণ-সমষ্টি ধাতুর উত্তর যুক্ত হইয়া ক্রিয়াপদ গঠন করে, সেই বর্ণ বা বর্ণ-সমষ্টিকে ধাতু-বিভক্তি বা ক্রিয়া-বিভক্তি বলা হয়। যেমন : 'কব্' [ যুল ধাতু ] + 'ইত্' + এন = করিতেন। এখানে 'ইত্' + এন = 'ইতেন' হইল ক্রিয়া-বিভক্তি। লক্ষণীয় যে, এখানে 'ইত্' কালবাচক প্রত্যয়। অন্ত্যান্ত কালবাচক প্রত্যয়ও বাংলায় আছে। যেমন : 'ইল্', 'ইব্'। সে যাহা হউক, এখানে 'ইত্' কালবাচক প্রত্যয়ের সহিত পুরুষবাচক [ প্রথম-পুরুষ—সম্মুখার্থে ] বিভক্তি 'এন' যুক্ত হইয়া ক্রিয়া-বিভক্তি গঠিত হইয়াছে। বাংলায় কালবাচক প্রত্যয় এবং পুরুষবাচক বিভক্তি যুক্ত হইয়া ক্রিয়া-বিভক্তি গঠিত হয়।

## ● ক্রিয়ার রূপ

ক্রিয়া-বিভক্তি সহযোগে ক্রিয়া রূপময় হইয়া উঠে। নীচে দিভিন্ন কালে বিভিন্ন পুরুষের ক্রিয়া-বিভক্তির রূপ প্রদত্ত হইল। [ ] বন্ধনী-চিহ্নের মধ্যে চলিত ভাষায় ক্রিয়া-বিভক্তি দেওয়া হইয়াছে :

### বর্তমান কাল

উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	প্রথম পুরুষ
নিত্য বর্তমান ই	অ, ইস্, এন	এ, এন
ঋটমান .. ইতেছি [ ছি ]	ইতেছ, ইতেছিস্, ইতেছেন	ইতেছে, ইতেছেন [ ছে, ছেন ]
	[ ছ, ছিস্, ছেন ]	
পুরাঘটিত ,, ইয়াছি [ এছি ]	ইয়াছ, ইয়াছিস্, ইয়াছেন	ইয়াছে, ইয়াছেন
	[ এছ, এছিস্, এছেন ]	[ এছে, এছেন ]
অনুজ্ঞা ,, ×	অ, উন	উক্, উন

### অতীত কাল

সাধারণ বা	ইলাম	ইলে, ইলি, ইলেন	ইল, ইলেন
নিত্য অতীত [ লাম, লুম, লেম ]		[ লে, লি, লেন ]	[ ল, লেন ]
নিত্যবৃত্ত ,, ইতাম		ইতে, ইতিস্, ইতেন	ইত, ইতেন
	[ তাম, তুম, তেম ]	[ তে, তিস্, তেন ]	[ ত, তেন ]
ঋটমান ,, ইতেছিলাম		ইতেছিলে, ইতিছিলি,	ইতেছিল, ইতেছিলেন
	[ ছিলাম, ছিলুম, ছিলেম ]	ইতেছিলেন	[ ছিল, ছিলেন ]
		[ ছিলে, ছিলি, ছিলেন ]	

	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	প্রথম পুরুষ
পুরাণটিত	ইয়াছিলাম	ইয়াছিলে, ইয়াছিলি,	ইয়াছিল,
অতীত	[ এছিলাম, এছিলুম, এছিলেম, ]	ইয়াছিলেন [ এছিলে, এছিলি, এছিলেন ]	ইয়াছিলেন [ এছিল, এছিলেন ]

### ভবিষ্যৎ কাল

সাধারণ ভবিষ্যৎ ইব	ইবে, ইবি, ইবেন	ইবে, ইবেন
[ ব ]	[ বে, বি, বেন ]	[ বে, বেন ]
ঘটমান „ ইতে থাকিব	ইতে থাকিব, ইতে থাকিবি, ইতে থাকিবেন	ইতে থাকিবে, ইতে থাকিবেন
[ তে থাকব ]	[ তে থাকবে, তে থাকবি, তে থাকবেন ]	[ তে থাকবে, ইতে থাকবেন ]
পুরাণটিত „ ইয়া থাকিব	ইয়া থাকিবে, ইয়া থাকিবি, ইয়া থাকিবেন	ইয়া থাকিবে, ইয়া থাকিবেন
[ এ থাকব ]	[ এ থাকবে, এ থাকবি, এ থাকবেন ]	[ এ থাকবে, এ থাকবেন ]
অমুজ্ঞা „ X	ইবে, ইও, ইাব, ইস্, ইবেন	ইবে, ইবেন
	[ বে, ও, বি, ইস্, বেন ]	[ বে, বেন ]

### ‘কর’

#### বর্তমান কাল

	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	প্রথম পুরুষ
সাধারণ বা নিত্য বর্তমান	করি	কর, করিস্, করেন	করে, করেন
ঘটমান „ করিতেছি	করিতেছি	করিতেছ, করিতেছিস্, করিতেছেন	করিতেছে, করিতেছেন
[ করছি ]	[ করছি ]	[ করছ, করছিস্, করছেন ]	[ করছে, করছেন ]
পুরাণটিত „ করিয়াছি	করিয়াছি	করিয়াছে, করিয়াছিস্, করিয়াছেন	করিয়াছে, করিয়াছেন
[ করেছি ]	[ করেছি ]	[ করেছ, করেছিস্, করেছেন ]	[ করেছে, করেছেন ]
অমুজ্ঞা „ X	কর, কর, করন	কর, কর, করন	করক, করন

অতীত কাল

	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	প্রথম পুরুষ
সাধারণ বা	করিলাম	করিলে, করিলি,	করিল, করিলেন
নিত্য অতীত [	করলাম, করলুম,	করিলেন [ করলে,	[ করল,
	করলেম ]	করলি, করলেন ]	করলেন ]
নিত্যবৃত্ত „	করিতাম	করিতে, করিতিস্,	করিত, করিতেন
	[ করতাম, করতুম,	করিতেন [ করতে,	[ করত,
	করতেম ]	করতিস্, করতেন ]	করতেন ]
ঘটমান „	করিতেছিলাম	করিতেছিলে,	করিতেছিল,
	[ করছিলাম,	করিতেছিলি,	করিতেছিলেন,
	করছিলুম,	করিতেছিলেন	[ করছিল,
	করছিলাম ]	[ করছিলে, করছিলি,	করছিলেন ]
		করছিলেন ]	
পূর্বাঘটিত „	করিয়াছিলাম	করিয়াছিলে,	করিয়াছিল,
	[ করেছিলাম,	করিয়াছিলি,	করিয়াছিলেন
	করেছিলুম,	করিয়াছিলেন	[ করেছিল,
	করেছিলাম ]	[ করেছিলে, করেছিলি,	করেছিলেন ]
		করেছিলেন ]	

ভবিষ্যৎ কাল

সাধারণ ভবিষ্যৎ করিব [ করব ]	করিবে, করিবি, করিবেন	করিবে, করিবেন
	[ করবে, করবি, করবেন ]	[ করবে, করবেন ]
ঘটমান „ করিতে থাকিব	করিতে থাকিবে, করিতে	করিতে থাকিবে,
[ করতে থাকব ]	থাকিবি, করিতে থাকিবেন	করিতে থাকিবেন
	[ করতে থাকবে, করতে	[ করতে থাকবে,
	থাকবি, করতে থাকবেন ]	করতে থাকবেন ]
পূর্বাঘটিত „ করিয়া থাকিব	করিয়া থাকিবে, করিয়া	করিয়া থাকিবে,
[ করে থাকব ]	থাকিবি, করিয়া	করিয়া থাকিবেন
	থাকিবেন	[ করে থাকবে,
	[ করে থাকবে, করে	করে থাকবেন ]
	থাকবি, করে থাকবেন ]	
অমুজ্ঞা „ ×	করিবে, করিও, করিবে,	করিবে, করিবেন
	করিস্, করিবেন	[ করবে, করবেন ]
	[ করবে, করো, করবি,	
	করিস্, করবেন ]	

বাংলার অন্যান্য ক্রিয়ার রূপ বিভিন্ন কালে এবং বিভিন্ন পুরুষে 'ক' ধাতুর অমুজ্ঞা।



## ॥ স্তম্ভসংগী ॥

\*১. সংজ্ঞা লিখ ও উদাহরণ দাও : নিত্যবৃত্ত অতীত, মা. '৫৫, '৬১, '৬৩, উ. মা. '৬২ ; যৌগিক কাল, '৬৬ ; পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ, মা. '৫২, উ. মা. '৬০ ; ঘটমান অতীত, উ. মা. '৬২, ক. প্র. '৬২, ব. প্র. '৬১ ; মৌলিক কাল, ঐতিহাসিক বর্তমান, পুরাঘটিত বর্তমান, পুরাঘটিত অতীত, ঘটমান ভবিষ্যৎ ও ভবিষ্যৎকালের অমুজ্ঞা, মা. '৫৬ ; ঘটনাস্তরূপে ক্ষিত ভাব, নিত্যবৃত্ত বর্তমান, নিত্যবৃত্ত ঘটমান বর্তমান, ঘটমান পুরানিত্যবৃত্ত পুরাঘটিত নিত্যবৃত্ত ।

\*২. নিত্য অতীত, নিত্যবৃত্ত অতীত, ঘটমান অতীত, পুরাঘটিত অতীত—এই চারটি কালের পার্থক্য বুঝাইয়া প্রত্যেকের একটি করিয়া দৃষ্টান্ত দাও । মা. '৬৪ ।

\*৩. 'হ' ধাতু অথবা 'হ্ণ' ধাতুর পুরাঘটিত বর্তমান, ঘটমান অতীত, বর্তমান অমুজ্ঞা এবং ঘটমান ভবিষ্যতের প্রথম পুরুষের সাধু ও চলিত রূপ লিখ । উ. মা. '৬১

৪. মৌলিক কাল ও যৌগিক কালের পার্থক্য কি দৃষ্টান্তসহ বুঝাইয়া দাও ।

৫. দৃষ্টান্ত দাও : অতীতকালের অর্থে ভবিষ্যৎ কালের প্রয়োগ, ভবিষ্যৎ কালের অর্থে অতীত কালের প্রয়োগ, বর্তমান কালের অর্থে ভবিষ্যৎ কালের প্রয়োগ, অতীত কালের অর্থে বর্তমান কালের প্রয়োগ ।

মা. '৫৬

৬. বল, হাস, পড়, লিখ—এই ধাতুগুলির বর্তমান কালের রূপ লিখ ।

৭. চল, শুন্, দে, যা—এই ধাতুগুলির অতীত কালের রূপ লিখ ।

৮. শো, হ মিল, খা—এই ধাতুগুলির ভবিষ্যৎ কালের রূপ লিখ ।

৯. বাকরণগত টীকা লিখ : 'দেখানে ছুটিতাম সকালে উঠি।' 'অশথ উঠিয়াছে প্রাচীর টুটি।' 'ওটা বিতে হবে।' 'সে বছরে ফাকা পেশু কিছু টাকা।' 'ক'রলান মন জীন্দাবন বাবেক আসিব ফিরি।' 'সে কাল কলকাতায় আনছে।' 'তুমি দেখছি, আমাব দবনাশ করলে।'

১০. 'কিয়র ভাব কাগকে বলে ?' 'কিয়র ভাব-প্রকাশক প্রকার কয় রকমের ?' দৃষ্টান্তসহ আলোচনা কর ।

১১. কর্ ধাতুর পুরাঘটিত বর্তমান কালের ( Present Perfect ) সকল পুরুষের রূপান্তর লিখ ।

উ. মা. '৭০

বাক্যের মধ্যে লিঙ্গ, বিভক্তি, পুরুষ বা বচনে যে সকল পদের রূপের কোন পরিবর্তন হয় না, তাহাদের অব্যয় পদ বলা হয়। যেমন : ও, এবং, বাহবা, ছিঃ, মরি, কিন্তু, তবু, তথাপি ইত্যাদি। অব্যয় অর্থাৎ যাহার ব্যয় বা পরিবর্তন নাই—যে সকল পদ সকল অবস্থাতেই একই রূপ থাকে, তাহারা অব্যয় পদ। অব্যয় বাক্যস্থ শব্দগুলির স্থান, কাল ও পাত্রের সম্বন্ধ-নির্দেশক এবং ভাব-প্রকাশক।

প্রচুর সংস্কৃত অব্যয় বাংলায় স্থান লাভ করিয়াছে। যেমন : অকস্মাৎ, অচিরাত্, অতএব, অতঃপর, অতীব, অত্র, অথবা, অর্থাৎ, অত্, অধুনা, অনন্তর, অন্তত্, অপি, অপিচ, অবশ্য, অসি, অরে, অহো, আঃ, আশু, ইদানীং, একত্র, একদা, এবং, এবস্থিধ, কথঞ্চিৎ, কদাচ, কদাচিৎ, কদাপি, কলা, কিংবা, কিঞ্চিৎ, কিন্তু, কুত্র, কুত্রাপি, কেবল, কচিৎ, চমৎকার, ঝটিতি, তত্র, তত্রাপি, তথৈব, তদানীং, ধিক্, নচেৎ, নতুবা, নিতান্ত, পশ্চাৎ, পরন্তু, পরম্, পুনঃ, পুনশ্চ, পৃথক্, প্রতি, প্রত্যহ, প্রত্যুত, প্রভৃতি, প্রাক্, প্রাতঃ, প্রায়, প্রায়শ্, বরং, বরঞ্চ, বা, বিনা, বুধা, যত্র, যথা, যদি, যতপি, যাবৎ, যুগপৎ, রে, সদা, সত্তাঃ, সম্প্রতি, সম্যক্, সর্বত্র, সর্বথা, সহসা, সাক্ষাৎ, স্ততরাং, স্তত্, স্বয়ং, হা, হস্ত, হে।

খাটি বাংলা অব্যয়ের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। যেমন : অথচ, আচ্ছা, আর, আবার, আ মরি, আ মরে যাই, আরে, আহা-রে, ইঃ, ইস্, উঃ, উহ, ওঃ, ওরে, ওলো, ও হরি, ওহে, ওহো, কি, কেন, কখন, তখন, তবে, তবেই, তবু, তারপর, তেমনি, তো, দূর, ধেং, ছি ছি, ছা ছা, না, নাকি, বাঃ, বাপ্-রে, বাহবা, বুঝি, বেশ, মরি মরি, মতো, মতন, যখন, যেমন, শাবাস, হায়, হায় হায়, হায়রে ইত্যাদি।

### অব্যয়ের শ্রেণীবিভাগ

অব্যয় পদগুলিকে প্রধানতঃ দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় : এক. সংযোগবাচক বা সম্বন্ধবাচক এবং দুই. ভাববাচক। স্মরণীয় যে, একই অব্যয় সংযোগবাচক বা ভাববাচক হইতে পারে। কাজেই, ইহাদের শ্রেণীবিভাগ হওয়া উচিত প্রয়োগ এবং অর্থের ভিত্তিতে।

এক. সংযোগবাচক বা সম্বন্ধবাচক অব্যয়ের মধ্যে আবার পড়ে : পদাধ্বয়ী অব্যয় এবং সমুচ্চয়ী বা বাক্যাধ্বয়ী অব্যয় ; দুই. ভাববাচক অব্যয়ের মধ্যে পড়ে : অনধ্বয়ী অব্যয়।

কাজেই, অব্যয় মূলতঃ তিন প্রকার : এক. পদাধ্বয়ী অব্যয়, দুই. সমুচ্চয়ী বা বাক্যাধ্বয়ী অব্যয় এবং তিন. অনধ্বয়ী অব্যয়।

#### এক. পদাধ্বয়ী অব্যয়

যে সকল অব্যয় বাক্যের বিভিন্ন পদের মধ্যে অর্থ বা সম্বন্ধ প্রকাশ করে, তাহাদের

পদসমূহী অব্যয় বলা হয়। স্মরণীয় যে, পদাঙ্কীয় অব্যয় পদসমূহের মধ্যে অঙ্কন বা সংকল্প প্রকাশ করে, বাক্যসমূহের মধ্যে নয়। যেমন : বিনা, ব্যতীত, ছাড়া, সঙ্গে, সহিত, সহ, সনে, সম, মত, মতন, তায়, সদৃশ, তুল্য, যেন, পশ্চাতে, সম্মুখে, পাশে, বামে, ভিতর, ভিতরে, বাহিরে, সামনে, পিছনে, অন্তরে, নিমিত্ত, জন্ত, তরে, পৰ্যন্ত, অবধি, হইতে, থেকে, চেয়ে, পানে, প্রতি ইত্যাদি। এই অব্যয়গুলিকে আবার অনুসঙ্গ অব্যয়ও বলা হয়। ইহারা বিশেষ্য বা সর্বনামের পরে বসিয়া বিভক্তির কাজ করে ; অর্থাৎ, বাক্যস্থিত পদগুলির সহিত ক্রিয়ার সংকল্প প্রকাশ করে।

**দৃষ্টান্ত :** “সীতা ‘বিনা’ আমি যেন মণিহারা ফণী।” “বাধা মোর উঠবে জলে উর্ধ্ব ‘পানে’।” “অশান্তির ‘অন্তরে’ যেথায় শান্তি সুমহান।” “আমি পরানের ‘সাথে’ খেলিব আজিকে মরণ খেলা।” “আমার সকল ‘দ্বিগ্ন’ সাজাব তোমারে।” “নদী জলে-পড়া আলোর ‘মতন’ ছুটে যা ঝলকে ঝলকে।” “হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে ময়ূরের ‘মত’ নাচে রে।” “মোড়লের কাছে পত্র দেয় পাঁচ হাজার টাকা দাবি করে ব্রাহ্মণের ‘জন্তে’।” “বাংলার মুখ ভুলে খাচার নষ্ট শুকের ‘মতন’ কাটাইনি দিনমাস।” “গাংশালিখের ঝাঁক, মনে হয়, ‘যেন’ সেই কালীদহে ভাসে।” “বনের ‘মাঝ’ দিয়ে আকাঁকা সন্ন পথ।” “ওপাড়া ‘হইতে’ আয় মায়ে বিয়ে।” “বাঘের ‘সঙ্গে’ যুদ্ধ করিয়া আমরা হাঁচিয়া আছি।” “তুমি আর উড়ে উড়ে কেঁদো নাকো ধানসিঁড়ি নদীটির ‘পাশে’।” “ইহার ‘চেয়ে’ হতেম যদি আরব বেতুইন।” “শিখর ‘হইতে’ শিখরে ছুটিব।”

### তুই. সমুচ্চয়ী বা বাক্যাঙ্কীয় অব্যয়

যে সকল অব্যয় একাধিক পদ বা বাক্যের মধ্যে সংযোগ অথবা বিয়োগ সাধন করে, তাহাদের সমুচ্চয়ী বা বাক্যাঙ্কীয় অব্যয় বলে। এই অব্যয় আবার বহু রকমের হইতে পারে। যেমন : ক. **সংযোজক**—যে সকল অব্যয় একাধিক পদ বা বাক্যের মধ্যে সংযোগ সাধন করে, তাহাদের সংযোজক অব্যয় বলা হয়। যেমন : ও, আর, এবং, আরও, অপিচ, অধিকন্তু। ‘ও’, ‘এবং’ সাধু ও চলিত উভয় ভাষাতেই চলে ; ‘আর’ চলে শুধু চলিত ভাষায়। “বেলায় উঠে দেখলুম চমৎকার রোদ্দুর উঠেছে ‘এবং’ শরতের পরিপূর্ণ নদীর জল তল তল পৈ পৈ করছে।” “উই ‘আর’ ইহুরের দেখ ব্যবহার।” খ. **বিয়োজক**—যে সকল অব্যয় একাধিক পদ বা বাক্যের মধ্যে বিয়োগ সাধন করে, তাহাদের বিয়োজক অব্যয় বলা হয়। যেমন : বা, কিংবা, অথবা, হয়, না-হয়। “এই জীবনটা ভালো ‘কিবা’ মন্দ ‘কিবা’ বা হোক একটা কিছু।” অমল ‘অথবা’ বিমল কেউ একজন আসিলেই চলিবে। গ. **সংকোচক**—কিন্তু, তথাপি, তবে। “বোধ হয় এগারোটা ‘কিবা’ সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে, ‘কিন্তু’ এ পর্যন্ত লেগাপড়া ‘কিবা’ কোনো কাজে হাত দিইনি।” অনেক অহুরোধ-উপরোধ জানানো হইল, ‘তথাপি’ তাহাকে টলানো গেল না। “তবে’ তাই হোক, ক্রমাতেই আনো দাহ।” ঘ. **হেতুবোধক**—কারণ, যেহেতু, ব’লে, কেননা, জন্ত। তোমার ভুলের ‘জন্ত’ আমরা অনেক মাগল দিয়াছি। “কিন্তু বলব ‘ব’লে’ এসেছিলাম।” “তোমার আপন

জনে ছাড়বে ভোরে, তা 'ব'লে' ভাবনা করা চলবে না।" ৬. নিত্য-সম্বন্ধী—  
 যদি—তবে, যেই না—অমনি, যদিও—তবু, বরং—তবুও, যে—সেই, যদিও—তথাপি।  
 "যদি বারণ কর, 'তবে' গাহিব না।" 'যেই না' পা দিয়েছি, 'অমনি' সিঁড়িটা মড়মড়  
 করে পড়ল ভেঙে। "মা 'যদি' হও রাজি, বড়ো হলে আমি হব খেয়া ঘাটের মাঝি।"  
 'বরং' মৃত্যু বরণ করিব, 'তবুও' পরাভব স্বীকার করিব না। "যদিও" আমার অনেক  
 গুরুতর কাজ ছিল, 'তবু' খুব গম্ভীরভাবে আত্মোপাস্ত শুনে গেলুম।" ৮. সিদ্ধান্ত-  
 মূলক—অতএব, সুতরাং, কাজেই, তাই। "আমার যাহা বলিবার বলিয়াছি, 'কাজেই'  
 আমার আর নতুন কিছু বলিবার নাই। "সময় যে নাই; আবার শিশিররায়ে 'তাই'  
 নিকুঞ্জে ফুটায় তোল নব কুন্দরাজি।" ৯. ক্রিয়াবিশেষণবাচক—  
 হঠাৎ, অকস্মাৎ, দৈবাৎ। সে 'সন্ধ্যা' বিদেশ থেকে ফিরেছে, ওকে এখন কিছু বলো না।  
 কাজ যা ছিল সেরে ফেলেছি, 'আপাততঃ' হাতে কোন কাজ নেই। "হঠাৎ" আলোর  
 বলকানি লেগে বলমল করে চিস্ত। "আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে  
 'দৈবে' হতেম দশম রত্ন নবরত্নের মালে।" "অকস্মাৎ" তুর্ধ্বনি হইল তখন।" ১০.  
 ব্যতিরেকাঙ্গক—নচেৎ, নতুবা, নইলে। "বন্ধু, তোমার বুকভরা লোভ দুচোখে স্বার্থ-  
 হূলি/নতুবা' দেখিতে তোমারে সেবিত দেবতা হয়েছে কুলি।" "আমরা সবাই  
 রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে/নইলে' মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বপ্নে?"

### তিন. অনন্বয়ী বা ভাববাচক অব্যয়

বাক্যের সহিত যে সকল অব্যয়ের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকে না, কিন্তু মনের উচ্ছ্বাস  
 বা কোন বিশেষ ভাব প্রকাশ করিতে ব্যবহৃত হয়, তাহাদের অনন্বয়ী বা ভাববাচক  
 অব্যয় বলা হয়। যেমন: ক. বিস্ময়বোধক—আহা, অ্যা, ওমা, ওরে বাবা। "আহা"  
 আজি এ বসন্তে এত ফুল ফুটে!" "বাঃ"—এও তো বড়ো মজা!" "বাহবা!"  
 "বাবারে", আমি চুপ করে এই কচুবনে নুকিয়ে থাকি।" "অহো" কী হুঃসহ আশ্চর্য!"  
 "বাহবা! শাবাস রে তোর ভরসা দেখি!" "মিন্টন, 'আহা'! তুমি যদি আজ বাঁচিয়া  
 থাকিতে!" খ. প্রশংসাবোধক—বাঃ, মরি মরি, চমৎকার, খাসা, বেশ। "ওহে  
 সুন্দর 'মরি মরি'।" 'মরি'ও কার বাছা, ওকে কোথায় নিয়ে যায়।" গ. ঘৃণাবোধক  
 —ছিঃ, ছি-ছি, থু, ধিক। "ছি-ছি' চোখের জলে ভেজাস নে আর মাটি।" "ধিক"  
 ধনুঃশর! 'ধিক' বাহ বল!" "এই 'কি' তোমার উপহার।" "ধিক ধিক ধিক!"  
 ঘ. সম্মতিবোধক—আচ্ছা, আজ্ঞে ই্যা। "আচ্ছা" সে দেখা যাবে।" "আজ্ঞে ই্যা",  
 তাই হবে। ৬. অসম্মতি বোধক—না, উহঁ, কিছুতেই না, কথ'খনো না। "না",  
 আমি তোমাদের কোন কথাই শুনবো না।" ৮. আহ্বানবোধক—ওহে, ওরে,  
 ওগো, ও। "ও" আমার দেশের মাটি।" "ও ভাই, দেখে যা কত ফুল তুলেছি।" "ওরে  
 গৃহবাসী, খোল দ্বার খোল।" "হে' নতুন, দেখা দিক আর বার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ।"  
 "আরে' দাঁড়া দাঁড়া, অত ব্যস্ত হলে ফন্সাবে শিকার।" "ওগো' তোরা আজ বাসনে গো-  
 তোরা বাসনে ঘরের বাহিরে।" "ওরে' নবীন, 'ওরে' আমার কাঁচা!" ৯. বিরক্তি-  
 বোধক—খেং, ধুস্তোরি, কি জালা। 'কি মুন্সিল', তোমরা যে এখানেই বগড়া শুরু

কল্পে দিলে। জ. কান্তরতাবোধক বা শৌকজ্ঞাপক—হার-হার, হার, ও হো-হো। “এ যে ‘হার’ পথের বাতাসে নিবে বার।” “আহা! ঐ করুণ চোখে ও কার পানে চার।” “হা, কী দশা হল আমার।” ঝ. প্রত্নবোধক—প্রাণ বুকাইবার জন্ত বাক্যের মধ্যে যে সব অব্যয় ব্যবহার করা হয়, তাহাদের প্রত্নবোধক অব্যয় বলা হয়। যেমন : নাকি, কেমন, তো, না, নারে, বটে ইত্যাদি। “তোমার ‘নাকি’ যেমের বিয়ে?” “কেমনে’ শুধিব বলো তোমার এ ঞ্ণ?” “কেমন’, বলেছিলুম ‘না’ আমার জয় কেউ ঠেকাতে পারবে না?” এ. তুলনাবাচক—তুলনা বুকাইতে যে অব্যয়গুলি ব্যবহৃত হয়, তাহাদের তুলনাবাচক অব্যয় বলা হয়। যেমন : মত, মতন, ভায়, যেন, সদৃশ, সন, যেমন, যথা ইত্যাদি। “বিনা মেঘে বজ্রবের ‘মতো’ উল্লোকে বেঁকে কাড়ো-নাকাড়ো।” “হুতের ‘মতন’ চেহারা যেমন নির্বোধ অতি ঘোর।” তাহার ‘ভায়’ মহাত্ম্যের ব্যক্তি আমি আর দেখি নাই। “জলিতেছে কেন ‘যেন’ সারে সারে প্রদীপমালার ‘মতো’?” “আকাশ কাঁদে হতাশ ‘সম’।” তাহার বাহ্যগুণ ইম্পাত ‘সদৃশ’ কঠিন। “একত্র আছিল বন্ধ পাণ্ডবে কোরবে কলঙ্ক ‘যেমন’ থাকে শশাঙ্কের বুকে।” “তব অঙ্গগামী দাস রাজেন্দ্র-সকল দীন ‘যথা’ বার দূর তীর্থ দরশনে।” ঞ. বাক্যালংকার অব্যয়—যে সকল অব্যয় বাক্যের অলংকরণের জন্ত অর্থাৎ সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্ত ব্যবহৃত হয়, তাহা ছাড়া অন্য কোনরূপ অর্থপ্রকাশে সাহায্য করে না, তাহাদের বাক্যালংকার অব্যয় বলা হয়। যেমন : না, তো, বা, গে, আর, কি। “তুই আমাব মুণ্ড নিবি না ‘তো’ কে নেবে।” “তবে যাও ‘না’ টানো ‘গে’-‘না’ হে।” “সন্ন্যাসিনী ‘যে’ আমি।” “আমার নাই ‘বা’ হল পানে যাওয়া।” “তোমবা ‘যে’ বেড়াতে যাবাব নাম করে মেলায় যাচ্ছো, কেউ াক ‘আব’ তা জানে না?” ঠ. ধ্বজাত্মক অব্যয় বা অনুকারবোধক অব্যয়—যে সকল অব্যয় ধ্বনির অন্তর্যকরণে গঠিত, তাহাদের ধ্বজাত্মক অব্যয় বা অনুকারবোধক অব্যয় বলে। যেমন : বর বর, শন শন, টাপুব টপুব, টিপ্ টিপ্, ঠক্ ঠক্, বি বি, হি হি, হো হো, গৌ গৌ। ড. উপসর্গ অব্যয়—এই অব্যয়গুলি ধাতুর পূর্বে বসিয়া নতন নতন শব্দ গঠন করে কিংবা নতন নতন অর্থ দান করে। যেমন : [ আ-জ = ] আগার, [ বি-জ = ] বিহার, [ বি-অব-জ = ] ব্যাগব। \*খাঁটি বাংলা উপসর্গ অব্যয় : [ ‘অ’-ঘোর ] অঘোর, [ ‘অন’-ছিটি ] অনাছিটি, [ ‘হা’-ভাতে ] হাভাতে, [ ‘হা’-ধবে ] হাধরে, [ ‘আ’-কাঁড়া ] আকাঁড়া।

### অব্যয়ের

### কিছু অতিরিক্ত দৃষ্টান্ত

দস্তার ‘মতো’ ভেঙে চূবে দেয় চিবাভ্যাসেব মেলা [তুলনাবাচক অব্যয়]। ‘হঠাৎ’ কখন সন্ধ্যাবেলায় নামহাবা ফুল গছ এলায় [ক্রিয়াবিশেষণবাচক অব্যয়]। আসলে, আদর করা ব্যাপারটা অভিভাবকদেরই বিনোদনের ‘জন্ত’, ছেলেদের পক্ষে এমন বলাই আর নাই [‘আসলে’—সিদ্ধান্তমূলক, ‘জন্ত’—হেতুবোধক]। পথে কত

‘বে’ বিষ় ষটল তার ঠিক নেই [বাক্যালংকার অব্যয়]। বীশ্বাক্ষে কাকজলো করে কাক-কা’ করে ডেকে ওঠে [ধ্বজ্যাক্ত অব্যয়]। হাত চলছে না, ‘তবু’ পাতভাঙি-কোঁকি বন্ধ করবার ‘জো’ নেই [‘তবু’—সংযোজক, ‘জো’—বাক্যালংকার]। রাতের বেলায় ঘরের বাইরে বাতাস ‘শন-শন’ বহেতে থাকে [ধ্বজ্যাক্ত অব্যয়]। ‘আহা’, ওদের মতো ‘যদি’ ডানা পেতাম ‘তবে’ কি ‘আর’ মা আমার ঘরে বন্ধ করে রাখতে পারতেন? [‘আহা’—কাতরতাবোধক, ‘যদি’—তবে—নিত্যসম্বন্ধী, ‘আর’—বাক্যালংকার]। জীবন ‘বে’ জীবনযাত্রায় বাহির হইয়া পড়িতে চায় [বাক্যালংকার]। ‘যেমন’ নীহারিকাকে সৃষ্টিছাড়া বলা চলে না, ‘কারণ’ তাহা সৃষ্টির একটা বিশেষ অবস্থায় সত্য [‘যেমন’—তুলনাবাচক, ‘কারণ’—হেতুবোধক]। সে ‘আর’ কিছু নয়, এক-একটি পরিমুট চিহ্ন আঁকিয়া তুলিবার আকাঙ্ক্ষা [বাক্যালংকার অব্যয়]। কাব্যরচনা ‘ও’ জীবন-রচনা ও দুটা একই বৃহৎ-রচনার অঙ্গ [সংযোজক অব্যয়]। ইহার ‘উপরে’ বরিশালের ভলন্টিয়ারের দল স্বদেশী কীতন গাহিয়া কোমর বাঁধিয়া ষাটী সংগ্রহে লাগিয়া গেল, ‘সুতরাং’ জাহাজে ষাটীর অভাব হইল না [‘কিন্তু’ আর সকলপ্রকার অভাবই বাড়িল ‘বই’ কমিল না। [‘উপরে’—পদাঙ্কীয়, ‘সুতরাং’—সিদ্ধান্তমূলক, ‘কিন্তু’—সংকোচক, ‘বই’—ব্যতিরেকাঙ্ক]। তুমি অগম—তাই ‘বলিয়া’ আমি উত্তম না হইব কেন? [‘বলিয়া’—হেতুবোধক]। এ ‘বে’! এ গাছটার ‘পেছনে’! ‘কেমন’ অনেক দূর ‘না’? [‘বে’—বাক্যালংকার, ‘পেছনে’—পদাঙ্কীয়, ‘কেমন’—প্রশ্নবোধক, ‘না’—বাক্যালংকার]। এই দীর্ঘ সময়ের ‘মধ্যে’ এরা কি ‘আর’ বাড়েনি, ‘আর’ আপনার মধ্যেও কি কোনো পরিবর্তন হয়নি? [‘মধ্যে’—পদাঙ্কীয়, ‘আর’—বাক্যালংকার, ‘আর’—বাক্যাঙ্কীয়]। ছিনাথ কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিল; ‘কিন্তু’ পিসেমশায়ের ‘আর’ রাগ পড়ে না [‘কিন্তু’—সংকোচক, ‘আর’—বাক্যালংকার]। ‘অকস্মাৎ’ আমার ঠিক পিঠের কাছে ‘তম্’ শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে ছোড়দা ‘ও’ বতীনদার সমবেত আতঙ্কে গগনভেদী ‘রৈ-রৈ’ চীৎকার—‘ওরে বারা রে’, ‘থেকে ফেলো ‘রৈ’!’ [‘অকস্মাৎ’—ক্রিয়াবিশেষণবাচক, ‘এবং’—বাক্যাঙ্কীয়, ‘ও’—পদাঙ্কীয়, ‘রৈ-রৈ’—ধ্বজ্যাক্ত, ‘ওরে বাবারে’—বিস্ময়বোধক, ‘রৈ’—বিস্ময়বোধক]। এ ‘তো’ মেয়ে মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয় [‘তো’—বাক্যালংকার]। দুরাছারা এই পদ কামনা করে, ‘কিন্তু’ রাখতে পারে না। [‘কিন্তু’—সংকোচক]। শক্তি মরে ভীতির কবলে, ‘পাছে’ লোকে কিছু বলে [‘পাছে’—সংশয়সূচক]। ‘যদিও’ মা তোর দিবা আলোকে ঘিরে আছে আজ আধার ঘোর, কেটে যাবে মেঘ [‘যদিও’—নিত্যসম্বন্ধী]। আমি ‘ছাড়া’ আর কেহ ‘তো’ পায় না ঝুঁজে তারে [‘ছাড়া’—পদাঙ্কীয়, ‘তো’—বাক্যালংকার]। আমি ‘যেন’ যাবো দেশান্তরে [‘যেন’—তুলনাবাচক]। দেখো ‘তো’ চেয়ে, আমারে তুমি চিনিতে পারো ‘কিনা’ [‘তো’—বাক্যালংকার, ‘কিনা’—প্রশ্নবোধক]।

### ●কল্পে একটি সংস্কৃত অব্যয়ের ব্যবহার

‘অতি’ বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ। ‘আচাষিতে’ আকাশ মেঘাবৃত হইয়া চারিদিক অন্ধকার করিয়া আসিল। যদি ‘একান্ত’ বাইবেই, তবে আমাকে লইয়া



তো—হে বন্ধু, আছে 'তো' [প্রস্ন] ভালো? মরতে হয় 'তো' [তবে] মর শ্বে।  
যাবে 'তো' [যদি] চলো। সে 'তো' [বাক্যালংকার] আর ফিরবে না রে। ওর  
কথা শুনে আমি 'তো' [বিস্ময়] অবাক! তুমি যহ চাটুজের কথা বলছো? ও 'তো'  
[ভৎসনা] একটা আস্ত পাগল! আমি 'তো' [জোর] আছি, তুমি যাও।

না—যেও 'না' [নিষেধ] রজনী, আজি লয়ে তারাদলে। 'না' [সংশয়] জানি  
কোথা এলুম। 'না' বুঝে কারে তুমি ভালো আখিজলে। শুনেতে পেলুম পোস্তা  
গিয়ে তোমার 'না' [সংশয়]-কি মেয়ের বিয়ে? চরণ ধরিতে দিয়ে গো আমারে,  
নিয়ো 'না' [মিনতি] নিয়ো 'না' সরায়ো। 'না' [বিশেষ্য] বললে ছাড়ছি না [দৃঢ়তা]  
কি? তুমি একথা বলতে পারলে, তুমি 'না' [তিরস্কার] বাঙ্গালী? 'না' [অভিমান]  
যাবে—'না'-ই যাবে, এত কথা কিসের? 'না', [অহরোধ] যেয়ো 'না' [অহবোধ],  
যেয়ো 'না' কো। হিন্দু 'না' [জিজ্ঞাসা] ওরা মুসলিম? ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?  
আমি 'না' হয় [অনিশ্চয়তা] নাই গেলাম। তুমি যাও 'না' [হাঁ-বাচক]। 'না'  
[বিশেষণ] ঝাল 'না' [ঐ]-মিষ্টি। ওপথে যেয়ো না, কেন-'না' [কারণ] ওপথে  
বিপদ আছে। তুমি তো হাঁ-কে 'না' [বিশেষ্য], 'না' [বিশেষ্য]-কে হাঁ করতে  
পারো। বিলাস যে মিস্তির-বংশের ছেলে, ওকথা কে 'না' [বাক্যালংকার] জানে।

### ॥ অনুসরণী ॥

১. অব্যয় পদ কাহাকে বলে? না. '৬৭, মা. (কম্পার্ট) '৬৫
২. অনর্থক অব্যয় কাহাকে বলে উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর। উ. মা. '৬১
৩. অব্যয় পদ কয় প্রকার? প্রধান প্রধান অব্যয় পদগুলির দৃষ্টান্ত দাও।
৪. কিন কিন, খিল খিল, গমগম, গনগন, ছমছম, ঝমঝম, ঝলঝল—অনুকার অব্যয়গুলির যথাযথ প্রয়োগ দেখাও। ক. বি. '৫৫
৫. 'না' পদটির বিবিধ পবিচয় নির্দেশ কর: সে না-কি বাগ কবিখাছিল, তাই বালল, 'আমি বেড়াতে যাবনা, তুমি যাওনা।' আমি বললাম, 'না বললে ছাড়ছি নাও?' সে বলল, 'বতই বল না কেন, আমি নাচাব।' আমি বলিলাম, 'অর্থাৎ কিনা খোঁজা।' জ্বালামি দেখ না।'
৬. অনর্থক অব্যয় কয় প্রকার? প্রত্যেক প্রকাবে একটি কবিযা দৃষ্টান্ত দাও।
৭. নিম্নলিখিত পদগুলিকে অব্যয়রূপে ব্যবহার কর:  
আদৌ, উপস্থগির, অচিবাৎ, দৈবাৎ, বৃথা, ইদানীং, যংপবোনাস্তি, যেন-তেন-প্রকাষণ, কেবল, যুগপৎ।
৮. চিহ্নিত পদগুলি কোন শ্রেণীর অব্যয় লিখ:  
এ অগতে 'হার' সেই বেশি চাষ আছে যাব 'ভুরি ভুরি'। কোথা 'হা' হস্ত চিরবসন্ত, আমি বসন্তে মরি।  
সাতকোটি সন্তানের 'হে' যুদ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালি করে, মামুহ করনি। কীর্তনে 'আর' বাড়লের গানে  
আমরা ঘিরেছি খুলি মনের গোপনে নিভৃত ডুবনে হার ছিল যতগুলি। জাগিল বিজলী 'যেন' নীল নবঘনে।  
মস্তের সাধন 'কিংবা' শরীর পাতন। কেহ 'বা' ক্ষুধার রান, কেহ রোগে স্রিয়মাণ। 'বখন' আসিতেন, 'তখন'  
'আর' আহার পাইবার সন্ধাননা থাকিত না। 'হুতরা' তাঁহাকে রাজিতে অনাহারে থাকিতে হইত।  
'অকস্মাৎ' নাবিকেরা হরিয়ার পাঁচপীরের নাম কীর্তিত করিয়া মহা-কোলাহল করিয়া উঠিল। 'বসন্ত' বাহুবল  
অপেক্ষা বাক্যবল সর্বাপেক্ষে শ্রেষ্ঠ। 'তথাপি' প্রজার সঙ্গে বাহুবলের পরীক্ষা সুখদায়ক নহে। 'হে' রাজেন্দ্র,  
তব হাতে কাল অন্তহীন। সে আমার ডাকে এমন করিয়া কেন 'যে' কব তাঁ 'কেমনে'। আর'রে 'ওরে  
মৌদাছি আর, চৈত্রে 'যে' যায় পত্রঝরা। ব্যাধির 'চৈত্রে' আখি হল বড়ো। ডাক্তারে যা বলে বলুক-'নাকো'  
সেগুলি 'যদি' গাছের পাতা হইত 'তবে' নিশ্চয়ই করিয়া বাইত। সদর স্ট্রিটের রাস্তাটা যেখানে গিয়া শেখ  
হইয়াছে সেখানে 'বোধ করি' স্রী শুলের বাগানের গাছ দেখা যায়।



শব্দই ভাষার সমৃদ্ধির অগ্রতম উপকরণ। যে ভাষার যত বেশী শব্দ আছে, সেই ভাষা তত বেশী সমৃদ্ধ। শব্দ বা ধাতুর উত্তর প্রত্যয় যুক্ত হইয়া নতুন নতুন শব্দ গঠিত হয়। বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষা হইতে প্রচুর প্রত্যয় উত্তরাধিকারস্বত্বে প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহা ছাড়া আছে তাহার নিজস্ব কিছু প্রত্যয় এবং বিদেশী প্রত্যয়।

**প্রত্যয় :** শব্দ বা ধাতুর উত্তর যে সমস্ত বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ যুক্ত হইয়া প্রাতিপদিক\* গঠিত হয়, তাহাদিগকে প্রত্যয় বলা হয়। যেমন : অক, আলু, শানচ, শত, তুচ্, ইক্ষু, ষি, ষিক, আই, আলি ইত্যাদি। বিভিন্ন প্রত্যয় যোগে নতুন নতুন শব্দ গঠিত হয়।

প্রত্যয় দুই প্রকার : ১. কৃৎ-প্রত্যয় ও ২. তদ্ধিত-প্রত্যয়।

**কৃৎ-প্রত্যয় :** ধাতু-প্রকৃতির সহিত যে সকল প্রত্যয় যুক্ত হইয়া প্রাতিপদিক গঠিত হয়, তাহাদিগকে কৃৎ-প্রত্যয় বলা হয়। যেমন : অক, আলু, শানচ, শত, তুচ্, ইক্ষু ইত্যাদি কৃৎ-প্রত্যয়। গায়ক [ গৈ+অক ], দয়ালু [ দয়্+আলু ], বতমান [ বুৎ+শানচ ], দাতা [ দা+তুচ্ ], চলিষ্ণু [ চল্+ইক্ষু ]—এই কৃৎ-প্রত্যয়-নিম্পন্ন শব্দগুলি কৃদন্ত শব্দ। কোন ধাতুর উত্তর কোন বিশেষ প্রত্যয়যোগে বিশেষ পদ গঠিত হয় ; আবার, একই ধাতুর উত্তর ভিন্ন প্রত্যয়যোগে বিশেষ পদও গঠিত হয়। যেমন : উৎকৃষ্ + ষৎ = উৎকর্ষ [ বি ] ; উৎকৃষ্ + ক্ত = উৎকৃষ্ট [ বিণ ]। কৃদন্ত বিশেষ্য—‘উৎকর্ষ’ ; কৃদন্ত বিশেষণ—‘উৎকৃষ্ট’।

**তদ্ধিত-প্রত্যয় :** শব্দ বা নাম-প্রকৃতির সহিত যে সকল প্রত্যয় যুক্ত হইয়া নতুন নতুন প্রাতিপদিক গঠিত হয়, তাহাকে তদ্ধিত-প্রত্যয় বলা হয়। যেমন : ষি, ষিক, আই, আলি ইত্যাদি তদ্ধিত-প্রত্যয়। দাশরথি [ দশরথ+ষি ], মাজলিক [ মজল+ষিক ], বড়াই [ বড়+আই ], ঠাকুরালি [ ঠাকুর+আলি ]—এইগুলি তদ্ধিত-প্রত্যয়-নিম্পন্ন শব্দ। তদ্ধিত-প্রত্যয়-নিম্পন্ন শব্দকে তদ্ধিতান্ত শব্দ বলা হয়।

যে সকল প্রত্যয়যোগে পুংলিঙ্গ শব্দ জীলিঙ্গ শব্দে রূপান্তরিত হয়, তাহাদের জ্বী-প্রত্যয় বলা হয়। যেমন : ঈ [ পাত্র—পাত্রী ], আনী [ শিব—শিবানী ] ইত্যাদি। জ্বী-প্রত্যয় প্রকৃতপক্ষে তদ্ধিত-প্রত্যয়েরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আচার্য সুনীতিকুমার ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাহার মতে, ‘শব্দের উত্তর প্রযুক্ত হইলেও, এই জ্বী-প্রত্যয় ব্যাকরণের বিচারে তদ্ধিত-প্রত্যয়ের পর্যায়ে পড়ে না। ইহাকে বিশেষভাবে জ্বী-প্রত্যয় নামেই অভিহিত করা হয়।’

**ধাতুবস্ময় :** ধাতু বা শব্দের উত্তর যে বর্ণ বা বর্ণ-সমষ্টি যোগে নূতন নূতন ধাতু গঠিত হয়, তাহাকে ধাতুবস্ময় প্রত্যয় বলা হয়। যেমন : বল [ ধাতু ] + ‘আ’ [ ধাতুবস্ময় ] = বলা [ বলানো অর্থে ]—নূতন ধাতু ; শ [ ধাতু ] + সন্ [ ধাতুবস্ময় ] + ওশ্রা [ শুনিবার ইচ্ছা অর্থে ]—নূতন ধাতু ।

● এখন, কৃৎ-প্রত্যয়, ধাতুবস্ময় প্রত্যয় ও ধাতু বিভক্তি—এই তিনটির মধ্যে পার্থক্যটি সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করা প্রয়োজন ।

কৃৎ-প্রত্যয় ধাতুর উত্তর যুক্ত হইয়া নূতন শব্দ গঠন করে । যেমন : ‘কৃ’ [ ধাতু ] + ‘অক’ = কারক । ধাতুবস্ময় প্রত্যয় ধাতুর উত্তর যুক্ত হইয়া নূতন ধাতু গঠন করে । যেমন , ‘পড়্’ [ ধাতু ] + আ = পড়া [ পড়ানো অর্থে ] । ধাতু-বিভক্তি ধাতুর সহিত যুক্ত হইয়া ধাতুকে ক্রিয়াপদে পরিণত করিয়া তাহাকে বাক্যে ব্যবহৃত হইবার যোগ্যতা দান করে । যেমন : ‘কর’ [ ধাতু ] + ‘ই’ [ ধাতু-বিভক্তি ] = করি [ উত্তম পুরুষের সাধারণ বর্তমানের ক্রিয়াপদ ] ।

● এইবার, প্রত্যয় ও বিভক্তির মধ্যে পার্থক্যটি জানা প্রয়োজন । প্রত্যয় ধাতু ও শব্দের উত্তর প্রযুক্ত হয় ; তাহার ফলে নূতন শব্দ গঠিত হয় । এই শব্দ কেবলমাত্র বিভক্তি-যুক্ত হইলে তবেই বাক্যে ব্যবহৃত হইতে পারে । প্রত্যয়ের ত্রায় বিভক্তিও দুই প্রকার : শব্দ-বিভক্তি ও ধাতু-বিভক্তি । শব্দ-বিভক্তি বা ধাতু-বিভক্তি যুক্ত হইবার পূর্বে শব্দ বা ধাতুর সহিত এক বা একাধিক প্রত্যয় যুক্ত হইতে পারে ; কিন্তু শব্দ-বিভক্তি বা ধাতু-বিভক্তি যুক্ত হইবার পর আর কোন প্রত্যয় যুক্ত হইতে পারে না ।

**কৃৎ-প্রত্যয় ও তদ্ধিত-প্রত্যয় যোগের বিধি :** ধাতু ও শব্দের উত্তর প্রত্যয় যুক্ত হয় । কিন্তু লক্ষণীয় যে, প্রত্যয়-যোগের সময় প্রত্যয়ের কিয়দংশ ধাতু বা শব্দের উত্তর যুক্ত হয়, অবশিষ্টাংশ লুপ্ত হয় । ‘গম্’ [ ধাতু ] + ‘অনট্’ [ প্রত্যয় ] = গমন [ লক্ষণীয়, ‘ট্’ লুপ্ত ] ; স্নন্দর [ শব্দ ] + ফ্য [ প্রত্যয় ] = সৌন্দর্য [ লক্ষণীয়, ‘ক’ লুপ্ত ] । প্রত্যয়ের এই লুপ্ত অংশকে বলা হয় ‘ইৎ’ ।

**উপধা :** শব্দ বা ধাতুর অন্ত্য [ সর্বশেষ ] বর্ণের অব্যবহিত পূর্ববর্তী বর্ণকে উপধা বলা হয় । যেমন : ‘দেবতা’ শব্দের ‘ত্’ বর্ণ । ‘দেবতা’ শব্দটি বিশ্লেষণ করিলে দাঁড়ায় : দ্ + এ + ব্ + অ + ত্ + আ । ‘আ’ অন্ত্য বর্ণ, উহার অব্যবহিত পূর্ববর্তী বর্ণ ‘ত্’ হইল উপধা ।

### ● সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয়

সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয় যোগে তৎসম শব্দ গঠিত হয় । দৃষ্টান্তগুলিতে প্রত্যয়সমূহের, যে আংশটুকু শব্দের সহিত যুক্ত, তাহা বন্ধনী-চিহ্নের মধ্যে প্রদত্ত হইল ।

—গক [ অক ] : কর্তৃবাচ্যে ‘করেন যিনি’—অর্থে এই প্রত্যয় হয় । নিম্নলিখিত পদটি প্রধানতঃ বিশেষ্যপদরূপে ব্যবহৃত হয় । গৈ + গক = গায়ক ; দৃশ্ + গক = দর্শক ; লিখ্ + গক = লেখক ; কৃষ্ + গক = কৃষক ; পচ্ + গক = পাচক ; শাস্ + গক =

শালুক; হন্+ণক=ঘাতক; দা+ণক=দায়ক; কৃ+ণক=কারক; ধৃ+ণক=দায়ক; নন্+ণক=নাশক; পঠ্+ণক=পাঠক; চালি+ণক=চালক; পালি+ণক=পালক; প্র-ভৃ+ণক=প্রভারক; সম্-পাদি+ণক=সম্পাদক; পরি-ব্রজ্+ণক=পরিব্রাজক। তেমনি—শোষক, পাবক [পূ+ণক], সেচক, শিক্ক, পরীক্ষক [পরি-ঈক্+ণক], জনক [জন্+ণিচ্+ণক], অধ্যাপক [আধ-ই+ণিচ্+ণক]।

**বিশিষ্ট প্রয়োগ:** ‘অন্ধ গান্ধক পথের ধারে গান শুনিয়ে ডিঙে করে।’  
‘আমরা ঘাতক সরিধানে পুণ্ডর ভায় ভরঙের নিকট নিবন্ধ হইলাম।’

—**আলু:** ঐলার্থে কত্ববাচ্যে কয়েকটি ধাতুর উত্তর এই প্রত্যয় হয়। নিম্নর পদটি বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। দয়্+আলু=দয়ালু; নি-দ্রা+আলু=নিদ্রালু; কৃপ্+আলু=কৃপালু। তেমনি—ভাবালু, স্বপ্নালু, প্রত্নালু, তদ্রালু [তন্-দ্রা+আলু]।

**বিশিষ্ট প্রয়োগ:** বিজ্ঞাসাগর মহাশয়ের ভায় দম্রালু ব্যক্তি বিরল। সে তাহা স্বপ্নালু হই চোখে আকাশের দিকে চাহিয়া রাহল।

—**শানচ্ [মান]:** ক্রিয়ার কাজটি চলিতেছে অর্থে আত্মনেপদী ধাতুর উত্তর কর্তৃ ও কর্মবাচ্যে এবং পরস্মৈপদী ধাতুর উত্তর কেবল কর্মবাচ্যে এই প্রত্যয় হয়; নিম্নর পদগুলি বিশেষণ পদ হইয়া থাকে। চল্+শানচ্=চলমান; য্+শানচ্=স্রিয়মান; বৃৎ+শানচ্=বর্তমান; বৃধ্+শানচ্=বর্ধমান; দীপ্+শানচ্=দীপ্যমান; শৈ+শানচ্=শয়ান, আস্+শানচ্=আসীন; শুভ্+শানচ্=শোভমান; মুহ্+শানচ্=মুহ্যমান [মোহ্যমান]; উৎ-ই+শানচ্=উদীয়মান; বি-রাজ্+শানচ্=বিরাজমান। আত্মনেপদী ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে ও কর্মবাচ্যে এবং পরস্মৈপদী ধাতুর উত্তর কর্মবাচ্যে শানচ্ প্রত্যয় হয়। সেই দিক দিয়া প্রবহমান [প্র-বহ্+শানচ্] এবং চলমান [চল্+শানচ্] অশুভ। এখানে বহিতেছে অর্থে ‘প্রবহৎ’ [প্র-বহ্+শত্] এবং চলিতেছে অর্থে ‘চলৎ’ [চল্+ণত্] শুভ। কিন্তু অশুভ হইলেও ‘প্রবহমান’ ও ‘চলমান’ শব্দ দুইটি বর্তমানে খুবই প্রচলিত।

শানচ্ প্রত্যয়ের অতিরিক্ত দৃষ্টান্ত: কাম্যমান, বিজ্ঞমান, সেবমান, ধাবমান, প্রভীক্ষমান, নির্মায়মান, বিলীয়মান, অপহর্যমান, আবহমান, দৃষ্টমান, আলোচ্যমান, প্রভীরমান।

**বিশিষ্ট প্রয়োগ:** ‘এইখানে যোগলের মুকুট-রতন শম্মাল শাস্তির মাঝে।’  
‘বিধাতা দেছেন প্রাণ থাকি সদা জিহ্মমাণ।’ ‘আমানি খাবার গর্ত দেখে বিজ্ঞমান।’  
উদীয়মান হর্বের আলোকে ধাতুক্ষেত্র যেন লক্ষ্মীর ভায় বিরাজমান।

—**ইক্:** ঐলার্থে এই প্রত্যয় হয়। নিম্নর শব্দগুলি বিশেষণ পদ। জি+ইক্=জিক্; চল্+ইক্=চলিক্; সহ্+ইক্=সহিক্; বৃধ্+ইক্=বর্ধিক্; ক্রি+ইক্=ক্রিয়িক্। তেমনি—চরিক্।

**বিশিষ্ট প্রয়োগ:** ‘তরু হতে বেগা হয় সহিক্, তৃণ হতে দীনতর সেই বৈক্য।’ গ্রামটি এককালে বর্ধিক্ ছিল, তাই তাহার ক্রিয়িক্ রূপ আজ গহজেই চোখে পড়ে।

## কৃৎ-প্রত্যয়-ও ভাব্য-প্রত্যয়

— শত্ [ অৎ ] : বর্তমানকালে কর্তৃবাচ্যে এই প্রত্যয় হয়। বাংলার ইহার প্রয়োগ বিরল। নিম্ন শব্দগুলি বিশেষণ হইয়া থাকে। ধাব্ + শত্ = ধাবৎ ; চল্ + শত্ = চলৎ ; পঠ্ + শত্ = পঠৎ ; জীব্ + শত্ = জীবৎ ; অন্ + শত্ = অন্ ; মন্ + শত্ = মন্ ; জাগ্ + শত্ = জাগৎ ; ত্ + শত্ = ভবৎ ; জন্ + শত্ = জন্ ; গন্ + শত্ = গন্ ।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : ‘মহৎ বে হয় তার সাধু ব্যবহার।’ তিনি আজ বৃদ্ধ, চলচ্ছক্তিহীন। বৎসরের শেষে হিসাব মিলাইতে গিয়া সরকারী অফিসের কর্ম-চারীরা গলদ্বর্ষ্য হইতে লাগিল। জীবদ্দশায় সেখানে বাইব না।

— তৃচ্, ত্বন্ [ তা ] : শীলার্থে, সর্ম্ম্যার্থে বা জীবিকার্থে কর্তৃবাচ্যে এই প্রত্যয় হয়। নিম্ন শব্দগুলি বিশেষ্য। ক্তী + তৃচ্ = কর্তা ; দা + তৃচ্ = দাতা ; নী + তৃচ্ = নেতা ; যুধ্ + তৃচ্ = যোদ্ধা ; মা + তৃচ্ = মাতা ; পা + তৃচ্ = পিতা ; ভ্রাজ্ + তৃচ্ = ভ্রাতা ; বি-ধ্ + তৃচ্ = বিধাতা ; স্ + তৃচ্ = সবিতা ; হ্ + তৃচ্ = হতা ; বৃধ্ + তৃচ্ = বোদ্ধা ; শ্ + তৃচ্ = শ্রোতা ; দৃশ্ + তৃচ্ = দ্রষ্টা ; স্বজ্ + তৃচ্ = স্রষ্টা ; বহ্ + তৃচ্ = বক্তা ; রচ্ + তৃচ্ = রচয়িতা ; প্র-নী + তৃচ্ = প্রণেতা ; গ্রহ্ + তৃচ্ = গ্রহীতা। তেমনি—হস্তা, বেতা, বিজ্ঞেতা, ক্লেতা, বিক্রেতা, নিয়ন্তা [ নি-যন্ + তৃচ্ ], বিশ্বপিতা, স্থাপয়িতা, প্রবক্তা, দুহিতা, আহর্তা, সমাহর্তা, জামাতা [ জায়া-মা + তৃচ্ ]।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : ‘ক্ষমতা আছে যার রাখিতে ধন তাবেই দাতা হওয়া’ লাজে।’ ‘তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আমাদের নেতা।’ ‘মাতা মোর, ভ্রাতা মোর, মোর রাজকুল একমুহুর্তেই মাতা, করেছ নিমূল মোর জন্মক্ষেপে।’ ‘হতে পাতাম রাজনৈতিক বক্তাও অন্ততঃ।’ রবীন্দ্রনাথ ‘রক্তকরবী’র রচয়িতা।

## ● বাংলা কৃৎ-প্রত্যয়

অ : ধাতুর অর্থে অথচ বিশেষ্যাকারে ব্যবহারের জন্ম এই প্রত্যয় যুক্ত হয়। ছাড়্ + অ = ছাড় [ ছাড়পত্র ] ; বাধ্ + অ = বাধ ; মার্ + অ = মার ; হার্ + অ = হার ; ধর্ + অ = ধর ; পাকড়্ + অ = পাকড় ; নাচ্ + অ = নাচ , ডাক্ + অ = ডাক ; ছুট্ + অ = ছুট ; ঝুল্ + অ = ঝুল ; হুল্ + অ = হুল [ = দোল ] ; চল্ + অ = চল ; দিব্ + অ = দেয় ; বেড়্ + অ = বেড় ; সাজ্ + অ = সাজ ।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : ‘মরীয়ার মুখে মারণের বাণী উঠিতেছে মার মার।’ ‘বহি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলে রে।’ ‘বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও।’ ‘দে দোজ দোজ।’ সে আজ মণিপুরী নাচ নাচবে।

—অত, অতি : ‘অত’-প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলি বিশেষণ ; কিন্তু ‘অতি’-প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলি বিশেষ্য। বস্ + অত = বসত ; মান্ + অত = মানত ; ফিব্ + অত = ফেরত ; পার্ + অত = পারত ; বস্ + অতি = বসতি ।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : শেষে বসন্তবাটী বিক্রী করে তিনি কান্দীবাটী হয়েছেন। পার্শ্বতপকে তিনি সেখানে বান না। সন্ধানের আরোগ্যের জন্ম হা মন্দিরে মালতী করিলেন। গ্রামে বহলোকের বসতি।

—**অন** : ভাববাচ্যে, কারকবাচ্যে ও ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বুঝাইতে এই প্রত্যয় হয়। নিম্ন শব্দগুলি কৃদন্ত বিশেষ্য [ Verbal Noun ]। নড়্ + অন = মড়ন, বাঁচ্ + অন = বাঁচন; সাজ্ + অন = সাজন; বাঁধ্ + অন = বাঁধন; কাঁদ্ + অন = কাঁদন; ধব্ + অন = ধরন; গড়্ + অন = গড়ন; বাড়্ + অন = বাড়ন; চড়্ + অন = চড়ন; ঘুব্ + অন = ঘুরন; পব্ + অন = পরন; চল্ + অন = চলন; লেখ্ + অন = লেখন; বল্ + অন = বলন; ভাঙ্ + অন = ভাঙন; সাধ্ + অন = সাধন; দেখ্ + অন = দেখন; ভাব্ + অন + আ = ভাবনা; গাঁথ্ + অন = গাঁথন; কাঁপ্ + অন = কাঁপন; বাড়্ + অন = বাড়ন।

**বিশিষ্ট প্রয়োগ** : ‘প্রলয়-নাচন নাচলে যখন আপন ভুলে, নটরাজ, জটীর বাঁধন পড়ল খুলে।’ ‘লুটিয়ে-পড়া কিসের কাঁদন উঠেছে আজ নবীন ধানে।’ মেয়েটির চলন-বলন ভালো নয়। ‘আসে নির্দয় নব-ঘোবন ভাঙনের মহারথে।’

—**অনা, না** : নিম্ন শব্দগুলি বিশেষ্য। লাহ্ + অনা = লাঞ্ছনা; গঙ্ + অনা = গঞ্ছনা; বব্ + অনা = বরনা; বাজ্ + না = বাজনা; বাট্ + না = বাটনা; রাঁধ্ + না = রান্না; কাঁদ্ + না = কান্না; কাট্ + না = কাটনা, খুল্ + অনা = খুলনা; ছল্ + অনা = ছোলনা; মাগ্ + না = মাগনা; ধব্ + না = ধরনা; খেল্ + না = খেলনা; ফেল্ + না = ফেলনা; ঢাক্ + না = ঢাকনা; কুট্ + না = কুটনা; কব্ + না = করনা [ > কন্ন ]।

**বিশিষ্ট প্রয়োগ** : ‘শিলং পর্বতে বারনার জল বেড়ে উঠল।’ ‘কান্নাহাসির দোলদোলানো পৌষ-ফাগুনের পালা।’ ‘ফুলডোরে বাঁধা খুলনা।’ ‘গাজনের বাজনা বাজা।’ ‘নিয়ে যাবে মোরে সব লাঞ্ছনা হতে।’

—**আও** : নিম্ন শব্দ বিশেষ্য। ঘিব্ + আও = ঘেরাও; ফল্ + আও = ফলাও; চড়্ + আও = চড়াও; পাকড়্ + আও = পাকড়াও; ঢাল্ + আও = ঢালাও; লাগ্ + আও = লাগাও।

**বিশিষ্ট প্রয়োগ** : ভোরবেলা পুলিশ ওদের বাড়ি ঘেরাও করলো। পরের দিন থবরের কাগজে ঘটনাটা ফলাও করে ছাপা হলো।

—**তি** : এই প্রত্যয় যোগে ভাব-বাচক বিশেষ্য ও বিশেষণ গঠিত হয়। কাজেই, নিম্ন শব্দ কৃদন্ত বিশেষ্য ও কৃদন্ত বিশেষণ [ Verbal Noun ও Verbal Adjective ]। ঘাট্ + তি = ঘাট্‌তি; ভব্ + তি = ভব্‌তি; কম্ + তি = কম্‌তি; ফিব্ + তি = ফিব্‌তি; চল্ + তি = চল্‌তি; বড়্ + তি = বড়্‌তি; পড়্ + তি = পড়্‌তি; উঠ্ + তি = উঠ্‌তি; বাড়্ + তি = বাড়্‌তি; কাট্ + তি = কাট্‌তি; গুণ্ + তি = গুণ্‌তি; বস্ + তি = বস্‌তি; ভাঙ্ + তি = ভাঙ্‌তি।

**বিশিষ্ট প্রয়োগ** : চল্‌তি গাড়িতে কখনো উঠো না। ফিব্‌তি ট্রেনেই চলে এসো। সে এখন পাড়ার উঠ্‌তি গুণ্ডা। এই বইয়ের বেশ কাট্‌তি। বড়্‌তি

—**আরি, উরি** : করণবাচ্যে এই প্রত্যয় হয়। নিম্ন শব্দ বিশেষ্য। কাট্+আরি=কাটারি [ কাটারী ] ; ধুন্+আরি=ধুনারি ; ধুন্+উরি=ধুহুরি ; ভিৎ+আরি=ভাখারি ; ডুব্+আরি=ডুবারি ; ডুব্+উরি=ডুবুরি।

**বিশিষ্ট প্রয়োগ** : ‘ডুবুরি জলে মূকতা খোজে।’ ‘তুমি মোরে, হে ভিখারি, মার কাছ হতে কাড়ি করেছ আপন অমুচর।’

—**উ** : নিম্ন শব্দ বিশেষণ [ কখনও কখনও বিশেষ্য ] হয়। নিব্+উ=নিবু ; ডুব্+উ=ডুবু ; হ+ব্=হবু ; উড়্+উ=উডু ; বগড়্+উ=বগড়ু ; হাঁট্+উ=হাঁটু ; ঝাড়্+উ=ঝাড়ু ; চাল্+উ=চালু ; ঢাল্+উ=ঢালু।

**বিশিষ্ট প্রয়োগ** : ‘শান্তিপুত্র ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়।’ নিবু নিবু দীপের আলোয় দেয়ালে ছায়াগুলি কাঁপিতে লাগিল। ‘বৈশাখ মাসে তায় হাঁটুজল থাকে।’ কথাটা এখন খুব চালু।

—**উনি** : নিম্ন শব্দ বিশেষ্য। খাট্+উনি=খাটুনি ; জন্+উনি=জলুনি ; চাল্+উনি=চালুনি ; বক্+উনি=বকুনি ; পিট্+উনি=পিটুনি ; কাপ্+উনি=কাটুনি ; কাপ্+উনি=কাপুনি।

**বিশিষ্ট প্রয়োগ** : ‘খাটুনি যে ভালো ছিল জলুনির চেয়ে।’

### ● সংস্কৃত তদ্ধিত-প্রত্যয়

—**ঋ [ই]** : অপত্য অর্থে নিম্ন শব্দ বিশেষ্য। দশরথ্+ঋ=দাশরথি ; রাবণ্+ঋ=রাবণি ; অজুন্+ঋ=অজুনি ; সমিত্রা+ঋ=সৌমিত্রি ; ভগীরথ্+ঋ [ +ঈ—ঙী ] =ভাগীরথী [ ভগীরথ-আনীত নদী ] ; সত্যক্+ঋ=সত্যকি ; অরুণ্+ঋ=আরুণি ; দ্রোণ্+ঋ=দ্রোণি।

**বিশিষ্ট প্রয়োগ** : ‘উত্তরিলে কাতরে রাবণি।’ ‘দিব্যরথে দাশরথি পশিলা সংগ্রামে।’ ‘নাদিলা সৌমিত্রি শূর নির্ভয় হৃদয়ে।’ ভাগীরথীর উভয় তীরে পঞ্চবটীছায়াচ্ছন্ন গ্রামগুলি দাঁড়াইয়া আছে।

—**ঋগ্ন [এয়]** : অপত্য অর্থে নিম্ন শব্দ প্রধানতঃ বিশেষ্য। কুন্তী+ঋগ্ন=কৌন্তেয় ; গন্ধা+ঋগ্ন=গান্ধেয় ; নিকষা+ঋগ্ন=নৈকষেয় ; বিমাতৃ+ঋগ্ন=বৈমাত্রেয় ; ভগিনী+ঋগ্ন=ভাগিনেয় ; কৃত্তিকা+ঋগ্ন=কাতিকৈয় ; রাধা+ঋগ্ন=রাধেয় ; অত্রি+ঋগ্ন=আত্রেয় ; ইতরা+ঋগ্ন=ঐতরেয় ; অহিকা+ঋগ্ন=আহিকৈয় ; সরমা+ঋগ্ন=সারমেয় ; বিনতা+ঋগ্ন=বৈনতেয়। [ ভাব অর্থে ] অগ্নি+ঋগ্ন=আগ্নেয় ; পুরুষ+ঋগ্ন=পৌরুষেয় ; অতিথি+ঋগ্ন=আতিথেয় ; পথ্+ঋগ্ন=পাথেয় [ রাস্তা-থরচ ]।

**বিশিষ্ট প্রয়োগ** : বিহুব্রিয়াস এক জীবন্ত আগ্নেয় পর্বত। বেদ হিন্দুগণের নিকট অপৌরুষেয়। মহাপুরুষগণের আদর্শই আমাদের জীবন-যাত্রার পাথর।

—**ফায়ন [আয়ন]** : অপত্য [পুত্র] অর্থে নিম্ন শব্দ বিশেষ্য। দক্ষ্+ফায়ন=দাক্ষায়ণ ; বৎস্+ফায়ন=বাৎসায়ণ ; [ অন্তান্ত অর্থে ] : রাম্+ফায়ন=রামায়ণ ; রস্+ফায়ন=রসায়ন ; বীপ্+ফায়ন=বৈপায়ন।

**বিশিষ্ট প্রয়োগ :** ‘এশিয়া বে নয় কুলিরই আলয় প্রমাণ করিল যেবা, কুলিতে জাংগায়ে মহামানবতা নর-নারায়ণ সেবা।’ ‘রামায়ণের তুমিই মোদের বাম্বীকি আশ্রম।’

—**ফী [ ফী ] :** সৰ্ব্ব অর্থে নিম্ন শব্দ বিশেষণ। রাষ্ট্র+ফী=রাষ্ট্রীয়; জাতি+ফী=জাতীয়। বায়ু+ফী=বায়বীয়; পান+ফী=পানীয়; স্বর্গ+ফী=স্বর্গীয়; মানব+ফী=মানবীয়; দানব+ফী=দানবীয়; দেশ+ফী=দেশীয়।

**বিশিষ্ট প্রয়োগ :** জাতীয় ভাবধারা হইতে রাষ্ট্রীয় চেতনার উদ্ভব।

—**ফিক [ ইক ] :** সৰ্ব্ব অর্থে নিম্ন শব্দ বিশেষণ। নীতি+ফিক=নৈতিক; রাষ্ট্র+ফিক=রাষ্ট্রিক; জগৎ+ফিক=জাগতিক; ত্রায়+ফিক=নৈয়ামিক; লোক+ফিক=লৌকিক; ভূগোল+ফিক=ভৌগোলিক; ভূমি+ফিক=ভৌমিক; শরীর+ফিক=শারীরিক; পুরাণ+ফিক=পৌরাণিক; পরলোক+ফিক=পারলৌকিক; সমাজ+ফিক=সামাজিক; ইতিহাস+ফিক=ঐতিহাসিক; মূল+ফিক=মৌলিক; পরমাণু+ফিক=পারমাণবিক; নগর+ফিক=নাগরিক; দেহ+ফিক=দৈহিক; অণু+ফিক=আণবিক; চরিত্র+ফিক=চারিত্রিক; পুত্র+ফিক=পারিত্রিক; বিদ্যা+ফিক=বৈদ্যতিক; অন্তর+ফিক=আন্তরিক; বিজ্ঞান+ফিক=বৈজ্ঞানিক; দ্বার+ফিক=দৌবারিক; যোগ+ফিক=যোগিক; গিরি+ফিক=গৈরিক; রসায়ন+ফিক=রাসায়নিক; পথ+ফিক=পথিক; অধুনা+ফিক=আধুনিক; সম্প্রতি+ফিক=সাম্প্রতিক; অত্যন্ত+ফিক=আন্তান্তিক; প্রত্যহ+ফিক=প্রাত্যহিক; বিষয়+ফিক=বৈষয়িক; রাজনীতি+ফিক=রাজনৈতিক [ রাজনীতিক ]; অর্থনীতি+ফিক=অর্থনৈতিক [ অর্থনীতিক ]; অহন+ফিক=আহিক; দিন+ফিক=দৈনিক; মাস+ফিক=মাসিক; নির্ব্যক্তি+ফিক=নৈর্ব্যক্তিক; বর্ষ+ফিক=বার্ষিক; পঞ্চবর্ষ+ফিক=পঞ্চবার্ষিক; সম্প্রদায়+ফিক=সাম্প্রদায়িক; বিদেশী+ফিক=বৈদেশিক; উপনিবেশ+ফিক=ঔপনিবেশিক; সাম্রাজ্য+ফিক=সাম্রাজ্যিক; প্রদেশ+ফিক=প্রাদেশিক; বৎসর+ফিক=বাৎসরিক; অতীত+ফিক=আতীত; পরম্পর+ফিক=পারম্পরিক; ভূত+ফিক=ভৌতিক; পঞ্চভূত+ফিক=পঞ্চভৌতিক; অধিদেব+ফিক=আধিদৈবিক; জীব+ফিক=জৈবিক; জীবন+ফিক=জৈবনিক; অধ্যাত্ম+ফিক=আধ্যাত্মিক; সত্ত্ব+ফিক=সাত্বিক; রাজ+ফিক=রাজসিক; তম+ফিক=তামসিক; অজ্ঞ+ফিক=আজ্ঞিক; অকস্মৎ+ফিক=আকস্মিক; এছাগার+ফিক=এছাগারিক; অভ্যন্তর+ফিক=আভ্যন্তরিক; সময়+ফিক=সাময়িক; সমুদ্র+ফিক=সামুদ্রিক; বেতাল+ফিক=বৈতালিক; বিতান+ফিক=বৈতানিক; বিকাল+ফিক=বৈকালিক; বেদ+ফিক=বৈদিক; উপনিষদ্+ফিক=ঔপনিষদিক; মনস্+ফিক=মানসিক; চন্দ্র+ফিক=চান্দসিক; বেদান্ত+ফিক=বৈদান্তিক; শিল্প+ফিক=শৈল্পিক; সাহিত্য+ফিক=সাহিত্যিক; সংকেত+ফিক=সাংকেতিক; কাব্য+ফিক=কাব্যিক; প্রশাসন+ফিক=প্রশাসনিক; পিতৃ+ফিক=পৈতৃক;

[ গৈত্রিক—অশুদ্ধ ] ; অলংকার+ক্ষিক=আলংকারিক ; মুখ+ক্ষিক=মৌখিক ; গণতন্ত্র+ক্ষিক=গণতান্ত্রিক ; সমাজতন্ত্র+ক্ষিক=সমাজতান্ত্রিক ; হিপ্রাহর+ক্ষিক=হিপ্রাহরিক ; ইহ+ক্ষিক=ঐহিক ; তত্ত্ব+ক্ষিক=তাত্ত্বিক ; পরমার্থ+ক্ষিক=পারমার্থিক ; কায়+ক্ষিক=কায়িক ; তর্ক+ক্ষিক=তর্কিক ; মানব+ক্ষিক=মানবিক ; দানব+ক্ষিক=দানবিক ; উপকূল+ক্ষিক=উপকৌলিক [ ঔপকূলিক ] ; সংঘাত+ক্ষিক=সংঘাতিক ; প্রকৃতি+ক্ষিক=প্রাকৃতিক ; পরিপার্শ্ব+ক্ষিক=পারিপার্শ্বিক ; ব্যবসায়+ক্ষিক=ব্যবসায়িক ; ধর্ম+ক্ষিক=ধার্মিক ; সংবাদ+ক্ষিক=সাংবাদিক ।

**বিশিষ্ট প্রয়োগ :** ‘ফেরে ঘারে দৌবারিক ।’ পৌরাণিক যুগ হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত নানা অর্থহীন লৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড আমাদের সামাজিক অগ্রগতিকে ব্যাহত করিয়া আসিতেছে। বৈদেশিক শাসনমুক্ত হইয়া ভারত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পথে যাত্রা করিয়াছে। ‘যে বিচারক বা নৈসর্গিক, কল্পনিকালে কেহ তাহাকে কিছু বুঝাইতে পারে না ।’

—মতুপ্, বতুপ্ : ‘আছে’ এই অর্থে ব্যবহৃত হয় ; নিম্ন শব্দ বিশেষ্য । বুদ্ধি+মতুপ্=বুদ্ধিমান ; আয়ুঃ+মতুপ্=আয়ুমান ; চক্ষুঃ+মতুপ্=চক্ষুমান ; ধী+মতুপ্=ধীমান ; বিজ্ঞা+বতুপ্=বিজ্ঞাবান্ ; রূপ+বতুপ্=রূপবান্ ; গুণ+বতুপ্=গুণবান্ ; শক্তি+মতুপ্=শক্তিমান্ ; বল+বতুপ্=বলবান্ ; প্রজ্ঞা+বতুপ্=প্রজ্ঞাবান্ ; জ্ঞান+বতুপ্=জ্ঞানবান্ ; চরিত্র+বতুপ্=চরিত্রবান্ ; পুণ্য+বতুপ্=পুণ্যবান্ ; স্বাস্থ্য+বতুপ্=স্বাস্থ্যবান্ ; ধন+বতুপ্=ধনবান্ ; ভাগ্য+বতুপ্=ভাগ্যবান্ ; সার+বতুপ্=সারবান্ ; প্রজা+বতুপ্=প্রজাবান্ ; সৌভাগ্য+বতুপ্=সৌভাগ্যবান্ ; লক্ষ্মী+মতুপ্=লক্ষ্মীবান্ । [ মূল শব্দে ‘ম’ আছে বলিয়া ‘মতুপ্’ হলে ‘বতুপ্’ হইয়াছে । ]

**বি. দ্র. :** মান্ ও বান্ স্থানে জীলিঙ্গে যথাক্রমে ‘মতী’ ও ‘বতী’ হয় । যেমন : বুদ্ধিমান—বুদ্ধিমতী [ জীলিঙ্গ ], গুণবান্—গুণবতী [ স্ত্রীলিঙ্গ ] ।

**বিশিষ্ট প্রয়োগ :** ‘বুধা এ সাধনা, ধীমান্ ।’ কতিপয় বুদ্ধিমান্ ও জ্ঞানবান্ ব্যক্তিই সমগ্র সমাজটাকে শাসন করিতেছে। তাঁহার দ্বারা জ্ঞানবান্ এবং চরিত্রবান্ ব্যক্তি এতদঞ্চলে দুর্লভ। ‘আমার এ জীবনের সন্ধ্যায় প্রভাতে কাছে থাক লব্ধশক্তিমান্ ।’

—ইন্ [ ঈ ] : ‘আছে’ এই অর্থে ব্যবহৃত হয় ; নিম্ন শব্দ বিশেষ্য । গুণ+ইন্=গুণী ; ধন+ইন্=ধনী ; প্রাণ+ইন্=প্রাণী ; জ্ঞান+ইন্=জ্ঞানী ; মান+ইন্=মানী ; হস্ত+ইন্=হস্তী ; কর+ইন্=করী ; শিখা+ইন্=শিখী ; কণা+ইন্=কণী ; শব্দ+ইন্=শব্দী ; বোগ+ইন্=বোগী ; তাবুল+ইন্=তাবুলী । তেমনি—অণী, দস্তী, শূলী, বলী, সঙ্গী, রোগী, পক্ষী, প্রতিবোগী, অহুরাগী ইত্যাদি ।

**বিশিষ্ট প্রয়োগ :** ‘ওগো গুণী, কাছে থেকে দূরে যারা তাহারের বাণী যেন শুনি ।’ ‘যে ধনে হইয়া ধনী, মানীয়ে মান না মানী তাহারি খানিক ।’ ‘সমাজের ধনবৃদ্ধির অর্থ ধনীর ধনবৃদ্ধি ।’ ‘সুতা কিনা আনি যেন মণিহারা কলী ।’



—**ময়ট্** [ ময় ] : বিকারার্থে ব্যবহৃত হয় ; নিম্ন শব্দ বিশেষণ । গুণ+ময়ট্ = গুণময় ; কৃপা+ময়ট্ = কৃপাময় ; শূন্য+ময়ট্ = শূন্যময় ; হিরণ্য [ 'ব' লুপ্ত ] +ময়ট্ = হিরণ্যময় ; চিৎ+ময়ট্ = চিন্ময় ; বাক্+ময়ট্ = বাঙ্ময় ; স্বর্ণ+ময়ট্ = স্বর্ণময় ; আলোক+ময়ট্ = আলোকময় ; গো+ময়ট্ = গোময় ; জ্যোতিঃ+ময়ট্ = জ্যোতির্ময় । তেমনি—মধুময়, ধূলিময়, জলময়, মেঘময়, হেমময়, প্রজ্ঞাময়, প্রাণময়, স্নেহময়, ছন্দোময়, শোভাময়, স্বপ্নময়, বাণীময়, মণিময়, তন্ময়, মায়াময়, প্রেমময়, দুঃখময়, করুণাময়, আনন্দময়, মহিমময়, মনোময়, পৃথিবীময়, বিশ্বময়, বনময়, অরণ্যময়, শিলাময়, প্রসন্নময় ইত্যাদি ।

**বিশিষ্ট প্রয়োগ :** ‘ওগো দয়াময়, তুমি থাক সাথে সাথে প্রাণে বল করহ বিধান ।’ ‘সকলি কি স্বপ্নময় মায়াময় ছায়া দিয়ে লেখা ?’ ‘ভেঙেছে দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময় ।’ ‘এ হ্যালোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি ।’ ‘মৃন্ময়ী প্রতিমা হয়ে উঠবে চিন্ময়ী ।’

—**বিন্** [ বি ] : ‘আছে’ অর্থে ব্যবহৃত হয় ; নিম্ন শব্দ বিশেষণ । যশস্+বিন্ = যশস্বী ; মায়্যা+বিন্ = মায়্যাবী ; তেজস্+বিন্ = তেজস্বী । তেমনি—মেধাবী, তপস্বী, মনস্বী, ওজস্বিনী [ ভাষা ], শ্রোতস্বিনী [ নদী ] ।

**বিশিষ্ট প্রয়োগ :** মায়্যাবী মারীচ সোনার হরিণের বেশ ধারণ করিয়া কুটিরের সম্মুখে থেলা করিতে লাগিল । তিনি ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিতে লাগিলেন ।

—**ঈন** : ভাব অর্থে নিম্ন শব্দ বিশেষণ । গ্রাম+ঈন = গ্রামীণ ; কুল+ঈন = কুলীন ; প্রাচ্+ঈন = প্রাচীন ; সর্বাচ্+ঈন = সর্বাচীন ; সর্বজন+ঈন = সার্বজনীন বা সর্বজনীন ; স্বরণীয় : সার্বজনীন [ সর্বজন-সংজ্ঞীয় ] ; সর্বজনীন [ সর্বজনের কল্যাণ-কর ] । কাল+ঈন = কালীন ; কচ্ছা+ঈন = কানীন ; শালা [ আলায় ] +ঈন = শালীন ; তৎকাল+ঈন = তৎকালীন ; অর্বাচ+ঈন = অর্বাচীন ; সম্মুখ+ঈন = সম্মুখীন ; অভ্যন্তর+ঈন = অভ্যন্তরীণ ; নব+ঈন = নবীন ; বিশ্বজন+ঈন = বিশ্বজনীন ।

**বিশিষ্ট প্রয়োগ :** এখন পল্লীতে পল্লীতে সার্বজনীন পূজার প্রচলন দেখা যায় । ‘প্রাচীন ভারতে সার্বজনীন শিকার ছিল অব্যাহত-দ্বার ।’ গ্রামীণ শিল্পের উন্নতি ব্যতীত গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতি সম্ভব নয় । ‘পরম কুলীন স্বামী বন্দ্যবংশধার ।’ কর্ণ ছিলেন কুস্তার কানীন পুত্র ।

—**ইতচ্** [ ইত ] : জাত অর্থে নিম্ন শব্দ বিশেষণ । স্বরা+ইতচ্ = স্বরিত ; লঙ্কা+ইতচ্ = লঙ্কিত । যুচ্+ইতচ্ = যুচ্ছিত ; পুষ্প+ইতচ্ = পুষ্পিত । তেমনি—ফলিত, তরঙ্গিত, কল্লোলিত, পুষ্কিত, মগ্নিত, মুহূর্তিত, কুহুমিত, হিল্লোলিত, পিপাসিত, পণ্ডিত [ পণ্ডা+ইতচ্ ] ইত্যাদি ।

**বিশিষ্ট প্রয়োগ :** ‘বর্ষণ-গীত হল মুখরিত মেঘমগ্নিত ছন্দে ।’ ‘ভুরিতে নামায় পাল নদীপথে জন্ত তরী বত ।’ ‘মুহূর্তিত জীবনের রেণুগুলি রয়েছে ছড়ানো ও পথের ধূলি ‘পরে ।’ ‘তারুণ্যের সোনার স্বপন কণিকার সাথে সাথে হয়ে আছে

পুষ্পিত কাঞ্চন।’ ‘কেনাইয়া উঠে বঙ্কিত বৃকে পুষ্পিত অভিমান।’ ‘বিকৃষিত বিশ্ববাসনার অরবিন্দ-মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার।’ ‘দার লাগি ফিরি একা একা আঁখি পিপাসিত নাহি দেখা।’

—ইমন্ [ইম] : ভাব অর্থে নিম্পন্ন শব্দ বিশেষণ ; ‘আ’-প্রত্যয়ান্ত হইলে বিশেষ্য।  
 লঘু+ইমন্+আ=লঘিমা ; চন্দ্র+ইমন্+আ=চন্দ্রিমা ; নীল+ইমন্+আ=নীলিমা ;  
 রক্ত+ইমন্+আ=রক্তিমা ; শ্রামল+ইমন্+আ=শ্রামলিমা ; গুরু+ইমন্+  
 আ=গরিমা ; মধুর+ইমন্+আ=মধুরিমা ; অগ্নু+ইমন্+আ=অগ্নিমা ; দীর্ঘ+  
 ইমন্+আ=দ্রাঘিমা ; মহৎ+ইমন্+আ=মহিমা ; তনু+ইমন্+আ=তনিমা ;  
 কালি+ইমন্+আ=কালিমা ; জড়+ইমন্+আ=জড়িমা ; শোণ+ইমন্+আ=  
 শোণিমা। [ স্বার্থে ] : বহ+ইমন্+আ=ভূমা । কিন্তু রক্ত+ইমন্=রক্তিম।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : ‘শ্রামলে শ্রামল তুমি নীলিমায় নীল।’ ‘শোকের কালিমা যুগ যুগ ধরি তোমার আঁধার দিয়াছে বেগড়ি।’ ‘হেথা মত্ত ক্ষীতক্ষুর্ত ক্ষত্রিয়-মহিমা, হোথা স্তব্ধ মহামৌন ব্রাহ্মণ-মহিমা।’ ‘জগতের অক্ষধারে ধৌত তব তত্ত্বর তনিমা, ত্রিলোকের হৃদি-রক্তে আঁকা তব চরণ-শোণিমা।’

—ল : আছে অর্থে নিম্পন্ন শব্দ বিশেষণ। পাংশু+ল=পাংশুল ; মাংস+ল=মাংসল ; শ্রাম+ল=শ্রামল ; শীত+ল=শীতল ; ধূম+ল=ধূমল ; বহ+ল=বহল ;  
 হিম+ল=হিমল ; পিঙ্গ+ল=পিঙ্গল ; কপি+ল=কপিল ; শ্রী+ল=শ্রীল ;  
 কুশ+ল=কুশল ; বৎস+ল=বৎসল ; পেশ+ল=পেশল ; মঞ্জু+ল=মঞ্জুল ;  
 মুহু+ল=মুহুল ; উর্মি+ল=উর্মিল।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : ‘ধরণীতল হল শীতল চিকন আভায় ভ’রে।’ ‘শ্রামল নবন নববরবার কিশোর দূত কি এলে?’ ‘ধূসর পাংশুল মাঠ, ধেনুগণ ধায় উর্বমুখে।’ ‘পশ্চিমে বিচ্ছিন্ন মেঘে সায়াহ্নের পিঙ্গল আভাস রাঙাইছে আঁখি।’

—ইল : আছে অর্থে নিম্পন্ন শব্দ বিশেষণ। ফেন+ইল=ফেনিল ; সর্প+ইল=সর্পিল ; জটা+ইল=জটিল ; পঙ্ক+ইল=পঙ্কিল ; কুট+ইল=কুটিল ; পিচ্ছা+ইল=পিচ্ছিল ; শঙ্কা+ইল=শঙ্কিল।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : ‘তোমার মোহন এল ভীষণ বেশে, আকাশ-ঢাকা জটিল কেশে।’ ‘ঘোর-কুটিল পহু তার, লোভ-জটিল বন্ধ।’ ‘ওঁহি অতি শঙ্কিল পঙ্কিল বাট।’ ‘মন্ত্রমুগ্ধ চরণে ফেনিল জলধি গরজে জলদমদ্র।’

—র : আছে অর্থে নিম্পন্ন শব্দ প্রধানতঃ বিশেষণ। মধু+র=মধুর ; মৃৎ+র=মৃৎর ; নখ+র=নখর ; পাণ্ডু+র=পাণ্ডুর ; উষ+র=উষর ; নগ+র=নগর ; ধূম+  
 র=ধূম্র।

—তন : ভাব অর্থে নিম্পন্ন শব্দ বিশেষণ। পুরা+তন=পুরাতন ; সনা+তন=সনাতন ; চিরম্+তন=চিরন্তন ; নব+তন=নবতন>নূতন ; সায়ম্+তন=সায়ন্তন ; তদানীম্+তন=তদানীন্তন ; অত্ন+তন=অত্নতন ; পূর্ব+তন=পূর্বতন ;

অধুনা+তন=অধুনাতন; ইদানীম্+তন=ইদানীন্তন; নক্তম্ [রাত্রি]+তন=নক্তন্তন; অধঃ+তন=অধন্তন; উর্ধ্ব+তন=উর্ধ্বতন; প্রাক্+তন=প্রাক্তন।

বিশিষ্ট প্রয়োগ: 'নুতন করিয়া লহ আরবার চির-পুরাতন মোরে।' 'সাম্রাজ্যের রাস্তা ফুলের গন্ধ হাওয়ার' পরে অন্ধবিহীন আলিঙ্গনে সকল অন্ধ ভরে।' বাংলার কৃষক-সমাজের দারিদ্র্য চিরন্তন। সনাতন ভারতীয় রীতিতে তাঁহার। আত্মদিককে সংবর্ধনা জানাইলেন।

## ● বাংলা তদ্ধিত-প্রত্যয়

—ই, ঈ: সংযোগ, সম্বন্ধ, শীল, জাতি, ব্যবসায়, বৃত্ততা ইত্যাদি অর্থে নিম্ন শব্দ বিশেষত্ব ও বিশেষণ। দেশ+ই=দ্বিশি; বিলাত+ই=বিলাতি; বাঙ্গাল+ই=বাঙ্গালি; ডাক্তার+ই=ডাক্তারি; মাস্টার+ই=মাস্টারি; সওদাগর+ই=সওদাগরি; জমিদার+ই=জমিদারি; ছোরা+ই=ছুরি; গোলা+ই=গুলি; ছাতা+ই=ছাতি; ধাতা+ই=ধাতি, জাতি। দাম+ঈ=দামী; ভার+ঈ=ভারী; দরদ+ঈ=দরদী; মরম+ঈ=মরমী; গরম+ই=গরমী [গমি]। উৎপন্ন অর্থে নিম্ন শব্দ বিশেষণ: দেশ+ঈ=দেশী; বিলাত+ঈ=বিলাতী; বিহার+ঈ=বিহারী; জাপান+ঈ=জাপানী; বুদ্ধাবন+ঈ=বুদ্ধাবনী; কামরূপ+ঈ=কামরূপী; কটক+ঈ=কটকী; পাণ্ডাব+ঈ=পাণ্ডাবী; গুজরাট+ঈ=গুজরাটী; মাদ্রাজ+ঈ=মাদ্রাজী; শান্তিপুর+ঈ=শান্তিপুরী; কাশ্মীর+ঈ=কাশ্মীরী; জোনপুর+ঈ=জোনপুরী; বেনারস+ঈ=বেনারসী। নিপুণ অর্থে নিম্ন শব্দ বিশেষণ: সেতার+ঈ=সেতারী; শিকার+ঈ=শিকারী; ধ্রুপদ+ঈ=ধ্রুপদী; হিসাব+ঈ=হিসাবী; মজলিস+ঈ=মজলিসী। জীবিকা অর্থে নিম্ন শব্দ বিশেষত্ব: চাষ+ঈ=চাষী; ঢাক+ঈ=ঢাকী; তোল+ঈ=তুলী; তেল+ঈ=তেলী; করাত+ঈ=করাতী। উপাদান অর্থে নিম্ন শব্দ বিশেষণ: রেশম+ঈ=রেশমী; মৃত্তা+ঈ=মৃত্তী। সম্বন্ধ অর্থে নিম্ন শব্দ বিশেষত্ব: পসার+ঈ=পসারী; দোকান+ঈ=দোকানী; কয়েদ+ঈ=কয়েদী; তাঁড়ার+ঈ=তাঁড়ারী। [বিশেষণ অর্থে] বাদাম+ঈ=বাদামী; আসমান+ঈ=আসমানী; জাকরান+ঈ=জাকরানী; প্রণাম+ই=প্রণামী; নমস্কার+ঈ=নমস্কারী; আশীর্বাদ+ঈ=আশীর্বাদী; সেলাম+ঈ=সেলামী; দর্শন+ঈ=দর্শনী।

বিশিষ্ট প্রয়োগ: 'বাদল করেছে, গমি আর নেই।' 'চাষী উপবাসী থাকিতে না দেয়, নট তারে তোবে নৃত্যে গানে।' 'তাঁতী, তিলি, মালী সমান ভালো।' 'জাপানীরা ফুল খুব ভালোবাসে।' 'দোকানী পসারীরা আজ হাটে যায় নাই।' 'শালওয়ালারা ভাল ভাল পশ্চিমী শাল ও ক্রমাল লইয়া আসিত।' 'পশ্চিমী ক্ষেত্রীরা বেনারসী ও ঢেলীর ছোড় লইয়া উপহিত হইত।'।

—মি: তাব অর্থে নিম্ন শব্দ বিশেষত্ব। বড়ো+মি=বড়োমি; ছুই+মি=ছুইমি; ছেল+মি=ছেলমি; গৌড়া+মি=গৌড়ামি; গুণ্ডা+মি=গুণ্ডামি।

**বিশিষ্ট প্রয়োগ :** ‘আমি যদি ছুট্টুমি করে চাপার গাছে চাপা হয়ে ফুটি।’  
ধর্মীয় গৌড়ামি বর্তমান কালে নিশ্চিহ্নপ্রায়। তোমার বুড়োমি আর সহ হয় না।

—**আমি :** ভাব অর্থে নিম্ন শব্দ বিশেষ্য। পাগল+আমি=পাগলামি ; জেঠা+আমি=জেঠামি ; ভণ্ড+আমি=ভণ্ডামি ; ধূর্ত+আমি=ধূর্তামি ; পাকা+আমি=পাকামি ; জ্বাকা+আমি=জ্বাকামি ; ভাঁড়+আমি=ভাঁড়ামি ; বাদর+আমি=বাদরামি ; ছুট্ট+আমি=ছুট্টামি ; ফাজিল+আমি=ফাজলামি ; [দক্ষতা অর্থে] ঘর+আমি=ঘরামি।

**বিশিষ্ট প্রয়োগ :** ‘শিকলদেবীর এই যে পূজাবেনী—চিরকাল কি রইবে খাড়া ?—পাগলামি, তুই আয়রে ছয়ার ভেদি।’ বক-ধামিকদের ভণ্ডামি সহ করা যায় না। তুমি আর জেঠামি করো না।

**আর :** কর্ম অর্থে নিম্ন শব্দ বিশেষ্য। ভাঁড়+আর=ভাঁড়ার ; মাঝ+আর=মাঝার ; চাম+আর=চামার ; কাম+আর=কামার ; কুম [ > কুস্ত ]+আর=কুমার [ > কুমোর ]।

**বিশিষ্ট প্রয়োগ :** ‘সবারি রয়েছে কাজ এ বিশ্ব-মাঝার।’ ‘বাউরী, চামার কাওয়, তেওয়ার, পাটনী, কোটাল, কপালী, মালো, বামুন, কায়েৎ, কামাফ, কুমোর, তাঁতী, তিলি, মালী সমান ভালো।’

—**আরি :** প্রকার অর্থে নিম্ন শব্দ বিশেষ্য ও বিশেষণ দুইই হয়। মাঝ+আরি=মাঝারি ; কাট+আরি=কাটারি ; ভুখ+আরি=ভুখারি ; রকম+আরি=রকমারি।

**বিশিষ্ট প্রয়োগ :** ‘ভুখারি কিরিয়া চলে।’ কাল রাতে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি হয়েছে।

—**আরী :** কর্ম ও সম্বন্ধ অর্থে নিম্ন শব্দ বিশেষ্য। ভিখ+আরী=ভিখারী ; কাঁসা+আরী=কাঁসারী ; পূজা+আরী=পূজারী ; শাঁখা+আরী=শাঁখারী ; বিখ+আরী=বিখারী ; দিশ+আরী=দিশারী।

**বিশিষ্ট প্রয়োগ :** ‘তুমি মোরে, হে ভিখারী, মার কাছ হতে কাড়ি করেছ আপন অহুচর।’ শাঁখারী ‘শাঁখা চাই’ ‘শাঁখা চাই’ বলিয়া ডাকিয়া গেল। পূজারী পূজায় বসিলেন।

—**আরু, রু :** বহন করা অর্থে নিম্ন শব্দ বিশেষ্য। বোমা+আরু=বোমারু। অস্ত্রাত্মক অর্থে নিম্ন শব্দ বিশেষ্য। দিশ+আরু=দিশারু ; শশ+আরু=শশারু ; সজা+রু=সজারু ; গো+রু=গোরু।

**বিশিষ্ট প্রয়োগ :** আকাশ-মুখে শত্রুপক্ষের একখানি বোমারু বিমান ধ্বংস হইয়াছে। ‘সঙ্গে শিশুগণ ফেরে, তাড়িয়া শশারু ধরে।’ ‘রাখাল মোরুর পাল লয়ে যায় মাঠে।’

—**ইয়া [ > এ ] :** সম্বন্ধ বা সংযোগ বুঝাইতে নিম্ন শব্দ বিশেষ্য। শহর+ইয়া

= শহরিয়া < শহরে ; পাড়া + গাঁ + ইয়া = পাড়াগাঁইয়া > পাড়ার্গৈয়ে ; লেকাল + ইয়া = লেকালিয়া > লেকেলে ; বারমাস + ইয়া = বারমাসিয়া [ > বারমেসে ] ; একপাশ + ইয়া = একপাশিয়া [ > একপেশে ] ; ঘোট + ইয়া = ঘুটিয়া > ঘুটে ; মাটি + ইয়া = মাটিয়া > মেটে ; হলুদ + ইয়া [ > এ ] = হলুদে ; বালি + ইয়া = বালিয়া > বেলে । নাও + ইয়া = নাইয়া > নেয়ে ; জাল + ইয়া = জালিয়া > জেলে ; পাহাড় + ইয়া = পাহাড়িয়া > পাহাড়ে ।

**বিশিষ্ট প্রয়োগ :** শহুরে মাহুরেরা পাড়ার্গৈয়ে মাহুরগুলোর সম্পর্কে চিরকালই উগ্রাসিক। ‘আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের ঘুটে মজুরের।’ ‘চালু সেয়ে বাঁধা দিহ্ন মাটিয়া পাথরা।’ ‘তাঁতি বসে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল।’

—উয়া [ > ও ] : সম্বন্ধ বা সংযোগ বুঝাইতে নিম্ন শব্দ বিশেষণ। ভাত + উয়া = ভাতুয়া > ভেতো ; মাঠ + উয়া = মাঠুয়া > মেঠো ; মাছ + উয়া = মাছুয়া > মেছো ; গাছ + উয়া = গাছুয়া > গেছো ; পট + উয়া = পটুয়া > পটো ; কাঠ + উয়া = কাঠুয়া > কেঠো ; ঝড় + উয়া = ঝড়ুয়া > ঝড়ো ; খড় + উয়া = খড়ুয়া > খড়ো ; বাত + উয়া = বাতুয়া > বেতো ; বান + উয়া = বাহুয়া > বেনো ; জল + উয়া = জলুয়া > জলো ; গৌর + উয়া = গৌরুয়া > গুঁফো ।

**বিশিষ্ট প্রয়োগ :** সকাল থেকে ঝড়ো হাওয়া বইছে। মেঠো স্থরে গান গেয়ে ধান কাটছে চাষী। ঘরের খড়ো চাল কতোকণ আর ঝড়ের দাপট সহিতে পারে ? বেতো ঘোড়াটাকে গাড়ীতে জুড়ে দিয়ে ভূতপূর্ব জমিদারবাবু মাঝে মাঝে হাওয়া খেতে বেরোন। আজ সমাজের রক্তে রক্তে অনেক বেলো ভল ঢুকে পড়েছে।

—উক : স্বভাব অর্থে নিম্ন শব্দ বিশেষণ ; উ : নিম্ন শব্দও বিশেষণ। ভাব + উক = ভাবুক ; পেট + উক = পেটুক ; লাজ + উক = লাজুক ; মিশ + উক = মিশুক ; চুম + উক = চুমুক ; ঢুট + উ = ঢুটু ; কান [ < কৃক ] + উ = কাহু ; নীচ + উ = নীচু ; উচ [ উচ্চ ] + উ = উচু ; পিছ + উ = পিছু ; ভীত + উ = ভীতু ; আগ + উ = আগু ; চুম + উ = চুমু ; সাঁতার + উ = সাঁতারু ।

—ট, টিয়া [ > টে ] : নিম্ন শব্দ বিশেষণ। তুলা + ট = তুলট ; ধুলা + ট = ধুলট ; দাপ + ট = দাপট ; ঝাপ + ট = ঝাপট ; তামা + টিয়া = তামাটিয়া > তামাটে ; সাদা + টিয়া = সাদাটিয়া > সাদাটে ; পাগলা + টিয়া = পাগলাটিয়া > পাগলাটে ; ঝগড়া + টিয়া = ঝগড়াটিয়া > ঝগড়াটে ; ঘোলা + টিয়া = ঘোলাটিয়া > ঘোলাটে ; ধোঁয়া + টিয়া > ধোঁয়াটিয়া = ধোঁয়াটে ; ভাড়া + টিয়া > ভাড়াটিয়া = ভাড়াটে ; রোগা + টিয়া > রোগাটিয়া = রোগাটে ।

**বিশিষ্ট প্রয়োগ :** তিনি ছিলেন ডাকসাইটে জমিদার ; তাঁর দাপটে বাধে-গোহতে একঘাটে জল খেত। ‘পাখি যেন মারিতেছে ডানার ঝাপট।’ রোদুরে গুড়ে গুড়ে তার গানের রং হয়ে গেছে তামাটে। ‘ভাড়াটে কুটি ! নদীর শোভের জগাল সব আসিয়া কুটি।’

—পানা, পারা : সদৃশ অর্থে নিম্ন শব্দ বিশেষণ। চাঁদ+পানা=চাঁদপাকা ; হাড়ি+পানা=হাড়িপানা ; লম্বা+পানা=লম্বাপানা ; কালো+পানা=কালোপানা ; পাগল+পারা=পাগলপারা ।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : বাহার অমন চাঁদপানা মুখ শুকিয়ে একেবারে কালি হয়ে গেছে। ‘তোমার গায়ে ওটা কালোপানা কি রে?’ ‘আমি জগৎ প্রাণিয়া বেড়াই গাছিয়া আকুল পাগলপারা।’

—বস্ত, মস্ত : ‘আছে’ অর্থে কয়েকটি শব্দের উত্তর এই প্রত্যয় হয়। নিম্ন শব্দ বিশেষণ। গুণ+বস্ত=গুণবস্ত ; ভাগ্য+বস্ত=ভাগ্যবস্ত ; পয়+মস্ত=পয়মস্ত ; ত্রী+মস্ত=ত্রীমস্ত ; লক্ষ্মী+মস্ত=লক্ষ্মীমস্ত ।

### ● বিদেশী তদ্ধিত-প্রত্যয়

কতকগুলি বিদেশী শব্দ [ বিশেষতঃ ফারসী ] তদ্ধিত-প্রত্যয়রূপে বাংলায় ব্যবহৃত হয়। তাহাদের বিদেশী তদ্ধিত-প্রত্যয় বলা হয়। যেমন :

—ওয়ান : নিম্ন শব্দ বিশেষ্য। কোচ+ওয়ান=কোচওয়ান ; গাড়ী+ওয়ান=গাড়ীওয়ান ; [ ঘর ]>দার+ওয়ান=দারওয়ান ; পাল+ওয়ান=পালওয়ান ।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : ‘কোচওয়ান গাড়িতে উঠিয়া মনের আনন্দে গান গাহিতে লাগিল।’ ‘দারওয়ান গায় গান শোনো ঐ রামা হৈ।’

—আনি : নিম্ন শব্দ বিশেষ্য। তল+আনি=তলানি ; [ অন্ন ] আম+আনি=আমানি ; বাবু+আনি=বাবুআনি ; হিঁচু+আনি=হিঁচুআনি ; কাতর+আনি=কাতরানি ; নাক+আনি=নাকানি ।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : ‘তারা নিজে নিজেই আগেকার দিনের তলানি নিয়ে কোনোমতে একটু সাত্বনা পাবার চেষ্টা করে।’ ‘আমানি খাবার গর্ত দেখে বিচলিত।’ ‘আজ মহরম, নিখিল মুসলিম-জগতের ক্রন্দন-কাতরানির দিন।’

—আনা : নিম্ন শব্দ বিশেষ্য। বাবু+আনা=বাবুআনা ; গরীব+আনা=গরীবানা [ চাল ] ; মুনশী+আনা=মুনশীআনা ; মালিক+আনা=মালিকানা ; মুক্কা+আনা=মুক্কাআনা ; ঘর+আনা=ঘরানা ; সাল+আনা=সালিয়ানা ; সাহেব+আনা=সাহেবিয়ানা ।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : কাহিনী বর্ণনায় তাঁর মুনশীআনা সত্যি প্রশংসনীয়। বড় গোলাম আলি লক্কো-ঘরানার বিশিষ্ট গায়ক। জামর মালিকানা কৃষকদেরই থাকবে।

—খানা : নিম্ন শব্দ বিশেষ্য। ডাক্তার+খানা=ডাক্তারখানা ; পিল+খানা=পিলখানা ; তোশা+খানা=তোশখানা ; বৈঠক+খানা=বৈঠকখানা ; ছাপা+খানা=ছাপাখানা ; মুদ্রি+খানা=মুদ্রিখানা ।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : ভিড় এখন সবখানেই—ডাক্তারখানায় ভিড়, বৈঠক-খানায় ভিড়, চিড়িয়াখানায় ভিড়, এমন-কি ভিড় কয়েদখানায়ও ।

—খোর : নিম্ন শব্দ বিশেষণ। হৃদ+খোর=হৃদখোর ; মূলাকা+খোর=মূলাকাখোর ; নেশা+খোর=নেশাখোর ; গাঁজা+খোর=গাঁজাখোর ; মদ+খোর=মদখোর ; ঘুঘ+খোর=ঘুঘখোর ; চশম+খোর=চশমখোর ; গুলি+খোর=গুলিখোর ; আফিম+খোর=আফিমখোর।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : হৃদখোর মহাজনেরা দীর্ঘকাল কৃষকদের শোষণ করেছে। এখন চারিদিকে মূলাকাখোর আর ঘুঘখোরদেরই তো রাজত্ব।

—ওয়ালা : নিম্ন শব্দ বিশেষণ। কাবুলি+ওয়ালা=কাবুলিওয়ালা ; রিকশা+ওয়ালা=রিকশাওয়ালা ; ফল+ওয়ালা=ফলওয়ালা ; ফেরি+ওয়ালা=ফেরিওয়ালা ; বাড়ি+ওয়ালা=বাড়িওয়ালা ; ঘড়ি+ওয়ালা=ঘড়িওয়ালা ; বাসন+ওয়ালা=বাসনওয়ালা ; বাঁশি+ওয়ালা=বাঁশিওয়ালা , দই+ওয়ালা=দইওয়ালা ; ফুল+ওয়ালা [ স্ত্রী ]=ফুলওয়ালী ; চুড়ি+ওয়ালা [ স্ত্রী ]=চুড়িওয়ালী।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : ‘এমন-কি বেদানার বস্তা লইয়া বিদেশী কাবুলিওয়ালা পর্বত বাদে বহিত না।’ ‘ফেরিওয়ালা যাচ্ছে ফেরি নিয়ে।’

—বাজ [ দক্ষ ] : নিম্ন শব্দ বিশেষণ ; -বাজি [ দক্ষতা ] : নিম্ন শব্দ বিশেষণ ; বক্রতা+বাজ=বক্রতাবাজ ; চাল+বাজ=চালবাজ ; মামলা+বাজ=মামলাবাজ ; ফন্দী+বাজ=ফন্দীবাজ ; ফাঁকি+বাজ=ফাঁকিবাজ ; দাঙ্গা+বাজ=দাঙ্গাবাজ ; গল্প+বাজ=গল্পবাজ ; মতলব+বাজ=মতলববাজ ; দাঁও+বাজ=দাঁওবাজ ; গুণ্ডা+বাজি=গুণ্ডাগাজি ; ধাঙ্গা+বাজি=ধাঙ্গাবাজি ; গলা+বাজি=গলাবাজি ; ফাঁকি+বাজি=ফাঁকিবাজি ; ফেরেব+বাজি=ফেরেববাজি। তেমনি, দলবাজি, ধাঙ্গাবাজি।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : লোকটা যেমনি চালবাজ, মামলাবাজিতেও তেমনি গুস্তাদ। ‘এ পৃথিবীতে প্লাড্‌স্টোন ডিশ্রেলি প্রভৃতির ত্রায় তুমি কেবল গলাবাজিতে জিতিয়া গেলে।’

—গর : নিম্ন শব্দ বিশেষণ। কারি+গর=কারিগর ; সওদা+গর=সওদাগর ; বাজি+গর=বাজিগর>বাজিকর ; হালুই+গর=হালুইগর>হালুইকর।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : ‘কে বেঁধেছে এমন ঘর ধন্য কারিগর।’ মধ্যযুগে বাড়ালী সমাজে সওদাগরদের স্থান ছিল অতি উচ্চে। ‘বাজিকরের মেয়ে তারে যেমন নাচায় তেমনি নাচে।’

—গিরি : নিম্ন শব্দ বিশেষণ। বাবু+গিরি=বাবুগিরি ; কেরানী+গিরি=কেরানীগিরি ; গোয়েন্দা+গিরি=গোয়েন্দাগিরি।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : এখন না হয় তোমার পিতা বর্তমান ; কিন্তু এভাবে বাবুগিরি করিয়া আর কতদিন কাটিবে ? কেরানীগিরি করে সারা জাতটা আজ কেরানীর জাতে পরিণত হয়েছে।

—দানি : বিশেষণ। পিচ্+দানি=পিচ্‌দানি ; নস্ত+দানি=নস্তদানি ; ছাই+দানি=ছাইদানি ; ফুল+দানি=ফুলদানি ; ধূপ+দানি=ধূপদানি।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : ফুলদানিতে ফুল আর ধূপদানিতে ধূপ দিও।

—দান : নিম্নর শব্দ বিশেষ্য । বাতি+দান=বাতিদান ; কলম+দান=কলমদান ; আভর+দান=আভরদান ।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : মাথার ওপরে ঝুলছিল উজ্জ্বল বাতিদান ।

—দার : বিশেষ্য [ কখনও কখনও বিশেষণ ] । চৌকি+দার=চৌকিদার ; দাবী+দার=দাবীদার ; দোকান+দার=দোকানদার ; খরিদ+দার=খরিদার ; মজুত+দার=মজুতদার ; ব্যবসা+দার=ব্যবসাদার ; পাওনা+দার=পাওনাদার ; হাবিল+দার=হাবিলদার ; ফৌজ+দার=ফৌজদার ; হুকুম+দার=হুকুমদার ; তালুক+দার=তালুকদার ; অংশ+দার=অংশীদার ; বর্গা+দার=বর্গাদার ; জমি+দার=জমিদার ; জোত+দার=জোতদার ; পোত+দার=পোতদার ; পোন্ধর ; দানা+দার=দানাদার ; মজা+দার=মজাদার ; রঙ+দার=রঙদার ; বুটি+দার=বুটিদার ; চটক+দার=চটকদার ; পেশা+দার=পেশাদার ; সমঝ+দার=সমঝদার ; দেনা+দার=দেনাদার ; বাজন+দার=বাজনদার ; চুড়ি+দার=চুড়িদার ।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : ‘শোন্‌রে মালিক, শোন্‌রে মজুতদার, তোদের প্রাসাদে জমা হলে কতো স্বত মানুষের হাড় ।’ যুদ্ধান্তে হাবিলদার কবি স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন । ‘সন্ধানসম পালে যারা জমি, তারা জমিদার নয় ।’

—নবিশ, নামা : বিশেষ্য । নকল+নবিশ=নকলনবিশ ; শিক্ষা+নবিশ=শিক্ষানবিশ ; হিসাব+নবিশ=হিসাবনবিশ ; জমা+নবিশ=জমানবিশ ; পত্র+নবিশ=পত্রনবিশ, হুকুম+নামা=হুকুমনামা ; বয় [ বিক্রয় ]+নামা=বয়নামা ।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : সে এখন একটি বিখ্যাত শিল্প-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষানবিশ আছে । এদিকে সমস্তই প্রস্তুত ; এখন শুধু ছুকুমনামা পেলেই হয় ।

—চী, চি [ তুর্কী ] : নিম্নর শব্দ বিশেষ্য । তবলা+চী=তবলচী ; মশাল+চি=মশালচি ; ধুনা+চি=ধুনাচি, ধুহুচি । তেমনি—খাজাঞ্চি, বেড়াচি ।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : সে এই রাত-হুপ্তরে গান গাইবে ; আমি এখন তবলচী পাই কোথায় ? ‘বেড়াচিতে ভরে গেল দেশ ।’

## ॥ অনুসরণী ॥

১. প্রত্যয় কাহাকে বলে ? প্রত্যয় কয় প্রকার ও কি কি ? দুইটি করিয়া উদাহরণ দিয়া বুঝাও ।
২. কৃৎ-প্রত্যয়, ধাতুব্যব প্রত্যয় ও ধাতু-প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য কি দৃষ্টান্ত সহযোগে বুঝাইয়া দাও ।
৩. ‘ইৎ’ কাহাকে বলে ? দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দাও ।
৪. উপধা কাহাকে বলে ? উদাহরণ দিয়া ব্যাখ্যা কর ।
- \*৫. কৃৎ-প্রত্যয় কাহাকে বলে ? দুইটি সংস্কৃত ও দুইটি বাংলা কৃৎ শব্দ দ্বারা মোট চারিটি বাক্য রচনা কর । মা. ‘৫২ ।
৬. কৃৎ বা তদ্ধিত-প্রত্যয়ের সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়া তৎসমুদায়ী যে কোন চারিটি বাংলা কৃৎ বা সংস্কৃত তদ্ধিত শব্দ পঠিত কর । উ. মা. ‘৬০
- \*৭. তদ্ধিত ও কৃৎ-প্রত্যয়ের পার্থক্য বুঝাইয়া দাও । ষাঁটি বাংলা ও সংস্কৃত-উভয়বিধ কৃৎ ও তদ্ধিতের উদাহরণ দাও । মা. ‘৫৫. ‘৫৮ : উ. মা. ‘৬০, ‘৬২ । তাৎপৰ্য বুঝাইয়া দাও : বাংলা কৃৎ-প্রত্যয়, ‘৬০ ।



\*১. বাংলা ভাষার ব্যবহৃত সনস্কৃত ও বঙালি ধাতু হইতে নিম্নলিখিত শব্দের উদাহরণ দাও। উ. মা. '৩১।

\*২. কৃৎ ও তদ্ধিত-প্রত্যয়ের পার্থক্য উদাহরণ সহকারে বুঝাইয়া দাও। উ. মা. '৩৩; তৎসম ও বাংলা উভয়বিধ কৃৎ ও তদ্ধিতের দৃষ্টান্ত দাও। বিশেষ পদকে বিশেষণে রূপান্তরিত করিবার ক্ষমতা যে যে কৃৎ ও তদ্ধিত-প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়, তন্মধ্যে অন্ততঃ দুইটি করিয়া প্রত্যয়ের উদাহরণ দাও। উ. মা. '৩৩।

[সংকেতঃ : তৎসম অর্থাৎ সংস্কৃত। কৃৎ-প্রত্যয়ঃ : কৃৎ+অচ=হর্ষ [বিশেষ্য], কৃৎ+জ=জ [বিশেষণ]। যু+সন+আ=মুর্খা [বিশেষ্য]; যু+সন্+উ=মুমূর্ষু [বিশেষণ]। তদ্ধিত-প্রত্যয়ঃ : আদি [বিশেষ্য]; আদি+ম=আদিম [বিশেষণ]। রক্ত+ইমন+আ=রক্তিমা [বিশেষ্য]; রক্ত+ইমন=রক্তিম [বিশেষণ]।]

\*১০. যে কোন চারিটি উপসর্গের সহিত কৃ বা হ্র ধাতুর যোগে উৎপন্ন চারিটি শব্দের উল্লেখ কর। [আ-কৃ+ঘঞ=আকার; প্র-কৃ+ঘঞ=প্রকার; বি-কৃ+ঘঞ=বিকার। প্রতি-কৃ+ঘঞ=প্রতিকার; আ-হ্র+ঘঞ=আহার; প্র-হ্র+ঘঞ=প্রহার; বি-হ্র+ঘঞ=বিহার; প্রতি-হ্র+ঘঞ=প্রতিহার।]

১১. তদ্ধিত-প্রত্যয় কাকে বলে? পাঁচটি সংস্কৃত ও পাঁচটি বাংলা তদ্ধিতান্ত শব্দ স্বরচিত পৃথক পৃথক বাক্যে ব্যবহার কর।

\*১২. উদাহরণ সহকারে ব্যাখ্যা কর : বার্ষিক প্রত্যয়, উ. মা. '৩৪; কৃৎ-প্রত্যয়, মা. '৩২, ব. প্র. '৩২; তদ্ধিত-প্রত্যয়, মা. '৩১; বিদেশী তদ্ধিত-প্রত্যয়, মা. '৪২; অপভ্রংশে তদ্ধিত-প্রত্যয়, ক. প্রা. '৩১। সমাসান্ত প্রত্যয়, উ. মা. '৩৩; ক. প্রা. '৩৩; বাংলা কৃৎ-প্রত্যয়, উ. মা. '৩২।

[সংকেতঃ : সমাসান্ত প্রত্যয়—সমাস অধ্যায়ের শেষ অংশ দ্রষ্টব্য।]

\*১৩. নিম্নলিখিত প্রত্যয়গুলির প্রয়োগ দেখাও ও অর্থ-নির্দেশ কর : ইমন, ঘ, মং, গিরি, ওয়াল, আনি, উয়া, অন্ত, আ; উ. মা. '৩৪।

১৪. কৃৎ ও তদ্ধিত-প্রত্যয়ের সাহায্যে বিশেষণবিশেষণ ও বিশেষণ পদ বিশেষ্যে পরিণত হয়, তাহা উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও; উ. মা. '৩৪।

[সংকেতঃ : কৃৎ-প্রত্যয়—বচ+অনট=বচন [ক্ৰি], বচ্+তবা=বক্তব্য বা বচ্+স্ত=উক্ত [বিণ.], মুচ্+অনট=মুচন [বি], মুচ্+মুস্ত=মুক্ত [বিণ]। উপ-হ্র+ঘঞ=উপহার [বি], উপ-হ্র+স্ত=উপহৃত [বিণ]। হন্+অলু=বধ [বি], হন্+ত=হত [বিণ]। তদ্ধিত-প্রত্যয়—গ্রাম+ল=গ্রামল [বিণ], ভ্রামল+ইমন+আ=ভ্রামলিমা [বি]।]

\*১৫. অর্থ নির্দেশ করিয়া ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কর এবং কোন প্রত্যয় কি কারণে হইয়াছে লিখ : নহিষ্, দ্বাদশবি, পথা [পথিন্+যক্], কনিষ্ঠ, কাটারি, ভ্রমকাল; উ. মা. '৩২। ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কর : লোনা, মেটে, দাঁতাল, সহিষ্, নৌমিত্রি, চিন্ন, শস্যায়মান, দিশাক, পড়ন্ত, লাজুক; উ. মা. '৩০। অর্থনৈ প্রত্যয় নির্ধারণ কর : বরদী, কার্ণ, নব্র, ভলব, ভ্রম্যদ্যং, লোনা, মিথাক, সাপুড়ে; উ. মা. [কম্পার্ট.] '৩০। প্রকৃতি-প্রত্যয় ও ব্যুৎপত্তিগত অর্থ লিখ : পুষ্করা, ভাষা, কৃত, রোক্তমান, মাতৃকা, কাটারি, বড়াই; উ. মা. '৩১। বিবক্ষা, ছাত্র, সন্তান, স্বর, সত্য, ভ্রাগবত, অগণিক; উ. মা. '৩৩। প্রকৃতি-প্রত্যয় ও ব্যুৎপত্তিগত অর্থ লিখ : চকল, পুত্র, ভূতা, সার্বভৌম, সাহিত্য, বন্দী, সৌগত, আর্জব; উ. মা. '৩৪। প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্ধারণ কর ও ব্যুৎপত্তিগত অর্থ লিখ : অভিব্যেক, মহিমা, আহুত, বাণগিরি, ভয়ংকর, বাড়ন্ত, বোকাবদার; উ. মা. '৩৫। প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্ণয় কর : বক্ষ্যমাণ, রোক্তমান, কৌন্তের, মায়াবী, শাসাল, বলিরে, আগ্নেয়, ঢাকনি; উ. মা. '৩৬। গোময়, সঞ্চিত, লেঠেল, আত্মজ, দারিদ্র্য; উ. মা. '৩৭। ভ্রাহ্মণী, ঠাকুরালি, কণী, মিঠাই; উ. মা. '৩৮। বর্তমান, আধুনিক, প্রদর্শক, কর্তব্য পরিপুষ্ট, স্মরণ, সংস্কৃত; ক. প্রা. '৩৭। শয়ান, লুপ্তিত, দাতব্য, পাহাড়, নিভ্রালু; উ. মা. '৩৭। সিংহেল, ভূষড়, তন্ত্রালু, বৈদান্তিক, পানীয়, গাইয়ে, শুনানি, পাকড়াও; উ. মা. '৭০।

\*১৬. প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্ধারণ কর ও ব্যুৎপত্তিগত অর্থ লিখ : বৈচিত্র্য, দ্বাদশবি, ভ্রমিয়ার, পুষ্করা, চলিত, বার্ষিক, জ্যাঠানো, মেয়েলি, বড়াই, ঘরোয়া; মা. '৫৩। একলা, মিঠালি, লাঠিলাল, বয়ালু, চলন্ত, নিস্তক, ভগ্নাদি, বুনীআনা, তামাটে, ভ্রমন্তপনা; মা. '৫৫। দ্বাদশবি পদ্ধতি, সাধতা, পরিষ্ট, কর্তব্য।

লিপাসা, বিনষ্ট, উপকারী : মা. '৬৭। বর্ষিক, শরান, গিরিশ, প্রিয়ংবদা, ভাষাটে, বাষা, বুনো, নৈরাসিক ; মা. '৬৮। কানাই, সেবাইত, যিতালি, ঐকন, মূৰ্খজ্ঞ, আতিথ্য, মিথ্যাক, নৈরাসিক ; মা. '৭২। সহিক, দ্বাশরথি, পণা, কনিষ্ঠ, কাটারি, বড়াই জমকালো : মা. [ কম্পার্ট. ] '৬২। বুদ্ধিমান, শারীরিক, লোভনীয়, সত্তা, শোভমান, ধনা, নন্দিনী : মা. '৬৫। যুগ্মব, রবিবাসরীয়, ছেলেমি, বশবী, চলন্ত, খেয়ালী, শাখারী, নীলিমা ; মা. '৬৬। জ্যোতিষা, জিকু, শরান ভুক্ত, কোস্তের, লঘিমা, গড়ুয়া, তামুলী ; মা. '৬৯। পরিধেয়, শরান, শুক, হানি, ভাগ, খেলনা, গড়ুয়া, সৌর, জ্যোত, পায়স, ভয়ীভূত, ত্রাষিমা, হলদে, মোহো, ছাংলাপনা ; মা. '৬৬। সরনিজ, বিক্রীত, মুক্তি, অবশীয়, কম্পমান, সৌমিত্র, দ্বাশরথি, গাজের, দ্বস্তিপনা ; মা. '৭৩।

\*১৭. কারণ দেখাইয়া অতুষ্কি সংশোধন কর : ভৌগলিক, মহত্ব, যুগমান, অপকর্ষতা ; উ. মা. '৬১। লক্ষণীয়, স্বাধা, ভৌগ লক, একামত, নিশ্চরতা, বৈশিষ্ট্যতা ; উ. মা. '৬৪।

\*১৮. নিম্নলিখিত প্রত্যয়গুলির প্রয়োগ দেখাও : ইমন্, স্ব, বং, গিরি, ওয়ালা, আম, উয়া, অস্ত, আনি ; উ. মা. '৬৪। জি, ত্‌চ্‌, ইত, ইন্‌, উয়া, অস্ত, আলি, পনা, উ. মা. '৬৬। ইল, ইয়ত [ইয়স্‌], তন, ইয়ন্‌, গিরি, দান, বিন্‌, তা ; উ. মা. '৬৭। খোর, দার, রাজ, ইমন্‌, পনা, খানা, গিরি ; উ. মা. [ কম্পার্ট. ] '৬৯।

\*১৯. বাংলায় শত্‌ ও শানচ্‌ প্রত্যয়াস্ত পদ্ব কিতাবে ব্যবহৃত হয় দেখাও ; মা. '৬৬।

\*২০. শানচ্‌ প্রত্যয়-যুক্ত পাঁচটি কৃৎস্ত পদ রচনা করিয়া বাক্যে প্রয়োগ কর ; ক. প্রা. '৬৯।

\*২১. প্রকৃতি-প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন কর : গজা+এব, মুহ+ঈবস্‌, ক্ষি+জ, বৃৎ+শানচ্‌, গ্রহ্‌+ত্‌চ্‌, লাটি+আল, পাড়াগাঁ+ইধা ; মা. '৬৭।

\*২২. হুলাকবে মুদ্রিত পদগুলির স্থানে মেই অর্থে কৃৎস্ত বা তদ্ধিতান্ত পদ বসাত : ক. ভাদ্রমাসের শেষদিনে বিশ্বকমা পূজা হয়। ক. ভারতবর্ষে দেবীবার কি,র অভাব নাই। গ. মহাপুরুষের সর্বদাই স্মরণের বোধ্য। ঘ. পত্রিকাখানি ছয় মাস অন্তর বাহির হয়। ঙ. মেয়েটি গৃহের ব্যবস্থা ভালো জানে। চ. তোমার কাছে [ নদী ] পার হইবার পরমা আছে? ছ. মাটির তৈয়ারী।

২৩. প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্ণয় করিয়া স্বরচিত বাক্যে ব্যবহার কর : চৈনিক, সার্বজনীন, শ্রীমন্ত, বিবিয়ানা, এমনতর, চালবাজি, নকলানবিশ, ষোষণ, দ্বাশরথি, ভাগীরথী, বিশ্বজনীন, অকর্মণ্য, সৈন্যব, শ্রমিক, মহিম, নৌকা, পাতলা, কুঠরী, সোনালী, হৃৎষে, বড়াই, রেশমী, চিষটি, গোত্র, যুগ্মন্ত, উহৃতি, রাধুনী, ডুবুরী, পোড়ো, একলা, হাবিলদার, মেঠো, লাঠিয়াল, হাঁৎকা, রান্না, ডাকু, হবু, জায়াস্ত, বৈঠক, বেগুন, মাগুনা, জাভা, বালাই, বর-ভান্ডারী, ধুমুরী, বকান, বাজয়ে, গুন্‌তি, রঞ্জক, সবিতা, শুভকরী, দেবীপ্যমান, পৌত্র, উৎকর্ষ, ঐবর্ষ, জ্যোতিষর, সামা, তৃতীয়, বন্ধামান, বিবন্ধা, সার্বভৌম, উত্তীর্ণ, অর্থা, নম্বর, বস্ত্র।

[ সংকেত : বন্ধামান—বচ্‌+স্তমান্‌ ; বিবন্ধা—বচ্‌+সন্‌+আ ; অর্থা—অর্থ ( অর্হ+যজ্‌ )+বৎ ; নৌকা—নৌ+ক+আ ]

২৪. প্রকৃতি-প্রত্যয়যোগে এক কথায় প্রকাশ কর : দুতের কাজ, পুণোহিতের কাজ, ভূগোল সম্বন্ধীয়, ঠাকুরের ভাব, স্মৃতিশাল জানেন যিনি, বৃহস্পতির উপাসক, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র, উজ্জ্বলের ভাব, দ্রোণের পুত্র, কুন্তীর পুত্র, শরীর সম্বন্ধীয়, পরলোক সম্বন্ধীয়, প্রতিযোগীর ভাব, মনুজের গুণ, জট আছে বাহাতে, ঢাকার উৎপন্ন, ঝগড়া করে যে, ঋষির উক্ত, বাহা পুনঃ পুনঃ জলিতেছে, ঐ আছে বাহার, বিনতার পুত্র, পাণ্ডুর পুত্র, বধু পান করে যে, বাহা জানা উচিত, বাহা প্রশংসার বোধ্য, বাহা ক্ষয় পাইতেছে, যে মরিতেছে, মরিতে ইচ্ছুক, গুনিবার ইচ্ছা।

## উপসর্গ

‘যে সমস্ত অব্যয় শব্দ ধাতুর সহিত মিলিত হইয়া বা ধাতুকে অবলম্বন করিয়া ঐ ধাতুর নানা অর্থের সৃষ্টি করে’, তাহাদের উপসর্গ [Prepositional Prefixes] বলে।

‘উপসর্গের অর্থবাস্কতা নাই, কিন্তু অর্থছোতকতা আছে, তাহারায় স্বয়ং কোন বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে না ; কিন্তু ধাতুযোগে বিশেষ বিশেষ স্থলে বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে।’ এই গ্রন্থের জন্ত উপসর্গ কেবল প্রয়োজনীয় নয়, ভাষার পক্ষে অপরিহার্য। একটি মাত্র ধাতু ভিন্ন ভিন্ন উপসর্গযোগে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ গঠন করে। ‘উপসর্গ’ কথাটি ‘উপ-সর্গ-ধাতু+ঘঞ’ হইতে গঠিত। তাহার অর্থ—‘উপসৃষ্টি’।

সংস্কৃত ভাষায় কুড়িটি উপসর্গ আছে। সেগুলি হইল : প্র, পরা, অপ, সম, অবি, অব, অনু, নির, দুর্, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অতি, অপি, উপ, আ। কিন্তু পানিনির মতে, উপসর্গ কুড়ি নয়, ছাব্বিশটি অর্থাৎ বাইশ। তিনি ‘নিস্’ ও ‘দুস্’—এই অতিরিক্ত দুইটি উপসর্গকে হিসাবের মধ্যে ধরিয়াছেন।

সংস্কৃত উপসর্গ প্রধানতঃ ধাতুর পূর্বে প্রযুক্ত হয়। বাংলায়ও উপসর্গ কেবলমাত্র ধাতুর পূর্বে প্রযুক্ত হয়। রবীন্দ্রনাথও বলেন, ‘উপসর্গ থাকে সামনে, প্রত্যয় থাকে পিছনে, নতুন শব্দ তৈরী করবার বেলায় তাঁদের নইলে চলে না।’

সংস্কৃত ধাতুর সহিত ভিন্ন ভিন্ন উপসর্গযোগে কিভাবে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ গঠিত হয় ও অর্থান্তর ঘটে, তাহার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়া একটি সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করা বাইতে পারে :

“প্রহারাতার সহার বিহার পরিহারবৎ।”

অর্থাৎ, ‘হ’ ধাতুর সহিত ‘প্র’ উপসর্গ-যোগে ‘প্রহার’, ‘আ’ উপসর্গ-যোগে ‘আহার’, ‘সম্’ উপসর্গ-যোগে ‘সংহার’, ‘বি’ উপসর্গ-যোগে ‘বিহার’ এবং ‘পরি’ উপসর্গ-যোগে ‘পরিহার’ শব্দ গঠিত হয়। সংস্কৃত উপসর্গগুলি মূল ধাতুর পূর্বে বসিয়া কিরূপে শব্দের অর্থ বদলাইয়া দেয়, তাহা কয়েকটি ধাতুর দ্বারা প্রদর্শিত হইল :

সংস্কৃত √হ [হরণ করা] ধাতু : √হ+ঘঞ=হার [মালা, ভাগ]।

আ-হ+ঘঞ=আহার [ভোজন] ; বি-হ+ঘঞ=বিহার [ভ্রমণ] ; প্র-হ+ঘঞ=প্রহার [আঘাত] ; বি-অব-হ+ঘঞ=ব্যবহার [আচরণ] ; অব-হ+ঘঞ=অবহার [বাটা] ; অপ-বি-অব-হ+ঘঞ=অপব্যবহার [ভুল প্রয়োগ] ; সম-হ+ঘঞ=সংহার [হত্যা] ; সম-আ-হ+ঘঞ=সমাহার [সমষ্টি] ; পরি-হ+ঘঞ=পরিহার [পরিভ্যাগ] ; প্রতি-হ+ঘঞ=প্রতিহার

[ দৌবারিক ] ; বি-অতি-হ+ঘঞ=ব্যতিহার [ বিনিময় ] ; মি-হ+ঘঞ=মিহার, নীহার [ বরক ] ; অধি-হ+ঘঞ=অধিহার [ অতিরিক্ত মূল ] ; উৎ-হ+ঘঞ=উদ্ধার [ মুক্তি ] ; উপ-হ+ঘঞ=উপহার [ উপঢৌকন ] ; উপ-সম্-হ+ঘঞ=উপসংহার [ পরিসমাপ্তি ] ।

● সংস্কৃত √বদ্ [ বুল অর্থ—বলা ] ধাতু : √বদ্+ঘঞ=বাদ [ উক্তি, মত ] ।

প্র-বদ্+ঘঞ=প্রবাদ [ জনশ্রুতি ] ; অপ-বদ্+ঘঞ=অপবাদ [ মিলা ] ; সম্-বদ্+ঘঞ=সংবাদ [ খবর ] , অনু-বদ্+ঘঞ=অনুবাদ [ ভাষান্তর ] ; বি-বদ্+ঘঞ=বিবাদ [ ঝগড় ] , প্রতি-বদ্+ঘঞ=প্রতিবাদ [ বিরুদ্ধ উক্তি ] ।

● সংস্কৃত √বহ্ [ বুল অর্থ—বহন করা ] ধাতু : √বহ্+ঘঞ=বাহ [ বহনকারী ] ।

প্র-বহ্+ঘঞ=প্রবাহ [ শোত ] , নিব্-বহ্+ঘঞ=নিবাহ [ বাপন করা ] ; বি-বহ্+ঘঞ=বিবাহ [ পবিধয় ] , উৎ-বহ্+ঘঞ=উদ্বাহ [ পরিণয় ] ।

● সংস্কৃত √রুধ্ [ মূল অর্থ—বোধ করা ] ধাতু : √রুধ্+ঘঞ=রোধ [ বাধা ] । অব-রুধ্+ঘঞ=অবরোধ [ পরিবেষ্টন ] , অনু-রুধ্+ঘঞ=অনুরোধ [ মিনতি ] , নি-রুধ্+ঘঞ=নিরোধ [ বাধা ] ; বি-রুধ্+ঘঞ=বিরোধ [ বিবাদ ] ; প্রতি-রুধ্+ঘঞ=প্রতিরোধ [ বাধাদান ] ; উপ-রুধ্+ঘঞ=উপরোধ [ অন্নয় ] ।

● সংস্কৃত √নী [ বুল অর্থ—মানয়ন করা ] ধাতু : √নী+ঘঞ=নয় [ নীতি ] ।

প্র-নী+ঘঞ=প্রণয় [ প্রীতি ] , অনু-নী+ঘঞ=অনুনয় [ মিনতি ] ; নিব্-নী+ঘঞ=নির্ণয় [ নির্ধারণ ] , বি-নী+ঘঞ=বিনয় [ মনস্তা ] , পরি-নী+ঘঞ=পরিণয় [ বিবাহ ] , অভি-নী+ঘঞ=অভিনয় [ কৃত্রিম ভাব প্রকাশ ] ।

## ১. সংস্কৃত উপসর্গ :

প্র—প্রশংসা, প্রমাণ, প্রগতি, প্রকৃত, প্রহার, প্রকাশ, প্রথর, প্রসাদ, প্রচণ্ড, প্রলয়, প্রতাপ, প্রকট, প্রগল্ভ, প্রচলন, প্রদাহ, প্রবল, প্রজ্ঞা, প্রকর্ষ, প্রস্তাব, প্রভাব, প্রচ্ছদ, প্রভব, প্রবন্ধনা, প্রভারণা, প্রণয়, প্রণয়ন, প্রক্ষেপ, প্রমাদ, প্রবাহ, প্রণাম, প্রগতি । পরা—পরাক্রম, পরাজয়, পরাভব, পরাধীন, পরাধুখ, পরাক্রাণী, পরাগ, পরায়ণ । অপ—অপমান, অপচয়, অপনোদন, অপপ্রয়োগ, অপবাদ, অপবন, অপহরণ, অপকার, অপবায়, অপবৃত্তা, অপকর্ষ, অপরাধ, অপঘাত, অপগত, অপমৃত, অপক্লপ, অপদেবতা । সম্—সম্ভাষণ, সম্মুখ, সম্মান, সম্ভার, সম্মিলন, সম্বাদ, সঙ্কর, সংঘাত, সংগ্রহ, সংকলন, সংকট, সংকীর্ণ, সম্ভাপ, সঙ্কালন, সম্পত্তি, সম্ভাব, সংসীত, সংস্কার, সংগতি, সম্পাদন, সমাবর্তন, সম্পূর্ণ, সমাহার, সম্ভান, সম্পদ, সংসার, সম্ভোগ । নি—নিগ্রহ, নিকৃষ্ট, নিরুত্তি, নিবাস, নিগম, নিচ্চল, নিবারণ, নিরোধ, নিকট, নিবন্ধন, নিরাবয়, নিরাকরণ, নীরোগ, নির্ধন, নিপাত, নিশ্চয় । অব—অবতরণ, অবচেতন, অবরোধ, অবহেলা, অবজ্ঞা, অবরোধ, অবসর, অবকাশ, অবগঠন, অবস্থা, অবতায়,

[illegible]

নিষ্কটক, নিশ্চল, নিঃশাস, নিঃশ্বন। দুস্—দুস্তর, দুহুতি, দুপ্রবৃতি, দুস্তরিজ, দুঃশেষ, দুঃসাধ্য, দুঃসহ, দুঃশাসন, দুঃষপ, দুঃচিন্তা, দুঃসময়।

## ২. উপসর্গরূপে সংস্কৃত অব্যয় :

কতকগুলি সংস্কৃত অব্যয় বিশেষ কয়েকটি ধাতুর পূর্বে উপসর্গরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন : অস্ত্যঃ—অস্ত্যপূর, অস্ত্যসলিলা, অস্ত্যকরণ, অস্ত্যসার, অস্ত্যঃহ, অস্ত্যরহ, অস্ত্যভুক্ত, অস্ত্যভূত, অস্ত্যগত, অস্ত্যর্জলী, অস্ত্যধান, অস্ত্যবর্তী, অস্ত্যবাত, অস্ত্যশা, অস্ত্যদেশীয়। আবিঃ—আবির্ভাব, আবিষ্কার। পুরঃ—পুরস্কার, পুরোহিত, পুরোবর্তী, পুরোভাগ, পুরোধা, পুরোগমন। তিরস্—তিরস্কার, তিরোভাব, তিরোধান। পূর্ব—পূর্বরাগ, পূর্ববর্তী, পূর্বতন, পূর্বাহ্ন, পূর্বাভাস, পূর্বাশা, পূর্বোক্ত, পূর্বপুরুষ, পূর্বজ্ঞান, পূর্বাচল। প্রাভ্যঃ—প্রাভূতাব। বহিঃ—বহিঃহ, বহির্গমন, বহিরাগত, বহির্ঘাট, বহির্ভূত, বহিষ্কার, বহিরহ, বহির্ভারত, বহির্জগৎ, বহিরাবরণ, বহির্ভাগ, বহির্বিভাগ, বহির্বাণিজ্য। সাক্ষাৎ—সাক্ষাৎকার, সাক্ষাদর্শন। অলম্—অলংকার, অলংকরণ।

## ৩. বাংলা উপসর্গ :

বাংলা ভাষায়ও কতকগুলি নিম্নস্থ উপসর্গ আছে। ইহারা নামপদের পূর্বে বসে এবং শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটায়।

অ—অকুরন্ত, অদেখা, অহুবিধা, অবাঙালী, অবোলা, অকাজ, অষাডা, অবশ, অবিবেকী, অপাত্র, অযথা, অনড়, অচিন, অপরা, অবোলা, অজানা, অচেনা, অকেজো, অনামী। অনা—অনাবৃষ্টি, অনামুখো, অনামৃষ্টি। আ—আদেখ্‌লা, আলুনি, আভাড়া, আকাটা, আধোয়া, আসিক, আভাজা, আকাট, আঘাটা, আকাল, আগাছা, আশাকা, আকাঁড়া। দর—দরকাঁচা, দরসিক, দরপাকা। নি—নিলাজ, নিখরচা, নিখাদ, নির্জলা, নির্ভেজাল, নির্ভরসা, নির্ভাজ, নিটোল, নিখুঁত। পাতি—পাতিলেখ, পাতিহাঁস, পাতিকাক, পাতকুয়া। বে—বেচাল, বেহায়া, বে-হেড, বেশরম, বেতাল, বেজাত, বেহাত, বেচপ, বেহুরো, বেতার, বেসামাল, বেহন্দ। বি—বিভূঁই, বিদেশী, বিজোড়, বিকল, বিপথ। ভর—ভরদিন, ভরসন্ধ্যা, ভরত্পুর, ভরপেট। ভরা—ভরাঘট, ভরাগাঁব, ভরাগাও, ভরাবাগি, ভরাভূবি, ভরাবোবন, ভরানদী। রাম—রামদা, রামছাগল, রামগরুড়, রামশিঙে, রামশালিক, রাম-খোলাই। স—সপাট, সজোর, সজল, সটান, সঠিক, সখেদ, সকাভর, সক্ষম, সবুট। হা—হাভাতে, হাফের, হাপিত্যেণ, হা-হতাশ।

## ৪. বিদেশী উপসর্গ :

কি—কিদিন, কিবছর, কিসন, কিবার, কিরোজ। হর—হরবোলা, হরমোজ, হরদিন, হরখড়ি, হরসাল। গর—গরমিল, গরহজর, গররাখি, গরহাজির। হেড—হেড-মিস্ত্রী, হেড-চাপরাশী, হেড-পণ্ডিত, হেড-অফিস। না—নাচায়, নাথেরাজ, নাথালক, নাথহর, নাথক, নারাজ, নাহোড়বালা, নাকাল। ব—বকলম, বনাম, ববাল। বে—বেবন্দোবস্ত, বেদাখি, বেকহর, বে-টাইব, বেরসিক, বেখাইনী, বেইআত, বেপারোয়া,

বেনামী, বেতার, বেহাশ। বদ্—বদ্‌মাইস, বদ্‌রাগী, বদ্‌জাত, বদ্‌মেজাজী, বদ্‌নাম। ফুল—ফুলবাবু, ফুলহাতা, ফুলটিকিট, ফুলগাট, ফুলপ্যাট, ফুল-টাইম। হাক্—হাক্-টিকিট, হাক্-হাতা, হাক্-টাইম, হাক্-আখড়াই। সব্—[Sub]—সব্-ডেপুটি, সব্-জজ, সব্-রেজিষ্টার, সব্-অফিস। নিম্—নিমরাজী, নিমণ্ন, নিম-হাকিম, নিম-মোজা। বর—বরখাস্ত, বরবাদ, বরদাস্ত। কার—কারবার, কারখানা, কারসাজি, কারচুপি, কারদানি। খাস—খাসমহল, খাসকামরা। খোস—খোসগল্প, খোস-মেজাজ খোসগল্প, খোসবাবু।

### অনুসর্গ

যে সকল পদ বাক্যের মধ্যস্থিত পদগুলির সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য পদের অমুত্তে বা পরে বসে, অথচ পদগুলি হইতে বিযুক্ত হইলেও বিচ্ছিন্ন অবস্থায় অর্থবৃত্ত থাকে, তাহাদিগকে অনুসর্গ বলা হয়।

কারকের বিভক্তিরূপে, অর্থাৎ বাক্যের ক্রিয়াপদের সহিত বাক্যস্থিত অন্তান্ত পদগুলির সম্বন্ধ বুঝাইতে ইহারা ব্যবহৃত হয়। ইহারা আসলে স্বতন্ত্র পদ। কিন্তু কারক বুঝাইতে ইহারা বিভক্তিরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন : করণ কারকে দ্বারা, দিয়া, ক'রে, করিয়া, সাহায্যে, কর্তৃক ইত্যাদি শব্দ ; সম্প্রদান কারকে জন্য, নিমিত্ত, হেতু, অর্থে, তরে, লাগিয়া, উদ্দেশ্যে ইত্যাদি শব্দ ; অপদান কারকে হইতে, হতে, থেকে, চেষ্টে, অপেক্ষা, নিকট হইতে, কাছ থেকে ইত্যাদি শব্দ এবং অধিকরণ কারকে কাছে, নিকটে, মধ্যে, মাঝে, পাশে, ভিতরে, উপরে, পানে, দিকে ইত্যাদি শব্দ। এই শব্দগুলিকে বলা হয় অনুসর্গ, পরসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয়।

উপসর্গ [ Preposition ] যেমন শব্দের পূর্বে বসিয়া অর্থবৈচিত্র্য আনে, ইহারাও তেমনই নামপদের [ অর্থাৎ বিশেষ্য ও বিশেষণ ] অমুত্তে বা পরে বসিয়া বাক্যের অর্থকে সুস্পষ্ট করে। সেটজন্য ইহাদের অনুসর্গ বা পরসর্গ [ Post-position ] বলা হয়।

এই পদগুলি অব্যয়রূপেও ব্যবহৃত হয়।

'হতে' [ <হইতে ], 'থেকে' [ <থাকিয়া ], 'চেষ্টা' [ <চাহিয়া ], 'দ্বারা', 'দিয়ে' [ <দিয়া ], 'কারণে', 'জন্য', 'নিমিত্ত', 'জাড়া', 'বিনা', 'মতো', 'মতন', 'সঙ্গে', 'সাথে', 'ভিতরে', 'উপরে' ইত্যাদি শব্দগুলির এক-একটি নিজস্ব অর্থ আছে এবং ইহারা বাক্যে স্বাধীনভাবে প্রযুক্ত হইবার যোগ্য। তাই ইহাদের সম্পর্কে আচার্য্য রামেন্দুসুন্দর বলেন : 'ইহারা স্বতন্ত্র আন্তঃগোটা পদ ; 'দ্বারা' পদটি সংস্কৃত হইতে অবিকল আসিয়াছে, অন্তঃগোলা হয়ত অসমাপিকা ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু ইহারা এখন মূল অর্থ পরিহার করিয়া সংকীর্ণ অর্থে কেবল অব্যয় পদে লাড়াইয়াছে। ইংরেজিতে Preposition যেমন Objective Case-এর পূর্বে বসিয়া উহাকে govern করে বা শাসন করে, ইহারা সেইরূপে বাহালা পদের পরে বসিয়া পূর্ববর্তী পদকে শাসন করে বা পালন করিতে সক্ষম হয়।' (১) যেমন :

“সীতা ‘বিনা’ আমি যেন মণিহারী ফণী।” “তোমা ‘ছাড়া’ আর এ জগতে মোর কেহ নাই।” “সকলের ‘তরে’ সকলে, আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের ‘তরে’।” “খাটি দোনার ‘চাইতে’ খাটি।” “পরের ‘কারণে’ স্বার্থ দিয়া বলি এ-জীবন মন সকলি দাও।” “সে জীবনে কাহারও মন ‘বই’ ভালো করিল না।” “ইহার ‘চেয়ে’ হতেম যদি আরব বেহুয়িন।” “সবার ‘উপরে’ মাহুষ মত, স্রষ্টা আছে কি নাই।” “আমি তোমার বাত্মীদলের রব ‘পিছে’।” “তোমার ‘কাছে’ আরাম চেয়ে পেলাম শুধু লজ্জা।” “তব ‘সনে’ যিশি আছে নিশি কীত হাহাকার।” “পুরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন ‘পাশে’।” “বাধা মোর উঠবে জলে উন্ন-‘পানে’।” “সিংহন ‘নামে’ রেখে গেছে নিজ শৌর্ষের পরিচয়।” ইত্যাদি।

## ॥ অনুসর্গী ॥

১. উপসর্গ কাহাকে বলে? সংস্কৃত উপসর্গ কয়টি ও কি কি? সংস্কৃত উপসর্গ ও বিশেষী উপসর্গ—প্রত্যেকের পাঁচটি করিয়া উদাহরণ দাও।

\*১. উদাহরণসহ পার্থক্য নির্দেশ কর : উপসর্গ ও অনুসর্গ। উ. মা. '৬০

\*২. বাংলা উপসর্গ সব্বন্ধে বাঙা আন উদাহরণসহ লিখ। মা. '৬০; উ. মা. '৬০

\*৩. উপসর্গযোগে ধাতুর অর্থের কিরূপ পরিবর্তন হয় চারিটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে দেখাইয়া দাও। উ. মা. '৬০

\*৪. প্রকৃতি, প্রত্যয় ও উপসর্গ কাহাকে বলে? উদাহরণযোগে বুঝাইয়া দাও। উ. মা. '৬০

\*৫. আগমন, আক্ষেপ, আহ্বার, উপকার, আনয়ন, নিবৃত্তি, অপসারিত—এই শব্দগুলির মধ্যে যে-কোন চরটির আধিতে যে-উপসর্গ আছে, তাহার স্থানে অন্ত উপসর্গ ব্যবহার করিলে অর্থের কিরূপ পরিবর্তন হয় দেখাও। মা. '৬০

[ সংকেত : আগমন—আসা, অভিজ্ঞমন—অগ্রসর হওয়া; আক্ষেপ—কোভ, সংক্ষেপ—অসীকরণ; আহ্বার—ভোজন, বিহার—ভ্রমণ; উপকার—মঙ্গল সাধন, অপকার—অমঙ্গল সাধন; আনয়ন—আনা, প্রণয়ন—রচনা; নিবৃত্তি—নিবারণ, প্রবৃত্তি—স্পৃহা; অপসারিত—দূরীকৃত, প্রসারিত—বিভূত। ]

১. উপসর্গের যোগে ধাতুর অর্থ কিভাবে পরিবর্তিত হয় দেখাও। উ. মা. '৬০

৮. পাঁচটি সংস্কৃত অব্যয়কে উপসর্গরূপে প্রয়োগ করিয়া বাক্য রচনা কর।

২. প্র, পরি, বি, উপ—‘হ’ ধাতুর সহিত এই চারিটি উপসর্গযোগে চারিটি পৃথক পৃথক শব্দ গঠন কর।

\*১০. নিম্নলিখিত যে কোন চারিটি উপসর্গ প্রয়োগ করিয়া চারিটি পৃথক পৃথক শব্দ গঠন কর : প্র, অতি, পমা, নির, হ্রস্ব, বি, অধি, উপ। মা. '৬২

\*১১. উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর : নিম্নলিখিত অর্থে উপসর্গ। মা. '৬০

[ সংকেত : সংস্কৃত—উৎকোচ, উচ্ছৃঙ্খল; বাংলা—অপরা, অকোজো, অপদার্থ; বিশেষী—বহুনাশ, বজ্রাত, বধুভাগী। ]

১২. নিম্নোক্ত উপসর্গযোগে পৃথক পৃথক শব্দ গঠিত করিয়া প্রত্যেকটির সাহায্যে এক একটি মার্কক বাক্য রচনা কর : প্র—, সহ—, অধি—, অব—, উৎ—, যে—।

\*১৩. নিম্নপ্রদত্ত যে কোন পাঁচটি শব্দে ব্যবহৃত উপসর্গ উল্লেখ করিয়া ঐ পাঁচটি শব্দের অর্থ লিখ :

পরমিল, অনন্ত, আভ্যাস, আভ্যাস, বৈরসিক, উপনয়ী, প্রতাহার।

[ সংকেত : মিলের অভাব, নিশ্চয়, আশু পর্যন্ত, অভ্যাস পরম, রসজ্ঞানহীন, যে নবী অন্ত নবীতে সিন্না পতিত হয়, সংঘর্ষ, কিরাইয়া লওয়া। ]

১৪. অনুসর্গ কাহাকে বলে? উপসর্গের সঙ্গে ইহার পার্থক্য কি? দৃষ্টান্তসহ আলোচনা কর।



বাংলায় বিভিন্ন শব্দকে বিভিন্ন অর্থে এবং বিভিন্ন রূপে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। এক-একটি শব্দের এক-একটি অর্থ থাকে। কিন্তু অনেক সময় সেই সকল অর্থে শব্দকে ব্যবহার না করিয়া বিভিন্ন বিশেষ বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। তাহাকেই বলা হয় শব্দের বিশিষ্ট প্রয়োগ। এখানে বিভিন্ন প্রকার শব্দের বিভিন্ন অর্থে বিশিষ্ট প্রয়োগের উদাহরণ প্রদত্ত হইল:

### ● বিশেষ্য পদের বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ

● অঙ্ক>অঙ্কে কাঁচা [গণিতে কাঁচা]: ছেলেটি অঙ্কে কাঁচা। মাতৃ-অঙ্ক [মায়ের কোল]: 'তব অঙ্ক শঙ্কাত্ত বৈদৃষ্ট-সমান।' পঞ্চাঙ্ক [নাটকের পাঁচটি অংশ]: 'মেবার পতন' একখানি পঞ্চাঙ্ক নাটক। অঙ্কপাত করা [দাগ কাটা]: মাটিতে অঙ্কপাত করিয়া সন্ধ্যাসী তাহার ভবিষ্যৎ গণনা করিলেন। পদাঙ্ক [পদচিহ্ন]: প্রাতিঃস্বরণীয় ব্যাক্তগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আমাদের চলিতে হইবে।

● আলাপ>বাক্যালাপ [কথাবাতা]: তাহার সহিত আমার বাক্যালাপ বন্ধ। আলাপ করা [পরিচয় করা]: আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম। সুরের আলাপ [সুর ডাঙা]: বডে গোলাম আলি প্রথমেই ভৈরব রাগে আলাপ শুরু করলেন।

● উত্তর>উত্তর দেওয়া [জবাব দেওয়া]: 'উত্তর দাও' আদি পিতা ভগবান।' উত্তর দিক [দিক-বিশেষ]: শীতকালে উত্তর দিক হইতে হিমেল বাতাস বহিতে থাকে। উত্তরপুরুষ [বংশধর]: সেখানে এখন কবির উত্তরপুরুষের বাস করেন। উত্তরকাল [পরবর্তীকাল]: আজ বাহা সাহিত্যরূপে সৃষ্টি হইতেছে, উত্তরকালেই হইবে তাহার বপার্শ্ব ইত্যাদি। অষ্টোত্তর [আটের অধিক] শত: এ পুঁজার যে অষ্টোত্তর শত বিষয়বস্তুর প্রয়োজন। লোকোত্তর [অসাধারণ]: রবীন্দ্রনাথ ছিলেন লোকোত্তর প্রতিভার অধিকারী। দেবোত্তর [দেবজ বা দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত]: গুটা আমার দেবোত্তর সম্পত্তি, উহাতে হাত দিও না।

● কাগজ>লেখার কাগজ [লেখার উপকরণ]: আমার লেখার কাগজ নেই। কাগজ বাহির করা [পত্রিকা প্রকাশ করা]: 'নন্দ একদা হঠাৎ একটা কাগজ করিল বাহির।' কোম্পানীর কাগজ [সরকার কর্তৃক গৃহীত রূপের দলিল]: তিনি পঞ্চাশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ কিনেছিলেন।

● মুখ>মুখে আলা [বলা]: এমন কথা আর কখনো মুখে এসো না। মুখ ধারাপ করা [অসীল ভাষায় গালাগালি দেওয়া]: এখানে মুখ ধারাপ করো না

কিন্তু ; ভালো হবে না তাহলে । মুখ সামলানো [ সংযতভাবে কথা বলা ] : মুখ সামলিয়ে কথা বলা । মুখ খোঁলা [ কথা বলিতে শুরু করা ] : আজ তিনি মুখ খোলেননি । মুখ বন্ধ করা [ চূপ করা ] : তুমি এখন মুখ বন্ধ করবে কিনা ? মুখ চূপ [ লজ্জায় মলিন ] : সব শুনে বাবুয়া সব মুখ চূপ করে বসে রইলেন । মুখ রাখা [ সম্মান বজায় রাখা ] : ঠাকুর, থোকা যেন আমার মুখ রাখে । মুখ তুলে চাওয়া [ প্রসন্ন হওয়া ] : দেবতা যদি একবার মুখ তুলে চান, তাহলে আমার কোন অভাবই আর থাকবে না । মুখ করা [ গালি দেওয়া ] : লোকটা তোমাকে মুখ করে চলে গেল, আর তুমি কিছু বললে না ? মুখ নাড়া দেওয়া [ কটু ভৎসনা করা ] : তিনি তো দিনরাত আমাকে মুখ নাড়া দিচ্ছেন । মুখে আগুন [মৃত্যু কামনা করা] : যে এমন কথা বলে, তার মুখে আগুন । মুখে ফুল-চন্দন পড়া [ আশীর্বাদ বা শুভ কামনা করা ] : তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক । মুখ দেখানো [ সম্মানে চলা ] : কাজটা যদি না করতে পারি, তাহলে মুখ দেখানো বাবে না । মুখের কথা [ অত্যন্ত সহজ ] : বিলেত যাওয়া কি মুখের কথা ? মুখ পোড়ানো [ খুনাম নষ্ট করা ] : তুমি আমার মুখ পুড়িয়েছ, আর বেশী বকো না ।

●বুক>বুক কাটা [ বেদনাতে অন্তর বিদীর্ণ হওয়া ] : ওদের বুক কাটে তো মুখ ফোটে না । বুক দশহাত হওয়া, বুক ফুলিয়া ওঠা [ গবিত বা আনন্দিত হওয়া ] : ছেলের কৃতিত্বে বাবার বুক দশহাত হয়ে গেল [ ফুলে উঠলো ] । বুক দিস্নে পড়া [ সর্বশক্তি লইয়া উন্মোগী হওয়া ] : ভাইকে বাঁচাবার জন্যে তিনি বুক দিস্নে পড়লেন । বুক কোলানো [ গর্ব প্রকাশ করা ] : ওকে নিয়ে এত কাণ্ড হয়ে গেল, তবু সে এখনও বুক ফুলিয়ে চলে । বুক বাঁধা [ ধৈর্য ও সাহস অবলম্বন করা ] : এত ঝড়-ঝাপটা সত্ত্বেও তিনি কি করে বুক বেঁধে রয়েছেন, তাই ভাবি । বুক ভাঙ্গা [ অত্যন্ত মনঃকষ্ট হওয়া ] : একমাত্র ছেলে তার বুক ভেঙে দিয়ে চলে গেছে । বুকের রক্ত দেওয়া [ প্রাণ দেওয়া ] : স্বাধীনতার বেদীমূলে দেশের ক্ষুদ্রিরামের দলই বুকের রক্ত দিয়েছে । বুক হাত দিস্নে বলা [ সাহস বা আন্তরিকতার সঙ্গে ] : বুক হাত দিয়ে বলো তো, তুমি ভয় পাওনি !

●মাথা>মাথা পেতে নেওয়া [ শিরোধার্য করা ] : তিনি যদি আমাকে কোন শাস্তি দিতেন, আমি তা মাথা পেতে নিতাম । মাথা কেনা [ আত্মা বহন করা ] : আমি কেন তাঁকে হুক কথা বলতে পারবো না ? তিনি কি আমার মাথা কিনেছেন ? মাথা কাটা যাওয়া [ অপমান বোধ করা ] : এত লোকের হাঁকখানে সে এমন কাণ্ড করলো যে, লজ্জায় আমার মাথা কাটা গেল । মাথা খাওয়া [ দিবি দেওয়া ] : ‘মাথা খাও, তুলিয়ো না, খেরো মনে করে ।’ মাথা খাওয়া [ খতাব নষ্ট করে দেওয়া ] : তুমিই তো আব্দার দিয়ে দিয়ে ছেলেরটার মাথা খেয়েছো । মাথা খোঁলা [ অত্যন্ত প্রণয় দেওয়া ] : যেমন তাকে মাথায় তুলেছো, তেমনি এখন তার কল তোপ করো । মাথা ব্যথা [ হুচিন্তা ] : পাড়ার কার কি হলো, না হলো, তোমার

হাতে এত মাথাবাথা কেন? মাথা হেঁট হওয়া [অগমান বোধ করা]: এমন কিছু করো না, হাতে লোকের কাছে আমার মাথা হেঁট হয়। মাথা খাটানো [বুজি খাটানো]: লোকটা মাথা খাটিয়ে কলটা বানিয়েছে বেশ, তাই না? মাথা ঘামানো [চিন্তা করা]: ওই সব বাজে কথায় মাথা ঘামিয়ে কোন লাভ আছে কি? মাথা [প্রধান]: তিনি গাঁয়ের মাথা, তাঁকে সব কথা বলতে হবে বৈ-কি? মাথা [বোধশক্তি]: দেখতে অমন হলে কি হবে, গড়াভনায় ছেলেটার খুব মাথা আছে। মাথা গরম করা [চট্টা বাওয়া]: অত সহজে আমি মাথা গরম করিনা হে। মাথা ঠাণ্ডা করা [উত্তেজনা দূর করা]: মাথা ঠাণ্ডা করে একবার কথাটা ভেবে দেখো। মাথায় হাত বুলানো [ঠকানো]: সে তার মাথায় হাত বুলিয়ে তার অমন দামী ঘড়িটা হাতিয়ে নিয়েছে। মাথায় হাত [হুচিন্তাগ্রস্ত]: বন্ধুর বুদ্ধিতে চলতে গিয়ে সর্ব্ব খুইয়ে এখন তাঁর মাথায় হাত। মাথায় বাড়ি [সর্বনাশ]: আমার মাথায় বাড়ি, আমি কি অমন কথা বলেছি? মাথায় ওঠা, মাথায় চড়া [প্রশ্ন পাওয়া]: অতিরিক্ত আব্দারে ছেলেটা মাথায় উঠেছে [মাথায় চড়েছে]। মাথার উপর কেউ না থাকা [অভিভাবক-হীন হওয়া]: ছেলেটার মাথার উপর কেউ নেই বলে তুমি ওকে যা খুই তাই বলবে? মাথায় কাঁঠাল ভাজা [প্রবন্ধনা করিয়া আশ্রয় করা]: ধনীরা চিরকাল গরীবদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে আরও ধনী হয়েছে। মাথা ঠেকানো [প্রণাম করা]: 'স্নেহের সে দানে বহু সমানে বারেক ঠেকানু মাথা।' মাথা [কিছু না]: গান শিখে কী হবে, মাথা? মাথায় করে রাখা [সম্মত পালন করা]: লেখাপড়া কর মন দিয়ে, আমি তোমাকে মাথায় করে রাখবো। মাথা তোলা, মাথা চাড়া দিয়ে উঠা [নবচেতনার জাগরিত হওয়া]: আজ এশিয়া-আফ্রিকার পরাধীন দেশগুলি একে একে মাথা তুলে উঠে দাঁড়াচ্ছে [মাথা চাড়া দিয়ে জেগে উঠছে]। মাথা বিক্রি করা [বস্ত্রতা স্বীকার করা]: আপনায় আপিসে চাকরি করি বলে কি আপনায় কাছে মাথা বিক্রি করেছি? মাথার ঘাম পায়ে ফেলা [কঠোর শ্রম করা]: মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যারা ফসল কলায়, তারা ফসলের মালিক নয় কেন?

● হাত > হাত করা [বশে আনা]: বড়বাবুকে হাত করে সে দিবা ছুটির ব্যবস্থা করে নিয়েছে। হাত কামড়ান [আপসোস করা]: তখন চাকরিটা নিলাম না, এখন তাই হাত কামড়াচ্ছি। হাত খালি [রিক্তহস্ত]: এখন তাঁর একেবারে হাত খালি। তাঁর কাছে চেয়ে এখন কিছু পাবে না। হাত ধরচ [খুঁচা ব্যয়]: তাঁর এখন হাত ধরচেরই টাকার অভাব। হাত-খোলা [দানশীল]: তাঁর মতো হাত-খোলা মানুষ এ অঞ্চলে একটিও নেই। হাত শুটান [নিরস্ত হওয়া]: টাকার দাম কমে যাওয়ায় অনেক ব্যবসায়ী এখন হাত শুটিয়ে বসে গেছে। হাত পৌনা, হাত দেখা [ভাগ্য বিচার করা]: ঠাকুরমশাই হাত দেখেন। দেখে [হাত শুনে] বলেছেন, আমি পাস করবো। হাতটান [হিঁচকে হুঁরি অত্যাশ]:

লোকটাকে একটু চোখে-চোখে রেখো, ওর একটু হাতটান আছে। হাত তোলা [প্রহার করা]: তুমি ওর গায়ে হাত তুলেছ কেন সাহসে? হাত পাঁকান [অভ্যাসি ঘরা পটু হওয়া]: ছোটবেলা থেকে লিখে লিখে সে পণ্ড লেখার বেশ হাত পাকিয়েছে। হাত-পা বাঁধা [নিরুপায়]: ও-ব্যাপারে আমার হাত-পা বাঁধা, কিছু করবার আমার উপায় নেই। হাত-বদল [অধিকার পরিবর্তন]: ওপর তলার ভূমি হাত-বদল হয়ে গেছে, কৃষকেরা যে ভিমিরে, সেই ভিমিরে। হাতে খড়ি [প্রথম শিক্ষা]: ইকুলেই আমার কবিতা লেখার হাতে খড়ি। হাতে ধরা [সনির্বন্ধ অত্যাচার করা]: আমি তাঁকে আমার বাড়ি আসবার জন্যে হাতে ধরে বলেছি, তাতেও কি উনি আসবেন না? হাতে নম্র ভাতে মারা [প্রহার না কবিতা অথ উপায়ে দুর্বল করা]: ভারতীয়েরা ইংরেজদের হাতে নম্র ভাতে মারিয়াছিল। হাতে নাতে [বমাল]: চোরটা হাতে-নাতে ধরা পড়েছে। হাতে-পাওয়া [আয়ত্তে পাওয়া]: তোমাকে যখন একবার হাতে পেয়েছি, তখন সহজে ছাড়ছি না। কপালে হাত দেওয়া [ভাগ্যের দোহাই দেওয়া]: সক্ষম থাকতে কিছু কবোনি, এখন কপালে হাত দিলে হবে কি? কাঁচা হাত [অপটু হাত]: ছবিটা নিতান্তই কাঁচা হাতের আঁকা। পাকা হাত [পটু হাত]: দেখলেই বোঝা যায়, এটা পাকা হাতের কাজ। হাতে-কলমে [নিজে পরীক্ষা করিয়া]: হাতে-কলমে যা দেখা যায়, তা কেউ কখনো ভুলতে পারে না। হাত পাতা [ভিক্ষা করা]: বাংলার জন্ত আজও আমাদের বিদেশীর কাছে হাত পাততে হয়। হাতযশ [স্বক বা পারদর্শী বলিয়া খ্যাতি]: মানসিক যোগেব চিকিৎসায় আমাদের ডাক্তারবাবু খুব হাতযশ।

●গা>গা করা, গা দেওয়া [মনোযোগ দেওয়া]: আপনি যদি একটু গা করেন [গা দেন] তা হলে কাজটা হয়। গা-গতর [সবাক]: সারাদিন খেটে খেটে গা-গতব বাধা হয়ে গেছে। গা জুড়ানো [শাস্তি পাওয়া বা শাস্তি দূর করা]: সে মরলে আমার গা জুড়ায়। এখানে বাতাসে বসে একটু গা জুড়াই। গা জোঁরি, গা-জুরি [জবরদস্তি]: গা-জোঁরি করলে তো চলবে না। আইনমতো চলতে হবে। গা ঝাড়া দিয়ে ওঠা [জড়তা ভাগ করিয়া কাজে লাগা]: এখনই গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াতে হবে আমাদের। গা-জালা করা [বিরক্তির উত্থেক হওয়া]: ওর রকম-সকম দেখে আমার গা-জালা করে। গা ঢাকা দেওয়া [আত্মগোপন করা]: পুলিশ আসতেই চোরটা অন্ধকারে গা ঢাকা দিল। গা ঢেলে দেওয়া [শয়ন করা]: সারাদিনের ক্লাস্তি পর বিড়ানায় এইমাত্র গা ঢেলে দিয়েছি; এখন আর উঠতে পারবো না। গা তোলা [ওঠা]: বেলা অনেক হয়েছে, এবার গা তোলা। গা-সহা, গা-সওয়া [অভ্যাস]: সব রকমের অপমানই এখন তার গা সওয়া হয়ে গেছে। গায়ে-কাঁটা দেওয়া [আতঙ্কে রোমাঞ্চ হওয়া]: 'কাঁ ডরানক লড়াই হলো যা যে শুনে তোমার গায়ে দেবে কাঁটা।' গায়ের জালা [ঈর্ষা]: সে ভাল চাকরি পেয়েছে, তাতে তোমার গায়ের জালা কেন? গায়ের কাল ঝাড়া, গায়ের কাল মেটান [প্রচণ্ড ক্রোধ প্রকাশ করা]: ওকে একবার

সুমনে পেলে প্রাণের আনন্দে গায়ের বাল বাঁড়বে [মেটাবে]। গায়ের খুঁতু দেওয়া [অত্যন্ত ঘৃণা প্রকাশ করা] : কারখানার লোহা-লব্ধের গায়ে খুঁতু দিয়ে সে গায়ে কিরে এলো। গায়ের পড়িয়া [অস্বাচিতভাবে] : তুমি আবার গায়ে পড়ে আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে এলে কেন? গায়ের ফুঁ দিয়ে বেড়ান [পরিভ্রম-বিমুখ হইয়া চলা] : কতদিন এভাবে গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াও, আমি দেখব। গায়ের মাথা [আমল দেওয়া] : ও ছেলেমাহুষ—কিছু জানে না; ওর কথা গায়ে মাখবেন না। গায়ের মাস লাগা [হুটেপুটে হওয়া] : দেওঘরে গিয়ে ওর গায়ে মাস লেগেছে, দেখছি। গায়ের হাত তোলা [প্রহার করা] : কোন সাহসে তুমি ওর গায়ে হাত তুলেছ?

●চোখ>চোখ ওঠা [চক্ষুরোগবিশেষ হওয়া] : 'বোধ হয় রূপসীর চক্ষু উঠিয়াছে!' চোখ খোলা, চোখ ফোটা [প্রকৃত জ্ঞানলাভ করা] : সমস্ত দেখে-শুনে এতদিনে তার চোখ খুলেছে [চোখ ফুটেছে]। চোখ পাকান, চোখ রাঙান [রাগ দেখানো] : আপনি এভাবে আমাদের চোখ পাকাচ্ছেন [চোখ রাঙাচ্ছেন] কেন? চোখ টেপা, চোখ ঠাৱা [ইশারা করা] : তিনি চোখ টিপে [চোখ ঠেরে] আমাকে বসে পড়তে বললেন। চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো [স্পষ্ট প্রমাণসহ বোঝানো] : ব্যাপারটা তাঁকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে, নইলে তিনি বিশ্বাস করবেন না। চোখে চোখে রাখা [সতর্ক দৃষ্টি রাখা] : নতুন চাকরটাকে একটু চোখে চোখে রেখো। চোখে মুখে কথা বলা [বাচালতা করা] : ছেলেটা যেন চোখে মুখে কথা বলছে। চোখের বালি [চক্ষুশূল ব্যক্তি] : আমি যেন ওর চোখের বালি, আমাকে উনি একেবারেই সহিতে পারেন না। চোখে সরষে ফুল দেখা [দিশাহারা হওয়া] : বাবা মারা যাবার পর বিমল চোখে সরষে ফুল দেখলো। চোখের মাথা খাওয়া [অন্যবৎ আচরণ করা] : কিছুই দেখতে পাচ্ছো না; চোখের মাথা খেয়েছো নাকি? চোখ কপালে ওঠা [অত্যন্ত আশ্চর্য হওয়া] : বাব্বার জ্বিনিসপত্রের দাম শুনে মদনাবুর চোখ কপালে উঠলো। চোখ টাটানো [ঈর্ষা হওয়া] : তোমার উন্নতি দেখে আজ আমার চোখ টাটাচ্ছে। চোখের চামড়া, চোখের পর্দা [লজ্জা-সরষ] : লোকটার চোখের চামড়া [পর্দা] বলতে কিছুই নেই, নইলে আমার এই বিপদের দিনে টাকা চাইতে আসে? চোখে পড়া [দ্রষ্টব্য হয়ে ওঠা] : চোখে পড়বার মতো চেহারা তার ছিল না।

●কান>কান কাটা [সম্পূর্ণ পরাস্ত করা : মেরেটা সব বিষয়েই বেশী নবর পেয়ে ছেলের কান কেটেছে। কান কাটা [নির্গজ্ঞ] : রাসুর মত কান কাটা লোক আমি একটাও দেখিনি; কিছুতেই ওর লজ্জা নেই। কান দেওয়া [শোনা, গ্রাহ্য করা] : ওই বাচাল লোকটার কথার তুমি কান দিচ্ছ কেন? কান পাটলা [অপরের কথার সহজে আস্থা-স্থাপনকারী] : তিনি ভারী কান পাটলা লোক : যে বাই বলে, তাই তিনি সত্যি বলে বিশ্বাস করে বলেন। কান

পাতা [ কোন কিছু শুনিতে প্রস্তুত হওয়া ]: 'আমি কান পেতে রই আপন কথার-  
গহন ঘারে।' কান ভাজান [ কাহারও বিরুদ্ধে কিছু বলিয়া মনোমালিন্য সৃষ্টি  
করা ]: জানি, আমার বিরুদ্ধে নানাকথা বলে সে তোমার কান ভাঙ্গিয়ে দিয়েছে।  
কান ভাঙ্গী-করা [ কাহারও বিরুদ্ধে অন্তের মন বিবাক্ত করিয়া দেওয়া ]: তাঁর  
নিন্দা করে তুমি আমার কান ভাঙ্গী করতে এসেছো? কানে আঙুল দেওয়া  
[ অশ্রাব্য কিছু শুনিতে না চাওয়া ]: সে যা বলেছে, শুনেছি তুমি কানে আঙুল দেবে।  
কানে ওঠা [ কর্ণগোচর হওয়া ]: কথাটা যখন একবার কর্তার কানে উঠেছে, তখন  
তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। কানে তাল লাগা [ ভয়ানক উচ্চ গোলমালের জন্ত  
শুনিতে না পাওয়া ]: পূজা-বাড়ীর হৈ-হটগোলে কানে তাল লাগার উপক্রম হয়েছে।  
কানে তোলা [ শুনান, গ্রাহ্য করা ]: পুরুষ মানুষের কানে কি বাড়ির সব কথা  
তুলতে আছে? সে আমার কথা কানেই তুললো না। কানে যাওয়া [ শুনিতে  
পাওয়া ], কানের মাথা খাওয়া [ শুনিতে না পাওয়া ]: এত ডাকছি, তবু তোমার  
কানে গেল না; বলি, কানের মাথা খেয়েছো নাকি!

● গলা > গলা টিপলে দুধ বেরোয় [ নিতান্ত শিশু বা অজ্ঞ ]: গলা টিপলে  
যার দুধ বেরোয়, সেই বাপ্পার মুখে কিনা এই কথা! গলায় গলায় [ অত্যন্ত  
ঘনিষ্ঠ ]: চন্দন আর রক্তনের এখন গলায় গলায় ভাব। গলাবাজি [ চেষ্টামেচি,  
বক্তৃত ]: 'আমরা গান শুনতে এসেছি, কারও গলাবাজি শুনতে আসিনি। গলায়  
পড়া [ গলগ্রহ হওয়া ]: দিদি জামাইবাবু গত হলেন, আর শেষে ভাগনেটা আমার  
গলায় এসে পড়লো। গলায় দড়ি [ ঝিকারহচক উক্তি ]: তোমার মুখে আমাকে  
এই কথা শুনতে হলো? আমার গলায় দড়ি!

● নাক > নাক উঁচান, নাক বাঁকান, নাক সিট্‌কান [ ঘৃণা প্রকাশ  
করা ]: আমাদের কাজ দেখে সে নাক উঁচিয়ে [ নাক বেঁকিয়ে বা নাক সিট্‌কিয়ে ],  
চলে গেল। নাক মলা, নাকে খত দেওয়া [ স্বকৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত  
করা ]: এই আমি নাক মলছি [ নাকে খত দিচ্ছি ], আর যদি ওদের হয়ে কোন  
কথা বলি। নাক গলান [ অনধিকার-চর্চা করা ]: তুমি বিজ্ঞানের লোক;  
সাহিত্যের ব্যাপারে নাক গলাতে এসেছ কেন? নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরান [ অত্যন্ত  
বলীভূত করে ফেলা ]: কটা টাকা ধার দেবে বলে সে ওকে নাকে দড়ি দিয়ে  
ঘোরাচ্ছে। নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভাঙ্গ করা [ নিজের সমুহ কতি করে  
পরের অসুবিধা সৃষ্টি করা ]: পাড়ার ছেলেরা খেলতো বলে অমন সোনার মতো  
জরি লোকটা জলের দামে বিক্রি করে দিলে। নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভাঙ্গ  
করা আর কাকে বলে?

● মল > মল ওঠা [ আশা মেরা ]: অত পেয়েও ছেলেরা কিছুতেই মল  
ওঠে না। মল করা [ সংকল্প করা ]: 'করিলাম মন জীবদ্দাবন বারেক আসিব  
কিরি।' মল কথাকষি [ পরস্পর মনোমালিন্য ]: এখন দুই শরিকের খুব মল  
কথাকষি চলেছে। মল কেমন করা [ অস্থির বা ব্যাকুল হওয়া ]: সকাল থেকে

মুয়ের ভক্ত মন কেমন করছে। মন খারাপ হওয়া [বিবাদগ্রস্ত হওয়া]: তার কথা শুনে কাল থেকে আমার মন খারাপ হয়ে গেছে। মন খোলা [সরল]: এমন মন-খোলা লোক আজকালকার দিনে সত্যিই বিরল। খোলা মন [সংস্কারহীন মন]: খোলা মন নিয়ে বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত। মন খোলা [মনের কথা খুলে বলা]: তোমাকে আমার সব কথাই মন খুলে বললাম, এখন যা করার করো। মন গলা [করণাপরবশ হওয়া]: তাঁকে সমস্তই বললাম, তবুও তাঁর মন গললো না। মন জোগান [মনের মতো কাজ করিয়া প্রসন্ন করা]: নতুন বউ এখন শাড়ির মন জুগিয়ে চলবে, এইটেই আশা করেছিলাম। মন-মরা [বিষন্ন]: সারাদিন ভুমি এমন মন-মরা হয়ে থাকো কেন? মনে করা [কল্পনা করা]: 'মনে করো, যেন বিদেশ ঘুরে মাকে নিয়ে বাড়ি অনেক দূরে।' মনে দাগকাটা [স্থায়ী স্মৃতি থাকা]: তাঁর কথা আমাদের মনে দাগ কেটেছে। মনে ধরা [পছন্দ হওয়া]: ছেলেটিকে বাবা-মার খুব মনে ধরেছে। মনে পড়া [স্মরণ হওয়া]: আজ মনে পড়ছে, ১৯৪৮ সালের বাইশে প্রাণের কথা। মনের আগুন [শোকহঃপাদিজনিত মানসিক ব্যথা]: মনের আগুন কি চোখের জলে নেভে? মনের কালি [মনোমালিন্য]: ভালোবাসাতেই মাহুষের মনের কালি দূর হবে। মনের জোর [আত্মবিশ্বাস]: শুধু মনের জোরেই এতগুনি পথ একদিনে হেঁটে আসতে পেরেছি। মনের ঝাল ঝাড়া, মনের ঝাল মিটান [অস্তরের ক্রোধ প্রকাশ করা]: অনেক দিন পরে আমাকে কাছে পেয়ে উনি মনের ঝাল ঝাড়লেন [মিটালেন]। মনের মতো [পছন্দসই]: শুধু এই লাইব্রেরীতেই আমি আমার মনের মতো বই পাই। মনের মানুষ [পছন্দসই ব্যক্তি]: 'আমি কোথায় পাবো তারে আমার মনের মাহুষ খে রে?' মনের মিল [সঙ্গাব]: ওদের ভাইদের মধ্যে আশ্চর্য মনের মিল দেখছি।

৩ কথা > কথা কাটাকাটি [তর্ক-বিতর্ক]: মিছামিছি কথা কাটাকাটি করে কি লাভ? কথা দেওয়া [প্রতিশ্রুতি দেওয়া]: কথা দিলাম, সামনের শনিবারে ওখানে যাবো। কথা চালা, কথা পাড়া [প্রস্তাব করা]: তখন অবস্থা বুকে আমি কথাটি চাললাম [পাড়লাম]। কথাবার্তা [আলাপ-আলোচনা]: ওর সঙ্গে সেদিন ও বিষয়ে কোন কথাবার্তা হঠাৎ হয়নি। কথা রাখা [প্রতিজ্ঞা পালন করা]: জীবন দিয়েও আমি আমার কথা রাখবো। কথা শোনা [কথা মانت করা]: ছেলেরা আজকাল আর আমার কথা শোনে না। কথাই কথা [প্রসঙ্গক্রমে]: কথায় কথায় সেদিন ওর বগড়া বাধিয়ে বসলো। কথাই কথা [মূল্যহীন কথা]: ওটা বলেছি কথার কথা, ওটাকে অত গুরুত্ব দিচ্ছেন কেন? ছোট মুখে বড় কথা [সামান্য ব্যক্তির বৃহৎ ব্যাপায়ে মন্তব্য করা]: আর বাই হোক, ছোট মুখে বড় কথা মানার না। কথাই মতো কথা, লাখ কথাই এক কথা [উচিত কথা]: সেদিন সে যা বলেছে কথার মতো কথা [লাখ কথার এক কথা]।

## ● বিশেষণ পদের বিশিষ্ট অর্থ প্রয়োগ

৩ বড়>বড় কথা [প্রধান কথা, স্পষ্ট উক্তি]: খুব বড় কথা বলেছো তুমি। ছোট মুখে বড় কথা ভালো শোনায় না। বড় কুটুম [স্বজন]: একে চিনতে পারলে না? তোমার বড় কুটুম গো। বড় গলা [উচ্চ গলা]: সেদিন সে নিজের ছেলের কথা খুব যে বড় গলায় বলে এসেছিল, আজ কি হলো? ওর ছেলে যে একটি চোর, তা যে সবাই জেনে ফেলেছে। বড় জোর [খুব বেশী হয়তো]: কতোই বা ওর বয়স হবে?—বড় জোর কুড়ি। বড় বাড়ি [বড় শরিকের বাড়ি]: বড় বাড়িতে আজ সকলের নেমস্তব্ব। বড়লোক [ধনী ব্যক্তি]: বড়লোকেরা গরীবদের কথা একেবারেই ভাবে না। বড় মানুষী, বড় মান্ধি [ধনী লোকের অভিনয়]: আমরা গরীব বলে বড় মান্ধি করতে এসো না, মেজবউ। বড় হওয়া [খ্যাতিমান হওয়া]: দেখো, তোমার ছেলে কত বড় হবে। বড় মানুষ [মহাপুরুষ]: বিজ্ঞানাগর মহাশয় যে কত বড় মানুষ ছিলেন, তাহা বুঝিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। বড় মুখ করে আসা [প্রত্যাশা নিয়ে আসা]: সে তোমার কাছে সেদিন কত বড় মুখ করে এসেছিল, আর তুমি কিনা তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলে? বড়বাবু [প্রধান বাবু]: ‘হেড-আপিসের বড়বাবু লোকটি বড় শাস্ত।’

\* ছোট>ছোট নজর [দৃশ্য]: তোমার যে এত ছোট নজর হবে, তা আমি আগে ভাবতে পারিনি। ছোট কাজ [হেয়]: ছোট কাজ করে বলে মাহবটাকে ছোট ভেবো না। ছোট জাত [অবনত সম্প্রদায়]: সমাজের ছোট কাজগুলো করে বলেই কি হাড়ি-মুচি-ডোম—এরা ছোট জাত? ছোট আদালত [ক্ষমতার নিম্নতর]: ছোট আদালতে জিতেছো তো কি হয়েছে? আমি আবার আদালত করবো। ছোট হস্বে যাওয়া [সম্মান নষ্ট হওয়া]: তুমি কথাটা বলাতে আমি ওর কাছে ছোট হয়ে গেলাম। ছোট হওয়া [নম্র]: ‘বড় যদি হতে চাও ছোট হও তবে।’ মুখ ছোট হস্বে যাওয়া [সংকুচিত হওয়া]: দেখলে না, আমাকে দেখে ওর মুখ কেমন ছোট হয়ে গেল। ছোট করা [মর্দাদায় হানি করা]: তুমি ওভাবে আমাকে ওর কাছে ছোট করলে কেন? ছোট লোক [অভদ্র]: ‘ছি! ছি! আমাকে ও এত ছোট লোক মনে করে!’

● কাঁচা>কাঁচা পথ [মাটির তৈয়ারী]: দশ মাইল কাঁচা পথ গোকর বাড়িতে করে যেতে হবে। কাঁচা বয়স [তরুণ]: তোমাদের কাঁচা বয়স, তোমরা এখন রাতকে ঘিন করতে পারো। কাঁচা বুদ্ধি [অপরিশ্রুত]: তোমার যে এমন কাঁচা বুদ্ধি হবে, তা কি আমি আগে জানতাম? কাঁচা লেখা [অপটু]: এটা বড় কাঁচা লেখা, পরিকার ছাপা যাবে না। কাঁচা কাজ [অদক্ষভাবে কৃত]: সব কেনেও তুমি এমন কাঁচা কাজ করলে কেন? অন্ধ কাঁচা [অদক্ষ]: রমেন অন্ধ বড় কাঁচা। কাঁচা কথা [অনির্ভরযোগ্য প্রতিশ্রুতি]: কোনো রাততে পারবে না, তবু এমন কাঁচা



কথা তাকে দিয়ে এলে কেন? কাঁচা খাতা [খসড়া]: হিলাব কাঁচা খাতার তুলেছো, অকচ পাঁচা খাতার তোলোনি। কাঁচা রং [অস্বাদ্য]: এ তো কাঁচা রং, এলে খুলেই উঠে যাবে। কাঁচা সোনা [বিশুদ্ধ]: এটা কাঁচা সোনার গয়না। কাঁচা পয়সা [সহজলভ]: তার হাতে এখন কাঁচা পয়সা আসছে কিনা, তাই সে ধরাকে সরাভান করছে। কাঁচা ঘুম [অপূর্ণ]: কাঁচা ঘুম থেকে উঠে ছেলেটা খালি কাঁচছে। কাঁচা মাল [স্বাভাবিক উৎস্র প্রযা]: কাঁচা মালের অভাবে কারখানাটি বন্ধ হয়ে যাবার মুখোমুখি। কাঁচা হাত [অশু.হাত]: ছবিটা কাঁচা হাতের আঁকা।

● পাকা>পাকা চোর [অভিজ্ঞ চোর]: ‘বাবু কন্ হেসে, বেটা সাধুবশে পাকা চোর অভিশয়।’ পাকা ছেলে [স্বাস্থ্য]: হারু বড় পাকা ছেলে। পাকা কাজ [নিপুণভাবে কৃত]: তোমার কাছ থেকে এই রকম পাকা কাজই আশা করেছিলাম। পাকা লেখা [নিশ্চিত ধরন-প্রাপ্ত]: এ রকম পাকা লেখা তোমার চাড়া আর কার হবে? পাকা খাতা [চূড়ান্ত হিসাবের খাতা]: হিসেবটা পাকা খাতার তুলেছো তো? পাকা রং [স্থায়ী]: কাপড়টাব বং পাকা, কাচলে উঠবে না। পাকা পাঁচ সের [পাকা ওজন]: গাইটা তুধ দিত পাকা পাঁচ সের। পাকা বাড়ি [দৃঢ় ইটের তৈয়ারী]: ঝড়ের দিন সবাই রায়বাংদের পাকা বাড়িতে গিয়ে উঠেছিল। পাকা কথা [অপবিত্রনীয়]: আমি তোমাকে পাকা কথাই দিলুম, ওর কোন নড়চড় হবে না। পাকা দলিল [অটনায়মাবে সম্পাদিত]: বাকি টাকাটা দিয়ে আমি পাকা দলিল করিয়ে নেব। পাকা সোনা [খাঁটি]: দেখছো কি, সমস্ত গয়নাই পাকা সোনার। পাকা হাড় [শ্রমে অভ্যস্ত]: পাকা হাড়, তুই এত কড়-কাপটায় ভাঙেনি। পাকা ফলার [লুচ-মিঠাইসহ]: রায়বাড়িতে সেদিন হয়েছিল পাকা ফলারের আয়োজন। পাকা দেখা [বর বা কনেকে আনিবান্দ]: সেদিন ছিল রায়বাবুর মেয়ের পাকা দেখা। পাকা ঘুঁটি কাঁচিয়া যাওয়া [সম্পন্ন-প্রায় কাজ পণ্ড]: আর দুটো দিন হলেই কাজ হামিল হয়ে যেত। কিন্তু তার আগেই বুড়োর ছেলে এসে গেল; আর পাকা ঘুঁটি একেবারে কেঁচে গেল। পাকা খালে মই [স্বসম্পন্ন কাজ পণ্ড]: তুমি আমাকে দেখতেই পারো না কেন? আমি কি তোমার পাকা খানে মই দিয়েছি? পাকা মাথা [প্রবীণ ব্যক্তি]: কোন কাজ করবার আগে পাকা মাথার বুদ্ধি নিও। পাকা হাত [নিপুণ]: স্পষ্টই বোকা বার, এটা পাকা হাতের কাজ। পাকা মাথায় সিঁদুর পরা [প্রবীণ বয়স পর্বত লম্বা থাকা]: আনিবান্দ করি, পাকা মাথায় সিঁদুর পরো।

● খোলা>খোলা মাঠ [উন্মুক্ত মাঠ], দিল্ খোলা [উদার হৃদয়]: ‘খোলা মাঠের উপদেশে দিল্-খোলা হই তাই রে।’ খোলা মন [সংস্কারহীন মন]: খোলা মন নিয়ে চিন্তা করুন, দেখবেন এতগুলি অর্থহীন। মুখ-খোলা [অকপট]: এমন মুখ-খোলা লোক আমি আর দেখিনি। খোলা হাওয়া [বৃষ্টি বাতাস]: তোরের খোলা হাওয়ার একটু বেড়িয়ে এসো।

● বাসি>কাপড় বাসি করা [যৌত করা]: খোশাকে কাপড়টা বাসি করে

## শব্দের বিশিষ্ট প্রয়োগ

বানিতে বলেছে। তো ? বাসি ভাত [ পূর্ব দিনে প্রস্তুত ] : ‘বাসি ভাত খাও, বাছা, ঐ ঢাকারয়েছে।’ বাসি খবর [ অতি পুরাতন ] : মহাশয় থেকে মাহুব খুরে এসেছে, ওটা তো বাসি খবর। বাসি কাপড় [ পূর্ব রাজ্যে, পরিহিত বস্ত্র ] : বাসি কাপড়ে পূজার ফুল তুলো না। বাসি ঘর [ দিনের মধ্যে যে ঘর সাক করা হয় নাই ] : ঝাঁট পড়েনি, বাসি ঘর এখনও পড়ে আছে। বাসি জল [ পূর্ব দিনে তোলা জল ] : এক গেলাস বাসি জল খেয়ে নাও, দেখি। বাসি দুধ [ পূর্ব দিনে যে দুধ দোহন করা হইয়াছে ] : বাসি দুধ কখনও খাবে না। বাসি ফুল [ পূর্ব দিনের তোলা ফুল ] : বাসি ফুলে কোন পূজা হয় না। বাসি বিয়ে [ হিন্দু-বিবাহের পরদিন আচরণীয় অনুষ্ঠান ] : পাড়ার মেয়েরা দল বেঁধে বাসি বিয়ে দেখতে এলো। বাসি মড়া [ যে শব গভরাজির মধ্যে দাহ করা হয় নাই ] : বড় ছেলে ছিল দিল্লীতে ; তাই সরকার মশাইয়ের স্বতদেহ বাসি মড়া হয়ে গেল। বাসি মুখ [ প্রভাতে নিদ্রা-ভঙ্গের পর যে মুখ প্রক্ষালিত হয় নাই ] : তুমি বাসি মুখে চা খাও ?

● সাদা > সাদা মন [ সংস্কারহীন মন ] : সাদা মন নিয়ে ব্যাপারটা চিন্তা করে দেখুন। সাদা কথা [ সহজ কথা ] : সাদা কথায় বলে, মরা হাতি লাখ টাকা। সাদা হাত [ নিরাভরণ হাত ] : মেয়েটার সাদা হাতের দিকে তাকান যায় না। সাদাসিধে [ বিলাস-বঞ্চিত ] : লোকটি অত্যন্ত সাদাসিধে। সাদা-মাঠা [ কারু-কার্হীন ] : উনি পাঞ্জিকার জন্তে একটা সাদা-মাঠা গল্প লিখেছেন।

## ● ক্রিয়াপদের বিশিষ্ট অর্থে প্রয়োগ

● কাটা > কথা কাটাকাটি [ তর্ক-বিতর্ক করা ] : মিছিমিছি কথা কাটাকাটি করে তো কোন লাভ নেই। কোড়ন কাটা [ বিক্রম করা ] : ওরা কোড়ন কাটতেই তো ওস্তাদ, কাজটা করুক দেখি। ভুল কাটা [ দাগ দিয়া বাতিল করা ] : মাস্টার মশাই কত আর ভুল কাটবেন ? পুকুর কাটা [ খনন করা ] : রামবাবুয়া তেলিপাড়ার মাঠে একটা পুকুর কাটবেন। আঁক কাটা [ অঙ্কন করা ] : বইয়ের পাতায় আঁক কেটেছে কে ? ছড়াকাটা [ হ্রস্ব করে বলা ] : পদ্মবুড়ির মত ছড়া কাটতে কেউ পারে না। ভিলক কাটা [ দেহের নানা স্থানে চন্দনের ছাপ আঁকা ] : সারা গায়ে ভিলক কাটলে হবে কি ? লোকটা আসলে ভণ্ড। চেক কাটা [ লিখিয়া দেওয়া ] : বলামাত্রই তিনি এক হাজার টাকার একখানা চেক কেটে দিলেন। পথ কাটা [ তৈয়ারী করা ] : ‘চলার বেগে পথ কেটে চল, করিসনে আর দেরি।’ খাল কাটা [ খনন করা ] : তখনই বলেছিলাম, খাল কেটে কুমীর এলো না। ছামা কাটা [ তৈয়ারী করা ] : বাড়িতে ছানা কাটিয়ে সন্দেশ বানাতে তো আর বাধা নেই। টেরি কাট [ চুল বিক্ৰাস করা ] : সারাদিন ছেলোটোর টেরি কাটা ছাড়া আর কোন কাজই নেই। টেক কাটা, গাঁট কাটা [ চুরির উদ্দেশ্যে কাটা ] : টেক-কাটা টেক কাটে, গাঁট-কাটা গাঁট কাটে। তাল কাটা [ সমত্যাচ্য হওয়া ] : তাল কেটে থাকে, পা-টা আবার ধরো। মেঘ কাটা [ আকাশ পরিষ্কার হওয়া ] : আকাশের

বেশ কেটে বাচ্ছে। নেশা কাটা [ নেশা তিরোহিত হওয়া ] : নেশা কাটলে দেখলো, সে রাস্তার ধারে পড়ে আছে। ভুল কাটা [ সাহস হওয়া ] : তোমাকে দেখে আমার ভুল কাটলো। মাল কাটা [ বিক্রী হওয়া ] : বাজার বড় মন্দা, মাল কাটছে না তেমন। সাতার কাটা [ সাতার দেওয়া ] : সে রোজ সাতার কাটে।

● ওঠা > ওঠা [ জাগরিত হওয়া ] : 'উঠগো ভারতলক্ষী, উঠ অগতজনপূজা।' দাঁত ওঠা [ পছন্দ ] : শিঙটির দাঁত উঠিয়াছে। কানে ওঠা [ শুনিতে পাওয়া ] : একবার যখন কথাটা তাঁর কানে উঠেছে, তখন নিশ্চিত থাকতে পারো। কথা ওঠা [ প্রসঙ্গে আসা ] : সেদিন মিটিঙে সবার মাইনে বাড়ানোর কথা উঠেছিল। বাজারে ওঠা [ আর্থানি হওয়া ] : বাজারে এখন কাঠাল উঠেছে। ফসল ওঠা [ কাটা শেষ হয়ে যাওয়া ] : মাঠের ধান উঠে গেছে, এখন তো কলাই বুনতে পার। রুং ওঠা [ হুচিয়া যাওয়া ] : কাপড়টার রং উঠে গেছে। জাতে ওঠা [ পতিত অবস্থা হইতে মুক্তি লাভ ] : সে এখন জাতে উঠেছে। অন্ন ওঠা [ জীবিকা রহিত হওয়া ] : তুমি এখন থেকে আমার অন্ন উঠিয়ে তবে ছাড়লে, দেখছি। মন ওঠা [ সন্তোষ অন্য়ান ] : কোন ভিনিসেই তোমার মন ওঠে না। চোখ ওঠা [ চক্ষুরোগ-বিশেষ হওয়া ] : 'বোধ হয় রূপসীর চক্ষু উঠিয়াছে।' দোকান উঠে যাওয়া [ কারবার বন্ধিত হওয়া ] : চুনীবাবুর দোকান উঠে গেছে। প্রথা উঠে যাওয়া [ রহিত হওয়া ] : পণপ্রথা এখন প্রায় উঠে গেছে। ভাড়াটে উঠে যাওয়া [ বাড়ি বদল করা ] : তাঁরা এখন এখন থেকে বালিগঞ্জে উঠে গেছেন।

● তোলা > প্রসঙ্গ তোলা [ উত্থাপন করা ] : এখন ও প্রসঙ্গ তুলছো কেন? ঘুম থেকে তোলা [ জাগান ] : একে ঘুম থেকে তোলে কার সাধা? জাতে তোলা [ উন্নত করা ] : প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে তাকে জাতে তোলা হলো। বাড়ি তোলা [ নির্মাণ করা ] : বস্তির পাশে সে এখন পাঁচতলা বাড়ি তুলেছে। বাড়ি থেকে ভাড়াটে তোলা [ উচ্ছেদ করা ] : বাড়ি থেকে ভাড়াটে তোলবার অন্তে তিনি কি কম চেষ্টা করেছেন? দুধ তোলা [ বমন করা ] : ছেলেটা কাল থেকে দুধ তুলছে। হাই তোলা [ ত্যাগ করা ] : 'ভান পা তুলিয়ে তোলে হাই।' মাথা তোলা [ অবহার উন্নতি করা ] : আজ দেখি, পরাধীন জাতিগুলি একে একে মাথা তুলছে। হাত তোলা [ গ্রহণ করা ] : তুমি ওর গায়ে হাত তুলো না। পিঠের চামড়া তোলা [ বেবন গ্রহণ করা ] : সে বলছে, ওখানে গেলে এবার সে তার পিঠের চামড়া তুলে নেবে। কথা তোলা [ প্রসঙ্গে আসা ] : ও কথা এখন আর তুলে কি হবে? প্রথা তুলিয়া দেওয়া [ রহিত করা ] : অসিদ্ধারী প্রথা এখন তুলে দেওয়া হয়েছে। পটোল তোলা [ মারা যাওয়া ] : রূপণ বুড়োটা কাল রাতে পটোল তুলেছে। মাথায় তোলা [ প্রদান দেওয়া ] : তখন বলেছিলেন, ছেলেটাকে অত মাথায় তুলো না। সিকেয় তোলা [ বসিত রাখা ] : এখন তোমার প্রস্তাবটা সিকেয় তোলা থাক। লাইন তোলা [ উদ্ধৃত করা ] : সে লাইন তুলে দেখিয়েছে, রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনার সঙ্গে তার রচনার কতো মিল।

● **ধরা** > **বেশ ধরা** [পরিধান করা] : তুমি আমার সাধুর বেশ ধরলে কবে থেকে ? **চোর ধরা** [গ্রেপ্তার করা] : পুলিশ চোরটাকে ধরতে পারেনি। **গোঁ ধরা** [জিদ ধরা] : ছেলে গোঁ ধরেছে, পাস করে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বে। **কাউকে ধরা** [কোন কাজের জন্য মুকবি ধরা] : রায় মশাইকে ধরো, তাহলে দেখো, কাজটা ঠিক হয়ে বাবে। **রোগে ধরা** [আক্রমণ করা] : 'বিহুস বয়স বাইশ বখন রোগে ধরলো তারে।' **দোর ধরা** [হত্যা দেওয়া] : তারকেখরের দোর ধরে তাকে পেয়েছিলাম কোলে। **ঠাণ্ডায় গলা ধরা** [শব্দহীন হওয়া] : ঠাণ্ডায় তার গলা ধরে গেছে। **লোনা ধরা** [ছাপ লাগা] : ঘরের দেওয়ালে লোনা ধরতে শুরু করেছে। **মাথা ধরা** [বস্রণা হওয়া] : রোজ সকালে তার মাথা ধরে। **পা ধরে যাওয়া** [অবশ হয়ে আসা] : রেশনের 'কিউ'তে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ধরে গেছে। **ওষুধ ধরা** [কার্বিকর হওয়া] : কাল ধমক দিয়েছিলাম, আজ দেখছি, ওষুধ ধরেছে। **বৃষ্টি ধরা** [বন্ধ হওয়া] : বৃষ্টি একটু ধরলেই আমরা বেরিয়ে পড়বো। **রূপ ধরা** [সাজে সজ্জিত হওয়া] : 'স্নেহময়ীর রূপ ধরে মা দাঁড়িয়ে আছে মাঠের 'পরে।' **খুঁত ধরা** [দোষ খুঁজিয়া বাহির করা] : তুমি শুধু দিনরাত আমার কাজের খুঁত ধরতেই আছে। **তরকারি ধরে যাওয়া** [পুড়িয়া উঠা] : আলুর দমটা একটু ধরে গেছে। **উনাল ধরা** [জলিয়া উঠা] : এখনও উনুন ধরেনি, রান্না হবে কখন ? **বুড়ী ধরা** [হোয়া] : আমি আগে বুড়ী ধরেছি। **মন ধরা** [মনোমত হওয়া] : তোমার কথাটা তার খুব মনে ধরেছে। **ভূতে ধরা** [আচ্ছন্ন হওয়া] : তাকে ভূতে ধরেছে। **প্রাণ ধরা** [কোনমতে বাঁচিয়া থাকা] : বাছা, তোর জন্তেই আমি এতদিন প্রাণ ধরে আছি। **মানুষের মধ্যে ধরা** [গণ্য করা] : আমি তাকে মানুষের মধ্যে ধরি না। **ট্রেন ধরা** [বখাসময়ে আরোহণ করা] : তাড়াতাড়ি চলো, নইলে ট্রেন ধরতে পারবে না। **চুলে পাক ধরা** [প্রকাশ পাওয়া] : তাঁর চুলে পাক ধরেছে। **আফিম ধরা** [কু-অভ্যাস করা] : সে ইদানীং আফিম ধরেছে। **পৌ ধরা** [একান্ত অহুগত হওয়া] : সে তো বড়বাবুর পৌ ধরে আছে। **ম্যাও ধরা** [দারিদ্র নেওয়া] : গ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। কিন্তু একাজে ম্যাও ধরবে কে ? **হাত-পায়ে ধরা** [অত্যন্ত দীনভাবে অহরোধ করা] : তাঁকে হাতে-পায়ে ধরে বললুম, কিন্তু মনিবের দয়া হলো না। **ট্রেন স্টেশন ধরা** [থামা] : এই ট্রেনটা কোন্ কোন্ স্টেশন ধরে, বলতে পারেন ? **গান ধরা** [আরম্ভ করা] : 'গান ধরেছেন গ্রীষ্মকালে ভীষ্মলোচন শর্মা।' **আগুন ধরা** [জলিতে থাকা] : একটা বাড়িতে আগুন ধরলে সব কটা বাড়িতেই আগুন ধরে বাবে ! **চাঁদ ধরা** [নাগাল পাওয়া] : বামন হয়ে চাঁদ ধরতে চেয়ে না।

● **লাগা** > **আগুন লাগা** [জলিয়া ওঠা] : 'এরে তুই ওঠ, আজি আগুন লেগেছে কোথা !' **মনে লাগা** [ব্যথিত হওয়া] : কথাটা আমার মনে বড় লেগেছে। **চোট লাগা** [আঘাত পাওয়া] : তার হাতে চোট লেগেছে। **টাকা লাগা** [ব্যয়িত হওয়া] : 'লাগে লাখ টাকা বেবে সোরা সেন।' **ভালো লাগা** [পছন্দ হওয়া] :

‘এই তো ভালো লেগেছিল আলোর নাচন পাতায় পাতায়।’ সময় লাগা [ সময় ব্যয়িত হওয়া ] : ওখানে পৌঁছুতে কত সময় লাগবে ? কাজে লাগা [ নিযুক্ত হওয়া ] : মাসের পয়লা থেকেই সে কাজে লেগে গেছে। উঠিয়া পড়িয়া লাগা, আদাজল খাইয়া লাগা [ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রাণপণে পরিশ্রম করা ] : যদি পাস করতে চাও, তবে এখন থেকেই উঠে পড়ে [ আদাজল খেয়ে ] লাগো। মুক্ত লাগা [ আরম্ভ হওয়া ] : আবার যদি মুক্ত লাগে, তবে কেউ বাচবে না। বাতাস লাগা [ স্পর্শ করা ] : ‘গায়ে লাগুক হাওয়া।’ নৌকা লাগা [ ভিড়া ] : তীরে এসে নৌকো লাগলো। গ্রহণ লাগা [ ঘটা ] : কাল গ্রহণ লাগছে কখন ? পিছনে লাগা [ শক্ততা করা ] : তুমি আমার পিছনে লেগেছো কেন ?

### ● একই শব্দের বিভিন্ন পদরূপে প্রয়োগ

এই পর্যায়ে বিভিন্ন শব্দের বিভিন্ন পদরূপে প্রয়োগ প্রদর্শিত হইল। শব্দের এই রূপরূপায়নের দ্বারা ভাষা সমৃদ্ধ হয়।

অগ্নি : [ বি ]—রুদ্র দেবতার নয়নে প্রলয়-অগ্নি জলিতেছিল। [ বিণ ]—জ্ঞানস কি আর কিন্ব ? ‘সবই তো অগ্নিমূল্য।’

পাপ : [ বি ]—পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায়। [ বিণ ]—অমন পাপ কথা মুখেও এনো না।

অনাথ : [ বি ]—‘অনাথ নাথ তিনি, দীনের গতি।’ [ বিণ ]—‘অনাথ শিশুর কোলে নিবি, জননীরা আয় তোরা সব।’

সার : [ বি ]—সংসারে সার কিছুই নাই। [ বিণ ]—এই হলো সার কথা।

সভ্য : [ বি ]—সে আমাদের সমিতির একজন সক্রিয় সভ্য। [ বিণ ]—ইংরেজের সভ্য শাসনে ভারতে মানবতার চিত্রাশ্রয় রচিত হইয়াছিল।

সুন্দর : [ বি ]—‘সুন্দর, তুমি চক্ষু ভরিয়া এনেছ অক্ষয়ল।’ [ বিণ ]—‘কত মাতৃবীর স্তনে তুখে আঁকা সুন্দর ধরাতল।’ ‘মরিতে চাহি না আমি সুন্দর তুবনে।’

রক্ত : [ বি ]—‘তুমি আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দিব।’ [ বিণ ]—‘নয় শিশুরে কার ভাগ্যের রক্ত তৃকূল দিল উপহার ?’

ভাল : [ বি ]—ভাল ও মন্দ দুই-ই জগতে আছে এবং চিরকাল থাকবে। [ বিণ ]—‘ভালো মানুষ নষ্টের মোরা ভালো মানুষ নষ্ট।’ [ ক্রি-বিণ ]—ভালোই বলেছি। [ অব্যয় ]—‘কি যে বলছিলে ভাল। আরেক বার বল ত।’

বড় : [ বি ]—‘বড়র পীরতি বালির বাঁধ।’ [ বিণ ]—বড় বড় কথা ছাড়। ছোট মুখে বড় কথা। [ ক্রি-বিণ ]—ছেলেটি বড় বকে।

ঠাণ্ডা : [ বি ]—ঠাণ্ডা পড়ছে, বাইরে পেকো না। [ বিণ ]—ঠাণ্ডা ভাত কি শীতের সময় খাওয়া যায় ?

সমান : [ বি ]—সমানে সমানে লেগেছে ভাল। [ বিণ ]—তোমার ঝাকা না ঝাকা দুই-ই সমান। [ ক্রি-বিণ ]—কখন থেকে সমানে মুখে মুখে তক করছ।

**ঠিক :** [ বি ]—তার কথার ঠিক নেই। [ বিণ ]—ঠিক যোগ দিয়ে দেখ ত' অকুটা। [ ক্রি-বিণ ]—এ কি ঠিক হল ?

**রুজ :** [ বি ]—এ কি ভূমিকম্প, না রুজের পদধ্বনি ! [ বিণ ]—‘হে ভৈরব, হে রুজ বৈশাখ !’ ‘হে রুজ-বীণা, বাজো, বাজো, বাজো।’

**অন্ন :** [ বি ]—‘অন্ন লইয়া থাকি তাই মোর বাহা যায়, তাহা যায়।’ [ বিণ ]—‘তাঁহার অন্ন আয়, সেইজন্মই মাসে মাসে এত ঋণ।’

**অসম্ভব :** [ বি ]—‘মরি অসম্ভবের পায়ে মাথা কুটে।’ [ বিণ ]—অসম্ভব ক্রমতা না থাকলে এ কাজ করা যায় না। [ ক্রি-বিণ ]—ছেলেটি অসম্ভব চালাক।

**উত্তর :** [ বি ]—‘উত্তর দাঁও, আদি-পিতা ভগবান।’ ‘পেল না উত্তর।’ [ বিণ ]—উত্তরকালে তিনি যে খ্যাতনামা পুরুষ হবেন, তা আগেই বোঝা গিয়েছিল।

**জোর :** [ বি ]—গায়ের জোরে সব কাজ হয় না। [ বিণ ]—একটা জোর পবর বেরিয়েছে যুগান্তরে। [ ক্রি-বিণ ]—জোরে দৌড়াও, নয়ত ট্রেন ধরতে পারবে না। [ অব্যয় ]—ওঁর বয়স কত হবে ! জোর তিরিশ।

**হয় :** [ বি ]—তুমি যে হয়কে নয় করতে চাও। [ ক্রি ]—হয় কি না হয়, করে দেখ। [ অব্যয় ]—হয় এবার পরীক্ষা দাঁও ; না হয়, ছেড়ে দাঁও।

**সত্য :** [ বি ]—‘সত্যের নাহি পরাজয়।’ [ বিণ ]—‘সত্যবাক্য শিশুতেই জানে।’ [ ক্রি-বিণ ]—সত্যই আমি তাহাকে দেখি নাই।

**কালো :** [ বি ]—‘কালো জগতের আলো।’ ‘কালোয় যেজন আলো বানায়, হুলায় সবার মন, তারি পদধ্বজের তরে লুটায় বুদ্ধাবন।’ ‘কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কান্দ কেনে ?’ [ বিণ ]—‘আমি তাই কালো রূপ ভালোবাসি।’

**সাদা :** [ বি ]—‘সাদা রবে সবাকার টুটি টিপে, এ নহে তব বিধান।’ [ বিণ ]—সাবধান, সাদা পোশাকে পুলিশ ঘুরছে।

**নীল :** [ বি ]—এককালে বাংলাদেশে নীলের চাষ হতো। [ বিণ ]—‘ভ্রামলে ভ্রামল তুমি নীলিমায় নীল।’ ‘নীল নবধনে আষাঢ় গগনে তিল ঠাই আর নাহিরে।’

**মন্দ :** [ বি ]—মন্দকে মন্দই বলতে হবে। [ বিণ ]—প্রস্তাবটি মন্দ নয়। [ ক্রি-বিণ ]—‘যদিও মন্দ্য আসিছে মন্দ মন্থরে সব সংগীত গেছে ইংগিতে ধামিয়া।’

### ● তির্যার্থক এক শব্দ ও সদৃশ শব্দ

শব্দই ভাষার সম্পদ। এক একটি শব্দ এক একটি অর্থের দ্বারা পরিচালিত। কিন্তু এমন অনেক শব্দ আছে, বাহারা একাধিক অর্থ প্রকাশ করে। যেমন : ‘অচল’ শব্দটির একটি অর্থ—‘পর্বত’, অপর অর্থ—‘বাতিল’। ‘পর্বত’ অর্থে শব্দটি বিশেষ, কিন্তু ‘বাতিল’ অর্থে বিশেষণ।

### ● তির্যার্থক এক শব্দ

**অচল**—ভারতের উত্তরে দেবতাস্থা ‘হিমাচল’ [ পর্বত ]। সমাজে ধর্মীয় নৌকারি বর্তমানে ‘অচল’ [ বাতিল ]।

অঙ্ক—তিনি ‘অঙ্ক’শব্দে [ গণিত ] গণিত। হাত্-‘অঙ্ক’ই [ কোড় ] শিতর পরম আশ্রয়। নাটকটি পাচটি ‘অঙ্ক’ [ অংশ ] বিভক্ত।

অর্থ—‘অর্থ’ই [ টাকাকড়ি ] অনর্থের মূল। তিনি কবিতাটির ‘অর্থ’ [ অর্থপর্ব ] বুঝিতে পারিলেন না।

আশা—তার আসার ‘আশায়’ [ অপেক্ষায় ] বসে আছি। উবার আবির্ভাবে ‘পূবাণা’ [ দিক ] রক্তিম বর্ণ ধারণ করিল। ‘আশা’ [ লাঠি ]-বরফন্দাজ ‘আশা’-বন্ধে উপনীত হইল।

উত্তর—মেলেনি ‘উত্তর’ [ জবাব ]। শীতকালে ‘উত্তর’ [ দিক বিশেষ ] দিক হইতে শীতল বাতাস বয়। তিনি ‘উত্তর’-[ পরবর্তী ] কালে মহাকর্ষ হইয়াছিলেন।

কর্ম—এই কর্মময় পৃথিবীতে সকলকেই নিজ নিজ ‘কর্ম’ [ কাজ ] করিতে হয়। আমি আর কি করিব? তোমার ‘কর্ম’ই [ ভাগ্য ] মন্দ।

কাগজ—ইদানীং ‘কাগজ’ [ লেখার উপকরণ ] বড়ো হুমুলা হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা সকলে মিলিয়া একটি ‘কাগজ’ [ পত্রিকা ] বাহির করিল।

কাল—ভীবনপ্রবাহ বহি ‘কাল’ [ মৃত্যু ]-সিন্দুপানে ধায় ফিরাব কেমনে? ‘কাল’ [ সময় ] নিরবধি।

গজ—যুদ্ধে কত অশ্ব ‘গজ’ [ হাতী ], কত সৈন্ত মারা পড়িল। স্তম্ভটির উচ্চতা বাইশ ‘গজ’ [ পরিমাপ ]।

গুণ—কোন ‘গুণ’ [ উৎকর্ষ ] নাহি তার কপালে আগুন। ওঝা ‘গুণ’ [ জাহ্নু ] জানে। হাওয়া পড়িয়া গেলে তাহারা ‘গুণ’ [ নৌকার দড়ি ] টানিয়া অগ্রসর হইল। আনিল তোমার স্বামী বাক্তি নিজ ‘গুণে’ [ ধর্মের ছিল। ]। পচিশকে তিন দ্বিগুণে ‘গুণ’ [ পূরণ ] কর। বরষে ওর চেয়ে পাঁচ ‘গুণ’ [ বার ] সে বড়ো।

গুরু—‘গুরু’ [ দীক্ষাদাতা, শিক্ষক ] কাছে লব ‘গুরু’ [ হৃৎসহ ] হৃৎ।

ঘন—‘ঘন’ [ গাঢ় ] ‘ঘনা’কারে [ মেঘ ] ধূলা উঠিল আকাশে।

চরণ—‘চরণে’ [ পা ] পদ্য, অতসা অপরাধিতায় ভূষিত দেহ। কবিতার-‘চরণে’ [ পঙ্ক্তি ] কাব্য-সরস্বতীর বিচরণ।

চরিত্র—বিচিত্র মানব-‘চরিত্র’ [ স্বভাব ]। সেই নাটকে মাত্র পাঁচটি ‘চরিত্র’ [ পাত্র-পাত্রী ]।

চাল—খড়ো ‘চালে’র [ হুঁড়েঘরের আচ্ছাদন ] চায়ায় বসে সে ‘চালে’ [ চাউল ] কাকর বাছছিল। খুব ‘চাল’ [ মিথ্যা বড়াই ] মারছে সে আজকাল।

কাল—ভরকারটা আজ বড়ো ‘কাল’ [ লঙ্কার স্থান ] হয়ে গেছে। দুটো ঘটিতে একটু ‘কাল’ [ খাতু জুড়িবার পান ] দিয়ে দিলে লাজ চলতে পারবে। বর্জাদিন পরে পাঁচটাকে পেয়ে নায়েববশাই খুব করে গায়ের ‘কাল’ [ রাগ ] নেটালেন।

নীল—আকাশ ঘন ‘নীল’ [ রং ]। ‘নীল’ [ বিধ ]-কণ্ড করেছেন পৃথিবীে মিথিষ।

বিষয়—ব্যাকরণ ‘বিষয়ে’ [ সম্বন্ধে ] ঠাণ্ডার জ্ঞান পড়ীর। ‘বিষয়’ [ সম্পত্তি ]-বিষ-বিকার-কীর্ণ দীর্ঘ অপরিদৃষ্ট।

বৃত্তি—শৃগালের 'বৃত্তি' [আচরণ] এবে তোমার আশ্রয়। কবীর 'বৃত্তি'তে [পেশা] ছিলেন জোলা। ছাত্রটি পরীক্ষায় প্রথম হয়ে 'বৃত্তি' [জলপানি] পেয়েছে। •

বাস—দেবতার 'বাস' [বসতি] কি কেবল বৈকুণ্ঠে? রজনীগন্ধা 'বাস' [গন্ধ] বিলালো। তাহার বেশ-বাস' [কাপড়] ছিল মলিন।

রাগ—তাহার অঙ্গ-রাগ' [বর্ণ] ছিল ধূলিধূসরিত! 'রাগে' [ক্রোধে] তিনি কিছুকণ মৌন হইয়া রহিলেন। আমি তাহার কণ্ঠে দেশ-রাগে' [স্বর-বিভাসের একটি পদ্ধতি] আলাপ ওনিয়াছিলাম। •

শারদা—শরতে 'শারদা'র [দুর্গা] পূজায় বাংলাদেশ মুখরিত। 'শারদা'র [সব্বতী] পূজা হয় ত্রীপঞ্চমীতে। ['সাবদা' শব্দটিরও একটি অর্থ দুর্গা, অন্য অর্থ সরস্বতী।]

### ● ভিন্নার্থক সদৃশ শব্দ

বালায় কিছু কিছু শব্দের উচ্চারণ একই রকম, অথচ বানানে পার্থক্য আছে। সে-সকল শব্দের বানানগত পার্থক্য ও অর্থের পার্থক্য সম্বন্ধে ভালোভাবে জ্ঞান না থাকিলে বচনায় সেগুলি প্রয়োগে নানা বিভ্রান্তি ঘটে, সেইরূপ কিছু শব্দের অর্থ ও প্রয়োগ নিয়ে প্রদত্ত হইল :

অংশ—ভাগ। পিতার সম্পত্তির একটি অংশ তাহার আইনতঃ প্রাপ্য। অংশ—কাঁধ। একটি পারাবত আসিয়া তাহার অংশাপারি উপবেশন করিল।

অজগর—বৃহৎ সর্প। বহু যুগের অজগর-নিদ্রা ভাঙিয়া আজ সমগ্র ভারত জাগিয়া উঠিয়াছে। অজাগর—নিদ্রিত। 'এ যে অজাগর-গরজে সাগর ফুলিছে।'

অন্ন—ভাত। শোকে-হুঃখে তিনি অন্নভল ত্যাগ করিলেন। অন্ন—অপর। 'বে বৃত ভারত, সেই এক পথ আছে, নাহি অন্ন পথ।'

অন্ত—শেষ। প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দয়ার অন্ত ছিল না। অন্ত্য—শূদ্রকুলজাত। ভারতীয় সমাজ শূদ্রদের দীর্ঘকাল অন্ত্যজ করিয়া রাখিয়াছিল।

অণু—পশ্চাৎ। 'তব তত্ত্বগামী দাস।' অণু—কুত্ৰতম অংশ। 'সিদ্ধযুগে জলবিন্দু বিধযুগে অণু, সমগ্রে প্রকাশ।'

অবস্তা—নিন্দনীয়। তাহার অপরাধ অবস্তা। অবধ্য—বথের অব্যোগ্য। আলিঙ্গন অবধ্য।

অর্থ—মূল্য। জিনিসপত্র এখন মহাঅর্থ। অর্থ্য—পূজার উপকরণ। 'অতিথির তরে অর্থ্য সাঙ্গায়ে আনো।'

অবধান—শ্রেষ্ঠ দান। দুর্গেশনন্দিনী বন্ধিমচন্দ্রের প্রথম অবধান। অবধান—মনোযোগ। দয়া শোনা। 'হুঃখ কর অবধান।'

অবিহিত—বিধি-বহির্ভূত। তোমাদের এই পূজা অবিহিত পূজা। অতিথি—কথিত। দুর্গাপূজা শারদীয়া পূজা নামে অতিথিত।



অপগত—দূরীভূত। ‘এসো অপরাঙ্কিত বাণী, অসত্য হানি, অপহৃত শব্দা, অপগত সংশয়।’ অবগত—জ্ঞাত। তিনি সমস্ত অবগত হইয়াছেন।

অপচয়—কতি। জাতীয় সম্পদের অপচয় ভারত-ভাণ্ডার-বিধাতা কমা করিবেন না। অবচয়—চয়ন। ‘পুষ্প অবচয় করেছি গোটা—কয় এখন বসে মালা গাঁথি।’

অশক্ত—অক্ষম। বার্ষিকের ভারে তিনি গুরু দায়িত্ব বহনে আজ অশক্ত। অসক্ত—নির্লিপ্ত। সামসারিক মায়ামোহবন্ধন হইতে তিনি বর্তমানে অসক্ত।

অশন—ভোজন। অনশনে অর্ধাশনে তাহার দিন কাটে। অসন—দূরীকরণ। সমস্ত দেখিয়া তাহার সকল সংশয়ের নিরসন [ নিঃ+অসন ] হইল।

অশিত—ভংকত। ক্ষুধাত ব্যায় কড়ক নিরীহ পথচারী অশিত হইল। অসিত—কালো। ‘সিতাসিত দুই পক্ষ একই না জানি।’

অশ্ব—ঘোড়া। ‘কৃষ্ণ অশ্বে বসিয়া রয়েছে, চিত্রে বেন সে আঁকা।’ অশ্ব—প্রশ্বর। যুক্তিকার নিয়ে কোথাও কোথাও জীবাস্থ পাওয়া যায়।

অশীলতা—অশিষ্টতা। সামাজিক জীবনের সর্বত্র অশীলতা পরিহার্য। অসিলতা—তলোয়ার। ‘বাজে অসিলতা বনবন।’

আভাষ—আলাপ। তরুণাথায় বিহঙ্গেরা তখন মধুরাভাষে ব্যস্ত ছিল। আভাস—ঈষৎ প্রকাশ। দূর হইতে তাহার রথের আভাস সামান্য দেখা বাইতেছে।

আকিঞ্চন—দীন। ‘রূপা, প্রভু, কর অকিঞ্চনে।’ আকিঞ্চন—আকাঙ্ক্ষা। ‘সেই আকিঞ্চন লয়ে এসেছি হেথায়।’

আদি—প্রথম। রামায়ণ আদি-কবি বাস্তবিক-বিরচিত। আদি—মনঃপীড়া। ‘ব্যাধির চেয়ে আধি হলো বড়ো।’

আপণ—দোকান। দুইদিকে আপণের সারি আপন—নিজ। ‘আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ।’

আসার—প্রবল বর্ষণ। ‘আবার এসেছি আমি শ্রাবণের জলধারাসারে।’ আষাঢ়—বাংলা বৎসরের তৃতীয় মাস। ‘আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে।’

আহুতি—হোম। মূনিবর দ্বত আহুতি দিয়া বজ্র করিতেছিলেন। আকুতি—আশ্রয়। দেশমাতৃকার আহুতি তাঁহাকে চকল করিয়া তুলিল।

আবরণ—অলংকার। ‘তত্ত্ব দেহটি সাজাব তব আমার আভরণে।’ আবরণ—আচ্ছাদন। ‘এই আবরণ ক্ষয় হবে গো।’

ইতি—এই পর্যন্ত। ‘শড়ল বুকের দফায় ইতি।’ ঈতি—ছয় প্রকার শত-হানিকর উৎপাত। ‘কিন্তু কোন ঈতি দেখা দেয় যদি তা হলে ত রক্ষা নাই।’

ইহা—এই। ‘যোর শিখ্য বিনা ইহা অস্ত্র নাহি জানে।’ ঈহা—ইচ্ছা। ‘ঈষৎ ঈকণে ঈহা পুরাও আমার।’

উত্তত—প্রবৃত্ত। ‘অরণ্য উত্ততবাহ।’ উদ্ধত—অবিনীত। ‘তাইতো প্রাচীন সঙ্কিত ধনে উদ্ধত অবহেলা।’

উপাধান—উপকরণ। ঠট, চুন, বালি প্রভৃতি উপাদানে বাসগৃহ নির্মিত হয়।

উপাধাম—বালিশ। কোমল উপাধানে মাথা রাখিয়া তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন।

কুল—বংশ। ‘জনম তব কোন্ মহাকুলে?’ কুল—তীর। ‘কুলে একা বসে আছি নাহি ভরসা।’

কৃত—সম্পাদিত। কৃত অপরাধ স্বীকার করিলে রক্ষা পাইবে। ক্রীত—কেনা হইয়াছে এমন। ক্রীত পণ্য বিক্রয় করিয়া বাড়ি চল।

কৃতদাস—সাময়িক দাসত্বে আবদ্ধ। ভাগ্যদোষে সে আজ কৃতদাস। ক্রীতদাস—কেনা গোলাম। আজিও পৃথিবীতে ক্রীতদাস-প্রথা বিলুপ্ত হয় নাই।

কৃতি—কাজ। লোকটার সৃষ্টি বলিতে কিছু নাই। কৃতী—কৃতকার্য। রবীন্দ্রনাথ ভারতের একজন কৃতী সন্তান।

কটি—কোমর। ‘ক্ষীণ কটিতে গাঁথি লয়ে পরো করবী।’ কোটি—শতলক্ষ। ‘কোটি-কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে নরকের প্রায়।’

কমল—পদ্ম। ‘আলোর অমল কমলখানি কে কোটালে?’ কোমল—নরম। ‘অর্কের কোমল পত্র করয়ে ভক্ষণ।’

কীর্তি—বশঃ। ‘তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি বে মহৎ।’ কৃতি—ব্যগ্রহাল। ‘কৃতিবাস কীর্তিবাস কবি।’

গিরিশ—শিব। কৈলাস হইতে গিরিশ ত্রিশূল হস্তে বাহির হইলেন। গিরীশ—হিমালয়। ভারতের উত্তরে গিরীশ হিমালয়।

গোলক—গোলাকার বস্তু। সূর্য একটি প্রকাণ্ড জলন্ত অগ্নি-গোলক। গোলোক—বৈকুণ্ঠ। হরির গোলোকে বসতি।

চির—নিত্য। ‘ওরা চিরকাল ধরে থাকে হাল।’ চীর—ছিন্নবসন। ‘জীর্ণ চীর-পরা বনবাসীয়ে বসাল নৃপ রাজ্যসনে।’

চূত—আশ্র। ‘চূত-মঞ্জরী চূয়াইয়া শিশির করিতেছে।’ চ্যুত—অলিত। বৃষ্টিচ্যুত পুষ্পের মতো আমরাও একদিন করিয়া বাইব।

তরুণী—যুবতী। ‘অমনি কথা না বলি ভরা ঘট ছলছলি নভমুখে চলি গেল তরুণী।’ তরুণী—নৌকা। ‘এ ঘাটে বাঁধিব মোর তরুণী।’

দ্বার—দরজা। ‘বসন্ত জাগ্রত ধারে।’ দ্বার—জী। তিনি ছিলেন অকৃতদ্বার।

দীপ—প্রদীপ। ‘আমায় এ দীপ না জ্বালালে দেয় না কিছুই আলো।’ দ্বিপ—হাতী। ‘দ্বিপ-পৃষ্ঠে পর্বত শোভিছে মনোহর।’ দ্বীপ—জলবেষ্টিত ক্ষুণ্ড। ‘নীলের কোলে ডামল সে দ্বীপ প্রবাল দিয়ে ঘেরা।’

দিন—দিবস। ‘আমার বেদিন গেছে ভেসে চৌথের জলে।’ দীন—দরিদ্র। ‘দীন বধা বার দূর তীর্থ-দয়শনে।’

দুকূল—উভয় বংশ। বধূটির পিতৃকূল ও পতিকূল—দুইকূলই বজায় রহিল। দুকূল—রেশমী কাপড়। ‘রক্ত দুকূল দিল উপহার।’

দেখ—রাজ্য। ‘দেখ দেখ নন্দিত করি মন্ত্রিত তব জেয়ী।’ দ্বৈষ—হিংসা। ‘নাগিবে না তাহে বাহুবল কিবা আগিবে না দ্বৈষাধেবি।’

দু্যত—পাশাখেলা । ‘একি ছই দেবতার দু্যত খেলা অনিবার ?’ দু্যত—চর ।  
‘সাবাসি দূত, তোর কথা শুনি কোন্ বীর-হিয়া নাহি চাহে পশিতে সংগ্রামে ?’

নীড়—জল । ‘চির-স্থির কবে নীর হায় রে জীবন-নদে ?’ নীড়—পাখির বাসা ।  
‘আমি নীড়-হারানি নিশার পক্ষী ।’

পূর্বাঙ্ক—পূর্বাধিন । উৎসব দিবসের পূর্বাঙ্কে তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন ।  
পূর্বাঙ্ক—দিবসের প্রথম ভাগ । তুমি আগামীকাল্য পূর্বাঙ্কে এখানে আসিয়া  
ভোজন করিবে ।

বলি—পুঙ্কার উপচার । ‘আসি অলক্ষ্যে দাঁড়িয়েছে তারা, দিবে কোন্ বলিদান ?  
বলী—বলবান । ‘চাপি রিপুচয় বলী পড়েছিল যথা গরুড় ।’

বান—বক্তা । ‘বান এসেছে মরা গাড়ে খুলতে হবে নাও ।’ বাণ—শয় ।  
‘কোন্ পাষাণের বিবধানে তার নয়নের মণি ভিন্ন ।’

বিনা—ব্যতীত । ‘আজ বিনা-কাজে বাজিয়ে বাঁশি কাটবে সারাবেলা ।’ বীণা—  
বাঁজায় । ‘বীণা তবে রেখে দে, গান আর গান্ নে ।’

বিজ্ঞান—নির্জন । ‘বসেছি বিজ্ঞানে নব নীপবনে পুন্ডিত তৃণদলে ।’ বীজ্ঞান—  
পাখা । ‘তোমার পবন করিছে বীজ্ঞান জুড়াতে দক্ষপ্রাণ ।’

শব—মৃতদেহ । ‘সেই শব্দ মাতৃবের অগণিত শব ।’ সব—সকল । ‘আমাদের  
আছে সব, কিন্তু দেখে নেবার লোক নেই ।’

শম্যা—বিছানা । ‘ভদ্রবেশে বর্ষরতা উঠিয়াছে জাগি পঙ্কশয্যা হতে ।’ সম্ভা—  
বেশভূষা । ‘এবার আমার অঙ্গ ছেয়ে পরাও রণসজ্জা ।’

শরণ—আশ্রয় । ‘হে মহাজীবন, হে মহামরণ, লইত শরণ ।’ শ্ররণ—পূর্বচিন্তা ।  
চিরদিন রাখিয়ে শ্ররণ ।’

শঙ্কর—শিব । ‘হে ভবেশ, হে শঙ্কর, সবারে দিয়েছ ধর ।’ শঙ্কর—মিশ্র ।  
বাঙালীর মতো শঙ্কর জাতি আর নাই ।

শম—শান্তি । ‘হম, শম, দানাদির দ্বারা তিনি রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন ।  
সম—সমান । ‘বৃদ্ধের করুণ আঁখি দুটি সন্ধ্যা তারাসম রহে ফুটি ।’

শীকর—জলকণা । বাবু-তাড়িত শীতল শীকর-স্পর্শে তাহার নিজা আসিল ।  
শিকড়—গাছের মূল । ‘জল দাও প্রাণের শিকড়ে ।’

শ্রব—শ্রাব । ‘বৃদ্ধদের মধ্যে ঐ অজাতশত্রু যুবকটি কে ?’ শ্রব—শ্রাবণ ।  
ব্রহ্মচাৰ্য্যগণ বধুকে জননার মতো শ্রব করেন ।

শ্রবণ—শোনা । ‘তাপসীদের কণ্ঠে জননার নাম শ্রবণ করিয়া বালক শান্ত হইল ।  
শ্রবণ—করণ । পর্বত-গাত্র বাহিয়া জলের শ্রবণ লক্ষ্য করিলাম ।

শীত—ঠাণ্ডা । ‘শীতের হাওয়ার লাগলো নাচন আমলকীর ঐ ডালে ডালে ।’  
সিত—সাদা । ‘সিতাসিত চুই পক্ষ একই মা জানি ।’

সুত—সারথি । ভাগ্যবিড়ম্বিত মহাবীর কণ আত্মজীবন হতপুত্র বলিয়া পরিচিত  
হইয়াছিলেন । সুত—পুত্র । নন্দের হৃত শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় চলিলেন ।

সূর—বীর ॥ ‘সেখার হারাবঙ্গী সবাই মহা মহা শূর।’ সূর—সূর্য। সৌর  
কিরণে অন্ধকার অপনত হইল। সূর—দেবতা। ‘সুরলোকে বেজে ওঠে শব্দ।’

সর্গ—স্থিতি, প্রেমের পরিচ্ছদ। ‘যেমনাদবধ’ কাব্যের প্রথম সর্গের নাম ‘অভিবেক’।  
স্বর্গ—দেবলোক। ‘থাকো স্বর্গ হস্তমুখে, করো সুধা পান দেবগণ।’

সত্য—বথার্থ। ‘সত্যের নাহি পরাজয়।’ স্বত্ব—অধিকার। এই জমির স্বত্ব  
কাহার? সত্ত্ব—গুণবিশেষ। ঈশ্বরের মধ্যেই সত্ত্বগুণের প্রকাশ।

● তাহা ছাড়া, নিম্নলিখিত সমোচ্চার্য শব্দগুলির অর্থ-পার্থক্য লক্ষ্য কর :

অধ্যয়ন—পাঠ; অধ্যাপন—শিক্ষাদান। অবিরাম—অবিশ্রাম; অন্তিরাম  
—হৃন্দর। অবিহিত—বিধি-বিরুদ্ধ; অভিহিত—কথিত। অশ্ব—ঘোড়া;  
অশ্ব—প্রস্তর। আশ্বাষ—হুমিকা; আশ্বাস—কীর্ণ প্রকাশ। ওষধি—ফল  
পাকিলে যে গাছ মরিয়া যায়; ঔষধি—ডেবজ উদ্ভিদ। কপাল—ননাট; কপোল  
—গাল। কুট—পর্বত; কুট—কটিল। কুজন—খারাপ ব্যক্তি; কুজন—পাথির  
ডাক। কালি—মসী; কালী—শিবপত্নী। টিকা—তিলক, রোগ-প্রতিষেধক;  
টীকা—ব্যাখ্যা। তত্ত্ব—গূঢ় অর্থ; তথ্য—প্রকৃত ঘটনা, পরিসংখ্যান। দিন—  
দিবস; দীন—দরিদ্র। দীপ—প্রদীপ; দ্বীপ—জনবেষ্টিত ভূভাগ; দ্বিপ—হতী।  
নিরাশ—হতাশ; নিরাস—নিরাকরণ। নিদান—মূল কারণ; নিধান—আধার।  
নিবারণ—নিষেধ; নীবার—ধাতবিশেষ। নির্জর—দেবতা; নিরুর—ঝরনা।  
নিশিত—ধারালো; নিশীথ—রাত্রি। নিরশন—অনাহার; নিরসন—দূরীকরণ।  
নিরুতি—বিরতি; নিরুতি—মুক্তি, শান্তি। পরিচ্ছদ—পোশাক; পরিচ্ছেদ—  
অধ্যায়। পক্ষ—পাখা; পক্ষ—নেত্রলোম। পরম্ব—পরম দিন; পরম্ব—পরের  
ঘন। পরম্ব—কঠোর; পুরুষ—নর। পরিষদ—সভা; পারিষদ—সভাসদ।  
পৃষ্ঠ—জিজ্ঞাসিত; পৃষ্ঠ—পিঠ। প্রকৃত—বথার্থ; প্রাকৃত—সাধারণ।  
প্রসাদ—অহুগ্রহ; প্রাসাদ—অটালিকা। বসন—বস্ত্র; ব্যসন—  
কামজ ও কোপজ দোষ। বর্ষা—সড়কি; বর্ষা—বৃষ্টির ঋতু। বাস্ত—বালনা;  
বাহ্য—বলীভূত। \*বিশ—কুড়ি সংখ্যার পুরক; বিশতি—কুড়ি। বিশ—কুড়ি;  
বিশ—গরল; বিস—পণের দুগাল। বিস্ত—বিভব; বৃস্ত—মণ্ডল। বিস্মিত—  
আশ্চর্যবিত; বিস্মৃত—স্মরণে নাই এমন। বিকৃত—বিকার-প্রাপ্ত; বিক্রীত—  
বাহ্য বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। বেদ—শাস্ত্র; বেধ—গভীরতা। ভাষ—কথন;  
ভাস—দীপ্তি। মুখ—বদন; মুক—বোবা। যজ্ঞ—হোম; যোগ্য—উপযুক্ত।  
যতি—বিরতি; জ্যোতি—দীপ্তি। রিক্ত—শূন্য; রিক্ত—ধন। শর—বাণ;  
স্বর—ধ্বনি; স্মর—কামদেব। শয্যা—বিছানা; সজ্জা—সাজ। শম—শান্তি;  
সম—সমান। সারদা—দুর্গা; সারদা—সরস্বতী। শুক্তি—বিরহক; সুক্তি—  
হতাশিত। শুচি—পবিত্র; সুচি, সুচী—বিষয়-তালিকা, ছুঁচ। শ্রবণ—শোনা;  
শ্রবণ—করণ। সাক্ষর—অক্ষর-জানন্ত; স্বাক্ষর—সহি। সার্থ—বধিক-  
সম্প্রদায়; স্বার্থ—নিজের উদ্দেশ্য। সীমন্ত—সিঁথি; সীমান্ত—প্রান্ত।

কাভিকের; স্বজ্ঞ—কাঁধ। শুষ্ক—কাওহীন বৃক্ষ; শুভ—খার। স্ব—স্বয়ং; স্ব—স্বয়ং; স্বীকার—সম্মতিদান; শিকার—বৃগয়া।

### ৯। অল্পসরগী ॥

\*১. নিম্নলিখিত শব্দ-যুগলের অর্থের পার্থক্য নির্দেশ কর :

গিরিশ, গিরীশ : গোলক, গোলাক : কুতি, কুতী : স্বহ, স্বহ : মা. '৫৭। স্বহ, স্বহ : অধ্যয়ন, অধ্যাপন : বিংশ, বিংশতি : উ. মা. '৬৫ : পূর্বাহ, পূর্বাহ : স্বহ, স্বহ : কুত, কুত : শব্দা, শব্দা : উ. মা. '৬৭।

\*২. নিম্নলিখিত সমর্থনবিধিগত শব্দ-যুগলের অর্থগত পার্থক্য নিরূপণ কর :

বর্ষা, বর্ষা : স্বীকার, শিকার : আশা, আশা। মা. '৬৬

\*৩. শব্দগুণকগুলির অর্থভেদ বুঝাইয়া দাও : কুল, কুল : বর্ষা, বর্ষা : বিজন, বীজন : শব্দা, শব্দা : কুট, কুট : অগ্নোহন, অবগ্নোহন : সত্য, সত্য : উ. মা. '৭০। শাস্ত, শাস্ত : প্রকার, প্রকার : অবহিত, অবহিত : শুচি, শুচী : আপন, আপন : করি, করী। উ. মা. '৬২

\*৪. অর্থ-পার্থক্য নির্দেশ করিয়া পৃথক পৃথক বাক্য রচনা কর :

অর্থ, অর্থ : দুত, দুত : উদ্ভত, উদ্ভত : আধি, আধি : সর্গ, সর্গ : বলি, বলী : গোলক, গোলাক : নির্জর, নির্জর : [বহুতা], নির্জর [বহুতা] : বাণ, বাণ : বদন, বাসন [বিপদ্য] : শূঙ্গ, শূঙ্গ : কুজন, কুজন : নীর, নীড় : গিরিশ, গিরীশ : বীপ, বীপ : প্রসাদ, প্রসাদ : অবধান, অবধান : উপদান, উপদান : তরঙ্গী, তরঙ্গী : ব্রুকুল, ব্রুকুল : আভাস, আভাস [ভূমিকা] : অন্ত, অন্ত [শেষের] : উদ্দেশ্য [সন্ধান], উদ্দেশ্য [কৃত] : কুট [ভিন্ন], কুট [কার্য] : জোতি, জোতি [দেব, দেবী] : তরী, তরী [তাহার] : স্বপ্ন, স্বপ্ন [তোমার] : ধরা, ধরা : কটিবস্ত্র : বাত [বিধাতা], বাতী : প্রকৃত, প্রকৃত [প্রকৃতি-বিষয়ক] : বেধ, বেধ [গত রতা] : মূর্খ, মূর্খ [প্রধান] : বাস [গ্রহ], ভাস : বতি, বতী [ভিক্ত, তপস্বী] : বজ্র, বোণা : বকৃত ও সত্য [একবার] : সহিত, সহিত : [স্বাক্ষ-কল্যাণ] : বল্লব [গোপ], বল্লভ [স্বামী] : শীল [চরিত্র], শীল [বাটনা বাটার পাখরের কলক] : সপত্নী [সতীন] : সপত্নী : পুত্রধর [ভ্রাতার], পুত্রধর [নাতি-প্রসারক প্রধান নতি] : পরভূত [কোমিল], পরভূত [কাক]।

৫. বিভিন্ন বিশিষ্ট অর্থ শব্দগুলিকে প্রয়োগ করিয়া সার্থক বাক্য রচনা কর : স্বজ্ঞ, উদ্ভর, কুতা, মুখ, হাত, চোখ, কান, ধরা, কাটা, পাকা, মোটা, বড়।

৬. বিশিষ্ট অর্থের পরিচিত বাক্যে প্রয়োগ কর :

অন্তপাত, উদ্ভরকাল, মুখ রাণ, মুখ করা, মুখের কথা, মুখ বীধা, মুখ ভাঙ্গা, মাথার তোলা, মাথার হাত, মাথার ওঠা, মাথা বাথ, মাথা খাওয়া, মাথা তোলা, মাথার বাথ পারে ফেলা, হাত আসা, হাত খোলা, হাতটান, হাতে খড়ি, হাতে পাওয়া, পাকা হাত, হাতে নর ভাতে দারা, পা-করা, পা-চাকা দেওয়া, পা-তোলা, পাতে পড়া, গায়ের জোলা, চোখ খোলা, মাথা চোখ, চোখের বেধ, চোখের বালি, চোখ কপালে ওঠা, চোখ রাণ, চোখে পড়া, কান কাটা, নাক কাটা, কান ভাঙান, কানে আঙ্গুল দেওয়া, নাক গলান, মনে কর, মন খোলা, মনের আগ্রহ, মনের কালি, মনের মানুষ, মনের স্থান মিতান।

৭. বিশিষ্ট অর্থের পরিচিত বাক্যে ব্যবহার কর :

বড় গলা, বড় মুখ, বড় হোঁর, ছোট নজর, ছোট কাজ, ছোট হওয়া, কাঁচা বরস, কাঁচা খাতা, কাঁচা পরস, কাঁচা মুখ, কাঁচা মাল, কাঁচা হাত, পাকা চোব, পাকা হাড়, খোলা বন, বাসি কাপড়, বাসি ঘর, বাসি মুখ।

৮. নিম্নলিখিত ক্রিয়াপদগুলির প্রত্যেকটিকে পাঁচ প্রকার বিশিষ্ট অর্থের পরিচিত বাক্যে ব্যবহার কর : ওঠা, তোলা, কাটা, ধরা, লাগা।

৯. বিশেষ পদগুলিকে বিশেষ পদরূপে ব্যবহার কর : আগ্নি, পাপ, সার, উদ্ভর।

১০. বিশেষ পদগুলিকে বিশেষরূপে ব্যবহার কর : ভাল, মন্দ, কালো, সাদা, নীল, অসম্ভব, প্রশংসা।

১১. নিম্নোক্ত যে-কোন পাঁচটির প্রয়োগ দেখাইয়া পাঁচটি পৃথক বাক্য রচনা কর : হাতবশ, কানে তোলা, চোখে-মুখে, নাক-বলানো, মাথা কেনা, ধাঁও দারা, ভালকান [বাগ-দারা ব্রহ্ম]।। উ. মা. '৬৭

১২. দুইটি পৃথক পৃথক অর্থ ব্যবহার কর : অর্থ, আশা, কর্ম, কাল, ভুল, গুল, চরিত্র, বাস, সারবা।

পরস্পর-অর্থ-সম্পর্কযুক্ত একাধিক পদের একপদে সংহতি লাভের নাম সমাস। যেমন : বীণা পাণিতে বাহার=বীণাপাণি, চরণ পদের ত্রায়=চরণপদ, গাছে পাকা=গাছ-পাকা। প্রথম দৃষ্টান্তে ‘বীণা’ ও ‘পাণি’র মধ্যে, দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে ‘চরণ’ ও ‘পদ’র মধ্যে এবং তৃতীয় দৃষ্টান্তে ‘গাছ’ ও ‘পাকা’র মধ্যে একটি করিয়া অর্থ-সম্বন্ধ রহিয়াছে। অন্তর্নিহিত অর্থ-সম্পর্ক না থাকিলে সমাস হয় না।

যে সকল পদ মিলিত হইয়া সমাস হয়, তাহাদের বলা হয় সমস্ত্রমান পদ। ‘বীণাপাণি’ পদে ‘বীণা’ ও ‘পাণি’ পদগুলি এবং ‘চরণপদ’ পদে ‘চরণ’ ও ‘পদ’ পদগুলি কিংবা ‘গাছ-পাকা’ পদে ‘গাছ’ ও ‘পাকা’ পদগুলি সমস্ত্রমান পদ।

সমস্ত্রমান পদগুলি মিলিত হইয়া যে একপদে সংহতি লাভ করে, তাহাকে বলা হয় সমস্ত্র পদ বা সমাসবদ্ধ পদ। ‘বীণাপাণি’, ‘চরণপদ’ ও ‘গাছ-পাকা’ পদগুলি সমস্ত্র পদ বা সমাসবদ্ধ পদ।

সমাসবদ্ধ পদটিকে বিশ্লেষ করিবার জন্য যে বাক্যের প্রয়োজন হয়, তাহাকে বলা হয় সমাস-বাক্য বা ব্যাস-বাক্য বা বিগ্রহ-বাক্য। ‘বীণা পাণিতে বাহার’ কিংবা ‘চরণ পদের ত্রায়’—এই বাক্যগুলি সমাস-বাক্য বা ব্যাস-বাক্য বা বিগ্রহ-বাক্য।

সমস্ত্রমান পদগুলির প্রথম পদটিকে ‘পূর্বপদ’ এবং পরবর্তী পদটিকে [বা পদগুলিকে] ‘উত্তর পদ’ বা ‘পরপদ’ বলা হয়। সমস্ত্র পদে কখনও পূর্বপদের প্রাধান্য, যেমন : ‘চরণ-কমল’; কখনও পরপদের প্রাধান্য, যেমন : উড়ো যে জাহাজ=উড়োজাহাজ; কখনও উভয় পদের প্রাধান্য, ‘হরগৌরী’। আবার, কখনও-বা পূর্বপদ ও পরপদের কোনটিকে না বুঝাইয়া তৃতীয় পদের প্রাধান্য বুঝাইয়া থাকে। যেমন : ‘বীণাপাণি’।

### ●সন্ধি ও সমাসের পার্থক্য :

পরস্পর-সংলিখিত দুইটি বর্ণের মিলনকে সন্ধি বলা হয়। কিন্তু পরস্পর-অর্থ-সম্পর্ক-যুক্ত একাধিক পদের একপদে সংহতি লাভ করার নাম সমাস। যেমন : প্রতি+এক=প্রত্যেক [ সন্ধি ], এক এক=প্রত্যেক [ সমাস ]; পীত+অম্বর=পীতাম্বর [ সন্ধি ]; পীত অম্বর বাহার=পীতাম্বর [ সমাস ]।

সন্ধিতে সংলিখিত দুইটি বর্ণের মিলনের ফলে দুইটি পদেরও মিলন হয় : বর্ণের এই মিলনের ভিত্তি হইল উচ্চারণ। পদের মিলন সন্ধির লক্ষ্য নয়। ইহা সমাসের কাজ। সমাসে দুই বা ততোধিক পদের মিলন হইয়া থাকে এবং পদের এই মিলনের ভিত্তি হইল অর্থ। অবশ্য, সমাস সংঘটিত হইবার পর সম্ভব হইলে সংলিখিত দুইটি

বুর্গ সন্ধিহত্রে মিলিত হইতে পারে। আবার, অর্থের বোগ না থাকিলে সন্ধিও হয় না।

সন্ধিতে বিভক্তির লোপ হয় না। সমাসে অলুক সমাস ব্যতীত প্রতিটি পদের বিভক্তির লোপ হয়। সন্ধিতে বহু পদ বহুপদই থাকে। সমাসে বহু পদ একটিমাত্র পদে পরিণত হয়।

### ● সমাসের প্রকার-ভেদ

সমাস প্রধানতঃ ছয় প্রকার : ১. বহুব্রীহি, ২. তৎপুরুষ, ৩. কর্মধারয়, ৪. দ্বিগু, ৫. বহুব্রীহি এবং অব্যয়ীভাব। ইহা ছাড়া আরও দুই প্রকার সমাস আছে—সুপ-সুপা ও নিত্যসমাস। আচার্য হনুতিকুমারের মতে, সমাস মূখ্যতঃ তিন প্রকার—১. সংযোগমূলক—বহু, ২. বর্ণনামূলক—বহুব্রীহি, এবং ৩. ব্যাখ্যানমূলক—তৎপুরুষ, কর্মধারয়, দ্বিগু ও অব্যয়ীভাব।

আবার, সংস্কৃত বৈয়াকরণ পাণিনির মতে, সমাস প্রধানতঃ চার প্রকার : বহুব্রীহি, তৎপুরুষ, বহুব্রীহি ও অব্যয়ীভাব। কর্মধারয় ও দ্বিগু সমাস প্রকৃতপক্ষে তৎপুরুষ সমাসেরই অন্তর্গত।

সংস্কৃত ব্যাকরণে সমাস ছয় প্রকারের। “দ্বিগুর্বব্যয়ীভাবঃ কর্মধারয় এবং চ। পঞ্চম বহুব্রীহিঃ বহুতৎপুরুষঃ স্তুতঃ।” বাংলা ব্যাকরণেও সমাস ছয় প্রকার।

### ১. বহুব্রীহি সমাস

ইহা সংযোগমূলক সমাস। ‘বহু’ কথাটির দুইটি অর্থ : সংঘাত ও মিলন। বহু সমাস কথাটিতে দ্বিতীয় অর্থ [‘মিলন’]-টিই গৃহীত হয়। বহু সমাস অর্থাৎ মিলনের সমাস।

যে সমাসে দুই বা তাহার অধিক পদের মিলন হয় এবং সমস্তমান প্রত্যেক পদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহাকে বহু সমাস বলে।

সমস্তমান পদগুলিকে সংযোজক অব্যয় যুক্ত করে। বহু সমাসে উভয় পদেরই প্রাধান্য।

দুই পদের মিলন : হর ও গৌরী = হরগৌরী ; মশা ও মাছি = মশামাছি ; বর ও কনে = বরকনে ; পিতা ও মাতা = পিতামাতা ; জায়া ও পতি = জাম্পতি, জাম্পতী ; কুশ ও লব = কুশীলব ; চোখ ও কান = চোখকান ; মাথা ও মূণ্ড = মাথামূণ্ড ; ঝি ও চাকর = ঝি-চাকর ; ঘাস ও বিচালি = ঘাস-বিচালি।

দুইয়ের অধিক পদের মিলন : স্বর্ণ, মর্ত্য ও পাতাল = স্বর্ণ-মর্ত্য-পাতাল ; তেল, হুন ও লকড়ি = তেল-হুন-লকড়ি ; চর্বা, চূষ, লেছ ও পেয় = চর্বা-চূষ-লেছ-পেয় ; দুধ, দই, কীর ও সরপুয়িরা = দুধ-দই-কীর-সরপুয়িরা ; রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ = রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ ; রোগ, শোক, জরা ও কৃত্য = রোগ-শোক-জরা-কৃত্য ; ইষ্ট-কাম-দন-বালি-বরকী।

বাংলা সমাহার দ্বন্দ্ব : ডাল-ভাত, ডাল-ভাত-মাছ-তরকারি, মালা-চন্দন, আলু-পোস্ত, খানা-পিনা, দুধ-কলা, ঝি-জামাই, ডাল-কটি, আনাগোনা, বেচাকেনা, বিকিকিনি, নদীমালা, খাল-বিল, মুড়ি-মুড়কি, কান্না-হাসি, পৌষ-ফাল্গুন ইত্যাদি।

দুই বা ততোধিক বিশেষ্য পদের দ্বন্দ্ব : দ্বন্দ্ব সমাস সাধারণতঃ বিশেষ্য পদসমূহের মধ্যেই সংঘটিত হয়। উপরের দৃষ্টান্তগুলি বিশেষ্য-বিশেষ্যে দ্বন্দ্ব সমাসেরই দৃষ্টান্ত। তেমনি=জয়-মৃত্যু, জীবন-মরণ, কর্ণাজুন, ধানদুর্বা, শিবদুর্গা, জাতি-ধর্ম-বর্ণ, হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান, অশন-বসন, নদী-গিরি-বন, বস্ত্রভূষণ, ধূপধূনা-গন্ধাজল, সত্য-শিব-সুন্দর, দাক্ষা-হাক্ষামা, দেব-দেবী, নদ-নদী, পঞ্চ-চক্র-গদা-পদ্ম, চতুর্কর্ণ, আলো-অন্ধকার, নিশিদিন, হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ, আচার-ব্যবহার, পূজা-পার্বণ, জয়-মৃত্যু-বিবাহ, চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা, স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল, দেব-দানব-বন্ধ-বন্ধ ইত্যাদি।

দুই বিশেষ্য পদের দ্বন্দ্ব : ভালোমন, হিতাহিত, কুত্র-বৃহৎ, সাদাকালো, লঘু-গুরু, হতাহত, লালনীল, ইতর-ভদ্র, কাঁচাপাকা, উচনীচ, স্নায়-অস্নায়, চেনা-অচেনা, কাটা-ছেঁড়া, সহজ-সরল, ধীন-দুঃখী, ধনী-গরীব, ছোটবড়, সিতাসিত, আকা-বাকা, বাতায়ত, সুখী-অসুখী ইত্যাদি। কিন্তু স্মরণীয়, বিশেষ্য দুইটি একটি মাত্র বস্তু বা ব্যক্তিকে নির্দেশ করিলে তখন উহা দ্বন্দ্ব সমাস না হইয়া কর্মধারয় সমাস হইবে।

দুই সর্বনাম পদের দ্বন্দ্ব : তুমি-আমি, যে-সে, বাকে-তাকে, বার-তার, বা-তা, এ-ও-তা, এর-তার, একে-তাকে, এটা-ওটা ইত্যাদি।

দুই ক্রিয়া পদের দ্বন্দ্ব : উঠ-বস, হেসে-খেলে, মারধর, মরি-বাঁচি, উঠে-পড়ে, হেসে-কঁদে, নেচে-হুঁদে, শুয়ে-গড়িয়ে, কঁদে-ককিয়ে, দেখে-শুনে, বলে-কয়ে, হারি-জিতি, হাটি-চলি, পড়ি-মরি, ভেঙে-চূরে, চেয়ে-চিন্তে, রাসো [ বও ও মও ] ইত্যাদি।

● দ্বন্দ্ব সমাসের কতকগুলি বিশিষ্ট ব্যবহার :

ক. দ্বন্দ্ব সমাসের পরপদে রাত্রি ও নিশা-শব্দের অন্ত্য স্বর লুপ্ত হয়। যেমন : অহঃ ও রাত্রি=অহোরাত্রি, দিবা ও রাত্রি=দ্বিবারাত্রি, অহঃ ও নিশা=অহর্নিশ। কিন্তু, দিবা ও নিশি=দ্বিবানিশি। কিন্তু বাংলার দিনরাত, নিশিদিন, রাতদিন [ রাদিন ]।

খ. গোত্র-সম্বন্ধ ও বিদ্वा-সম্বন্ধ হইলে এবং ঋ-কারান্ত শব্দ পরে থাকিলে পূর্ববর্তী ঋ-কারান্ত শব্দ আকারান্ত হয়। যেমন : মাতৃ ও পিতৃ=মাতাপিতা। সংস্কৃতে মাতৃপিতৃহীন=বাহার মাতার পিতা অর্থাৎ মাতামহ নাই ; পিতৃমাতৃহীন=বাহার পিতার মাতা অর্থাৎ পিতামহী নাই। মাতাপিতৃহীন=বাহার মাতা ও পিতা নাই। সংস্কৃতে পিতামাতা অন্তত্ব। বাংলার পিতামাতা, মাতাপিতা=দুই-ই চলে।\*

\* সংস্কৃতে ত্রীলিঙ্গবাচক ও পুংলিঙ্গবাচক পক্ষে দ্বন্দ্ব সমাস হইলে আগে ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ ও পরে পুংলিঙ্গবাচক শব্দ বসে। যেমন : মাতাপিতা, বৃদ্ধবৃদ্ধ, বৃষবৃষ, হাসীহাস ইত্যাদি। কিন্তু বাংলার ভাৱ হয় না। বাংলার আগে পুংলিঙ্গবাচক শব্দ ও পরে ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ বসাই প্রচলিত রীতি। যেমন পিতামাতা, বৃদ্ধবৃদ্ধী, বর-বউ, হাস-হাসী ইত্যাদি।



প। সংস্কৃতে জায়া ও পতি = দম্পতি, দম্পতী, জম্পতি, জায়াপতি। কিন্তু বাংলায় হয় শুধু দম্পতি বা দম্পতী।

ঘ. কুশ ও লব সংস্কৃতে কুশীলব। বাংলায়ও কুশীলব [ নট ] প্রচলিত।

ঙ. অলুক্ হৃদ্ব : অ [ অর্থাৎ না ] লুক্ [ অর্থাৎ লোপ ]—কথাটির অর্থ 'বাহাতে বিভক্তির লোপ হয় না।'

যে হৃদ্ব সমাসে সমস্তমান পদগুলির বিভক্তি লোপ হয় না, তাহাকে অলুক্ হৃদ্ব সমাস বলে। যেমন : মাঠে ও ময়দানে = মাঠে-ময়দানে। তেমনি—ঘরে-বাইরে, বনে-বাগানে, বনে-জঙ্গলে, জলে-জঙ্গলে, হাটে-বাজারে, ছুখে-ভাতে, জপে-তপে, দুঃখে-সুখে, পতনে-উত্থানে, বৃকে-পিঠে, কোলে-পিঠে, ডাইনে-বায়ে, তেলে-বেগুনে, তেলে-জলে, আদায়-কাঁচকলায়, হাতে-পায়ে, হাতে-কলমে, মায়ে-ঝিয়ে, কাগজে-কলমে, ইকুলে-কলেজে, হাটে-মাঠে, গৃহে-গোষ্ঠে, ঝোপে-ঝাড়ু, গারে-গতরে, ক্ষেতে-খামারে, টোমে-বাসে, দেশে-বিদেশে, জলে-হলে-অস্তরীক্ষে, বনে-উপবনে ইত্যাদি।

সমার্থক হৃদ্ব : একই অর্থ-বিশিষ্ট পদসমূহ যে সমাসে মিলিত হয়, তাহাকে সমার্থক হৃদ্ব সমাস বলা হয়। যেমন : কাগজ ও পত্র = কাগজ-পত্র, রাজা ও বাদশা = রাজা-বাদশা। তেমনি—কাজ-কর্ম, যাগ-যজ্ঞ, ভুল-ভ্রান্তি, জ্ঞান-জানোয়ার, মাঠ-ময়দান, জন-মানব, পাইক-বরকন্দাজ, শাক-সবজি, বাড়ি-ঘর, জমি-জমা, ভিটে-মাটি, মামলা-মোকদ্দমা, কোট-কাছাড়ি, দাঁড়া-মস্তুরা, সভা-সমিতি, হাট-বাজার, ছাই-পাশ, ডাক্তার-বক্তা, কথা-বাতা, মাথামুণ্ড, চিঠি-পত্র, রাজা-রাজড়া, মাজ-পোশাক, চোর-ডাকাত, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, কুলি-মজুর, লোক-লম্বর, হাসি-তামাসা ইত্যাদি।

ইত্যাদি-অর্থসূচক হৃদ্ব : এক জাতীয় বস্তুতে ইত্যাদি-অর্থসূচক হৃদ্ব সমাস হয়। ১. সহচর শব্দ সংযোগে—যেমন : বৃদ্ধ-বিগ্রহ, খল-কপটতা, ফুটোকাটা, ডাকহাঁক, খানাপিনা, ছেলেপিলে, ধর-পাকড়, থানাপুলিশ, মার-ধর, বিলিবিজি, ধর-গেরহালি, গড়কুটো, গোঁফদাড়ি, হাত-পা, দেহ-মন, গান-বাজনা, নাচ-গান, হৈ-হলোড়, ডুগি-তবলা, খোল-করতাল, জলকল, জামা-কাপড়, বড়বুড়ি, বুড়ি-বাদল, সদি-কাশি, দুঃখ-কষ্ট, ধুলোবালি, ঠেঙা-লাঠি, লাঠি-সোটা, গাছ-পালা, ঝোপ-জঙ্গল, ডাল-পালা, জলকাদা, জিনিসপত্র, ঘরবাড়ি। ২. অসুচর শব্দ সংযোগে—যেমন : স্নানাহার, খেলাধুলো, পচা-পাতকো, চোর-ছাঁচোড়, চেয়ার-টেবিল, ছল-চাতুরি, ঝাড়-লগ্নন, ভাল-জোজুরি, ইড়ি-হেসেল, আজকাল, কালপরশ, পাচ-সাত, চুরি-চামারি, খটি-বাটি, খালা-বাসন, গান-বাজনা, দোকান-পাট, হাট-বাজার, হাতী-ঘোড়া, গোরু-বাছুর, ঘর-দোর, খুন-থারাপি, ঢাল-তলোয়ার, গোলা-বারুদ, লাঠি-সড়কি। ৩. প্রাচুর শব্দ সংযোগে—যেমন : উত্থান-পতন, পতন-অত্যাচার, উঁচু-নিচু, জয়-পরাজয়, ক্রয়-বিক্রয়, বেচা-কেনা, উখাল-পাতাল, জোয়ার-ভাটা, জল-হল, স্বর্গ-নরক, পাগ-পুণ্য, ভালোমন্দ, হাসিকান্না, কুজ-বুহৎ, আকাশ-পাতাল, উপর-নীচ, দিনরাত, নকাল-নক্যা, পোকা-মাকড়, শেয়াল-কুকুর, কুকুর-বিড়াল, গোজাবিল, ছেলে-

মেয়ে, বৌ-বেটা, আলোছারা, সাদাকালো, দিনরাত, ঝি-জামাই, ছেলে-পুলে, বাঙালী-অবাঙালী, সেনদেন, চাল-চুলো, চোর-ডাকাত। ৪. বিকার শব্দ সংযোগে—যেমন : ধর্ম-কর্ম, ওলট-পালট, অদল-বদল, তুচ্ছতাক্, বা-তা, ফাঁক-কোকর, ঝাঁকি-ঝুঁকি, কারা-কাটি, বস্তুর-মস্তুর, ভাঙ্গা-চোরা, খেলা-ধুলা, জারি-জুরি, কাঁদা-কাটা, বস্ত্র-আভি, বাড়-জুক, গাল-গল্প। ৫. অহুকার শব্দ সংযোগে—যেমন : কাজ-টাজ, চা-টা, ভাত-টাত, হাতে-নাতে, হাড়ি-হুড়ি, প্রজাপস্তুর, বিষয়-আশয়, গোলা-পালা, কাচ্চা-বাচ্চা, ঝালা-পালা, নাকানি-চোবানি।

একশেষ দ্বন্দ্ব : যেমন : তুমি, সে ও আমি = আমরা ; তুমি ও সে = তোমরা।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : সেখানে আমি অছোঁরাত্র নদীর কুলকুল সংগীত শুনিতাম। দ্বিবারাত্র তাহার শুধু কলহ করে। ‘কেবল আমার সাথে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ।’ ‘দ্বিবার-নিশি ভাবনা কিসে ক্লেষ পাবো না।’ ‘নিশিদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।’ তাহার মাতামহের পরলোকগমনে সে মাতৃপিতৃহীন [মাতামহহীন] হইল। পিতামহীর মৃত্যুতে সে পিতৃমাতৃহীন [পিতামহীহীন] হইয়াছে। পিতা ও মাতাকে হারাইয়া সে শৈশবে মাতাপিতৃহীন [মাতাপিতাহীন] হইয়াছে। তিনি নবদম্পতীকে [দম্পতি] আশীর্বাদ করিলেন। নাটকের কুশীলবগণ একে একে আবিস্কৃত হইলেন। ঘরে-বাইরে আজ আমাদের সমান দুর্গতি। ‘আমার সম্মান যেন থাকে দুধে-ভাতে।’ ভিড় এখন কোন্‌দায় নেই? ইচ্ছুলে-কলেজে, হাটে-বাজারে, মাঠে-ময়দানে ভিড় এখন সবখানেই। ‘বাবা একেবারে তেলে-বেগুনে উঠলেন জলে।’ ‘ওপাড়া হইতে আর মাস্তে-ঝিলে।’ ‘হাটে-মাঠে-গৃহে-গোঠে সবাকার ধান।’ ‘পরে মাস দেড়ে ভিটে-মাটি ছেড়ে বাহির হইল পথে।’

## ২. তৎপুরুষ সমাস

যে সমাসে পূর্বপদের কারক বা সম্বন্ধ-বোধক বিভক্তি লুপ্ত হইয়া পরপদের অর্থ-প্রাধান্ত প্রতীয়মান হয়, তাহাকে তৎপুরুষ সমাস বলা হয়। যেমন : শরণকে আগত = শরণাগত ; মধুর দ্বারা মাথা = মধুমাথা। ‘শরণকে’ এবং ‘মধুর দ্বারা’ এই পূর্বপদ দুইটির প্রথমটিতে দ্বিতীয়া বিভক্তি এবং দ্বিতীয়টিতে তৃতীয়া বিভক্তি হইয়াছে ; কিন্তু সমস্তপদে বিভক্তি লুপ্ত হইয়া পরপদ দুইটির অর্থের প্রাধান্ত প্রতীয়মান হইতেছে। তৎপুরুষ সমাসে প্রথমা বিভক্তি ছাড়া সকল বিভক্তিই লোপ পায়। বিভক্তি অহুযায়ী তৎপুরুষ সমাসের নামকরণ হয়।

বিঃ দ্রঃ কারকের ক্ষেত্রে প্রথমা, দ্বিতীয়া ইত্যাদি বিভক্তির পরিবর্তে বিভক্তি-চিহ্নের উল্লেখ করা উচিত। কারণ, কারক বাক্য-নির্ভর এবং বাংলা ব্যাকরণে বাংলা বাক্যেই কারবার ; সংস্কৃতের নয়। কিন্তু বাংলার পুঁহিত সংস্কৃত শব্দগুলির যখন তৎপুরুষ সমাস হয়, তখন সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ, তৃতীয়া তৎপুরুষ ইত্যাদি ব্যবহার করাই হুক্তিসঙ্গত। কারণ বাংলার সমাস-নির্ণয়ের অন্ত ব্যবস্থা নাই।

### ● তৎপুরুষ সমাসের বিবিধ রূপ :

দ্বিতীয়া তৎপুরুষ : যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের দ্বিতীয়া বিভক্তি [কে, রে

ইত্যাদি] লুপ্ত হইয়া পরপদের অর্থ-প্রাধান্ত প্রতীয়মান হয়, তাহাকে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস বলে।

১. গত, প্রাপ্ত, আপন্ন, আশ্রিত, আকৃষ্ট, অতীত, সংক্রান্ত প্রভৃতি শব্দযোগে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ হয়। যেমন : শরণকে আগত = শরণাগত ; স্বঃ [ স্বর্গ ] কে গত = স্বর্গত ; বিপদকে আপন্ন = বিপদাপন্ন ; দেবকে আশ্রিত = দেবাশ্রিত ; সংখ্যাকে অতীত = সংখ্যাতীত ; অথকে আকৃষ্ট = অস্বাকৃষ্ট ; বয়ঃকে প্রাপ্ত = বয়ঃপ্রাপ্ত ; স্বকে গত = স্বগত ; ব্যক্তিকে গত = ব্যক্তিগত। তেমনি = হস্তগত, মজ্জাগত, মর্মগত, পুংখিগত, জাতিগত, স্রবণাতীত, সাহাষ্যপ্রাপ্ত, চরণাশ্রিত, আলোকপ্রাপ্ত, বৃত্তিপ্রাপ্ত, গা-ঢাকা, নথ-নাড়া, গা-নাড়া, রথ-দেখা, কলা-বেচা, বাসন-বাজা, ঘর-ধোয়া, জল-তোলা, কাপড়-কাচা, হাত-দেখা, লুচি-ভাজা, বধু-বরণ, নবীন-বরণ।

২. ব্যাপ্তি বুঝাইলে কালবাচক দ্বিতীয়াস্ত পদের সহিত দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস হইয়া থাকে। যেমন : চিরকাল ব্যাপিয়া স্থায়ী = চিরস্থায়ী ; চিরকাল ব্যাপিয়া স্থায়ী = চিরস্থায়ী ; চিরকাল ব্যাপিয়া বসন্ত = চিরবসন্ত ; ক্ষণকাল ব্যাপিয়া স্থায়ী = ক্ষণস্থায়ী। তেমনি—চিরহরিৎ, দীর্ঘস্থায়ী, চিরস্রবণীয়, চিরদুঃখিনী, চির-বঞ্চিত, চির-কৃতজ্ঞ, চির-শত্রু, চির-কৃপণ, নিত্যানন্দ, জীবনানন্দ, পক্ষাশোচ, চির-চঞ্চল।

৩. পূর্বপদটি বিশেষণীয় বিশেষণ বা ক্রিয়াবিশেষণ হইলে পরবর্তী কৃদন্তপদের সহিত দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস হইয়া থাকে। যেমন : ক্রত বধা তথা গামী = ক্রতগামী ; ধীর বধা তথা গামী = ধীরগামী ; বৃহ বধা তথা ভাষিণী = বৃহভাষিণী ; অবশ্র বধা তথা কর্তব্য = অবশ্রকর্তব্য ; ঘনভাবে সন্নিবিষ্ট = ঘনসন্নিবিষ্ট ; নিম্ন [ অর্ধ ] ভাবে রাজী = নিম্নরাজী ; নিম্ন [ অর্ধ ] ভাবে খুন = নিম্নখুন ; দৃঢ়রূপে বন্ধ = দৃঢ়বন্ধ। তেমনি—নিম্নগামী, আধ-পাকা, অর্ধ-সমাপ্ত, অর্ধ-ফুট, আধ-পোড়া, অর্ধ-দগ্ধ।

অতিরিক্ত বালা দৃষ্টান্ত : চুল-চেরা, পান-কাটা, ছেলে-ভুলানো, ঘর-বদলানো।

**তৃতীয়া তৎপুরুষ :** যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের তৃতীয়া বিভক্তি [যারা, দিয়া, সাহায্যে ইত্যাদি] লুপ্ত হইয়া পরপদের অর্থ-প্রাধান্ত প্রতীয়মান হয়, তাহাকে তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন : মধুর দ্বারা মাথা = মধুমাথা ; শ্রীর দ্বারা হীন = শ্রীহীন ; শ্রীর দ্বারা যুক্ত = শ্রীযুক্ত ; একের দ্বারা উন বিংশতি = উনবিংশতি ; শোকের দ্বারা আকুল = শোকাকুল ; বিজ্ঞান দ্বারা সম্মত = বিজ্ঞানসম্মত ; ঠিক্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ = ঈক্রয়গ্রাহ ; বাক্যের দ্বারা দস্তা = বাগদস্তা ; বাণের দ্বারা বিদ্ধ = বাণবিদ্ধ ; অশ্বের দ্বারা উপচার = অশ্বোপচার : তেমনি—বিজ্ঞাহীন, দৃষ্টহীন, বজ্রাহত, রোত্রদগ্ধ, ভ্রমদাবৃত, স্বনাম-খ্যাত, কীটদগ্ধ, দুঃখপোক্ত, স্বপ্নগস্ত, বোপাঙ্কিত, পরপুচ্ছিত, মেঘাচ্ছন্ন, মোহাচ্ছন্ন, স্নেহাচ্ছন্ন, ভ্রমচ্ছন্ন, মোহাচ্ছন্ন, গুণদগ্ধ, শ্রম-সাধ্য, যুতপক, পদদলিত, মসৌলিত, মাতৃহীন, রবারত, শকিসম্পন্ন, রথখচিত, শৃংখলাবদ্ধ, রজ্জুবদ্ধ, বিধিবদ্ধ, হস্ত-চালিত, বাহু-চালিত, বিদ্যুৎ-চালিত, জরাভাঙা, কণ্টকাকীর্ণ, বাঙ্গালীক-প্রণীত, আশ্রয়বিহীন [আশ্রয়ের দ্বারা অধিত], রোগাক্রান্ত, জনশূন্য, সর্পদষ্ট, শুক্লদন্ত, বহুচালিত, লিপিবদ্ধ, ————— অতিরিক্ত-বাক্যে অর্থ-প্রাধান্ত বজ্রাচ্ছন্ন, তৈলাচ্ছন্ন, বিপদসমুল, অধিযুক্ত।

অতিরিক্ত বাংলা দৃষ্টান্ত : দা-কাটা, ঢেঁকি-হাঁটা, মধু-মাখা, মন-গড়া, কাঁটা-পেটা, লেপ-মুড়ি, তেল-মাখা, চুন-মাখা, শান-বাধানো, তাম-খেলা, লাঠি-খেলা, ধামা-চাপা, হাত-ছানি, শোয়া-কম, সিকি-কম, বাহুড়-চোবা, কালি-মাখা।

**চতুর্থী তৎপুরুষ :** যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের চতুর্থী বিভক্তি [কে, রে, নিমিত্ত, উদ্দেশ্যে ইত্যাদি] লুপ্ত হইয়া পরপদের অর্থ-প্রাধান্ত প্রতীয়মান হয়, তাহাকে চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস বলে। উদ্দেশ্য বুঝাইতে বা নিমিত্তার্থে চতুর্থী বিভক্তি হয় এবং সেরূপ ক্ষেত্রেও চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন : দেবকে বা দেব উদ্দেশ্যে দত্ত = দেবদত্ত ; জীবন উদ্দেশ্যে কাঠি = জীবনকাঠি ; যূপের নিমিত্ত কাঠ = যূপকাঠ ; শয়নের নিমিত্ত কক্ষ = শয়নকক্ষ ; রাগার নিমিত্ত ঘর = রাগাঘর। তেমনি—পুত্রশোক, আরাম-কেদারা, বালিকা-বিদ্যালয়, অতিথিশালা, শান্তিনিকেতন, শিশু-বিভাগ, কিশোর-পত্রিকা, শিশু-সাহিত্য, জপমালা, মালগুদাম, অনাথাশ্রম, বিশ্রামঘর, নাট্যমন্দির, স্মৃতি-মন্দির, দেবমন্দির, দেব-বলি, ছাত্রাবাস, বিদ্যাবন, পাঠভবন, পান্থনিবাস, তীর্থযাত্রা, সভামঞ্চ, ভোজনাগার, বিজয়-উল্লাস, চণ্ডীমণ্ডপ, ফাসিকাঠ, বজ্রশালা, খাঞ্চ-আন্দোলন, দূতাবাস, ভিক্ষাপাত্র।

অতিরিক্ত বাংলা দৃষ্টান্ত : পুণ্ডলী-গারদ, রেল-ভাড়া, রেল-মাণ্ডল, খেয়াঘাট, বিয়ে-পাগলা, ডাক-মন্ডল, ধান-জমি, বসত-বাটি, মড়া-কারা, ঠাকুর-ঘর, ডাকঘর।

**পঞ্চমী তৎপুরুষ :** যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের পঞ্চমী বিভক্তি [হইতে, থেকে, চেয়ে, অপেক্ষা ইত্যাদি] লুপ্ত হইয়া পরপদের অর্থ-প্রাধান্ত প্রতীয়মান হয়, তাহাকে পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন : শাপ হইতে মূক্ত = শাপমুক্ত ; আদি হইতে অন্ত = আন্তস্ত ; যুগ হইতে ভ্রষ্ট = যুগভ্রষ্ট ; জন্ম হইতে অন্ধ = জন্মান্ধ ; সর্প হইতে ভয় = সর্প-ভয় ; মানব হইতে ইতর = মানবতের ইত্যাদি। তেমনি—বন্ধনমুক্তি, পদচ্যুত, দুষ্টজাত, রোগমুক্তি, সিংহাসনচ্যুত, শাখা-ষ্ট, বিরুললক, স্বর্ণভ্রষ্ট, বিদেশাগত, বহিরাগত, ব্যাঘ্র-ভীতি, ধর্মচ্যুত, বৃদ্ধচ্যুত, সমাজচ্যুত, আকাশবাণী, মৃত্যুভয়, লোকলজ্জা, সভ্যভ্রষ্ট, লক্ষ্যভ্রষ্ট, লোকভয়, চোরভয়, পদচ্যুত, বস্ত্রাভ্রাণ, জলাভ্রাণ, প্রাণাধিক, দেবোত্তর, কারামুক্ত, ঋণমুক্তি, প্রাণপ্রিয়, পাঠশালা-পলায়ন, যুদ্ধোত্তর, অটোত্তর, তজ্জাত, তত্ত্ব।

অতিরিক্ত বাংলা দৃষ্টান্ত : গা-তাড়ানো, জেল-খালাস, জেল-শালানো, ইচ্ছুল-শালানো, বিলাত-ফেরত, আগাগোড়া।

**ষষ্ঠী তৎপুরুষ :** যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের ষষ্ঠী বিভক্তি [র, এর ইত্যাদি] লুপ্ত হইয়া পরপদের অর্থ-প্রাধান্ত প্রতীয়মান হয়, তাহাকে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন : গন্ধার জল = গন্ধাজল, ছাত্রদের সমাজ = ছাত্রসমাজ ; বৌদ্ধদের ধর্ম = বৌদ্ধধর্ম ; স্ব-র [নিজের] পড়া = স্বপড়া, [কিছু সমান বা একই পতি বাহাদের = সপত্নী—বহুব্রীহি]। পূর্বের অন্ত = সূর্য্যান্ত ; \*পথের রাজা = রাজপথ ; \*হংসের রাজা = রাজহংস ; কবিদের রাজা = রাজকবি বা কবিরাজ ইত্যাদি। তেমনি—পিজালয়, তরুচ্ছায়া, দেশবন্ধু, রাষ্ট্রপতি, কবিগুরু, গিরিরাজ, গিরীশ, সূর্য্যোদয়, রাজোদয়, রাজপুত্র, ব্রাহ্মণতনয়, জ্যেষ্ঠপুত্র, লক্ষ্যেশ্বর, দিল্লীশ্বর, বিশ্বকবি, বিশ্বভারতী, সূর্যালোক, ধীনবন্ধু, নবীতীর, রাজাজ্ঞা, গোহৃদ, বৃগশাবক, সাধুসঙ্গ, অশোক-কানন, সাগরতীর, আতিসংঘ।

কতকগুলি ঙে-কারান্ত জীলিঙ্গ শব্দ পূর্বপদ হইলে সমস্তপদে ঙে-কার ই-কার হয়। যেমন : কালীর দাস=কালিদাস, দেবীর দাস=দেবদাস, বড়ীর দাস=বড়ীদাস ইত্যাদি। কিন্তু চণ্ডীর দাস=চণ্ডিদাস ও চণ্ডীদাস দুই-ই হয়।

স্বরগীর : রাজপথ, রাজকবি, কবিরাজ, রাজহংস, রাজমিস্ত্রী, রাজরোগ—সমস্ত পদগুলিতে পূর্বপদগুলির পরনিপাত হয়। যেমন : মিজীদের রাজা=রাজমিজী।

সপ্তমী তৎপুরুষ : যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের সপ্তমী বিভক্তি [এ, তে, এতে, র, মধ্যে ইত্যাদি] লুপ্ত হইয়া পরপদের অর্থ-প্রাধান্ত প্রতীয়মান হয়, তাহাকে সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন : কর্মে নিপুণ=কর্মনিপুণ; শিল্পে পটু=শিল্পপটু; জলে মগ্ন=জলমগ্ন; পূর্বে ভূত=ভূতপূর্ব; পূর্বে ক্ষত=ক্ষতপূর্ব; সত্যে নিষ্ঠা=সত্যনিষ্ঠা; গৃহে বাস=গৃহবাস; সংখ্যায় গরিষ্ঠ=সংখ্যাগরিষ্ঠ। তেমনি—অরণ্যবাস, বনবাস, পাশাসক্ত, ক্রীড়াকুশল, রণনিপুণ, বিশ্ববিখ্যাত, গৃহাগত, তীরলগ্ন, উত্তরায়ণ, ধানমগ্ন, জলমগ্ন, অকালপক, অকালমৃত্যু, কাশীবাস, পুষ্কোত্তম, নরোত্তম, সর্বোত্তম, সরোবর, সর্ববিচ্ছা-বিশারদ, কর্ম-কুশল, মহাকাশ-ভ্রমণ, কবি-শ্রেষ্ঠ, বন-ভোজন, অকালবার্ধক্য, পাঠরত, অধ্যয়ন-রত, গৃহকর্ম-নিপুণা, সত্যাগ্রহ, অকালবোধন।

অতিরিক্ত বাংলা দৃষ্টান্ত : গাছপাকা, ইংরেজি-শিক্ষিত, রাতকানা, তালকানা।

স্বরগীর : পূর্বে ভূত=ভূতপূর্ব; পূর্বে ক্ষত=ক্ষতপূর্ব; পূর্বে দৃষ্ট=দৃষ্টপূর্ব; পূর্বে আবাদিত=আবাদিতপূর্ব—সমস্ত পদগুলিতে পূর্বপদগুলির পরনিপাত হইয়াছে।

তৎপুরুষ সমাসের অতিরিক্ত প্রকার-ভেদ : তৎপুরুষ সমাস আরও কয়েক প্রকারের হইয়া থাকে। যেমন : - উপপদ তৎপুরুষ, অলুক তৎপুরুষ, নঞ তৎপুরুষ ইত্যাদি।

● উপপদ তৎপুরুষ : সমাসবদ্ধ কৃদন্ত পদের পূর্বপদকে উপপদ বলা হয়। অর্থাৎ, যে সব পদের পরস্থিত ধাতুর কৃতপ্রত্যয় হয়, তাহাদের উপপদ বলা হয়। যেমন : গৃহস্থ, জলচর, খেচর, উদ্ভিদ, জলজ—এই সমাসবদ্ধ কৃদন্ত পদগুলির পূর্বপদ—বাক্রমে—গৃহ, জল, খ, উৎ, জল—ইহারা উপপদ।

উপপদের সহিত কৃদন্ত পদের যে সমাস হয়, তাহাকে বলা হয় উপপদ তৎপুরুষ সমাস। যেমন : জলে চরে যে=জলচর; গৃহে থাকে যে=গৃহস্থ; পক্ষে জয়ে বাহা=পক্ষজ; জল ভেদে যে=জলজ; শত্রুকে হত্যা করে যে=শত্রুক; সত্য বলে যে=সত্যবাদী; ইন্দ্রকে ভয় করে যে=ইন্দ্রভীত; খ-এ [আকাশে] চরে যে=খেচর; অগ্রে জয়ে যে=অগ্রজ; দুঃখে থাকে যে=দুঃস্থ; গোকে পালন করে যে=গোপ; পরম [শত্রুকে] তপ [ধর্ম] করে যে=পরম্পর; অ-পা জলে জয়ে বাহা=অপ। তেমনি—পাদপ, নীরদ, কুঙ্কর, অভভেদী, দ্বিগিজয়ী, যুতাজয়, ধনজয়, সুধর, সুচর, ধর্মবর, জলজ, অস্থজ, অদ্ভ্যুজ, কুজ, হিতকর, মধুপ, মনোজ, মনসিক, সরোজ, বাহুকর, দিবাকর, চন্দ্রধর, বনবাসী, অশ্বেবাসী [অশ্বে অর্থাৎ গুরুগৃহে বাস করে যে], অরিন্দম, দীপজয়, ভূতপ, করদ, বর্ণকার, চিত্রকর, পথিকৃৎ, শত্রুধর, মদুপ, ভূপপ্রাণী, শ্রীশ, দ্বিগিণ

## সমাস

নিশাচর, সর্বসহা, সর্বনাশী, ভটহ, মুখহ, হিমর, পাণর, বৃক্কর, ক্রতিধর, রাজ্যপাশী, বহুধা, বহুব্রা, আশ্রয়, কুমিঠ, গদ্যধর, মডকর, বাজিকর, দহুজ, সয্যসী, [সয অর্থাৎ উভয় হস্তেই সন্ধান করেন যিনি], প্রকৃতিহ, কর্মনাশা, শ্রমজীবী, সর্বহার।

অতিরিক্ত বাংলা দৃষ্টান্ত : রাহিমারা, দিশাহারা, লক্ষীকাড়া, বর্ণচোরা, গাঁটকাটা, পকেট-বার, ছেলে-ধরা, ভূঁইকোড়, শোলোক-বলা, সবজাস্তা, বাস্তহার।

● **অলুক্ তৎপুরুষ :** যে সমাসে পূর্বপদের বিভক্তির লোপ হয় না, তাহাকে অলুক্ সমাস বলে। যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের বিভক্তির লোপ হয় না, তাহাকে অলুক্ তৎপুরুষ সমাস বলা হয়। সকল প্রকার তৎপুরুষ সমাসেই অলুক্ তৎপুরুষ হইয়া থাকে। যেমন : তৃতীয়া—হাত দিয়ে কাটা=হাতে-কাটা, তেল দিয়ে ভাজা=তেলে-ভাজা। তেমনি—ঘিয়ে-ভাজা, হাতে-গড়া, কলে-ছাঁটা, হাতে-পোতা, বাঁশে-বাঁধা, চোখে-দেখা, বানের-জলে-ভেসে-আসা, সবার-পরশে-পবিত্র-করা। চতুর্থী—পরের নিমিত্ত পদ=পরশ্চপদ। তেমনি—আশ্রনেপহ, ভাতের-চাল, মুড়ির-চাল, জামার-কাপড়, খেলার-মাঠ, পেটের-ভাত, ভুলের-মাস্তুল, ঘানির-বলদ, চায়ের-কাপ, চায়ের-দুধ, পড়ার-ঘর, খাবার-ঘর। পঞ্চমী—সার হইতে সার=সারাংসার; পর হইতে পর=পরাংপর; ঘানি হইতে তেল=ঘানির-তেল তেমনি—কলের-জল, বাপের বেটা, পুত্রের মাছ, ক্ষেতের-ধান, বিদেশ-থেকে-আনা আকাশ-থেকে-পড়া, কাছ-থেকে-দেখা, নদী-থেকে-আনা, বন-থেকে-আনা। ষষ্ঠী—ভাতু : [ ভাতার ] পুত্র=ভাতুপুত্র, তেমনি—বাচস্পতি, বাপের-বাড়ি, মামার-বাড়ি, গোকর-গাড়ি, গোকর-দুধ, ঘোড়ার-গাড়ি, কলের-গান, ভাগের মা, বাটির-মাছ, সোনার বাংলা, মোমের-পুতুল, ভোরের-পাখি, রাজার-মেয়ে, পরের-মা, অহরোধের আসর, গল্প-দাহর আসর। সপ্তমী—যুধি [ যুদ্ধে ] হির=যুধিষ্ঠির; সরসি [ সরোবরে ] জাত=সরসিজ; মনসি [ মনে ] জাত=মনসিজ; সোনার সোহাগা=সোনার-সোহাগা। তেমনি—খেচর, ঘরে-পাতা, কলেজে-পড়া, হাতে-গরম, অন্তর্বাসী অরণ্যে-রোদন, দিনে-ডাকাতি, অন্ধে-কাঁচা, গোড়ার গলদ।

● **নঞ্ তৎপুরুষ :** যে তৎপুরুষ সমাসের পূর্বপদ নঞর্থক বা নিষেধার্থক অব্যয়, তাহাকে নঞ্ তৎপুরুষ সমাস বলে। সংস্কৃত নঞ্ অব্যয়ের বাংলা রূপ—অ, অনু, অমা, আ, গর, ন, না, বি ও বে। অ—নাই মিল=অমিল; না হৃথ=অহৃথ; নয় হৃথ=অহৃথ; নয় শুভ=অশুভ; নয় গণ্য=অগণ্য [ বাহা গণন করা যায় না ]; নয় গণ্য=নগণ্য [ বাহা গণ্য করা যায় না—অর্থাৎ তুচ্ছ ]। অনু—নয় উচিত=অনুচিত; নয় এক=অনেক; নাই অন্ত=অনন্ত; নাই সীমা=অসীম নাই আহার=অনাহার; নয় আহৃত=অনাহৃত; নয় আবাদিত=অনাবাদিত অমা—নাই বৃষ্টি=অনাবৃষ্টি; নয় আজাত=অনাজাত। আ—নয় গাছা=আগাছা নয় বাটা=আবাটা; নয় কাল=আকাল; নয় কাঁড়া=আকাঁড়া; নয় লুনি=আলুনি গর—নয় হাজির=গরহাজির; নয় রাজী=গররাজী; নয় মিল=গরমিল। ন—ন অতি দীর্ঘ=নাতিদীর্ঘ; নয় অতি দূর=নাতিদূর; নয় অতি শীত ও উষ্ণ=নাতি

নীতোক :- নয় ধর=নধর। না—নয় রাজী=নারাজ, নয় মজুর=না-মজুর; নয় বালক=নাবালক; নাই দাবী=নাদাবী; নাই খেয়াজ [ খাজনা ]=নাখেয়াজ। নি, নিরু—নাই ভরসা=নির্ভরসা; নাই আশা=নিরাশা; নয় ভেজাল=নিভেজাল। নাই খুঁত=নিখুঁত; নাই ভুল=নিভুল; নাই জ্ঞান=নির্জ্ঞান। বি—নয় দেশ=বিশেষ; নাই শৃঙ্খলা=বিশৃঙ্খলা; নয় সমুদ্র=বিসমুদ্র; নয় ছেদ=বিচ্ছেদ। বে—নাই গতি=বেগতিক; নয় মানান=বেমানান। তেমনি—অন্যভাবে [ নয় বচনীয় ], অন্ত [ নয় কৃত ], অমৃত [ নয় মৃত ], অগ্নি, অনাবশ্যক, অবাধ্য, অনিবার্য, অভাব [ নাই ভাব ], অবাক, অনলস, অজ্ঞাত, অধ্যাত, অপরিচিত, অসং, অমঙ্গল, নাতিবৃহৎ, নাতিছুহু, অনশন, অনভিপ্রেত, অনিচ্ছা, অনীশ [ নয় ঈশ ], অনর্ভজ, অবিরাম, অপরিণত, অনিপুণ।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : শরণাগতকে রক্ষা করা কহবা। স্বগত উক্ত হইতে তাহার মনের কথা জানা গেল। ‘পাড়ায় এসেছে এক নাড়ী-টেপা ডাক্তার।’ ছেলে-ভুলানো ছড়া, জামাই-ঠিকানো প্রহ্ন, লোক-হাসানো কাণ্ড, প্রাণ-মাতানো সংগীত, হাড়-কীপানো শীত, হাড়-জালানো ছেলে, চোখ-ঝলসানো বিদ্যাতের আলো, প্রাণ জুড়ানো বাতাস, ঘুম-ভাঙানো ডাক। আলস্য বাকালীর মজ্জাগত দোষ। পরীবাংলা আজ গ্রীহীন। বিজ্ঞানসন্মত উপায়ে আজ রোগের চিকিৎসা হওয়া উচিত। বালকটি আসলে একটি সন্মাজ্জাদিত বহি। অন্ধিমুক্ত ব্যক্তির অন্তের প্রশংসা শুনিতে ভালোবাসেন না। নরপিলাচদের কবল হইতে দুঃখপোক্ত শিক্তরাও নিষ্কৃতি পায় নাই। পুত্রশোকে চন্দ্রধর একেবারে ভাঙিয়া পড়িলেন না। আসলে এই পৃথিবীটা একটা বড়ো রকমের পাগলা-পারদ। মহারাজ গুত্তরাষ্ট্র জম্মাক ছিলেন। যুদ্ধোত্তর-কালে শ্রমিক-বিক্ষোভ অত্যন্ত প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে। ‘বৌবরাহ্মে বসয়ে দে না লক্ষ্মীছাড়ার সিংহাসনে।’

### ৩. কর্মধারয় সমাস

যে সমাসে পূর্বপদ ও পরপদ যথাক্রমে বিশেষণে ও বিশেষ্যে বা বিশেষ্যে ও বিশেষ্যে বা বিশেষণে ও বিশেষণে গঠিত হয় এবং পরপদের অর্থ-প্রাধান্য প্রতীয়মান হয়, তাহাকে কর্মধারয় সমাস বলা হয়। কর্মধারয় সমাস মূলতঃ তৎপুরুষ সমাসেরই প্রকারভেদ; ইহাতে পরপদেরই প্রাধান্য। উহা প্রথমা তৎপুরুষেরই নামান্তর। যেমন : রক্ত যে পদ্ম=রক্তপদ্ম; যিনি রাজা তিনিই বাহাদুর=রাজাবাহাদুর; লাল ও নীল=লাল-নীল। প্রথম দৃষ্টান্তে—পূর্বপদ বিশেষণ [রক্ত] ও পরপদ বিশেষ্য [পদ্ম], দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে—পূর্বপদ বিশেষ্য [রাজা] ও পরপদ বিশেষ্য [বাহাদুর] এবং তৃতীয় দৃষ্টান্তে পূর্বপদ বিশেষণ [লাল] ও পরপদ বিশেষণ [নীল]।

বিশেষণ ও বিশেষ্যে কর্মধারয় : হ [ ভাল ] যে পুরুষ=তৎপুরুষ; মহৎ যে জন=মহাজন। তেমনি—নীলোৎপল, হারাদন, চলচ্চিত্র, ষায়েতশাসন, ভাড়াহাট, পুণ্যাহ, গুরুপক্ষ, কুরুপক্ষ, বেতপত্র, পূর্ণচন্দ্র, সৎগুরু, কুমরগণ, মহারাজ, মহামন্ত্রী, মহাবীর, মহাটমি [মহতী যে অটমী], মহাবি, মহাপুরুষ, মহাজন, মহাবিদ্যা, মহাজ্ঞান,

মহারাজী, শুচিবস্তু, কাপুরুষ [ কু বে পুরুষ—কপুরুষ ], পাণ্ডুলিপি [ পাণ্ডু বে লিপি ], খেতচন্দন, মিষ্টবাক্য, রক্তাশ্রয়, ছিন্নপত্র, বীরাদনা, সঙ্জন, নীলাকাশ, খেতপদ্ম, লাল কমল, ছিন্নবস্ত্র, ভগ্ন-সৌধ, বিধ [ সকল ]-মানব, রত্নবীণা, মহাসভা, হেড-পণ্ডিত, ফুল [ full ]-বার, পোড়ামাটি, হলুদপাখী, কালোমাণিক, নীলমণি, চোরাবালি, ঝরাপাতা, কালোবাড়ার, পাসমহল, কেনাগোলাম, কালপেচা, কাঁচকলা, হেড-মাস্টার, উড়োজাহাজ, ডুবোজাহাজ, উড়োচিঠি।

কতকগুলি শব্দে সমস্তপদে পূর্বপদ ও পরপদের অবস্থান পরিবর্তিত হইয়া যায়। ইহাকে ‘পূর্বনিপাত’ বলা হয়। যেমন : ‘অধম যে রাজা’=রাজাধম; অধম যে নর=নরাদম; উত্তম যে নর=নরোত্তম। বাংলায় এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক আছে। যেমন : বাটা এমন হলুদ=হলুদ-বাটা; ভাজা এমন চাল=চাল-ভাজা; সিদ্ধ এমন আলু=আলুসিদ্ধ। তেমনি—মাছ-ভাজা, পটোল-ভাজা, বেগুন-পোড়া।

বিশেষ্য ও বিশেষ্যে কর্মধারয় : যে খোকা সেই বাবু=খোকাবাবু; যিনি রাজা তিনিই ঋষি=রাজর্ষি; বাহা গঙ্গা তাহাই নদী=গঙ্গানদী; বাহা কলিকাতা তাহাই শহর=কলিকাতা-শহর; যিনি পিতা তিনিই ঠাকুর=পিতাঠাকুর ইত্যাদি। তেমনি—রাজ-সন্ন্যাসী, দেবর্ষি, লাট-সাহেব, ছালোক, ভুলোক, দাদুভাই, গিন্নীমা, দিদিভাই, দাদাবাবু, গুরুদেব, পিতৃদেব, মাতৃদেবী, ঠাকুরমহাশয়, ঠাকুরমা, শুকতারার, সম্রাট-কবি, নৃপশিখ, ডাক্তারবাবু, সর্দার-পটুয়া, বউঠাকুরাণী, বটগাছ, ডাক্তার-সাহেব, পণ্ডিতমহাশয়, শিক্ষকমহাশয়, কথকঠাকুর, মাতা-ঠাকুরাণী।

বিশেষণ ও বিশেষণে কর্মধারয় : বাহা কাঁচা তাহাই মিঠা=কাঁচামিঠা; বাহা মুছ তাহাই মন্দ=মুছমন্দ; যে চালাক সেই চতুর=চালাক-চতুর; বাহা লাল তাহাই নীল=লাল-নীল; বাহা ভীষণ তাহাই স্থন্দর=ভীষণ-স্থন্দর; তেমনি—গাঢ়নীল, নীল-লোহিত, সহজ-সরল, দীনছাষী, ক্রান্তরিক্তি, পণ্ডিতমূর্খ, জীবন্ত, অন্নমধুর, শীতোষ্ণ, নানান্থিক, গণ্যমান্য, কষ্টগুট, সুস্থ-সবল, হিংস্র-কুটিল, মিঠাকড়া, কঠোর-কোমল, মধুর-লজিত, কাঙ্ক্ষ-কোমল, বাঁধা-খরা, শান্তশিষ্ট, কানারোড়া, সুশোখিত, দীনহীন, ব্রিড-সজল, স্নিগ্ধোজ্জল।

### ● কর্মধারয় সমাস সম্পর্কে কতকগুলি বিশেষ সংস্কৃত-বিধি :

১. প্র, পূর্ব, মধ্য, অপর, সায়ন্ প্রভৃতি শব্দের পর ‘অহন্’ শব্দের ‘অহ্’ আদেশ হয়। যেমন : পূর্ব বে অহ=পূর্বাহ্ন [ দিনের পূর্বভাগ ], পূর্বাহ্ন [ পূর্বদিন ]; প্র [পূর্ব] বে অহ=প্রাহ্ন। তেমনি—মধ্যাহ্ন, পরাহ্ন, অপরাহ্ন, সায়াহ্ন।

২. স্বরবর্ণ পরে থাকিলে ‘ক্’ স্থানে ‘কং’ [ কন্ ] আদেশ হয়। যেমন : ক্ বে আচার=কদাচার; ক্ বে আকার=কদাকার; ক্ বে অর্থ=কদর্থ; ক্ বে অভ্যাস=কদভ্যাস। তেমনি—কদক্ষর, কদজি, কদন্তর, কদর্ঘ, কদয়, কদ্রক [ কবোক ]।

৩. পূর্বপদ ‘মহৎ’ স্থানে ‘মহা’ এবং পরপদ ‘সখি’ স্থানে ‘সখ’, ‘রাজন্’ স্থানে ‘রাজ’ ও ‘রাজি’ স্থানে ‘রাত্রি’ আদেশ হয়। যেমন : মহৎ বে জন=মহাজন, মহৎ বে রাজা=মহারাজ [ বাংলার ‘মহারাজা’ শব্দও প্রচলিত। যেমন : বর্ষবানের



মহারাজা]। মহৎ বিনি আশয়=মহাশয়; কিন্তু মহতের আশয়=মহাশয় [বটী তৎপুরুষ]। প্রিয় যে সখা=প্রিয়সখ; পূর্ব যে রাজি=পূর্বরাজ। অর্বরাজ, দীর্ঘরাজ।

\* কর্মধারয় সমাস প্রধানতঃ তিন প্রকারের হইয়া থাকে। যেমন : ১. সাধারণ, কর্মধারয়, ২. মধ্যপদলোপী কর্মধারয় ও ৩. উপমামূলক কর্মধারয়।

১. সাধারণ কর্মধারয় : বিশেষণ-বিশেষ্যে বা বিশেষ্য-বিশেষ্যে বা বিশেষণ-বিশেষ্যে যে কর্মধারয় সমাস হয়, তাহাকে সাধারণ কর্মধারয় সমাস বলে। [পূর্বে ইহার দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে।]

২. মধ্যপদলোপী কর্মধারয় : যে কর্মধারয় সমাসে ব্যাস-বাক্যের মধ্যস্থিত ব্যাখ্যানমূলক পদের লোপ হয়, তাহাকে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় বলা হয়। যেমন : সিংহ 'চিহ্নিত' আসন=সিংহাসন; ছায়া 'প্রধান' তরু=ছায়াতরু; তেল 'রাখিবার' ধুতি=তেলধুতি; বি 'মিশান' ভাত=বি-ভাত; জল 'মিশ্রিত' সাগু=জলসাগু; পল [মাংস] 'মিশ্রিত' অন্ন=পলান্ন; সিংহর 'রাখিবার' কোটা=সিংহর-কোটা; হাতে 'পরিবার' ঘড়ি=হাতঘড়ি; পঞ্চ 'অধিক' দশ=পঞ্চদশ। উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলিতে সমস্তমান পদে ব্যাখ্যানমূলক পদের [যথা : 'চিহ্নিত', 'প্রধান', 'মিশ্রিত', 'রাখিবার', 'পরিবার', 'অধিক' ইত্যাদি] আবির্ভাব ঘটিয়াছে; কিন্তু সমস্ত-পদগুলিতে তাহারা লুপ্ত হইয়াছে। সেইজন্য ইহার মধ্যপদলোপী কর্মধারয়। তেমনি—ভিকার, একাদশ, বোড়শ, গীতি-ভোজ, লীতি-উপহার, বোভাত, জামাইবটী [জামাইয়ের কল্যাণার্থ বটী], ভাত-দ্বিতীয়া, কাকন-কোকনদ, বয়স-জল, কজ-ঘড়ি, ফুলদানি, কেশ-তৈল, গন্ধতৈল, ছাইদান, বাতিদান, রক্ত-মুদ্রা, স্বর্ণালঙ্কার, গন্ধবর্ণিক, তালপাটালি, অগ্নিবাণ, হাঁটুজল, গৃহ-মার্জার, হাসিমুখ, জীবনবীমা [জীবন আশঙ্কার বীমা], স্বর্ণাকর, লক্ষ্মীকী [লক্ষ্মীমুক্তা কী], স্বর্ণভরণ, রৌপ্যমুদ্রা, রক্তচক্র, বিজয়-শব্দ [বিজয়-সূচক শব্দ], কীতি-মন্দির, গাড়িবারান্দা [গাড়ি রাখিবার বারান্দা], শোক-সভা [শোক-প্রকাশিকা সভা], পদ্মবেদী [পদ্ম-চিহ্নিত বেদী], মধ্যাহ্ন-ভোজন, সিংহর-কোটা, মনিবাগ, জল-চৌকি, আলোকচিত্র, মরুভূমি, মরুভান, জগদ্বিবস, জন্মোৎসব, স্মৃতি-সৌধ, সূচীশিল্প, পাদটীকা, মোমাছি, দুধ-বাগি, ধর্মঘট [ধর্ম রক্ষার্থে ঘট], সাম্যবাদ [সাম্য-বিষয়ক বাদ], রাষ্ট্রনৈতি, বরষাত্রী, সিংহদ্বার, বাহুঘর [বাহু বা পুরাকীতি-শোভিত ঘর], ভাইকোটা, স্বাধীনতা-দিবস [স্বাধীনতার স্মরণে পালনীয় দিবস], শহীদ-দিবস।

৩. উপমামূলক কর্মধারয় : যে কর্মধারয় সমাসে দুইটি অসম জাতীয় বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে তুলনা বা উপমার মাধ্যমে সাদৃশ্য কল্পনা করা হয়, তাহাকে উপমামূলক কর্মধারয় বলা হয়। উপমার চারটি অঙ্গ : ক. উপমান, খ. উপমেয়, গ. সাধারণ ধর্ম ও ঘ. তুলনাবাচক শব্দ।

ক. উপমান—বাহার সঙ্গে তুলনা করা হয় বা সাদৃশ্য কল্পনা করা হয়, তাহাকে উপমান বলা হয়। খ. উপমেয়—বাহাকে তুলনা করা হয় বা বাহার সাদৃশ্য কল্পনা করা হয়, তাহাকে উপমেয় বলা হয়। গ. সাধারণ ধর্ম—দুইটি অসম

জাতীয় বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে তুলনা করিতে গিয়া যে একটি বিশেষ বিষয়ে সাদৃশ্য কল্পনা করা হয়, তাহাকে সাধারণ ধর্ম বলা হয়। ‘চাঁদের জ্বায় হুম্মর মুখ’ দৃষ্টান্তটিতে ‘চাঁদ’ [ উপমান ] ও ‘মুখের’ [ উপমেয় ] মধ্যে একটি বিষয়ে মিল আছে। উভয় বস্তুর মধ্যে সেই মিল হইল ‘হুম্মর’। ‘হুম্মর’ সাধারণ ধর্মবাচক শব্দ। ব. তুলনাবাচক শব্দ—এই ধরনের উপমা বা তুলনায় উপমা বা তুলনাটিকে স্পষ্ট করিয়া তুলিবার জন্য একটি অব্যয় পদ ব্যবহার করা হয়। উল্লিখিত দৃষ্টান্তে ‘জ্বায়’ শব্দটি তুলনাবাচক শব্দ। জ্বায়, মত, মতন, সদৃশ ইত্যাদি তুলনাবাচক শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়।

উপমান, উপমেয় ও সাধারণ ধর্মের ভিত্তিতে উপমায়ুক্ত কর্মধারয় তিন প্রকারের : উপমান কর্মধারয়, উপমিত কর্মধারয় ও রূপক কর্মধারয়।

১. উপমান কর্মধারয় : উপমান পদের সহিত সাধারণ ধর্মবাচক শব্দের যে সমাস হয়, তাহাকে বলা হয় উপমান কর্মধারয়। যেমন : কুম্মের জ্বায় কোমল = কুম্ম-কোমল। এখানে ‘কুম্ম’ উপমান, ‘কোমল’ সাধারণ ধর্মবাচক শব্দ, কাজেই ইহা উপমান কর্মধারয়। তেমনি—ঘনের [ মেঘের ] জ্বায় শ্রাব = ঘনশ্রাব ; শশের জ্বায় ব্যস্ত = শশব্যস্ত ; তুবারের জ্বায় ধবল = তুবারধবল ; কাজলের জ্বায় কালো = কাজল-কালো ; বজ্রের জ্বায় কঠিন = বজ্রকঠিন ; হস্তীর জ্বায় মূর্খ = হস্তী-মূর্খ।

অতিরিক্ত দৃষ্টান্ত : জলদ-গভীর, বক-ধার্মিক, মসীকৃষ্ণ, ইন্দ্রাভ-কঠিন, বিড়াল-তপস্বী, ভ্রমরকৃষ্ণ, কাশগুহ, তুবার-গুহ, কুম্মগুহ, হিমশীতল, তুবারশীতল, শিশির-স্নিগ্ধ, শৈলোরত, জ্যোৎস্না-ধবল, মেঘ-নীল, ঘনকালো, শোণিত-রাঙা, মেঘ-মেঘুর, ক্রুটি-কুটিল, অশ্রু-অরুণ, অরুণ-রাঙা, দুর্বাদলশ্রাব, বজ্রগভীর, শব্দ-ধবল, নবনীত-কোমল, নিমতিতা, মিশ্র-কালো, গোবেচারী, ফুটিকাটা, দুধ-শাদা, সিদ্ধুর-রাঙা।

২. উপমিত কর্মধারয় : উপমান পদের সহিত উপমেয় পদের সমাসকে উপমিত কর্মধারয় বলা হয়। যেমন : ‘মুখ’ চাঁদের ‘জ্বায়’ = চাঁদমুখ। এখানে ‘চাঁদ’ উপমান, ‘মুখ’ উপমেয়। উপমান ও উপমেয়ের সমাস হইয়াছে। কাজেই, ইহা উপমিত কর্মধারয়। তেমনি—পুরুষ সিংহের জ্বায় = পুরুষসিংহ ; কর পল্লবের জ্বায় = করপল্লব ; আঁখি পদ্মের জ্বায় = পদ্ম-আঁখি ; লোচন পলাশের জ্বায় = পলাশ-লোচন ; চরণ কমলের জ্বায় = চরণ-কমল ; মুখ চন্দ্রের জ্বায় = মুখচন্দ্র [ চন্দ্রমুখ ]।

অতিরিক্ত দৃষ্টান্ত : পদ্মপত্র, বাহুলতা, তহুলতা, নরশাহুল, মরসিংহ, পুরুষ-ব্যাঘ্র, ফুলকুমারী, কর-কিশলয়, অধর-কিশলয়, অধর বিধ [ বিধাধর ], বাহুবল্লরী, কটিকজল, অধর-কমল, মুখ-চন্দ্রক, সোনামুখ, হাড়ি-মুখ, করপল্লব, পশুপল্লব, কদমহাঁট, ফুলবাবু [ ফুলের মত বাবু ], চন্দ্রপুলি, ওলকপি, চাঁদবদন, অধর-পল্লব, চরণ-পদ্ম, জটাজাল।

৩. রূপক কর্মধারয় : যে সমাসে উপমান ও উপমেয়ের সাদৃশ্য এত নিবিড় হয় যে, উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে অভেদ কল্পনা করা হয় অর্থাৎ উপমান ও উপমেয়ের ভেদাভেদ করা যায় না, তাহাকে রূপক কর্মধারয় সমাস বলা হয়। যেমন : ঘন রূপ বাকি = ঘনবাকি। এখানে ‘ঘন’ উপমেয় ও ‘বাকি’ উপমান। ঘন ও বাকির মধ্যে সাদৃশ্য এত নিবিড় হইয়াছে যে, দুইটি বস্তুকে

পৃথক কল্পনা করা যায় না। মনে হয়, দুই-ই এক অর্থাৎ অভিন্ন। উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে এই অভেদ-কল্পনার জ্ঞান রূপক কর্মধারয় সমাস হইয়াছে। তেমনি—বিভা রূপ আলৌকিক=বিভালৌকিক; ক্রোধ রূপ বহি=ক্রোধবহি; ভব রূপ নদী=ভবনদী; মন রূপ মাঝি=মনমাঝি; প্রাণ রূপ পাখি=প্রাণপাখি; কুখ্য রূপ অনল=কুখ্যানল।

অতিরিক্ত দৃষ্টান্ত : ভবসিদ্ধু, ভবসাগর, দেহ-মন্দির, শোকান্নি, শোকসিদ্ধু, শোক-সাগর, দেহ-শিঞ্জির, বিষাদ-সিদ্ধু, বিচারত, জীবনশ্রোত, মন-বিহঙ্গ, হৃদয়-সাগর, স্নেহ-সুধা, জীবনতরু, আকাশ-পট, জীবন-প্রবাহ, আকাশ-গঙ্গা, স্নেহপাশ, মরণশ্রোত, বিরহ-স্বাধার, গন্ধজাল, হৃদয়-পদ্ম, মনোরথ, মন-ময়ূরী, জ্ঞানবৃক্ষ, হৃদয়-আকাশ, বিভাধন, চক্ষুরত, কীৰ্ত্তিধ্বজা, প্রেমসুধা, চরিতামৃত, কথাস্বত, শাস্তিবারি, যৌবন-কুসুম, বাণী-মঞ্জরী, কল্পনাতা, হৃদয়-কুসুম, মাংসর্ষ-বিষ, স্নেহসমুদ্র, প্রাণ-বাহিনী, মায়াডোর, দেহ-আকাশ, জীবন-উত্থান, হৃদয়-অরণ্য, রূপ-সাগর, চিত্ত-চাকর, মন-মধুর, দুঃখানল, মন-পবন, আঁখি-পাখি, যৌবন-বাউল, দিল-দরিয়া, মায়া-কোকিল, জ্ঞান-বহি, ধনবহি, রূপবহি, ধর্মবহি, ইন্দ্রিয়বহি, সংসার-কানন, জ্ঞানালোক, সংসার-সাগর, কালশ্রোত, কালচক্র, \*কালসাপ, জীবন-তরী, হৃৎপদ্ম, সভ্যতা-নাগিনী, জ্ঞান-বর্তিকা, সমাজ-সৌধ, ভাব-বিগ্রহ, দেশ-মাতৃকা, বাদল-বাউল।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : ‘জনগণে ব্যাধা ভৌকসম শোবে তারে মহাজন কর।’ পাণ্ডুরা আজ স্বায়ত্ত-শাসন লাভের জ্ঞান সংগ্রাম করিতেছে। তাঁহার উপজ্ঞানের পাণ্ডুলিপি হারাটয়া গিয়াছে। রাজর্ষি জনক রামচন্দ্রের হাতে সীতাকে সম্প্রদান করিলেন। ‘কেতকী-কেশরে কেশপাশ করে সুরভি।’ ‘নৃপশিখ্য নতশিরে বসি রহে নদীতীরে।’ ‘স্নিগ্ধোজ্জ্বল শ্রামকান্তি তব তব অমৃত-পরশ।’ ‘বাংলার রবি জয়দেব কবি কান্ত-কোমল পদে করেছে সুরভি সংস্কৃতির কাকুন-কোকনদে।’ তিনি শশবাস্তু হইয়া স্বানটি পরিত্যাগ করিলেন। ‘হে মহামানব, একবার এসো ফিরে।’ বোভাতের প্রীতি-ভোজে শুধু প্রীতি-উপহারেরই ভিড়। আলোক-চিত্রের প্রদর্শনী ছিল মেলার একটি আকর্ষণ। পনেরই আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা-দিবস। শহীদ-দিবসে আমরা সেই অমর আত্মাগুলিকে অস্তরে স্মরণ করি। তুষার-ধবল আকাশে যেন ছোয়াঁয়ার বান ডাকিয়াছে। ‘জলদ-গঙ্গারীর স্নেহে কছিল সৌমিত্রি।’ গায়ে নামাবলী দেখে ভুলে যেও না, আসলে উনি একটি বক-ধার্মিক। তাঁহার হৃদয় ছিল যেমন ইম্পাত-কঠিন, অতীতিকে তেমনি কুসুম-কোমল। ‘জীবন-প্রবাহ বহি’ কালসিদ্ধু পানে পায়, ফিরাব কেমনে?’ মন-মাঝি তোর বৈঠা নে রে।’ ‘দেখিবারে আঁখি-পাখি ধায়।’

বি. অ. : উপমিত কর্মধারয় ও রূপক কর্মধারয়ের মধ্যে পার্থক্যটি অত্যন্ত নিবিড়, উপমিত কর্মধারয়ে নাদৃশ্যটি কেমন নিবিড় নয়। উপমিত কর্মধারয়ে উপমেয়ের প্রাধান্য : কিন্তু রূপক কর্মধারয়ে উপমানেরই প্রাধান্য। উপমিত কর্মধারয়ে দুইটি পদই বস্তুবাচক ; কিন্তু রূপক কর্মধারয়ে একটি পদ ভাববাচক, অতীত বস্তুবাচক। যেমন : উপমিত কর্মধারয়—বিশিষ্ট বিষ-বাসনার অরবিন্দ-বাসনানে পাদপদ্ম রেখে তোমার। উপমেয়—‘পাদ’। ক্রিয়াপদটি উপমেয়ের অনুগামী। রূপক কর্মধারয়—দেখিবারে আঁখি-পাখি ধায় : উপমান—‘পাখি’। ক্রিয়াপদটি উপমানের অনুগামী।

## ৪. দ্বিগু সমাস

দ্বিগু সমাসও তৎপুরুষ সমাসেরই প্রকার-ভেদ মাত্র।

যে তৎপুরুষ সমাসের পূর্বপদে সংখ্যাবাচক বিশেষণ বসিয়া সমাহার বা সমষ্টি বুঝায় এবং পরপদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহাকে দ্বিগু সমাস বলা হয়। দ্বিগু সমাসেও তৎপুরুষ সমাসের মতো পরপদেরই প্রাধান্য।  
 যেমন : পঞ্চ বটের সমাহার = পঞ্চবট। ‘পঞ্চ’ এই পূর্বপদটি সংখ্যাবাচক বিশেষণ। ইহার দ্বারা সমাহার বা সমষ্টি বুঝাইতেছে এবং ‘বট’ এই পরপদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। অতএব এই দৃষ্টান্তটি সমাহার দ্বিগু সমাসের। তেমনি—  
 সপ্ত অঙ্কের সমাহার = সপ্তাহ ; শত অঙ্কের সমাহার = শতাব্দী ; নব রত্নের সমাহার = নবরত্ন ; পঞ্চ নদের [নদীর] সমাহার = পঞ্চনদ [পঞ্চনদী]। তেমনি—ত্রিগুণ্য, ত্রিফলা, চতুষ্পদ, পঞ্চভূত, দ্বিপ্রহর, ত্রিশঙ্খা, ত্রিধামা, ত্রিভুজ, চতুর্দ্বিজ, পঞ্চরাত্রি, পঞ্চভূগা, নবভূগা, সপ্তধি, ত্রিবেণী, দশচক্র, ত্রিচক্র [যান], ত্রিভুবন, চতুষ্পর্বা, পঞ্চপ্রদীপ, বারমাস্তা [বারমাসী], চৌপদী, ষড়রিপু, ষড়ষহ, অষ্টধাতু, পঞ্চায়ত, পঞ্চাব, ষড়ধাতু, ষট্পদী, অষ্টবহু, নবগ্রহ, চতুরঙ্গ, সপ্তসিদ্ধি, দশদিগন্ত, চতুর্দশপদী, ত্রিমূর্তি, সপ্তরথী, শতবার্ষিকা, পঞ্চবার্ষিকী, অষ্টাঙ্গ, ষোড়শোপচার।

অতিরিক্ত বাংলা দৃষ্টান্ত : পাঁচকড়ি, তিনকড়ি, সাতকড়ি, সাতঘাট, পাঁচনালা, দশশালা, তেমাখা, চোমাখা, চোরকী, চোরাস্তা, তেপায়া, পাঁচকোড়ন, ছয়ানি, ছবেলা, দোচালা, দোপাটা, তেপান্তর [প্রান্তর], ছপুর, ত্রিভাল, চৌভাল, চৌদিক, চৌপর, চারভালা, চারদিক, চৌপায়, সাতসমুদ্র, তেরনদী, তে-মোহনা, তে-রাস্তির, সেতার, দোভাড়া, দোয়াব, দোতানা, দোনালা, দোহারা, সাতকাণ্ড, সাতখুন, সাতনরী, দুহুল।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : ‘শত শতাব্দী ভাঙেন যে হাড়, সেই হাড়ের ওঠে গান।’  
 ‘আমি ষাট জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে, দৈবে হতেম দশম রত্ন নবরত্নের মালে।’  
 ‘পঞ্চনদীর তীরে বেগী পাকাইয়া শিরে দেখিতে দেখিতে গুরুর ময়ে জাগিয়া উঠিল শিখা।’  
 ‘যামিনী ত্রিধামা ; আকাশে দৈববাণী শ্রুত হইল। দশচক্রে ভগবান হৃত।’  
 ‘আমাদের সেনা যুদ্ধ করেছে সজ্জিত চতুরঙ্গে।’  
 ‘সপ্তসিদ্ধি দশদিগন্ত মাথাও যে ঝংকারে।’ ১২৬১ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্র-জন্ম-শতবার্ষিকী অহুষ্ঠিত হয়।  
 কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সপ্তরথী বালক অভিমন্যুকে বধ করিয়া দ্বিজবীরকে কলঙ্কিত করিয়াছিল। ছোট-রানীর গলায় ছিল সাতনরী হার। ‘হাটের দোচালা মুদিল নয়ান।’  
 ‘পিরায় দোপাটা দিতে বরে টানাটানি।’  
 ‘কটিতে ছিল নীল দুকূল, মালতী-মালা মাখে।’  
 ‘অশানের বৃকে আমরা রোপণ করেছি পঞ্চবটী।’

## ৫. বহুব্রীহি সমাস

যে সমাসে পূর্বপদ বা পরপদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান না হইয়া তৃতীয় একটি অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহাকে বহুব্রীহি সমাস বলা হয়। যেমন : নীল কণ্ঠে বাহার = নীলকণ্ঠ। পূর্বপদটি ‘নীল’ অর্থাৎ বিব, পরপদটি

‘কঠ’। সমাসবদ্ধ পদটিতে নীল বা বিব কিংবা কঠ কাহাকেও বুঝাইতেছে না; বাহার কৃষ্ঠে বিব থাকে অর্থাৎ ‘বিব’কে বুঝাইতেছে। অতএব বৃহত্তম বহুব্রীহি সমাসেন্ন।

বহুব্রীহি সমাস কয়েক প্রকারের হয়। যেমন : ১. সমানাধিকরণ বহুব্রীহি, ২. ব্যতিকরণ বহুব্রীহি, ৩. ব্যতিহার বহুব্রীহি, ৪. মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি, ৫. অলুক বহুব্রীহি ও ৬. নঞর্থক বহুব্রীহি।

১. সমানাধিকরণ বহুব্রীহি : যে বহুব্রীহি সমাসে পূর্বপদ বিশেষণ ও পরপদ বিশেষ্য, তাহাকে সমানাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস বলা হয়। যেমন : গীত অমর বাহার=গীতাধর; পুষ্য শ্লোক [ বশঃ ] বাহার=পুষ্যাশ্লোক; শোড়া মুখ বাহার=মুখশোড়া; পক কেশ বাহার=পককেশ; প্রোষিত [ প্রোষসী ] ভর্তা [ স্বামী ] বাহার [ স্ত্রী ] =প্রোষিতভর্তকা ইত্যাদি। তেমনি—শ্রোত্রাস, হর্ষক [ হরি অর্থাৎ পিঙ্গল বর্ণ অক্ষি বাহার ], ছিন্নতন্ত্রী, রক্তাধরা, মতিজ্বর, বেতাধরা, মধ্যবিত্ত, উর্ধ্ববাহু, আত্মমূলধিতবাহু, শুভচিত্ত, চরিতার্থ [ চরিত অর্থ বাহার ], মন্মভাগ্য, হতভাগ্য, হতবুদ্ধি, কুজাঙলি, জিতেন্দ্রিয়, কৃতবিত্ত [ কৃত বিভা বাহার ], বিগতস্ত্রী, শুদ্ধস্ব, সুহৃদ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, বিশালাক্ষী, দশভূজা, ত্রিনয়নী, মহাপ্রাণ [ মহান প্রাণ বাহার ], প্রোষিতভার্য [ প্রোষিতা ভার্য বাহার ], বিবিধ [ বি অর্থাৎ বহু বিভা অর্থাৎ প্রকার বাহার ], অপকুপ [ অপ অর্থাৎ বিচিত্র ], ছিন্নমূল, হীনপ্রভা, বিগত-যৌবন, স্বচ্ছসলিলা, কুবের [ কু অর্থাৎ কুংসিত বেব অর্থাৎ দেহ ], নীল-বাসনা, নীল-নয়না, প্রসন্ন-সলিলা, রক্ত-ঔষি, শ্রামাঙ্গী, লাল-পেড়ে, মিহিধানা, মধ্যবয়সী, দশানন, দীর্ঘকায়, কৃতার্থ, নতশির, উচ্চশির, সিদ্ধকাম, সিদ্ধহস্ত, পকানন, ত্রিলোচন, বদ্রমেজাজী, খোশমেজাজী, কালোবরণ, অকৃতকার্য, শুধী, করিতকর্মী, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, ছন্নমতি, কদাকার [ ‘ক’স্থানে ‘কদ্’ আদেশ ], স্বল্পায়ু, নষ্টকীর্তি, লব-প্রতিষ্ঠ, সমবয়সী, দীর্ঘদেহী, স্ত্যস্তপৃষ্ঠ, বাসন্তী-দুহলা, একরোখা, একপুংয়ে, দোমনা, সবাস্ত [ সবস্ব অস্ত বাহার ], কালোপেড়ে।

সমানাধিকরণ বহুব্রীহি সমাসে কখনও কখনও বিশেষ্য পদটি পূর্বে এবং বিশেষণ পদটি পরে বসে। যেমন : পেটমোটা, রাশভারি, বিলাসপ্রিয়, ভূষণ-প্রিয়।

অনেক সময় সমানাধিকরণ বহুব্রীহি সমাসে পূর্বপদটি বিশেষ্য হইয়াও বিশেষণ-স্থানীয়রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। যেমন : শশী ভূষণ বাহার=শশীভূষণ; কণী ভূষণ বাহার=কণিভূষণ; অহি ভূষণ বাহার=অহিভূষণ; কুস্তি [ বাঘের ছাল ] বাস বাহার=কুস্তিবাস, ভূতগণের নাথ যিনি=ভূতনাথ; মেঘ বাহন বাহার=মেঘবাহন; নদী মাতা বাহার=নদীমাতৃক; বিপ মিত্র বাহার=বিশ্বামিত্র। তেমনি—দ্বিপদ্য, কৃষিমাতৃক [ কৃষি মাতা বাহার ], দিগমনা, বিদূতিভূষণ, পদ্মালনা।

স্মরণীয় : ঙ্গ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ পূর্বপদ থাকিলে সমাসবদ্ধ পদটিতে ঙ্গ-কার ই-কার হয়। আবার ‘দাস’ শব্দ যোগেও ‘কালী’, ‘দেবী’ ও ‘বজী’ শব্দের বীর্ঘ-ই হ্রস্ব-ই হয়। যেমন : কালিদাস [ কিন্তু কালীদাস, কালীচরণ ], দেবদাস [ কিন্তু দেবীচরণ, দেবীপদ, দেবীপ্রসাদ ]; বজীদাস [ কিন্তু বজীচরণ, বজীকান্ত ]। কেবলমাত্র ‘চণ্ডীদাস’ ও ‘চণ্ডিদাস’ উভয় রূপই প্রচলিত।

### ৭. ব্যতিকরণ বহুব্রীহি : যে বহুব্রীহি সমাসে

তাহাদের মধ্যে একটি পদ [অধিকরণ] সপ্তমী-বিত্তিক্রিয়, তাহার ব্যতিকরণ বহুব্রীহি সমাস বলা হয়। যেমন : চন্দ্ৰ দেখে বাহার = চন্দ্রদেখ। এখানে পূর্বপদ 'চন্দ্ৰ', পরপদ 'দেখ'—উভয় পদই বিশেষ; কিন্তু পরপদে সপ্তমী-বিত্তিক্রির চিহ্ন 'এ' হুক্ত রহিয়াছে এবং সমস্তপদ 'চন্দ্রদেখ' শিবকে বুঝাইতেছে। দৃষ্টান্তটি ব্যতিকরণ বহুব্রীহি সমাসের। তেমনি—বড়ল হতে বাহার = বড়লহত; শূল পাণিতে বাহার = শূলপানি; বীণা পাণিতে বাহার = বীণাপানি; পদ্ম নাভিতে বাহার = পদ্মনাভ; ডব্বর পাণিতে বাহার = ডব্বরপানি; মীল কণ্ঠে বাহার = মীলকণ্ঠ ইত্যাদি। তেমনি—রত্নগর্ভা, বকরচূড়, চন্দ্রচূড়, শ্রীকণ্ঠ, শ্রীনিবাস, বহুপানি, শশিশেখর, শশাক, উর্ণনাভ [উর্ণা নাভিতে বাহার], আশীবিব [আশীতে অর্থাৎ দাঁতে বিব বাহার], কপলম্মা, পাশপতি, অস্ত্রমনক, অস্ত্রমনা, কৃষ্ণ, হিরণ্যগর্ভ, শিনাকপানি, ধর্মবুড়ি, বিদ্যোগম্ভ, সত্যসম্ভ, বিজম্ভ, হর্মমুখী, মাণ্ডীবধবা, পুণ্ডরু।

ব্যতিহার বহুব্রীহি : পরস্পর-সাপেক্ষ ক্রিয়া বা পরস্পর ক্রিয়া-

বুঝাইতে যে বহুব্রীহি সমাসে একই পদ দ্বিগু হইয়া পূর্বপদ ও পরপদরূপে বসে, তাহাকে ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন : লাঠিতে লাঠিতে যে যুদ্ধ = লাঠালাঠি; কানে কানে যে কথা = কানাকানি; ঘূষিতে ঘূষিতে যে যুদ্ধ = ঘূষাঘূষি; হাতে হাতে যে যুদ্ধ = হাতাহাতি; কোলে কোলে যে মিল = কোলাহুলি। তেমনি—গলাগলি, দলাদলি, গালাগালি, কেশাকেশি, চুলোচুলি, মারামারি, টানাটানি, ধস্তাধস্তি, হাঁকাহাঁকি, বকাবকি, কষাকষি, রক্তারক্তি, টানাটানি, রেধারেধি, ভাগাভাগি, দেখাদেখি, নখানখি, হানাহানি, চোখাচোখি, তর্কাতর্কি, ফাটাফাটি, খুনাখুনি, কড়াকড়ি, গুঁতাগুঁতি, ঘোষাঘোষি।

৪. মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি : যে বহুব্রীহি সমাসে ব্যাসবাক্যের ব্যাখ্যানমূলক মধ্যবর্তী পদটির লোপ হয়, তাহাকে মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস বলা হয়। ইহার অল্প নাম উপমান পূর্বপদ বহুব্রীহি বা উপমান্বক বহুব্রীহি। যেমন : বৃণের নয়নের জায় নয়ন বাহার = বৃণনয়না। এখানে ব্যাসবাক্যের উপমান্বক ব্যাখ্যানমূলক পদটির লোপ হইয়াছে। কাজেই, এই দৃষ্টান্তটি মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি বা উপমান পূর্বপদ বহুব্রীহি বা উপমান্বক বহুব্রীহি সমাসের। বর্ণের আভার জায় আভা বাহার = বর্ণাভ; চন্দ্রের জায় বদন বাহার = চন্দ্রবদনা; এণ'র অক্ষির জায় অক্ষি বাহার = এণাকী; মীনের অক্ষির জায় অক্ষি বাহার = মীনাকী; খঙনের নয়নের জায় নয়ন বাহার = খঙন-নয়না ইত্যাদি। তেমনি—পদ্মমুখী, অশ্রুমুখী, বিড়ালাকী, বিধুমুখী, কপোতাক, কমলাক, বিদ্যায়রা, কঙ্কর, কুরবার, বাপহ [বা অর্থাৎ কুকুরের জায় পদ বাহার], পদ্মগড়ী, হুতকর্ণ, হর্ষনখা, কর্ণাম্ভ [কর্ণে অবতের জায় বাহা], মেঘবরণ, তড়িতবরণী, হরিণনয়নী, গোবিন্দামুখো, ভাকাবুকো [ভাকের বুকের মতো বুক বাহার]।

৫. **অলুক্ বহুব্রীহি :** যে বহুব্রীহি সমাসে বিভক্তির লোপ হয় না, তাহাকে অলুক্ বহুব্রীহি সমাস বলা হয়। যেমন : গায়ে হনুদ দেওয়া হয় যে অহুঠানে = গায়েহনুদ। এখানে ‘গায়ে’ শব্দের সপ্তমী বিভক্তি সমস্তপদে লুপ্ত হয় নাই। কাজেই, ইহা অলুক্ বহুব্রীহি সমাসের দৃষ্টান্ত। মতান্তরে ইহা অনুষ্ঠানবাচক বহুব্রীহিও। হাতে খড়ি দেওয়া হয় যে অহুঠানে = হাতেখড়ি ; মুখে ভাত দেওয়া হয় যে অহুঠানে = মুখেভাত ; হরির উদ্দেশে লুঠ দেওয়া হয় যে অহুঠানে = হরির লুঠ।

৬ **নঞর্থক বহুব্রীহি :** যে বহুব্রীহি সমাসে পূর্বপদ নঞর্থক বা নিষেধার্থক অব্যয়, তাহাকে নঞর্থক বহুব্রীহি সমাস বলা হয়। যেমন : নাই ভুল বাহাতে = নিভূল। এখানে পূর্বপদ নঞর্থক বা নিষেধার্থক অব্যয়। এবং সেই অব্যয়ের অর্থ বা পরপদের অর্থ প্রধান না হইয়া তৃতীয় একটি পদের অর্থ [ নিভূল বস্তু ] প্রধানরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। কাজেই, দৃষ্টান্তটি নঞর্থক বহুব্রীহি সমাসের। তেমনি— নাই পরোয়া। ষাঠাব = বেপরোয়া, নাই নাড়ীজ্ঞান ষাহার = আনাড়ী ; নাই ইমান ষাহার = বেইমান, নাই ভল ষাহাতে = নিভলা। তেমনি—অবুঝ, নিবোধ, নিরহঙ্কার, নিরপরাধ, বেকার, বেইজ্জত, নিভীক, নির্ধন, বেহায়া [নাই হায়া অর্থাৎ লজ্জা ষাহার], অজ্ঞান, অনাদি, নিরুপায়, নির্বাক, নিষ্পাপ, নিস্তরঙ্গ, নির্মল, নিরুপহব, নিঃসহায়, বেহুং, বেহুরো, নিরলুঘ, নীরব, অপয়া [নাই পয় ষাহার], নিলজ্জ, নিরপেক্ষ, অসীম, অপদার্থ, নিঃশঙ্ক, অতল, নিদয়, নির্মম [নাই মমতা ষাহার], বেতার [নাই তার ষাহাতে], বেয়াদপ, নীরজ, নিচিস্ত, নীরস, অপুত্রক।

**সহার্থক বহুব্রীহি :** সহার্থক পদের সহিত বিশেষ্য পদের যে বহুব্রীহি সমাস হয়, তাহাকে সহার্থক বহুব্রীহি সমাস বলা হয়। যেমন : সঞ্জীক [ স্ত্রীর সহিত বর্তমান ], সুপত্নীক, সুপুত্র, সবাঙ্ঘব, সশিষ্য, সপরিবাব, সম্বয়, সাদর, সপাতি, সবিনয়, সশ্রদ্ধ, সম্বেহ, সাভয়, সোৎসাহ, সদর্প, সাহংকার, সফল, সার্থক, সজল, সক্রম, সাকার, সাগ্নিক, সকৌতুক, সলজ্জ, সনাথ, সগল, সতর্ক, সন্তোষ, সসাগরা, সবিব্রাম, সশস্য, সশঙ্ক, সভয়, সক্রিয়, সদয়, সহর্ষ, সবাৎ, সমধা, সাবলীল, সফল, সসন্মান, সসুদয়, সগোত্র, সম্ভর, সশঙ্ক, সক্রিয়, সজীল, সহার্থ [ সমান বা একই তীর্থ বা গুহ ষাহার ], সপত্নী [ সমান বা একই পতি ষাহার—স্ত্রী লঙ্গে ], সখেদ, সবেগ, সমান [ মানের সহিত বর্তমান ], সচক্তি, সজোর, সহিত, সফল, সশরীর, সার্থ [ অর্ধের সহিত বর্তমান ]।\*

বহুব্রীহি সমাসেব অতিরিক্ত দৃষ্টান্ত : মৃত্যুভিত্তিকা, বিপত্নীক [ বিগত হইয়াছে পত্নী ষাহার ], প্রোষিতপত্নীক, বিদবা [ বিগত হইয়াছে ধব অর্থাৎ স্বামী ষাহার ], নিয়োগান্ত, মিলনান্ত, সমকক্ষ, কান্তকৃষ্ণ, অধাবক, কৃষিপ্রধান, জনাবরণ, রূপবানী, প্রাপ্তবয়স্ক, বহুসংখ্যক, অন্তরীপ, দ্বীপ, দেশবন্ধ, সোদর, সতোদর, অবাক, অমিতীয়া, সমবয়সী, অল্পবয়স্ক, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, বীতশ্রদ্ধ, দ্বিরদ [ রদ = দাত ]।

\* উত্তরপদ বিশেষ্য হইলে সহার্থক বহুব্রীহি হইবে না। অবশ্য সেক্ষেপ পদের প্রয়োগ হইবে। কিন্তু ইহার অন্তর্ভুক্ত। যেমন : সপত্নিত, সচকিত, সকাতির, সলজ্জিত, সক্রমজ, সঠিক সাংলিখিত ইত্যাদি।

### বহুব্রীহি সমাসের কতকগুলি স্মরণীয় নিয়ম :

১. 'সহ' শব্দের স্থানে 'স' হয় : বাক্যের সহিত বর্তমান=সবাক্ । 'সহ [ সমান ] উদ্ভব বাহ্যার=সোদর বা সহোদর, সমান ধর্ম বাহ্যার=সধর্ম্য ।

২. 'অক্ষি' শব্দের স্থানে 'অক্ষ', 'ধনুস' শব্দের স্থানে 'ধনু' [ ধবা ] এবং 'নাভি' শব্দের স্থানে 'নাভ' হয় । যেমন : বিশালাক্ষ, গাণ্ডীবধনু, উর্ণনাভ ইত্যাদি ।

৩. ঙ্গ-কারান্ত শব্দের উত্তর, নিত্য ক্রীলিঙ্গ শব্দের উত্তর এবং 'উরস্' শব্দের উত্তর 'ক' হয় । যেমন : নদীমাতৃক, সঙ্গীক, নিরর্থক, বিশালউরস্ক ইত্যাদি ।

৪. কতকগুলি শব্দের উত্তর বিকল্পে 'ক' হয় । যেমন : অল্পবয়স্ক, প্রাপ্তবয়স্ক, বহুসংখ্যক ইত্যাদি ।

৫. 'ধর্ম' শব্দের উত্তর 'ধনু' [ আ ] হয় । যেমন : সমান ধর্ম বাহ্যার=সমানধর্ম্য বা সধর্ম্য । তেমনি : বিধর্ম্য [ বিধর্মী—বিকল্পে ], সুধর্ম্য ।

৬. 'গন্ধ' শব্দের উত্তর বিশেষ অর্থে 'ই' হয় । যেমন : স্ব [ শোভন ] গন্ধ বাহ্যার=সুগন্ধি । তেমনি : পদ্মগন্ধি, চন্দনগন্ধি ।

৭. 'সম', 'বি', 'অন্তর' শব্দের পর 'অপ্' 'ঐপ্' হয় । যেমন : সমীপ, বীপ, অন্তবীপ ।

**বিশিষ্ট প্রয়োগ :** পুণ্যল্লোক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম জানে না, এমন বাঙালী ক'জন আছে ? কোমলতাই নদীমাতৃক বাংলাদেশের স্বভাব-ধর্ম । আজ বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজ চব্বিশ অবস্করের সম্মুখীন । আমাব আকাজ্জা কি চরিতার্থ হইবে না ? ঠাকুব-পরিবারের সকল সন্তানই ছিলেন কৃতবিদ্য, খ্যাতিমান । তাহার মতো হতভাগ্য এ পৃথিবীতে আর কেহ নাই । পল্লী-বাংলা আজ দীন, মলিনা, বিগতশ্রী । বর্ধমানের মিহিাদান বিখ্যাত । বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান বহু মারণাস্ত্রের আবিষ্কারায় আজ সিদ্ধকাম । স্বভাবচন্দ্রের পিতা জানকীনাথ ছিলেন কটকের লক্ষ-প্রতিষ্ঠ আইন-ব্যবসায়ী । ভারত আজ তাহার সমস্ত কিছু হারাইয়া একেবারে সর্বস্বান্ত । 'আয় রে পাখি লেজঝোলা ।' 'কুন্তিলাস কীর্তিলাস কবি ।' 'নীলকণ্ঠ করেছেন পৃথ্বীরে নিবিধ ।' 'কী স্বাভাব্য বিষে বুঝিবে সে কিসে কত আশীর্ষিষে দংশেনি বারে ?' নেতাজী স্বভাবচন্দ্র ছিলেন অগণজন্মা মহানায়ক । 'মাল-চেনাচেনি' দর-জানাঙ্গানি, কানাকড়ি নিয়ে কত টানাটানি, হানাহানি করে কেউ নিল ভরে, কেউ গেল খালি ফিরে । 'লাগিবে না তাহে বাহুবল কিবা লাগিবে না ঘোষাঘোষি ।' 'বিড়ালকী বিষমুখী মুখে গন্ধ ছুটে ।' 'কিবা বিদ্বাধর্য রমা অমুরাশি-তলে ।' তার মতো বেইমান, বেহাঙ্গা আর বেপরোয়া মানুষ আমি আর দেখিনি । বেশ প্রোষিতকর্তৃকা বক্ষপ্রিয়র নিকট বিরহের বাণী বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল ।

### ৬. অব্যয়ীভাব সমাস

যে সমাসের পূর্বপদে অব্যয় থাকে এবং অব্যয়ের অর্থই প্রধানরূপে, প্রতীয়মান হয়, তাহাকে বলা হয় অব্যয়ীভাব সমাস । অব্যয়ীভাব সমাসে পূর্বপদ অর্থাৎ অব্যয় পদেরই অর্থের প্রাধান্য । যেমন : ভিকার স্তাব=হৃতিক



এখানে পূর্বপদ [ ছব্ ] অব্যয়, তাহার অর্থ [ অভাব ]-ই প্রধানরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। অভাব, সামীপ্য, ব্যাপ্তি [ বীজ্য, পুনঃপুনঃ ], অনতিক্রম, পৰ্বন্ত [ সীমা ], সাদৃশ্য, যোগ্যতা, পশ্চাৎ, বিপরীত, ক্রুদ্রতা, সাকল্য ইত্যাদির অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস হয়। যেমন : অভাব—ভিকার অভাব=হুঁচিক ; ভাতের অভাব=হা-ভাত ; ঘরের অভাব=হা-ঘর ; বন্দোবস্তের অভাব=বে-বন্দোবস্ত ; মিলের অভাব=অমিল বা গরমিল ; বিয়ের অভাব=নিবিব্র ; ব্যবহার অভাব=অব্যবহা ; কায়দার অভাব=বেকায়দা ; আমিষের অভাব=নিরামিষ ; মক্ষিকার অভাব=নির্মক্ষিক।

তেমনি—বেমানান, নিৰ্ব্বাট, আলুনি, বেকহর, বেজায় [জায় বা হিসাবের অভাব]। সামীপ্য—কূলের সমীপে=উপকূল, নগরীর সমীপে=উপনগরী, কণ্ঠের সমীপে=উপকণ্ঠ, অক্ষির সমীপে=সমক, সন্ধ্যার কাছাকাছি=সন্ধ্যা-নাগাদ, গোদাবরীর সমীপে=অহুগোদ। তেমনি—অহুগঙ্গ, অহুবাৎ। ব্যাপ্তি [অবধি, বীজ্য, পুনঃপুনঃ]—জন্ম হইতে=আজন্ম ; শৈশব হইতে=আশৈশব ; বাল্য হইতে=আবাল্য ; দিন দিন=প্রতিদিন ; রোজ রোজ=হররোজ ; বছর বছর=ফি-বছর ; সন সন=ফি-সন।

তেমনি=প্রতিকৃণ, অহুকৃণ, প্রতিগৃহ, প্রতিমণ, জনপিছু, মাথাপিছু, জনপ্রতি, দিনভর, মাঠকে-মাঠ, জনকে-জন, গ্রামকে-গ্রাম, দিনকে-দিন, প্রত্যেক, প্রত্যাহ, প্রত্যক্ষ, প্রতিবার, ফি-বছর, প্রতিজন। অনতিক্রম—শক্তিকে অতিক্রম না করিয়া=যথাশক্তি ; উচিতকে অতিক্রম না করিয়া=যথোচিত ; যথাবিধি, যথারীতি, যথেষ্ট ; অর্থকে অতিক্রম না করিয়া=যথার্থ, সাধ্যকে অতিক্রম না করিয়া=যথাসাধ্য ; ইষ্টকে অতিক্রম না করিয়া=যথেষ্ট ; তেমনি—যথাযোগ্য, যথাসত্য, যথাপূর্ব, সাধ্যমতো, রীতিমতো, ইচ্ছামতো, নিয়মমাকিক। পৰ্বন্ত—সমুদ্র পৰ্বন্ত=আসমুদ্র ; সমুদ্র হইতে হিমাচল পৰ্বন্ত=আসমুদ্রহিমাচল ; জীবন পৰ্বন্ত=আজীবন ; ব্রহ্ম পৰ্বন্ত=আব্রহ্ম ; [ব্রহ্ম হইতে শুষ্ক পৰ্বন্ত=আব্রহ্মস্থ], কণ্ঠ পৰ্বন্ত=আকণ্ঠ। তেমনি—আজানু, আমরণ, আপাদমস্তক, আহুল, আকর্ষ। সাদৃশ্য—বনের সদৃশ=উপবন ; নদীর সদৃশ=উপনদী ; কথার সদৃশ=উপকথা ; দেবতার সদৃশ=উপদেবতা ; আচার্যের সদৃশ=উপাচার্য। তেমনি—উপাধ্যক্ষ, প্রতিযুক্তি, প্রতিরনি, প্রতিকূপ, প্রতিলিপি, উপদ্বীপ, উপগ্রহ, উপসাগর, উপবিভাগ, উপমন্ত্রী, উপরাষ্ট্রপতি, বিমাতা। যোগ্যতা—রূপের যোগ্য=অহুরূপ ; কূলের যোগ্য=অহুকূল ; প্রেরণার যোগ্য=অহুপ্রেরণ। তেমনি—অহুভাব, অহুধান। পশ্চাৎ—গমনের পশ্চাৎ=অহুগমন ; সরণের পশ্চাৎ=অহুসরণ ; ধাবনের পশ্চাৎ=অহুধাবন। তেমনি—অহুশোচনা, অহুতাপ, অহুক্রম, অহুরণন, অহুরাধা, অহুদৈর্ঘ্য, উপেক্ষ, অহুপূর্ব, অহুনাদ, অহুহার। বিপরীত—দানের বিপরীত=প্রতিদান ; ফলের বিপরীত=প্রতিকূল ; কূলের বিপরীত=প্রতিকূল। তেমনি—প্রতিহিংসা, প্রতিপক্ষ, প্রতিশোধ। ক্রুদ্রতা—ক্রুদ্র গ্রহ=উপগ্রহ ; ক্রুদ্র অশ্ব=প্রত্যঙ্গ। সাকল্য—বাল, বৃদ্ধ ও বনিতা সকলে=আবালবৃদ্ধ-বনিতা ; পামর, জনসাধারণ সকলেই=আপামর-জনসাধারণ ; বিজ্ঞ চণ্ডাল সকলেই=আজ্ঞানচণ্ডাল। বিভক্তির অর্থে—উভয়=প্রত্যুয ; অক্ষির সমীপ=প্রত্যক্ষ ;

আত্মাকে অধি=অধ্যাত্ম; দৈবকে অধি=অধিদৈব; ভূতকে অধি=অধিভূত; দক্ষিণকে প্রগত=প্রদক্ষিণ; অক্ষির অগোচর=পরোক্ষ।

**বিশিষ্ট প্রয়োগ :** ‘দূর হবে দুর্ভিক্ষের দুখ।’ শুভ কার্য নির্বিশেষে সমাধা হইল। আশৈশব যিনি পরম সুখে প্রতিপালিত, তিনি এ দুঃখ কেমন করিয়া সহ্য করিবেন? ‘নৌকা ফি-সল ডুবিছে ভীষণ।’ সে তাহার কৃতকার্যের যথোচিত পারিশ্রমিক পাইয়াছিল। প্রতিকার না হইলে তিনি আমরণ অনশন করিলেন। ‘সাগর জলে সিনান করি সজল এলোচূলে বুসিয়াছিলে উপল-উপকূলে।’ ‘চলিলে সাথে, হা’সলে অনুকূল।’ ‘সহসা বায়ু বহিল প্রতিকূলে।’ ‘ভারতের যুক্তিকা আমার শৈশবের শিশুশয্যা, যৌবনের উপবন, আমার বাধক্যের বারণনী।’ ‘নমি আমি প্রতিজ্ঞে আদ্বিজচণ্ডাল।’ ‘ক্ষণটিরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে।’

**সমাসান্ত প্রত্যয় :** সমাস সংঘটিত হইবার পর সমস্তপদে সমাসেরই অঙ্গ হিসাবে যে প্রত্যয় অর্থের কোনরূপ রূপান্তর সাধন না করিয়া তদ্বিতের আয় বৃদ্ধ হয়, তাহাকে সমাসান্ত প্রত্যয় বলে। যেমন : পেরে রাজা=রাজপথ [ অ ]; এক-রোখা [ আ ]; হুগন্ধি [ ই ]; শত অঙ্গের সমাহার=শতার্কা [ ঙ্গ ]; ঘরের অভাব বাহার=হা-ঘরে [ এ ]; ঘরের দিকে মুখ বাহার=ঘরমুখো [ ও ]; বিপত্নীক [ ক ]।

### নিত্য সমাস

যে সমাসে সমস্তমান পদগুলির দ্বারা ব্যাসবাক্য হয় না, ব্যাসবাক্য গঠনের জন্য অস্ত্র পদের প্রয়োজন হয়, তাহাকে নিত্য সমাস বলে। যেমন : অস্ত্র ভাষা=ভাষান্তর; অস্ত্র মনু=মনুস্তর; অস্ত্র গতি=গত্যস্তর; অস্ত্র গ্রাম=গ্রামান্তর। তেমনি—দেশান্তর, উপায়াস্তর, দিগন্তর, মাসান্তর, ধর্মাস্তর, দিনান্তর, দৃশ্যাস্তর, লোকান্তর, জন্মান্তর, পাঠান্তর, প্রকারান্তর, বারান্তর, যুগান্তর, ভাবান্তর, মতান্তর, প্রসঙ্গান্তর, বিষয়ান্তর, জলমাত্র, দর্শনমাত্র, দেখামাত্র, নামমাত্র ইত্যাদি।

অনুক সমাসের মতো নিত্য সমাসও কোন স্বতন্ত্র সমাস নয়।

### ● সমাসজনিত অর্থ-পার্থক্য :

অনর্থ [সর্বনাশ]=নাই অর্থ=নঞ তৎপুরুষ; অনর্থক [বৃথা]=নাই অর্থ বাহাতে =নঞর্থক বহুব্রীহি। পূর্বাহ্ন=অহনের পূর্ব [দিনের প্রথম অংশ]=ষষ্ঠী তৎপুরুষ; পূর্বাহ্ন =পূর্ব অহ্ন [পূর্ণ দিন]=কর্মধারয়। পূর্বরাত্রি=রাত্রির পূর্ব [রাত্রির প্রথম অংশ]=ষষ্ঠী তৎপুরুষ; পূর্বরাত্রি=পূর্বা রাত্রি [গতরাত্রি]=কর্মধারয়। জামাতাপুত্র=জামাতা ও পুত্র=বহু; জামাঃপুত্র=জামাতার পুত্র=ষষ্ঠী তৎপুরুষ। মহাদাশয়=মহতের আশয় [আশায়]=ষষ্ঠী তৎপুরুষ; মহাশয়=মহৎ যে আশয়=কর্মধারয়। মহৎধন=মহতের ধন=ষষ্ঠী তৎপুরুষ; মহাধন=মহৎ যে ধন=কর্মধারয়। মহৎপ্রাণ=মহতের প্রাণ=ষষ্ঠী তৎপুরুষ; মহাপ্রাণ=মহান প্রাণ বাহার=বহুব্রীহি। হুপুরুষ=হু যে পুরুষ [ত্রীহীন]=কর্মধারয়; কাপুরুষ=হু যে পুরুষ [ভীক]=কর্মধারয়। হুগন্ধ=হু গন্ধ বাহার [বিজ্ঞ গন্ধ নয়—যেমন, ‘হুগন্ধ বায়ু’]=বহুব্রীহি; হুগন্ধি=হু গন্ধ বাহার।

[ নিঃস্ব গন্ধ—বেমন, 'স্বগন্ধি পুষ্প' ]=বহুব্রীহি। সপত্নী=সমান পতি বাহাদের  
=বহুব্রীহি; স্বপত্নী=স্ব-র [ নিঃস্ব ] পত্নী=বহুব্রীহি। প্রিয়সখা=প্রিয়  
সখা বাহার=বহুব্রীহি; প্রিয়সখ=প্রিয় যে সখা=কর্মধারয়। ছিন্নশাখা  
=ছিন্ন শাখা বাহার [ বৃক্ষ ]=বহুব্রীহি; ছিন্নশাখ=ছিন্ন যে শাখা=কর্মধারয়।  
হীনবল=হীন বল বাহার=বহুব্রীহি; বলহীন=বলের দ্বারা হীন=তৃতীয়া  
তৎপুরুষ। শাক্ষর=অক্ষরের সহিত বর্তমান [ অক্ষর-জ্ঞান আছে বাহার ]=  
বহুব্রীহি; শাক্ষর=স্ব-র [ নিঃস্ব ] অক্ষর [ সহি ]=ষষ্ঠী তৎপুরুষ। সশক্ক  
=শক্কর সহিত বর্তমান=বহুব্রীহি; শশাক্ক=শশ অক্কে বাহার [ চন্দ্র ]=বহুব্রীহি।  
মাতৃপিতৃহীন=মাতার পিতার দ্বারা হীন=তৃতীয়া তৎপুরুষ; পিতৃমাতৃহীন=পিতার  
মাতার দ্বারা হীন=তৃতীয়া তৎপুরুষ।

## ৷ অনুসরণী ৷

\*১. সমাস প্রধানতঃ কয় প্রকার ? তাহাদের নাম উল্লেখ করিয়া প্রত্যেক সমাসের একটি করিয়া  
উদাহরণ দাও। উ. মা. '৩১, '৩৫; মা. '৫৭, '৬১।

\*২. সমাস কাহাকে বলে ? সন্ধি ও সমাসের পার্থক্য দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

উ. মা. '৬০, '৬২, '৬৬; মা. '৬৩।

\*৩. নিম্নলিখিত সমাসগুলির মধ্যে পার্থক্য দেখাও :

ক. কর্মধারয় ও বহুব্রীহি, উ. মা. '৬৩; খ. সর্বনামধিকরণ ও বাধিকরণ বহুব্রীহি, উ. মা. '৬৫; গ.  
মধ্যপদলোপী কর্মধারয় ও মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি, উ. মা. '৬১; ঘ. নঞতৎপুরুষ ও নঞবহুব্রীহি; ঙ.  
অলুক তৎপুরুষ ও অলুক বহুব্রীহি; চ. বহুব্রীহি সমাস ও কর্মধারয় সমাস, উ. মা. '৬৫; মা. '৬৫;  
ছ. রূপক সমাস ও উপামিত সমাস, উ. মা. '৬৩, '৬২, '৬৬; জ. কর্মধারয় ও বিশ্রু সমাস, উ. মা. '৬৬।

\*৪. দৃষ্টান্তসহ নিম্নলিখিত সমাসগুলির সংজ্ঞা লিখ :

অলুক তৎপুরুষ, রূপক কর্মধারয়, খ্যাতি বালা বন্দ উপপদ তৎপুরুষ, বাতিহার বহুব্রীহি, নিত্য সমাস,  
মা. '৩০; কর্মধারয় সমাস, উ. মা. '৭০; উপমান কর্মধারয়, মা. '৬৩; উপমিত কর্মধারয়, রূপক কর্মধারয়, মা.  
'৫৩; '৬১; উ. মা. [ কম্পাট. ] '৬২; ক. প্রা. '৬১; উপমান পূর্ণপদ বহুব্রীহি, অলুক সমাস, উ. মা. '৬৪;  
মা. '৬৪, '৫৮; ক. প্রা. '৬২; অলুক বন্দ, অলুক তৎপুরুষ অলুক বহুব্রীহি, নিত্য সমাস, উ. মা. '৬৩;  
বাতিহার বহুব্রীহি, উ. মা. '৬১, '৬৩; ক. প্রা. '৬১; অব্যয়্যোভাব সমাস, উ. মা. '৬৮, '৬৮; মা. '৬২; ক. প্রা.  
'৬২; নঞর্থক বহুব্রীহি, উ. মা. '৬৩, '৬৪; উপপদ তৎপুরুষ, উ. মা. '৬১, '৬৩; অব্যয়্যোভাব, বীপার্ধে  
অব্যয়্যোভাব উ. মা. '৬৩, '৬৮; বিশ্রু, মা. '৫০; মধ্যপদলোপী কর্মধারয়, ক. প্রা. '৬১; সমাসান্ত প্রত্যয়,  
উ. মা. '৬৩; ক. প্রা. '৬২, '৬৩; বিশ্রু বাক্য, মা. '৬৫; বহুব্রীহি সমাস, উ. মা. '৬২।

\*৫. কর্মধারয় সমাস কাহাকে বলে ? উপমান কর্মধারয় ও রূপক কর্মধারয়ের প্রভেদ উদাহরণ সাহায্যে  
বুঝাইয়া দাও। মা. '৫৬; ক. প্রা. '৬২।

৬. কর্মধারয় ও বিশ্রু সমাসকে তৎপুরুষ সমাসের অন্তর্ভুক্ত করা যায় কিনা ব্যক্তি সহকারে বিচার কর।

৭. দৃষ্টান্তসহ তৎপুরুষ সমাসের বিভিন্ন রূপের পরিচয় দাও। মা. '৫৬; ক. প্রা. '৬৬।

\*৮. নিম্নলিখিত পদগুলির বাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর : ভূষারথবল, বখাশক্তি, পুরুষসিংহ, স্বাধীনতা-  
দিবস, চিরস্থ, নুনানিধি, লঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠ, হাস্যহাসি, রাজগণ; উ. মা. '৬০। পঞ্চরাত্র, পুরুষসিংহ, নিঃহাসন,  
লোক-স্বখানো, ধনিগণ, ব্রাহ্মপুত্র, স্বপশক্তি, নিখুঁত : উ. মা. [ কম্পাট. ] '৬০। গৃহগত, গাছপাকা, বধূবর,  
গৌরব, ছাগহৃৎ, সন্নিক, কোলাকুলি, খেচর : উ. মা. [ কম্পাট. ] '৬১। দেশান্তর, কাঁচামিঠে, শরণাপন্ন,  
সরসিঙ্গ, শোকানল, বিয়ে-পাগলা, বিপত্নীক : উ. মা. '৬২। পাষণ্ড্য, প্রত্যক, ঘনশ্রাম, সুগোঁবত, বিধাদিত্র

বেচাকেনা, অন্তর্বাসী, অপূত্রক : উ. মা. [কম্পার্ট.] '৬২। দাকাটা, তেলেভাজা, রান্নাবর, গোলাভরা, হুবা, হস্তাঙ্গা, বতিজ্বর, নবীমাহুক, যুগ্মোখিত : উ. মা. '৬৩। প্রোবিত্তজর্জুকা, বিপত্নীক, বীণাশাশি, বধাশক্তি, তেলেভাজা : উ. মা. '৬৭। ছেলেধরা, বধাবিধি, লাঠিখেলা, হাতাহাতি, শোকাবল, হুবা : মা. '৬৯। রান্নাবর, মুখপোড়া, অষ্টাধশ, আধিপাশি, অহোরাত্রি, পুরুষসিংহ, নিখোজ, আসমুদ্র, তেরাধা : মা. '৭০। ভিকার, অগ্নিভর, ডাক্তারসাহেব, লাঠিখেলা, লাঠালাঠি, বরমুখা, গোঁজামিল, নবনীকোমল : মা. '৭১। বধাশক্তি, কৃতকার্য, সপ্তাহ, গ্রামবাসী, বেহারী, ঘি-ভাত, লোকলজ্জা : মা. [কম্পার্ট.] '৬২। কদাচার, বেরাধব, গরমিল, আবাল, শতানী, হুবা, আভক্ত, গারে-হলুদ, গোঁজামিল, পঞ্চবটা : ক. প্রা. '৬১। কন্তনহিতার্থী, বহুশাস্ত্রজ্ঞ, আতিথাপরায়ণ, সমাজহিতৈষী, শরণাগতাত্রয় : ক. প্রা. '৬২। শ্রীত্রষ্ট, শ্রীযুক্ত, শ্রীধর, সপ্তাহ, জলধ-গম্ভীর, হিংসা-বিব, নরসিংহ : ক. প্রা. '৬৫। ভিকালক একশরা, মহোৎসব, হুংগম, আত্মসমাহিত, অভিলষিত-বর্শন, স্মরণস্তম্ভ : ক. প্রা. '৬৭। পটোলভাজা, ঢেঁকিহাটা, বিয়ে-পাগলা, তিনকড়ি, ঘর-পালানো, হাতাহাতি, লেজকোলা, তেমোহনা, অন্নমধুর, পাছপাকা, ঘনশ্রাম, না-মজুর, শশব্যস্ত, বিধবা, হাতেখড়ি, জীবমৃত, সেতার, গ্রামান্তর, রাতকানা, মাথাপিছু, লক্ষ্যছাড়া, সমস্ত, ছেলেভুলানো, বালিকা-বিভালয়, বরপাতা, কাণাকড়ি, স্বাধীনতা-দিবস, সপত্নী, সত্নীক, অর্ধনীতি, তেপান্তর, রূপবানী, উড়োভাহাত, চুলাচুলি, জলবোগ, শতবার্ষিকী, সতীর্থ, তেপায়া, ডাকাবুকো, মাথাবাধা, চালাক-চতুর, লাঠালাঠি, একঘরে, হা-কুমড়া, বক-ধারিক, রাজহাঁস, সর্গত, বাগদস্তা, আজমুলস্বিতবাহ, আগাগোড়া, মনোরথ, আনাড়ী, কালজকালো, কি-বছর ও মনমারি। অষ্টাধশ, আধিপাশি, অহোরাত্রি, পুরুষসিংহ, নিখোজ, আসমুদ্র, তেরাধা : উ. মা. '৬৯। লাভালাভ, আগাগোড়া, রথারুঢ়, বর্ষচোরা, ঘি-ভাত, ঢেঁকিহাটা, পঞ্চবৃত্ত, উকিল, বাতিষ্টার, মাথাপিছু রান্নাবর, বীরপুত্রা, হুংগম : উ. মা. '৭০। বরজামাই অগ্নিভর, সপ্তাহ, ভূতপূর্ব, তেলেভলে, আটচালা, মাথাপিছু, নরসিংহ, মিশকালো, নামজুর : উ. মা. [কম্পার্ট.] '৭০।

৯. সমস্তপক্ষে পরিণত করিয়া সমাসের নাম লিখ : মহান রাজা মুখ চন্দ্রের ছাত্র, পঞ্চবর্ষের সমাচার, কম করে যে, বোঝাই নৌকা বাহার দ্বারা, নাই ক্রিয়া বাহার, কহলের মতো অক্ষি বাহার : উ. মা. [কম্পার্ট.] '৬৭। জারা ও পতি, পঞ্চদশীর সমাহার, সমান ধর্ম যার, হৃদয় গন্ধ যার, কুংসিত আচার, শোভন হৃদয় যার, পুরুষ সিংহের ছাত্র, অমৃতের ছাত্র মধুর, ভলে চরে যে, বোঝাই নৌকা বাহার দ্বারা, বালিকাদের বিভালয়, রুতের দ্বারা পক : মা. '৬৯। পুত্রের সহিত বর্তমান, বিশাল উরঃ বাহার, পুণ্ডরীকের স্ত্রীর অক্ষি বাহার, জনদের মতো গম্ভীর, জীবনরূপ প্রবাহ, কালীর দাস, হস্তচালিত শিল্প, অন্তে বাস করে যে, প্রোথিত ভাষা বাহার, অন্তে অপ্ [জল] বাহার, দুই দিকে অপ্ বাহার, রাহার। পথের ] নিমিত্ত খরচ, মহতী যে অষ্টবী, চরিত অর্থ বাহার, শালের মতো প্রোথ, নীর ঘের যে।

১০. সমাসের নাম করিয়া সমাসবদ্ধ কর : বিধান+সমাজ : ছাগী+চক্ষ : অস্ত+জন্ম : পূর্ব+অহন : খর+স্রোত : শত+অক্ষ : কু [কুংসিত] অন্ন : ছিন্ন+শাখা : প্রা. '৬৯। হৃদয়+শ্রী : কুংসিত+পুরুষ : স্বধর+বিধ : মনঃ+রথ, হংস+রাজ : পূর্ব+রাত্রি : অপরা+অহন।

১১. অর্থ-পার্থক্য দেখাও : সগত, সর্গত : সপত্নী, সপত্নী : অনর্থ, অনর্থক : পূর্বাধ, পূর্বত্ব : মাতা-পিতৃহীন, মাতৃপিতৃহীন, পিতৃমাতৃহীন : হৃগন্ধ, হৃগন্ধি : শশক, শশাক : মহাশয়, মহাশয় : পূর্বরাত্রি, পূর্বরাত্রি।

১২. নিম্নলিখিত শব্দগুলির সমাসবদ্ধ রূপ ও সমাসের নাম লিখ :

জারা ও পতি, পক নদীর সমাহার, সমান ধর্ম যার, হৃদয় গন্ধ যার, কুংসিত আচার, শোভন হৃদয় যার, পুরুষ সিংহের ছাত্র, অমৃতের ছাত্র মধুর, ভলে চরে যে, বোঝাই নৌকা বাহার দ্বারা, বালিকাদের বিভালয়, রুতের দ্বারা পক, ভিজে এমন ছোলা, শ্রীতির নিমিত্ত ভোজ, মসীর ছাত্র বুক, নাই তার বাহাতে, ঘিন ব্যাপিরা, গলায় গলায় যে মিল, বনের সপুষ, লব ও কুশ, ফুলের মত বাবু, ধামা ধরে যে, তত্ত্ব ব্রহ্ম করে যে, পাস করিরাছে যে, কুনের বিপরীত, অরিকে ব্রহ্ম করে যে, কাছ হইতে ছাড়া, এলো বেশ যে মারীর, অস্ত্র ধাপ, ক্ষণে জন্ম বাহার, নাটের নিমিত্ত মন্দির, দুয়ের মতো সাবা, বোণাতাকে অতিক্রম না করিয়া, মূর্তির সপুষ, অক্ষির সমীপে, একদিকে চোখ বাহার।

১০. সংজ্ঞাসহ উদাহরণ দাও : বহুব্রীহি, বচ, ক্ষমারীভাব, কর্মধারয়, বিগু : [উ. মা. কম্পার্ট.] '৭০

১১. নিম্নলিখিত সমস্ত পদগুলির পাঁচটিকে স্মরিত বাক্যে প্রয়োগ কর : শিরোধাৰ, কৃতবিদ্য, নদীশীতল, দ্রুতপোয়া, সর্বশাস্ত, চরিতার্থ, পুণ্যলোক, শশব্যস্ত, দূরদর্শী ; ক. প্রা '৬১।

১২. নিম্নলিখিত বাক্যগুলির মধ্যে স্থলকায় শব্দগুলির ব্যাসবাক্যসহ সম্যাস নির্ণয় কর :

তোমার দেখছি জোরবজাত। এমন লোক-দেখানো কাজ না করাই ভালো। কলেছাঁটা চাল খেয়েই তো অস্থখ করেছে। বৈশতিক দেখে লোকটা পালিয়ে গেল। আজ সেই স্বতীমন্দিরের দ্বার খোল হবে। আর রে পাখি লেজকোনা। গায়ে-পড়া মানুষ আমার ভালো লাগে না : মা. '৫২। আমি নিত্য কহিতেছি বথাসত্য বাণী। দুজনায় মহাভক্ত শক্তি কার বেশী। ঠেলাঠেলি 'জুড় করে শিশুতরুধলে। দর্শকজন মুদল নয়ন সভা হল নিতরু। ছোট গ্রামখানি লেহিয়া লইল এলয়লৌলুপ রসনা। পেরুয়াবসনা সন্ধ্যা নামিল পশ্চিম-নাঠ পারে। সহন! ভূতলে প'ড় পদ্মটি রাখিল ধরি, প্রভুর চরণপদ্ম 'পরে ; মা. '৬৫।

বাংলা ভাষার শব্দ-সম্ভার অত্যন্ত সমৃদ্ধ। প্রাচীন ভারতীয় আৰ্যভাষা হইতে বিবর্তনের পথ বাহিয়া বাংলা ভাষার উদ্ভব। ফলে, অতি স্বাভাবিক কারণেই প্রাচীন ভারতীয় আৰ্যভাষার বহু শব্দ বিবর্তিত হইয়া বাংলায় নতুন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। আবার, বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষা হইতেও বহু শব্দ ঋণ-গ্রহণ করিয়াছে। তাহা ছাড়া, বাংলা ভাষায় বিদেশী শব্দের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। নানা উপলক্ষে বাংলাদেশে বহু বিদেশী জাতির সমাগম ঘটিয়াছে; তাহাদের ভাষারও বহু শব্দ বাংলা ভাষায় রাখিয়া গিয়াছে।

বাংলা শব্দ-সম্ভারকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় : মৌলিক শব্দ ও আগন্তুক শব্দ। প্রাচীন ভারতীয় আৰ্যভাষা বা সংস্কৃত হইতে পরিবর্তিত বা অপরিবর্তিতরূপে গৃহীত শব্দগুলিকে বলা হয় মৌলিক শব্দ। তৎসম, তদ্ভব ও অর্ধ-তৎসম শব্দগুলি ইহার অন্তর্ভুক্ত। আর, বিভিন্ন কালে বিভিন্ন ভাষার সংস্পর্শে আসিবার ফলে তাহাদের বহু শব্দ বাংলা ভাষায় গৃহীত হইয়াছে; তাহাদের বলা হয় আগন্তুক শব্দ। দেশী ও বিদেশী শব্দগুলি ইহার অন্তর্ভুক্ত। মজার ব্যাপার, দেশী শব্দগুলিও আগন্তুক শব্দ।

বাংলা ভাষার শব্দ-সম্ভারকে ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। অর্থাৎ, বাংলা শব্দ-ভাণ্ডারের শব্দ ছয় প্রকার : তৎসম, তদ্ভব, অর্ধ-তৎসম, দেশী, বিদেশী ও মিশ্র শব্দ।

১. তৎসম শব্দ : [ তৎ=সংস্কৃত, সম=সমান; অর্থাৎ সংস্কৃতের সমান ] যে সকল শব্দ সংস্কৃত ভাষা হইতে অপরিবর্তিত আকারে বাংলা ভাষায় গৃহীত হইয়াছে, তাহাদের তৎসম শব্দ বলা হয়। যেমন : বৃক্ষ, লতা, নদী, ধরিত্রী, সমুদ্র, স্নান, কাষ্ঠ, হস্ত, চক্ষু, কর্ণ, মস্তক, অন্ন, বস্ত্র, নক্ষত্র, গিরি, কুম্ভ, ব্যাঘ্র, অশ্ব, হস্তী, সূর্য, চন্দ্র, সন্ধ্যা, রাত্রি, অরণ্য, গৃহ, বায়ু, আকাশ ইত্যাদি। এই সমস্ত শব্দ সংস্কৃত ভাষা হইতে বাংলা ভাষায় ঋণ-স্বরূপ গৃহীত। বাংলা ভাষার মোট শব্দ-সমষ্টির চুয়াল্লিশ শতাংশ অর্থাৎ মোট প্রায় এক লক্ষ পঁচিশ হাজার শব্দের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ হাজার শব্দই তৎসম শব্দ। কাজেই, সংস্কৃত হইতে গৃহীত ঋণের পরিমাণ সহজেই অনুমেয়।

২. তদ্ভব শব্দ : [ তৎ=সংস্কৃত, ভব=জাত; অর্থাৎ সংস্কৃত হইতে জাত ] যে সকল সংস্কৃত শব্দ যুগ-যুগান্তরের বিবর্তনের পথে প্রাকৃত-অপভ্রংশ ইত্যাদি দ্বয়ের মধ্য দিয়া পরিবর্তিত হইয়া বাংলা ভাষার রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহাদের বলা হয় তদ্ভব শব্দ। যেমন :

সংস্কৃত	>	প্রাকৃত	>	বাংলা
হস্ত		হথ		হাত
ভক্ত		ভত্ত		ভাত
কাঠ		কট্ঠ		কাঠ
কৃষ্ণ		কহু [ কাহু ]		কান্ [ <আদরার্থে উ = কাহু ; + আদরার্থে আই = কানাই ]

তেমনি : পদ>পা, ব্যাঘ্র>বাঘ, কণ্টক>কাঁটা, পক্ষী>পাখি, চক্র>চাঁদ, সঙ্ঘা>সঙ্ঘা, সঁঝ, কর্মকার>কামার, দধি>দৈ, স্বর্ণ>সোনা, মন্তক>মাথা, চকু>চোখ, কর্ণ>কান, বংশ>বাঁশ, হংস>হাঁস, সর্প>সাপ, নৃত্য>নচ, চ>নাচ, গ্রাম>গাঁ, অজ্ঞ>আজ্ঞ, পৃষ্ঠ>পিঠ, মৃত্তিকা>মাটি, মক্ষিকা>মাছি, গৃহ>ঘর, পিতৃঘসা>পিসি, কার্ধ>কাজ, গাত্র>গা, স্বদ্ধ>কাঁধ, ব্রাহ্মণ>বামুন, সামন্তপাল>সাঁওতাল, ভূমি>ভূঁই, লোহ>লোহা>নোয়া, তাম্র>তামা, কর্পট>কাপড়, ভাণ্ড>ভাঁড়, অর্ধ>আধ, ইক্ষু>আখ, মৎস্ত>মাছ ইত্যাদি। প্রাকৃত হইতে জাত বলিয়া ইহাদের আর এক নাম প্রাকৃতজ শব্দ। এই শব্দগুলিকে সংস্কৃত ভাষা হইতে বাংলা ভাষা উত্তরাধিকার-স্বত্রে লাভ করিয়াছে। এই শব্দগুলির বর্তমান রূপের মধ্যে ভাষার ক্রমবিবর্তনের হাজার হাজার বছরের ইতিহাস বিধৃত রহিয়াছে।

আবার, প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায়ও অন্যান্য ভাষার বহু শব্দ গ্রহীত হইয়াছিল। সেই শব্দগুলিও কালক্রমে রূপান্তরিত হইয়া বাংলা ভাষায় স্থান লাভ করিয়াছে। সেই শব্দগুলিকে বলা হয় রূপান্তরিত শব্দ। যেমন : তামিল শব্দ—মুটে>মুটক [ সং ] মুড়ম [ প্রা ]>মোট [ বাংলা ] = বোঝা। পিলৈ—পিলিক [ সং ]>পিলু [ প্রা ]>পিলে [ বাংলা ]। গ্রীক শব্দ—ড্রাপ্মে>ড্রমা [ সং ]>দম্মে [ প্রা ]>দাম [ বাংলা ]। গ্রিক্স>গ্রিক্স [ সং ]>গ্রিক্স [ বাংলা ]। পারসিক শব্দ—মোচিক>মোচিম [ প্রা ]>মুচি [ বাংলা ]। তুর্কী শব্দ—তুর্ক>তুরক [ সং ]>তুরক [ বাংলা ]। তিগীর>ঠিকুর [ সং ]>ঠাকুর [ বাংলা ]। পছলবীশব্দ—পোহ [ লিখিবার চামড়া ]>পুস্তিকা [ সং ]>পুঁথি [ বাংলা ]।

৩. অর্ধ-তৎসম বা ভগ্ন-তৎসম শব্দ : যে-সকল তৎসম শব্দ বাঙ্গালীর মুখে উচ্চারণের বিকৃতির ফলে রূপান্তর লাভ করিয়াছে, তাহাদের বলা হয় অর্ধ-তৎসম বা ভগ্ন-তৎসম শব্দ। যেমন :

তৎসম	>	অর্ধ-তৎসম	তৎসম	>	অর্ধ-তৎসম
কৃষ্ণ		কেটে	পুত্র		পুতুর
বিষ্ণু		বিষ্টু	শ্রাদ্ধ		ছেরাদ

তেমনি : শ্রদ্ধা>ছেদা, শ্রীদাম>ছিদাম, শ্রী>ছিরি, নিমগ্ন>নেমগ্ন, প্রণাম>পেরাম, পুরোহিত>পুহুত, কায়স্থ>কায়েত, কুংসিত>কুচ্ছিত, গৃহস্থ>গেরস্থ, গৃহিনী>গিরি, নিশ্চিন্ত>নিশ্চিলি, যুগা>ঘোলা, বৈদ্য>বদি, কবিরাজ>

কব্জ, পথ্য>পথি, স্বত্তি>সোয়াত্তি, বস্ত>বস্ত্র, মিত্র>মিত্তির, পিত্ত>পিত্তি, হা-প্রত্যয়া>হাপিত্যোশ, স্বাদ>সোয়াদ, অনাস্টি>অনাচ্ছিষ্টি, বৃহস্পতি>ব্ৰহ্মস্পতি, বিহ্যৎ, বিস্ত্রী>বিচ্ছিন্নি, মিথ্যা>মিছা, গ্রাম>গেরাম, রাত্রি>রাত্তির, রৌত্র>রোদ্দুর, জ্যোৎস্না>জ্যোছনা, বৃষ্টি>বিষ্টি, ময়>মস্তুর, তন্ত্র>তন্তুর, মহার্ঘ>মাগ্গি, মহোৎসব>মোচ্ছব, আধিক্যাতা [ ভুল সংস্কৃত ]>আদিখ্যোতা ইত্যাদি। অৰ্ধ-তৎসম শব্দকে সেমি-তৎসম [ Semi-তৎসম ] শব্দও বলা হয়।

লক্ষণীয় : তন্তুব ও অৰ্ধ-তৎসম শব্দ উভয়েরই উর্ৎস সংস্কৃত ; কিন্তু তন্তুব শব্দের রূপান্তর বহু শতাব্দীর ক্রম-বিবর্তনের ফল ; আর অৰ্ধ-তৎসম শব্দের পরিবর্তন আকস্মিক উচ্চারণ-বিকৃতি-জনিত। তন্তুব : কৃষ্ণ>কন্থ>কাহ>কান্ [ কাহ বা কানাই ]। অৰ্ধ-তৎসম : কৃষ্ণ>কেষ্ট।

†

৪. দেশী শব্দ : বাংলা দেশে আৰ্য-জাতির বংশধর [এবং আৰ্যভাষার] আগমনের পূর্বে যে জাতি বাস করিত, তাহাদের কিছু শব্দ বাংলা ভাষায় স্থান গ্রহণ করিয়াছে। সেই শব্দগুলিকে দেশী শব্দ বলে। যেমন : চাউল, মুড়ি, ঢেঁকি, কাঁকা, খেয়া, ধুনি, ঝিঙ্গা, কাঁটা, খোপা, টোপর, খাঁচা, ছাল, চাল, পেট, ডাহা, ধামা, ঢোল, মাঠ, ঢেউ, গড়, কুলা, কলা, লাঠি, তেঁতুল, ডাগর, বাহুড, গাড়ি, ঘোড়া, খাদু, গাদু, ঘোমটা, ঝিটি, কামড়, ডাঁসা, সড়কি, আড্ডা, ডাব, ঝাড়, বোঝা, দোয়েল, ফিঙে, কাতলা, চিংড়ি, বক, কুকুর, চাচ, ঢোঁড়া, ডিঙি, ঘুড়ি ইত্যাদি।

৫. বিদেশী শব্দ : বাংলা দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রীয় যোগাযোগের ফলে বহু আরবী, ফারসী, ইংরেজি, ফরাসী, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, তুর্কী, চীনা, জাপানী, বর্মী ও রুশ শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে। তাহাদিগকে বিদেশী শব্দ বলা হয়। যেমন : আরবী—আইন, আদালত, অ্যাক্সেল, কবর, সমাজ, কোরান, কৈফিয়ত, কেছা, ইমারত, তালেবর, মজ্জুর, মজুর, তলব, খবর, খাজনা, জিলা, মেরামত, তারিখ, দলিল, দালাল, তাবিজ, তামাদি, কাগজ, কলম, দরখাস্ত, কেতাব, ফসল, হিসাব, বিদায়, দফা, ব্যায়, জাহাজ, কেছা, খেতাব, তামাসা, গোলাম, হাকিম, হুকুম ইত্যাদি। ফারসী—আমির, উজীর, মালিক, সিপাই, ইয়ার, আন্দাজ, দোকান, নালিশ, পেশা, ফেরার, মোকদ্দমা, মোক্তার, বীমা, দরবেশ, খোদা, দরদ, বরফ, আবাদ, বাগান, খরচ, জমিদারী, ফরিয়াদ, তোতা, কিনারা, দরিয়া, বেহারী, চরখা, চশমা, খাতা, গোলাপ, বাদাম, পর্দা, মশলা, শিশি, সিন্দুক, ক্রমাল, সানাই, শরিক, দালান, কারখানা, কারিগর, দোয়াত, ময়দা, ময়দান, রাস্তা, খুশি ইত্যাদি। ইংরেজি—চেয়ার, টেবিল, আপিস, উইল, গ্লাস, অফিস, জেল, মাইল, সিনেমা, স্টেশন, কলেজ, স্কুল, বস, বেঞ্চ, পকেট, নিব, রেল, মোটর, বাক্স, ষ্টিয়ার, হাসপাতাল, পুলিশ, কোর্ট, কলেরা, লাট, ট্রাম, বাস, থিয়েটার, মাস্টার, রবার, লাইব্রেরী, লিফট, ফিফটি, ডাক্তার ইত্যাদি। ফারসী—কাফে, কার্তুজ, কপ্পন, আশ, বিস্কুট, ওলন্দাজ, দিনেমার, ফিরিজি, বৃকোয়া, রেস্তোরাঁ ইত্যাদি। পর্তুগীজ—আলমারি, আলপিন, কেরানী, পারদ,



ক্রুশ, জানালা, সাবান, তোয়ালে, ফিতা, গামলা, বালতি, পেরেক, বারান্দা, নিলাম, পাউন্ডটি, গীর্জ, বোতল, চাবি, কামরা, সাগু, পেয়ারা, নোনা, আতা, পোঁপে, কামিজ, আলকাतरা, ফিতা, বোতাম, আনারস, মিন্টী ইত্যাদি। **ওলন্দাজ**—ইসাপন, কইতন, হরতন, তুরুপ, ইকুপ ইত্যাদি। **তুর্কী**—আলখান্না, উজবুক, কাচি, চাক, দারোগা, লাশ, বাকল, বেগম, বিবি, বাহাদুর, কুলি, বোচকা, উর্হু ইত্যাদি। **চীনা**—কাগজ, চা, তুফান, চিনে, লিচু, লুচি ইত্যাদি। **জাপানী**—রিকশা, হারিকিরি ইত্যাদি। **বর্মী**—লুজি, ঘুঘনি ইত্যাদি। **রুশ**—কলশেভিক, সোভিয়েত, স্পুটনিক ইত্যাদি। **পেরু**—কুইনিন ইত্যাদি। **ইতালীয়**—ম্যাজেটা ইত্যাদি। **অষ্ট্রেলীয়**—কান্ডাক ইত্যাদি। **তিব্বতি**—লামা ইত্যাদি। তাহা ছাড়া আছে **হিন্দী**—বানি, কচুরী, হুঁও ইত্যাদি। **গুজরাটী**—তঁকলি, হরতাল ইত্যাদি। **মারাঠী**—চৌধ, বর্গী ইত্যাদি। **পাঞ্জাবী**—চাহিদা, শিখ ইত্যাদি। **সাঁওতালী**—কম্বল, ময়ুর ইত্যাদি।

**খাঁটি বাংলা শব্দ** : তত্ত্ব, দেশী ও যে সকল বিদেশী শব্দ বহুপূর্বে বাংলা ভাষায় গৃহীত হইয়া নিবর্তনের পথে বাংলা রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহাদের খাঁটি বাংলা শব্দ বলা হয়। তত্ত্ব ও দেশী শব্দের দৃষ্টান্ত পূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে। যে সব বিদেশী শব্দ নিবর্তিত হইয়া খাঁটি বাংলা শব্দরূপে গৃহীত হইয়াছে, তাহার উদাহরণ : দান (< প্রাচীন গ্রন্থ শব্দ—‘দান’), মুচ (< প্রাচীন পারসিক শব্দ—‘মোটিক’) ইত্যাদি।

**৬. মিশ্র শব্দ** : তৎসম, তত্ত্ব, দেশী ও বিদেশী শব্দের মধ্যে যে কোন এক শ্রেণীর শব্দেব সহিত অপর শ্রেণীর শব্দ বা প্রত্যয়াদির যোগে যে সকল নূতন শব্দ গঠিত হইয়াছে, তাহাদের মিশ্র শব্দ বা সংকর শব্দ [ Hybrid words ] বলা হয়। যেমন : তত্ত্ব+বিদেশী—হাট-বাড়ার, জলাজমি, কাজ-কারবার, সীমা-সরহদ, জানাই-বান, রাজা-উড়ার, ধন-দৌলত, শাক-সব্জি, খ্রীষ্টান্দ। **বিদেশী+তত্ত্ব**—মাস্টার-মশাই, ডাক্তার-বহি, পাউন্ডটি, অকিস-পাড়া, রেলগাড়ি, হাফ-ছুটি, আইন-সমত, হেড-পণ্ডিত। **বিদেশী+বিদেশী**—উকিল-প্যারিস্টার, কোর্ট-কাছারি, হেড-মোনারী, পুলিশ-মাস্তেব, হাক-আগড়াই। **বিদেশী প্রত্যয়যুক্ত মিশ্র শব্দ**—পণ্ডিতগিরি, চন্দনদার, বাড়িওয়াল, নন্দদান। **বিদেশী উপসর্গযুক্ত মিশ্র শব্দ**—বেতার, বে-হাত, গরমিল।

বাংলা শব্দ-ভাণ্ডারে উল্লিখিত ছয় প্রকারের শব্দ ছাড়া আরও কয়েক প্রকার শব্দের সাক্ষাৎ মেলে। যেমন :

**অপশব্দ** : বুল ভাষার কোন শব্দ বিকৃত বা পরিবর্তিতরূপে ব্যবহৃত হইলে, তাহাকে অপশব্দ বলা হয়। যেমন : ভাগ্য [ সংস্কৃত ] > ভাইগ [ পূর্ববঙ্গীয় বাঙ্গালী উপভাষা ]।

**ইতর-শব্দ** : যে সকল শব্দ মাত্রিত লোকদের কথায় বা ভাষায় ব্যবহৃত হয় না, তাহাদের বলা হয় ইতর-শব্দ [ Slang ]। যেমন : গুল মারা, পেটো, গের্জানো ইত্যাদি। এই সব শব্দের উদ্ভব কোন ব্যক্তি বা দলবিশেষের উচ্চারণ হইতে। ইহারা কালক্রমে জাতিতে উঠিতে পারে বা লুপ্ত হইয়া যাইতে পারে।

**খণ্ডিত শব্দ :** কোন কোন শব্দের অংশবিশেষ বাদ দিয়া উচ্চারিত হয় ; তাহাদের খণ্ডিত শব্দ বলা হয়। যেমন : ফোন [ < টেলিফোন ], বাইক [ < বাইসাইকেল ], মাটক [ < রাইকোফোন ], সুপার [ সুপারিটেণ্ডেণ্ট ]।

## ৷ অনুসরণী ৷

১. তদ্বৎ, তৎসম ও অর্ধ-তৎসম শব্দ কাহাকে বলে—উদাহরণসহ পরিশুট কর। উ. মা. '৬০।
২. দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দাও : তদ্বৎ, মা. '৫৭; '৫৪, '৬২ ; ক. প্রা. '৬২ ; প্রাকৃতজ শব্দ, উ. মা. '৬১ ; তৎসম, মা. '৫৩ '৫৫ ; অর্ধ-তৎসম, মা. '৫২ ; মা. [ কম্পার্ট. ] '৬২ ; উ. ম. '৬২, '৬৮ ; ভগ্ন-তৎসম, মা. '৬২ ; উ. মা. '৬৩ ; খাঁটি বাংলা শব্দ ; বিদেশী শব্দ ও মিশ্র শব্দ, দেশী শব্দ, উ. মা. [ কম্পার্ট. ] '৬২।
৩. তদ্বৎ শব্দ ও অর্ধ-তৎসম শব্দের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। মা. '৬০ ; উ. মা. '৬৫
৪. উদাহরণসহ তৎসম ও তদ্বৎ শব্দের পার্থক্য বুঝাইয়া দাও। উ. মা. '৬১
৫. দেশী ও বিদেশী শব্দ বলিতে কি বুঝায় ? দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দাও। ক. বি. '৪৭
৬. প্রাকৃতজ শব্দ এবং মৌলিক ও আগত্বক শব্দ কাহাকে বলে ? দৃষ্টান্তসহ পরিশুট কর।
৭. বাংলা ভাষায় বহু-বাবস্থিত পাঁচটি বিদেশী ও তাহাদের আকরের উল্লেখ কর। উ. মা. '৬৩
৮. নিম্নোক্ত অংশগুলিতে প্রযুক্ত শব্দগুলির শ্রেণী নির্দেশ কর :  
ক. ভুলিতেছে তবী, ফুলিতেছে ভাল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,  
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ.  
কে আছে জোয়ান, হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।  
এ তুফান ভারী হিতে হবে পাড়ি নিতে হবে তবী পার।'—নজরুল ইসলাম।  
তবী [ তৎসম ], জন [ তৎসম ], মাঝি [ তদ্বৎ ], পথ [ তৎসম ], পাল, হাল [ দেশী ], হিম্মৎ [ বিদেশী—আ. ], জোয়ান [ বিদেশী—ফা. ] আগুয়ান [ তদ্বৎ ], তুফান [ বিদেশী—ফা. ], ভারী [ তদ্বৎ ] পাড়ি [ দেশী ], পার [ তৎসম ]।
- খ. 'নিকের মোজা, চকচকে পাশ্প-শু আখাণোড়া ওভারকোট মোড়া, গলার গলাবন্ধ, হাতে দস্তানা মাথায় টুপি—প'ল্‌দের শীতের বিরুদ্ধে তাঁহার সতর্কতার অভাব নাই।'—শরৎচন্দ্র
৯. কাহাকে বলে উদাহরণসহ বুঝাইয়া লিখ :  
ইতর শব্দ, খণ্ডিত শব্দ ও অপশব্দ।

## শব্দধৈত

একই শব্দ বহন একসঙ্গে দুইবার উচ্চারিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন অর্থের স্রোতনা করে, তখন তাহাকে শব্দধৈত বলা হয়। শব্দধৈত বাংলা ভাষার একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। নিখুঁত মনের ভাব প্রকাশে শব্দধৈতের ভূমিকা অসামান্য। অনেক সময় একই শব্দ না হইয়া বিকৃত শব্দ কিংবা বিশরীত শব্দও প্রযুক্ত হইয়া শব্দধৈত গঠিত হইয়া থাকে; ইহারা কখনও বন্দ সমাসের অন্তর্ভুক্ত হয়, কখনও ব্যতিহার সমাসের অন্তর্ভুক্ত হয়।

১ চলিত বাংলায় একই শব্দ দুইবার প্রয়োগের দ্বারা নতুন অর্থের স্রোতনা করা যায়। তাহাদের দ্বিরুক্ত শব্দ বা শব্দযুগ্ম বা শব্দধৈত বলা হয়। যেমন :

‘তোমা লাগি দিকে দিকে কাঁদিছে ক্রন্দসী।’ ‘এখন পণ্ডিতেরা দূর দূর থেকে।’ ‘দেউলে দেউলে কাঁদিয়া ফিরি গো।’ ‘ঘরে ঘরে আছে পরমায়্যায়, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া।’ বছর বছর এমনভাবে কষ্ট করা যায় না [প্রতি বছর]। হাজার হাজার লোক ভ্রমে গেল [অনেক হাজার]। গাড়ী গাড়ী খাবার আসতে লাগলো [অনেক খাবার]। ধামা ধামা মুড়ি নিমেষে ফুরায় [অনেক ধামা]। ঢুলু ঢুলু চোখ বে! ঘুম আসছে নাকি [ঘুম আসবার মতো] ? কাঁদ কাঁদ মুখে ছেলেটি চলে গেল [প্রায় কারার মতো]। জল জল করে প্রাণটা তব্বিয়ে গেল [জলের তীব্র আকাজক্ষায়]। বই বই করে ছেলেটা পাগল [বই পড়ার তীব্র আকাজক্ষায়]। চলো চলো, দেরী হয়ে যাচ্ছে [তাগিদ]। ধরো ধরো, এখনি উল্টে পড়বে [আগ্রহান্বিতভাবে]। ‘পথে পথে কাটাই বেলা।’ গান গান করে সারা দেশের লোক যেন নক্কে উঠেছে। আয় আমরা চোর চোর গেলি। ‘ডেউ—আবার ডেউ। যেন রাশি রাশি বস্তা বস্তা ভূলা।’ লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়ে গেল। “ভট্ট শারের বনভ্রমণের মধ্যে দলে দলে জোনাকি, যেন নিঃশব্দে মুঠো মুঠো আগুনের ‘হরির লুত’ ছড়াইতেছে।” ‘নর্দা কূলে কূলে, উঠে কলোল।’ ‘এবার আলোয় আলোয় বদায় দে মা, ভালোয় ভালোয় চলে বাই।’ ‘ওরে ভাই, কাগুন লেগেছে বনে বনে, ডালে ডালে, ফুলে ফুলে পাতায় পাতায় রে. আড়ালে আড়ালে কোণে কোণে।’ তেমনি—আশায়-আশায়, কানে-কানে, মাঠে-মাঠে, গানে-গানে, প্রাণে-প্রাণে, অন্তরে-অন্তরে, হৃদয়ে-হৃদয়ে, চালে-চালে, দেশ-দেশে, মাতৃবে-মাতৃবে, পায়ে-পায়ে, হাতে-হাতে। [পৌনঃপুঞ্জ অর্থে] বছর-বছর, বারে-বারে, সপ্তাহে-সপ্তাহে, রোজ-রোজ, মাসে-মাসে, মাঝে-মাঝে, সময়-সময়, বর্টার-

শব্দবৈত ও বাক্যস্বক শব্দ,

কটার, পলে-পলে, নিমেষে-নিমেষে, কখনো-কখনো, কথার-কথার, পলক-পলক  
[ নিরত অবস্থান বুঝাইতে ] চোখে-চোখে, হাতে-হাতে, পিঠে-পিঠে, মনে-মনে, একে  
ডলে, উপরে-উপরে, ভিতরে-ভিতরে, আগে-আগে, পাশে-পাশে, সঙ্গে-সঙ্গে, পিছনে  
পিছনে। [ কিয়ার দীর্ঘস্বার বুঝাইতে ] হালিতে-হালিতে, খেলিতে-খেলিতে, চলিতে  
চলিতে, ছুটিতে-ছুটিতে, দেখিতে-দেখিতে, বলিতে-বলিতে, বসিতে-বসিতে, পড়িতে-  
পড়িতে, নাচিতে-নাচিতে, ডেকে-ডেকে, নেচে-নেচে, কঁদে-কঁদে, ঘুরে-ঘুরে, ছুটে-ছুটে  
[ বিশেষ নিশ্চয়তা বুঝাইতে ] টাট্কা-টাট্কা, গরম-গরম, ঠিক-ঠিক, সকাল-সকাল,  
নিম্নে-নিম্নে, গলার-গলার, বজার-বজার।

২. দ্বৈতবর্ধে বা সাদৃশ্য বুঝাইতে শব্দবৈত হয়। যেমন : ঘুম-ঘুম পাচ্ছে।  
শীত-শীত করছে। শুকে কেমন বেন চোর-চোর মনে হচ্ছিল। তার গায়ে  
গোরু-গোরু পছ। লোকটার পেটে-পেটে বৃদ্ধি। এসো, হাতে-হাতে  
কাজটা করে কেলি। তখন স্বর্ষ ডুবু-ডুবু। ‘আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে স্বর্ষি ডোবে-  
ডোবে।’ ‘এত বাই-বাই করছ কেন?’ এততো এলে, এখনই উঠি-উঠি  
করছ? ‘আউসের খেত জলে ভরো-ভরো।’ তেমনি—মেঘ-মেঘ, জর-জর, নিবু-  
নিবু, হাসি-হাসি, মানে-মানে, কিরে-কিরে, বাব-বাব, করি-করি, খাই-খাই, বলি-বলি,  
বার-বার, ভাসা-ভাসা, ফাকা-ফাকা, চেনা-চেনা।

৩ একটি প্রকৃত শব্দ ও একটি বিকৃত শব্দ যোগে গঠিত শব্দবৈত  
বা‘লায় কখনও ‘প্রভৃতি’ বুঝাইতে, কখনও বা ‘অবজ্ঞা’ বুঝাইতে ব্যবহৃত  
হয়। যেমন : ‘সারাদিন কাটে ভপে-তপে।’ চা-টা খেয়ে বেরিয়ে পড়া যাক।  
কম সময় করে খরচ করো। বাজারে মাছ-কাছ কিছুই নেই। চল, পাখি-টাখি  
মারা যাবে। ভাত-টাত কি দেবে দাও। ঘোড়া-টোড়ার ধার ধারি না, পায়ে  
হেঁটেই মেবে দেব। কাজ-টাজ এখন আর ভাল লাগছে না। অলি-গলি দিয়ে  
কোথায় নিয়ে চললে? বকা-ঝকা করে মনটা খারাপ হয়ে গেল। মার-ধোর করে  
কিছু হবে না। রাগ-বাগ করে আব কি হবে? এই ভাড়া-চোরা পুতুল নিয়ে কি  
খেলা হবে? বই-টই কিছু পেলো? কথাটার মাথা-মুণ্ড কিছুই বুঝলাম না।  
তেমনি—জড়-সড়, আবোল-তাবোল, মল-টল, ধার-ধোর, কাপড়-চোপড়, চাকর-  
বাকর, লাঠি-সোটা, রকম-সকম।

৪. ব্যতিহার বুঝাইতে শব্দবৈত হয়। যেমন : তাহাদের মুখ-দেখাদেখি  
বন্ধ হইয়া গেল। চোখাচোখি হইলেই তাহাদের কথা-কাটাকাটি শুরু হইয়া  
যায়। রাতারাতি কাজটা সারিয়া ফেল। লোকজনের ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া  
গেল। আমি বৃষি সোজাশুষ্টি। তাকে শ্রদ্ধাধরি করে সবাই বাড়ি নিয়ে এল।  
বা বলছ, খোলাখুলি বল। অত হাসাহাসি করছ কেন? এখানে তেমন কিছু  
কড়াকড়ি নেই। সরাসরি বাড়ি চলে যাও। তেমনি—কানাকানি, বলাবলি,  
মাঝামাঝি, পাশাপাশি, বাধাবাধি, ঠাটাঠাটি, মারামারি, কাছাকাছি, মুখোমুখি,  
ঠেলাঠেলি, গড়াগড়ি, দোড়াদোড়ি, কোলাহুলি।

৫. ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও শব্দদ্বৈত ছাড়া আর এক শ্রেণীর যুগ্ম বা জোড়া-শব্দ বাংলা ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায়।

ক. ইহাদের মধ্যে বিপরীতার্থক যুগ্ম শব্দের কথা আগেই আলোচনা করা হইয়াছে। যেমন—অগ্র-পশ্চাৎ; আগা-গোড়া; মরণ-বীচন; দোষ-গুণ; স্বথ-দুঃখ; হাসি-কারা; ইতর-ভত্র; নাচন-কোদন; আদান-প্রদান; লেন-দেন; দেনা-পাওনা; উঠা-বসা; রাত-দিন; পড়া-শোনা; ভালো-মন্দ; ভাল-গড়া; আলো-আঁধার।

খ. এ ছাড়া সমার্থক শব্দযুগ্মের প্রয়োগ দ্বারা অর্থের ব্যাপকতা বোঝান যায়। যেমন—হাসি-খুশি; ঝি-চাকর; চোর-ডাকাত; লোক-লম্বুর; বলা-কওয়া; হুঃখ-কষ্ট; আদর-বহর; পাহাড়-পর্বত; ঠাট্টা-তামাসা; শিশি-বোতল; ছাই-পাশ; ধূলি-মাটি; হেলা-ফেলা; কারা-কাটি; চুরি-ডাকাতি; হাট-বাজার; লজ্জা-সরম।

গ. বিভিন্নার্থক শব্দযুগ্ম : যেমন—অন্ন-বন; অন্ন-জল; ভাত-কাপড়; জল-বায়ু; জামা-কাপড়; টেবিল-চেয়ার; দোয়াত-কলম; খাতা-পেন্সিল; ডাল-কুটি; আসমান-ভূমি; ধূলা-বালি; ইট-পাথর; হাত-পা; চোখ-কান; গোক-দাড়ি।

৬. ধ্বন্যাত্মক বা অনুকারাত্মক শব্দের শব্দদ্বৈত হয়। যেমন : কলকল—‘এসো এসো হে তুকার জল কলকল চলছিল।’ ঠংঠং—‘মন্দিরেতে কীসর-বটী বাজল ঠংঠং।’ ঝরঝর—‘আজি বারি ঝরে ঝরঝর ভরা বাদরে।’ দুরুদুরু—‘দুরুদুরু করে হিয়া।’ সন-সন—‘হুলিছে পবনে সন-সন বন-বীথিকা।’ টন্টন্—পুরাতন ব্যাটা টন্টন্ করে উঠল। ছলোছলো—‘দিয়েছি পাতি মম জল ছলোছলো আঁখি।’ ফরফর—ফরফর করিয়া নিশান উড়িতেছে। ডিম্‌ডিম্—‘দুন্দভি বেজে ওঠে ডিম্‌ডিম্‌ রবে।’

### ধ্বন্যাত্মক শব্দ বা অনুকারাত্মক শব্দ

বাংলা ভাষায় এমন কতকগুলি শব্দ আছে, যাহারা আভাবিক ধ্বনির অনুলম্বন হইতে জাত। সেই ধ্বনি-সংকেত দ্বারা তাহারা বিশেষ বিশেষ অর্থ জ্ঞোতিত করে। এইরূপ শব্দকে ধ্বন্যাত্মক বা অনুকারাত্মক শব্দ বলে। যেমন : ‘ঠক্’ করিয়া কী একটা মেঝেতে পড়িল। সে আমার পায়ে ‘টিপ্’ করিয়া একটা প্রণাম করিয়া বসিল। দরজায় ‘খুট্’ করিয়া এক শব্দ হইল। ‘দুম্’ করে তার পিঠে পড়ল একটা তাল।

ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলির আভিধানিক অর্থ খুজিতে যাওয়া বুঝা। ধ্বনির সাহায্যে ইহারা মনের মধ্যে এমন একটি জ্ঞোতনার সৃষ্টি করে, তাহাতে উপহাসনা অত্যন্ত নিখুঁত হয়।

ইহাদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন, ‘সৈন্তদলের পশ্চাতে যেমন একদল অনুযাত্রিক থাকে, তাহারা রীতিমতো সৈন্ত নহে, সৈন্তদের নানাবিধ প্রয়োজন সরবরাহ করে, ইহারাও বাংলা ভাষার পশ্চাতে সেইরূপ ঝাঁকে ঝাঁকে ফিরিয়া সহস্র কর্ম করিয়া থাকে,

অথচ টিকমতো শব্দশ্রেণীতে ভর্তি হইয়া অভিধানকারের নিকট সম্মান প্রাপ্ত হয়। নাই। ইহার নানা পাশ্চিলে বাংলা ভাষার বর্ণনার পাঠ একেবারে উঠাইয়া দিতে হয়।' ইহার অব্যয় এবং ক্রিয়ার বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। আবার, কখনও কখনও বিশেষ্যরূপে, কখনও বিশেষণরূপে, কখনও ক্রিয়ারূপে ইহাদের ব্যবহার দেখা যায়। এই প্রকার শব্দের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার অবিচ্ছিন্ন বা বিচ্ছিন্নভাবে একবার বা দুইবার ব্যবহৃত হইয়া পন্থির স্বাক্ষর সৃষ্টি করিয়া বিশেষ অর্থ বোধগম্য করায়। যেমন :

আমি অতশত [অত প্রকার] জানি না। খাওয়ার পরই শরীরটা তার আইটাই [অস্বস্তিবোধ] করতে লাগলো। তাঁকে দেখার জন্যে মনটা আঁকুপাঁকু [উত্তলাবোধ] করছে। আমতা-আমতা [ইতস্ততঃ] করছ কেন? যা খটেছে, তাই বল। 'মা বলিতে প্রাণ করে আনচান [অস্থির]।' বিকেল হতেই সে বাইরে যাবার জন্যে উশখুশ [অধীরতা প্রকাশ] করছে।

শব্দটিকে সে কচ্ [নরম জিনিস সংক্ষেপে কাটার শব্দ] করে কেটে ফেললো। লাউটাকে সে কচ্ কচ্ [বিন্দিতভাবে কাটার শব্দ] করে কেটে ফেললো। সে বসে কুচ্ কুচ্ [মিহিভাবে কাটার শব্দ] করে পেঁয়াজ কাটছিল। কচাকচ্ [সজোরে দ্রুত কাটার শব্দ] করে সে চালকুমড়োগুলো কাটতে লাগল। এক কোপে সে কলাগাছটাকে কচাৎ [সজোরে সংক্ষেপে কাটার শব্দ] করে কেটে ফেললো। জাঁতি দিয়ে সে স্প্রিংটা কট্ [শক্ত জিনিস সংক্ষেপে কাটার শব্দ] করে কেটে ফেললো। দেখলাম, কুলের একটু সে কুট্ [আরো সংক্ষেপে কাটার শব্দ] করে কামড়ে নিল। ভাত খেতে খেতে এখন কটাৎ বা কটাস্ করে [শক্ত জিনিস সজোরে কাটার শব্দ] ঝাঁকর কামড়তে হয়। তার কান কট্ কট্ [ঘয়ণা] করছে। ডোবার ধারে পোকাকামড় কিল্ কিল্ [দলবদ্ধভাবে বিচরণ] করছে। পিঁপড়ে খেয়ে ব্যাঙ মশায়ের পেট করে কুট্ কুট্ [মৃদু ব্যাণা]। জানালাটা খট্ [শক্ত জিনিস ঠুকবার শব্দ] করিয়া খুলিয়া গেল। অঙ্ককারে কে যেন খুট্ [ঐ মৃদু ও সংক্ষিপ্ত শব্দ] করিয়া বাস্তু খুলিল। দরজায় খটাৎ [জোর শব্দ] করিয়া খিল দ্বিবার শব্দ হইল। অঙ্ককারে কোথায় যেন খটাস্ [খটাৎ-এর চেয়ে জোর] করিয়া শব্দ হইল। তিনি খড়ম পায়ে খট্ খট্ [ক্রমাগত খট্ শব্দ] করে সারা বাড়ি চষে বেড়াচ্ছেন। চোখে বালি পড়ে খচ্ খচ্ [কর্কশ ও কষ্টকর স্পর্শের অনুকৃতি] করছে। সে রাগে কট্ কট্ [জোরের ভাব প্রকাশ] করে তাকিয়ে রইলো। 'হেসে ঝলঝল [আনন্দে হাসির শব্দ] গেয়ে কলকল [মধুর অস্ফুট ধ্বনি] তালে তালে দিব তালি।' 'কড়্ কড়্ কড়্ [মেঘের শব্দ] ডাকবে দেয়া, আসবো আমন ক'য়ে।' সারাদিন বীদরগুলো করছে কিচির-মিচির [একটানা কণ্ঠ কোলাহল], আর সারারাত কিচমিচ [একটানা মৃদু কলরব] করছে বাহুড়গুলো। 'কেবল তার পেটের মধ্যে পুঁথির শুকনো পাতা খস্ খস্ [পত্রের ঘর্ষণের শব্দ] গজ্ গজ্ [কথা বাহির হইবার অন্তর্য-প্রকাশক] করিতে লাগিল।' আজ ঘরবাড়ি যেন খাঁ খাঁ [শূন্যতা বোধ] করছে। 'গুডাঘিলি ঝিল্ ঝিল্ [ক্রমাগত হাসির শব্দ] করিয়া হাসিয়া উঠিল।' 'তিনিও একটু খিটখিটে [সদা বিরক্ত]—

তাহাকে বশ করিয়া লইতে হইবে।' আকাল খুঁতখুঁত [অসন্ত হওয়া] করা তোমার স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

"কেবল সেই 'দাঁড়াও' শব্দ অনেককণ গম্‌গম্ [ধনিত গভীর শব্দ] করিতে লাগিল।" উহনে আগুন গ্নগ্ন [আগনের প্রধরতার ভাব] করছে আর সেই গ্নগ্ননে [তেজাল] আগুনে কড়া চাপিয়ে সে বেগুন ভাজছে। আমার কথার কান না দিয়ে গট্‌গট্‌ বা গট্‌মট্‌ [সদৃশ পদক্ষেপের শব্দ] করে চলে গেল। সে গড়্‌গড়্‌ [দ্রুত ও অনারামে] করে ছড়া মুখ বুলতে পারে। সে রাগে গর্‌গর্‌ [চাপা ক্রোধের ভাব] করতে লাগলো। ফাটা কপাল থেকে গল্‌গল্‌ [অবিরল ধারার] করে রক্ত ঝরছিল। বাড়িতে আজ লোকজন গিজ্‌গিজ্‌ [ঠালা-ঠালির ভাব] করছে। গুঁড়িগুঁড়ি [একটানা বিন্দু বিন্দু] বৃষ্টি পড়ে। সে নিছের মনে গুন্‌গুন্‌ [অক্ষুট স্বরে] করে গান গাইছে। গুড়্‌গুড়্‌ [মৃদু গড়্‌ গড়্‌ শব্দ] শব্দে মেঘ ডাকছিল। 'গুরুগুরু [গভীর মেঘগর্জনধ্বনি] মেঘ গুরি' গুরি' পরজে গগনে গগনে।' 'চরকার ঘন্‌ঘন্‌ [একটানা মৃদু চাকার শব্দ] পড়শীর ঘর-ঘর।' ঘোড়ার সারা গা-টা আমার ঘিন্‌ঘিন্‌ [ঘণাহেতু অস্বস্তি-বোধ] করছে। কুকুরের বাচ্চাটা সারাদিন ঘুর্‌ঘুর্‌ [ঘোরাঘুরি করার ভাব] করছিল। কণ্‌ণ ছেলেরা সব সময় ঘ্যান্‌ঘ্যান্‌ [ক্রমাগত বিরক্তিকর নাকী স্তরে কাশা] করে কাপছে।

লোভে তার চোখদুটো চক্‌চক্‌ [দাঁপ] করে উঠলো। 'চিক্‌চিক্‌ [মৃদু দীপ্তি] কবে বালি কোথা নাহি কান্দা।' শীতকালে শুকনো গা চড়্‌চড়্‌ [শীতের টান] করে। গ্রীষ্মের রোদুর মাথার ওপর চন্‌চন্‌ [প্রখরতাবোধক] করছিল। চন্‌চন্‌ [শুক এবং প্রখর] রোদুরে আমার বোনগুলো সব করে গেল। আঙুলের কাটা ভায়গাটা চিন্‌চিন্‌ [ঈষৎ ব্যথা] করছে। পোকা চুক্‌চুক্‌ [জ্বিত দিয়া হৃদ পাঠবার শব্দ] করে সবুজ হৃদ খেয়ে কেলোছে। সে কেন চুলবুল্‌ [অস্থিরতার ভাব] করে ওখানে ঘুরে বেড়ায়? তাহাকে দেপির জল জননার প্রাণ ছট্‌ফট্‌ [অস্থিরতা] করিতেছিল। 'শ্রাবণ-আকাশে ওই দিয়েছি পার্ণি নম চল-ছলছল [সজল] অঁপি মেঘে মেঘে।' 'মায়ের কথায় তাহার চোপ ছলছল [অশ্রুপূর্ণ] করিয়া উঠিল।' এই বনের ধারে গেলেই সবার গা হুম্‌হুম্‌ [ভয়স্রব্দ] করে ওঠে।

অন্ধকারে তার চোখদুটো জ্বল্‌জ্বল্‌ [দীপ্তিস্রব্দ] করছিল। তোমার ঐ জ্বল্‌জ্বল্‌ [জ্বল উজ্জল] করে চেয়ে থাকা আমার ভালো লাগে না। 'আজি বারি করে ঝরঝর [ক্রমাগত পতনের শব্দ] ভরা বাদরে।' 'পরতে ধরাডল শিশিরে ঝলঝল [উজ্জল]। ঝমঝম [বৃষ্টি পতনের শব্দ] করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করলো। মলপায়ে সে ঝমঝম্‌ [চলার শব্দ] করে হাঁটছিল। সারাদিন পড়ছিল ঝমঝম্‌ [ক্রমাগত বৃষ্টির শব্দ] করে বৃষ্টি। 'শুন্‌লে বারবার ঝন্‌ঝন্‌ [কর্কশ ঝনংকার] ঝংকার, নয় এ তো তরগীর কন্দন শব্দার।' 'ঝন্‌ঝনি ঝন্‌ঝনি [তালে তালে কর্কশ ঝনংকার] খঞ্নি বাজে।' পরিকার মেঝেটা আজ যেন ঝক্‌ঝক্‌ [তীব্র উজ্জল] করছে। চামরের সোনা বাধানো হাতল-গুলো রোদুরে ঝক্‌ঝক্‌ [হৃদ উজ্জল] করছিল। 'নদীর তরঙ্গহীন প্রবাহের উপর আলো

ঝিক্‌ঝিক্‌ [ বৃহ্ উচ্চল ] করিতেছে। 'নদীর শান্ত জলে তখন রোদ্রের ঝিক্‌ঝিক্‌ [ অতি বৃহ্ উচ্চল ] করিতেছিল।' 'গায়ে আলো করে ঝিক্‌ঝিক্‌ [ আলোর বৃহ্ কম্পন ] যেন পরেছে হীরার চিক্‌।' 'ঝিক্‌ঝিক্‌ [ আলোর বৃহ্ অথচ দ্রুত কম্পন ] করে পাভা, ঝিলিঝিলি [ বৃহ্ বলমল ] আলো। সারাক্ষণ তার হাত-পা ঝিন্‌ঝিন্‌ [ অস্বস্তিকর জালা ] করছে। নদীর জল তিরতির [ লঘু প্রবাহের ভাব ] করে বয়ে চলেছে। ঝিরঝির [ বৃহ্ কলধনি ] করে বয়েছে বরনার জল। দেয়ালের গা থেকে বালি ঝুরঝুর [ বৃহ্ ঝুরঝুর শব্দ ] করে বয়ে পড়ছে। 'ঝুরঝুর [ বৃহ্ বরবর শব্দ ] পাভাগুলি নড়ে।' 'অগ্নিশিখার মতো তাদের সগিন উর্ধ্ব গতির প্রতি চাহিয়া থাকিলে মাথা ঝিম্‌ঝিম্‌ [ অবশতার ভাব ] করে।' 'নৃপের ঝিনিঝিনি, ঝুমুঝুমু [ বৃহ্ নিকণ ] শব্দে সারা প্রাণের মুখরিত হইয়া উঠিল।' 'ঝুম্‌ঝুম্‌ [ বৃহ্ ঝম্‌ঝম্‌ শব্দ ] করে পায়ের মল বাজিয়ে সে চলে গেল। 'পাড়-ভাঙার অবিস্ময় রূপ, ঝাপ, [ ক্রমাগত পতনের শব্দ ] শব্দ এবং জলের গর্জনে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিল।' নদীর পাড়-ভাঙার রূপ, রূপ [ ক্রমাগত পতনের বৃহ্ শব্দ ] শব্দের যেন আর বিরাম নেই।

বুকা ব্যাথায় টন্‌টন্‌ [ অস্বস্তিবোধ ] করে উঠলো। দীঘির জল টল্‌টল্‌ [ বচ্ছতার ভাব ] করছে। বর্ষায় গঙ্গার জল টল্‌মল্‌ [ অস্থির আন্দোলন ] করছে। কলে টপ্‌টপ্‌ [ কৌটার কৌটার শব্দ ] করে জল পড়ছে। সারাদিন টিপ্‌টিপ্‌ [ দ্রুত পড়ার শব্দ ] করে বৃষ্টি পড়ছিল। কাঁচা কুলগুলো সে টপাটপ [ দ্রুত ] গিলতে লাগলো। 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর [ বৃষ্টিপাতের বৃহ্ শব্দ ] নদেয় এলো বান।' 'কন্দ দশে আপন অধব দংশন করিয়া টিপিটিপি [ নিঃশব্দে ] হাসিতেছে।' 'মৃদব দোকানে টিম্‌টিম্‌ [ কীণ আলো ] কবে দীপ জলে একখানে।' গ্রামে একটিমাত্র পাঠশালা, তাও অর্থভাবে টিম্‌টিম্‌ [ কীণভাবে অস্থির বজায় রাখা ] করছে। 'এ পারেতে লঙ্কা-গাছটি বাঁড়া টুকটুক্‌ [ ঘোব লাল অথচ স্থন্দব ] করে।' 'দেয় ডুব টুপ্‌টুপ্‌ [ দ্রুত ডুব দেওয়া ] ঘোমটাব বউটি।' বাস্তায় রিক্‌শাওয়ালা টুংটাং [ ধাতুদ্রব্যাদির আওয়াজ ] খটা বাজিয়ে চলেছে। 'হাতে লগ্ন কবে ঠন্‌ঠন্‌ [ ধাতুদ্রব্যের শব্দ ]।' 'মন্দিরেতে কাঁসবধটা বাজলো ঠংঠং [ ঐ ]।' আর শোনা যায় ভারবাহী পশু-কণ্ঠের ঠুংঠুং [ ঘণ্টাদির বৃহ্ শব্দ ] ধনি। 'এমন সময় একটা ঠক্‌ঠক্‌ [ কঠিন বস্তু ঠুকিবার ] শব্দের সহিত গৃহনাব ঝম্‌ঝম্‌ শব্দ শোনা গেল।' সে ভয়ে ঠক্‌ঠক্‌ [ প্রবলভাবে ] করে কাঁপছিল। 'ঠুন্‌ ঠুন্‌ [ ধাতুপাত্রের আওয়াজ ] পেয়ালা কেয়া রংবেরং।'

'ডিম্‌ডিম্‌ [ ডম্‌কধনি ] বাজে ডম্‌ক ডাল।' সে তার বড় বড় চোখে ড্যাং-ড্যাং [ বিক্ষা দত ] কবে চেয়েছিল। ড্যাং ড্যাং বা ড্যাড্যাং ড্যাং [ ঢাকের ধনি ] করতে কবতে বিসর্জনের শোভাযাত্রা চলে গেল। সে ঢক্‌ঢক্‌ [ দ্রুত পানের শব্দ ] কবে সবটুকু জলই খেয়ে ফেললো। ওর সব কটা দাঁতই ঢক্‌ঢক্‌ [ নড়িবার শব্দ ] করে নড়ছে। 'বাইবে কৌটার পন্তন, বাড়িতে হাঁড়ি তো চন্‌চন্‌ [ শৃঙ্খলিত আওয়াজ ]।' বোন খেয়ে আইটাই পেট করে চপ্‌চপ্‌ [ শৃঙ্খলিত দ্রব্য আঘাতের শব্দ ]। 'তলতল [ সৌন্দর্য-ভরাগত ] কাঁচা অঙ্গের লাবণী অবনী বহিয়া যায়।' খুব



রোগা হয়ে গেছ, তাই জামাটা গায়ে ঢলঢল [ ঢিলা হওয়া ] করছে। হেডমাস্টার মশুইকে ক্লাসে হঠাৎ ঢুকতে দেখে ভয়ে সবার বুক চিপ্‌চিপ্‌ [ ভারী জ্বিনিসের ক্রমাগত পতনের শব্দ ] করতে লাগলো। ‘হে যোগীন্দ্র, যোগাসনে তুলুতুলু [ আবেশ-বিভোর ] হ’নয়নে, বিভোর বিস্মল মনে কাহারে ধোঁয়াও?’

‘মাঝে মাঝে এক-একটা জায়গা ঘূতকুমারীর বেড়া দিয়ে ঘেরা, পরিষ্কার তক্ততক্ত [ পরিচ্ছন্নতা ] করিতেছে।’ নীচে জল তরতর [ স্বচ্ছতা ] করে বয়ে চলেছে। আমরা পেকে তলতল [ খুব নরম অবস্থা ] করছে। ‘মম চিন্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে তাতা খৈখৈ তাতা ঠৈ ঠৈ [ তাণ্ডব-নৃত্যের বোল ]।’ ‘তুলতুলু [ অতিশয় কোমল ] টুকটুক কোন্ ফুল তার তুল।’ ‘খরখর [ প্রবল কম্প ] করি কাঁপিছে ভূধর।’ বর্ষার জলে মাঠ-ঘাট থইখই [ তরল পদার্থের পড়িব্যাপ্তি ] করছে। খালায় পায়ের ধক্ধক্ [ ঘন ও ঈষৎ তরল ] করছে। ছাল উঠে গিয়ে ঘা-টা ধক্ধক্ [ ক্ষত সাংঘাতিক হওয়া ] করছে। লোকটার মেদবহুল শরীরে পেটের মাংস থলথল [ স্থূল কোমল ও স্থিতি-স্থাপক ] করছে। নিস্তব্ধ নিশ্চুতি রাত থমথম [ নিথর ] করছিল। তাহার বিষম মুখখানি মেঘাবৃত আকাশের ঝায় থমথম [ জলভারাক্রান্ত ] করিতেছিল। বধাকালে ওদের উঠানে পোকামাকড় ধিক্‌ধিক্ বা ধক্ধক্ [ গাদাগাদি ] করতে থাকে। লাঠিহাতে বৃদ্ধ একাকী থুড়থুড় [ দুর্বলতাহেতু কম্পন ] করে হেঁটে চলেছেন।

ঘা-টা সকাল থেকে দগ্‌দগ্‌ [ জ্বলন ] করছে। অন্ধকারে জোনাকিরা দপ্‌দপ্‌ [ জ্বলন ] করিয়া জলিতে নিভিতে লাগিল। তাহার কপালের শিরা দপ্‌দপ্‌ বা দব্‌দব্‌ [ ঈষৎ যন্ত্রণা ] করিতেছে। তার গা থেকে দরদর [ ক্ষরণ ] করে ঘাম ঝরছিল। ‘দরোদরো [ জল পড়ার শব্দ ] বেগে জলে পড়ি জল ছলোছলো উঠে বাজি রে।’ ‘আমলকি বন কাঁপে যেন তার বুক করে দুর্দুর্দুর্দু [ ভয়ে কম্পন ]।’ সারা পাহাড়-বন দাঁউদাঁউ [ প্রবলভাবে জলা ] করে জলে উঠলো। অন্ধকারে কারা যেন দুড়্‌দুড়্‌ [ অতি দ্রুত ও উচ্চ পদশব্দ ] করে এগিয়ে আসছে শুনে আমার বৃকের ভিতরটা দুড়্‌দুড়্‌ [ ভয়াদি-হেতু কম্পন ] করছিল। সারাদিন বাড়ির মধ্যে দুপ্‌দুপ্‌ [ ক্রমাগত মৃদু ধপ্‌ শব্দ ] শব্দ ভালো লাগে না। সমস্ত দিন ওরা দুম্‌দুম্‌ [ ক্রমাগত হুম্‌হুম্‌ শব্দ ] করে ছাত পিটোয়। অমন দুম্‌দুম্‌ [ ক্রমাগত মৃদু হুডুম্‌ শব্দ ] করে হাঁটছে কেন? ছাদের উপর দুম্‌দাম্‌ [ গভীর আঘাতের শব্দ ] করে হাঁটছে কে? ‘ধক্‌ধক্‌ [ প্রবল অগ্নি-জ্বলনের আওয়াজ ] দশদিকে বিস্তারের ঝল।’ বুকটা ধড়ধড় [ অস্থিরতা ] করিয়া উঠিল। অন্ধকারে শব্দটা শুনেই ধড়মড় [ আকস্মিক ব্যস্ততা ] করে উঠে বসলাম। ‘এজিনের ধক্‌ধকি [ প্রবল স্পন্দনের শব্দ ] সব গেল থেমে।’ শাদা কাপড়খানা ধপ্‌ধপ্‌ বা ধব্‌ধব্‌ [ অতিশয় শব্দভা ] করছে। মায়ের বৃকে পুত্রশোক তুষের আগুনের মতো ধিক্‌ধিক্ বা ধিকিধিকি [ ধীরে ধীরে জ্বলার শব্দ ] জ্বলছে। ‘ধুক্‌ধুক্‌ [ মৃদু স্পন্দন ] করে বুক।’ ‘আগুন ধু ধু [ তীব্র আগুন জ্বলার শব্দ ] করিয়া জলিয়া উঠিল।’ দিগন্ত পর্বন্ত শুকনো মাঠ ধু ধু [ শূন্যতা ] করছে। ‘তাই বলি—সারথান! করো নাকো ধুপ্‌ধুপ্‌ [ ভারী কিছু পতনের শব্দ ]।’ মজা পেয়ে

ছেলেরা খেই খেই [ তাণ্ডব-নাচের আওয়াজ ] করে নাচতে লেগেছে। ভাঙা কুঁড়েটা নড়বড় [ দুর্বল কিছু পতনের আশঙ্কা ] করছে। ওকে বেশ এক হাত শিক্কা দেবার জন্য হাতদুটো নিস্পিস্ [ অস্থিরতা ] করছে।

তারা পটপট [ বৃহৎ ক্ষুণ্ণ ] আখণ্ডলো ভেঙে নিয়ে চিবোতে শুরু করে দিল। ‘হঠাৎ একটা বিদ্যুৎ অন্ধকারটাকে আকাশের এক ধার হইতে আর এক ধার পর্যন্ত পটাপট [ বজ্রাদি ছেঁড়ার শব্দ ] শব্দ করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল।’ সে কুল পেড়ে পটাপট [ অতি দ্রুত ] পকেটে ভরতে লাগলো। শয়তান লোকটা আবার কেমন পিটপিট [ অস্পষ্ট দৃষ্টিনিক্ষেপ ] করে তাকায়। শুচিবায়ুগ্রস্তরা দিনরাত পিটপিট [ স্পর্শভীতি ] করে। মেলায় লোক পিল্পিল্প [ বহুজনের একত্র গমন ] করে চলেছে। পৌঁ পৌঁ [ বাশির শব্দ ] করে বাশি বাজছিল। আমাদের দেখে তারা পৌঁ [ আত দ্রুত ] করে দৌড় দিল। উঠোনে কাদা প্যাচ্ প্যাচ্ [ জলকাদা মাড়াইয়া চলার শব্দ ] করছে। রুগণ ছেলেটা দিনরাত প্যান্ প্যান্ [ একগুঁয়ে নাকী কারা ] করে কাঁদে। সে ফড়ফড় [ বজ্রাদি ফাড়িয়া ফেলিবার শব্দ ] করে কাপড়খানা ফেড়ে ছ’খানা করে ফেললো। ‘ফরফর [ পাতলা বস্তুর উড়িবার শব্দ ] নিশান চলেছে পোতশ্রেণী।’ আমাদের দেখলেই সে ফিক্‌ফিক্ [ ক্রমাগত ঝবং হাসি ] করে হাসতে থাকে। অতি মিহি ধুতিটা ফিন্‌ফিন্ [ অত্যন্ত মিহি ] করছে। ‘বোল তার ফিস্ ফিস্ [ চাপা স্বর ]।’ বাইরে চलो, দেখবে জ্যোৎস্না কেমন ফুট্‌ফুট্ [ উজ্জলতা ] করছে। বাতাসে ফুর্‌ফুর্ [ হালকা জিনিস ওড়ার শব্দ ] করে তার মাথায় চুল উড়ছিল। সে রাগে ফৌঁসফৌঁস [ ক্রুদ্ধ গর্জনের শব্দ ] করছিল। ‘আর আর ঝিলোকেরা ফেল্-ফেল্ বা ফ্যাল্‌ফ্যাল্ [ বিঘৃঢ় চাহনি ] করিয়া চাহিয়া রহিল।’ চিরকাল এইভাবে ফ্যা-ফ্যা [ নিম্নল সঙ্কান ] করে ঘুরে বেড়ালে কি চলেবে ?

দিনরাত ছেলেটা কেবল বক্‌বক্ [ বাচালতা ] করছে। ‘ববম্ ববম্ [ গালবাত্ত ] বাজায় গাল।’ ‘তার হাতের খাড়া তখন বন্বন্ব [ দ্রুতবেগে ঘূর্ণন ] করে ঘুরছে।’ ‘ঘোড়াচুলো গাছগুলো ছোট্ট বাঁইবাঁই [ দ্রুত ছুটিবার ভাব ]।’ লোকটা বিড় বিড় [ আপন মনে অহুচ্চ কথন ] করে নিজের মনে কি বক্ছে। ‘প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রহ বৌঁ বৌঁ [ সববেগে ঘূর্ণন ] করে যায়।’ ভন্‌ভন্ [ বিজ্রী গুঞ্জন ] করে মাছি উড়ছে। ‘মধুমাংসে মনোহর সৌরভেতে ভরভর [ গন্ধে আমোদিত ] প্রফুল্ল ফুলের কত শোভা।’ ভত্‌ভত্ [ শিকাদির শব্দ ] বাজায় শিক্কা। ‘কদম্বে আজ শিখিল রেণু হুবাংসে ভুর্‌ভুর্ [ গন্ধে আমোদিত ]।’ ‘হারাধনের একটি ছেলে কাঁদে ভেউ ভেউ [ আবুল ক্রন্দন ]।’ ‘চক্ শূন্যময় দেখে ভেঁ ভেঁ [ ক্রমাগত ঘূর্ণনের শব্দ ] করে কান।’ জলার ধারে ব্যাঙগুলো মক্‌মক্ [ ব্যাঙের ডাক ] করছে। ‘নতুন চীনের জুতা করে মস্‌মস্ [ তক্ চর্যাদি ছম্‌ড়াইবার শব্দ ]।’ বনের পাতাগুলো মরমর্ [ পত্র কল্পনের শব্দ ] শব্দ করিয়া কাঁপিতেছিল। ভূতেরা মাছধ ধরে আর মট্‌ মট্ [ শক্ত কিছু ভাঙার শব্দ ] করে ঘাড় মট্‌কায়। মড়্‌ মড়্ [ কঠিন দ্রব্য ভাঙিবার শব্দ ] করে গাছের ডালটা

ভেঙে পড়লো। 'মহর মিটিমিটি [ নিম্নীলিত চাহনি ] চায়।' অরের কোণে শিদিষটা মিট্‌মিট্‌ [ ক্রীণ আলো ] করে জলছিল। শরীরটা আক ম্যাক্‌, ম্যাক্‌ [ অহুহতা ] করছে।

'তাহার সবাক রাগে রিরি [ তীব্র ক্রোধ ] করিয়া জলিতে লাগিল।' 'অরণোর প্রত্যেক পাতা সেই শব্দের কম্পনে রিরি [ তীব্র ধ্বংসের অহুহতা ] করিতে লাগিল।' 'রুম্মিম্ম [ যত্ন বৃষ্টিপাতের শব্দ ] ঘন ঘন রে বরষে।' 'শাধন রজনী ঘন ঘন দেখা গরজন রিম্মিম্মি [ অথোনে বৃষ্টিব শব্দ ] শব্দে বরষে।' 'মহার বাজুক রিন্-রিন্ [ তারবহু বা নুপুরের শব্দ ] রিন্।' 'পায়ের মল রিনি কনি [ নুপুরাদির শব্দ ] শব্দে বাজতে লাগল। 'নুপুর বেজে যায় রিনিরিনি [ ঐ ]।' 'গান তার গুনগুন, মস্তুর রুন্‌রুন্‌ [ ঐ ]।' 'বেগনেটের মন্থনর প'রাতে এট 'অল'কারের রুন্‌রুনি [ অলংকারাদি শব্দ ]।' 'রুন্‌-রুন্‌ [ নুপুর বা অলংকারের আওয়াজ ] রবে বাজে আভরণ।' 'কংকারিবে মস্তুর রুন্‌-রুন্‌ [ নুপুরের শব্দ ]।' 'লকলক্‌ [ নমনায় পদার্থের আন্দোলিত হওয়া ] শিখা উঠিবে কেপে।' 'লটপট [ নুটিবার বা হুলিবার ভাব ], জটা লপটে যায়।'।

'হুলিছে পর্বনে সনসন [ অতিক্রম বেগহৃৎক ] বনবাধিকা।' 'আমাদের পাশ দিয়ে সাপটা সড়সড় [ সর্পাদির দ্রুত গমনহৃৎক ] করে ছুটে গেল। বৃষ্টিব ছাটে বিহানটা ভিজে সপসপ্‌ [ জল সিক্ত ] করছে। সে তখন সপসপ্‌ [ তরল বস্তু থাইবার শব্দ ] করে পায়েস খাচ্ছিল। হাকুর পিঠে তারপর সপা-সপাং [ কমাগত বেছাঘাতের শব্দ ] বেত পড়তে লাগলো। 'হিনি সপ সপ [ দ্রুত সপ্‌ সপ্‌ শব্দে আহার ] করে একনিঃশ্বাসে পায়েসটুকু শেষ করে ফেললেন। বাইরে তখন সাঁ সাঁ বা সাঁই সাঁই [ প্রবল বেগ ] করে ঝড় বইছে। এমন সময় শৌ শৌ বা সৌ সৌ [ ঐ ] শব্দে ছুটে এলো প্রচণ্ড ঝড়। সকালের হিমেল বাতাসে গ-টা শিরশিন্ বা সিরসিন্ [ শিহরণের ভাব ] করে উঠলো। 'দেখ, পদ দিয়ে চাটকে ম'হা হন্থন্থ [ দ্রুতবেগে ] করে ছেটে চলেছেন। 'পশ্চাৎ হতে হাহা [ অটহাস ] করে হাসি মস্ত কটিকা ঠেলা দেয় আস।' 'ফাঙন কারছে হাহা [ শূলতা ] ফুলের বনে।' 'কাঁকা খর তাঁ হাঁ [ শূলতাবোধক ] করছে। ওকে দেখামাত্র হিহি [ বিক্রমের হাসি ] করে সবাক হাসল। 'হাফ ছাড় হাঁস-হাঁস [ কণ্ঠে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ] ওরকম হা করে।' 'গরম বাতাস হু হু [ বেগে বাতাস বাহবার শব্দ ] করে ছুটে যাচ্ছে ধুলো উড়িয়ে।' 'অমল আর পৃথিবীতে নেই শুনে আমার মনের ভেতরটা ছু ছু [ যাতনা ও নৈরাজ্য ] করে উঠলো। 'কিছু বলবার আগেই সে ছুছুছু [ ঘোরে জল পড়া ] করে এক কলস- জল আমার মাপায় জেলে দিল। 'ভয় পেয়ে আমরা রাস্তার পাশের বাড়ির বৈঠকখানায় ছুছুছু [ ঠেলাঠেল কারয়া প্রবেশ ] করে ঢুকে পড়লাম। 'ছেলেদা সব বাসার ছোটে ছো ছো [ অটহাস ] করে উড়িয়ে দিয়ে ধুলো।' এমন সময় রাস্তার পাশের লোকগুলো হৈ-হৈ [ উচ্চ গোলমাল ] করে উঠলো।

## ধ্বন্যাত্মক শব্দের বিশেষণরূপে ব্যবহার

**ধ্বন্যাত্মক বিশেষণ :** ইহাদের ধ্বন্যাত্মক বিশেষণও বলা হয়। কচ্ কচে [ চিবাইলে কচ্ কচ্ আওয়াজ ] ডাঁশা পেয়ারা খেতে বেশ লাগে। বাগানে খুব কট্ট-কটে [ কট্টকট্ট-শব্দকারী ] ব্যাঙ হয়েছে। তোমার ওই কট্টমটে [ নীরস ] কথা আমার একেবারে ভালো লাগে না। এখন বেশ কড়মড়ে বা কড়কড়ে [ চিবাইলে কড়কড় শব্দ ] চাল-ভাজা হলে মন্দ হয় না। 'সেদিন কনকনে [ তীব্র শীতল ] শূন্য।' আমি কড়করে [ আনকোরা ] পঞ্চাশটি টাকা তাকে শুনে দিলাম। মেয়েটা একেবারে কুচ্ কুচে [ গাঢ় ও চক্চকে ] কালো। শুকনো হটখটে [ শুষ্ক ] মেয়ের ওপর পড়েছে বোশেখ মাসের রোদ। এমন খড়খড়ে [ খড়খড়-শব্দকারী ] কাপড় আমার পরতে ভালো লাগে না। স্বককারে বুড়ির খন্ খন্ [ খন্ খন্ আওয়াজ-সৃষ্টিকারী ] কথা শুনে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। এত খস্ খসে [ অমসৃণ ] কাপড় আমি পরতে পারি না। তোমার মতো খুঁতখুঁতে [ সব কিছুতেই অসন্তুষ্ট ] ছেলে আ ম আর দেখিনি। উড়নে এখনও বেশ গনংগনে [ তেজাল ] আগুন রয়েছে। এমন ঘ্যান্ ঘ্যান্ [ ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে এমন ] ছেলে আর দেখিনি ; সব সময় কাশা। এই ঘুট্ ঘুটে [ গাঢ় ] অঙ্ককারে পথ চিনে এলে কি করে ? রোজ রাতে তার ঘুস্ ঘুসে [ চাশা ] জর হচ্ছে। আজ সকালে বেশ চন চনে [ প্রখর ] রোদ উঠেছে। মেয়েটি বেশ চটপটে [ তৎপর ] তো ! তার চক্চকে [ উজ্জল ] জুতোয় কি করে কাদার দাগ লাগলো ? এট চটে [ অঁঠাল ] মেঝেতে পা ফেলে হাঁটতে বিশ্রী লাগছিল। ছেলেটির বেশ ছিপ্ ছিপে [ কৃশ ও লম্বা ] চেহারা। ঝরঝরে [ গোটা গোটা ] ভাত না হলে উনি আবার খান না। কলমটাতে বেশ ঝরঝরে [ স্পষ্ট ] লেখা হয়। শরতের এই ঝলমলে [ উজ্জল ] রোদুর কার না ভাল লাগে ? 'ঝক্ ঝকে [ উজ্জল ] নীলাকাশ সোনাঢালা রোদুর।' ছোট্ট টুকটুকে [ স্বস্তি ] একটি মেয়ে রোজ সকালে ফুল দিয়ে ষেত। টক্ টকে [ গাঢ় ] লাল-পেড়ে শাড়িতে তাকে বেশ মানাতো। কপালে তার ডগডগে [ অতি গাঢ় ] সিঁহরের টিপ্। সে কিছু না বলে তার ডা-ব-ড্যাবে [ ভাসা ভাসা ] চোপে চেয়ে রইলো। ঐ ডিগ্ ডিগে [ অতিশয় কৃশ ] লোকটার গায়ে এত জোর তা কে আগে জানতো ! মে-লা আকাশে রোদুর উঠলেই মেয়েটির ঢল্ ঢলে [ লাভণ্যময় মুখ মনে পড়ে। এমন তক্তকে [ পরিষ্কার ও উজ্জল ] উঠোনখানা নোংরা করলে কে ? ঘা-টার রং হয়েছে দগ দগে [ ক্ষতাদির ভাব-সূচক ] লাল। 'ফুট্ ফুটে [ উজ্জল ] জোহনায় ধব্ ধবে [ অতিশয় পরিচ্ছন্নতা ] আভিনায় একখানি মাদুর পাতিয়ে জননী শুইয়া আছে।' ওয়া থাকতো একটি নড়বড়ে পতনোন্মুখ ] পাতার কুটির। লাঠি হাতে চলছিলেন থু থু থুড়ে [ অশক্ত ও কম্পমান এক বৃদ্ধো। কিন্ কিনে [ আঁত-মিহি ] আদ্রির পাঙাবিটা ছিঁড়ে গেল। ফুরফুরে [ লবু ] হাওয়ায় একটু খুরে এসো। লোকটা একেবারে মিশমিশে [ গাঢ় ] কালো। লিকালকে [ কৃশ ] চেহারার লোকটা হাতে লক্ লকে [ নমনীয় ও আন্দোলনশীল একখানা বেত নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

### ধ্বন্যাত্মক শব্দের ক্রিয়াক্রমে ব্যবহার

‘ধ্বন্যাত্মক ক্রিয়া : সাধারণতঃ ‘ইয়া’ বা ‘ইয়ে’ প্রত্যয় বোঝে অস্বাভাবিক। ক্রিয়ারূপেই ইহাদের ব্যবহার। যেমন : মায়ের কথা মনে হতেই খোকনের চোখটুটে ছলছলিয়ে উঠলো। ‘ঢাল তলোয়ার বন্‌বনিয়ে বাজে।’ ‘চড়চড়িয়ে পাহাড় ফাটে।’ ‘গড়ের মাঠে ঘোড়ার গাড়ি গড়গড়িয়ে যায়।’ খড়খড়টার পাশে তার বুকটা ধড়কড়িয়ে উঠলো। ভিড় ঠেলে তড়বড়িয়ে এগিয়ে গেলাম। আকাশ কড়কড়িয়ে একেবারে থেমে গেল। ‘দুধের চাঁছি শুবছে মাছি, উড়ছে কতক ভন্‌ভনিয়ে।’ ‘ঘুরছে লাঠি বন্‌বনিয়ে।’ ‘যাচ্ছে কারা হন্‌হনিয়ে।’

### ● ধ্বন্যাত্মক শব্দের বিশেষ্যরূপে ব্যবহার

ধ্বন্যাত্মক বিশেষ্য : ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি মূলতঃ অব্যয় ; বিশেষ্যরূপেও ইহাদের প্রয়োগ দেখা যায়। তখন ইহাদের ধ্বন্যাত্মক বিশেষ্য বলা হয়। যেমন : তোমাদের কচকচি [ একটানা তর্ক-বিতর্ক ] আমার আর ভালো লাগে না। তোমার লেখার কটমটি [ ছবোধাতা ] এখনও যায়নি। বাজের কড়কড়ানি, বড়ের শন্‌শনানি আর পাতার ধস্‌ধসানি শুনে বৃকের খুঁকখুকানি বেড়েই চললো। ‘শালিকরা সব মিহিমিছি লাগিয়ে দেবে কিচিমিচি [কলরব]।’ ‘এঙিনের ধক্‌ধকি [ ধক্‌ধক্‌ শব্দ ] সব গেল পেমে।’ দূর থেকে অঙ্কের সন্‌সন্‌নি শোনা যেতে লাগলো। ছোট্ট মেয়ে একলা বসে বাজায় কুমকুমি।

এই ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি বাংলার সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব সম্পদ। ইহাদের কোনও আভিধানিক অর্থ নাই ; এমন-কি, ব্যুৎপত্তিগত অর্থের অন্বেষণও নিরর্থক। তবু বাক্যলীর অস্থত্বতির এমন নিখুঁত অত্ববাদ, এমন সঠিক প্রকাশ অল্প কিছুতেই সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ তাই বলিয়াছেন—‘এই ধ্বনিগুলির সঙ্গে অস্থত্বতির কোনও শব্দগত সাদৃশ্য নেই, তবু এই নিরর্থক শব্দগুলির দ্বারা অস্থত্বতির যেমন স্পষ্ট ধারণা হয়, এমন আর কিছুতেই হতে পারে না।’

### ॥ অনুসরণী ॥

- \*১. উদাহরণ সহকারে পরিভাষাগুলি ব্যাখ্যা কর : ধ্বন্যাত্মক শব্দ, উ. মা. ‘৩১ ; শব্দবৈত, উ. মা. ‘৩২, ‘৩০ ; ধ্বন্যাত্মক বিশেষ্য, উ. মা. ‘৩২ ; ধ্বন্যাত্মক ক্রিয়া, ধ্বন্যাত্মক বিশেষ্য।
২. শব্দবৈত কি প্রকারে গঠিত হয় ? বিভিন্ন প্রকারের শব্দবৈতের উদাহরণ দাও।
৩. অনুকার-ধ্বনিবিশিষ্ট শব্দবৈত কাকে বলে ? উদাহরণ দিয়া বুঝাও।
৪. অর্থ-নির্দেশপূর্বক সার্থক বাক্য রচনা কর : টনটন, কনকন, শনশন, ঝিরঝির, কলমল, কলকল, রিরি, ঝাঝা, ধুধু, চনচন, গনগন, গজগজ, গিস্‌গিস্‌, নিস্‌নিস্‌, টো-টো, তুলতুলে, কটমট, গদগদ, ডগডগ, ত্রিমিত্রিমি, বিন্বিন, টিমটিম, টিপটিপ, মো মো, ভো ভো, কপ্‌কপ্‌, হুন্‌হুন্‌।

৫. অৰ্ধ-পার্শ্বকা বোখাইয়া বাক্য রচনা কর : কলকল, থলথল ; থচ্ থচ্, থট্ থট্, কট্ কট্ ; কচ্ কচ্, কুচ্ কুচ্ ; গড়গড়, গরগর ; থস্ থস্, মসমস্ ; ঘরঘর, ঘুরঘুর ; চনচন, চিন্ চিন্ ; চিকচিক্, ঝিকঝিক্ ; জল্ জল্, জুল্ জুল্ ; বকবক্, বকমক্ ; ঝিরঝির, ঝিরিঝিরি ; বুবুবু, বুরুবুর ; টল্ টল্, টল্ টল্ ; টপ্ টপ্, টপ্ টপ্ ; ঠুনঠুন, ঠুং ঠুং ; ঢপ্ ঢপ্, ঢিপ্ ঢিপ্ ; তক্তক্ত, থকথক্ ; তন্নতন্ন, থন্নথন্ন ; বন্নবন্ন, বরোবরো ; ছড় ছাড়, ছড় ছড় ; ছন্নছন্ন, ছন্নছন্ন ; খড্ খড্, খড্ খড্ ; ফব্ ফব্ ; বো বো, ভো ভো ; মিট্ মিট্, মিটিমিটি ; বিন্ বিন্, বিনিবিনি . লকলক, লট্ লট্ ; বিন্ বিন্, বিনিবিনি ; সডসড, শিরশির ; হাহা, হাঁহাঁ ; হুহুহু, হুহুহু ।

৬. দৃষ্টান্ত দাও : অক্ষরান্বয়ক শব্দবৈত্ত, বিশেষরূপে ক্ষণস্থায়ক শব্দ, বিশেষরূপে ক্ষণস্থায়ক শব্দ, ক্রিয়ারূপে ক্ষণস্থায়ক শব্দ, ব্যক্তিহাব শব্দবৈত্ত, নিপত্তীতার্থক যুগ্মশব্দ, ঐবদ্বর্থে যুগ্মশব্দ, সমার্থক যুগ্মশব্দ, বিভিন্নার্থক যুগ্মশব্দ ।

\*৭. শব্দবৈত্ত বা একই শব্দের দুইবার উচ্চারণ করিলে উহার অর্থের পরিবর্তন ঘটায় বোখাইয়া দাও, মা. '৬৬

৮. বাক্য রচনা কবিয়া অৰ্ধ-পার্শ্বকা বোখাও : মেঘ, মেঘ-মেঘ, জর, জব-জর শীত, শীত শীত . ঠক, ঠক-ঠক . ঢিপ, ঢিপ-ঢিপ . ভোঁ, ভোঁ-ভোঁ ; গৌ, গৌ-গৌ ; চল, চলচল . টপ্, টপ্-টপ্ ; বুট্, বুট্-বুট্ ; ঢং, ঢং-ঢং, রি, রিরি ; ঝন্, ঝন্-ঝন্, ঠা, ঠা-ঠা ; কট্, কট্-কট্ . কুট্, কুট্-কুট্ . ছন, ছন-ছন, শুড়, শুড়-শুড়, শুড়-শুড়, কুচ, কুচ-কুচ ; শৌ, শৌ-শৌ . বন্, বন্-বন্ ; ঝপ্, ঝপ্-ঝপ্ . চট্, চট্-চট্ . থচ্, থচ্, থচ্ . থক, থক-থক . ফিক, ফিক-ফিক ।

পরস্পর-সম্পর্ক-যুক্ত কতকগুলি পদ একত্র সম্মিলিত হইয়া যদি একটি সম্পূর্ণ এবং সঙ্গত অর্থ পরিষ্কৃত করে, তবে তাহাকে বাক্য বলা হয়।

কাজেই, বাক্য একটি পদ-পরিবার। ইহার অন্তর্গত প্রতিটি পদ একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে সম্পর্ক-যুক্ত। সেই বিশেষ উদ্দেশ্যটি হইল একটি সম্পূর্ণ এবং সঙ্গত অর্থ-প্রকাশ। যেমন : 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।' পদগুলি হৃৎসংবদ্ধ এবং পরস্পর-সম্পর্ক-যুক্ত। সেই সঙ্গে অর্থবহ। আবার, একটিমাত্র পদেও বাক্য গঠিত হইতে পারে। যেমন : 'শোনো।' এক্ষেত্রে কতপদ [ 'তুমি' ] উহা আছে। কিন্তু উহা উহা থাকিলেও বক্তা এবং শ্রোতা মনে মনে উহা প্রয়োগ করিয়া সমগ্র বাক্যটির অর্থ উপলব্ধি করিয়া নেয়। আবার, 'দৈনিক তুমি পাখান-ফলকে'—এতগুলি শব্দ ব্যবহার করিয়াও বাক্য হইল না। কারণ, বাক্যের প্রধান যে দুইটি পদ—কর্তা এবং সমাপিকা ক্রিয়া—তাঁহারা এখানে অনুপস্থিত। কাজেই, 'পড়িল' ও 'রক্তলিখা' পদ দুইটি—বাক্যটির বধা নামে সমাপিকা ক্রিয়া ও কর্তা—প্রয়োগ করিলে বাক্যটি সম্পূর্ণ হইল। আবার, কেবল কর্তা আর সমাপিকা ক্রিয়া হইলেই বাক্য হয় না। বাক্যের একটি অর্থ থাকি চাই। শব্দের আছে সেই অর্থ-শক্তি। শব্দের এই অর্থ-শক্তি ত্রিবিধ : সুস্বার্থ, লক্ষ্যার্থ ও ব্যঙ্গার্থ। ইহাদের বধাক্রমে বলা হয় অভিধা, লক্ষণা ও ব্যক্তনা।

**অভিধা :** 'শব্দের যে শক্তি দ্বারা উহার ব্যাকরণ ও অভিধান-সম্বন্ধ মূল অর্থের বোধ হয়,' তাহাকে অভিধা বলে। যেমন : 'কুটিয়াছে সরোবরে কমল-নিকর।' 'সরোবর' এখানে পুষ্করিণী এবং 'কমল-নিকর' অর্থাৎ পরশমহা। পুষ্করিণীতে পরশমহা কুটিয়াছে—ইহাই উহার ব্যাকরণ ও অভিধান-সম্বন্ধ অর্থ; তাহার অতিরিক্ত কিছু নয়।

**লক্ষণা :** আভিধানিক অর্থকে ছাপাইয়া কল্পনার দ্বারা শব্দের যে বিশেষ অর্থ আরোপিত হয়, তাহাকে বলে লক্ষণা। যেমন : 'আমরা বাঙালী বাস করি সেই তীরে বরদ বসে।' বঙ্গদেশকে 'তীর' এবং 'বরদ' কল্পনা করা হইয়াছে।

**ব্যক্তনা :** আভিধানিক ও লক্ষণিক অর্থকে ছাপাইয়া শব্দের যে শক্তি মনের মধ্যে কাব্য-চমৎকারিত্ব সহযোগে সৌন্দর্য্য অন্বেষণের সৃষ্টি করে, তাহাকে বলে শব্দের ব্যক্তনা-শক্তি। যেমন : 'আমার এই দেহটারে তুলে ধরো, তোমার ঐ দেহালয়ের প্রদীপ করো।' [ ভক্তি-পুত ব্যক্তনা ]

বাক্যের আরও তিনটি উল্লেখযোগ্য দিক আছে : বাক্যের যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও আসত্তি।

**যোগ্যতা :** অর্থগত ও ভাবগত মেলবন্ধনকেই যোগ্যতা বলা হয়। যেমন : 'মাতৃব বাঘকে খাইয়াছে।' ব্যাকরণের দিক হইতে ঠিক বাক্য ; কিন্তু অভিজ্ঞতা ও বৌদ্ধিকতার দিক হইতে ইহা বাক্য হইতে পারে নাট। কারণ, যোগ্যতার অভাব।

**আকাঙ্ক্ষা :** বাক্যে যদি শ্রোতার আকাঙ্ক্ষা না মিটে, তবে তাহা বাক্য হয় না। বাক্যের এই গুণকে বলা হয় আকাঙ্ক্ষা। যেমন : বিদ্যাসাগর ছিলেন—ইহাতে কর্তা ও সমাপিকা ক্রিয়া আছে, কিন্তু আরও অনিবার আকাঙ্ক্ষা থাকিয়া যায় ; তাই ইহা বাক্য হয় নাই। ‘বিদ্যাসাগর ছিলেন দয়ার সাগর।’—বলায় ইহা বাক্য হইল।

**আসত্তি :** বাংলায় বাক্যে সাধারণতঃ কর্তা সর্বাগ্রে এবং সমাপিকা ক্রিয়া, সর্বশেষে বসিয়া থাকে। অন্তান্ত পদগুলি বসে মাঝখানে। ‘আছে নামে যন্ত্র এক-রকম অণুবীক্ষণ।’—ইহাতে বাক্যস্থিত পদগুলির স্থান-বিপর্যয় ঘটিয়াছে। অর্থাৎ, বাক্যটিতে আসত্তি নাই। বাক্যের অন্তর্গত পরস্পর-সম্পর্কযুক্ত পদগুলির স্থান-নৈকট্যকে আসত্তি বলা হয়। যেমন, ‘অণুবীক্ষণ নামে একরকম যন্ত্র আছে।’

**উদ্দেশ্য ও বিধেয় :** বাক্যের দুইটি অংশ ; উদ্দেশ্য ও বিধেয়। বাক্যের লক্ষ্য হইল কোন বিষয়ে বা কাহারও বিষয়ে কোন কিছু বলা। বাক্যের যে অংশে কাহ’রও সম্বন্ধে কিছু বলা হয়, তাহাকে উদ্দেশ্য [Subject] বলে। আর, বাক্যের যে অংশে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছু বলা হয়, তাহাকে বলে বিধেয় [Predicate]। ‘অনেক বিলম্বে ইন্দ্র নতুন-দা আসিয়া ঘাটে পৌঁছিলেন।’—বাক্যটিতে ‘ইন্দ্র নতুন-দা’ বিষয়ে বলা হইতেছে। কাজেই, ‘ইন্দ্র নতুন-দা’ অংশটি উদ্দেশ্য। তাহার সম্বন্ধে কি বলা হইতেছে ? না—‘অনেক বিলম্বে আসিয়া ঘাটে পৌঁছিলেন।’—এই অংশটি বিধেয়। উদ্দেশ্য অংশের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পদ হইল কর্তা এবং বিধেয় অংশের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পদ হইল সমাপিকা ক্রিয়া।

### ● বাক্যের গঠন-ভিত্তিক প্রকার-ভেদ

গঠন-অনুসারে বাক্য তিন প্রকার : সরল বাক্য, মিশ্র বা জটিল বাক্য ও বৌগিক বাক্য।

**ক. সরল বাক্য [Simple Sentence] :** যে বাক্যে একটিমাত্র ক্রিয়া নির্দেশিত হয় অর্থাৎ একটিমাত্র সমাপিকা ক্রিয়া থাকে, তাহাকে সরল বাক্য বলে। যেমন : ‘আমি দিবাচকু পেয়েছি।’ ‘তুমি [হও] বসন্তের কোকিল।’ সমাপিকা ক্রিয়া কখনও থাকে বাস্তব, কখনও থাকে উহ।

**খ. মিশ্র বা জটিল বাক্য [Complex Sentence] :** যে বাক্যে থাকে একটি প্রধান [বা স্ব-নির্ভর] বাক্যাংশ এবং এক বা একাধিক অপ্রধান [বা পর-নির্ভর] বাক্যাংশ, তাহাকে বলে মিশ্র বা জটিল বাক্য। বাক্যাংশে একটি কর্তা এবং একটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকে। প্রধান বাক্যাংশ অর্থ-প্রকাশে স্বাধীন বা স্ব-নির্ভর। কিন্তু যে বাক্যাংশ অর্থ-প্রকাশের ব্যাপারে স্বাধীন নয়, অর্থাৎ পর-নির্ভর, তাহাকে বলে অপ্রধান বাক্যাংশ। ‘যে মিথ্যা কথা বলে, তাহাকে কেহ ভালোবাসে না।’—এই বাক্যে দুইটি বাক্যাংশ আছে : ১. ‘যে মিথ্যা কথা বলে’ এবং ২. ‘তাহাকে কেহ ভালোবাসে না।’ ‘যে মিথ্যা কথা বলে’—এই বাক্যাংশ অনন্ত-নির্ভর হইয়া অর্থ-প্রকাশে সমর্থ নয়। তাই ইহা অপ্রধান বাক্যাংশ। কিন্তু, ‘তাহাকে কেহ



ভালোবাসে না।’—এই বাক্যাংশটি অনন্ত-নির্ভর হইয়া অর্থ-প্রকাশে সক্ষম। তাই ইহা প্রধান বাক্যাংশ। অতএব সমগ্র বাক্যটি হইল মিশ্র বা জটিল বাক্য। তেমনি : ‘যদি বারণ কর, তবে গাহিব না।’ ‘মানবাত্মার মহত্ব যে জানে না, স্বাবলম্বন-শক্তি তাহার আসে না।’ বাক্যগুলি মিশ্র বা জটিল বাক্য।

গ. যৌগিক বাক্য [ Compound Sentence ] : দুই বা ততোধিক সরল বা জটিল বাক্য সংযোজক বা বিয়োজক অব্যয়ের দ্বারা সংযুক্ত হইলে সমগ্র বাক্যটিকে যৌগিক বাক্য বলা হয়। যেমন : কাল তুমি আসিবে, নতুবা আমাকে যাইতে হইবে। ‘কাল তুমি আসিবে’ এবং ‘আমাকে যাইতে হইবে—দুইটি স্বাধীন সরল বাক্য। ইহার ‘নতুবা’ এই বিয়োজক অব্যয়ের দ্বারা যুক্ত হইয়াছে। কাজেই, ইহা যৌগিক বাক্যের উদাহরণ। তেমনি : ‘তাহার মুখ অত্যন্ত পাতুর, কিন্তু চোখটো জলিতে লাগিল।’ সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল এবং যথাসময়ে কলেজে ভর্তি হইল।

### ● বাক্যের অর্থ-ভিত্তিক প্রকার-ভেদ

অর্থানুযায়ী বাক্য অনেক প্রকার হইতে পারে। যেমন : নির্দেশক বাক্য, প্রশ্নবোধক বাক্য, অনুজ্ঞাবাচক বাক্য, বিষয়বোধক বাক্য, ইচ্ছাবোধক বাক্য ইত্যাদি।

১. নির্দেশক বাক্য [ Indicative Sentence ] : যে বাক্যে কোন ঘটনা বা ভাবের বিবৃতি থাকে, তাহাকে নির্দেশক বাক্য বলা হয়। যেমন : ‘শীতের সকালে রাস্তা দিয়া খেজুর রস হাঁকিয়া যাইতেছে।’ ‘একটা বিশেষ দিন সাতসমুদ্রপারের রাজপুত্রের মতো আসিয়া উপস্থিত হয়।’

নির্দেশক বাক্য আবার দুই প্রকার : অস্ত্যর্থক বাক্য ও নাস্ত্যর্থক বাক্য।

ক. অস্ত্যর্থক বাক্য [ Affirmative Sentence ] : যে বাক্যে ঘটনা বা ভাব বিবৃতির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাকে অস্ত্যর্থক বাক্য বলে। যেমন : ভগবান বুদ্ধ পৃথিবীকে শাস্তির বাণী শুনাইয়া গিয়াছেন।

খ. নাস্ত্যর্থক বাক্য [ Negative Sentence ] : যে বাক্যে কোন ভাবের অস্তিত্ব বিবৃতির মাধ্যমে অস্বীকৃত হয়, তাহাকে নাস্ত্যর্থক বাক্য বলে। যেমন : ভারতবর্ষ রাজ্য লইয়া মারামারি করে নাই।

২. প্রশ্নবোধক বাক্য [ Interrogative Sentence ] : যে বাক্যে কোন ঘটনা বা ভাব সম্পর্কে কোনরূপ জিজ্ঞাসা থাকে, তাহাকে প্রশ্নবোধক বাক্য বলে। যেমন : ‘হিন্দু না ওরা মুসলিম ?—ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন ?’ ‘কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক ?—কে বলে তা বহুদূর ?’ ‘তাজমহলের পাথর দেখেছ ? দেখিয়াছ তার প্রাণ ?’ ‘তুমি কি দেখেছ তাকে ? আমাদের বুড়ি ঠাকুমাাকে ?’

৩. অনুজ্ঞাবাচক বাক্য [ Imperative Sentence ] : যে বাক্যে আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, প্রার্থনা বা নিষেধ ইত্যাদি বুঝায়, তাহাকে অনুজ্ঞাবাচক বাক্য বলে। যেমন : এগিয়ে চল। বৃথা সময় নষ্ট করিও না। ‘আয় আমাদের অঙ্গনে অতিথি বালক তরুদল।’ ‘ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে কেলে আগুন জালো।’

৪. **বিস্ময়বোধক বাক্য** [ Interjective Sentence ] : যে বাক্যে মনের হুঃখ, আনন্দ ইত্যাদি আবেগ বা উচ্ছ্বাস প্রকাশিত হয়, তাহাকে বিস্ময়বোধক বাক্য বলে। যেমন : আহা, কী দেখিলাম ! অহো, কী স্পর্শ ! কী আশ্চর্য ! কী স্তম্ভ ! কী চমৎকার !

৫. **ইচ্ছাবোধক বাক্য** [ Optative Sentence ] : যে বাক্যে মনের শুভ বা অন্তঃ ইচ্ছা প্রকাশিত হয়, তাহাকে ইচ্ছাবোধক বাক্য বলে। যেমন : তোমার কল্যাণ হোক। 'তোমারি হউক জয়।' 'বেন তে-রাস্তির না পোহায় !'

## অর্থের ভিত্তিতে বাক্যের রূপান্তর

### ● এক. অন্ত্যর্থক বাক্য হইতে নাস্ত্যর্থক বাক্য :

১. 'তিনি সচ্চরিত্র ব্যক্তি।' > 'তিনি অসচ্চরিত্র ব্যক্তি নন।' ২. 'মানিকতলায় অনেক পোড়ো বাগান আছে।' > 'মানিকতলায় পোড়ো বাগানের অভাব নাই।' ৩. 'দৈন্য জিনিসটাকে আমি ছোটো বলি।' > 'দৈন্য জিনিসটাকে আমি বড়ো বলি না।' ৪. 'ইংরাজি ভাষাটা আমাদের অতি মাত্রায় বিজাতীয় ভাষা।' > 'ইংরাজি ভাষাটা আমাদের অল্প মাত্রায়ও জাতীয় ভাষা নহে।' ৫. 'জয়সিংহ অনন্তমনস্ক ছিলেন।' > 'জয়সিংহ অনন্তমনস্ক ছিলেন না।' ৬. 'প্রতিভা যে দেবদত্ত, একথা আংশিক সত্য।' > 'প্রতিভা যে দেবদত্ত, একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়।' ৭. 'তাকে শিয়ালে খাইয়াছে।' > 'তাকে শিয়ালে না খাইয়া ছাড়ে নাই।' ৮. 'এখানে সব জিনিসই যেমন দুগ্ধ, তেমনি দুগ্ধ।' > 'এখানে কোন জিনিসই যেমন স্থলভ নয়, তেমনি সস্তাও নয়।' ৯. 'এ রস রসজ্জেরই উপভোগ্য।' > 'রসজ্জ ব্যতীত এ রস অন্য কাহারও উপভোগ্য নয়।' ১০. 'উপায়ান্তর না থাকিলে দেশান্তরেই বাইতে হইবে।' > 'উপায়ান্তর থাকিলে দেশান্তরে বাইতে হইবে না।' ১১. 'পরীক্ষার্থীদের মধ্যে স্থূল অল্পতম।' > 'অল্প কোন পরীক্ষার্থী স্থূল অপেক্ষা অল্পতম নয়।' ১২. 'ইংরেজি না জানিলে কোন কোন আধুনিক কবিতার অর্থ বুঝা কঠিন।' > 'ইংরেজি জানিলে কোন কোন আধুনিক কবিতার অর্থ বুঝা কঠিন নয়।'

### ● দুই. নাস্ত্যর্থক বাক্য হইতে অন্ত্যর্থক বাক্য :

১. 'সত্যের নাহি পরাজয়।' > 'সত্যের জয় আছেই।' ২. 'আমি তাহাকে বিশ্বাস করি না।' > 'আমি তাহাকে অবিশ্বাস করি।' ৩. 'তাকে দেখেছে বলবার লোক তখন বিস্তর ছিল, যেনে নেবার লোকও কম ছিল না।' > 'তাকে দেখেছে বলবার লোক তখন বিস্তর ছিল, যেনে নেবার লোকও ছিল বহু।' ৪. 'বাহা হউক, তথাপি কথটা নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক হয় নাই।' > 'বাহা হউক, তথাপি কথটা মোটামুটি প্রাসঙ্গিক হইয়াছে।' ৫. 'কোনও দোকানদারই সেই থালা কিনিতে সম্মত হইল না।' > 'সব দোকানদারই সেই থালা কিনিতে অসম্মত হইল।' ৬. 'স্বষ্টিকর্তা যে কাহারও প্রতি পক্ষপাতী হইয়া তাহাকে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন করিয়াছেন, ইহা সম্ভব নহে।' > 'স্বষ্টি-

কর্তা যে কাহারও প্রতি পক্ষপাতী হইয়া তাহাকে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন করিয়াছেন, ইহা অসম্ভব। ৭. 'যত্নপূর্বক অধ্যয়ন না করলে সবগুলি হইতে পর্যাপ্ত উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায় না।' > যত্নপূর্বক অধ্যয়ন করিলে সবগুলি হইতে পর্যাপ্ত উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৮. 'হজুর, আমি মিথ্যে কথা জীবনে বলি নি আর কখনো বলবও না।' > হজুর, আমি সত্য কথাই জীবনে বলি আর সব সময় বলবও। ৯. 'পাষণ প্রতিমা বিচলিত হইল না।' > পাষণ প্রতিমা অবিকল রহিল। ১০. 'অন্য দিকে মন দিলে আমার শিক্ষাদানে কোন ফল হইবে না।' > অন্যদিকে মন না দিলে আমার শিক্ষাদানে ফল হইবে। ১১. 'মাছ পাওয়া যায় তো তেল পাওয়া যায় না।' > মাছ হয়তো পাওয়া যায়, কিন্তু তেল পাওয়া কঠিন। ১২. 'এ আমাদের গোচর ছিল না।' > এ আমাদের আগোচর ছিল।

### ● তিন. অস্বার্থক বাক্য হইতে প্রশ্নবোধক বাক্য :

১. 'এই দেশে বুদ্ধ, চৈতন্য, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।' > এই দেশে কি বুদ্ধ, চৈতন্য, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন নাই? ২. 'পাশ্চাট্য দিনে দিনে দম্ভরমত আধমরা হইয়া আসিল।' > পাশ্চাট্য কি দিনে দিনে দম্ভরমত আধমরা হইয়া আসিল না? ৩. 'কাল রাত্তির থেকে মেঘের কামাই নাই।' > কাল রাত্তির থেকে কি মেঘের কামাই আছে? ৪. 'রজনন্দিনী গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলেন।' > রজনন্দিনী কি গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলেন না? ৫. 'খেলাটার চেয়ে এই জায়গাটার প্রতি আমার টান বেশি ছিল।' > খেলাটার চেয়ে এই জায়গাটার প্রতি আমার টান কি বেশি ছিল না? ৬. 'যত্নশীলই রত্নলাভে অধিকারী।' > যত্নশীলই কি রত্নলাভে অধিকারী নয়? ৭. 'প্রতিভা শিক্ষা-নিরপেক্ষ দেবদত্ত শক্তি।' > প্রতিভা কি শিক্ষা-নিরপেক্ষ দেবদত্ত শক্তি নয়? ৮. 'নবকুমারকে ব্যাঘ্রে হত্যা করিয়াছে।' > নবকুমারকে কি ব্যাঘ্রে হত্যা করে নাই? ৯. 'পিপাসিত জন যেমন সরোবর দেখতে চায়, রাম সেইরূপ এঁকে দেখবার জগৎ উৎকণ্ঠিত হয়ে আছেন।' > পিপাসিত জন যেমন সরোবর দেখতে চায়, রাম সেইরূপ এঁকে দেখবার জগৎ কি উৎকণ্ঠিত হয়ে নেই? ১০. 'পাগলা কুর কামড়ালে জলাতঙ্ক রোগ দেখা দেয়।' > পাগলা কুর কামড়ালে কি জলাতঙ্ক রোগ দেখা দেয় না? ১১. 'ভাবপ্রবণতা আছে আমাদের দেশে অতি পরিমাণে।' > আমাদের দেশে কি অতি পরিমাণে ভাবপ্রবণতা নেই? ১২. 'পরীক্ষার্থীদের মধ্যে স্থূল অল্পতম।' > পরীক্ষার্থীদের মধ্যে কি স্থূল অল্পতম নয়?

### ● চার. প্রশ্নবোধক বাক্য হইতে অস্বার্থক বাক্য :

১. 'আমি কি তাহার বংশ-পরিচয় জানি না?' > আমি তাহার বংশ-পরিচয় জানি। ২. 'তুই আমার মুণ্ড নিবি না তো কে নেবে?' > তুইই তো আমার মুণ্ড নিবি। ৩. 'ব্রহ্ম কাহার না হয়?' > ব্রহ্ম সকলেরই হয়। ৪. 'এ সব অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হচ্ছে না কি?' > এ সব অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হচ্ছে। ৫. 'বাংলাদেশে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম কে

শোনে নাই ? >বাংলাদেশ দৈনন্দিন বিজ্ঞানসাগর মহাশয়ের নাম সকলেই শুনিয়াছে।

৬. গান এবং ফুল কে না ভালোবাসে ? >গান এবং ফুল সকলেই ভালোবাসে। ৭. টাকায় কী না হয় ? >টাকায় সবই হয়। ৮. স্বাধীনতা কার না কাম্য ? >স্বাধীনতা সকলেরই কাম্য। ৯. তাহার সম্পর্কে কি আমি কিছুই জানি না ? >তাহার সম্পর্কে আমি সবই জানি। ১০. রবীন্দ্রনাথ কি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি নন ? >রবীন্দ্রনাথ ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। ১১. দেশকে ভালোবাসিয়া শত শহীদ কি জীবন উৎসর্গ করে নাই ? >দেশকে ভালোবাসিয়া শত শহীদ জীবন উৎসর্গ করিয়াছে। ১২. ভারতীয় সভ্যতা কি পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা নয় ? >ভারতীয় সভ্যতা পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা।

### ● পাঁচ. অন্ত্যর্থক বাক্য হইতে অনুজ্ঞাবাচক বাক্য :

১. প্রত্যহ মন দিয়া লেখাপড়া করা উচিত। >প্রত্যহ মন দিয়া লেখাপড়া করিও। ২. তোমার সেখানে যাওয়া কর্তব্য। >তুমি সেখানে যাও। ৩. তোমার একবার এখানে আসা উচিত। >তুমি একবার এখানে এস। ৪. নিজেকে জানা কর। >নিজেকে জানো। ৫. সদা সত্যকথা বল। >সদা সত্যকথা বলিবে। ৬. দরিদ্রের সেবা করা কর্তব্য। >দরিদ্রের সেবা করিবে। ৭. সশস্ত্রে আমার অনুসরণ করা উচিত। >‘সশস্ত্রে আমার অনুসরণ করো।’ ৮. ইহাদের দুই জনকে বন্দী করা কর্তব্য। >‘ইহাদের দুজনকে বন্দী করো।’ ৯. রঘুপতির কাছ হইতে তোমার দূরে থাকা উচিত। >‘রঘুপতির কাছ হইতে দূরে থাকিও।’ ১০. [তোমার] এ স্থান ত্যাগ করা উচিত। >এ স্থান ত্যাগ করো। ১১. তাকে দেশ থেকে দূর করে দেওয়া দরকার। >তাকে দেশ থেকে দূর করে দাও। ১২. ‘দূর করে দিচ্ছ তোর।’ >দূর হয়ে যা।

### ● ছয়. নির্দেশক বাক্য হইতে বিস্ময়বোধক বাক্য :

১. সত্য সেলুকাস, এই দেশ বড় বিচিত্র। >‘সত্য সেলুকাস, কী বিচিত্র এই দেশ!’ ২. দৃশ্যটি অতীব করুণ। >দৃশ্যটি কী করুণ! ৩. ভারি চমৎকার চিত্র। >কী চমৎকার চিত্র! ৪. ইহা ভারি লজ্জার কথা। >কী লজ্জার কথা! ৫. ইহা অত্যন্ত ঘৃণার কথা। >কী ঘৃণার কথা! ৬. ছেলেটি খুব দরিদ্র। >ছেলেটি কী দরিদ্র! ৭. শিশুটির মৃত্যু-দৃশ্য অত্যন্ত শোকাবহ। >শিশুটির মৃত্যু-দৃশ্য কী শোকাবহ! ৮. সেই গল্পটি অত্যন্ত চমৎকার। >কী চমৎকার সেই গল্পটি! ৯. এই গানটি অত্যন্ত করুণ। >কী করুণ এই গানটি! ১০. দৃশ্যটি ঝরঝরনাই ভয়াবহ। >দৃশ্যটি কী ভয়াবহ! ১১. বাহা দেখিলাম, ভারি সুন্দর। >‘আহা, কী দেখিলাম!’ ১২. সেই ত্যাগের মহিমা অতি অপূর্ব। >কী অপূর্ব সেই ত্যাগের মহিমা!

### ● সাত. বিস্ময়বোধক বাক্য হইতে নির্দেশক বাক্য :

১. কী অপূর্ব দৃশ্য! >দৃশ্যটি বড়ই অপূর্ব। ২. ত্যাগের কী অপূর্ব মহিমা! >ত্যাগের এই মহিমা অপূর্ব। ৩. কী সুন্দর! >ইহা সুন্দর বটে। ৪. কী ভয়ংকর! >ইহা ভয়ংকর। ৫. কী প্রচণ্ড বেগেই না ঝড় বহিতেছিল! >অত্যন্ত প্রচণ্ড বেগে ঝড় বহিতেছিল। ৬. আহা, কী রমণীয় দৃশ্য! >দৃশ্যটি অতীব রমণীয়। ৭. ‘কী

ভয়ানক লড়াই হলো যা বে!> যা, খুব ভয়ানক লড়াই হলো। ৮. 'আজ কী আনন্দ!> আজ খুব আনন্দ। ৯. কী মিষ্টি সেই বাশির হুর!>সেই বাশির হুর ভারি মিষ্টি। ১০. কী লোমহর্ষক কাণ্ড!>কাণ্ডটি অত্যন্ত লোমহর্ষক। ১১. তাহার মুখখানি কী করুণ!>তাহার মুখখানি অত্যন্ত করুণ। ১২. কী অকৃতজ্ঞতা!>[ ইহা ] অতীব অকৃতজ্ঞতা।

## গঠনের ভিত্তিতে বাক্যের রূপান্তর

### ● এক সরল বাক্য হইতে মিশ্র বা জটিল বাক্য :

১. 'এ সংসারে কোনো দরকারি কাজে আমার হাত ছিল না।' >এ সংসারে যে কাজ দরকারি, তাতে আমার হাত ছিল না। ২. 'বন্দুক থাকলে মোকাবিলা করা যেত।' >যদি বন্দুক থাকতো, তাহলে মোকাবিলা করা যেত। ৩. 'সে সামনের দু' পা তুলে উঠতেই দিলুম তার গলায় কাস আটকিয়ে।' >সে যেই সামনের দু' পা তুলে উঠেছে, অমনি দিলুম তার গলায় কাস আটকিয়ে। ৪. 'রঘুপতি অরণ্য হইতে বাহির হইবামাত্র দুর্গ-প্রাকারের উপরে সৈন্তরা সচকিত হইয়া উঠিল।' >রঘুপতি যেইমাত্র অরণ্য হইতে বাহির হইলেন, অমনি দুর্গ-প্রাকারের উপরে সৈন্তরা সচকিত হইয়া উঠিল। ৫. 'ভালো করিয়া দেখিতে গেলে শিশুর মতো পুরাতন আর কিছুই নাই।' >যদি ভালো করিয়া দেখি, তবে শিশুর মতো পুরাতন আর কিছুই নাই। ৬. 'অবশেষে অস্ত্র উপায় না দেখিয়া দুর্গা ধূপ দীপ নৈবেদ্য লইয়া ধ্যানে বসিলেন।' >অবশেষে যখন দুর্গা অস্ত্র উপায় দেখিলেন না, তখন তিনি ধূপ দীপ নৈবেদ্য লইয়া ধ্যানে বসিলেন। ৭. 'গুহার ভিতরে বৃষ্টির ধারার বেগে স্বাভাবিক ঐচ্ছিক কারুকর্ম দেখিয়া আমরা আশ্চর্য হইলাম।' >গুহার ভিতরে যখন বৃষ্টির ধারার বেগে স্বাভাবিক বিচিত্র কারুকর্ম দেখিলাম, তখন আমরা আশ্চর্য হইলাম। ৮. 'সাক্ষীর বাক্যের মধ্যে উঠিয়া বুড়া বুদ্ধি ঠিক রাগিতে পারে নাই।' >বুড়া যখন সাক্ষীর বাক্যের মধ্যে উঠিল, তখন সে বুদ্ধি ঠিক রাগিতে পারে নাই। ৯. 'নবদীপচন্দ্র যে দলিল দাখিল করিয়াছিল, তাহা মিথ্যা।' >নবদীপচন্দ্র যে দলিল দাখিল করিয়াছিল, তাহা মিথ্যা। ১০. 'পোস্ট মাস্টার চলে গেলে সেই রাতে আবার রঘুবংশ নিয়ে পড়লুম।' <পোস্ট মাস্টার যখন চলে গেলেন, তখন সেই রাতে আবার রঘুবংশ নিয়ে পড়লুম।

### ● দুই. মিশ্র বা জটিল বাক্য হইতে সরল বাক্য :

১. 'ইন্ডের যেমন ঐরাবত আমার তেমন পদ্মা।' >ইন্ডের ঐরাবতের মতো আমার পদ্মা। ২. 'মাস্তুল যেমন এক পাক ঘুরছে অমনি সকলের আনন্দে উচ্ছাস।' >মাস্তুল এক পাক ঘুরলেই সকলের আনন্দে উচ্ছাস। ৩. 'মাঝিরা যদি আপনাদের মধ্যে মন খুলে হাসি গল্প করে সেটা তারা রাজার প্রতি অসম্মান জান করে।' >মাঝিরা আপনাদের মধ্যে মন খুলে হাসি গল্প করলে সেটা তারা রাজার প্রতি অসম্মান জান করে। ৪. 'আমাদের দেশে গায়া বজ্রহাতে ইন্দ্রপদে বলিয়া আছে ঐদের সহস চকু।' >আমাদের দেশে বজ্রহাতে ইন্দ্রপদে আসীন ব্যক্তিদের সহস চকু। ৫.

‘আমাদের জাতির মুক্তি যদি পার্শ্বের দিকে না থাকে তবে উপরের দিকে আছেই।’  
 > আমাদের জাতির মুক্তি পার্শ্বের দিকে না থাকলে উপরের দিকে আছেই।  
 ৬. যখন রাত্রি প্রভাত হয় তখন পাখিরা গান গাহিয়া উঠে। > রাত্রি প্রভাত হইলে পাখিরা গান গাহিয়া উঠে। ৭. যতদিন জীবন থাকিবে, ততদিন পরের দাসত্ব করিব না। > জীবন থাকিতে পরের দাসত্ব করিব না। ৮. ‘যখন কপাট টেনে দেওয়া হতো, কলকল করে বরনার মতো জল ফেনিয়ে পড়ত। ৯ ‘আমরা যখন ছোটো ছিলুম সন্ধ্যাবেলায় কলকাতা শহর এখনকার মতো এত বেশি সজাগ ছিল না।’ > আমাদের ছোটো বেলায় সন্ধ্যাবেলায় কলকাতা শহর এখনকার মতো এত বেশি সজাগ ছিল না। ১০. ‘এখনকার কালে সূর্যের আলোর দিনটা যেমন ফুরিয়েছে অমনি শুক হয়েছে বিজলি আলোর দিন।’ > এখনকার কালে সূর্যের আলোর দিনটা ফুরোতেই শুক হয়েছে বিজলি আলোর দিন।

### ● তিন. সরল বাক্য হইতে যৌগিক বাক্য :

১. দরিদ্র হইলেও লোকটি সং। > লোকটি দরিদ্র, কিন্তু সং। ২. সত্য কথা স্বীকার না করিলে শাস্তি পাইবে। > সত্য কথা স্বীকার কর, নতুবা শাস্তি পাইবে। ৩. ‘কামাল নিরস্ত্র হয়ে বোকার মতো ঠাঁড়িয়ে আছে।’ > কামাল নিরস্ত্র হয়েছে এবং বোকার মতো ঠাঁড়িয়ে আছে। ৪. ‘সমুদ্রে পতিত হইয়াও বারিবিদ্যুৎগণের বিশ্রাম নাই।’ > বারিবিদ্যুৎগণ সমুদ্রে পতিত হয়, কিন্তু তবুও তাহাদের বিশ্রাম নাই। ৫. ‘এখন ভাগীরথী-তীরে বসিয়া তাহার কুলকুল ধনি শ্রবণ করি।’ > এখনও ভাগীরথী-তীরে বসি এবং তাহার কুলকুল ধনি শ্রবণ করি। ৬. ‘অপু এক দোড়ে ফটক পার হইয়া রাস্তার উপর আসিয়া উঠিল।’ > অপু এক দোড়ে ফটক পার হইল এবং রাস্তার উপর আসিয়া উঠিল। ৭. ‘তুমি গেলে তোমার ঘর সামলাবে কে?’ > তুমি যাবে, কিন্তু তোমার ঘর সামলাবে কে? ৮. ‘নক্ষত্র রায়কে সঙ্গে লইয়া মহারাজ পদব্রজে অরণ্যের দিকে চলিলেন।’ > নক্ষত্র রায়কে মহারাজ সঙ্গে লইলেন এবং পদব্রজে অরণ্যের দিকে চলিলেন। ৯. প্রাসাদের পথে না গিয়ে রাজা মন্দিরের দিকে গেলেন। > রাজা প্রাসাদের দিকে গেলেন না, গেলেন মন্দিরের দিকে। ১০. ‘হিন্দুরা বিশ্বনের অনাসক্ত পরহিঁতবণা দেখিয়া তাঁহাকে ঘৃণা বা নিন্দা করিতে যেন সাহস করিল না।’ > হিন্দুরা বিশ্বনের অনাসক্ত পরহিঁতবণা দেখিল কিন্তু তাঁহাকে ঘৃণা বা নিন্দা করিতে সাহস করিল না।

### ● চার. যৌগিক বাক্য হইতে সরল বাক্য :

১. তিনি ধনী ছিলেন, কিন্তু সুখী ছিলেন না। > তিনি ধনী হইয়াও সুখী ছিলেন না। ২. আমি অত্যন্ত দুর্বল, তাই আমি কোন কাজ করিতে পারিতেছি না। > অত্যন্ত দুর্বলতাবশতঃ আমি কোন কাজ করিতে পারিতেছি না। ৩. ‘হিম-নিবারণ-জন্ত সন্মুখে আবরণ দেওয়া ছিল, এমনকি নৌকার ভিতর হইতে আরোহীরা এ-সকল বিষয় কিছুই জানতে পারেন নাই।’ > হিম-নিবারণ-জন্ত সন্মুখে আবরণ দেওয়া থাকায়

নৌকার ভিতর হইতে আরোহীরা এ-সকল বিষয় কিছুই জানিতে পারেন নাই। ৪. 'তুমি অধম—তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?' > তুমি অধম বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন? ৫. 'বারিকগাগণই বৃষ্টিরূপে পৃথিবী ধৌত করিতেছে, এবং মৃত ও পরিত্যক্ত দ্রব্য বহন করিয়া সমুদ্র-গর্ভে নিক্ষেপ করিতেছে।' > বারিকগাগণই বৃষ্টিরূপে পৃথিবী ধৌত করিয়া মৃত ও পরিত্যক্ত দ্রব্য বহন করিয়া সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিতেছে। ৬. 'আমাদের এক চাকর ছিল, তাহার নাম শ্রাম।' > শ্রাম নামে আমাদের এক চাকর ছিল। ৭. 'ছুঁচোর গোলাম চামচিকে, তাঁর মাইনে চোদ্দ সিকে।' > চাম চকে ছুঁচোর চোদ্দ সিকে মাইনের গোলাম। ৮. 'ইউরোপীয়দের আমরা যতই নিন্দা করি না, অনেক বিষয়ে তাহারা খাটি মাতুষ।' > আমাদের নিন্দা সত্ত্বেও ইউরোপীয়রা অনেক বিষয়ে খাটি মাতুষ। ৯. 'নেশায় শরীরের শক্তি যায়, কিন্তু গুরুর কাছে শেখা বিত্তে তো যায় না।' > নেশায় শরীরের শক্তি গেলেও গুরুর কাছে শেখা বিত্তে যায় না। ১০. 'আমাদের দেহ সাড়ে তিন হাতের মধ্যে বন্ধ, কিন্তু তাই বলিয়া ঠিক সেই সাড়ে তিন হাত পরিমাণ গৃহ নির্মাণ করা চলে না।' > আমাদের দেহ সাড়ে তিন হাতের মধ্যে বন্ধ বলিয়া ঠিক সেই সাড়ে তিন হাত পরিমাণ গৃহ নির্মাণ করা চলে না।

### ● পাঁচ. মিশ্র বা জটিল বাক্য হইতে যৌগিক বাক্য :

১. যদি সংপথে থাকিয়া পরিশ্রম কর, তবে তোমার ভবিষ্যতে ভালো হইবে। > সংপথে থাকিয়া পরিশ্রম কর, ভবিষ্যতে তোমার ভালো হইবে। ২. যদিও ভালো বৃষ্টি হইয়াছে, তথাপি ভালো শস্য ফলিবার তেমন সম্ভাবনা নাই। > ভালো বৃষ্টি হইয়াছে কিন্তু ভালো শস্য ফলিবার তেমন সম্ভাবনা নাই। ৩. 'আমরা যখন ছোটো ছিলাম তখন সন্ধ্যাবেলায় কলকাতা শহর এখনকার মতো এত বেশি সজাগ ছিল না।' > আমরা তখন ছোটো ছিলাম, আর সন্ধ্যাবেলায় কলকাতা শহরও এখনকার মতো এত বেশি সজাগ ছিল না। ৪. 'যে বাঘের কবলে পড়েছিলেন বলে আমাদের চমক লাগিয়েছিলেন, সে বাঘের মুখ থেকে তিনি কামড় পাননি।' > তিনি এক বাঘের কবলে পড়েছিলেন বলে আমাদের চমক লাগিয়েছিলেন, কিন্তু সে বাঘের মুখ থেকে তিনি কামড় পাননি। ৫. 'বিঘ্ননাথ শিকারী একদিন খবর দিল, শিলাইদহের জঙ্গলে বাঘ এসেছে।' > শিলাইদহের জঙ্গলে বাঘ এসে এবং বিঘ্ননাথ শিকারী একদিন সেই খবর দিল। ৬. 'পরদিবস প্রাতঃকালে সেই পর্বতশ্রেণীর মধ্যে যে পর্বত বনাকীর্ণ, সেই পর্বতের পথ দিয়া নিয়ে পদব্রজেই আরোহণ করিতে লাগিলাম।' > সেই পর্বতশ্রেণীর মধ্যে একটি বনাকীর্ণ পর্বত ছিল, এবং [আমি] সেই পর্বতের পথ দিয়া নিয়ে পদব্রজেই আরোহণ করিতে লাগিলাম। ৭. 'সকাল হইতে দেখিতাম, প্রতিবেশীরা একে একে স্নান করিতে আসিতেছে।' > সকাল হইতে প্রতিবেশীরা একে একে স্নান করিতে আসিত, আর আমি দেখিতাম। ৮. 'যে ভাবরাজ্যে তিনি সঞ্চরণ করতেন, সেখানে তাঁর জীবন পূর্ণ হত প্রতিক্ষণে প্রকৃতির রসভাণ্ডার থেকে।' > তিনি এক ভাবরাজ্যে সঞ্চরণ করতেন এবং সেখানে তাঁর জীবন পূর্ণ হত প্রতিক্ষণে প্রকৃতির রসভাণ্ডার থেকে।

৯। ‘বিজ্ঞানাগরের উন্নত হৃদয় চরিত্রে বাহা মেরুদণ্ড, সাধারণ বাঙালির চরিত্রে তাহার একান্তই অসম্ভাব।’ > বিজ্ঞানাগরের উন্নত হৃদয় চরিত্রে ছিল একটি মেরুদণ্ড, কিন্তু সাধারণ বাঙালির চরিত্রে তাহার একান্তই অসম্ভাব। ১০. ‘তাহার পরদিন যখন জয়সিংহ মন্দিরে ফিরিয়া আসিলেন তখন পূজার সময় অতীত হইয়া গিয়াছে।’ > তাহার পরদিন জয়সিংহ মন্দিরে ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু তখন পূজার সময় অতীত হইয়া গিয়াছে।

### ● ছয়. বৌগিক বাক্য হইতে মিশ্র বা জটিল বাক্য :

১. সে দরিদ্র বটে, কিন্তু আত্মসম্মান হারায় নাই। > যদিও সে দরিদ্র, তথাপি সে আত্মসম্মান হারায় নাই। ২. তোর ডাক শুনে কেউ না আসুক, একলা চলো রে। > ‘যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে’। ৩. ‘উত্তনে যেন জলা কাঠ নিভেছে তবু কয়লায় রয়েছে আগুন।’ > যদিও উত্তনে জলা কাঠ নিভেছে, তথাপি কয়লায় রয়েছে আগুন। ৪. ‘তার পরেকার খবর তলিয়ে গেছে জলের তলায়, তুলে আনতে দেরি হবে।’ > তার পরেকার যে খবর তা তলিয়ে গেছে জলের তলায়, তাকে তুলে আনতে দেরি হবে। ৫. ‘কাব্য মাজিক হতে পারে, কিন্তু সমালোচনা লজিক হতে বাধ্য।’ > যদিও কাব্য মাজিক, তবু সমালোচনা লজিক হতে বাধ্য। ৬. এমন-কি তিনি হিতৈষণাবলে অনেক কাজ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার অনেকই আধুনিক সমাজতত্ত্ব মঞ্জুর করিবে না। > ‘এমন-কি তিনি হিতৈষণাবলে যে সকল কাজ করিয়াছেন তাহার অনেকই আধুনিক সমাজতত্ত্ব মঞ্জুর করিবে না।’ ৭. তিনি ঠিক বাঙালিটি হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন এবং শেষ দিন পর্যন্ত বাঙালিটিই ছিলেন। > তিনি ঠিক যেমন বাঙালিটি হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, শেষদিন পর্যন্ত তেমনি বাঙালিটিই ছিলেন। ৮. তুমি এখানে থাক আর আমার সেখানকার কার্য অসম্পূর্ণ হউক। > তুমি যদি এখানে থাক, তাহা হইলে আমার সেখানকার কার্য অসম্পূর্ণ হইবে। ৯. ধর্ম স্বয়ং দ্বারে আসিয়া আস্তান করিতেছেন এবং আপনি তাঁহাকে অবহেলা করিবেন না। > ‘ধর্ম যখন স্বয়ং দ্বারে আসিয়া আস্তান করিতেছেন তখন তাঁহাকে অবহেলা করিবেন না।’ ১০. ‘ছাত্রের অভাব না ঘটুক, কিন্তু সরঞ্জামের অভাব না ঘটে।’ > যদি ছাত্রের অভাব ঘটেও, তবুও সরঞ্জামের অভাব ঘেন না ঘটে।

### ॥ অনুসরণী ॥

১. গমনের ভিত্তিতে বাক্যকে কয়প্রকারে বিভক্ত করা যায় এবং কি কি? দৃষ্টান্ত দাও।
২. অর্থের ভিত্তিতে বাক্যকে কয়প্রকারে বিভক্ত করা যায়? দৃষ্টান্তসহ তাহাদের পরিচয় দাও।
৩. সরল ও জটিল বাক্য সংশ্লিষ্ট একটি বৌগিক বাক্য রচনা করিয়া তাহার অন্তর্গত সরল ও জটিল বাক্যের সংখ্যা লিখাইয়া দাও। এই দ্বিবিধ বাক্যের পার্থক্য বুঝাইয়া দাও। উ. মা. ৬২।
- [সংক্ষেপ: ‘বড়ো হইয়া নবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক বাখ্যা শুনিয়াছি কিন্তু যখনই জ্ঞাতমনে নবী-তীরে বসিয়াছি তখনই সেই চিরাত্মক কুপকলু জন্মের মধ্যে এই পূর্বকথা জন্মিতাম।’]
৪. দৃষ্টান্তসহ সংজ্ঞা লিখ: অর্থার্থক বাক্য, বাস্তবিক বাক্য, নির্দেশক বাক্য ও প্রয়োগিক বাক্য।
৫. নির্দেশক বাক্যগুলির কোনটি কান্ধা বাক্য? অর্থ পরিবর্তন না করিয়া নির্দেশাত্মক বাক্যগুলির জপান্তর সাধন কর।



দুর্বোধন ভীমসেনের সহিত বাহুগুড়ে প্রবৃত্ত হইলেন [মিশ্র]। যখন রাত্রি প্রভাত হইল, তখন পথিকেরা বাত্রাশ্রয় করিল [বৌগিক]। ব্রাহ্মণ অতিশয় ধরিত্র ছিলেন তাই হেলটিকে লেখাপড়া শিখাইতে পারেন নাই [বৌগিক]। তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মনটি শিশুর মতো [সরল]। 'যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক আমি তোমায় ছাড়বো না মা [সরল]।' ধ্যান-নিরতা পার্শ্বতীর দিকে মহেশ্বর দৃষ্টিপাত করিলেন [মিশ্র]। রাত দুইটার পর আমাদের ডিঙি আসিয়া ঘাটে ভিড়িল [মিশ্র]। পাণ্ডবগণ যদি আপনার রক্ষক হন তবে ইন্দ্রও আপনাকে ক্ষয় করতে পারবেন না [সরল]। পাণ্ডবগণ অথবা আপনার পুত্রগণ যুদ্ধে নিহত হলে আপনার কী হৃৎ হবে, বলুন [মিশ্র]। আপনি যদি উপেক্ষা করেন তবে পৃথিবী ধ্বংস হবে [বৌগিক]। কাঙালীর মার জীবনের ইতিহাস ছোট কিন্তু সেই ছোট কাঙালী জীবনটুকু বিখ্যাতার এই শরহাসের দ্বায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল [সরল]।

৬. কোনটি কোন শ্রেণীর উল্লেখ করিয়া নির্দেশ-অনুযায়ী বাক্য পরিবর্তন কর :

দ্বিপ্রহ-নারায়ণের সেবাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম [নাস্তার্থক বাক্য]। তাঁহার শ্রাম মহান কর্মবীর অতি অল্পই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন [নাস্তার্থক]। মাতাপিতার প্রতি তাঁহার ভক্তির সীমা ছিল না [অন্তার্থক]। ইহজগতের পাপতাপ ইহজগতেই শেষ হয় [প্রস্তাবোধক]। ছাত্রজীবনে অধ্যয়নই কি উপস্থান [অন্তার্থক] ? ভারতীয় সভ্যতা পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা [প্রস্তাবোধক]। দেশসেবা আমার জীবনের সর্বোচ্চ আদর্শ [নাস্তার্থক]। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি [প্রস্তাবোধক]। কী চমৎকার চিত্র [অন্তার্থক]। নিকটে অগ্নিশিখা না থাকিলে তাহাদিগকে আসাইয়া তোলা সহজ ছিল না [অন্তার্থক]। এই অচিন পাথির নিঃশব্দ যাত্রা-আসার খবর গানের সুর চাড়া আর কে দিতে পারে [নাস্তার্থক] ? এই ভ্রম-পরাজয়ের সংবাদ-আলোচনার আমাদের উত্তেজনার অন্ত ছিল না [অন্তার্থক] ? এই গল্পটি অত্যন্ত চমৎকার [বিস্ময়বোধক]। কী শোকাবহ সেই ঘটনা [নির্দেশক বাক্য]। এমন প্রবল নদী কাহার [নাস্তার্থক] ? একতাই বল [নাস্তার্থক]। তাহার শক্তি নাই [অন্তার্থক]।

৭. অর্থ অনুসর্য্য রাখিয়া যে-কোন পাঁচটি বাক্যের রূপান্তর সাধন কর : ক. সময় পাও তো কাল একবার এসো। খ. বৃদ্ধ হইলেও তাঁহার লেখনা এখনও অশ্রান্ত। গ. যাহা অনিবার্য তাহা শিরোধার্য। ঘ. একমাত্র তোমার কাছেই সাহায্য পাই। ঙ. এমনভাবে শব্দগুলি সাজাও যাহাতে বর্ণের ক্রম নষ্ট না হয়। চ. ভ্রাতাদের মধ্যে হৃদয়ই যোগাত্মক। ছ. এত ভার বহন আমার ক্ষমতাতে কুলাইবে না। জ. দীর্ঘ থাকিতে দীর্ঘের মর্যাদা বুঝে না।

ক. প্রা. '৬২

৮. নির্দেশ-অনুসারে বাক্যগুলির রূপান্তর সাধন কর : ক. আমাকে কি যেতেই হবে? ['আমাকে'-র স্থলে 'আমার' বসাত]। খ. সকলেই পাপী, তাহাদের মধ্যে তুমি পাপিষ্ঠ। [নেতিবাচক বাক্য পরিণত কর]। গ. তুমি না চাহিলেও আমি দিতাম। [মিশ্রবাক্য পরিণত কর]। ঘ. যখনই ডাকবেন, তখনই চলে আসব। [সরল বাক্য পরিণত কর]।

ক. প্রা. '৬২

৯. নিম্নলিখিত বাক্যটিকে পাঁচটি সরল বাক্যে বিশ্লেষণ কর : বহুব্রংশে পর্বতের অবিভ্যাকার আরোহণের পর পথক্লান্তি ভুলিয়া চারিদিকের নয়ন-মনোহর প্রাকৃতিক দৃশ্যের পানে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম।

ক. প্রা. '৬২

১০. একবাক্যে পরিণত কর : উন্মেষবানু ছিলেন অধ্যাপক। তাঁহার আয় ছিল পরিমিত। তাহা হইতে তিনি বহুকষ্টে সঞ্চয় করিতেন। একজন সংসারের ব্যয়সঙ্কোচ করিতে হইত। সেই সঙ্কীর্ণ অর্থ তিনি দ্বিপ্রহ ছাত্রদিককে দান করিতেন। এই দানে তিনি জাতিধর্মভেদ বিচার করিতেন না।

ক. প্রা. '৬৩

১১. অর্থ অনুসর্য্য রাখিয়া বাক্যগুলির রূপান্তর সাধন কর : ক. এখানে সব জিনিসই যেমন দুর্লভ, তেমনি দুর্মূল্য। খ. এর সমসংসারেরই উপভোগ্য। গ. অন্তর্য্যমিকে মন বিলে আমার শিক্ষাদানে কোন কল হইবে না। ঘ. উপায়ান্তর না থাকিলে দেশান্তরেই বাইতে হইবে। ঙ. মাহ পাওয়া যায় তো তেল পাওয়া যায় না। চ. ভ্রম কাহার না হয়? ছ. পরীক্ষার্থীদের মধ্যে হৃদয় অশ্রুতম। জ. ইংরেজি না জানিলে কোন কোন আধুনিক কবিতার অর্থ বুঝা কঠিন। ঝ. বাগ্ম্যে শীঘ্র যাও, নতুবা চিনি পাইবে না।

ক. প্রা. '৬১

### বাক্য-প্রসারণ

বাক্যের দুইটি প্রধান অংশ : একটি উদ্দেশ্য, অপরটি বিধেয়। সম্বন্ধ পদ, বিশেষণ, অব্যয় ও ক্রমসূচ পদ ইত্যাদির সহযোগে উদ্দেশ্য অংশটি সম্প্রসারিত করা যায় ; আবার বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া-বিশেষণ, অব্যয় ও অসমাপিকা ক্রিয়া ইত্যাদি পদ-সংযোগে বিধেয় অংশ সম্প্রসারিত করা যায়। উদ্দেশ্য ও বিধেয় অংশের সম্প্রসারণের সাহায্যে সম্পূর্ণ বাক্যটি সম্প্রসারিত হইয়া যায়। ইহাই বাক্য-প্রসারণ।

**দৃষ্টান্ত :** রাম বনে গিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য—‘রাম’, বিধেয়—‘বনে গিয়াছিলেন’। সম্প্রসারিত উদ্দেশ্য—অযোধ্যার রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র নবজলধরশ্রাম, রমুকুলতিলক, নয়নাভিরাম রাম। সম্প্রসারিত বিধেয়—পিতৃসত্যরক্ষার নিমিত্ত সীতা ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া চতুর্দশ বৎসরের অন্ত্র বনে গিয়াছিলেন। **সম্প্রসারিত বাক্য :** অযোধ্যার রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র নবজলধরশ্রাম, রমুকুলতিলক, নয়নাভিরাম রাম পিতৃসত্যরক্ষার নিমিত্ত সীতা ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া চতুর্দশ বৎসরের অন্ত্র বনে গিয়াছিলেন।

**ফুল ফুটিয়াছে।** উদ্দেশ্য—‘ফুল’, বিধেয়—‘ফুটিয়াছে’। সম্প্রসারিত উদ্দেশ্য—বিচিত্রবর্ণের ও বিচিত্রগন্ধের অকুরন্ত ফুল। সম্প্রসারিত বিধেয়—ঋতুরাজ বসন্ত-সমাগমে বাগান আলো করিয়া ফুটিয়াছে। **সম্প্রসারিত বাক্য :** ঋতুরাজ বসন্ত-সমাগমে বিচিত্রবর্ণের ও বিচিত্রগন্ধের অকুরন্ত ফুল বাগান আলো করিয়া ফুটিয়াছে।

**নদী প্রবাহিত হইতেছে।** উদ্দেশ্য—‘নদী’, বিধেয়—‘প্রবাহিত হইতেছে’। সম্প্রসারিত উদ্দেশ্য—শততরঙ্গ বিস্তার করিয়া যুগ যুগ ধরিয়া পৃথিবীর মুমুকু নবনারীদের মুক্তি বিতরণ করিতে করিতে পতিতোদ্ধারিণী পুণ্য সলিলা গঙ্গানদী। সম্প্রসারিত বিধেয়—বঙ্গোপসাগরের উদ্দেশ্যে প্রবাহিত হইতেছে। **সম্প্রসারিত বাক্য :** পতিতোদ্ধারিণী পুণ্যসলিলা গঙ্গানদী শততরঙ্গ বিস্তার করিয়া যুগ যুগ ধরিয়া পৃথিবীর মুমুকু নবনারীদের মুক্তি বিতরণ করিতে করিতে বঙ্গোপসাগরের উদ্দেশ্যে প্রবাহিত হইতেছে।

**গায়ক গান করিতেছে।** উদ্দেশ্য—‘গায়ক’, বিধেয়—‘গান করিতেছে’। সম্প্রসারিত উদ্দেশ্য—গণের ধারে বসিয়া এক অঙ্ক গায়ক। সম্প্রসারিত বিধেয়—অত্যন্ত করুণ স্বরে গান করিতেছে। **সম্প্রসারিত বাক্য :** গণের ধারে বসিয়া এক অঙ্ক গায়ক অত্যন্ত করুণ স্বরে গান করিতেছে।

**বিজ্ঞানাগরের নাম বিখ্যাত।** উদ্দেশ্য—‘বিজ্ঞানাগরের নাম’, বিধেয়—‘বিখ্যাত’। সম্প্রসারিত উদ্দেশ্য—বীরসিংহের সিংহশিত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানাগরের নাম। সম্প্রসারিত বিধেয়—সারা ভারতে দ্বার সাগর নামে বিখ্যাত। **সম্প্রসারিত বাক্য :** বীরসিংহের সিংহশিত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানাগরের নাম সারা ভারতে দ্বার সাগর নামে বিখ্যাত।

**আমি বেধিতে লাগিলাম।** উদ্দেশ্য—‘আমি’, বিধেয়—‘বেধিতে লাগিলাম’। সম্প্রসারিত উদ্দেশ্য—আকাবীকা পার্বত্য পথে চলিতে চলিতে আমি। সম্প্রসারিত বিধেয়—বেবতাজা হিমালয়ের নয়নাভিরাম অনির্বচনীয় দুষ্টরাজি বেধিতে লাগিলাম। **সম্প্রসারিত বাক্য :** আকাবীকা পার্বত্য পথে চলিতে চলিতে আমি বেবতাজা হিমালয়ের নয়নাভিরাম অনির্বচনীয় দুষ্টরাজি বেধিতে লাগিলাম।

**‘যেয়ে চোখের জল ফেলাছেন।’** উদ্দেশ্য—‘যেয়ে’, বিধেয়—‘চোখের জল ফেলাছেন’। সম্প্রসারিত উদ্দেশ্য—শরনবরের সেকের পড়ে রাজার যেয়ে। সম্প্রসারিত বিধেয়—রাতের অন্ধকারে কেবলি চোখের জল ফেলাছেন। **সম্প্রসারিত বাক্য :** রাতের অন্ধকারে শরনবরের সেকের পড়ে রাজার যেয়ে কেবলি চোখের জল ফেলাছেন।

‘কিবাধরা’ কেবলে।’ উদ্দেশ্য—‘কিবাধরা’। বিধেয়—‘কেবলে’। সম্প্রসারিত উদ্দেশ্য—কেতে যেতে যেতে কোন এক অজানা গাঁয়ের কিবাধরা। সম্প্রসারিত বিধেয়—সকালে পথের ধারে দেখে রক্তমাখা দুই রাজকুমার হরজয়ল আর পৃথীরাজ। সম্প্রসারিত বাক্য : ‘কোন এক অজানা গাঁয়ের কিবাধরা সকালে কেতে যেতে যেতে পথের ধারে দেখে রক্তমাখা দুই রাজকুমার হরজয়ল আর পৃথীরাজ।’

‘ঘোড়া মিলিয়ে গেছে।’ উদ্দেশ্য—‘ঘোড়া’। বিধেয়—‘মিলিয়ে গেছে’। সম্প্রসারিত উদ্দেশ্য—সন্দের নতুন ঘোড়া। সম্প্রসারিত বিধেয়—হৃষোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পুরমুখে অনেক দূরে ছোটো একটি কালো ফোটার মতো আন্তে আন্তে দূর মাঠের একেবারে শেষে বনের আড়ালে মিলিয়ে গেছে। সম্প্রসারিত বাক্য : ‘সন্দের নতুন ঘোড়া হৃষোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পুরমুখে অনেক দূরে ছোটো একটি কালো ফোটা মতো আন্তে আন্তে দূর মাঠের একেবারে শেষে বনের আড়ালে মিলিয়ে গেছে।’

স্বরশীর্ষ : মূল বাক্যটি সাধু বা চলিত—যে ভাষার রচিত, বাক্যটি সেই ভাষাতেই সম্প্রসারিত হইবে।

● বি: প্র.: এই অধ্যায়ের শেষাংশে বাক্য-প্রসারণ সম্পর্কে অতিরিক্ত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

## বাক্য-সংকোচন

রচনার চমৎকারিত্ব সৃষ্টির জন্য এবং ভাবের সূহৃৎ রূপায়ণের জন্য বাক্য-সংকোচনের প্রয়োজন। বাক্য সংহতির জন্য নাম একপদে পরিণতকরণ। কতকগুলি উপায়ে বাক্যংশের বা পদ-সমষ্টির সংকোচন সম্ভব। সেই উপায়গুলি হইল : ১. কৃৎ-প্রত্যয় যোগে, ২. তদ্ধিত-প্রত্যয় যোগে, ৩. সমাস-প্রয়োগে এবং ৪. সম্পূর্ণ ভিন্ন শব্দের প্রয়োগে।

### ১. কৃৎ-প্রত্যয় যোগে :

অন্নসন্ধান করিবার ইচ্ছা=অনুসন্ধিৎসা। অহু করণ করিবার ইচ্ছা=অনুচিকীর্ষা। উপকার করিবার ইচ্ছা=উপচিকীর্ষা। \*লাভ করিবার ইচ্ছা=লিপ্সা। গমন করিবার ইচ্ছা=জিগমিষা। \*জয় করিবার ইচ্ছা=জিগীষা। \*জানিবার ইচ্ছা=জিজ্ঞাসা। শুনিবার ইচ্ছা=শুশ্রূষা। মৃত্তির বাসনা=মুমুক্কা। মরিবার ইচ্ছা=মুমূর্ষা। যাহার মৃত্যু নিকটবর্তী=মুমূর্ষু। খাইবার ইচ্ছা=বুভুক্কা। কমা করিবার ইচ্ছা=তিতিক্ষা। হনন [হত্যা বা বধ] করিবার ইচ্ছা=জিঘাৎসা। পান করিবার ইচ্ছা=পিপাসা। সহ্য করা বাহ্যার স্বভাব=সহিষু। বাহ্য বুদ্ধি পাইতেছে=বর্ধিষু। যাহা ক্রয় পাইতেছে=ক্ৰয়িষু। বাহ্য পুনঃ পুনঃ হ্রাসিত=দৌহুল্যমান। \*বাহ্য পুনঃ পুনঃ ক্রান্তিতেছে বা জল জল করিতেছে=জাজ্বল্যমান। যে পুনঃ পুনঃ কাদিতেছে=রোরুদ্যমান। \*বাহ্য উড়িয়া বাইতেছে=উড়ন্ত, উড্ডীয়মান। যাহা ধূম উদ্গিরণ করিতেছে=ধূমায়মান। যাহা দীপ্তি পাইতেছে=দীপ্যমান। যাহা সঞ্চিত হইতেছে=সঞ্চীয়মান। যে বস্তুর অপচয় হইতেছে=অপচীয়মান। অন্ধকে [মেঘকে] লেহন করে যে=অভ্রংলিহ। যাহা বাঁচিয়া আছে=জীবন্ত। যাহা ছুটিতেছে=ছুটন্ত। যাহা ফুটিতেছে=ফুটন্ত। যাহা বলা হইবে=বক্ষ্যমাণ। যাহা দেখা বাইতেছে=দৃশ্যমান। যে শুইয়া আছে=শয়ান। যাহা আসিবে=আগামী। যাহা লক্ষ্যন করা যায় না=অলক্ষ্য। যাহা অতিক্রম করা যায় না=অতিক্রম্য। যাহা সহ্য

করা যায় না=অসম্ভব। \*যাহা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না=অনির্বচনীয়।  
 যাহা আরোহণ করিতে কষ্ট হয়=ছুরারোহ। যেখানে অবগাহন করা ছঃসাধ্য=  
 ছুরবগাহ। যাহাকে সহজে দমন করা যায় না=দুর্দমনীয়। যে কষ্ট সহিতে পারে=  
 কষ্টসহিষ্ণু। যাহারা এক স্থান হইতে অল্পস্থানে যাতায়াত করে=যাযাবর। \*যে  
 নিজেকে পণ্ডিত মনে করে=পণ্ডিতম্ভু। যে নারী স্বর্ষকে দেখে নাই=অসূর্যস্পৃশ্যা।  
 যিনি বহু দেখিয়াছেন=বহুদর্শী, ভূয়োদর্শী। যিনি দূরের ঘটনাও দেখিতে পান=  
 দূরদর্শী। পরিণামে কি হইবে দেখার ক্ষমতা যাহার নাই=অপরিণামদর্শী।  
 যে নারীর বিবাহ হয় নাই=অনুঢ়া। যে কর্মের অযোগ্য=অকর্মণ্য। অগ্রে গমন  
 করে যে=অগ্রগামী। মধু পান করে যে=মধুপ। গৃহে থাকে যে=গৃহস্থ। \*যে  
 বিদেশে থাকে না=অপ্রবাসী। সরোবরে জন্মে যাহা=সরোজ, সরসিজ। মনে  
 জন্মে যাহা=মনোজ, মনসিজ। পক্ষে জন্মে যাহা=পঙ্কজ। পশ্চাতে জন্ম যাহার  
 =অনুজ। \*অগ্রে জন্ম যাহার=অগ্রজ। তত্ত্ব হইতে জাত=তত্ত্বজ। যাহার  
 জন্ম হয় নাই=অজ। দুইবার জন্ম যাহার=দ্বিজ। পা দিয়া পান করে যে=পাদপ।  
 কর দেয় যে=করদ। ইন্দ্রকে জয় করিয়াছে যে=ইন্দ্রজিৎ। শত্রুকে বধ করে  
 যে=শত্রুঘ্ন। শত্রুকে জয় করিয়াছে যে=শত্রুজিৎ। অরিকে দমন করিয়াছে যে  
 =অরিন্দম। \*যাহা সহজে ভাঙিয়া যায়=ভঙ্গুর। ডুব দিতে জানে যে=ডুবুরি।  
 গ্রহণ করিবার যোগ্য=গ্রাহ্য। নৌ চলাচলের যোগ্য=নাব্য। \*উপেক্ষার যোগ্য=  
 উপেক্ষণীয়। যাহা হইবে=ভাবী। \*যাহা অবশ্যই হইবে=অবশ্যভাবী। যে সম্পত্তি  
 স্থানান্তরিত করা যায়=অস্থাবর। যাহাতে বিসংবাদ নাই=অবিসংবাদিত,  
 অবিসংবাদী। \*যিনি অভিনয় করেন=অভিনেতা। \*যে গান গাহিতে পারে=  
 গায়ক। যিনি আরাধনার যোগ্য=আরাধ্য। পানের অযোগ্য=অপেন্ন। যাহা  
 বপন করা হইয়াছে=উপ্ত। যাহা বলা হইয়াছে=উক্ত। যে হাতে-কলমে কাজ করিয়া  
 দক্ষতা লাভ করিয়াছে=করিতকর্মী। যাহা কম্পিত হইতেছে=কম্পমান। যাহা ঘন  
 হইতেছে=ঘনায়মান। যাহা ভাবা যায় না=অভাবনীয়। যাহা চিন্তা করা  
 যায় না=অচিন্তনীয়, অচিন্ত্য। জয়স্বচক যে উৎসব=জয়ন্তী। যাহা গতিশীল  
 =জঙ্গম। যাহা স্থানান্তরিত করা যায় না=স্থাবর। যে দ্রব্য গমন করে=  
 তুরগ, তুরঙ্গ, তুরঙ্গম। যে লাকাইয়া চলে=প্লবগ। যে বক্রভাবে গমন  
 করে=ভুজগ, ভুজঙ্গ, ভুজঙ্গম। \*যাহা সহজে লজ্জন করা যায় না=দুর্লজ্জ্য।  
 দেখিবার যোগ্য=দ্রষ্টব্য। যাহা ভুবিয়া বাইতেছে=ডুবন্ত, নিমজ্জমান। \*যে  
 পড়ে=পড়ো, পোড়ো, পড়ুয়া। সন্ধ্যাস লইয়া ভ্রমণ=প্রভ্রজ্যা। \*যাহা মর্যকে  
 পীড়া দেয়=মর্যস্তদ। \*যাহা মাথা পাতিয়া লওয়ার যোগ্য=শিরোধারণ্য। যাহা  
 পরিহার করা যায় না=অপরিহার্য। যাহা নিবারণ করা যায় না=অনিবার্য।  
 \*যাহার পরিমাণ করা যায় না=অপরিমেন্ন। যাহার বিনাশ আছে=নশ্বর।  
 যাহার বিনাশ নাই=অবিনশ্বর। যাহা চিরকাল মনে রাখিবার যোগ্য=  
 চিরস্মরণীয়। যে উপকারীর উপকার স্বীকার করে=কৃতজ্ঞ। যে উপকারীর

উপকার স্বীকার করে না=অকৃতজ্ঞ। যে উপকারীর অপকার করে=কৃতঘ্ন।  
 কৃত্ত করে যে=কৃত্তকার। জলে ও হলে চরে যে=উভচর। আকাশে চরে যে=  
 খেচর। বাহা অনাস্রাসে লাভ করা যায়=অনাস্রাসলভ্য। বাহা সহজে লাভ  
 করা যায়=সুলভ। বাহা কষ্টে লাভ করিতে হয়=দুর্লভ। বাহা সহজে জানা  
 যায় না=দুর্জ্ঞেয়। কি করিতে হইবে, যে বুঝিতে পারে না=কিংকর্তব্যবিমূঢ়।  
 বাহা অদূর ভবিষ্যতে হইবার কোন আশা নাই=অদূর-পরাহত। \*বাচিয়াও যে  
 মরিয়া আছে=জীবন্ত। বাহা আতপ হইতে রক্ষা করে=আতপজ্ঞ। কোন  
 বিষয়ে সম্পূর্ণ না জানিয়া সকল বিষয় কিছু কিছু জানা=পল্লবগ্রাহিতা। চক্ষুর দ্বারা  
 গৃহীত=গোচর। স্থপথ হইতে যে বিচলিত হইয়াছে=উন্মার্গগামী। কতকালে  
 জাত=কানীন। যে পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করিতে পারে=জাতিস্মরণ। যে নারীর  
 সম্ভ্রতি বিবাহ হইয়াছে=নবোঢ়া। যে বৃকে হাঁটিয়া গমন করে=উরণ। যে পারে  
 হাঁটিয়া গমন করে না=পল্লগ [পদ+ন+গ]। পা ধুইবার জল=পাত্ত। বাহা  
 সহজে পরিপাক হয় না=দুষ্পাচ্য। অত্র গতি নাই বলিয়া=অগত্যা। যে নারীর  
 সম্ভান হয় না=বন্ধ্যা। যে নারী একবার মাত্র গর্ভধারণ করে=কাকবন্ধ্যা।  
 বাহার বিবাহ হয় নাই=অকৃতদার। নিতান্ত দৃঢ় হয় যে সময়ে=নিদাঘ। সাক্ষাৎ  
 ঐষ্টা=সাক্ষী। বাহা চক্ষে দেখা যায়=চাক্ষুষ। যে শোনামাত্র মনে রাখিতে পারে  
 =শ্রুতিধর। যে সকল সহ্য করিতে পারে=সর্বৎসহ। মায়্যা নাই বাহার=  
 অমায়িক। \*বাহা পূর্বে ঘটে নাই=অভূতপূর্ব। বাহা পূর্বে শোনা যায় নাই=  
 অশ্রুতপূর্ব। \*বাহা পূর্বে দেখা যায় নাই=অদৃষ্টপূর্ব। বাহা পূর্বে হয় নাই=অপূর্ব।  
 \*বাহার শত্রু জন্মে নাই=অজাতশত্রু। বাহার দুই হাত সমান চলে=সব্যসাচী।  
 সম্মুখে অগ্রসর হইয়া অভ্যর্থনা=প্রত্যুদগমন। বাহা অস্বীকার করা যায় না=  
 অনস্বীকার্য।

## ২. তদ্ধিত-প্রত্যয় যোগে :

ঈশ্বরের অস্তিত্বে যে বিশ্বাস করে=আন্তিক। ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না  
 যে=নাস্তিক। মনুর পুত্র=মানব। দহুর পুত্র=দানব। অদিতির পুত্র=  
 আদিত্য। পৃথার পুত্র=পার্থ। ভৃগুর পুত্র=ভাগব। কৃষ্ণীর পুত্র=কৌন্তেয়।  
 জনকের কন্যা=জানকী। ব্যাকরণ জানেন যিনি=বৈয়াকরণ। বিজ্ঞান জানেন  
 যিনি=বৈজ্ঞানিক। ইতিহাস জানেন যিনি=ঐতিহাসিক। স্বতি জানেন যিনি  
 =স্মার্ত। বৃদ্ধের উপাসনা করেন যিনি=বৌদ্ধ। বিষ্ণুর উপাসনা করেন  
 যিনি=বৈষ্ণব। শক্তির উপাসনা করেন যিনি=শাক্ত। গণপতির উপাসনা  
 করেন যিনি=গাণপত্য। শিবের উপাসনা করেন যিনি=শৈব। সব চেয়ে  
 বড়=জ্যেষ্ঠ। সব চেয়ে ছোট=কনিষ্ঠ। বাহা বনে জাত=বন্য, বনজ।  
 বাহা যুক্তিসঙ্গত নহে=অযৌক্তিক। যে স্বীর বশীভূত=শ্রোণ। বাহা হিরণ্য দ্বারা  
 নির্মিত=হিরণ্ময়। \*বাহা মাটির দ্বারা নির্মিত=মেটে। রেশমে নির্মিত=রেশমী।

শরীর সঞ্চীয় = শারীরিক। বাহা হেমন্তকালে জন্মে = হৈমন্তিক। বাহা শরৎকালে  
 বটে = শারদায়। বোকার মত = বোকাটে। পাগলের মত = পাগলাটে। \* যে  
 বিনা বেতনে কাজ করে = অবৈতনিক। পরিতুষ্ট হইয়া বাহা দেওয়া হয় =  
 পারিতোষিক। \* যিনি পুরাকালের বিষয় জানেন = পুরাতাত্ত্বিক। পার হইবার  
 জন্ত যে মূল্য = পারানি। পূর্বকাল সম্পর্কিত = প্রাক্তন। বালকের অহিত =  
 বালাই। বার মাসের কাহিনী = বারমাস্তা। \* বাহাতে মজা আছে = মজাদার।  
 বাহার। হান হইতে হানান্তরে ভ্রমণ করে = যাবাবর। \* সাধুর ভাব = সাধুতা।  
 ময়ূরের কণ্ঠের শ্রাব্য রং বাহার = ময়ূরকণ্ঠী। জুয়া খেলে যে = জুয়ারী বা জুয়াড়ী।  
 চৈত্রমাসে উৎসব = চৈতালী। পাটনায় উৎসব = পাটনাই। যে সাপ ধরিতে পটু-  
 = সাপুড়িয়া, সাপুড়ে। তীর ছুঁড়ে যে = তীরন্দাজ। যে বহু কথা বলে =  
 বাচাল। \* যে মায়া জানে না = অমায়িক। আট মাসে যে জন্মিয়াছে = আটশে।  
 এক পঙ্ক্তিতে বসার অযোগ্য = অপাঙক্তেয়। \* কোথাও উচু কোথাও নীচ =  
 বন্ধুর। যে গাছ ফল পাকিলে মরিয়া যায় = ওষধি। ঋষির দ্বারা উক্ত = আর্ষ।  
 খেয়া পার করে যে = পাটনী। একই সময়ে বর্তমান = সমসাময়িক। বাহা সারাদিন  
 [ আটপ্রহর ] ব্যবহৃত হয় = আটপোরে। যে রোগ নির্ণয়ে হাতড়াইয়া মরে =  
 হাতুড়ে। \* যে বিচার না করিয়া কাজ করে = অবিমূঢ়াকারী। যে নারী পতিপুত্রহীনা  
 = অবীরা। যে জমিতে দুইবার ফসল হয় = দোকসলী। দুই দিকের হার  
 [ অনূপাত ] সমান বাহার = দোহার। দুয়ের মধ্যে একটি = অন্তর। বর্ণমালার  
 পারস্পর্য রক্ষা করিয়া = বর্ণানুক্রমিক। দ্বারে থাকে যে = দোবারিক। \* বাহার শ্রী  
 আছে = শ্রীমান্, শ্রীমন্ত। বাহার মান আছে = মানী। \* বাহার যশ আছে =  
 যশস্বী। গাড়ী চালায় যে = গাড়োয়ান। জল দ্বারা ব্যাপ্ত = জলময়।

### ৩. সমাস-প্রয়োগে :

যিনি পণ্ডিত হইয়াও মূর্থ = পণ্ডিতমূর্থ। গো-র শ্রায় বেচারী = গোবেচারী।  
 শশকের শ্রায় ব্যস্ত = শশব্যস্ত। শত অব্দের সমাহার = শতাব্দী। পা হইতে মাথা  
 পর্যন্ত = আপাদমস্তক। জীবন পর্যন্ত = আজীবন। বীপের সদৃশ = উপদ্বীপ।  
 ভিকার অভাব = দুঃস্থক। ক্লের বিরুদ্ধে = প্রতিকূল। জন্ম হইতে মৃত = জন্মান্তর।  
 পুত্র নাই বাহার = অপুত্রক। পত্নী মৃত হইয়াছে বাহার = বিপত্নীক। পত্নীর সহিত  
 বর্তমান = সপত্নীক। একই গুরু শিষ্য = সতীর্থ। কানে কানে যে মন্ত্রণা =  
 কানাকানি। বাহার সর্বত্র হ্রত হইয়াছে = হ্রতসর্বত্র। নদী মাতা যে দেশের =  
 নদীমাতৃক। কৃষি মাতা যে দেশের = কৃষিমাতৃক। দুইদিকে অপ [ জল ] বাহার  
 = দ্বীপ। যে দ্বীপ ভতা [ স্বামী ] বিদেশে আছেন = প্রোষিতভতৃক। বাহার মন  
 অন্ত দিকে নাই = অনন্যমনা। অন্ত সহায় নাই বাহার = অনন্যসহায়। বাহা অন্ত  
 ব্যক্তিতে সাধারণ নয় = অনন্যসাধারণ। বাহার দাড়ি জন্মায় নাই = অজাতশাক্র।  
 হৃগন্ধ আছে বাহার = হৃগন্ধি। গাণ্ডীব ধনু বাহার = গাণ্ডীবধনু। স্বামী নাই বাহার

=বিধবা। বাহার মমতা নাই=নির্মম। সমুদ্র হইতে হিমাচল পর্যন্ত=আসমুদ্র-হিমাচল। সাগর সমেত পৃথিবী=সসাগরা-পৃথিবী। বাহার পরিমাণ করা যায় না=অপরিমেয়। বাহার উপায় নাই=নিরূপায়। বাহার অন্য উপায় নাই=অন্যোপায়। \*বাহার ভাতের অভাব আছে=হা-ভাতে। বাহার ঘরের অভাব আছে=হা-ঘরে। বাহার কুল ও শীল জানা নাই=অজ্ঞাতকুলশীল। বাহা বাক্য ও মনের অতীত=অবাঙ্মনসগোচর। বাহা খুব [ অতি ] দীর্ঘ নহে=নাতিদীর্ঘ। বাহা অতি শীতও নয়, উষ্ণও নয়=নাতিশীতোষ্ণ। সামান্য উষ্ণ=কবোষ্ণ। বাহা হইতে পারে না=অসম্ভব। বাহা শোনার যোগ্য নহে=অশ্রাব্য। বাহা বলার যোগ্য নহে=অকথ্য। কর্ণ পর্যন্ত=আকর্ণ। জয় হইতে=আজয়। মৃত্যু [মরণ] পর্যন্ত=আমৃত্যু [আমরণ]। \*শৈশব হইতে=আশৈশব। কণ্ঠ পর্যন্ত=আকণ্ঠ। জাহ্নু পর্যন্ত লবিত=আজাহ্নুলবিত। \*উপস্থিত বুদ্ধি বাহার আছে=প্রত্যুৎপন্নমতি। বাহা প্রথমে মধুর=আপাতমধুর। যতটা পারা যায় [ শক্তিকে অতিক্রম না করিয়া ]=যথাশক্তি। যে বিদেশে থাকে=প্রবাসী। নাতি পর্যন্ত লবিত হার=ললন্তিকা। পথ দেখায় যে=পথপ্রদর্শক। শিক্ষার উপর নির্ভর না করিয়া=শিক্ষা-নিরপেক্ষ। যে পরিমিত কথা বলে=মিতভাষী। যে আয় বুঝিয়া ব্যয় করে=মিতব্যয়ী। যে গলায় কাপড় দিয়াছে=গললগ্নীকৃতবাস। ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছেন যিনি=জিতেন্দ্রিয়। যে স্বামীর স্বী বিদেশে থাকে=প্রবাস-পত্নীক। একই সময়ে বহুমান=সমসাময়িক। যে ভূমির উৎপাদিকা-শক্তি নাই=অনুর্বরা। যে পূর্বে অপরের বাগ্‌দত্তা বা স্বী ছিল=অগ্রপূর্বা। বাহার দ্বিতীয় বা সদ্‌শ নাই=অদ্বিতীয়। বাহা নিজ অধিকারের বহির্ভূত, তাহার চর্চা=অনধিকারচর্চা। \*কুৎসিত আকার বাহার=কদাকার। \*খেলায় পটু যে=খেলোয়াড়। যে শুভক্ষেণে ভগ্নিয়াছে=ক্ষণজন্মা। বাহার ঘাম করিতেছে=গলদর্শম। দিনের আলো ও রাতের অন্ধকারের সন্ধিক্ষণ=গোধূলি। যে গাছে বছরে দুইবার ফল ধরে=দ্বৌফলা। দুই রণীর যুদ্ধ=দ্বৈরথ। ধনুর দ্বারা যে যুদ্ধ করে=ধনুধর। যে কাহারও অপেক্ষা রাখে না=নিরপেক্ষ। বাহার উদ্দেশ্য নাই [ সন্ধান বা ঠিকানা সজ্জাত ]=নিরুদ্দেশ্য। \*বাহার গুণ নাই=নিগুণ। \*বাহার জ্ঞান কর দিতে হয় না=নিষ্কর। \*পরের সৌভাগ্য দেখিলে যে কাতর হয়=পরশ্রীকাতর। মৃত্যু কামনার উপবাস=প্রায়োপবেশন। সর্বজন সম্বন্ধীয়=সার্বজনীন। সর্বজনের কল্যাণে=সর্বজনীন। \*বাহার অমুরাগ দূর হইয়াছে=বীতরাগ। \*খরচের হিসাব নাই বাহার=বেহিসাবী। বন্দোবস্তের অভাব=বেবন্দোবস্ত। ছল করিয়া কান্না=মায়াকান্না। যে নারীর হাসি শুচি=শুচিহাসিতা। \*স্বীর সহিত বর্তমান=সঙ্গীক। \*হৃদয়ের প্রীতিকর=হৃদ্য। যেখানে মাছি প্রবেশ করিতে পারে না=নির্মক্ষিক। যে কোন অবলম্বন ছাড়াই থাকে=নিরাশ্রয়। বাহার কিছুই নাই=নিঃশ, অকিঞ্চন। হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিকের সমাহার=চতুরঙ্গ। যে নারীর সন্ধান বাঁচে না=মৃতবৎসা। বেদান্ত জানেন যিনি=বৈদান্তিক। বেদ জানেন

যিনি=বেদজ্ঞ। যাহাকে শাসন করা কঠিন=দুঃশাসন। একই মায়ের পুত্র=সহোদর। যে ভূমিতে ফসল জন্মে না=উষ্ম। \*যে নারী প্রিয় বাক্য বলে=প্রিয়বদা। যে বৃক্ষের ফল হয় না, কিন্তু ফল হয়=বনম্পতি।

#### ৪. সম্পূর্ণ ভিন্ন শব্দের প্রয়োগে :

পুরুষের উদ্ভাস নৃত্য=তাণ্ডব। হস্তীর চীৎকার=বৃংহণ, বৃংহতি। অশ্বের চীৎকার=দ্রুম। ভূষণাদির শব্দ=শিঞ্জন, টুংকার। নৃপূরের শব্দ=নিঞ্জন। পাখীর কলরব=কাকলি, কুজন। ময়ূরের ডাক=কেকা। কোকিলের ডাক=কুহ। ভ্রমরের শব্দ=গুঞ্জন। বীণার ধ্বনি=ঝঙ্কার। ধ্বজের শব্দ=টঙ্কার। বাঘের চামড়া=কৃন্তি। হরিণের চামড়া=অজিন। পরিব্রাজকের বৃত্তি=প্রব্রজ্যা। পরিব্রাজকের ভিক্ষা=মাণ্ডুকী।

● বিশিষ্ট প্রয়োগ। ধনীদিগের ধনলিপ্সা অত্যন্ত প্রবল। জিজ্ঞাসার দীপশিখা আলিয়া মানুষ অজানার অন্ধকারে পাড়ি দিয়েছে। নেতাজী স্বভাবচক্রেয় নাম ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে চির-জাজ্বল্যমান হইয়া থাকিবে। তীরন্দাজ আকাশে একটি উড়ন্ত [ উড্ডীয়মান ] বিহঙ্গকে তীরবিন্দু করিয়া ভূপাতিত করিল। ভারতের উত্তরে অভ্রলিহ হিমাচল। কাকনজজ্বার শিখরে সূর্যোদয়ের শোভা সত্যই অনির্বচনীয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ। মানুষের মন কি কাচের মতো ভঙ্গুর? এই সামান্য দোষত্রুটি উপেক্ষণীয়। অহংকারের পতন অবশ্যজ্ঞাবী। শিশিরকুমার ছিলেন ভারতের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। যুগের যন্ত্রণায় বর্তমানের ধ্বনিকা কম্পমান। আদর্শ উদ্যাপনের পথে রহিয়াছে দুর্লভ্য বাধা। ‘আমি আজ কানাই মাষ্টার, পোড়ো মোর বেড়াল-ছানাটি।’ রাজপুত-ললনাদের কাহিনী এক মর্মস্পন্দু আত্ম-বিসর্জনের কাহিনী। যাহা অনিবার্য, তাহা শিরোধার্য। যাহারা শুভ্রায়া করিতেছিল, তাহারা মুমূর্ষুকে ঘিরিয়া বসিল। তাঁহার পূর্বপুরুষেরা ছিলেন অপরিমেয় সম্পদের অধিকারী। ‘বিটপাল আর ধীমান, বাঘের নাম অবিনশ্বর।’ অনাহারে, অনিদ্রায় এবং দুরারোগ্য ব্যাধিতে তিনি আজ জীবন্ত। অবিশ্বাস্যকারিতার দ্বন্দ্ব অবিশ্বাস্যকারীদের পরে দুঃখ পাইতে হয়। তিনি চিরকাল মেটে ঘরেই বাস করিতেন। তিনি অমায়িক প্রকৃতির লোক ছিলেন। ‘পতন-অভ্যুদয়-বঙ্গুর পহা যুগ-যুগ-ধাবিত যাত্রী।’ পুরাতাত্ত্বিক গবেষণায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, ভারতীয় সভ্যতা অতি সুপ্রাচীন। ‘কণ্ঠে নিলেম গান, আমার শেষ পান্নালির গান।’ নামগুলিকে বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজাও। ‘ফুল্লার বারমাস্তা’ দ্বিজ ব্যাধ-বধুর বেদনাময় আত্মকাহিনী। ‘বিশ্বের পথে ছুটে চলিয়াছি আমি এক ঘাষাবর।’ সাধুতাই শ্রেষ্ঠ উপায়। ‘ঈশ্বরীয়ে জিজাসিল ঈশ্বরী পাটনী।’ মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন সমসাময়িক। বাংলা নদীমাতৃক দেশ। শিশুর আগন্তকের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ‘দূর হবে দুর্ভিক্ষের কুখা।’ ভূদেবচন্দ্র ছিলেন মধুসূদনের সতীর্থ। প্রোথিতভর্জকা প্রবাসী খামীর পথ চাহিয়া আছেন।



● এই অখ্যারের সূচনার বাক্য-প্রসারণ বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। আর এক প্রকার পদ্ধতির দ্বারা বাক্য-প্রসারণ করা যায়। বাক্যের মধ্যে কোন কৃত-প্রত্যয় বা তদ্ধিত-প্রত্যয়-নিম্পন্ন শব্দ থাকিলে অথবা সমাসবদ্ধ পদ থাকিলে তাহাকে প্রসারিত করিয়া বাক্য-প্রসারণ করা যায়। সেজন্য বাক্য-সংকোচন অংশটি আগে পাঠ করিয়া লইতে হইবে। তারপর নিম্নের দৃষ্টান্তগুলি লক্ষ্য কর :

১. ধুমায়মান পর্বতকে আগ্নেয়গিরি বলা হয়।—যে পর্বত ধূম উৎপন্ন করিতেছে, তাহাকে আগ্নেয়-গিরি বলা হয়। ২. তাহার প্রবল জিহ্বাসা তাহাকে স্থির থাকিতে দিল না।—তাহার জানিবার প্রবল ইচ্ছা তাহাকে স্থির থাকিতে দিল না। ৩. চলন্ত গাড়িতে উঠিবার চেষ্টা করিলে পতনের সম্ভাবনা থাকে।—যে গাড়ি চলিতেছে, তাহাতে উঠিবার চেষ্টা করিলে পতনের সম্ভাবনা থাকে। ৪. ক্ষয়িষ্ণু সমাজে প্রাচীন মূল্যবোধগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িতে থাকে।—যে সমাজ ক্ষয় পাইতেছে, তাহাতে প্রাচীন মূল্যবোধগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িতে থাকে। ৫. জীবনে কোন বাধাই অলম্ব্য বা অনতিক্রম্য নয়।—জীবনে এমন কোন বাধা নাই, যাঁহা লম্বন করা যায় না বা অতিক্রম করা যায় না। ৬. প্রকৃতির অনির্বচনীয় রূপমাধুরী আমরা দেখিতে লাগিলাম।—বাক্যে প্রকাশ করা যায় না, প্রকৃতির এমন রূপমাধুরী আমরা দেখিতে লাগিলাম। ৭. যে গায়ক, সে ভালো অভিনেতা নাও হইতে পারে।—যে গান গাহিতে পারে, সে ভালো অভিনয় নাও করিতে পারে। ৮. সর্বদা ভুরোষশীল পরামর্শ গ্রহণ করিবে।—যিনি বহু দেখিয়াছেন, সর্বদা তাহার পরামর্শ গ্রহণ করিবে। ৯. ঐতিহাসিকেরা তোমার এই কথা স্বীকার করিবেন না।—বাঁহারা ইতিহাস জানেন, তাঁহারা তোমার এই কথা স্বীকার করিবেন না। ১০. নাতিকেরাও একসময় ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিয়া বসেন।—বাঁহারা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেন না, তাঁহারাও এক সময় ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিয়া বসেন। ১১. রাজনারায়ণ বহু ছিলেন ঐকিকল্প মানুষ।—রাজনারায়ণ বহু ছিলেন ঐকির মতন মানুষ। ১২. তিনি কবি মধুসূদনের সমসাময়িক।—তিনি কবি মধুসূদনের একই কালে বর্তমান ছিলেন। ১৩. এ বৎসর হৈমন্তিক যান ভালো হয় নাই।—যে ধান হৈমন্তিকালে জন্মে, তাহা এ বৎসর ভালো হয় নাই। ১৪. একজন ডুবুরিকে ডাক।—যে ডুব দিতে জানে, এমন একজনকে ডাক। ১৫. অপরিণামতমূলক অনুশোচনা ভোগ করিতে হয়।—পর্যায় না দেখিয়া যে কাজ করে, তাহাকে অনুশোচনা ভোগ করিতে হয়। ১৬. নামগুলি বর্ণমুক্‌মিকভাবে সাজাও।—নামগুলি বর্ণমালার পারস্পর্য রক্ষা করিয়া সাজাও। ১৭. ধৃতরাষ্ট্র জন্মাক ছিলেন।—ধৃতরাষ্ট্র জন্ম হইতে অন্ধ ছিলেন। ১৮. অত্যাতিকুলীনকে গৃহে স্থান দেওয়া কি উচিত?—যাহার কুল ও দীল জানা নাই, তাহাকে গৃহে স্থান দেওয়া কি উচিত? ১৯. যে দেশে চন্দ্রিক, সে দেশে মিতবারী হওয়া ভালো।—যে দেশে শিকার অভাব, সে দেশে আয় বৃদ্ধি বায় করা ভালো। ২০. তাঁহারা আগন্তকের অপাবনস্তক লক্ষ্য করিয়া পরস্পর কানাকানি করিতে লাগলেন।—তাঁহারা আগন্তকের পা হইতে বাধা পর্বন্ত লক্ষ্য করিয়া কানে কানে মন্থণ করিতে লাগিলেন।

## ৥ অনুসরণী ৥

১. বাক্যগুলি প্রসারিত কর : বান্দীকি রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। বর্ষাকালে বৃষ্টি হয়। আকাশ আনুত হইল। বিদ্যাসাগর চলিলেন। পাখী ডাকিতেছে। সূর্য অস্ত গেল। বাতাস বহিতেছে। বৃক্ষ শুষ্ক হইল। বনকুমার কহিলেন। আমি পাঠ করিয়াছি। জোনাকি হরির লুট ছড়াইতেছে। চুর্বাধন চলে গেলেন। কুক বলেন। বক্সার স্থির করিল। বনপ্রণী আয়োজন করেছে। রবীন্দ্রনাথ কবি। রূপ বলাইয়া যায়। কসল কলে। মাঝিরা গান ধরেছে। খবর রটে গেল।

২. ক্রমস্ত বা তদ্ধিতান্ত বা সমাসবদ্ধ পদগুলিকে প্রসারিত করিয়া বাক্যগুলিকে সম্প্রসারিত কর : সুবুকে জল দান করা একটি পুণ্য কর্ম। জীবন্ত সর্প ধ্বংস করে। যাহা অপরিহার্য, তাহা শিরোধার্য। নেতাজী যে একজন শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক ছিলেন, তাহা অবিসংবাদিত। ভগতে অপরিণামশীলরাই ভুল করে। যাহা অবশ্যস্বাভাব্য, তাহা অনিবার্য। এদেশে প্রবাহী কবিবে, ইহা সুদূরপরাহত ছিল। এমন অজুতপূর্ণ ৫ ঘটনার সকলেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেল। তিনি আকস্মিক বৈকল্য, আশ্রয় বৈকল্যই ছিলেন। ভগতে

পরীক্ষাকর্তারাই অস্বীকার। এই বনে ওষধি যেমন দুর্গভ, বনস্পতি তেমন দুর্গভ নয়। তিনি একটি নাতিবীৰ্য বক্তৃতা দিলেন। তিনি ছিলেন জিতেন্দ্রিয়, মিতব্যয়ী এবং মিতভাবী।

\*৩. একপাশে পরিণত করিয়া সার্থক বাক্য রচনা কর :

ক. যে গলায় কাপড় দিয়াছে। যে অগ্নি জ্বলিয়াছে। বাহাতে মজা আছে। যে জীবিত থাকিয়াও মৃত। যে আপনাকে পণ্ডিত মনে করে। বাহার ভাতের অভাব আছে। বাহা সহজে ভাঙে। বাহা পূর্বে কখনও শোনা যায় নাই। মা. '৫৮। খ. বাহা অবশ্যই হইবে। বন্দোবস্তের অভাব। পা হইতে মাথা পর্যন্ত। বাহা স্নায়ের অমুবর্তী নয়। মা. '৫৯। গ. স্ত্রীর সহিত বর্তমান। বাহা পূর্বে শোনা যায় নাই। বাহা পরিমাণ করা যায় না। বাহা সহজে ভাঙ্গিয়া যায়। যিনি আরাধনার যোগ্য। যে জীবিত থাকিয়াও মৃতবৎ। শৈশবকাল হইতে। উপেক্ষার যোগ্য। মা. '৬০। ঘ. খেলার দক্ষ। কুৎসিত আকার বাহার। বাহার জন্ত কর দিতে হয় না। পান করিবার যোগ্য। প্রিয়বাক্য বলে যে রমণী। ধরতের হিসাব নাই বাহা। বাহা উড়িয়া বাইতেছে। বাহা করিতে হইতেছে। মা. '৬১। ঙ. বাহা সহজে লজ্জন করা যায় না। বাহা জল জল করিতেছে। বাহা কোথাও নীচু, কোথাও উঁচু। যে ডুবিয়া বাইতেছে। বাহা মাথা পাতিয়া লওয়ার যোগ্য। পরের সৌভাগ্য দেখিয়া যে কাতর হয়। বাহা পান করার অযোগ্য। মা. '৬২। চ. বাহার উপহিত-বুদ্ধি আছে। বাহা সহজে ভাঙে। জানিবার ইচ্ছা। যে-বস্তু খাইতে ইচ্ছা হয়। বাহার অমুদ্রাণ ঘূর হইয়াছে। পুরাকালের বিষয় জানে যে। হৃদয়ের প্রীতিকর। মা. '৬৩। ছ. যে গাছ কল পাকিলে মরিয়া যায়। আদর করার যোগ্য যে বা বাহা। যে বিশেষে থাকে না। যে ব্যক্তি বিশেষ বিবেচনা না করিয়া কাজ করে। বাহার গুণ নাই। যে মনকে পীড়া দেয়। বাহার শুনিবার ইচ্ছা আছে। বাহা বচনের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। মা. '৬৪। জ. সাধুর ভাব। যে ব্যাকরণ জানে। বাহার বশ আছে। যিনি অভিনয় করেন। যে পড়ে। মাটি দিয়া তৈয়ারী। মা. '৬৫।

৪. সূচক বাক্যগুলিকে সংকোচিত কর বা সূচক শব্দগুলির স্থানে একটিমাত্র শব্দ ব্যবহার কর বা জটিল বাক্যগুলিকে সরল বাক্যে পরিণত কর :

বাহার কুল ও শীল জানা নাই তাহাকে গৃহে স্থান দেওয়া উচিত হয় নাই। যে মরিতে চাহিতেছে তাহাকে মরিতে দেও। সে জন্ম হইতেই বধির। এখন দেশে ভিক্ষার অভাব নাই। তিনি মৃত্যু পর্যন্ত অনশন করিবেন। যে নারী পুনঃ পুনঃ কাঁদিতেন তাহার পরের কাহারও জানা নাই। আমি যে আনন্দ লাভ করিলাম তাহা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না। যিনি বহু দেখিয়াছেন একমাত্র তিনিই সে কথা বলিতে পারেন। বাহা নিবারণ করা যায় না, তাহা মাথা পাতিয়া লওয়া উচিত। যে রাঁধে, সেও চুল রাঁধে। পরিণামে কি হইবে দেখার ক্ষমতা বাহার নাই, সে কি কখনও স্থনী হইতে পারে? যে বাঁচিয়াও মরিয়া আছে তাহার আবার মৃত্যুভয় কি? ইনি ঘটনার একজন সাক্ষী জ্ঞাত। এই ঘটনা পূর্বে কখনও ঘটে নাই। যিনি ব্যাকরণ জানেন তাহাকে বিজ্ঞাসা করিও।

\*৫. নিম্নবৃত্ত উক্তিবিচয়ের উপযুক্ত প্রতিশব্দ রচনা কর :

বাহা সহজেই ভাঙ্গিয়া যায় : সে নিজেকে পণ্ডিত মনে করে ; ঢাকার উৎপন্ন ; বাহা পূর্বে ঘটে নাই ; মৃত্যুকাল পর্যন্ত ; যিনি অরিকে হনন করেন ; জীবিত থাকিয়াও মৃত যে ; যে বুক ভর দিয়া গমন করে ; অবশ করিবার ইচ্ছা ; যে অবস্থার ভিক্ষা মিলে না ; বাহা বচনের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। উ. মা. '৭০। অপকার করিবার ইচ্ছা ; উপায় নাই বাহার ; পা হইতে মাথা পর্যন্ত ; বাহা পূর্বে শোনা যায় নাই ; যে দুই-বার জন্মায় ; বাহা সহজে পাওয়া যায় না ; যে বিচার করিয়া কাজ করে না ; অবশ করিবার ইচ্ছা। উ. মা. [কম্পার্ট.] '৭০। বাহা পূর্বে জানা যায় নাই ; শত্রুকে বধ করিয়াছেন যিনি ; বাহা অবশ্যই হইবে ; হনন করিবার ইচ্ছা ; ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছে যে ; বাহা উড়িয়া বাইতেছে ; যে পাছে বসন্তে দুইবার কল হয়। উ. মা. '৬৯। অন্ধর জ্ঞান নাই বাহার ; বাহা কামনার যোগ্য ; বহু স্ত্রী ; মিতার ভাব ; জানিবার ইচ্ছা ; বাহার প্রয়োজন নাই ; যে উপকারীর ধন খাওয়ার করে না। উ. মা. [কম্পার্ট.] '৬৯। বাহা বচনে প্রকাশ

করা যায় না ; বেড়ে যিনি অভিজ্ঞ ; ঈশং নীলবর্ণ বিশিষ্ট [ নীলাভ ] ; বাহা পান করিবার যোগ্য নহে ; বাহা অর্জন করা হইয়াছে [ অর্জিত ] ; যে বিবেচনাপূর্বক কাজ করে না [ অবিবেচক ] ; বাহার অস্ত্র গতি নাই [ অনস্ত্রগতি ] : উ. মা. '৬৮ । একই গুরুর শিষ্য ; পরিব্রাজকের ভিক্ষা ; বাহার পত্নী বিদেশে থাকেন ; বিদেশে থাকে যে : যে নিজেকে পণ্ডিত বলিয়া মনে করে ; বাহার কোন মায়া নাই ; বাহা প্রমাণ করা যায় না [ অপ্ৰামাণিক ] ; দিনের আলো ও রাত্রির অন্ধকারের মিলনকাল [ গোধূলি ] ; বাহার অস্ত্রদ্বিকে দন নাই ; বাহার দাড়ি জন্মে নাই ; বাহা হইতে পারে না ; সমান গোত্র বাহাদেব ; বাহার স্বামী 'বদেশে' আছেন ; জায়া ও পতি ; ছেলে ধরে যে ; অতি শীতও নয়, অতি উষ্ণও নয় ; পণ্ডিত হইবে ও মুখ : গো-র ছায় বেচারি : হিসাবে স্বক্ষণ ময়ুরের কণ্ঠের ছায় রং বাহার ; বনে জাত ; মাটি দ্বারা হৈয়ারী ; চক্ষু দ্বারা গৃহীত ; বাহা যুক্তিসঙ্গত নহে ; বাহা পূর্বে দেখা যায় নাই ; বর্ণন জানেন যিনি . ইন্দ্রিয়কে জয় করিয়াছে যে ; সকল সহ করে যে ; গৃহে থাকে যে ; যে সহজেই ভয় পায় . বাহা নিন্দ ব যোগী ; বাহা দেওয়া যায় না : বাহা পুনঃ পুনঃ অলিতেছে ; বাহা বলা হইবে ; বাহা শোভা পায় [ শোভন ] ।

---

## বাগ্‌ধারা

প্রত্যেক ভাষারই কতকগুলি চিরকালাগত নিজস্ব বাক্-ভঙ্গিমা আছে। তাহাদের কোনরূপ পরিবর্তন করা যায় না। নিয়ন্ত ব্যবহারের দ্বারা তাহারা যুগ যুগ ধরিয়া বিশেষ অর্থ প্রকাশ করিয়া আসিতেছে। আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ না করিয়া তাহাদের গূঢ়ার্থই গ্রহণ করা হইয়া থাকে। ইহারা বাগ্‌ধারা। এই বাগ্‌ধারাই ভাষার প্রাণ।

নিম্নে এইরূপ বিশিষ্টার্থ-প্রকাশক বাক্যাংশের অর্থ ও ব্যবহারের রীতি প্রদর্শিত হইল :

১. অকুল পাথার [ভীষণ বিপদ]—স্বামী, পুত্র এবং যথাসর্বস্ব হারাইয়া মহিলাটি একেবারে অকুল পাথারে পড়িয়াছেন। ২. অরণ্যে রোদন [নিম্নল আবেদন]—নির্মম ঐ ব্যক্তির নিকট দয়া ভিক্ষা করা কেবল অরণ্যে রোদন মাত্র। ৩. অকাল কুম্মাণ্ড [অকর্মণ্য ব্যক্তি]—বড় লোকের ছেলে ভক্তহরি একটি অকাল কুম্মাণ্ড, ওকে দিয়ে কোন কাজই হবে না। ৪. অন্ধের যষ্টি [অসহায়ের সহায়]—‘অন্ধের যষ্টির মত কর গো আমারে।’ ৫. অর্ধচন্দ্র দেওয়া [গলাধাক্কা দেওয়া]—দাঁও ওকে অর্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় করে। ৬. অগস্ত্য যাত্রা [চির-বিদায় নেওয়া]—সেটা ছিল তাহার অগস্ত্য যাত্রা; সেই যে সে গেল, আর ফিরিয়া আসিল না। ৭. অগ্নিশর্মা [অত্যন্ত ক্রুদ্ধ]—রাগে অগ্নিশর্মা হইয়া তিনি স্থান ত্যাগ করিলেন। ৮. অহি-নকুল সম্বন্ধ [নিদারুণ শত্রুতা]—তাহার সহিত তোমার ত’ অহি-নকুল সম্বন্ধ। ৯. অথৈ জল [ভীষণ বিপদ]—এখন আমার চারিদিকে একেবারে অথৈ জল, কোনদিকেই নিস্তার নেই। ১০. অমাবস্তার চাঁদ [হৃদয়-দর্শন]—তুমি যে আজকাল অমাবস্তার চাঁদ হয়ে উঠেছ, দেখা পাওয়াই ভার। ১১. অশ্ব ডিম্ব [অবাস্তব বস্তু]—যে বাহা পারিল লুটিয়া লইল, আর আমার ভাগ্যে অশ্ব ডিম্ব।

১২. আনাগোনা [আসা-যাওয়া]—‘বন্ধ হবে আনাগোনা এই হাটে।’ ১৩. আহ্লাদে আটখানা [অত্যন্ত আনন্দিত]—পাসের খবর পাইয়া পাচুগোপাল ত’ আহ্লাদে আটখানা! ১৪. আকাশ কুসুম [অসম্ভব কল্পনা]—সে একজন বড় কবি হইবে, ইহা আকাশ কুসুম। ১৫. আদার ব্যাপারী [সামান্য কাজের লোক]—আমরা যোজ় আনি, যোজ় খাই, বিলেত যেতে প্লেনের ভাড়া কত জানবার কি দরকার? আদার ব্যাপারীর আবার জাহাজের খবর! ১৬. আক্কেল সেলামী [বোকাটির দণ্ড]—তাহার কথায় অমন দামী বইটা আমাকে আক্কেল সেলামী দিতে হলো। ১৭. আকাশ-পাতাল প্রভেদ, ১৮. আসমান-জমিন ফারাক [খুব বেশী পার্থক্য]—তুমি উচ্চশিক্ষিত ,

আর আমি গ্রাম্য পাঠশালায় পড়া সমাপ্ত করেছি মাত্র—তোমায় আমার আকাশ-পাতাল প্রভেদ [আসমান-জমিন ফারাক]। ১৯. আক্কেল গুডুম [কিংকর্তব্য-বিমূঢ়]—খবরটা শুনেই ত' তার একেবারে আক্কেল গুডুম। ২০. আমড়াগাছি [খোসামোদ]—আমড়াগাছি করে সে বড়দার অমন দামী ঘড়িটা হাতিয়ে নিয়েছে। ২১. আঠারো মাসে বছর [দীর্ঘস্থত্রী, অতি বিলম্বে কাজ করা]—তোমার ত' আঠারো মাসে বছর; দেখা যাক, কাজটা কবে শেষ হয়। ২২. আড়ি পাতা [লুকাইয়া কিছু শুনিবার চেষ্টা]—তুই বন্ধুঁতে কি গোপন পরামর্শ করিতেছে, তাহা চাকরটা আড়ি পাতিয়া শুনিবার চেষ্টা করিল। ২৩. আদায় কাঁচকলায় [বনিবনার অভাব]—পিতার মৃত্যুর পর তুই ভাইতে একেবারে আদায় কাঁচকলায়; মুখদেখাদেশি বন্ধ। ২৪. আইটাই [বদহজমজনিত অশস্তি]—অবেলায় নেমস্তন্ন খেয়ে এখন তার পেটটাই আইটাই করছে। ২৫. আঙুল ফুলে কলাগাছ [হঠাৎ ধনী হয়ে ওঠা]—বেলী মাইনের চাকরি পেয়ে এখন ত' সে আঙুল ফুলে কলাগাছ। ২৬. আলালের ঘরের দুলাল [বড়লোকের অপদার্থ সন্তান]—২৭. আদা জল খেয়ে লাগা [দৃঢ় সংকল্প নিয়ে কাজ করা]—আদা জল পেয়ে লেগে যাও, দেখবে ঠিক পাস করছে। ২৮. আমড়া কাঠের ঢেঁকি [অকর্মণ্য]—তুমি গুকে বলেছ ঘর সাফ করতে? তা হলেই হয়েছে। ও ত' একটা আমড়া কাঠের ঢেঁকি। ২৯. আষাঢ়ে গল্প [অবাস্তব গল্প]—রাখো তোমার আষাঢ়ে গল্প। ভালো লাগে না এ সব উদ্ভট গল্প শুনে। ৩০. আকাশ থেকে পড়া [আশ্চর্য হওয়া]—আমার কথা শুনে সে একেবারে আকাশ থেকে পড়লো; যেন কিছুই জানে না। ৩১. আমতা আমতা করা [সত্য গোপনের জন্ত কিছু বন্ধে দ্বিধা প্রকাশ করা]—সে এখন আমতা আমতা করছিল, তখনই আমি বুঝেছিলাম, বইটা ও ছাড়া আর কেউ নেয়নি। ৩২. আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া [দুর্ভাগ্য কিছু পাওয়া]—বুধ বয়সে পরিতোষবাবু হারানো ছেলেকে ফিরে পেয়ে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন।

৩৩. ইঁচড়ে পাকা [ডেঁপো; বয়সে বালক, বচনে বৃদ্ধ]—ছেলেটি একেবারে ইঁচড়ে পাকা, এই বয়সে যত পাকা পাকা কথা ওর মুখে। ৩৪. ইলুশে গুঁড়ি [গুঁড়ি গুঁড়ি দৃষ্টি]—সারাদিন ধরে ইলুশে গুঁড়ি বরছিল। ৩৫. ইতি গজ [গোজামিল]—যেমন পারি ইতি গজ করে কাজটা সারলাম। ৩৬. ইঁদুরে কপাল [হঠাৎ ভাগ্যোদয়]—এখন তোমার ইঁদুরে কপাল, পেয়ে গেলে মূঠো মূঠো টাকা, এখন আর তোমার ভাবনা কি?

৩৭. উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ [অকেজো জিনিস দান করে আশ্রয়দাতা]—আমাকে দিলে কুড়িয়ে-পাওয়া পুরোনো একটা কোট—গায়ে দেওয়াই বাবে না—উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ। ৩৮. উত্তর সঙ্কট [তুই বিপদের মধ্যে পড়া]—আমায়  
• এখন উত্তর সঙ্কট, একদিকে মায়া, অন্যদিকে মেসো—কাকে রাখি কাকে ছাড়ি!

৩৯. উড়ো কথা [ শুভব ]—উড়ো কথায় কান দিও না। ৪০. উড়ো চিঠি [ বেনামী চিঠি ]—লোকটার নামে রোজ কত বে উড়ো চিঠি আসতো, তারুঠিক নেই। ৪১. উলুবনে মুক্তো ছড়ানো [ অপাঙ্গে সহৃদয় বর্ষণ ]—তোমাকে এ সব কথা বলা মানে উলুবনে মুক্তো ছড়ানো, তা আমি জানি। ৪২. উত্তম মধ্যম দেওয়া [ প্রহার করা ]—লোকটাকে উত্তম-মধ্যম দিয়ে বিদায় করে দাও। ৪৩. উড়ন চণ্ডী [ অপব্যয়ী ]—কর্তামশাইর মেজোছেলে উড়ন চণ্ডীর মতো টাকা খরচ করে চলেছে। কিন্তু এর জন্যে একদিন আপসোস করতে হবে তাকে। ৪৪. উড়ে এসে জুড়ে বসা [ অনধিকারীর সহসা প্রতিষ্ঠা লাভ ]—কে হে বাপু তুমি? উড়ে এসে জুড়ে বসলে এখানে? ৪৫. উপরোধে ঢেঁকি গেলা [ পরের অহরোধে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করা ]—ইচ্ছা ছিল না, তবু আমাকে কাজটা করতে হলো; যেন উপরোধে ঢেঁকি গেলা। ৪৬. উল্টো গাওয়া [ বিপরীত কথা বলা ]—উনি ছিলেন বড় একজন কম্যুনিষ্ট, এখন ধনীলোকের জামাই হয়ে উল্টো গাইতে শুরু করেছেন। ৪৭. উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে [ একের দোষ অপরের উপর চাপানো ]—দোষ করল কে, আর শাস্তি পেল কে?—উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে আর কি?

৪৮. উনপঞ্চাশ বায়ু [ পাগলামি ]—তোমার মাথায় উনপঞ্চাশ বায়ু ভর করেছে নাকি হে? কাজে-কর্মে, কথায়-বার্তায় তারই আভাস দেখছি যেন।

৪৯. একাদশ বৃহস্পতি [ খুব সুসময় ]—তোমার ত' এখন একাদশ বৃহস্পতি, হাতের ধুলোমুঠিও সোনামুঠি হয়ে যাচ্ছে। ৫০. এক ফুরে মাথা কামানো [ একমতাবলম্বী হওয়া ]—তোমারও দেখি তার মতো কথা; এক ফুরে মাথা কামিয়েছ নাকি? ৫১. একটিলে দুই পাখি মারা [ একসঙ্গে দুই কার্য সিদ্ধ করা ]—‘হু’ পক্ষই আমার সাহায্য চায়; এমন একটা কাজ করবো, যাতে এক টিলে দুই পাখি মরে। ৫২. একমাঘে শীত যায় না [ বিপদ বারে বারেই আসতে পারে ]—বিপদ কেটে গেছে; তবু মনে রেখো, এক মাঘে শীত যায় না।

৫৩. ওৎপাতা [ স্ববোগের অপেক্ষায় থাকা ]—স্ববোগের অপেক্ষায় সে ওৎ পেতে বসে আছে। ৫৪. ওয়ুধ ধরা [ ফল পাওয়া ]—সেদিন শাস্তি পেয়ে রমেন পড়াশুনায় মন দিয়েছে, দেখছি; ওয়ুধ ধরেছে তাহলে।

৫৫. কলুর বলদ [ পর-চালিত লোক ]—কলুর বলদের মতো না চলে একটু নিজের বিত্তাবৃত্তি খাটাও। ৫৬. কত ধানে কত চাল [ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ]—রোজ রোজ ক্লাস পালাও; একদিন ধরা পড়লে বুঝতে পারবে, কত ধানে কত চাল। ৫৭. কড়ান্ন-গুণায় [ পুরোপুরি ]—আমার পাওনা আমি কড়ায়-গুণায় বুঝে নেবো। ৫৮. কপাল কেরা [ ভাগ্য হ্রাসের হওয়া ]—বড় সাহেবের নজরে পড়ে তার এখন কপাল ফিরতে শুরু করেছে। ৫৯. কলকাঠি নাড়া [ আড়ালে থাকিয়া উদ্ভাবন দেওয়া ]—আড়ালে বসে ব্রিটেন আর আমেরিকা কলকাঠি নাড়বে, আর ভারত-কৃষ্ণের হিন্দু-মুসলমান আমরা পরস্পর হানাহানি করে মরবো? ৬০. কাঠী ঘায়ে মুলের ছিটে [ হৃৎকের উপর আরো হৃৎক ]—পুঞ্জশোকগ্রস্ত লোকটিকে

- এভাবে গালি দিয়ে কাটা ঘারে হুনের ছিটে দিও না। ৬১. কাঁটা নটের ঝাড় [ দুই ব্যক্তি ]—বার পাঠায় পড়েছ, ও একটি কাঁটা নটের ঝাড়; ধনেমানে বেরিয়ে আসতে পার কিনা, দেখ। ৬২. কানে তুলো দেওয়া [অগ্রাহ্য]—ওনতে পাছো না, কি বলছে ওরা? কানে তুলো দিয়ে বসে আছে নাকি? ৬৩. ক-অক্ষর গোমাংস [নিরক্ষর]—চুল আর পোশাকের বহর দেখে ভুলে যেও না। ভেতরে কিন্তু ক-অক্ষর গোমাংস। ৬৪. কাঁঠালের আমসত্ত্ব [অসম্ভব ব্যাপার]—এ হাড়-কৃপণ লোকটার কাছ থেকে চাঁদা অদায় করেছে; এ যে দেখি কাঁঠালের আমসত্ত্ব! ৬৫. কাঁচা পয়সা [প্রচুর অর্থ]—রতনের হাতে এখন কাঁচা পয়সা, তাই মাথাটা ঠিক রাখতে পারেনি। ৬৬. কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরা [অল্প বয়সে বকে যাওয়া]—এই বয়সে এতো—এ যে দেখছি, কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরেছে। ৬৭. কেঁচে গণ্ডুষ করা [নতুন করে আরম্ভ করা]—অন্ধ ভুলে গিয়ে এখন ছোট ভাইকে শেখাতে বসে আবার কেঁচে গণ্ডুষ করতে হচ্ছে। ৬৮. কালো বাজার [চোরাই কারবার]—কালো বাজারের ফলে এখন দেশের এক শ্রেণীর লোক আঙুল ফুলে কলা গাছ হয়ে উঠেছে। ৬৯. কান ভারী করা [পরের কথায় বিশ্বাস করা]—তুমি তো নীলুর কথা শুনে কান ভারী করে বসে আছে; আমার কথা কি তুমি আর শুনবে? ৭০. কথায় চিড়ে ভেজে না [মৌখিক শ্লোক বাক্য]—শুধু কথায় চিড়ে ভেজে না। নগদ কিছু দিলে ভালো হয়। ৭১. কথায় কথায় [প্রসঙ্গক্রমে]—কথায় কথায় সেদিন সেন মশাইর প্রস্তাব এসে পড়লো। ৭২. কথায় কথা [মূল্যহীন কথা]—টাকা হলে সবই হয়—ওটা শুধু একটা কথার কথা। ৭৩. কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা [শত্রু দিয়ে শত্রু নাশ করা]—কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা—এই হলো চাঞ্চাল-নীতি। ৭৪. কাজির বিচার [বিচারের নামে গ্রহণ]—কার দোষে কার শাস্তি হলো—এ যে কাজির বিচার! ৭৫. কান পাতলা [যে পরের কথায় বিশ্বাস করে]—লোকটি বড় কান পাতলা, পরের কথায় ওঠে আর বসে। ৭৬. কলির সন্ধ্যা [ভয়াবহ পরিণতির সূত্রপাত]—নতুন কর বসানোর কথায় আংকে উঠছে কেন? এই তো মরে কলির সন্ধ্যা। করের চাপে একদিন 'তাহি' 'তাহি' বলে চীৎকার করতে হবে। ৭৭. কঙ্কে পাওয়া [আমল পাওয়া]—হুঁ পাতা লিখে সাহিত্যের সমাজে কঙ্কে পায়ে ভেবেছ? অত সহজ নয় হে। ৭৮. কান-কাটা [নির্ভঙ্ক]—তোমার মতো কান-কাটা মানুষ আর দেখিনি; লোকে এতো অপমান করে, তবু তোমার জ্ঞান হয় না? ৭৯. কুস্তকর্ণের নিভ্রা [দীর্ঘকাল উত্তমহীন]—পালে বাঘ না পড়লে সরকারের কুস্তকর্ণের নিভ্রা ভাঙে না। ৮০. কালনেমির লঙ্কা ভাগ [কাজ শেষ হওয়ার আগে লাভের হিসাব]—আগে চাকরিটা পাও, তারপর কাকে কি দেবে হিসেব করলে চলবে—এখনই কালনেমির লঙ্কা ভাগ কেন? ৮১. কাঠের পুতুল [জড় ব্যক্তি]—সব তো শুনলে; এখন কাঠের পুতুলের মতো বসে না থেকে কাজে লেগে যাও। ৮২. কুরুক্ষেত্র বাধানো [ভীষণ ঝগড়া করা]—চাকরটা দেবী করে বাড়ি কেয়ার বাড়ীর গিন্নী একেবারে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাধিয়ে বসলেন। ৮৩. কৈ

মাছের প্রাণ [অত্যন্ত কষ্ট-সহিষ্ণু]—আমার কৈ মাছের প্রাণ বলে এত কষ্ট-সহ্যে আনতে পেরেছি। ৮৪. কৈচো খুঁড়তে সাপ [তুচ্ছ ব্যাপার থেকে বৃহৎ ব্যাপ্তিরে হৃদয় আধিকার]—হুনিতির তদন্ত আরম্ভ হয়েছে। দেখা যাক, কৈচো খুঁড়তে সাপ বেরোর কিনা। ৮৫. কুপমণ্ডুক [বিষবিমুখ] কুপমণ্ডুকেরা হুনিয়ায় কি হচ্ছে, কোন খবরই রাখে না। ৮৬. কোণঠাসা [বেকায়দায় পড়া]—লেভী আর রেশন-প্রথা চালাতে গিয়ে সরকারের এখন একেবারে কোণঠাসা অবস্থা। ৮৭. কেটেবিট্টু [গণ্যমাত্র লোক]—পথঘাট বেশ সাজানো হয়েছে দেখছি—কোন কেটেবিট্টু আসবেন বোধহয়। ৮৮. কেও-কেটা [তুচ্ছ লোক]—তোমার বাড়ি এসেছেন বলে ঠেকে কেও-কেটা ভেবো না। উনি কিন্তু আসলে একজন জাঁদরের অফিসার। ৮৯. কানের পোকা বার করা [বৃত্ততা করে উদ্ভাসিত করা]—এখনকার দেশ-সেবা মানে তো চীৎকার করে মাহুষের কানের পোকা বের করা। ৯০. কেতাদুরস্ত [ক্যাসান-সম্মত]—শহরে কেতাদুরস্ত পোশাকে তাহাকে দেখিয়া আমি অবাক হইয়া গেলাম।

৯১. খয়ের খাঁ [মোসাহেব]—বড়লোকের খয়ের খাঁ হয়ে জীবনধারণ করা বিড়ম্বনা মাত্র। ৯২. খাল কেটে কুমার আনা [কৃতকর্মের ফলে বিপদ ঘটানো]—বৈদেশিক শক্তির সাহায্য চাওয়া আর খাল কেটে কুমার আনা একই কথা।

৯৩. গায়ে পড়া [স্বৈচ্ছায়] গায়ে পড়ে প্রতিবেশীকে তোমার উপদেশ দিতে যাওয়া ঠিক হয়নি। ৯৪. গোবর গণেশ [নির্বোধ]—ছেলেটিকে চালাক মনে করেছিলুম; কিন্তু এখন দেখছি, ওটি একটি গোবর গণেশ। ৯৪. গোকুলের ষাঁড় [নিষ্কর্ম]—শহরের অলিতে গলিতে যে সব ছেলে দেখ, অধিকাংশই গোকুলের ষাঁড়—কোন কর্মের নয়। ৯৬. গৌফ-খেজুরে [অত্যন্ত অলস]—তোমাদের মতো গৌফ-খেজুরেদের জীবনে কিছুই হবে না। ৯৭. গণেশ ওল্টানো [কারবার ওল্টানো]—কাপড়ের কারবারে গণেশ ওলটিয়ে তবে এই লোহার কারবার খুলেছি। ৯৮. গড্ডলিকা প্রবাহ [অসুস্থকরণ]—পড়াশোনা শেষ করে একটা চাকরি নিয়ে গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসলাম।

৯৯. গুড়ে বালি [বড় আশায় ছাই]—বড় আশা করে গিয়েছিলাম; কিন্তু ভাই, সে গুড়ে বালি। ১০০. গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা [কাহারও কৃতৃত্বের দ্বারা তাহাকেই স্মরণ]—রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতার মধ্য দিয়ে আমরা গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজাই করলাম। ১০১. গোবরে পদ্মফুল [নীচ কুলে মহৎ ব্যক্তি]—যেটি সামান্য ঘরে জন্মালেও কিন্তু গোবরে পদ্মফুল। ১০২. গৌরচন্দ্রিকা [ভণিতা]—যা বলবার সংক্ষেপে বলে ফেল—এত গৌরচন্দ্রিকার প্রয়োজন কি?

১০৩. গোরু মেয়ে জুতো দান [ভীষণ ক্ষতির সামান্য ক্ষতিপূরণ]—চাকরি ছাড়িয়ে দিয়ে মাত্র এক মাসের মাহিনা দেওয়া—এ ত' গোরু মেয়ে জুতো দান। ১০৪. গদাই লঙ্করি চাল [অত্যন্ত মন্থর গতি]—সরকারের গদাই লঙ্করি চলে কবে কাজটা শেষ হবে, ভগবানই জানেন। ১০৫. গোলে হরিবোল [দায়সার]



কাজ]—চাকরটা হয়েছে মহা কাকিবাছ। এত লোকের মধ্যে গোলে হরিষোল দিয়ে কেটে পড়তে তার কুড়ি নেই। ১০৬. 'গোড়ায় গলদ বা বিলম্বিত গলদ [ মূল্যে ক্রটি ]—ছেলেটি লেখে ভালো, কিন্তু গোড়ায় গলদ—ব্যাকরণ একেবারে জানে না। ১০৭. গরীবের ঘোড়া রোগ [ অবস্থার অতিরিক্ত আড়ম্বর ]—গরী নেই, খেলা দেখতে এসেছে, গরীবের ঘোড়া রোগ কেন, বাবা? ১০৮. গোদের উপর বিষ ফোড়া [ কষ্টের উপরে আরো কষ্ট ]—জরই সারেনি, তার উপর দাঁতের ব্যথা; একেবারে গোদের উপর বিষ ফোড়া। ১০৯. গোলায় যাওয়া [ নষ্ট হয়ে যাওয়া ]—অসৎ সঙ্গে পড়ে ছেলেটা একেবারে গোলায় গেছে।

১১০. ঘোড়া দেখলেই খোঁড়া [ সামান্য সাহায্যের স্বযোগে আত্মনির্ভরতা ত্যাগ করা ]—কাজটা করছিলে বেশ, ও আসতেই রেখে দিলে কেন? তুমি যে দেখছি, ঘোড়া দেখলেই খোঁড়া। ১১১. ঘরের ঢেঁকি কুমীর বা ঘরভেদী বিষয়ণ [ নিজেদের মধ্যেই বিশ্বাসঘাতক ]—ওকে বিশ্বাস করো না। ও হচ্ছে ঘরের ঢেঁকি কুমীর। ১১২. ঘাট মানা [ ক্রটি স্বীকার করিয়া নত হওয়া ]—এই সামান্য কথায় তুমি রাগ করলে? ঘাট মানছি, ভাই, এমন কথা আর আমি জীবনে বলবো না। ১১৩. ঘাড় ভাঙা [ জ্বরদগ্ধি করে আদায় করা ]—সমর হাক্কর ঘাড় ভেঙে রোজ টিফিন পায়। ১১৪. ঘাড়ে চাপা [ গলগ্রহ হওয়া ]—এই দুদিনে দুঃ-সম্পর্কের এক পিসি চার পাঁচটি ছেলেপুলে নিয়ে এসে ঘাড়ে চেপেছেন। ১১৫. ঘাড়ে ভূত চাপা [ দুর্বৃত্তি হওয়া ]—ঘাড়ে ভূত চাপলো, আর অমনি দশ হাজার টাকার শস্যার কিনে ফেললে? ১১৬. ঘুণাকর [ সামান্য ইংগিত ]—ইরাকে যে এত বড় সামরিক অভ্যুত্থান হতে যাচ্ছে, কেউ ঘুণাকরেও তা টের পায়নি। ১১৭. ঘোড়া ডিঙাইয়া ঘাস খাওয়া [ উর্বরতন কষ্টপত্রকে না মেনে কিছু করা ]—তোমার অফিসারকে কিছু না বলে খোদ মালিককে প্রমোশনের কথা বলতে গেছ; ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া কি এত সহজ? ১১৮. ঘোড়ার ঘাস কাটা [ বাজে কাজ করা ]—কাজ করি না তো আমি কি এখানে ঘোড়ার ঘাস কাটতে রোজ আসি? ১১৯. ঘোল খাওয়ানো [ নাস্তানাবুদ করা ]—ওকে একবার হাতে পেলে বোল খাইয়ে ছাড়বো। ১২০. ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে [ যে বিপদে সকলেই পড়তে পারে, কাউকে তাতে পড়তে দেখে উল্লসিত হওয়া ]—প্রতিবেশীর এই বিপদে তাকে উল্লসিত হতে দেখলাম।—ঘুঁটে পোড়ে, গোবর হাসে। ১২১. ঘাম দিয়ে জর ছাড়া [ বিপন্ন হওয়ার স্বস্তি ]—জ্বরভেঁরা চলে যেতে আমার ঘেন ঘাম দিয়ে জর ছাড়লো।

১২২. চিনির বলদ [ ভারবাহী, কিন্তু ফলভোগী নয় ]—সন্দেশের কারখানায় কাজ করলে কি হয়; আমরা সব চিনির বলদ—তাড়ু নাড়াই সার। ১২৩. চোখ টাটানো [ ঈর্ষাপরায়ণ হওয়া ]—ওর উন্নতিতে তোমার চোখ টাটাবার কারণ কি? ১২৪. চক্ষুঃশূল [ দেখিলে বিরক্তি হয়, এমন ব্যক্তি ]—আমি তোমার চক্ষুঃশূল, তা কি আমি জানি না? ১২৫. চোখের বালি [ চক্ষুঃশূল ]—জানি, আমি তোমার চোখের বালি; তুমি আমাকে কখনো দইতে পারো না। ১২৬. চোখে ধুলো দেওয়া

[ঠকানো]—চোরটা পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে গেল। ১২৭. চোখেয় চামড়া [চক্ষু-লঙ্কা]—লোকটার চোখের চামড়া বলতে কিছু নেই। আমার এই ছদ্মবেশ টাকা চাইতে এসেছে। ১২৮. চাল চালা [কলি খাটান]—তুমি যতই চাল চালা, ওর সঙ্গে পেরে উঠবে না। ১২৯. চুল-চেরা ভাগ [হস্ত ভাগ]—বা হয় মোটামুটি ভাগ করে দাও, তোমাকে চুল-চেরা ভাগ করতে কে বলেছে? ১৩০. চুল-চেরা বিচার [অতিহস্ত বিবেচন]—অত চুল-চেরা বিচার করতে গেলে কাব্যরস উপলভি করা যাবে না। ১৩১. চক্ষুদান করা [চুর করা]—আর বাই করো, আমার ঘড়িটার চক্ষুদান করো না। ১৩২. চক্ষু চড়কগাছ [অতিমাত্র বিশ্বাস]—ছেলেটির কাণ্ড-কারখানা দেখে তো আমার চক্ষু চড়কগাছ। ১৩৩. চর্বিভ চর্বণ [একই বিষয়ের পুনরাবলোচনা]—আজকের সভায়ও তিনি তাঁর গতদিনের বক্তৃতারই চর্বিভ চর্বণ করলেন। ১৩৪. চশমখোর [চক্ষু-লঙ্কাহীন]—মহাজনেরা চিরকালই চশমখোর হয়ে থাকে, এ আর নতুন কথা কি? ১৩৫. চাঁদের হাট [আনন্দের একত্র সমাবেশ]—ছেলেপুলে, নাতি-নাভনীদেব নিয়ে বাড়িতে তুমি যে একেবারে চাঁদের হাট বসিয়ে দিয়েছ। ১৩৬. চুনকালি [কলঙ্ক]—আর খাই করো, বংশের নামে চুনকালি দিও না। ১৩৭. চুলোয় যাওয়া [ধ্বংস পাওয়া]—লাভ চুলোয় যাক, এখন আসলটা হাতে এলেই বাঁচি। ১৩৮. চুনো পুঁটি [সামান্ত ব্যক্তি]—আমরা তো সব চুনোপুঁটি, উনি রাজামানুষ—আমাদের সঙ্গে কথা বলবেন কেন?

১৩৯. ছিচ কাঁদুনে [ছুঁইলে কাঁদে, এমন]—এমন ছিচ কাঁদুনে ছেলে আমি জন্মে দেখিনি, হাতটা ধরেছি, এমনি কেঁদে বাড়ি মাথায়! ১৪০. ছিনে জোঁক [নাছোড়বান্দা]—লোকটা একেবারে ছিনে জোঁক, কিছু আদায় না করে কিছুতেই ছাড়লে না। ১৪১. ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো [অনাদৃত অথচ সর্বশেষ অবলম্বন]—তুমি আর বাবে কোথায় বলো?—আমি আছি তোমার ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো। ১৪২. ছাই-চাপা আগুন [অপ্রকাশিত প্রতিভা]—ছেলেটি ছাই-চাপা আগুন, একদিন সকলের চোখে ও তাক লাগিয়ে দেবে, দেখো। ১৪৩. ছিনিমিনি খেলা [তছনছ করা]—মাথার উপর কেউ না থাকায় বাপের সম্পত্তি নিয়ে ছেলেটা ছিনিমিনি খেলছে। ১৪৪. ছুঁচোর কেতন [স্বদা কলহ]—তোমাদের বাড়িতে তো সব-সময় ছুঁচোর কেতন জেগে আছে। ১৪৫. ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করা [সামান্ত লাভের জন্য বদনাম কড়ানো]—সামান্ত ক'টা টাকার জন্তে মিথ্যা কথা বলে ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করি আর কি! ১৪৬. ছেলের হাতে মোসলা [সহজে তুলিয়ে নেবার জিনিস]—পাকিস্তান যতই ছল-চাতুরি করুক—কাশ্মীর ছেলের হাতে মোসলা নয়।

১৪৭. জিলিপির প্যাঁচ [কুট বুদ্ধি]—মথুর মথুর মথুর কথার কুলো না, ওর পেটে আছে জিলিপির প্যাঁচ। ১৪৮. জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ [সকল কাজের পটুতা]—জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ—সব কাজই ঠকে করতে হয়। ১৪৯. জড় ভরত [নিষ্ক্রিয়]—জড় ভরত হয়ে বলে থাকলে জীবনে কিছুই করতে র. বি. (২য়)—১২

পারবে না। ১৫০. জগাখিচুড়ি [বিসদৃশ মিশ্রণ]—সে বাংলা আর হিম্মি মিশিয়ে এক জগাখিচুড়ি ভাবায় কথা বলে।

১৫১. ঝড়ো কাক [কক যুতি]—এমন সময় ঝড়ো কাকের মতো কোথা থেকে হুবল এসে হাজির। ১৫২. ঝাঁকের কই [এক দল-মতের লোক]—এখন ও দলছাড়া; হুঁসিন বাড়েই ঝাঁকের কই ঝাঁকেই মিশে বাবে। ১৫৩. ঝোপ বুঝে কোপ মারো [স্বযোগ বুঝে কাজ সারা]—আমি শুধু স্বযোগের অপেক্ষায় আছি; সময় এলেই ঝোপ বুঝে কোপ মারবো। ১৫৪. ঝাল ঝাড়া [রাগ দেখানো]—বহুদিন পরে তিনি আমাকে সামনে পেয়ে বেশ মনের সুখে ঝাল ঝাড়লেন।

১৫৫. টলক নড়া [চৈতন্ত হওয়া]—মাহুষ না খেয়ে মরছে, তবু সরকারের টলক নড়ে না। ১৫৬. টই টব্বুর [কানায় কানায় পূর্ণ]—এ বছর প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে, খাল-বিল, নদীনালা সব টইটব্বুর। ১৫৭. টাকার কুমীর [বিপুল ধর্মের অধিকারী]—চোরা কারবার করে সে এখন টাকার কুমীর হয়ে উঠেছে। ১৫৮. টেকা দেওয়া [প্রতিযোগিতা করা]—সব কাজেই মেয়েরা এখন ছেলের সঙ্গে টেকা দিচ্ছে।

১৫৯. টোটকাটা [স্পষ্ট বক্তা]—এমন টোটকাটা মাহুষ দেখিনি বাপু; সুখে বা-ই আসে তা-ই বলে দেয়। ১৬০. ঠুটো জগন্নাথ [অক্ষম]—ঠুটো জগন্নাথের মতো বসে না থেকে কাজটা সেরে ফেল। ১৬১. ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় [বেথানে সকলেই সমান অপরাধী]—সমাজে এত দুর্নীতি যে, ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে বাবে।

১৬২. ডামাডোল [ওলাট-পালাট]—সুকের ডামাডোলে কে বে কোথায় গেল, আর দেখা পেলাম না। ১৬৩. ডান হাতের ব্যাপার [খাওয়া-দাওয়া]—বিবাহের দেরী আছে। চলো, আমরা ডান হাতের ব্যাপারটা আগেই সেরে ফেলি। ১৬৪. ডাল-ভাড়া ফ্রোশ [অতি দূরত্ব]—কখন বেরিয়েছি; এখনও বলছো আরও হুঁফ্রোশ; এ যে দেখছি ডাল-ভাড়া ফ্রোশ। ১৬৫. ডুব মারো [অদৃষ্ট হওয়া]—সে সেই যে ডুব মেরেছে, আজও তার দেখা নেই। ১৬৬. ডুবে ডুবে জল খাওয়া [গোপনে গোপনে কিছু করা]—লোকটার বাইরে সাধুর বেশ; কিন্তু ডুবে ডুবে জল খাওয়ার গুরু। ১৬৭. ডাকাবুকো [দুঃসাহসী]—অন্ধকার রাত্রে একা একা ছেলেটা পালিয়ে এসেছে। এমন ডাকাবুকো ছেলে আমি দেখিনি। ১৬৮. ডুমুরের ফুল [অদৃষ্ট]—তুমি যে আজকাল ডুমুরের ফুল হয়ে গেছ হে; দেখা-সাক্ষাৎ একে-বারেই নেই।

১৬৯. ঢাক ঢাক গুড়গুড় [গোপন রাখার চেষ্টা]—বা বলার বলেই ফেল; অত ঢাকঢাক গুড়গুড় কিসের? ১৭০. ঢাক পিটানো [প্রচার করা]—পালের খবরটা সে ঢাক পিটিয়ে সবাইকে জানিয়ে দিল। ১৭১. ঢাকের বাঁয়া [ব্যক্তিবাহীন অহুত্ব]—সেক্রেটারীর ঢাকের বাঁয়া হয়ে আমি করিটিতে থাকতে পারবো না। ১৭২. চিমে ভেতালো [অত্যন্ত মনঃপতি]—এমন চিমে ভেতালো ভবিতে কাজ করলে জীবনেও শেষ করতে পারবে না।

১৭৩. ভালপাতার লিপাই [অত্যন্ত রোগা]—জামাই হয়েছে একটা

তালপাতার সিপাই; বাতাসেই বুঝি উড়ে যাবে। ১৭৪. তাক লাগানো [অবাক করে দেওয়া]—এমন অভিনয় করবো যে, সবাইকে তাক লাগিয়ে দেবো। ১৭৫. তালকানা [মাজাজানহীন]—চাঁদুর মতো তালকানা লোককে দিয়েছো কেনাকাটার ভার। দেখো, কি করে আসে। ১৭৬. তিলকে তাল করা [ভুল ঘটনা কাঁপিয়ে তোলা]—তিলকে তাল করতে পারায় যার ছুড়ি নেই, তুমি সেই রাহু পিসির কথা বিশ্বাস করছো? ১৭৭. তেলে-বেগুনে জলে ওঠা [অত্যন্ত রোগে ওঠা]—চাকরটা কাঁচের বাসন ভেঙে ফেলেছে শুনেই গিরিমা একেবারে তেলে-বেগুনে জলে উঠলেন। ১৭৮. তেলা মাখায় তেল দেওয়া [প্রয়োজন-হীনকে দান]—‘তেলা মাখায় তেল দেওয়া মহাজ্ঞাতির রোগ।’ ১৭৯. তুষের আগুন [দীর্ঘস্থায়ী দুঃখ]—একমাত্র ছেলেকে হারাবার পর থেকে নিঃসহায় বৃদ্ধার বুকে তুষের আগুন জ্বলছে। ১৮০. তুলসীবনের বাঘ [ছদ্মবেশী]—লোকটি সাধু সেজে বেড়ালে কি হবে, আসলে উনি একটি তুলসীবনের বাঘ;—একেবারে পাকা শয়তান। ১৮১. তীর্থের কাক [কোন কিছুই প্রত্যাশী]—বৃদ্ধা তাঁর ছেলের টাকার প্রত্যাশায় বাড়িতে তীর্থের কাকের মতো বসে আছেন। ১৮২. তাসের ঘর [ভুল]—পাকিস্তানে কত হিন্দুর স্বপ্নের সংসার তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়লো। ১৮৩. তুলকালাম [তুল বগড়া]—ছোট্ট একটা কথা নিয়ে পাড়ায় এমন তুলকালাম কাণ্ড ঘটে যাবে—কে আগে জানতো?

১৮৪. থ হয়ে যাওয়া [ভীষিত হয়ে যাওয়া]—ওইটুকু ছেলের মুখে এমন পাকা পাকা কথা শুনে আমি তো থ হয়ে গেলাম। ১৮৫. থই পাওয়া [ঠাই পাওয়া]—চরম দুদিনে বন্ধুর আত্মকল্যাণ পেয়ে সে যেন থই পেল। ১৮৬. থোঁতা মুখ ভোঁতা করা [দেমাৎ ভেঙে দেওয়া]—সবার সামনে কথাটা ফাঁস করে দিলে কেমন তার থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দিলাম।

১৮৭. দায় সারা [যেমন-তেমন করে করা]—তোমার এই দায় সারা গোছের কাজ আমার একদম ভালো লাগে না। ১৮৮. দু’মুখো সাপ [যার কাছে যেমন, তার কাছে তেমন]—নিম্ন একটা দু’মুখো সাপ; তোমার কাছে এক একম বল, অন্যের কাছে বলে আরেক রকম। ১৮৯. দস্তখস্ত [হৈ হট্টগোল]—তাঁর বক্তৃতা শুক হতেই সভায় একবারে যেন দস্তখস্ত বেধে গেল। ১৯০. দহরম-মহরম [খুব খাতির]—ধানার দারোগার সঙ্গে কেশববাবুর খুব দহরম-মহরম। ১৯১. দস্তখুট করা [বুঝতে পারা]—সে বছর এমন শক্ত প্রশ্ন হয়েছিল যে, ভালো ছেলেরাও দস্তখুট করতে পারেনি। ১৯২. দাঁও মারা [সহজে লাভ করা]—স্বপ্নের স্বপ্নোগে চোরা কারবারীরা বেশ দাঁও মেয়েছে। ১৯৩. দিনে ডাকাতি [প্রকৃষ্টে প্রতারণা করা]—তিন টাকার জিনিস দশ টাকায় বেচো; এ-বে দিনে ডাকাতি হে! ১৯৪. দৈত্য-কুলের প্রহ্লাদ [অসং বংশে সংলোক]—ডাকাতের বংশে এমন ছেলে! এ দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ! ১৯৫. দু’ নৌকায় পা [উভয় দিক বদায় রাখার চেষ্টা]—আবার এখন দু’ নৌকায় পা; কাকে ছাড়ি, কাকে রাখি? ১৯৬. দু’ কাল কাট

[ অতিশয় নির্লজ্জ ]—লোকটা একেবারে ছ' কান কাটা ; বতই বলো, তবু কিছুতেই চেতনা হয় না। ১১৭. তুট্টা সরস্বতী ভর করা [ ছবু'ছি হওয়া ]—সেদিন তোমার বাড়ি তুট্টা সরস্বতী ভর করেছিল ; তা নইলে এমন কথা বলতে পারো ? ১১৮. দুধের সাধ ঘোলে মেটানো [ আসলের অভাব নকলে পূরণ করা ]—কফির অভাবে চা খেলায় ; কিন্তু দুধের সাধ কি ঘোলে মেটে ?

১১৯. ধর্মের ঝাঁড় [ অকর্মণ্য ]—নিধুবাবুর ছেলেটা সারাদিন পাড়ায় ধর্মের ঝাঁড়ের মতো ঘুরে বেড়ায়। ২০০. ধান ভানতে শিবের গীত [ প্রশাসনিক কথা ]—রবীন্দ্রনাথের কথা বলতে উঠে ভদ্রলোক নিজের জীবনী বলতে আরম্ভ করলেন—একেই বলে ধান ভানতে শিবের গীত। ২০১. ধরাকে সরাসরি জান করা [ অত্যন্ত অহংকার প্রকাশ করা ]—পরীক্ষায় পাস করে সে একেবারে ধরাকে সরাসরি জান করতে আরম্ভ করেছে। ২০২. ধনুক-ভাড়া পণ [ ভীষণ প্রতিজ্ঞা ]—রায়বাবুর ছোটো-ছেলে বিলিতি ডিগ্রী না নিয়ে দেশে ফিরবে না ; এ যে তার ধনুক-ভাড়া পণ। ২০৩. ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির [ অত্যন্ত সং ]—মধ্যে কথা বলবে না ত' সবংশে মর, একেবারে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির। ২০৪. ধামা চাপা দেওয়া [ মূলতবী ]—দালা এসে পড়ায় ব্যবস্যা-যুদ্ধির প্রসঙ্গটি আপাততঃ ধামা চাপা দেওয়া হলো। ২০৫. ধামাধরা [ খোলামুখে ]—ধনীর বারা ধামাধরা, তাদের কাছে গরীবদের আশা করার কিছু নেই। ২০৬. ধোপে টেকা [ যুক্তিনির্ভর হওয়া ]—তোমার যুক্তিগুলো শুনে বোঝে, কিন্তু ধোপে টেকে না।

২০৭. নদীর পুতুল [ শ্রম-কাতুরে ]—এমন নদীর পুতুল ছেলেকে নিয়ে কি হবে ? এখনো নিজের হাতে খেতেই শিখল না। ২০৮. নেই-আঁকড়া [ নাছোড়বান্দা ]—যত্নর মতো নেই-আঁকড়া ছেলের সঙ্গে তুমি কিছুতেই পেরে উঠবে না। ২০৯. নমো নমো করে সারা [ কোন রকমে দায় উদ্ধার ]—টাকা পরসার বড়ো টানাটানি, তাই কাছটা নমো নমো করে সারতে হলো। ২১০. নম্র-ছন্ন করা [ বাজে নষ্ট করা ]—বাপের অসুস্থস্থিতিতে ছেলে সমস্ত টাকা-পয়সা নম্র-ছন্ন করে শেষ করে ফেললো। ২১১. নখ-দর্পণে ঝাকা [ বিশেষভাবে জানা ]—পৃথিবীর কোথায় কি হচ্ছে, সমস্ত গুঁর নখ-দর্পণে আছে। ২১২. নম্রনের মণি [ একান্ত প্রিয় ]—একমাত্র ছেলেটি ছিল দুঃখিনী জননীর বুকের ঘন—নয়নের মণি। ২১৩. নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা [ অক্ষয়ের বাজে অজ্ঞাত ]—হারমোনিয়াম বাজাতে জানো না, তাই বলো ; হারমোনিয়ামটাকে খারাপ বলছো কেন ? নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা। ২১৪. নাড়ীনক্স [ খুঁটিনাটি ]—আমাকে তোমার সবকিছু কিছু বলতে হবে না। আমি তোমার নাড়ীনক্স জানি। ২১৫. নাক সিটকানো [ অবজ্ঞা প্রকাশ করা ]—মার্কিন যুক্তরাজ্য থেকে ফিরে এসে সে এখন দেশের মানুষদের নাক সিটকোতে আরম্ভ করেছে। ২১৬. নবমীর পাঁঠা [ চরম বিপদের সম্মুখীন ]—আমাকে দেখে সে নবমীর পাঁঠার মতো ভয়ে কাঁপতে লাগলো। ২১৭. নাকে তেল দিলে ঘুমানো [ নিশ্চিন্তে সময় কাটানো ]—দরখাস্ত করবার শেষ তারিখ কবে চলে গেছে ; এতদিন

নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছিলে নাকি ? ২১৮. নিজের কোলে ঝোল টানা [বার্ধ-পরের মতো আচরণ করা]—লোকটা দেশের সেবা করবে কি ?—সব সময় নিজের কোলে ঝোল টানতেই ব্যস্ত। ২১৯. নেক-নজরে পড়া [অহংগ্রহ-দৃষ্টিতে পড়া]—তুমি এখন বড় সাহেবের নেক-নজরে পড়েছ, তোমার প্রমোশন ঠেকায় কে ?

২২০. পরের মুখে ঝাল খাওয়া [শোনা কথায় বিশ্বাস করা]—আমি তোমার মতো কান পাতলা নই যে, পরের মুখে ঝাল খাবো। ২২১. পাকা ধানে মই [ফলস্ব কাজ পণ্ড হওয়া]—তুমি আমার সঙ্গে শ্রদ্ধা করছ কেন—আমি কি তোমার পাকা ধানে মই দিয়েছি ? ২২২. পথের কাঁটা [উন্নতির বাধা]—সে উন্নতি করুক, আমি তার পথের কাঁটা হতে চাই না। ২২৩. পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙা বা হাত বুলানো [কাঁকি দিয়ে পরের ধন আত্মসাৎ করা]—পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে আর কতকাল চলবে ? এবার নিজের রোজগার নিজে কর। ২২৪. পরের ধনে পোন্ধরি [পরের অর্থ যথেষ্ট ব্যয় করে পর্ববোধ করা]—মানেকারবাবু এতদিন তো পরের ধনে পোন্ধরি করে এসেছেন ; নিজের টাকায় হাত পড়ুক, তবেই তো বুঝবেন, কত ধানে কত চাল। ২২৫. পর্বতের আড়ালে থাকা [নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে থাকা]—এতকাল মাথার ওপরে জ্যাঠামশাই ছিলেন ; আমরা পর্বতের আড়ালে ছিলাম। সাংসারিক ঝড়-ঝাপ্টা কিছুই বুঝতে পারিনি। ২২৬. পাড়া মাথায় করা [হৈ-চৈ বাধানো]—বাড়িতে পায়ের তৈরী হয়নি বলে নাগবাবু রাত দুপুরে পাড়া মাথায় করলেন। ২২৭. পান্নাভারি [উন্নতিজনিত অহংকার]—রাতারাতি প্রমোশন পেয়ে রমেনের বড়ো পায়ভারি হয়েছে ; কাগো সঙ্গে কথাই বলে না। ২২৮. পালের গোদা [দলপতি]—গোলমালের মূল সেই পালের গোদাটাকে না ধরে এদের ধরে আনলে কেন ? ২২৯. পিঠটান [পালিয়ে যাওয়া]—পুলিশকে আসতে দেখে হারাণ পিঠটান দিল। ২৩০. পুঁটিমাছের প্রাণ [ক্ষীণ শক্তি]—মাস্টার মশাইদের হলো পুঁটি মাছের প্রাণ ; অথচ তাঁদেরই বাড়ি চাপলো শিক্ষাকরের বোঝা। ২৩১. পাততাড়ি গুটানো [সব ছেড়ে-ছুড়ে দেওয়া]—১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ইংরেজ এদেশ থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে স্বদেশে রওনা দিল। ২৩২. পটোল তোলা [মারা যাওয়া]—সারা গ্রামটাকে আলিয়ে পুড়িয়ে শেষে এতদিনে লোকটা পটোল তুললো। ২৩৩. পাথরে পাঁচ কিল [ধুব ভাল অবস্থা]—তোমার ত এখন পাথরে পাঁচ কিল—বাড়ি গাড়ি কোন কিছুই অভাব নেই। ২৩৪. পিঙ্গীলিকার পাখা উঠে মরিবার ভরে [পতনের পূর্বে বাড়াবাড়ি]—জার্মানীর বাড়াবাড়ি দেখে তখনই বোঝা গিয়াছিল যে, পিঙ্গীলিকার পাখা উঠে মরিবার ভরে। ২৩৫. পেটে খেলে পিঠে সন্ধ্যা [লাভের বস্তু কর্তি স্বীকার]—লোকগুলোকে খাটিয়ে নেবে, অথচ মাইনে দেবে কম ; পেটে খেলে তবেই তো পিঠে সইবে। ২৩৬. পোন্না বারো [দারুণ হুমুয়া]—বড়বাবুর অল্পপরিচিত কর্মচারীদের এখন পোন্না বারো ; সবাই মিলে এখন পুকুর চুরি করতে লেগেছে। ২৩৭. পুকুর চুরি [সমানে চুরি]—একেবারে পুকুর চুরি করো না হে ; বাতে একটু

রয়-সয়, তার ব্যবস্থা করো। ২৩৮. পর্বতের মৃষিক প্রসব [ বিরাট আয়োজনের সামান্য সাক্ষ্য ]—এত তোড়জোড়ের পর শেষে এই হলো—একেই বলে পর্বতের মৃষিক প্রসব। ২৩৯. প্রজাপতির নির্বন্ধ [ বিবাহের দৈবযোগ ]—কোন দেশের ছেলে আর কোন দেশের মেয়ে—শেষে কিনা বিবাহ হলো ; একেই বলে প্রজাপতির নির্বন্ধ ! ২৪০. পৌঁ খরা [ খোসামোদ করা ]—আর বাই করি, তপনের মতো বড় সাহেবের পৌ ধরতে পারবো না।

২৪১. কঁাসির খাওয়া [ জীবনের শেষ খাওয়া ]—সে যেভাবে খাবারগুলো গোত্রাসে গিলছিল, দেখে মনে হচ্ছিল, সে বুকি কঁাসির খাওয়া খাচ্ছে। ২৪২. ফুলবাবু [ শৌখিন লোক ]—হরি মিস্তিরির ছেলে অবিনাশ চাকরি পেতে না পেতেই একেবারে ফুলবাবু হয়ে উঠেছে। ২৪৩. ফুলের ঘাস্নে মুর্ছা খাওয়া [ অল্পেই কাতর হওয়া ]—মেয়ে তো নয়, যেন মোমের পুতুল ; ফুলের ঘাস্নে মুর্ছা খান। ২৪৪. ফোড়ন কাটা [ কথার মধ্যে মস্তব্য করা ]—চূপ করে বসে আমাদের কথা শোন, ফোড়ন কেটো না। ২৪৫. ফোপন্ন দালাল [ বাক্য-বীর ]—ওই ফোপন্ন দালালটি এখানে কোথায় এসেছেন—দেখো, কেউ ওর কথায় ভুলো না।

২৪৬. বারো ভুত [ বাজে লোক ]—ভ্রমলোক বা রোজগার করে রেখে গিয়েছিলেন, বারো ভুতে সব খেল। ২৪৭. বালির বাঁধ [ নির্ভরযোগ্য নয় ]—‘বড়র পিরিতি বালির বাঁধ।’ ২৪৮. বাঘের দুধ [ হুস্ত্রাপ্য বস্তু ]—টাকা থাকলে বাঘের দুধও পাওয়া যায়। ২৪৯. বাড়ি ভাতে ছাই [ বড় আশার মধ্যে নিরাশা ]—ভেবেছিলাম, টাকাটা পেয়ে যাবো ; কিন্তু যোগেনবাবু আমার বাড়ি ভাতে ছাই দিলেন। ২৫০. বামন হয়ে চাঁদে হাত [ ছোট ব্যক্তির বড়-আশা পোষণ ]—দরিদ্র বামনের ছেলে হয়ে তুমি ম্যাজিস্ট্রেট হবার স্বপ্ন দেখছ ; বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়িও না। ২৫১. বোঝার উপর শাকের আঁটি [ গুরু দায়িত্বের উপর সামান্য বুদ্ধি ]—এত বড় কাজটা পারলে, এইটুকু আর পারবে না ?—এ তো বোঝার উপর শাকের আঁটি। ২৫২. ব্যাণ্ডের আধুলি [ অত্যন্ত প্রিয় সঙ্গ ]—বৃত্ত আশীর সামান্য পুঁজিটুকু বিধবা মহিলা ব্যাণ্ডের আধুলির মতো আগলে রয়েছে। ২৫৩. ব্যাণ্ডের সর্দি [ অসম্ভব ব্যাপার ]—তোমার মতো পেটুকের নিমন্ত্রণে অরুচি !—এ যে একেবারে ব্যাণ্ডের সর্দি হে ! ২৫৪. বিড়াল তপস্বী [ ভণ্ড ]—গায়ে নামাবলী দেখে ভুল করো না যেন ; আসলে উনি একটি বিড়াল তপস্বী। ২৫৫. বকধার্মিক [ ভণ্ড ]—ফোঁটা-তিলক কপালে ঐ লোকটাকে বকধার্মিক বলে মনে হয়, একটু সাবধানে থাকা ভালো।

২৫৬. বর্ণচোরা আম [ ছদ্মবেশী গুণী ব্যক্তি ]—অফিসের বড়বাবুকে রোজ পান চিবোতে আর টাকার অঙ্ক মেলাতেই দেখেছি। উনি ভালো গান করতে পারেন, কেউ জানতাম না। এতদিনে জানা গেল, উনি একটি বর্ণচোরা আম। ২৫৭. বাপের ঠাকুর [ শ্রদ্ধাভাজন ]—‘ওরা কি তোমার বাপের ঠাকুর, আমি কি তোমার কেউ নই ?’ ২৫৮. বুকের পাটা [ সাহস ]—এই রাজিরে কবরখানা থেকে ফুল তুলে নিয়ে এলো।

তো; বুঝবো তোমার কেমন বুকের পাটা। ২৫৯. বিন্দুবিলগ [সামান্যতম ইংগিত]—এত বড় ঝড় আসছে, হাওয়া অফিসের কেউ তার বিন্দুবিলগও জানতে পারেননি। ২৬০. বিনা মেঘে বজ্রপাত [অপ্রত্যাশিত হুঃসংবাদ]—মায়লা জয়ের আনন্দে সবাই এখন আত্মহারা, ঠিক তখনই বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো এলো কর্তামশাইর মৃত্যুর সংবাদ। ২৬১. বুজির ঢেঁকি [নিতান্তই নির্বোধ]—‘হঁকাটি বাড়িয়ে রয়েছে দাঁড়িয়ে ব্যাটা বুজির ঢেঁকি।’ ২৬২. বুদ্ধাছুষ্ঠ দেখানো [কাঁক দেওয়া]—যারা আইনকে বুদ্ধাছুষ্ঠ দেখিয়ে অত্যাচারে মূঠে মূঠে টাকা কামায়, তারাই দেখি বড় বড় কথা বলে। ২৬৩. বিদুরের ক্ষুদ্র [সামান্য দান]—কিছুই আয়োজন করতে পারিনি; সামান্য বিদুরের ক্ষুদ্র আপনার পাতে দেওয়া হয়েছে; গ্রহণ করে আমাকে ধন্য করুন। ২৬৪. বাঁ হাতের ব্যাপার [খুব লওয়া]—সরকারী অফিসে যাচ্ছে, কিন্তু মনে রেখো, দারোয়ান থেকে বড় সাহেব পর্যন্ত সকলেরই বাঁ হাতের ব্যাপার আছে। ২৬৫. বজ্র আঁটুনি কস্ক পেরো [একদিকে কড়াকড়ি, অপরদিকে প্রলয়]—একদিকে আইনের কড়াকড়ি, অন্যদিকে আইনের চোখে ধুলো দিয়ে কাজ হাঁসিল। এ বেন বজ্র আঁটুনি কস্ক পেরো। ২৬৬. বাস্তবুখু [ছদ্মবেশী গৃহজ্ঞ]—লোকটাকে চিনে রাখ;—ও কিন্তু একটা বাস্তবুখু। ২৬৭. বড় মুখ [প্রত্যাশা]—ছেলেটা তোমার কাছে সাহায্য পাবে বলে বড় মুখ করে এসেছিল; তুমি তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলে? ২৬৮. বিষকুস্ত পরোমুখ [মুখে মিষ্টিকথা, অন্তরে বিষ]—নিমুর মিষ্টিকথায় গলে যেও না, ও আসলো কিন্তু বিষকুস্ত পরোমুখ; ওর পেটে পেটে ছুটবুজি।

২৬৯. ভরাডুবি [সম্মল সর্বনাশ]—সমস্ত বিক্রি করে ব্যবসায় নেমেছি; এবার কিছু হলে আমার ভরাডুবি হবে। ২৭০. ভয়ে ঘি ঢালা [অপাত্রে দান করা]—অসাধু ব্যবসায়ীদের উপদেশমূলক দেওয়া আর ভয়ে ঘি ঢালা একই কথা। ২৭১. ভিক্ষে বিড়াল [অন্তরে খল, কিন্তু বাহিরে নিরীহ]—ও যে এখানে ভিক্ষে বিড়ালটির মতো বসে বসে আমাদের আলোচনা সব শুনছে; নিশ্চয়ই কোন কু-মতলব আছে। ২৭২. ভুঁইকোড় [হঠাৎ বড় হয়ে ওঠা]—বাধীনতালভের পর যত ভুঁইকোড় দেশপ্রেমিক গজিয়ে উঠেছিল, তারাই তো এখন রাজনীতির বাজার মাত করে চলেছে। ২৭৩. ভুতের বেগার খাটা বা ভুতের বোঝা বহা [অর্থহীন পরিশ্রম করা]—‘ভুতের বেগার মলেম খেটে।’ ২৭৪. ভূশাণ্ডী কাক [অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রবীণ ব্যক্তি]—সবাই গেছে, এখন এই ভূশাণ্ডী কাকটি মরলে তবেই পাড়া জুড়াবে। ২৭৫. ভেক ধরা [ছদ্মবেশ ধরা]—সাধারণ পোশাকে বিশেষ স্ববিধে হলো না। তাই সে সাধুর ভেক ধরেছে। ২৭৬. ভোল কেমনালো [চেহারার উন্নতি করা]—নতুন হেডমাস্টার মশাই এসে ছদ্মবেশে ইচ্ছার ভোল কিয়রে দিলেন। ২৭৭. ভুতের বাপের ভ্রাতা [ভীষণ বিশ্বাস অবস্থা]—সমস্ত ব্যাপারটা এমন অগোছালো হয়ে পড়ে আছে; বেন ভুতের বাপের ভ্রাতা হয়ে গেছে। ২৭৮. ভুতের মুখে রায়লাল [শত্রুর মুখে প্রশংসা]—পুন্নিবীর



যুদ্ধবাজেরা আজ বলছে—শান্তি চাই ; এ যে ত্বতের মুখে রামনাম । ২৭৯. তাঁড়ে মা ভবানী [ শূত্র ভাণ্ডার ]—ওদিকে লম্বা বক্রতার বহর, আর এদিকে তাঁড়ে মা ভবানী ।

২৮০. মাকাল ফল [ অ. ]—চেহারায় অমন হলে কি হয়, ছেলেটা একটা আস্ত মাকাল ফল—কোন কাজের নন্দ । ২৮১. মাছের মায়েল পুত্রশোক [ অবিবাহিত ব্যাপার ]—লাখপতি ভূমি ; ক'টা টাকা বেশি খরচ করে আফসোস করছ । এ যে দেখি, মাছের মায়েল পুত্রশোক । ২৮২. মুখ রাখা [ মান বজায় রাখা ]—তোমরা সবাই আশীর্বাদ করো, ছেলে যেন আমার মুখ রাখে । ২৮৩. মিছরির ছুরি [ বাইরে মধু, ভিতরে বিষ ]—লোকটার কথা যেন মিছরির ছুরি—ভনতে বেশ ; কিন্তু ভেতরে খুব ধার । ২৮৪. মেও ধরা [ ঝড়ট পোয়ানো ]—দীর্ঘ প্রত্যাব ত' গৃহীত হলো ; এখন মেও ধরবে কে ? ২৮৫. মাণিক জোড় [ অভিন্ন-জুড়য় বন্ধ ]—হরিবাবুর ছেলে আর ভ্রামবাবুর ছেলে—দুটিতে যেন মাণিক জোড় । ২৮৬. মায়াকান্না [ সহানুভূতি পাইবার জন্য করার ভান ]—আর মায়াকান্না না কেন্দ্রে হাতের কাজ চটপট সেয়ে ফেল । ২৮৭. মাছি-মারা কেরানী [ অন্ধ নকলকারী ]—মাছি-মারা কেরানীর মতো সমস্ত না টুকে একটু মাথা খাটানো । ২৮৮. মাঝাতার আমল [ অতি প্রাচীনকাল ]—মাঝাতার আমল থেকে এই রীতি আমাদের দেশে চলে আসছে । ২৮৯. মশা মারতে কামান দাগা [ সামান্য কারণের জন্য বিরাট আয়োজন ]—দরিদ্র ব্রাহ্মণকে জ্বল করার জন্য এই মশা মারতে কামান দাগার কি দরকার ছিল ? ২৯০. মগের মুলুক [ অরাজক দেশ ]—এটা কি মগের মুলুক পেয়েছ যে, বা-খুশি তাই করবে ? ২৯১. মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা [ মর্মান্তিক আঘাতের পর আবার আঘাত ]—একে মামলায় হেরে গিয়ে তিনি সব খুইয়ে পথে বসেছেন, তার ওপর কি দরকার ছিল মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দেবার ? ২৯২. মাটির মানুষ [ সহিষ্ণু প্রকৃতির মানুষ ]—মা-টি তো মাটির মানুষ ; তাঁর আব্দারে ছেলেটি একেবারে মাটি হয়ে গেল । ২৯৩. মাঠে মারা যাওয়া [ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হওয়া ]—সরকারী অবহেলায় পরিকল্পনাগুলো সব মাঠে মারা যাবার ষোগাড় । ২৯৪. মাটি হওয়া [ নষ্ট হয়ে যাওয়া ]—বৃষ্টিতে বিয়ের নেমন্তন্নটা একেবারে মাটি হয়ে গেল । ২৯৫. আমার বাড়ীর আব্দার [ অন্তায় আব্দার ]—বা চাইবে তা দিতে হবে ; এখানে ওসব আমার বাড়ীর আব্দার চলবে না । ২৯৬. মুচির কুকুর [ হিংস্র ]—লোকটা একেবারে মাটির মানুষ ; কিন্তু রাগলে একেবারে মুচির কুকুর । ২৯৭. মেঘ না চাইতে জল [ হঠাৎ বরাত করা ]—লোকটি আশা করেছিল ছুটি মাত্র টাকা ; কিন্তু লটারীতে পেয়ে গেল হু'হাজার টাকা ; যেন মেঘ না চাইতে জল । ২৯৮. মুখচোরা [ লাক্ক ]—রমেশ যে এত মুখচোরা, তা আমার জানা ছিল না ।

২৯৯. বাহা বাহার তাহা তিপান্ন [ সামান্য পার্থক্য ]—দশ টাকা বা, লাড়ে দশ টাকাও তাই ; বাহা বাহার তাহা তিপান্ন । ৩০০. বখের খন [ কপণের সম্পত্তি ]—বুড়োর সম্পত্তিতে হাত দেবে কে ? ও তো বখের খন । ৩০১. যমের অকচি [ মৃত্যুর অশুভ ]—পাড়া-জালানী বুড়িটা মরেও না, যেন যমের অকচি ।

৩০২. রাধব বোয়াল [ বড় অপরাধী ]—চুনোপুঁটি ধরা পড়লো, আর যে রাধব বোয়াল সেই গেল পালিয়ে। ৩০৩. রগচটা [ বদমাশী ]—দাঁতের মতো রগচটা মানুষকে মিষ্টি কথায় বশ করতে হবে। ৩০৪. রাশভারী [ গভীর-স্বভাব ]—বড়কর্তা ছিলেন রাশভারী মানুষ ; অতি বড় ডাকসাইটে লোকও তাঁর সামনে যেতে ভয় পেতেন। ৩০৫. রাবণের চিতা [ চিরহুঃখ ]—একমাত্র পুত্রকে হারিয়ে বিধবা মহিলাটির বৃকে রাবণের চিতা জলছে যেন। ৩০৬. রুটি মারা [ জীবিকা অপহরণ করা ]—এভাবে ছাঁটাই করে গরীবের রুটি মারবেন না, স্ত্রার।

৩০৭. লক্ষ্মীর ভাগ্য [ প্রচুর ধাকা ]—আপনার তো লক্ষ্মীর ভাগ্য ; এতকু দিলে আপনি টেরই পাবেন না। ৩০৮. লেফাফা দুহস্ত [ বাহু সাজসজ্জা ]—অমন লেফাফা দুহস্ত বাবুটিকে দেখে ভুলে যেও না ; আসলে ও একটি গোবর গণেশ। ৩০৯. লঙ্কাকাণ্ড [ তুমুল ব্যাপার ]—পুকুরের সামান্য একটা পুঁটি মাছের জন্ত হু' ভাইতে সেদিন লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে বসলো। ৩১০. লাল হওয়া [ খুব লাভ করা ]—চোরা কারবারে লোকটা হঠাৎ লাল হয়ে উঠেছে। ৩১১. লাল বাতি জ্বালা [ কারবার ফেল করা ]—চুনের ব্যবসায় সে লালবাতি জ্বলে দেশে ফিরে গেছে। ৩১২. ল্যাংবোট [ পার্শ্চর ]—রামবাবু কিন্তু বড় সাহেবের একটি বড় ল্যাংবোট।

৩১৩. শিবরাত্রির সলতে [ একমাত্র বংশধর ]—রাসবিহারী তার বংশের শিবরাত্রির সলতে। ৩১৪. শিমূল ফুল [ রূপবান্ অথচ গুণহীন ব্যক্তি ]—চেহারা সুন্দর হলে হবে কি ! আসলে ও একটি শিমূল ফুল, সাতবার চেষ্টা করেও পাস করতে পারেনি। ৩১৫. শিরে সংক্রান্তি [ আসন্ন বিপদ ]—পরীক্ষার একমাস মাত্র বাকী—শিরে সংক্রান্তি ; এখন ওরা বলছে থিয়েটার করবে ? ৩১৬. শাঁখের করাত [ উভয় দিকেই ক্ষতিকারক ]—তোমার কথা যেন শাঁখের করাত, যেতেও কাটে, আসতেও কাটে। ৩১৭. শত্রুর মুখে ছাই দেওয়া [ অনিষ্টকারীরা আশা নিমূল করা ]—শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে সে এখন বিপুল সম্পত্তির মালিক। ৩১৮. শকুনি মামা [ গৃহভেদী কুটিল ব্যক্তি ]—এ শকুনি মামাটাকে তাড়াতে না পারলে হু' ভায়ের মধ্যে বিবাদ মেটানো যাবে না। ৩১৯. শাঁপে বর [ অনিষ্টের ফলে ইষ্ট ]—চাকরিটা গিয়ে তার শাঁপে বর হয়েছে ; নইলে এত বড় চাকরি সে পায় ? ৩২০. শ্মশান বৈরাগ্য [ অস্থায়ী অনাসক্তি ]—মামলায় হেরে গিয়ে মদনের শ্মশান-বৈরাগ্য এসে গেছে ; বলে কিনা সম্পত্তি অসার। ৩২১. শাক দিয়ে মাছ ঢাকা [ গোপন করার ব্যর্থ চেষ্টা ]—রাজনৈতিক ব্যাপার বলে তুমি শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চেষ্টা করো না। আমি সব জানি। ৩২২. শাঁড়ের গোবর [ অকর্মণ্য লোক ]—গদাই একটি শাঁড়ের গোবর , ওকে পাঠিয়েছ ডাক্তার ডাকতে ?

৩২৩. সবেধন নীলমণি [ একমাত্র ভরসা ]—অচুতানে হুটু ছাড়া আর কে পান পাইবে ? সেই তো পানে এখানে সবেধন নীলমণি। ৩২৪. স্নেহের পায়রা [ চিরহুঃখভোগী ]—তুমি তো স্নেহের পায়রা, হুঃখের দিনে কেউ নও। ৩২৫. সাকী পোপাল [ ক্ষতাহীন ব্যক্তি ]—সেই বিপদের দিনে তুমি শুধু সাকী পোপালের মতো

গাড়িয়ে রইলে ; কোন সাহায্যই করলে না । ৩২৬. সোনান্ন সোহাগা [ মণিকাকন সংযোগ ]—ছেলেটির যেমন হৃন্দর চেহারা তেমনি অশেষ গুণ ; যেন সোনায় সোহাগা ! ৩২৭. সরিষার ফুল দেখা [ অন্ধকার দেখা ]—বাণ মারা যেতে সে যেন চোখে সরিষের ফুল দেখলো । ৩২৮. সাপে-নেউলে [ ঘোর শক্রতা ]—রামে আর ভ্রামে যেন সাপে-নেউলে সম্পর্ক, দেখা হলেই বগড়া আর মারামারি । ৩২৯. সসেমিরা [ কিংকর্তব্যবিমূঢ় ]—চারদিকে অসংখ্য সমস্তার চাপে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তখন সসেমিরা অবস্থা । ৩৩০. সেয়ানে সেয়ানে [ চালাকির জবাব চালাকিতে ]—সে ঠকিয়ে তোমার বড়ি নিয়েছে, তুমিও ঠকিয়ে ওর রেডিও নিয়েছো ; এ যে সেয়ানে সেয়ানে কোলাহুলি । ৩৩১. সাত খুন মাপ [ গুরু অপরাধে শাস্তি না পাওয়া ]—মন্ত্রীশায়ের লোক বলেই সাতখুন মাপ ? ৩৩২. স্বখাত সলিল [ কৃতকর্মের ফল ]—‘দোষ কারো নয় গো মা, আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি, ভ্রামা ।’ ৩৩৩. সাপের পাঁচ-পা দেখা [ হঠাৎ অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করা ]—পরীকার কোনক্রমে পাস করে রাম যেন সাপের পাঁচ-পা দেখেছে । ৩৩৪. সাত-পাঁচ [ নানা রকম ]—সাত-পাঁচ ভেবে ঠিক করলুম, বিদেশে আমি যাবো না ।

৩৩৫. হরিষোষের গোয়াল [ বিশৃঙ্খল অবস্থা ]—আজ হেড্‌মাষ্টার মশাই ফুলে নেই বলে ফুলটা যেন হরিষোষের গোয়াল হয়ে গেছে । ৩৩৬. হ-ব-ব-ল [ বিশৃঙ্খল ]—তোমার কাজকর্ম ভীষণ হ-ব-ব-ল ; বড় সাহেব ভারি বিরক্ত হয়েছেন তোমার ওপর । ৩৩৭. হস্তিমূর্খ [ অতিশয় মূর্খ ]—বলু একটি হস্তিমূর্খ, ওকে ইকনমিক্স বোঝাতে যাওয়া বুধা । ৩৩৮. হরিষে বিবাদ [ আনন্দের মধ্যে দুঃখ ]—বিয়ের দিনে মেয়ের মা মারা যাওয়ায় সবার মনে হরিষে বিবাদ নেমে এলো । ৩৩৯. হাড় জুড়ানো বা হাড়ে বাতাস লাগা [ অভিযোগ করা ]—মামলাবাজ বুড়োটি মরলে সকলের হাড়ে বাতাস লাগে । ৩৪০. হাড়-হাভাতে [ লক্ষীছাড়ো ]—হাকুর মতো হাড়-হাভাতে ছেলে আমি আর একটিও দেখিনি, যা হাতে পায়, সব উড়িয়ে দেয় । ৩৪১. হাঁড়ির হাল [ অত্যন্ত দুর্বস্থা ]—একমাত্র রোজগেরে ছেলে মারা যাওয়ার পর মা-র হয়েছে হাঁড়ির হাল । ৩৪২. হাতভারি [ ব্যয়বৃদ্ধ ]—প্রাণগোপালবাবুর মতো হাতভারি লোকের কাছে কিনা বারোয়ারি পূজার চাঁদা আদায় করেছে ! ৩৪৩. হাতির খোরাক [ প্রচুর ব্যয় ]—চাকরি তো ছেড়ে দিয়ে এলে ; এখন এতগুলো মাহুষেব হাতির খোরাক জোগাবে কি করে ? ৩৪৪. হাত পা কানো [ অভিজ্ঞতা লাভ ]—চুরিতে হাত পাকিয়ে সে এখন বাট-পাড়ি করতে শুরু করেছে । ৩৪৫. হাল ধরা [ নেতৃত্ব গ্রহণ করা ]—ভ্রামাপ্রসাদের মৃত্যুর পর নেতৃত্বহীন বাংলার হাল ধরবার কেউ ছিল না । ৩৪৬. হাল ছাড়িয়া দেওয়া [ আশা ত্যাগ করা ]—চার-চারবার কেল করে সে এখন হাল ছেড়ে দিয়েছে । ৩৪৭. হালে পানি পাওয়া [ বিপন্নুক্ত হইবার সম্ভাবনা দেখা ]—এই চরম দুদিনে ছেলেটি চাকরি জোগাড় করতে পারায় বৃদ্ধ হারিবাবু যেন হালে পানি পেয়েছেন । ৩৪৮. হিতে বিশরীত [ ভালো করতে গিয়ে বন্দ করা ]—কবির বারণ লঙ্ঘন

অপারেশন করা হলো ; কিন্তু হলো হিতে বিপরীত ।—কবিকে আর বাঁচানো গেল না । ৩৪৯. হেস্তনেস্ত [শেষ বীমাংসা]—সে যদি এর পর কিছু বলে, তবে একটা হেস্তনেস্ত করে ছাড়বো । ৩৫০. হাতে খড়ি [আরস্ত]—ইত্বুলেই আমার বকৃত্য দেওয়ার হাতে খড়ি । ৩৫১. হাতটান [চুরির অভ্যাস]—চাকরটার একটু হাতটান আছে, পারো তো একটু নজর রেখো । ৩৫২. হাটে হাঁড়িভাজা [গুপ্ত কথা ব্যক্ত করা]—আমাকে রাগিও না, তাহলে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেব । ৩৫৩. হরে কর কথা [আবোল তাবোল]—‘হরে কর কথা’ এ সব কি লিখেছ ? কিছুই বোঝনি দেখছি । ৩৫৪. হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা [উপহিত স্বযোগ ত্যাগ করা]—হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলো না , বা পাছ তাই নিয়ে যাও । ৩৫৫. হাতে পাঁজি মঙ্গলবার [জানবার উপায় থাকতে মিথ্যা গবেষণা]—তোমাদের হাতে পাঁজি মঙ্গলবার—এ ত’ শব্দবোধ অভিধান রয়েছে, অর্থটা দেখে নাও । ৩৫৬. হাতের পাঁচ [বিনা আয়াসে বা পাওয়া যায়]—ছেলে-পড়ানো ত’ হাতের পাঁচ, তাছাড়া কোন কাজ পাওয়া যায় কিনা তাই দেখছি । ৩৫৭. হরিহর আত্মা [অত্যন্ত সস্তাব]—ছেলে দুটির কি সস্তাব ! যেন হরিহর আত্মা ; দেখলেও চোখ জুড়ায় । ৩৫৮. হাতে-কলমে [প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা]—আরে, আমাকে আর বলতে হবে না—ও সব হাতে-কলমে করা আছে আমার । ৩৫৯. হাড়হুদ [আগাগোড়া]—আমার কাছে মিথ্যে কথা বলো না ; আমি হাড়হুদ সব জানি । ৩৬০. হাত-পা বাঁধা [নিরুপায়]—আইনে আমাদের হাত-পা বাঁধা, কারো ক্ষম্ভে কিছু করা অসম্ভব । ৩৬১. হাত-পা বাঁধিয়া জলে ফেলা [বৃত্তামুখে ঠেলিয়া দেওয়া]—পূর্বে বাংলাদেশে হাত-পা বেঁধে মেয়েদের জলে ফেলে দেওয়ার মতো প্রচলিত ছিল গৌরীদান প্রথা । ৩৬২. হাত-সাকাই [চুরি]—চাকরটা হাত-সাকাই ছাড়া অন্য কোন কাজই শিখতে পারেনি । ৩৬৩. হরিমটর [উপবাস]—কিছু সংগ্রহ করতে পারলুম না ; বুঝলুম, সেদিন রাত্তিরে আমার কপালে হরিমটর । ৩৬৪. হীরের টুকরো [বৃদ্ধিমান ও নং]—হীর আমাদের হীরের টুকরো ছেলে ; কারোর সঙ্গেই তার তুলনা হয় না ।

## প্রবাদ-বাক্য

প্রাত্যেক জাতির তাহার নিজস্ব কিছু প্রবাদ-বাক্য থাকে । সেগুলি তাহার জাতীয় সম্পদ । কবে, কিভাবে এবং কে সেই স্ফুটাবিত বাণী-মঞ্জরী রচনা করিয়াছিলেন, কেহ জানে না । কিন্তু সেগুলি লোকমুখে যুগ যুগ ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে । প্রবাদ-বাক্যগুলি যদি একটু মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, ইহাতে লৌকিক অভিজ্ঞতা এবং কখনও মানবচরিত্রের সমালোচনা সংক্ষেপে বিধৃত রহিয়াছে । অবশ্য কখনও কখনও কোন কোন কবির রচনা জনপ্রিয়তার গুণে প্রবাদ-বাক্যরূপে গণমানসে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে ।

নিম্নে তাৎপৰ্যসহ বাংলার কিছু প্রবাদ বাক্যের দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল :

১. অজিতপে হত লক্ষা [অহংকারের পতন আছে] : অত দূর ভালো নয় ;

তুলো না, অতিদুর্গে হত লক্ষ্য। ২. অতিবুদ্ধির গলায় দড়ি [বেশী চালাকির পরিণাম ভাল হয় না]: আমার কথা না শুনে চালাকি করতে গেলে; দেখলে তো, অতিবুদ্ধির গলায় দড়ি। ৩. অতি লোভে তাঁতী নষ্ট [বেশী লোভে লক্ষ্যে নষ্ট হয়]: বেশী লোভ করতে গিয়ে লোকটা শব খোয়ালে, একেই বলে—অতি লোভে তাঁতী নষ্ট। ৪. অধিক সন্ন্যাসীতে গাজল নষ্ট [লোক বেশী হলে কাজ পণ্ড হয়]: এই সামান্য কাজটুকুর জন্যে এত লোক! দেখো, শেষে অধিক সন্ন্যাসীতে না গাজল নষ্ট হয়ে যায়। ৫. আসমানের চাঁদে হাতে পাওয়া [দুর্লভ বস্তু পাওয়া]: বৃদ্ধা বহুদিন পরে ছেলেকে ফিরে পেয়ে বেন আসমানের চাঁদ হাত পেলেন। ৬. এক মাঘে শীত যায় না [বিপদ বার বার আসে]: এক মাঘে শীত যায় না হে! বিপদ আবার আসতে কতক্ষণ? ৭. এক হাতে তালি বাজে না [বিবাদে উভয় পক্ষেরই দোষ থাকে]: দোষ দুজনেরই আছে; কখনো এক হাতে তালি বাজে না। ৮. একে মনসা তায় ধুনোর গন্ধ [যে যাতে রেগে যায়, তাই করা]: বড় সাহেবকে দিয়েছো কবিতার বই! একে মনসা তায় ধুনোর গন্ধ! ৯. কাজের বেলায় কাজী কাজ ফুরোলে পাজী [কার্যসিদ্ধির পর তুলে যাওয়া]: বিপদে পড়ে ছুটে এসেছো। তোমাকে চিনি না? কাজের বেলায় কাজী, কাজ ফুরোলে পাজী। ১০. গোরু মেয়ে জুতো দান [গুরু পাপের ক্ষম প্রার্থনাকৃত]: সারা জীবন গ্রাম-গুলিকে শোষণ করে বৃদ্ধ জমিদার করলেন দরিদ্র নারায়ণের সেবা; একেই বলে গোরু মেয়ে জুতো দান। ১১. গেঁয়ো যুগী ভিখু পায় না [চেনা গুণীর কদর নেই]: অতবড় শিল্পীকে পাড়ার কেউ চেনে না; চিনবে কি করে? গেঁয়ো যুগী কোনকালেই যে ভিখু পায় না। ১২. ঘরপোড়া গোরু সিঁহুরে মেঘ দেখলে ডরায় [পূর্ব বিপদের আশঙ্কায় আশঙ্কিত হওয়া]: প্রচুর টাকা মেয়ে পার্লারে গিয়ে লোকটা আবার এসেছে। আমি তো ঘরপোড়া গোরু, তাই সিঁহুরে মেঘ দেখলে ডরাই। ১৩. চালুনির আবার ছুঁচের বিচার [অজ্ঞান ক্রটিবৃত্ত বা ভুল অস্ত্রের ক্রটি ধরা]: তুমি তো দিনরাত অজ্ঞান মিথ্যেকথা বলো; আজ অন্তকে বলছো মিথ্যাবাদী। চালুনির আবার ছুঁচের বিচার। ১৪. চেনা বামুনের পৈতার দরকার হয় না [পরিচিত ব্যক্তির পরিচয় নিশ্চয়োজ্ঞান]: আপনাকে আমরা চিনি, আপনার আবার কার্ভের কি দরকার? চেনা বামুনের পৈতার দরকার হয় না। ১৫. চোরের সাকী গাঁটকাটা [দুষ্ট লোকেরাই দুষ্ট লোকদের সমর্থক]: চোরাকারবারী তো মজুতদারকে সমর্থন করবেই; ওতে নতুন কি আছে? জানাই তো, চোরের সাকী গাঁটকাটা। ১৬. ছেড়ে দে মা কঁদে বাঁচি [দারিদ্র থেকে অব্যাহতির জন্যে ব্যাকুলতা]: শখ করে উনি কমিটির প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। একটা মিটিং চালিয়েই এখন গুঁর ছেড়ে দে মা কঁদে বাঁচি অবস্থা। ১৭. জলে কুমির ডাঙায় বাধ [উত্তর লকট]: আমি এখন কোথায় বাই? পাড়ার হয়ে খেললে ইকুলের রাগ, ইকুলের হয়ে খেললে পাড়ার রাগ। এখন যে আমার জলে কুমির ডাঙায় বাধ। ১৮. দশচক্রে ভগবান ভুত [বহর চক্রান্তে ভালোও মন্দ হয়ে যায়]: একা

আপনি কতদিন কিনিটিতে ভালো থাকবেন? দশচক্রে ভগবানও তৃত হয়ে যায়। ১৯. ধরি মাহ না ছুই পানি [কই এড়িয়ে কারোয়ার]: ওঁর তো সব সময় ধরি মাহ না ছুই পানির নীতি,—দূরে দূরে গা বাঁচিয়ে চলবেন, কিন্তু কাজটি অস্তের মাথার কাঁঠাল ভেঙে ঠিক উদ্ধার করে নেবেন—যেথো। ২০. বরের বরের মাসী, কনের বরের শিসী-[হু'মুখো সাপ]: হু'বদুর বগড়ার মধ্যে লোকটা কোন্‌খান থেকে এসে একে বলছে এক কথা, অন্যকে বলছে আর এক কথা; লোকটা দেখছি, বরের বরের মাসী, কনের বরের শিসী। ২১. বামুন গেল ঘর তো হাল তুলে ঘর [বালিকের অল্পবয়স্কিতে কাজের কাকি]: কত মশাই এখন তার্থে গেছেন; তাই তাঁর কর্মচারীদের এখন বামুন গেল ঘর তো হাল তুলে ঘর। ২২. বানরের গলায় মুক্তার হার [অযোগ্য লোককে দামী বস্ত্র দান]: রাখালের সঙ্গে রাজকন্ডার বিয়ে—সে তো বানরের গলায় মুক্তার হার! ২৩. বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড় [বড়োর চেয়ে ছোটোর অধিক আশ্রয়ান]: সরকার মশাইর চেয়ে আজকাল সরকার মশাইর ছেলের দাপট বেশী। এ যে দেখছি, বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড় [ছোটো সাপের বড়ো বিষ]। ২৪. বেল পাকলে কাকের কী? [অধিকারহীনের বৃথা আপসোস]: সরকারী অফিসের মাইনে বেড়েছে, আমাদের তো আয় বাড়েনি। বেল পাকলে কাকের কী? ২৫. বুনো তেঁতুল বাঘা ওল [ছুষ্টের ষোগ্য প্রতিপক্ষ]: কাব সাহেবের টেবিলের ওপর সবুট পা তুলে দিয়ে চুকট টানার প্রত্যাশায় বিভ্রাসাগর চটিহুক তাঁর পা দুটি তেপায়ার ওপর তুলে হাঁকো টানতে টানতে কার সাহেবকে আপ্যায়িত করলেন। কার সাহেব যেমন বুনো তেঁতুল, বিভ্রাসাগর তেমনি বাঘা ওল! ২৬. ভাগের মা গঙ্গা পায় না [ভাগাভাগির কাজে সবাই দায়িত্ব এড়িয়ে চলে]: চৌধুরীবাবুর মৃত্যুর পর দেবী ভবানীর পূজা-অর্চনার ভাব পড়ে তাঁব হেলেদেব ওপর। কিন্তু হলে কি হবে, ভাগের মা এখন গঙ্গা পায় না। ২৭. ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া [দাতব্য জিনিসের খুঁত ধরা উচিত নয়]: সরকারী খয়রাতি যা পেয়েছো, তাই ভালো, ভিক্ষের চাল কাঁড়া আব আকাঁড়া। ২৮. মাথা নেই তার মাথা ব্যথা [অকারণ হুশিঙ্কা]: তোমার কোন দায়-দা যত্ব নেই, তুমি এত ভাবছো কেন?—মাথা নেই তার মাথা ব্যথা! ২৯. মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত [সীমিত ক্ষমতা]: কী কথায় কথায় তুমি মামলার ভয় দেখাও, জানি, মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত। ৩০. যার কাজ তারে সাজে অস্ত্র লোকের লাঠি বাজে [অযোগ্য লোকের হাতে কাজেব দায়িত্ব দিলে বিভ্রাট দেখা দেয়]: তুমি তো কার্ঠের মিস্ত্রি, সেলাই কলের কি বোঝো? জাখো, যার কাজ তারে সাজে, অস্ত্র লোকের লাঠি বাজে। ৩১. লাখ কথার এক কথা [শ্রেষ্ঠ উক্তি]: উনি যে বললেন, টাকা বড়ো নয়, মাহুবই বড়ো,—এটা হলো লাখ কথার এক কথা। ৩২. লাগে লাখ টাকা দেবে গৌরী সেন [অর্থের অপচয়]: দুহাতে তোমরা আমার টাকা উড়িয়েছ; ভেবেছো, লাগে লাখ টাকা দেবে গৌরী সেন।

## ৥ অঙ্গুলরগী ॥

১. অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া বাক্য রচনা কর :

ক. শিমুল ফুল, বর্ণচোরা, স্থখের পায়রা, মাটির মানুষ, রাহুর ঘণা, জিলিগিরি প্যাচ; মা. '৫০।  
খ. অরণো রোহন, কুপমণ্ডুক, উত্তম মধ্যম, তীর্থের কাক, বক্ষবজ্র, পুকুর চুরি, শাঁখের করাত, শিরে সংক্রান্তি; বকধার্মিক, চিনির বলহ; মা. '৫১। গ. সোনার সোহাগা, আক্কেল সেলামি, এতলে-বেগুনে, ভুতের বেগার, পায়ের ঝাল, পাকা ধানে মই, ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো, আকাশের চাঁদ; মা. '৫৮। ঘ. ভয়ে ঘি ঢালা, বাগে পাওয়া, কেঁচে গণ্ডু ব করা, অগ্নিশখা হওয়া, নবীর পুতুল, অরণো রোহন, হাল ছাড়িয়া দেওয়া; মা. '৫২। ঙ. বাগে পাওয়া, চোখ টাটানো, বালির বাধ, ভাগের মা, মুখ রাখা, তাসের ঘর, শাঁখের করাত, সোনার সোহাগা; মা. '৬১। চ. কড়ার গভার, এক চোখে, অন্ধের বষ্টি, অরণো রোহন, কাঠের পুতুল, উত্তম মধ্যম, কলুর বলহ, শাঁখের করাত; মা. [কম্পার্ট.] '৬১। ছ. শাপে বর, চর্চিত চর্চণ, আকাশ কুহুম, নবীর পুতুল, দশান বৈরাগ্য, হাল ধরা; মা. [কম্পার্ট.] '৬২। জ. পায়াজারি, মাটির মানুষ, বিদুরের মুখ, গোবর গণেশ, চোখের চামড়া, ধান ভানতে শিবের গীত; মা. '৬৩। ঝ. মগের মূলুক, অরণো রোহন, হিতে বিপরীত, ভূয়ের আঙন, হাতের পাঁচ, চোখে আঙুল, ঢাকের বায়া, কুপমণ্ডুক, জিলিগিরি প্যাচ; ক.প্রা. '৬৩। ঞ. হুনোকার পা, শিরে সংক্রান্তি, চোখের বালি, পোয়া বারো, আক্কেল সেলামি, আশমানজমিন, চুলচেরা, হিনে জোঁক; ক.প্রা. '৬৪। ট. চোখ-টাটানো, চাল চালা, মান ভাঙানো, কান ভারি করা, পাশ কাটানো, দায় সারা, ঘাট মানা, ঢাক পিটানো; ক.প্রা. '৬৫। ঠ. অবাভার চাঁদ, আমড়া কাঠের ঢেঁকি, দুহুর ফুল, তাসের ঘর, তীর্থের কাক, রাবণের চিতা, ঝাঁকের কই; ক. প্রা. '৬৬। বক-ধার্মিক, মাটির মানুষ, বকের পাটা, জড় ভরত, পডলিকা প্রবাহ, গোবর গণেশ, উত্তম সঙ্কট, সোনার সোহাগা, পথিকৃৎ, পায়াজারি, ঢাক-পিটানো, অগ্রী; উ. মা. '৬৭। শাঁখের করাত, ভূয়ের ফুল, আটসাত, তুলকালাম, জারিজুরি, গনগনে, কলুর বলহ; উ. মা. [কম্পার্ট.] '৬৮। আকাশ কুহুম, তালকানা, রাশভারি, অলাঞ্জলি, মুখাড়া, বকধার্মিক, গলাবান্ধি, অগস্ত্যব্রাহ্ম, চুনকালি, নেপথ্যে, নাতানাবু, তালকানা; উ. মা. '৭০। নপিকাকনযোগ, হাতের পাঁচ, গোড়ার গলব, স্থখের পায়রা, পোকুলের বাঁড়, পায়াজারি, তালকানা, নাড়ি-নক্ষত্র, সাতপাঁচ, ডান হাতের ব্যাপার; [উ. মা. কম্পার্ট.] '৭০। অরণো রোহন, কলুর বলহ, পুকুর চুরি, মিহির চুরি, স্থখের পায়রা, সোনার সোহাগা, পোকুলের বাঁড়, চোখের চামড়া, শাঁখের করাত, অর্থচন্দ্র; উ. মা. [কম্পার্ট.] '৭০। অন্ধের বষ্টি, আকাশ কুহুম, কুপমণ্ডুক, চিনির বলহ, জিলিগিরি প্যাচ, পুকুর চুরি, ভুতের বেগার, তীর্থের কাক, বক্ষবজ্র; মা. '৭৩।

২. নিম্নলিখিত বাক্যাংশগুলি বিশিষ্ট অর্থ প্রকাশ করিয়া তাহাদের প্রত্যেকটিকে সুরচিত বাক্যে স্ববহার কর :

কাঁচা পরমা, এক হাত লওয়া, কত ধানে কত চাল, বৃকে হাত ধিরে বলা, ভাতে মারা, কপাল ভাঙ্গা, কাঁধে পা দেওয়া, আকাশ ভাসিয়া পড়া, পুকুর চুরি, পাখের পাঁচ কিল, অকাল কুয়াস্ত, অকূল পাখারে পড়া, আক্কেল গুড়ুম, আঙুল ফুলে কলাগাছ, উড়ে থৈ গোবিন্দায় নমঃ, ইতি গজ, কলুর বলহ, চিনির বলহ, ধর্মের বাঁড়, ধর্মের ধী, সবেধন নীলবর্ণি, পোকুলের বাঁড়, গৌর-ধেজুরে, গৌরচন্দ্রিকা, চোখের বালি, টুটো অগ্নিশখা, তুলসীবনের বাঘ, নব-বর্ণণে ধাকা, প্রজাপতির নির্বন্ধ, মাড়ের মা, ব্যাঙের সখি, মাছিমারা কেরানী, শাঁখের করাত, সাপের পাঁচ-পা, হাতে হাঁড়ি ভাঙা, হাতের পাঁচ, হাত-সাকাই, হরিহর আশ্রা।

৩. নিম্নলিখিত প্রবাহ বাক্যগুলির অর্থসহ প্রয়োগ দেখাও : অতিলোভে উঠা নষ্ট, অতিদর্পে হত লজা, অধিক সন্মাসীতে গাজন নষ্ট, এক হাতে তালি বাজে না, একে মনসা তায় খুনার গন্ধ, গোক মেরে জুতো ধান, পেঁয়ে খুঁটি ভিখু পায় না, বরশোড়া পোক সিঁছুরে বেধ বেধে ডরায়, চেনা বাসুনের পৈতে দরকার হয় না, ছেড়ে বেধে কেঁদে বাঁচি, জলে কুমির ডাঙার বাঘ, বাবুন গেল ঘর তো হাল তুলে ধর, বুঝে উঠুল বাঘা ওল, ভাগের মা গলা পায় না, ভিকের চাল কাঁড়া আর আঁকাঁড়া।

নির্ভুল ব্যাকরণ-জ্ঞান নির্ভুলভাবে ভাষা লিখিবার ও বলিবার জন্য একান্তভাবে প্রয়োজন। তোমরা ব্যাকরণের পঠিতব্য সকল অধ্যায় ধারাবাহিকভাবে শিখা করিয়াছ। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে আমাদের ভুল হয়, এখন তোমাদের তাহা জানা দরকার এবং সেই সেই ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করিলে তোমরা বহু অবাস্থিত ভুল পরিহার করিতে পারিবে এবং নিজেদের ব্যবহারী বস্তুব্য নির্ভুলভাবে লিখিতে পারিবে।

মুখ্যতঃ উচ্চারণের ত্রুটির জন্য শব্দের বানানের বিভ্রাট ঘটে। আবার, বাংলায় অনেক ক্ষেত্রে দুইটি বর্ণের উচ্চারণ একই রূপ হওয়ায় শব্দের বানানে কোন্ বর্ণটি বসিবে, সে সম্পর্কে বিভ্রাট ঘটয়া থাকে। যেমন : ই, ঐ ; উ, ঊ ; ণ, ন ; শ, ষ, স ; জ, ঝ, ইত্যাদি। বাংলায় এই বর্ণগুলির উচ্চারণ একই প্রকার হওয়ায় বানানের বিভ্রাট প্রায়ই ঘটিয়া থাকে।

সতর্কতা অবলম্বন করিলে এবং কোন্ বিশেষ বর্ণটি ব্যবহৃত হইবে—নিঃসংশয়রূপে জানা থাকিলে এই ধরনের অবাস্থিত ভুলগুলি আর হয় না। দ্বিতীয় প্রকারের ভুল হয় সন্ধি, সমাস ও প্রত্যয়-ঘটিত। গভীর ব্যাকরণ-জ্ঞান এই দ্বিতীয় প্রকারের ভুলের হাত হহতে অব্যাহাত দিতে পারে।

● নিম্নে প্রাপ্ত শব্দ-সম্ভারের শুদ্ধ ও অশুদ্ধ রূপ লক্ষ্য কর :

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অভূত	অভূত	অনাধিনী	অনাথা
অভ্যাস	অভ্যাস্ত	অধিনী	অধীনা
অনাটন	অনটন	অহুকুল	অহুকুল
অত্যাস্ত	অত্যাস্ত	অসহনীয়	অসহ, অসহনীয়
অত্মবধি	অত্মাবধি	অহুমত্যাহুসারে	অহুমত্যাহুসারে
অহনিশি	অহনিশ	অহুহ নিবন্ধন	অহুহতা নিবন্ধন
অত্যাধিক	অত্যাধিক	অহুহতা নিবন্ধনের জন্য	অহুহতা নিবন্ধন
অহোরাত্রি	অহোরাত্র	আত্মাকর	আত্মকর
অধ্যাবসায়	অধ্যাবসায়	আপ্রাণ	প্রাণপণ
অস্তুরেন্দ্রিয়	অস্তুরিন্দ্রিয়	আশক্তি	আসক্তি
অধ্যায়ন	অধ্যয়ন	আবিষ্কার	আবিষ্কার
অনাধিক	অনধিক	আহ্নিক	আহ্নিক
অজানী	অজান	আপদ	আপদ
অভ্যেষ্টি	অভ্যেষ্টি	আকৃ	আকৃ
আয়তাবীম	আয়ত বা অধীন	গোপিনী	গোপী



অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
আকর্ষ পর্ষস্ত	আকর্ষ বা কর্ষ পর্ষস্ত	গ্নয়	গ্রীষ্ম
আবশ্যক নাই	আবশ্যকতা নাই	চিরজিবী	চিরজীবী
আকাঙ্ক্ষা, আকাংখা	আকাঙ্ক্ষা	চক্ষুরোগ	চক্ষুরোগ
আবশ্যকীয়	আবশ্যক	চক্ষুষ্ম	চক্ষুষ্ম
ইয়ত্বা	ইয়ত্বা	চক্ষুরত্ন	চক্ষুরত্ন
উর্ধ্ব, উর্ধ	উর্ধ্ব	চোঙ	চুঙ
উপরোক্ত	উপর্যুক্ত, উপরিউক্ত	চ্যুত	চ্যুত
উঘেলিত	উঘেল	ছাগীশিত	ছাগশিত
উৎপাৎ	উৎপাত	ছাত্রগণেরা	ছাত্রগণ
উৎকর্ষতা	উৎকর্ষ	জ্যেষ্ঠ	জ্যেষ্ঠ
উচিং	উচিত	জাত্যাভিমান	জাত্যাভিমান
উচ্চর	উৎসর	জ্যোতীহ্র	জ্যোতিরিক্স
উজ্জল	উজ্জল	জাগরক	জাগরক
উদাসিনী	উদাসীনা	জ্ঞানমান্	জ্ঞানবান
উভ্যক্ত	উভ্যক্ত	জাগ্রদাবস্থা	জাগ্রদাবস্থা
ঋণগ্রহ	ঋণগ্রহ	জগদ্ধাত্রী	জগদ্ধাত্রী
একত্রিত	একত্র	তরুছায়া	তরুছায়া
ঐক্যতা	ঐক্য, একতা	তপস্বীবেশ	তপস্বিবেশ
ঐক্যতান	ঐক্যতান	তিরস্কৃত	তিরস্কৃত
কুরঙ্গিনী	কুরঙ্গী	তোমাপেক্ষা	তোমা অপেক্ষা
কৃষিজিবী	কৃষিজীবী	তাহাপেক্ষা	তাহা অপেক্ষা
কোতুহল	কোতুহল	ত্রাণ-স্পর্শ	ত্রাণস্পর্শ
কর্তাকারক	কর্তৃকারক	তেজ্য	ত্যাগ্য
ক্লিতিশ	ক্লিতিশ	ক্রটি	ক্রটি
কুংপিপাসা	কুংপিপাসা	দীর্ঘজিবী	দারিদ্র্য দরিদ্রতা
কিষদন্তী	কিষদন্তী	দারিদ্রতা	দুর্নাম
কুশামন	কুশামন	দুর্গাম	দুরাস্থগণ
গননা	গণনা	দুরাস্থাগণ	দিলরাজি
গডালিকা	গডালিকা	দিনরাত	দ্রবদৃষ্ট
গুণীগণ	গুণীগণ	দুরাদৃষ্ট	দ্রববস্থা
পরিস্রমি	পরিস্রমি	দুরাবস্থা	দ্বিগিজ
গড়ুর	গড়ুর	দ্বিগেজ	দ্বিবারাজি
দ্বিগিজ	দ্বিগিজ	দ্বিবারাজ	পৃথগণ
দ্বিগিজ	দ্বিগিজ	পৃথকার	

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
দ্বিসহ	দ্বিসহ	পুরকার	পুরীকার
দংশিত	দষ্ট	পদ্যধম	পদ্যধম
ধ্বংশ	ধ্বংস	পক্ষীশাবক	পক্ষিশাবক
ধর্মাত্মাগণ	ধর্মাত্মগণ	প্রত্যাভ	প্রত্যাভ
ধনীসন্তান	ধনিসন্তান	পরিমান	পরিমাণ
নমস্কার	নমস্কার	পক্ষীজাতি	পক্ষিজাতি
নিপিড়িত	নিপীড়িত	প্রাণীবৃন্দ	প্রাণিবৃন্দ
নিশিথ	নিশীথ	প্রসারতা	প্রসার
নেহ	ত্ৰায্য	পূজ্যাম্পদ	পূজ্যাম্পদ, পূজা
নিষ্কাম	নিষ্কাম	পৌরহিত্য	পৌরোহিত্য
নিফল	নিফল	ফেন	ফেন
নিরস	নীরস	ফণীভূষণ	ফণিভূষণ
নিরক্ত	নীরক্ত	বক্ষোপরি	বক্ষ উপরি
নিধনী	নিধন	ব্যবস্থা	ব্যবস্থা
নিরোগ	নীরোগ	ব্যায়	ব্যায়
নিরব	নীরব	ব্যাবধান	ব্যাবধান
নিরপরাধী	নিরপরাধ	ব্যাতীত	ব্যাতীত
নেতাগণ	নেতৃগণ	বাহুল্যভা	বাহুল্য, বহুলভা
নীরিহ	নিরীহ	বিকির্ণ	বিকীর্ণ
ননদিনী	ননদ	বিহঙ্গিনী	বিহঙ্গী
নীরিক্ষণ	নিরীক্ষণ	বয়ক্রম	বয়ঃক্রম
নদীমুখ	নদীমুখ	বাক্‌দান	বাগ্‌দান
নমিত	নত	বান্ধিকী	বান্ধীকি
নুপুর	নুপুর	ব্যবসায়	ব্যবসায়
পঙ্ক	পঙ্ক	ব্যবহার	ব্যবহার
পশ্চাদ্‌গদ	পশ্চাৎ‌গদ	বিজ্ঞপ	বিজ্ঞপ
পৃথিবী, প্রথিবী	পৃথিবী	বয়ো কনিষ্ঠ	বয়ঃ কনিষ্ঠ
পূণ্য	পুণ্য	বিধর্মী	বিধর্মা
প্রতিকূল	প্রতিকূল	বেক্তি	ব্যক্তি
পূর্বাঙ্ক	পূর্বাঙ্ক	বৈরতা	বৈর
প্রাজন	প্রাজ্ঞ	ব্যাঞ্জন	ব্যঞ্জন
পিচাশ	পিচাচ	ব্যাঞ্	ব্যঞ্
বিদ্যান	বিদ্যান	মহন্ত	মহন্ত

অণুত	তুত	অণুত	তুত
বৃংপ্তি	ব্যংপ্তি	মধ্যাহ্ন	মধ্যাহ্ন
ব্যক্ত	ব্যক্ত	মহত্বকার	মহোপকার
বন্দোপাধ্যায়	বন্দোপাধ্যায়	মোতি	মতি
বাগেশ্বরী	বাগীশ্বরী	মহাশ্মাগণ	মহাশ্মাগণ
বোমকেশ	ব্যোমকেশ	মাতঙ্গিনী	মাতঙ্গী
বাহিক	বাহ	ষদ্যাপি	ষদ্যাপি
বৈচিত্র	বৈচিত্র্য	ষদ্যপিও	ষদ্যপি, যদ্বিও
বীভিষিকা	বিভীষিকা	যষ্টি	যষ্টি
বিকীরণ	বিকিরণ	যোগেশ্বর	যোগীশ্বর
ভুল	ভুল	যোগীবেশ	যোগিবেশ
ভ্রাতাগণ	ভ্রাতৃগণ	যোগীগণ	যোগীগণ
ভূজঙ্গিনী	ভূজঙ্গী	যশলাভ	যশোলাভ
ভরঙ্গরী	ভরঙ্গরা	যাবনীয়	যাবনীয়
ভাগিরথী	ভাগীরথী	রসায়ণ	রসায়ন
ভগবান্ প্রদত্ত	ভগবৎ প্রদত্ত	রামায়ন	রামায়ণ
ভবিষ্যৎবাণী	ভবিষ্যৎবাণী	রাজাগণ	রাজগণ
ভূম্যাধিকারী	ভূম্যাধিকারী	কণ	কণ
ভৌগলিক	ভৌগোলিক	বক্ষরাজ	বক্ষোবাজ
ভূষণ	ভূষণ	রাশিকৃত	রাশিকৃত
মনহর	মনোহর	লঙ্কাস্বর	লঙ্কাকর
মনমোহন	মনোমোহন	লক্ষী	লক্ষী
মধ্যরাত্রি	মধ্যরাত্র	শগু	শস্ত
মাহাত্ম্য	মাহাত্ম্য	শিরমনি	শিরোমণি
মাননীয়	মাননীয়, মান্ত	শিরনাম	শিরোনাম
মৈত্রতা	মিত্রতা	শিরচ্ছেদ	শিরশ্ছেদ
মনঃ কষ্ট	মনোকষ্ট	শেতাজিনী	শেতাবী
মধুসূদন	মধুসূদন	শশীভূষণ	শশিভূষণ
মধুর্ভতা	মধুর্ভতা	শোণিত	শোণিত
মুমূর্ষু	মুমূর্ষু	শিরোপীড়া	শিরোপীড়া
মৃত্ত	মৃত্ত	শিশিপুচ্ছ	শিখিপুচ্ছ
মনস্কাম	মনস্কাম	শ্রদ্ধাম্পদাস্ত	শ্রদ্ধাম্পদেষু
মহীন্দর	মহীন্দর	স্বরস্বতী	সরস্বতী
মুগ্ধ	মুগ্ধ	স্বাস্থ	স্বাস্থ্য
সান্ত্বনা	সান্ত্বনা	সমীচীন	সমীচীন

অন্তর	শব্দ	অন্তর	শব্দ
সন্মান	সন্মান	সৌভজ্যতা	সৌভজ্য, হৃদয়ভা
সন্মতি	সন্মতি	সারথী	সারথি
সম্মুখ	সম্মুখ	স্বাতন্ত্র্য	স্বাভাৱ্য
শ্রোতবেগ	শ্রোতবেগ	সন্ন্যাসী	সন্ন্যাসী
সলজ্জিত	সলজ্জ	সায়াহু	সায়াহু
সকাতর	কাতর	সহা	সহা
সবিনয়পূর্বক	সবিনয়ে, বিনয়পূর্বক	সাধ্যায়ত্ত	সাধ্য
স্ববুদ্ধিমান	স্ববুদ্ধি	সম্মিলন	সম্মেলন
স্বামিপুত্র	স্বামিপুত্র	স্বয়ংস্বরা	স্বয়ংস্বরা
স্বকেশিনী	স্বকেশা	সম্বরণ	সংস্বরণ
সকৃতজ্ঞ	কৃতজ্ঞ	সানন্দিত	সানন্দ
সদ্যজাত	সদ্যোজাত	সর্পিনী	সর্পা
সিন্দূর	সিন্দূর	সহাতীত	সহনাতীত
সপ্ত	সপ্ত	সমতুল্য	সম বা তুল্য
সচ্ছন্দ	সচ্ছন্দ	স্বালন	স্বালন
সাক্ষন্দ্য	সাক্ষন্দ্য	হস্তীদন্ত	হস্তিদন্ত
সঙ্ঘা	সঙ্ঘা	দ্বন্দ্বিগু	দ্বন্দ্বিগু
সাহায্য	সাহায্য	দ্বন্দ্বকম্প	দ্বন্দ্বকম্প
স্বয়ংধনী	স্বয়ংধনী	দ্বিকেশ	দ্বিকেশ

### বানানের উভয় রূপ শব্দ :

কতকগুলি শব্দের উভয় প্রকার বানানই শুদ্ধ। পরীক্ষকগণের অনেকেই কেবলমাত্র এক প্রকার বানানের সহিত পরিচিত বলিয়া তাঁহারা অন্য প্রকার বানানকে অশুদ্ধ মনে করিয়া কাটেন। ইহাতে বিচারকের অপরাধে নিরপরাধের দণ্ড হয়। শব্দগুলির উভয় প্রকার বানানই প্রদত্ত হইল :

অঙ্গুলি—অঙ্গুলী। অটবী—অটবি। অমৃষর—অমৃষার। অমৃষ্টপ—অমৃষ্টপ।  
 অন্তরীক্ষ—অন্তরীক্ষ। অবনী—অবনি। অরণি—অরণী। অলি—অলী। আভস—  
 আভস। ইন্দীবর—ইন্দিবর। উবা—উবা। কপাট—কবাট। কটি—কটী।  
 কলসী—কলসি। কস্তুরী—কস্তুরা। কিশলয়—কিসলয়। কাকলি—কাকলী।  
 কুটির—কুটীর। কুশীদ—কুসীদ। কেশর—কেশর। কুমি—ক্রিমি। কৈকেয়ী—  
 কৈকয়ী। কোটি—কোটা। কোশল্যা—কৌশল্যা। ক্ষুর—ধুর। গতি—গতি।  
 গাগরি—গাগরী। গাতিব—গাতিব। চবি—চবী। চিংকার—চিংকার। ঝিলী—  
 ঝিলি। তরণী—তরণ। তরী—তরি। তমু—তন্। ত্রটি—ত্রুটি। বপতি—  
 বপতি। দেবকী—দেবকী। ধরণী—ধরণী। ধূলি—ধূলী। ননি—ননী। নিহার

নীহার। নিমিষ—নিমেঘ। নিশ্চন্দ—নিশ্চন্দ। পাটীগণিত—পাটীগণিত। পেশি—  
পেশিশ। প্রতিকার—প্রতীকার। প্রত্যাষ—প্রত্যাষ। পরীক্ষিত—পরীক্ষিত। পল্লী—  
পল্লি। প্রণালী—প্রণালি। পরিবেষণ—পরিবেশন। পদবী—পদবি। পুরবী—  
পুরবী। বীথি—বীথি। বেণী—বেণি। দেবী—দেবি। বল্পরী—বল্পরি। বাড়ি—  
বাড়ী। বিকশিত—বিকসিত। বিশদ—বিষদ। ব্যতিহার—ব্যতীহার। বশিষ্ঠ—বসিষ্ঠ।  
বেশি—বেশী। ভূমি—ভূমী। ভেরী—ভেরি। ভূশক্তি—ভূশক্তি। ভ্রূটি—ভ্রূটি।  
ভক্তি—ভক্তি। মহামারী—মহামারি। মহী—মহি। মঞ্জু—মঞ্জু। মঞ্জরি—  
মঞ্জরী। মাণিক—মানিক। মিলন—মেলন। মালিশ—মালিস। মাঘুলী—মাঘুলী।  
মাহুলি—মাহুলী। মাঝি—মাঝী। মাঙ্গিক—মাঙ্গীক। মহোষধি—মহোষধী।  
মহার্ঘ—মহার্ঘ্য। লহরী—লহারি। লিখন—লেখন। শট—শটি। শব্দক—শব্দক।  
শাড়ী—শাড়ি। শিষ—শিষ। শেফালি—শেফালী। শিপ্রা—সিপ্রা। শামলা—  
শামলি। শ্রেণী—শ্রেণি। শূর্ণনখা—শূর্ণনখা। সরণী—সরণি। সরসু—সরসু।  
সর—সর। সীকর—সীকর। সিঁড়ি—সিঁড়ী। সিন্ধাড়া—সিন্ধাড়া। সূচী—সূচি।  
স্বাতী—স্বাতি। সুরী—সুরি। দৈবজ্ঞী—দৈবজ্ঞী। সুরভি—সুরভী। সুরজু—  
সুরজু। হুম্মান—হুম্মান। হাতী—হাতি। হাথির—হাথীর। হার্দ—হার্দ্য।

### ● অন্তঃ, কিন্তু বহু-প্রচলিত শব্দ :

কতকগুলি শব্দ আছে, যেগুলি ব্যাকরণের বিচারে অন্তঃ; কিন্তু তাহারা বহু-  
প্রচলিত। ভাষা সব সময় ব্যাকরণের শাসন মানিয়া চলে না। সেইরূপ কিছুসংখ্যক  
শব্দ নিয়ে প্রদত্ত হইল :

অতিথিশালা। অর্ধাঙ্গিনী। অর্ধেক। অনাথিনী। অন্তঃশীলা। অশ্রুজল।  
আভোপাস্ত। আবশ্যকীয়। আভ্যন্তরীণ। আহরিত। ইতিপূর্বে। ইতিমধ্যে। ইচ্ছিত।  
উদাসিনী। উদগীর্ণ। উপরদ্ধ। উপরোক্ত। একত্র। এদেশীয়। এ জাতীয়। করিতকর্ম।  
কার। কিবা। কৃষক। কেবলমাত্র। খোদিত। গণতান্ত্রিক। গুরুত্ব। গোপিনী।  
চণ্ডীদাস। চকুলজ্জা। চকুরোগ। চকুল। চকুস্তির। চকুমান। চকুরত্ন। চকুদ্বয়।  
চমকিত। চলৎশক্তি। চাভকিনী। চাকচিক্য। ছাত্রী। জর্জরিত। তৎকালীন। তদ্রাচ।  
তিনঘনী। দিগমরী। ধার্ষ। নমিত। নিরলস। সিন্দুক। নিরাশা। নির্জলা উপবাস।  
নিগোষী। নিবিরোধী। তটিনী। নিশি। নিঃশেষিত। নিশ্চয়তা। নির্ভরতা।  
পাশ্চাত্য। পাশবিক। প্রাকৃতিক। পৈশাচিক। প্রত্নতাত্ত্বিক। প্রবহমান। পত্রোৎ  
পার্ভত্য। বহুত্বপী। বহু। বনানী। বরষাত্রী। বাহ্যিক। বিতাড়িত। বিধর্মী। বিশেষত্ব।  
বিধাতা-পুরুষ। ভয়ঙ্করী। ভাষ্যবধু। মনোহর। মনোচোর। মানসিক।  
মহাআগণ। মহারণী। মহাশয়। মুগরিত। মৌন। মৌনতা। সুবাপুরুষ। রক্তরিচী।  
রক্তকিনী। রাজনৈতিক। রূপসী। শরৎচন্দ্র। শতবার্ষিক। শারীরিক। শিরোনাম।  
শিরোগরি। যেতাজিনী। শ্রেষ্ঠতর। শ্রেষ্ঠতম। সক্ষম। সর্পিনী। সম্ভব। সত্যতা।  
সঠিক। সকাহরে। সকাহজ। সচকিত। সলজ্জিত। সশব্দিত। সমসাময়িক। সাবধানী।

লাকী দেওয়া। সাধ্যাতীত। সাধ্যায়ত্ত। সাজ্জা। সিংহিনী। সিখন। সিক্ত।  
স্থবিত্ত। স্থকেশিনী। স্থড়ন। স্থজন। সেবিকা। স্বক্ষে। স্বজন। স্বাধিকারী।  
হস্তায়ক। হেমাঙ্গিনী।

“সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী অশুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইলেও, ইহাদের  
আর কোনক্রমেই পরিহার করা যায় না এবং সেইজন্য বাঙ্গালা ব্যাকরণের দ্বারা  
ইহাদের সমর্থন করা হইয়াছে।”  
—সংস্কৃত বাঙ্গালা অভিধান

### • বিশ্ববিদ্যালয়-প্রণীত বাংলা বানানের সংক্ষিপ্ত নিয়ম :

এক. রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিভব বর্জন : রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিভব  
হইবে না। যেমন, কর্জ, ধর্ম, সর্ব, গর্ব, অর্চনা, মূর্ছা, অর্জুন, কর্তা, কার্তিক, কর্দম  
ইত্যাদি। এই নিয়ম তৎসম শব্দের ছায় তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী শব্দের ক্ষেত্রেও  
প্রযোজ্য। যেমন : মর্গ, শর্ত, পর্দা, সর্দার, চবি, ফর্গা, জার্মানী, আর্ম্যানি, বর্তমান  
ইত্যাদি।

দুই. সন্ধিতে ও স্থানে বিকল্পে অনুস্বার : ক, খ, গ ও ঘ পরে থাকিলে  
পদের অন্তস্থিত ম-স্থানে ‘ঙ’ বা বিকল্পে অনুস্বার হয়। যেমন, অহংকার [অহংকার],  
ভয়ংকর [ভয়ংকর], শুভংকর [শুভংকর], সম্মা [সংখ্যা], সম্ম [সংগম], হৃদয়ঙ্গম  
[হৃদয়ংগম], সঙ্ঘটন [সংঘটন], সঙ্কলন [সংকলন], সংকল্প [সংকল্প] ইত্যাদি।

তুল্লিখিত বিধির অপপ্রয়োগ : মনে রাখিতে হইবে যে, কেবলমাত্র ক, খ  
গ, ঘ পরে থাকিলে এবং ম আগে থাকিলেই [ং] অনুস্বার হয় না। ঐ ‘ম’ পদের  
অন্তস্থিত ‘ম’ হওয়া চাই। নচেৎ অনুস্বারের [ং] ব্যবহার অশুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত  
হইবে। যেমন, অহম্ [পদের অন্তস্থিত ‘ম’]+কার=অহংকার; শুভম্ [পদের  
অন্তস্থিত ‘ম’]+কার=শুভংকর; সম্ [পদের অন্তস্থিত ‘ম’]+কলন=সংকলন  
হৃদয়ম্ [পদের অন্তস্থিত ‘ম’]+গম=হৃদয়ংগম ইত্যাদি। কিন্তু বহিম, অক, পক, শক  
ভক, বক, ব্যাক, ভকি, মঙ্গল, ইজিত, ককাল, পদপাল, রত্নময়, লজ্জন, শক  
আকাক্ষ, গকা, গকোপাধ্যায়, পকিল, কলিজ, ভকুর, অকার, লবক, অক, ভক,  
লকা, ককণ, কিকিণী।

তিন. ও ও অনুস্বারের ভিন্নভর প্রয়োগ : বাঙ্গালা, বাঙ্গালা, বাঙ্গালী,  
ভাঙ্গন প্রভৃতি শব্দের বাংলা, বাঙলা, বাঙালী, ভাঙন প্রভৃতি উভয় প্রকার বানানই  
শুদ্ধ। হসন্ত ধ্বনি হইলে বিকল্পে ং ও ঙ—দুই-ই হয়। যেমন, রং [রঙ], সং [সঙ],  
বাংলা [বাঙলা] ইত্যাদি। তবে স্বরাশ্রিত হইলে একমাত্র ‘ঙ’ ব্যবহারই বিধেয়।  
যেমন, রঙের, বাঙালী, ভাঙন ইত্যাদি।

চার. হস্ চিহ্নের প্রয়োগ : অ-কারান্ত হইলেও তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী  
শব্দের শেষে সাধারণতঃ হস্ চিহ্নের ব্যবহার নিষ্প্রয়োজন। যেমন : কাক, বক, মাহুত,  
কান, নাক, হাত, ওতাদ, ওছনহ, পকেট, ডিগ, অজ, চেক, কবেরন, করিলেন, করিস  
ইত্যাদি। অবশ্য হসন্ত উচ্চারণ অস্পষ্ট হইলে হস্ চিহ্ন ব্যবহার্য। যেমন : শাহ

তৎ, তৎ, তৎ, তৎ, তৎ ইত্যাদি। কিন্তু যদ্য-কর্মে প্রয়োজন হইলে তৎ, তৎ, তৎ অব্যয়ই প্রযোজ্য। যেমন : উল্কি, কুল্কি, চুইকি, থইকা ইত্যাদি। আবার, উপাধি-বর অত্যন্ত হ্রস্ব হইলে শব্দ-শেষে হ্রস্ব-চিহ্নের ব্যবহার শুভ। যেমন, কইকই, গইগই, থইথই ইত্যাদি।

পাঁচ. ই ই-এর শুদ্ধ প্রয়োগ : মূল সংস্কৃত শব্দে ই থাকিলে তদ্রূপ বা তৎসমূহ শব্দে ই বা ই বিকল্পে হয়। যেমন, কুমীর [ কুমির ], পাণ্ডি [ পাণি ], বাঙী [ বাড়ি ], শিব [ শিষ ], কুটীর [ কুটীর ] ইত্যাদি। কিন্তু কতকগুলি শব্দে কেবল 'ই' হয়। যেমন : খিল, পানি, কলি, গলি, ধলি ইত্যাদি। আবার, কতকগুলি শব্দে কেবল 'ঈ' হয়। যেমন : কীল, পানী, ফলী, নীলা, হীরা, দীপ, পীত ইত্যাদি।

ত্রীলিঙ্গ শব্দের অন্তে এবং ব্যক্তি, ভাতি, ভাষা ও বিশেষণবাচক শব্দের অন্তে 'ঈ' হইবে। যেমন : বাধিনী, চণ্ডালী, হস্তিনী, হরিণী, কাবুলী, কেরানী, চাকী, করিয়ারী, ইংরেজী, বিলাতী, দাঙ্গি, রেশমী ইত্যাদি। কিন্তু কতকগুলি শব্দে 'ই' হইয়া থাকে। যেমন : বি, দিবি, বিধি, কচি, মিহি, মাঝারি, চলতি ইত্যাদি। অবশ্য 'পিনী' স্থানে বিকল্পে 'পিসি' এবং 'মাসী' স্থানে বিকল্পে 'মাসি' লেখা চলিবে। অন্তর্গত মনুষ্যভেদ জীব, বস্তু, গুণ, ভাব ও কর্মবাচক শব্দের অন্তে এবং দ্বিরাবৃত্ত শব্দের অন্তে কেবল 'ঈ' হইবে। যেমন : ব্যক্তি, বেড়াচি, কাঠি, সজ্জি, চুরি, কেরামতি, পাগলামি, বাবুগিরি, ভাড়াভাতি, ধরাধরি, সরাসরি, সোজাসজ্জি, ইত্যাদি।

ছয়. উ উ-র শুদ্ধ প্রয়োগ : মূল সংস্কৃত শব্দে 'উ' থাকিলে তদ্রূপ বা তৎসমূহ শব্দে 'উ' বা বিকল্পে 'উ' হয়। যেমন : উনিশ [ উনিশ ], উরা, [ উরা ], চুন [ চুন ], পূব [ পূব ] ইত্যাদি। কতকগুলি শব্দে কেবলমাত্র 'উ' শুধু। যেমন : চুল, তালু, জুয়া ইত্যাদি।

সাত. ও-কার ও উচ্চ-কমার প্রয়োগ : সপ্রচলিত শব্দের উচ্চারণ, উৎপত্তি বা অর্থের ভেদ বুঝাইবার জন্ত অতিরিক্ত ও-কার, উচ্চ-কমা বা অন্ত চিহ্ন যোগ বর্তনীয়। যদি অর্থ-গ্রহণে বাধা হয়, তবে কয়েকটি শব্দে অন্য অক্ষরে ও-কার এবং আঙ বা মধ্য অক্ষরে উচ্চ-কমা বিকল্প দেওয়া ঘাইতে পারে। যেমন, কাল [ কালো ], ভাল [ ভালো ], মত [ মতো ], পড়ে [ পড়ে ] ইত্যাদি।

এত, কত, যত, তত ; তো, হয তো ; কাল [ সময়, কাল ], চাল [ চাউন, চাট, গতি ], ভাল [ ভাল, শাখা ]—এইরূপ একই প্রকার বানান বিধেয়।

আট. জ ও ঘ-র ব্যবহার : কাত, জাউ, জাউ, জাতি, জুই, জুত, জো, জোড, জোড়া, জোত, জোহাল—এই সকল শব্দে 'ব' না লিখিয়া, 'জ' লেখাই বিধেয়।

নয়. ণ ও ঙ-র ব্যবহার : অ-সংস্কৃত শব্দে কেবল 'ন' ব্যবহার করাই বিধেয়। যেমন : কান, সোনা, বামন, কোরান, করোনার। কিন্তু যুক্তাক্ষর ণ্ট, ণ্ড, ণ্ড, ণ্ড ব্যবহৃত হওয়া উচিত। যেমন : ণ্টি, লুণ্ডন, ণ্ডা ইত্যাদি।

দশ. শ, ষ ও স-র ব্যবহার : মূল সংস্কৃত শব্দে শ, ষ ও স থাকিলে তদ্রূপ

## অন্তর্নিহিত সংশোধন

শব্দেও শ, ব বা স হইবে। যেমনঃ >আন্ত>আশ, আশিঃ>আব, পিত্ত>পান,  
—বশা, পিতৃশা—পিনী। ব্যতিক্রমঃ যমুত—মিন্‌সে, ব্রহ্ম—সাব ইত্যাদি।

বিবেচনী শব্দের উচ্চারণ অনুসারে >স-হানে 'স' এবং >শ-হানে 'শ' হইবে।  
যেমনঃ আসল, ক্লাস, গ্লাস, জিনিস, পুলিশ, পেন্সিল, সাদা, সবুজ, খুশি, শব্দ, কল্যাণ,  
পশম, পোশাক, পালিশ, শখ, সৌধিন, পেক্সপিরর।

### ০. বাক্যাংশের শুদ্ধি অশুদ্ধি [বাক্যনী চিত্রের মধ্যবর্তী রূপটিই শুদ্ধ]

আতিথ্য সংকার [অতিথি সংকার]। আবশ্যক নাই [আবশ্যকতা নাই]।  
আরোগ্য হইলাম [আরোগ্য লাভ করিলাম বা নীরোগ হইলাম]। অসম্ভব বিধ  
[অসংগত বা উৎকট জিহ্বা]। অস্তর্ধান হইলেন [অস্তর্ধান করিলেন বা অস্তর্হিত  
হইলেন]। আপ্রাণ চেষ্টা [প্রাণপণ চেষ্টা]। অজ্ঞত ব্যক্তি [অগণিত ব্যক্তি]।  
অস্বাভাবিক আনিভেদ [কৃত্রিম আনিভেদ]। অশুদ্ধ স্থান [অশুদ্ধ পদ]।  
প্রবেশ নিবেদ [প্রবেশ নিবিদ্ধ]। আলোচ্য গচ্ছাংশ [আলোচ্যমান গচ্ছাংশ]।  
অজীর্ণতা [অজীর্ণ রোগ]। অপমান হইবার ভয় [অপমানিত হইবার ভয়]।  
দেবতার উদ্দেশ্যে [দেবতার উদ্দেশ্যে]। গৌরব লোপ হইয়াছে [গৌরব লুপ্ত  
হইয়াছে বা লোপ পাইয়াছে]। করা কর্তব্য [করা উচিত]। কৃতকার্যতার সহিত  
[কৃতিত্বের সহিত]। জীবন সংশয় [জীবন সংশয়াপন্ন]। দরিদ্রদের অত্যাচার  
করা [দরিদ্রদের উপর অত্যাচার করা]। কারো ধারি না [কারুর ধার ধারি  
না]। ওর কথা বিশ্বাস করি না [ওর কথায় বিশ্বাস করি না]। রাত্রি অবসান  
হইল [রাত্রির অবসান হইল]। বিত্তহীন হিন্দুর হোটেল [হিন্দুর বিত্তহীন হোটেল]।  
বাল্মীকী পাঠার দোকান [বাল্মীকীর পাঠার দোকান]। সোনার হাল ফ্যানারের  
গয়না [হাল ফ্যানারের সোনার গয়না]। শোকানলে মগ্ন [শোক-সাগরে মগ্ন]।  
জীবনশ্রোত, দ্রুতপথে ছুটিল [জীবনশ্রোত দ্রুতবেগে ছুটিল]। তার সাথে ঝগড়া  
[তার সঙ্গে ঝগড়া]। মুদি দোকান [মুদির দোকান]। মৃগ ডাল [মৃগের ডাল]।  
মামাবাড়ি [মামার বাড়ি]। হরিমুট [হরির মুট]। ছোটদের মহাভারত  
[ছেলেদের মহাভারত]। ছোটবেলার কথা [ছেলেবেলার কথা]। পূজার বস্তু  
[পূজার ছুটি]। নামজাদা লেখক [নামকরা লেখক]। লালপেড়ে শাড়ি [লালপাত  
শাড়ি]। পুষ্পের সুরভি [পুষ্পের সৌরভ]। ভয়ংকর কুখ [অত্যন্ত কুখ]।  
ভীষণ ঘুম [খুব বেশী ঘুম]। আরম্ভ হইল [আরম্ভ হইল]। শেষ হইল [সমাপ্ত  
হইল]। উদয় হইল [উদিত হইল]। গোপন কথা [গোপনীয় কথা]।  
বিস্তর ঘেনা [অনেক ঘেনা]। সম্ভব নয় [সম্ভবপর নয়]। মৌন হইয়া রহিলেন  
[মৌনী হইয়া রহিলেন]। তদ্বৃষ্টে [তদর্শনে]। আশ্চর্য হইল [আশ্চর্যাবিত  
হইল]। সাবকাশ নাই [অবকাশ নাই]। সাক্ষী দিয়াছে [সাক্ষ্য দিয়াছে]। প্রমাণ  
হইয়াছে [প্রমাণিত হইয়াছে]। সবট অবস্থা [সবটাপন্ন অবস্থা]। বন-কুশলী  
[বন-কুশল]। সাংঘাতিক ভোজন [প্রচুর ভোজন]। সাংসারিক বুদ্ধি [সংসার-



বুদ্ধি]। সাহায্য-কৃত বিভাগ [সাহায্য-প্রাপ্ত বিভাগ]। সমর সংকেপ [সমর সংক্ষিপ্ত]। হওয়া কর্তব্য [হওয়া উচিত]। নাটক অভিনয় হইবে [নাটকের অভিনয় হইকে বা নাটক অভিনীত হইবে]। একত্রে গমন [একত্র গমন]। অত্র স্থানের [এই স্থানের বা অত্র স্থানে]। সকল লোকেরাই [সকল লোকই বা লোকেরা সকলেই]। বুদ্ধিমতী মহিলাগণ [বুদ্ধিমতী মহিলারা]। নানাবিধ পক্ষীগণ [নানাবিধ পক্ষী]। প্রায় পাঁচ সহস্র ছাত্রবৃন্দ [প্রায় পাঁচ সহস্র ছাত্র]। কানন-প্রাঙ্গণ [কুটির প্রাঙ্গণ]। আবাল্য হইতেই [বাল্যকাল হইতেই]। সমুদ্রপূর্বক [সমুদ্রপূর্বক বা সমুদ্রে]।

### চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার-জমিত অশুদ্ধি :

কাটা—কণ্টক। কাটা—ছেদন করা। বাধা—বন্ধন। বাধা—বিষয়। গাঁথা—গ্রথিত করা। গাঁথা—কাব্য-কাহিনী। পাঞ্জি—পঞ্জিকা। পাঞ্জি—দুই প্রকৃতির। পাক—কর্মসম্মত। পাক—বন্ধন। কাঁদা—ক্রন্দন। কাঁদা—কর্মসম্মত। হাস—হাস্য। হাস—হাস্য। দাঁও—সুযোগ। দাঁও—দাঁ-ধাতুর মধ্যম পুরুষের বর্তমানকালের অতীত। ছাঁদ—ছন্দ। ছাঁদ—গৃহের উপরিভাগ। চাই—নেতা [মন্ডাথে]। চাই—চাহ্ ধাতুর উত্তম পুরুষের বর্তমান। তাঁহার [তাঁর]—সম্মান-যোগ্য ব্যক্তি। তাহার [তার]—সম্মানের অযোগ্য ব্যক্তি।

### অনুসরণী ।

\*১. নিম্নলিখিত প্রয়োগগুলি শুদ্ধ কি অশুদ্ধ, কারণ দেখাইয়া বিচার কর : ক. নিরপরাধীন। নারাজী। রুচিবান। উৎকর্ষতা। প্রাঙ্গণ। বিদ্যাত্মক। সমুদ্র। প্রতিযোগিতা। উ. মা. '৫১। খ. সর্ব সমুদ্র সংকেপিত। প্রাক-প্রবন্ধ। ১৯৪৪ সালের বইবন আইনামুসারে। গুণগণ। তড়িতাহত। নিরোপিত। গারবী। বন্ধন। উ. মা. '৫২। গ. মতিমামুদিত। প্রকাশ্য। নিরতিমানিনী। দুবান্দা। সমুদ্রিত। মতিম। সর্বধানী। বৈদ্যতা। উ. মা. 'কম্পাট.' '৫৩। ঘ. কুজিনী। শ্রীমদ্রাগবতী। মুক্তিমালিনী। মাতৃবৃন্দ। গুণগণ। অজ্ঞানতা। গুণগণ। চন্দ্রবিন্দু। চন্দ্রবিন্দু। উ. মা. '৫৩। ঙ. লক্ষ্যগণ। সমুদ্র। ভৌগলিক। নিরতিমানী। প্রকাশ্য। প্রকাশ্য। সমুদ্র। নিরতিমান। বৈদ্যতা। উ. মা. '৫৪। চ. দুবান্দা। বারহা। চৌহান। রোগগ্রস্ত। সর্বজনপূর্বক। লক্ষ্যগণ। সমুদ্র। প্রদারতা। উ. মা. '৫৫। ছ. তেজস্বী। বাধ্য। মুখ। লক্ষ্যগণ। বিপদপাত। যত্নশীল [ব্যক্তি]। আশী। উ. মা. '৫৬। জ. গোলকনাথ। আশ্রয়। বিপদগ্রস্ত। বিভাগ। কলুষতা। কলুষকণন। বাস্তবিক। গুণগণ। উ. মা. '৫৭। ব. লক্ষ্য। বারহা। মুখ। আশ্রয়। নিরতিমান। মুখ। বাস্তবতা। উ. মা. '৫৮। ঙ. মুখ। কলুষ। মধ্য। প্রাথমিক। পর্বটন। উ. মা. '৫৯। ট. অনাটন। দ্বন্দ্বিতা। নিরতিমান। মুখ। রামায়ণ। পাক। কচিৎ। চর্চাচোড়। অধীন। আশ্রয়। উ. মা. [কম্পাট.] '৬০।

\*২. শুদ্ধ কি অশুদ্ধ, তাকার কারণ দেখাইয়া বল : ক. সর্বজনীন। পরিহার। হারি। মহত। প্রকাশ্য। ইতিমত। নিরতিমান। বারহা। প্রকাশ্য। সমুদ্র। মাধুর্য। মা. '৫২। খ. উৎকর্ষতা। আবহাওয়া। কলুষগণ। বন্যোগ। নিরপরাধী। অনুবর্তিত। মহত। সমুদ্র। অপরাধ। অতিমান। মা. '৫৩। গ. পৌরোহিত্য। লক্ষ্যগণ। দুবান্দা। জ্ঞানগণ। বৈদ্য। বাস্তবতা। আকাংক্ষা। ব্যবহার। মা. '৫৪। ঘ. নিরপরাধী। কলুষগণ। অপকর্ষতা। ভৌগলিক। বন্যোগ। মহত। মুখ। মা. '৫৫। অকর্ষতা। আবহাওয়া। বন্যোগ। নিরপরাধী। মহত। সমুদ্র। অপরাধ। কলুষগণ। ভৌগলিক। মা. [কম্পাট.] '৬১।

৬. ভৌগলিক। অতিমান। পূর্বক। প্রতিদ্বন্দ্বিতা। বন্যোগ। পূর্বক। কলুষগণ। মা.

## অভি সংশোধন

[কম্পাট.] '৩০। হ. হুয়াবহ। আবরিত। সক্রতজ। আরতী। ব্যাখ্যা। আগতকল্য। লক্ষ্যী।  
বিপদগ্রহ। গৌরহিত। মা. '৩১। জ. ঐক্যমত। ভৌগলিক। নিশ্চয়তা। আকাখ। বটমণ।  
হুশাচা। উচ্ছাসিত। সবিনয়পূর্বক। মা. '৩২। হকটিবান। আবির্ভাব। ভূমাধিকারী। ক্ষত্বস।  
খালন। উপহিত। লক্ষ্যী। বিদূষী। সখা। মা. '৩৩। প্রেক্ষণশান। ওয়ার্ডবার্শ। বটন।

৩০. উচ্ছাসগুণের ভুল সংশোধন কর: ক. যে বাঙালীরা নিয়ে আমরা অহরাত্রি আশ্রয়ন করি।  
যদি তাহাও অতি ছোট ও শীর্ণ চেহারা বরণ করে। এই চতুঃপার্শ্বের সুত্রস্তর মধ্যস্থলে বিভাসাগরের নৃতি  
ধবলগিরির স্তায় শীর্ণ তুলিয়া দাঁড়িয়ে থাকে। ড. মা. '৩১। খ. নন্দ্যদেবীর শিরপরি এক অতি বৃহৎ  
ভাস্কর্য্যোক্তি: বিরাট করিতেছে, তাঙ্গা একান্ত দুর্নিরীক্ষ। সেই ভ্রাতৃপুঞ্জ হঠাৎ নির্গলিত ধূম্ররাশি বিক-  
সিত্ত বাপিবা রহিয়াছে। \*বে এই কি মহাদেবের কটা? এই ভ্রাতৃ পৃথিবীকণী নন্দ্যদেবীকে চন্দ্রাভূষণের  
স্তায় আভরণ করিয়া রাখিয়াছে। উ. মা. [কম্পাট] '৩১। গ. [১] খন্ড পলাথকরণ করাই প্রাণীদেহের  
পক্ষে পরম প্রাপ্তি নয়। [২] গণহরণশাসনে রাজার এখানীন্তন অন্তরঙ্গ সঙ্গ্য ভাতির উদ্দেশ্যেই এই শাশ্বতী  
ও গবতী উক্তি প্রযুক্ত। ৩. খাণ্ডা হঠাৎই নদীর সহিত আমার সখ্যতা। [৪] সমস্তপূর্বক অধ্যায়ন  
না করিলে পঞ্চাশ উপকার প্রাপ্ত হওয়া বদন। ড. মা. '৩১। ঘ. এক্ষণ সত্য যে আমাদের বহু কুসংস্কার  
আছে। সমাজদেহে ইহাদের কবর অবস্থিতি। এইগুলিকে কাটিয়া বাধ দিতে হইবে, অবশ্য তাহাতে  
জাতীয় প্রাণশক্তি, ধর্ম, অধ্যাত্মিকতা নষ্ট হইবে ন। আসলে বর্ষা মূল তত্ত্বগুলি এখনও অক্ষতই রহিয়াছে  
এবং বর্ত্তি চারিত্র্যের এই অবস্থিত কলঙ্ক কালমা বিদূষিত হইবে, ততই এই তত্ত্বগুলি প্রোচ্ছল হইয়া  
উঠিবে। মা. '৩৮।

৪ ক. নিয়ে 'স্তম্ভ' শব্দগুণগুলির মধ্য হঠাৎ শব্দকণ্ঠ লিখ: উৎসর্গতা; উৎসর্গ। সঙ্গীল, সহনশীল।  
শয়নান্তর, শয়নান্তর। নৃদ্বিজলীল। নৃদ্বিজলী। ঐকমত্য, ঐকমত্য। ভৌগলিক, ভৌগোলিক।  
আয়ত, আয়ত। ড. মা. [কম্পাট] '৩২। খ. 'নন্দ্যদেবী' শব্দগুলির শব্দকণ্ঠ লিখ: অনুমত্যানুসারে।  
ভ্রাতৃপুঞ্জ। পাজন। চন্দ্র চান্দ্র। প্রজ্ঞাত। বিগেল। আভ্যাকর। মহারাজা। পঞ্চমধ্যে।  
উ. মা. [কম্পাট] '৩২।

৫. 'হস্ত' শব্দ পরিবর্তন লিখ:

ক. প্রেহে। জাতীয়া,

তোমার পত্র পাতবাচি। তোমার পিতৃদেবের ষাট ভাল থাকিচ্ছে না। এবং বিশেষ গুরুত্ব  
প্রয়োজন লিখিয়াছি। কিন্তু তাঁহার শ্রবণের মধ্যে যে শোক'নল প্রজ্জ্বলিত রহিয়াছে তাহাতে বাহিরের  
চিকিৎসার আরণ্য লাভ করিবেন কি? আশা করি তোমার সমস্ত জ্ঞান শিশুটি ভাল আছে।

আলীদাশক—

আলীদাশক, দে,

মা. '৩৪

খ. কমা,

শ্রবণশীল কুপার তুমি পণ্ডিত্যে অস্তিত্ব হইবাহ, এই সংবাদে আনন্দিত হইলাম। তোমার জননী  
হুয়ারোগা ব্যাধিতে ভুগিতেছেন জানিয়া দুঃখিত হইবারি। তাহার বখাযোগ্য সেবাসুজ্ঞান করিবে।  
তোমার শারীরিক কুশল কামনা করি।

ইতি

নিভান্তাশী

শ্রীমধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়

● পাঠ্য-গ্রন্থের ব্যাকরণ-পাঠের নির্দেশ ●

তৎ = তৎপুরুষ	কর্মবা = কর্মবাচ্য
কর্মধা = কর্মধারয়	করণবা = করণবাচ্য
মধ্যপ-কর্মধা = মধ্যপদলোপী কর্মধারয়	সম্প্রদানবা = সম্প্রদানবাচ্য
বহুব্রী = বহুব্রীহি	অপাদানবা = অপাদানবাচ্য
মধ্যপ-বহুব্রী = মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি	অধিকরণবা = অধিকরণবাচ্য
কর্তৃবা = কর্তৃবাচ্য	ভাববা = ভাববাচ্য

বি. জ. : পরীক্ষার উত্তর-পত্রে ভানদিকের মতো সম্পূর্ণ পদটিই লেখা উচিত ।

# রচনা বিচিত্রতা

## পাঠ্য-গ্রন্থের ব্যাকরণ

মাসিক পরীক্ষা, ১৯৭৮

### ● নবম শ্রেণী ●

পাঠ-সংকলন ॥ প্রথম খণ্ড ॥ ষষ্ঠ সংস্করণ

#### গদ্যাংশ

১. সমুদ্র-পথে
২. ভানুসিংহের পত্র
৩. লুই পাস্তুর
৪. মেজদা
৫. অচেনার আনন্দ

#### পদ্যাংশ

১. শ্রীরামের অগ্রিমূনির আশ্রম গমন
২. মধ্যাহ্নে
৩. পুরাতন ভূত্যা
৪. ত্রিরত্ন
৫. হাট

### ● দশম শ্রেণী ●

পাঠ-সংকলন ॥ প্রথম খণ্ড ॥ ষষ্ঠ সংস্করণ

#### গদ্যাংশ

১. হিমালয়-ভ্রমণ
২. সাগরসঙ্গমে নবকুমার
৩. আশ্রমের রূপ ও বিকাশ
৪. বাঙ্গাদিত্য
৫. ভারতবর্ষ

#### পদ্যাংশ

১. তুর্ঘোধনের প্রতি ধৃতরাষ্ট্র
২. ইন্দ্রজিতের যজ্ঞগৃহে লঙ্ঘন
৩. ধূলামন্দির
৪. কালবৈশাখী
৫. কাণ্ডারী হুঁশিয়ার

# নবম শ্রেণী

## পাঠ-সংকলন

### প্রথম খণ্ড

। পদ্য্যংশ ।

## ॥ সমুদ্রগণে ॥

সন্ধি ॥ দ্বীপ = দ্বি + ঈপ । তথাপি = তথা + অপি । লাভালাভ = লাভ + অলাভ । চড়্কারেরা = চড়ন + দ্বারেরা । পবন্ত = পরি + অন্ত । গলদ্বর্ষ = গলৎ + ঘর্ষ । সংগ্রহ = সম্ + গ্রহ । পুরস্কার = পুরঃ + কার । গঙ্গা = গম্ + গা ।

কারক-বিভক্তি ॥ বালীদ্বীপে—অধিকরণে 'এ' বিভক্তি । সবজায়গাই—অধিকরণে শূত্রবিভক্তি । কাজকর্ম - কর্মে শূত্রবিভক্তি । চারি পাঁচ মাস—অধিকরণে শূত্রবিভক্তি । জিনিস—কর্মে শূত্রবিভক্তি । মেঘের পরেই—করণে 'এ' বিভক্তি । নানা জিনিস—কর্মে শূত্রবিভক্তি । শুধেই—অধিকরণে 'এ' বিভক্তি । সাতগাঁ—অধিকরণে শূত্রবিভক্তি । হাল কর্মে শূত্রবিভক্তি । ছক্কে—করণে 'এ' বিভক্তি । বাতাসে—করণে 'এ' বিভক্তি । দোষে—করণে 'এ' বিভক্তি । সাজায়—অধিকরণে 'এ' বিভক্তি । ঝাপটা - করণে 'দিয়া' বিভক্তি । ঝেঁউতি—কর্মে শূত্রবিভক্তি । কটের—করণে 'এর' বিভক্তি । দর্পণের - কর্ম-প্রবচনীয়যোগে 'এর' বিভক্তি ।

সমাস ॥ বালীদ্বীপে - দ্বি [ দুইদিকে ] অপ্ [ জল ] যাহার—বহুব্রী ; বালী নামক দ্বীপ - মধ্যপ-কর্মধ, তাহাতে । কাজকর্ম—কাজ ও কর্ম—দ্বন্দ্ব । বাহাল-বরণান্ত—বহাল ও বরণান্ত—দ্বন্দ্ব । সাতগাঁ—সাত গাঁয়ের সমাহার—ধিগু । অদৃষ্টে—নয় দৃষ্ট—নঞতৎ, তাহাতে । দস্ত-মহাশয়—যিনি দস্ত, তিনিই মহাশয়—কর্মধা । নড়াচড়া—নড়া ও চড়া—দ্বন্দ্ব । ইষ্ট-দেবতার—ইষ্ট যে দেবতা—কর্মধা, তাহার । প্রাণপণে—প্রাণকে পণ—দ্বিতীয়াতৎ, তাহাতে । মাঝিমাল্লার—মাঝি ও মাল্লা—দ্বন্দ্ব, তাহার । নৌকারকার—নৌকাকে রক্ষা—দ্বিতীয়াতৎ, তাহার । ঝড়-বৃষ্টির—ঝড় ও বৃষ্টি—দ্বন্দ্ব, তাহার । গলদ্বর্ষ—গলৎ ঘর্ষ যাহার—বহুব্রী । দ্বী-পুত্র—স্ত্রী ও পুত্র—দ্বন্দ্ব । বগড়া-বিদার—বগড়া ও বিদার—দ্বন্দ্ব । অজ্ঞান—নাই জ্ঞান যাহার—নঞ-বহুব্রী । দাঁত-কপাটি - দাঁতের দ্বারা কপাটি—তৃতীয়াতৎ । স্ত্রী-পুত্র—স্ত্রী ও পুত্র—দ্বন্দ্ব, তাহাতে । বেনেবউ—বেনের বউ—বধীতৎ । যথাসর্ব্ব—সর্ব্বথেকে অতিক্রম না করিয়া—অব্যয়ীভাব । গর্জন-তেলের—গর্জনের ( গর্জনের ) তেল—বধীতৎ ; তাহার । উত্তর-পশ্চিম—উত্তর ও পশ্চিম—দ্বন্দ্ব ।

প্রকৃতি-প্রত্যয় ॥ সমুদ্র - সম্-উল্ + র [ কর্তৃবা ] । ব্যবসায়ের—বি-অব-সো + ষ্ণ্ [ ভাববা ], তাহার । ফসাও—ফস + আও । লাভ—লভ্ + ষ্ণ্ [ ভাববা ] । সংস্কার—সম্-ক + ষ্ণ্ [ ভাববা ] । মন্দিরে—মন্ + ইর [ অধিকরণবা ]

+এ। আনন্দ—আ-নন্দ্ + ঘঞ্ [ভাববা]। খেলুড়ি—খেল্ + উড়ি। আন—  
 আ + অনট্ [ভাববা]। আহ্লাদ—আ-হ্লাদ্ + ঘঞ্ [ভাববা]। দক্ষিণ—  
 দক্ষ্ + ইন [কর্তৃবা]। স্থবিধা—স্থ-বি-ধা + ঘঞ্ [ভাববা] + আ। স্থির—স্থা  
 + ইর [কর্তৃবা]। নড়া—নড়্ + আ। চড়া—চড়্ + আ। প্রমাদ—প্র-মদ্  
 + ঘঞ্ [ভাববা]। পাটনী—পাট + নী। শক্ত—শক্ + ক্ত [কর্তৃবা]। গুটানো—  
 গুট্ + আনো। নামানো—নাম্ + আনো। নোকা—নৌ + ক্ + আ। গোয়ানি  
 —গৌ + আনি। বিপদ—বিপ-দ্ + ষ্পি [ভাববা]। চন্দার—চডন + দার।  
 ইষ্টদেবতা—ইষ্ + ক্ত [কর্মবা] + দেব + তা [স্বাধিক]। রক্ষা—রক্ষ্ + অঙ  
 [ভাববা] + আ। মাঝি—মাঝ + ই। ভয়ানক—ভী + আনক। গলৎ—গল্ +  
 শত্। নিখাস—নি-খস্ + ঘঞ্ [ভাববা]। সহ—সহ্ + ণ্যৎ। কপাটি—কপাট  
 + ই। মুছিত—মুছ্ + ইত্। উপস্থিত—উপ স্থা + ক্ত [কর্তৃবা]। স্থস্থ—স্থ-  
 স্থা + ক। দর্পণ—দৃপ্ + অনট্ ! কর্তৃবা]। বিশ্বাস—বি-বস্ + ঘঞ্ [ভাববা]।  
 পুরস্কার—পুরস্ + ক্ত + ঘঞ্ [ভাববা]। স্বীকার—স্ব-অভূততস্তাবে চি + ক্ত + ঘঞ্  
 [ভাববা]। উপকার—উপ-ক্ + ঘঞ্ [ভাববা]। শ্রম—সম্-ধৈ + ঘঞ্ + আ।  
 গম্—গম্ + গ [কর্তৃবা] + আ। মোহানা—মূহ [ < মূধ ] + আনা।

**লিঙ্গান্তর** ॥ মেয়ে—ছেলে। রাজা—রানী। দত্ত-মহাশয় - দত্ত-মহায়া। ইষ্টদেবতা  
 —ইষ্টদেবী। বেটা—বেটী। স্ত্রী—স্বামী। পুত্র—কন্যা। পাগল—পাগলী,  
 পাগলিনী। বেনে—বেনেবউ।

**পদ-পরিবর্তন** ॥ সমুদ্র (বি)—সামুদ্রিক (বিণ)। দেশ (বি)—দেশীয়  
 (বিণ)। ব্যবসায় (বি)—ব্যবসায়ী (বিণ)। বদল (বি)—বদলী (বিণ)।  
 সংস্কার (বি)—সংস্কৃত (বিণ)। লাভ (বি)—লুভ (বিণ)। আদর (বি)—  
 আদৃত (বিণ)। আনন্দ (বি)—আনন্দিত (বিণ)। আন (বি)—আত (বিণ)।  
 আহ্লাদ (বি)—আহ্লাদিত (বিণ)। স্থির (বিণ)—স্থৈর্য (বি)। বিপদ (বি)  
 —বিপন্ন (বিণ)। স্থস্থ (বিণ)—স্থাস্থ্য, স্থস্থতা (বি)। জল (বি)—জলীয়  
 (বিণ)। ফেনা (বি)—ফেনিল (বিণ)। দোষ (বি)—দুষ্ট (বিণ)। মুছিত  
 (বিণ)—মুছ্ (বি)। স্ত্রী (বি)—স্ত্রৈয় (বিণ)। তেল (বি)—তেলা (বিণ)।  
 পুরস্কার (বি)—পুরস্কৃত (বিণ)। স্বীকার (বি)—স্বীকৃত (বিণ)। বিশ্বাস (বি)  
 —বিশ্বস্ত (বিণ)। নষ্ট (বিণ)—নাশ (বি)। উত্তর (বি)—উত্তরা (বিণ)।  
 পশ্চিম (বি)—পশ্চিমা (বিণ)। উপকার (বি)—উপকৃত, উপকারী (বিণ)।

**সার্থক বাক্যরচনা** ॥ ভদ্রারক—সবই তো হলো, এখন কাণটা ভদ্রারক করবে  
 কে? বাহাল-বরখাস্ত—নতুন বড়বাবু এসে কর্মচারীদের বাহাল-বরখাস্ত করে  
 অফিসটাকে সম্পূর্ণ ঢেলে সাজালেন। খেলুড়ি—ছেলেবেলায় যে সব খেলুড়িদের সঙ্গে  
 খেলতাম, তারা আজ সব কোথায় চলে গেছে। ক্রমে ক্রমে—আবারের জল ক্রমে  
 ক্রমে বাড়িতে লাগিল। লাভালাভ—ব্যবসারে লাভালাভ আছে। অকৃত—

মাহুষের **অদৃষ্টে** কি আছে, তাহা শুধু অদৃষ্ট-দেবতাই জানেন। **মিস্‌মিসে**—**মিসমিসে** কালো, মেঘে আকাশ ঢাকা। **ঝড়-ঝাপটা**—জীবনে ঝড়-ঝাপটা আসে; তাতে তো আর ভেঙে পড়লে চলবে না। **চড়্‌ফার**—নোকর **চড়্‌ফারের**। একসঙ্গে কীর্জন সাহিতে লাগিল। **গলদ্বর্ষ**—বছরের শেষে হিসাব মেলাতে বসে কর্মচারীরা **গলদ্বর্ষ** হতে লাগলো। **দাঁতকপাটি**—অন্ধকারে সেই ভয়ানক আওয়াজ শুনে সকলের **দাঁতকপাটি** লাগার উপক্রম। **যথাসর্বস্ব**—অগ্নিকাণ্ডে লোকটির **যথাসর্বস্ব** ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে।

**উক্তি-পরিবর্তন**। মাঝি বলিল, ‘মশাই, আমি.....স্বপ্ন হয়।’ (প্রত্যক্ষ উক্তি)। মাঝি সবিনয়ে বলিল যে, সে সেই টেউ খামাইয়া দিতে পারে—কিন্তু তাহাতে তাহার (বিহারীর) সাত আট লক্ষ টাকা ক্ষতি হইবে। তাহা সে সহিতে পারিবে কিনা তাহাকে বলিতে হইবে। বিহারী বলিল যে, তাহার যথাসর্বস্ব যায় সেও আচ্ছা; কিন্তু তাহার স্ত্রী ও কন্যা যেন প্রাণ পায় ও স্বপ্ন হয়। (পরোক্ষ উক্তি)।

## ॥ ভানুসিংহের পত্র ॥

**সন্ধি**। বৃহস্পতি = বৃহৎ + পতি [নিপাতনে]। অর্ধেক = অর্ধ + এক। বৃষ্টি = বৃষ + তি। আচ্ছন্ন = আ + ছন্ন। নির্মল = নিঃ + মল। পুণ্যতীর্থোদকে = পুণ্যতীর্থ + উদকে। সম্বন্ধে = সম্ + ধানে। নিশ্চিত = নিঃ + চিত। নিশ্চল = নিঃ + চল। বিচ্ছেদ = বি + ছেদ। আশ্চর্য = আ + চর্য। কিন্তু = কিম্ + তু। অতএব = অতঃ + এব।

**কারক-বিভক্তি**। কাল - অধিকরণে শূত্রবিভক্তি। বোলপুর থেকে - অপাদানে ‘থেকে’ বিভক্তি। মেঘে - করণে ‘এ’ বিভক্তি। মোটরগাড়িতে - কর্মে ‘তে’ বিভক্তি। মোটর - কর্মে শূত্রবিভক্তি। জলে - করণে ‘এ’ বিভক্তি। পুণ্যতীর্থোদকে - করণে ‘এ’ বিভক্তি। রাত্রি - অধিকরণে শূত্রবিভক্তি। গ্রহ-বৈগুণ্যে - করণে ‘এ’ বিভক্তি। চিঠি - মধ্যকর্মে শূত্রবিভক্তি। ডাক - কর্মে শূত্রবিভক্তি।

**সমাস**। ভানুসিংহের - ভানুদের মধ্যে সিংহ - সম্বন্ধীতৎ; তাহার। শিলংপুর্বতে - বাহা শিলং, তাহাই পর্বত - কর্মধা; তাহাতে। মা-গঙ্গা - বিনি মা, তিনিই গঙ্গা - কর্মধা। বার-বেলা - মেলায় বার - সম্বন্ধীতৎ। মোটরগাড়ি - বাহা মোটর, তাহাই গাড়ি - কর্মধা; অথবা মোটর-চালিত গাড়ি - মধ্যপদলোপী কর্মধা। গৌহাটি-স্টেশন - বাহা গৌহাটি, তাহাই স্টেশন - কর্মধা। ভাগ্যদেবতা - ভাগ্য-রূপ দেবতা - রূপক-কর্মধা। বজ্রনাদ - বজ্রের নাদ - সম্বন্ধীতৎ। মূলধারে - মূললের দ্বার ধারা - উপমিত কর্মধা; তাহাতে। খেয়া-আহাজে - বাহা খেয়া, তাহাই আহাজ - কর্মধা; তাহাতে। বকাবকি, দাপাদাপি, ছুটোছুটি - ব্যতিহার বহুব্রী। নির্মল - নাই মল বাহাতে - বহুব্রী। গঙ্গান্নান - গঙ্গার ন্নান - সম্বন্ধীতৎ। পুণ্যতীর্থোদকে - পুণ্য যে তীর্থ - কর্মধা, তাহার উদক [জল] - সম্বন্ধীতৎ; তাহাতে। কটাকপাত - কটাকের পাত - সম্বন্ধীতৎ।

স্বর্ধদেব—বিনি স্বর্ধ, তিনিই দেব—কর্মধা। অসম্ভব—নয় সম্ভব—নঞ্তৎ  
পোয়ালক্ষগামী—পোয়ালক্ষে গমন করে যাহা—উপপদতৎ। স্টীয়ার-ঘাট—স্টীয়ার  
ভিড়িবার ঘাট—মধ্যপ-কর্মধা। মোটর-কোম্পানী—মোটর বিষয়ক কোম্পানী—মধ্যপ  
কর্মধা। মালগাড়ী—মাল বহনের নিমিত্ত গাড়ি—চতুর্থীতৎ। পথপার্শ্বে—পথে  
পার্শ্ব—বগীতৎ, তাহাতে। নিচ্চল—নয় চল—নঞ্তৎ। পূর্বদিনে—পূর্ব বে দিন—  
কর্মধা, তাহাতে। জিনিসে-মানুষে—জিনিসে ও মানুষে—অলুক্ বহ্ব। গ্রহ বৈগুণ  
—গ্রহের বৈগুণ্য - বগীতৎ, তাহাতে।

**প্রকৃতি-প্রত্যয়।** বিয়—বি-হন+অ (কর্তৃবা)। গন্ধা—গম্+গ (কর্তৃবা  
+আ। আকার—আ-কৃ+অ (কর্মবা)। আয়তন—আ-যত্+অনট্। ভাগ্য—  
ভজ্+ব (কর্মবা)। দেবতা—দেব+তা (স্বার্থিক)। ঝাঁকানি—ঝাঁক্+আনি  
রক্ত—রন্জ্+ক্ত। আচ্ছন্ন—আ-ছন্+ক্ত (কর্মবা)। স্নান—স্না+অনট্। পৃথিবী  
—পৃথ্+ঐ (কর্তৃবা)। শ্রোত—শ্র+ক্ত। স্নিগ্ধ—স্নিহ্+ক্ত। পঙ্কিল—পঙ্ক+ইল,  
যাত্রি—রা+ত্রি (কর্তৃবা)। যাপন—যা+গিচ্+অনট্। সম্ভান—সম্+ধা+অনট্  
(কর্তৃবা)। অমুমতি—অমু-মন্+তি (ভাববা)। স্বর্ধ—স্ব+ব (কর্তৃবা)। অসম্ভব  
—নঞ-সম্-ভূ+অ (ভাববা)। জিজ্ঞাসা—জ্ঞা+সন্+আ। আশ্রয়—আ-শ্রি+অ  
(ভাববা)। প্রভাত—প্র-ভা+ক্ত (কর্তৃবা)। আকাশ—আ-কাশ্+অ  
(অধিকরণবা)। ঘোরতর—ঘোর+তর। হাঁপানি—হাঁপ+আনি। বহন—বহু  
+অনট্ (কর্তৃবা)। নিবিড়তর—নিবিড়+তর। অবস্থা—অব-স্থা+অ (ভাববা)।  
স্তম্ভ—স্তম্ভ্+ক্ত (কর্তৃবা)। বিশেষত—বিশেষ+ত। বিচ্ছেদ—বি-চ্ছিন্ন+অ  
(ভাববা)। বৈগুণ্য—বিগুণ+য (ভাববা)। আশ্চর্য—আ-চরু+য (ভাববা)।

**পদ-পরিবর্তন।** পর্বত [বি]—পার্বত্য [বিণ]। পথ [বি]—পাথের  
[বিণ]। গন্ধ [বি]—গাঙ্গেয় [বিণ]। সাবধান [বি]—সাবধানী [বিণ]।  
পাহাড় [বি]—পাহাড়ী [বিণ]। দেহ [বি]—দৈহিক [বিণ]। স্নান [বি]—  
স্নাত [বিণ]। সময় [বি]—সাময়িক [বিণ]। স্নিগ্ধ [বিণ]—স্নেহ [বি]।  
নির্মল [বিণ]—নির্মলতা [বি]। পঙ্কিল [বিণ]—পঙ্কিলতা [বি]। অন্তর্মিত  
[বিণ]—অন্তর্গমন [বি]। আশ্রয় [বি]—আশ্রিত [বিণ]। দুঃখ [বি]—দুঃখী,  
দুঃখিত [বিণ]। বহন [বি]—বাহিত [বিণ]। নিচ্চল [বিণ]—নিচ্চলতা  
[বি]। বিচ্ছেদ [বি]—বিচ্ছিন্ন [বিণ]। বৈগুণ্য [বি]—বিগুণ [বিণ]। স্থান  
[বি]—স্থানীয়, স্থানিক [বিণ]। স্থির [বিণ]—স্থৈর্য [বি]।

**ভাষা ভাষায় পরিণত কর।** কাল পৌঁচেছি...করে দিয়েছিলেন? [চলিত  
ভাষা]—কাল আসিয়া পৌঁছিয়াছি শিলং পর্বতে, পথে কত যে বিয় ঘটিল তাহার ঠিক  
নাই। মনে আছে—বোলপুর হইতে আসিবার সময় জননী গন্ধা আমাকে জল-কর্ধমের  
মধ্যে হিঁচড়াইয়া আনিয়া সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন?

**বাচ্য-পরিবর্তন।** তাঁহাকে টিকিট কিনিতে হয় নি [ভাববাচ্য]। তিনি  
টিকিট কেনেন নি [কর্তৃবাচ্য]।



**উক্তি-পরিবর্তন।** কারখানার লোকেরা ‘...ভাকবাংলার।’ [এতদ্বারা উক্তি] > কারখানার লোকেরা বলিল যে, সেখান কিছু করা অসম্ভব। তাহার পরের দিন চেষ্টা করিয়া দেখিবে। সেখক এবং তাহার সবীরা জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাহার দ্বারা কোথায় আশ্রয় পাইবেন। তাহার বলিল যে, ভাকবাংলার তাহার ভাড়া পাইবেন।

## । ৬৭২ পাতক ।

**সন্ধি।** জলাতন = জল + আতন। আবিষ্কার = আবিঃ + কার। সংযায় = সম্ + বায়। পরীক্ষাগারে = পরি + ইক্ষা + আগারে। বধ্যবধ = বধ্য + অবধ। গবেষণা = গো + এষণা। পদ্ধতি = পদ্ + ইতি। জীবাণু = জীব + অণু। উজ্জল = উৎ + জল। সিদ্ধান্ত = সিদ্ধ + অন্ত। পুনরুজ্জীবিত = পুনঃ + উৎ + জীবিত। সংস্কার = সম্ + কার। নির্ণয় = নিঃ + নয়। ভগদ্বাসীর = ভগৎ + বাসীর। ভগদ্বিখ্যাত = ভগৎ + বিখ্যাত। লোকারণ্য = লোক + অরণ্য। অত্যন্ত = অতি + অন্ত। স্থিতি = স্থ + অস্তি। নশ্বর = নিঃ + চর।

**কারক-বিভক্তি।** ছেলে—কর্তায় শূত্রবিভক্তি। জলাতন রোগে—করণে এ বিভক্তি। দিনরাত—অধিকরণে শূত্রবিভক্তি। চিপিটা—কর্মে শূত্রবিভক্তি। পদ্ধতিতে—করণে ‘তে’ বিভক্তি। অণুবীক্ষণে—করণে ‘এ’ বিভক্তি। জীবাণু—কর্মসম্বন্ধে ‘র’ বিভক্তি। আলো—কর্মে শূত্রবিভক্তি। জীবিকা—কর্মে শূত্রবিভক্তি। আবিষ্কার থেকে—করণে ‘থেকে’ বিভক্তি। আনুগ্রাহ্য-রোগে—করণে ‘এ’ বিভক্তি। কারণ—কর্মে শূত্রবিভক্তি। চিকিৎসা-বিজ্ঞা—কর্মে শূত্রবিভক্তি।

**সমাস।** কতবিক্রত—কত ও বিক্রত—দ্বন্দ্ব। জলাতন—জল ইহাতে আতন—পঞ্চমীতৎ। অনিবার্ধ—নয় নিবার্ধ—নঞতৎ। রোগ-নিবারণের—রোগকে নিবারণ—ষষ্ঠীতৎ; তাহার। জলাতন-রোগী—জল ইহাতে আতন—পঞ্চমীতৎ; জলাতনে আক্রান্ত রোগী—মধ্যপদলোপী কর্মধা। পরীক্ষাগারে—পরীক্ষার নিমিত্ত আগার—চতুর্থীতৎ, তাহাতে। দূরদেশ—দূর যে দেশ কর্মধা। রসায়নবিজ্ঞা—রসায়ন বিষয়ক বিজ্ঞা—মধ্যপ-কর্মধা। জীবাণুশূত্র—জীবের অণু—বহীতৎ, জীবাণুর দ্বারা শূত্র—তৃতীয়াতৎ। ধূলিকণা—ধূলের কণা—বহীতৎ। পার্শ্বাত—পাশে স্থিত—সপ্তমীতৎ। শরনঘরে—শরনের নিমিত্ত ঘর—চতুর্থীতৎ, তাহাতে। ভ্রলোক—ভ্রম এমন লোক—কর্মধা। শূত্রকথা—শূত্র যে কথা—কর্মধা। জীবাণু-বিনাশের—জীবাণুকে বিনাশ—ষষ্ঠীতৎ; তাহার। গুটিপোকা-চাব—গুটি এমন পোকা—কর্মধা; তাহার চাব—বহীতৎ। প্রাণিতত্ত্ববিশারদদের—প্রাণি-বিষয়ক তত্ত্ব—মধ্যপ-কর্মধা; তাহাতে বিশারদ—সপ্তমীতৎ; তাহাদের। রসায়নবিদকে—রসায়ন জানেন যিনি—উপপদতৎ; তাহাকে। জন্তুজানোয়ার—জন্তু ও জানোয়ার—দ্বন্দ্ব। বিশেষজ্ঞ—বিশেষ জানেন যিনি—উপপদতৎ। জনমণ্ডলী—জনদের মণ্ডলী—বহীতৎ। জয়ধ্বনি—জয়-মুচক

অনি—অধ্যাপ-কর্মবা। অগন্তবানী—অগন্তে বাস করে যে—উপগমতৎ। কৃতজ্ঞতা—কৃতজ্ঞতার ভাষন—বহীতৎ। লোকারণ্য—লোকের অরণ্য—বহীতৎ। গবেষণাক্ষেত্র—গবেষণার নিমিত্ত কেন্দ্র—চতুর্থাৎ। মর্মরহুতি—মর্মর-নির্মিত হুতি—বধ্যাপ-কর্মবা। যেষপালক—যেষ পালন করে যে—উপগমতৎ।

প্রকৃতি-প্রত্যয়। বিকৃত—বি-কৃৎ + কৃত (কর্মবা)। অনিবার্হ—নঞ্-নি-বারি + য (কর্মবা)। আবিষ্কার—আবিঃ-কৃ + অ (কর্মবা)। প্রতিষেধক—প্রতি-সিধ্ + ক। বিভিন্ন—বি-ভিদ্ + কৃত (কর্মবা)। চিকিৎসা—চিক্ + সন্ + ঞ। প্রতিষ্ঠিত—প্রতি-স্থা + কৃত (কর্মবা)। পরিণত—পরি-নম্ + কৃত। গ্রহণ—গ্রহ্ + অনট্ (কর্তৃবা)। অভিলাষ—অভি-লস্ + অ (ভাববা)। ব্যবস্থা—বি-অব-স্থা + অ। প্রতিষ্ঠান—প্রতি-স্থা + অনট্। রসায়ন—রস + আয়ন। অমুলীন—অমূল-নীল্ + অনট্ (ভাববা)। আনন্দ—আ-নন্দ্ + অ (ভাববা)। মৌলিক—মূল + ঞিক। ফুটন্ত—ফুট্ + অন্ত। গবেষণা—গো-ইম্ + অনট্ + আ। বিজ্ঞানী—বিজ্ঞান + ঙ্গ। রাসায়নিক—রসায়ন + ঞিক। পদ্ধতি—পদ্-হন্ + ক্তি (কর্মবা)। প্রবেশ—প্র-বিশ্ + অ (ভাববা)। অমূলীকরণ—অমূল-বি-ক্ৰে + অনট্। ঘোলাটে—ঘোলা + টে। ঘোষণা—ঘোব্ + অনট্ + আ। উৎপত্তি—উৎ-পদ্ + ক্তি (কর্তৃবা)। অমূলসন্ধান—অমূল-সন্ধান + অনট্। উজ্জল—উজ্-জল্ + অ (ভাববা)। শয়ন—শী + অনট্। সাক্ষাৎ—সহ-অক্ষি-অৎ + ক্ৰিপ্ (কর্তৃবা)। বিনাশ—বি-নশ্ + অ। লম্বাটে—লম্বা + টে। চলন—চল্ + অন। দক্ষিণ—দক্ + ইন। জীবিকা—জীব্ + ক + আ। প্রতিকার—প্রতি-কৃ + অ। নির্ধারণ—নি-ধৃ + গিচ্ + অনট্। দুঃখিত—দুঃখ + ইত। পুনরুজ্জীবিত—পুনঃ-উদ্-জীব্ + কৃত। জাতীয়—জাতি + ঙ্গ। মারাত্মক—মার্ + আত্ম + ক। আক্রমণ—আ-ক্রম্ + অনট্। প্রমাণ—প্র-মা + অনট্। আহ্বান—আ-হ্বে + অনট্। অরণীয়—অ + অনীয়। সাংবাদিক—সংবাদ + ঞিক। দুরীকরণ—দূর-অভূত-স্ত্যাবে চি-কৃ + অনট্। সংখ্যক—সংখ্যা + ক। অমাদিক—নঞ্-মায়া + ঞিক। সাধন—সাধ্ - অনট্। স্থানীয়—স্থান + ঙ্গ।

পদ-পরিবর্তন॥ পাগলা (বিণ)—পাগলামি (বি)। সৌভাগ্য (বি)—হুভগ (বিণ)। আবিষ্কার (বি)—আবিষ্কৃত (বিণ)। নিবারণ (বি)—নিবারিত (বিণ)। সংবাদ (বি)—সাংবাদিক (বিণ)। পরিণত (বিণ)—পরিণতি (বি)। অভিলাষ (বি)—অভিলষিত (বিণ)। পৃথিবী (বি)—পাথিব (বিণ)। রসায়ন (বি)—রাসায়নিক (বিণ)। অমুলীন (বি)—অমূলীকৃত (বিণ)। মৌলিক (বিণ)—মূল, মৌলিকতা (বি)। প্রবেশ (বি)—প্রবিষ্ট (বিণ)। বিস্তৃত (বিণ) (বিণ)—বিস্তৃততা (বি)। স্থানচিত্র (বিণ)—স্থানচিত্র (বি)। পরীক্ষা (বি)—পরীক্ষিত (বিণ)। বিনাশ (বি)—বিনষ্ট (বিণ)। রেশম (বি)—রেশমী (বিণ)। প্রতিষেধক (বিণ)—প্রতিষেধ (বি)। আক্রমণ (বি)—আক্রান্ত (বিণ)। উপহাস (বি)—উপহাসিত (বিণ)। প্রমাণ (বি)—প্রমাণিত (বিণ)। বিজ্ঞান (বি)—বৈজ্ঞানিক (বিণ)। ইতিহাস (বি)—ঐতিহাসিক (বিণ)। আহ্বান

(বি)—আহৃত (বিণ)। নিবারণ (বি)—নিবারণিত (বিণ)। নির্ণয় (বি)—  
নির্ণায়িত (বিণ)। অভিনন্দন (বি)—অভিনন্দিত (বিণ)। স্বকিত (বিণ)—  
স্বকিত (বি)। সমাধি (বি)—সমাধিত (বিণ)। স্থানীয় (বিণ)—স্থান (বি)।

## । য়জদা ।

**জঙ্ঘি** । সমাজ্য—সম+আ+জ্য। উত্তীর্ণ—উৎ+তীর্ণ। তদ্বাবধানে—তৎ  
+ব+অবধানে। বিভাভাস—বিভা+অভি+আস। বাক্য—ব+অক্য। তৃতীয়া  
—তৃত+ভাণ্য। নিবোধ—নিঃ+বোধ। পরীক্ষক—পরি+ঈক্ষক। তদ্রাজিত—  
তদ্রা+অভিজিত। দীপালোকের—দীপ+আলোকের। উদ্বৃৎ—উৎ+বৃৎ।  
অপেক্ষা—অপ+ঈক্ষা। সংক্ষেপে—সম+ক্ষেপে। উত্তেজিত—উৎ+তেজিত।  
নির্ভয়ে—নিঃ+ভয়ে। পরিহার—পরি+কার। সর্বাগ্রে—সর্ব+অগ্রে। সর্বাপেক্ষা—  
সর্ব+অপ+ঈক্ষা। বজ্রাতকে—বদ্+জাতকে। উত্তরোত্তর—উত্তর+উত্তর।

**কারক-বিভক্তি** । দিনটা—কর্মে শূভবিভক্তি। সারাদিন—অধিকরণে শূভ-  
বিভক্তি। ঘনমেঘে—করণে 'এ' বিভক্তি। অঙ্ককারে—করণে 'এ' বিভক্তি। হংকার  
—অপাধানে 'ব' বিভক্তি। নিজে—কর্তায় 'এ' বিভক্তি। নাক—কর্মে শূভবিভক্তি।  
সম্মান-সৌভাগ্য—কর্মে শূভবিভক্তি। কিসে—কর্তায় 'এ' বিভক্তি। কাম—কর্মে  
শূভবিভক্তি। বগলে—করণে 'এ' বিভক্তি। তেজে—করণে 'এ' বিভক্তি। বাঘের  
—কর্মপ্রবচনীয়যোগে 'এর' বিভক্তি। শতকণ্ঠে—অপাধানে 'এ' বিভক্তি। বাঘ—  
কর্মে শূভবিভক্তি। সাহসে—করণে 'এ' বিভক্তি।

**সম্মান** । সারাদিন—সারা ব্যাপিয়া দিন—দ্বিতীয়াতং। অবিশ্রান্ত—নয় বিশ্রান্ত  
—নঞতং। ঘনমেঘে—ঘন মে মেঘ—কর্মধা, তাহাতে। গভীর-প্রকৃতি—গভীর  
প্রকৃতি বাহ্য—বহুব্রী। মনোযোগ—মনের দ্বারা যোগ—তৃতীয়াতং। হাসিমুখে—  
হাসিপূর্ণ মুখ—মধ্যপ-কর্মধা, তাহাতে। সপ্তাহ—সপ্ত অহোর সমাহার—বিণ্ড।  
স্বপ্নলায়—স্ব স্বপ্নলা—প্রাদিতং; তাহাতে। নিবোধ—নাই বোধ বাহার—  
নঞতং। দাবিদ্বিবোধ—দাবিদ্বি বিষয়ক বোধ—মধ্যপ-কর্মধা। অদৃষ্টের—নয় দৃষ্ট—  
নঞতং, তাহার। তদ্রাজিত—তদ্রার দ্বারা অভিজিত—তৃতীয়াতং। গভীর-  
অধ্যয়ন-ব্রত—গভীর যে অধ্যয়ন—কর্মধা; তাহাতে ব্রত—সপ্তমীতং। আইনসমত  
—আইনের দ্বারা সমত—তৃতীয়াতং। আর্ভকণ্ঠের—আর্ভ যে কণ্ঠ—কর্মধা, তাহার।  
গগনভেদী—গগন ভেদ করে বাহা—উপপদতং। বিদ্যাব্যবেগে—বিদ্যাব্যবের বেগ—  
বহুব্রীতং; তাহাতে। দক্ষবজ্র—দক্ষ-আহৃত বজ্র—মধ্যপ-কর্মধা। ঠেলাঠেলি—ঠেলিয়া  
ঠেলিয়া যে যুদ্ধ—ব্যতিহার বহুব্রী। নিম্নীলিতচন্দ্রে—নিম্নীলিত যে চন্দ্র—কর্মধা,  
তাহাতে। দীর্ঘশ্বাস—দীর্ঘ যে শ্বাস—কর্মধা। ভয়চকিত—ভয়ের হেতু চকিত—  
তৃতীয়াতং। কঙ্ক-নিশ্বাসে—কঙ্ক এমন নিশ্বাস—কর্মধা; তাহাতে। মহামারী—মহা

সে মারী—কর্ম্ম। উত্তরোত্তর—উত্তর হইতে উত্তর—পশ্চীম। বীরপুংসব—বীর  
বে পুংসব—কর্ম্ম। বখেই—ইটকে অতিক্রম না করিয়া—অব্যবহৃত। সহস্র—সহ  
এমন উত্তর—কর্ম্ম। অপমানকর—অপমান করে বাহা—উপপদতৎ।

প্রকৃতি-প্রত্যয়। অবিকৃত—নঞ-বি-শ্রু+ক্ত (কর্তৃবা)। প্রাণ—প্রাণী  
+ ক। সমাজ—সম্-আ-ছদ্+ক্ত (কর্ম্মবা)। সম্ভা—সম্-ধে+ঘঞ+আ। উত্তীর্ণ—  
উৎ-তৃ+ক্ত (কর্তৃবা)। গাঢ়—গাহ্+ক্ত (কর্তৃবা)। অঙ্ককার—অঙ্ক-কৃ+ঘঞ  
(ভাববা)। উপভোগ—উপ-ভূজ্+ঘঞ (ভাববা)। হিন্দুয়ানী—হিন্দুয়ান+ঈ  
তুলসীদাসী—তুলসীদাস+ঈ। কঠোর—কঠ্+ওর (কর্তৃবা)। তব—তৎ+ব।  
অবধান—অব-ধা+অনট্ (ভাববা)। অভ্যাস—অভি-অস্+ঘঞ (ভাববা)। গভীর—  
গম্+ঈর (অধিকরণবা)। প্রকৃতি—প্র-কৃ+ক্তি (ভাববা)। প্রস্তুত—প্র-স্তু+ক্ত  
(কর্তৃবা)। শাসন—শাস্+অনট্ (ভাববা)। বিয়—বি-হ্ন+ঘঞ (কর্তৃবা)।  
সরস্বতী—সরস্+বতুপ্+ঈ। নিশ্চয়—নিঃ-চি+অল্। সম্মান—সম্-মন্+ঘঞ  
(ভাববা)। সৌভাগ্য—সুভগ+ফ্য। দুর্ভাগা—দুর্-ভজ্+ব (কর্ম্মবা)। নিবোধ—  
নিব্-বুধ্+ঘঞ (ভাববা)। অমুরাগ—অমু-রজ্+ঘঞ (ভাববা)। সম্বন্ধ—সম্-বন্ধ  
+ঘঞ (ভাববা)। স্মৃ—স্মৃচ্+স্ম। তস্ম—তস্ম্+অ (ভাববা)+আ।  
অভিভূত—অভি-ভূ+ক্ত (কর্তৃবা)। আলোক—আ-লোক্+ঘঞ (ভাববা)।  
অধ্যয়ন—অধি-ই+অনট্ (ভাববা)। তৃষ্ণা—তৃষ্+ক্বেপ্ (ভাববা)+আ। পরীক্ষা—  
পরি-দ্রেক্+ঘঞ (ভাববা)+আ। প্রদীপ—প্র-দীপ্+ঘঞ (কর্তৃবা)। লড়াই—  
লড্+আই। পরিপূর্ণ—পরি-পূর্ণ+ক্ত (কর্ম্মবা—নিপাতনে)। প্রকৃতিস্থ—প্রকৃতি  
স্থা+ক। প্রম্ম—প্রম্ম্+ন (ভাববা)। চেতন্ত—চেতনা+ফ্য। দীর্ঘ—দ্রাঘ্+অ  
(কর্তৃবা)। সংক্ষেপে—সম্-ক্ষিপ্+ঘঞ (ভাববা)। উত্তেজিত—উৎ-তিজ্+ক্ত  
(কর্তৃবা)। নিস্তব্ধ—নি-স্তব্ধ্+ক্ত (কর্তৃবা)। উপস্থিত—উপ-স্থা+ক্ত (কর্তৃবা)  
চীৎকার—চীৎ-কৃ+ঘঞ। ব্যাপার—বি-আ-পৃ+ঘঞ (ভাববা)। নিশ্বাস—নি  
শ্বস্+ঘঞ (ভাববা)। সহসা—সাহস+ফ। আভাস—অ-ভাস্+ঘঞ (ভাববা)  
পরিকার—পরি-কৃ+ঘঞ (ভাববা)। অভিযোগ—অভি-যুজ্+ঘঞ (ভাববা)।

সার্থক বাক্য-রচনা॥ সমাজ—সকাল হইতে আকাশ গাঢ় কৃষ্ণ যেন  
সমাজ। প্রথমত—নিত্যকার প্রথমত আমরা ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলাম  
গভীর প্রকৃতি—অলখরবাবু ছিলেন ভারী গভীর-প্রকৃতির মানুষ। তস্মাভিভূত  
—সাহাদিনের স্তাস্তির পর যুদ্ধমন্ড বাতাসে তিনি তস্মাভিভূত হইয়া পড়িলেন  
আইনলগত—তাহাকে এখানে প্রবেশ করিতে না দেওয়া আইনসম্মত কিনা তাহা  
অবশ্য-বিচার্য। প্রকৃতিস্থ—আপনি প্রকৃতিস্থ হইয়া সমস্ত শ্রবণ কখন  
বিদ্যুৎবেগে—কোলাহল গুলিয়া সে বিদ্যুৎবেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল  
দক্ষমত—উৎসবমঞ্চে যমেন উঠামাত্রই দক্ষমত বাধিয়া গেল।

## । অচেনার আনন্দ ।

**লক্ষি** । উরাসে—উৎ + লাসে । আবিষ্কারক—আবিঃ + কারক । স্বর্গাশ্রয়—স্বর্গ + অশ্রয় । বর্ণচ্ছটা—বর্ণ + ছটা । অবস্থাপন্ন—অবস্থা + আপন্ন ।

**কারক-বিভক্তি** ॥ এবার—ক্রিয়াবিশেষণে শূন্তবিভক্তি । বাড়ি—অধিকরণে শূন্তবিভক্তি । দোহাড়ি—কর্মে শূন্তবিভক্তি । সর্বপ্রথম—ক্রিয়াবিশেষণে শূন্তবিভক্তি । রেললাইন—কর্মে শূন্তবিভক্তি । একদৃষ্টে—ক্রিয়াবিশেষণে ‘এ’ বিভক্তি । কী—কর্মে শূন্তবিভক্তি । রেলের রাস্তা—কর্মে শূন্তবিভক্তি । দুইজন—কর্তার ‘এ’ বিভক্তি । মরিয়ার ভাবে—ক্রিয়াবিশেষণে ‘এ’ বিভক্তি । পথ—কর্মে শূন্তবিভক্তি । কাটা—কর্মে শূন্তবিভক্তি । বাড়ি—অধিকরণে শূন্তবিভক্তি । জল, ধানক্ষেত—কর্মে শূন্তবিভক্তি । পিঠ—কর্মে শূন্তবিভক্তি । সড়কের—কর্মপ্রবচনীয়যোগে ‘এর’ বিভক্তি । রেলের—নিমিত্তে ‘এর’ বিভক্তি । চোখে—করণে ‘এ’ বিভক্তি । তারে—করণে ‘এ’ বিভক্তি । ‘দিন’—অধিকরণে শূর্ত্যবিভক্তি । ছাগল—কর্মে শূন্তবিভক্তি । গা—কর্মে শূন্তবিভক্তি । মেঘের—অভেদ-সদৃশে ‘এর’ বিভক্তি । আদরে—ক্রিয়াবিশেষণে ‘এ’ বিভক্তি ।

**সমাস** ॥ গুলঞ্চলতা—গুলানো—গুলকের লতা—যঙ্গীতং, তাহা দোলায় যাহা—উপপদতং । রেল-লাইন—রেলের লাইন—যঙ্গীতং । কলাই-কল—যাহা কলাই, তাহাই কল—কর্মধা । সূক্ষ্ম—সূক্ষ্মার সহিত বর্তমান—বহুব্রী । জলসত্রতলা—জলের সত্র—যঙ্গীতং, তাহার তলা—যঙ্গীতং । বাধারীন—বাধার দ্বারা হীন—তৃতীয়াতং । ধানক্ষেত—ধান পূর্ণ ক্ষেত—মধ্যপ-কর্মধা । রেলগোষ্ঠা—রেলের নিমিত্ত রাস্তা—চতুর্থীতং । রেলগাড়ী—রেল-বাহিত গাড়ী—মধ্যপ-কর্মধা । বিশ্বগ্রাসী—বিশ্বকে গ্রাস করে যে—উপপদতং । দেশ-আবিষ্কারক—দেশকে আবিষ্কার করে যে—উপপদতং । রহস্য-অবগুঠন—রহস্য রূপ অবগুঠন—রূপক-কর্মধা । মহাজন—মহৎ যে জন—কর্মধা । অবস্থাপন্ন—অবস্থাকে আপন্ন—দ্বিতীয়াতং । গৃহস্থ—গৃহে থাকে যে—উপপদতং ।

**প্রকৃতি-প্রত্যয়** ॥ আনন্দ—আ-নন্দ্ + ঘঞ্ ( ভাববা ) । বৈশাখ—বিশাখা + ফ । জ্যেষ্ঠ—জৈষ্ঠী + ফ । প্রকাশ—প্র-কাশ + ঘঞ্ ( ভাববা ) । দুর্গা—দুর্-গম্ + ঘঞ্ + আ । দক্ষিণ—দক্ষ্ + ইন ( কর্তৃবা ) । বিশ্বয়—বি-শ্ব + ঘঞ্ ( ভাববা ) । আবদ্ধ—আ-বদ্ধ্ + ক্ত ( কর্মবা ) । রক্ত—রনজ্ + ক্ত । অবসর—অব-স্ + ঘঞ্ ( ভাববা ) । সহজ—সহ-জন্ + ড । অগ্রসর—অগ্র-স্ + ঘঞ্ ( ভাববা ) । বিশ্বগ্রাসী—বিশ্ব-গ্রস্ + ইন্ । সূধা—সুধ্ + কিপ্ ( ভাববা ) + আ । আবিষ্কারক—আবিস্-ক্ + পক । পৃথিবী—পৃথু + ঈ ( কর্তৃবা ) । অমুহূতি—অমু-ভূ + ক্তি ( ভাববা ) । অনাবিষ্কৃত—নঞ্-আবিস্-ক্ + ক্ত ( কর্মবা ) । নবীনতা—নবীন + তা । আশ্রয়—আ-শ্রয়্ + ঘঞ্ ( ভাববা ) । প্রসার—প্র-স্ + ঘঞ্ ( ভাববা ) । সমুদ্র—সম্-উজ্ + র ( কর্তৃবা ) । পরিচিতি—পরি-চি + অল্ ( ভাববা ) । রহস্য—রহস্ + য । সন্ধ্যা

—সম-ধৈ+অঙ্+আ। গম্ভব্য—গম+ভব্য। শিক্ত—শাস্+ব (কর্মবা)। অবস্থা—অব-স্থা+ক+আ। আপন্ন—আ-পদ্+ক্ত (কর্তৃবা)। গৃহস্থ—গৃহ-স্থা+ক।

সার্থক বাক্য-রচনা। মরিয়্যার ভাবে—চারিদিকে একবার চাহিয়া এইয়া সে মরিয়্যার ভাবে লাকাইয়া পড়িল। সুবিধাজনক—যাই বলা, কাজটা খুব সুবিধাজনক হইবে না। অবস্থাপন্ন—গ্রামে অনেক অবস্থাপন্ন লোকের বাস। মহাজন—এমন হৃদযোব মহাজন আমি আর একটিও দেখিনি।

নবম শ্রেণী

॥ শব্দ্যাংশ ॥

### । সীরাঘের অত্রিমূনির আশ্রম গমন ।

সজ্জি। পুনবার—পুনঃ+বার। তপোবন—তপঃ+বন। কৃতাজ্জলি—কৃত+অজ্জলি। নমস্কার—নমঃ+কার। আশীর্বাদ—আশিস্ [আশীঃ]+বাদ। উজ্জস—উৎ+জল।

কারক-বিভক্তি। আয়া—কর্মে শূত্ৰবিভক্তি। আয়াতে—সম্প্রদানে ‘তে’ বিভক্তি। চিত্রকূট—কর্মে শূত্ৰবিভক্তি। তপোবন—অধিকরণে শূত্ৰবিভক্তি। চরণ সম্প্রদানে শূত্ৰবিভক্তি। রামে—কর্মে ‘এ’ বিভক্তি। সীতা—কর্মে শূত্ৰবিভক্তি। সীতারে—কর্মে ‘রে’ বিভক্তি। রাজকূলে (জমিয়া)—অপাদানে ‘এ’ বিভক্তি। গুণ, নীলে—করণে ‘এ’ বিভক্তি। সম্পদ—কর্মে শূত্ৰবিভক্তি। তপশ্রায়—করণে ‘য়’ বিভক্তি। সম্পদে—করণে ‘এ’ বিভক্তি।

সমাস। চিত্রকূট—চিত্র শোভিত কূট যাহার—মধ্যপ-বহব্রী। রঘুনাথ—রঘুবংশের নাথ যিনি—বহব্রী। তপোবন—তপের নিমিত্ত বন—চতুর্থীতৎ। মুনিবর—মুনিদের বর—ষষ্ঠীতৎ। পাণ্ডার্থ্য—পাণ্ড ও অর্থ্য—বন্দ। মুনিপত্নী—মুনির পত্নী—ষষ্ঠীতৎ। কৃতাজ্জলি—কৃত অজ্জলি যাহার—বহব্রী। রাজকূলে—রাজার কুল—ষষ্ঠীতৎ, তাহাতে। দূর্বাদলশ্রাম—দূর্বীর দল—ষষ্ঠীতৎ; তাহার ন্যায় শ্রাম—উপমান-কর্মধা।

প্রকৃতি-প্রত্যয়। আইলে—<আস্+ইলে (অসমাপিকা)। অবোধ্যা—নঙ্+যুধ্+ব (কর্মবা)+আ (স্ত্রী)। ভক্তি—ভজ্+ক্তি (ভাববা)। দক্ষিণে—দক্ষ্+ইন (কর্তৃবা)+এ। পরিশ্রম—পরি-শ্রম্+ক্+ইন (ভাববা)। আশ্রম—আ-শ্রম্+ঘঞ্ (অধিকরণবা)। প্রবেশিয়া—প্রবেশ (নামধাতু) [প্র-বিশ্+অ (ভাববা)]+ইয়া (অসমাপিকা)। বন্দনা—বন্দ্+অনই (ভাববা)+আ। চরণ—চন্+অনই (করণবা)। পাণ্ড—পাদ্+বৎ (ভাববা)। অর্থ্য—অর্থ্+বৎ (ভাববা)।

সমপিতা—সম-অপি + ইল (কর্তৃবা) + আ। সীতা—সি + ত্ (কর্তৃবা) + আ।  
 পালন—পাল্ + অনট্ (ভাববা)। করহ—কব্ + হ (অনুজ্ঞা)। দ্রুহিতা—দ্রুহ্ +  
 ত্ (কর্তৃবা)। মূর্তিমতী—মূর্তি + মতৃপ্ + ত্রী (স্ত্রী)। করণা—করণ + আ।  
 প্রহা—প্রং + ধা + অ (ভাববা) + আ। উপস্থিতা—উপ-স্থা + অ (কর্তৃবা) + আ।  
 গুরু—গৃচ্ + ল (কর্তৃবা)। বন্ধ—বন্ + ত্র (করণবা)। পরিধান—পরি-ধা +  
 অনট্ (কর্মবা)। জ্ঞান—জ্ঞা + অনট্ (ভাববা)। গাধাত্রী—গাধৎ-ত্রৈ + অ  
 (কর্তৃবা) + ত্রী (স্ত্রী)। নমস্যা—নমস্ + যৎ (কর্মবা) + আ। নমস্কার—নমস্-কৃ  
 + অ (ভাববা)। আশীষাদ—আশিস্-বদ্ + আ (ভাববা)। বনিতা—বন্ + ক্ত  
 (কর্মবা) + আ (স্ত্রী)। প্রদূষ—প্র-দূষ্ + ক্ত (কর্তৃবা)। উজ্জ্বল—উজ্-জল্ + অ  
 (কর্তৃবা)। সম্পদ—সম্-পদ্ + কিপ্ (কর্মবা)।

**ব্যাকরণগত টীকা** ॥ যতনে—যত্নে—স্বরভক্তি বা বিপ্রকথ। ঠাই—স্থান।  
 (কিবা) বা—বাক্যালংকার অবয়ব। কাম—কর্ম।

**গতরূপ** ॥ আইলে—আসিলে। এমত—এমন। ঠাই—স্থান। সমপিতা—  
 সমর্পণ করিলেন। করহ—করো। সবার—সকলের। হেন—এমন। মম—আমার।

**সার্থক বাক্য-রচনা** ॥ পাদ্য-অর্ঘ্য—মহর্ষি বিদ্যামিত্রকে দশরথ পাদ্যঅর্ঘ্য  
 দিয়া বরণ করিয়া লইলেন। মূর্তিমতী—স্বামীপুত্রীনা বিধবাটি ছিলেন যেন  
 মূর্তিমতী শিষ্যতা। কুতাজলি—প্রভাগণ কুতাজলিপুটে রাজ-সমীপে আসিয়া  
 গণ্ডারমান হইল।

## ২ মধ্যাহ্নে ২

**লঙ্ঘি** ॥ মধ্যাহ্নে = মধ্য + অহ্নে।

**কারক-বিভক্তি** ॥ সমীরে—করণে 'এ' বিভক্তি। কাতরে—ক্রিয়াবিশেষণে 'এ'  
 বিভক্তি। লাজে—হেতুর্থে 'এ' বিভক্তি। আরামে—হেতুর্থে 'এ' বিভক্তি।

**সমাস** ॥ মধ্যাহ্নে—অহ্নের মধ্য—একদেবী সমাস, তাহাতে। নদীকূলে—  
 নদীর কূলে—বগীতং। নদী-বাকে—নদীর বাকে—বগীতং। তরুতলে—তরুর তলে  
 —বগীতং। কুলবধু—কূলের বধু—বগীতং। অলস-স্বপন-জাল—স্বপনের জাল—  
 বগীতং; অলস যে স্বপন-জাল—কর্মধা। স্বপন-ভরে—স্বপনের ভরে—বগীতং,  
 তাহাতে। ধরাধামে—ধরা রূপ ধামে—রূপক-কর্মধা।

**প্রকৃতি-প্রত্যয়** ॥ নধর—সং নবধর। সমীর—সম্-ঈব্ + অ (কর্তৃবা)। বাক  
 —বহ। জেলে—আইল্যা—আলিয়া (= জাল + ইয়া)। পথিক—পথিন্ + ক।  
 মেঠো—মাউঠা—মাঠুয়া (= মাঠ + উয়া)। দ্রুত—দ্রু + ত (কর্তৃবা)। বিরাম—  
 বি-রন্ + অ (ভাববা)। শাস—শস্ + ঘঞ্ (ভাববা)।

**পদ-পরিবর্তন** ॥ ভগৎ (বি)—ভাগতিক (বিণ)। কাতর (বিণ)—  
 কাতরতা, কাতরিয়া (বি)। মেঠো (বিণ)—মাঠ (বি)। লাজ (বি)—লাজুক

(বিণ)। অলস (বিণ)—অলস্য, অলসতা (বি)। হৃদয় (বি)—হৃদ্য (বিণ)।  
ব্যথা (বি)—ব্যথিত (বিণ)।

গদ্যরূপ ॥ ভুল—ভুলিয়া। পড়ে—পড়িয়া। পড়েছে—পড়িয়াছে। হেলে—হেলিয়া। কাঁপিছে—কাঁপিতে। 'বরে—কাতরভাবে। লুকায়ে—লুকাইয়া। শুয়ে—শুইয়া। বেধে—বাধিয়া। 'ায়—চলিয়া যায়। দিয়ে—দিয়া। নিয়ে—নিয়া, লইয়া। চেয়ে—চাহি। এলায়ে—এলাইয়া। মুদে আসে—মুদিয়া আসে। চাহি—চাহিয়া। পড়িছে—পড়িতেছে। খসে—খসিয়া।

## ॥ পুরাতন ভূতা ॥

সন্ধি ॥ নিবোধ=নিঃ+বোধ। বাপাস্ত=বাপ+অস্ত। কণ্ঠাগত=কণ্ঠ+আগত। ব্যাধি=বি+আধি।

কারক-বিভক্তি ॥ ভূতের—কর্মপ্রবচনীয় যোগে 'এর' বিভক্তি। বেত, বেতন—কর্মে শূত্রবিভক্তি। কোথা—অধিকরণে শূত্রবিভক্তি। দরজার—কর্মপ্রবচনীয় যোগে 'র' বিভক্তি। ঘরদুয়ার—কর্তায় শূত্রবিভক্তি। কেঠারে—কর্মে 'রে' বিভক্তি। বাজার—অধিকরণে শূত্রবিভক্তি। তার—কর্ম-সম্বন্ধে 'র' বিভক্তি। টিকি—কর্মে শূত্রবিভক্তি। তারে—কর্মে 'রে' বিভক্তি। টাকা—কর্মে শূত্রবিভক্তি। দালালগিরি—কর্মে শূত্রবিভক্তি। পতির, সতীর—কর্তৃ-সম্বন্ধে 'র' বিভক্তি। পোটলাপুটলি, বলয়, বাস্ম—কর্মে শূত্রবিভক্তি। প্রাণটা—কর্মে শূত্রবিভক্তি। ছয়-সাতে—কর্তায় 'এ' বিভক্তি। বসন্তে—করণে 'এ' বিভক্তি। ব্যাধিধরশরে—করণে 'এ' বিভক্তি। জরে—কর্তায় 'এ' বিভক্তি। তীর্থে—কর্মে শূত্রবিভক্তি।

সমাস ॥ নিবোধ—নাই বোধ বাহার—নঞ্-বহুব্রী। প্রাণপণে—প্রাণকে পণ—বিতীয়াতৎ, তাহাতে। মহাকলরবে—কল যে রব—কর্মধা; মহা যে কলরব—কর্মধা, তাহাতে। হতভাগা—হত ভাগ [ভাগ্য] বাহার—বহুব্রী। কুকর্মুর্তি—কুকর্মুর্তি বাহার—বহুব্রী। ঘরদুয়ার—ঘর ও দুয়ার—দ্বন্দ্ব। অকাতর—নয় কাতর—নঞ্-তৎ। শ্রীকৃন্দাবন—শ্রীকৃন্দাবন—মধ্যপ-কর্মধা। রশারশি—রশি ও রশি—দ্বন্দ্ব। কবাকবি—কবিতা কবিতা যে কাজ—ব্যতিহার-বহুব্রী। নিবারণ—নাই বারণ বাহার—বহুব্রী। রেলগাড়ি—রেলবাহিত গাড়ি—মধ্যপ-কর্মধা। কণ্ঠাগত—কণ্ঠকে আগত—বিতীয়াতৎ। ব্রজবাল্য—ব্রজের বাল্য—বহুব্রীতৎ। বনমালা—বনের মালা—বহুব্রীতৎ। বনমালা—বনমালা পরেন যিনি—উপপদতৎ। চিরবসন্ত—চিরব্যাপিয়া বসন্ত—বিতীয়াতৎ। ব্যাধিধরশরে—ধর যে শর—কর্মধা; ব্যাধিরূপ ধরশর—রূপক-কর্মধা, তাহাতে। নিশিদিন—নিশি ও দিন—দ্বন্দ্ব। বিদেশে—নয় দেশ—নঞ্-তৎ, তাহাতে। মাঠাকুরাণী—যিনি মা, তিনিই ঠাকুরাণী—কর্মধা, তাহাতে। কালব্যাধিভার—ব্যাধির ভার—বহুব্রীতৎ, কালরূপ



ব্যাদিভার—রূপক-কর্মধা। জ্ঞানহীন—জ্ঞানের দ্বারা হীন—তৃতীয়াতং। চিরসাধি—চির ব্যাপিয়া সাধি—দ্বিতীয়াতং।

**প্রকৃতি-প্রত্যয়** ॥ পুরাতন—পুরা+তন। ভূত—ভূ+ক্যপ্। বাপান্ত—বাপ+অন্ত। চেতন—চিত্+অন। চীৎকার—চীৎ+কৃ+ঘঞ্ [ভাববা]। তাড়া—তাড়্+আ। সাড়া—সাড়্+আ। নিমেষ—নি-মেষ্+ঘঞ্। সাধা—সাধ্+আ। কর্ত্তা—কর্তৃ+ঐ। শাসন—শাস্+অনট্। বসন—বস্+অনট্। অশন—অশ্+অনট্। বুদ্ধি—বুধ্+ক্তি [ভাববা]। বর্ধমান—বৃধ্+শানচ্। প্রসন্ন—প্র-সদ্+ক্ত। দালালগিরি—দালাল+গিরি। পুণ্য—পু+ণ্যৎ। নিবারণ—নি-বৃ+অনট্। প্রশান্ত—প্র-শম্+ক্ত। স্পর্ধা—স্পর্ধ্+ঘঞ্+অ। পরম—পর+ম। বাসা—বাস্+আ। আরাম—আ-রম্+ঘঞ্। তীর্থ—তৃ+থ [কর্মবা]।

**লিঙ্গান্তর** ॥ ভূত—পেত্ৰী। গিন্নি—কর্তা। গাধা—গাধী। কর্ত্তা—কর্তা। বেটা—বেটা। পরিবার—স্বামী। পতি—পত্নী। গৃহিণী—কর্তা। কর্তা—গৃহিণী।

**পদ-পরিবর্তন** ॥ চোর (বিণ)—চৌর্ষ (বি)। প্রয়োজন (বি)—প্রয়োজনীয় (বিণ)। নিদ্রা (বি)—নিদ্রালু, নিদ্রিত (বিণ)। পিত্ত (বি) পৈত্তিক (বিণ)। মাদ্য (বি)—মাদ্যাবী (বিণ)। ত্যাগ (বি)—ত্যাক্ত (বিণ)। শাসন (বি)—শাসিত (বিণ)। বুদ্ধি (বি)—বুদ্ধিমান (বিণ)। প্রসন্ন (বিণ)—প্রসাদ, প্রসন্নতা (বি)। সতী (বিণ)—সতীত্ব (বি)। গৃহিণী (বিণ)—গৃহিণীপনা (বি)। কষ্ট (বি)—কষ্টকর (বিণ)। নিবারণ (বি)—নিবৃত্ত (বিণ)। প্রশান্ত (বিণ)—প্রশান্তি (বি)। স্পর্ধা (বি)—স্পর্ধিত (বিণ)। দক্ষিণ (বিণ)—দাক্ষিণ্য (বি)। ভঙ্গ (বি)—ভঙ্গিল (বিণ)। জল (বি)—জলীয় (বিণ)। কর্তা (বিণ)—কর্তৃত্ব (বি)। ভয় (বি)—ভীত (বিণ)। জ্ঞানহীন (বিণ)—জ্ঞানহীনতা (বি)। বদ্ধ (বি)—বদ্ধ (বিণ)।

**গতরূপ** ॥ দেই—দিই। যবে—যখন। কেঁটারে—কেঁটাকে। লয়ে—লইয়া। তারে—তাহাকে। মোর—আমার। পেছ—পাইলাম। বারেক—একবার। তার—তাহাতে। বলিছ—বলিলাম। নহিলে—না হইলে। ধায়—ধাবিত হয়। হেরিলাম—দেখিলাম। হেনমতে—এইভাবে। সহিব—সহ্য করিব। ছুঁষি—দোষ দিই। হুহু—হইলাম। হেরি—দেখিয়া। নমিছ—নমস্কার করিলাম। কোথা—কোথায়। শিরে—মাথায় কাছে। শুধায়—জিজ্ঞাসা করে। শিরে—মাথায়। পুন—পুনরায়। লভিয়া—লাভ করিয়া। তাহারে—তাহাকে। গেছ—গেলায়। কিরিছ—কিরিলাম।

## । ত্রিভু ।

সন্ধি ॥ দিগ্‌জয়ী = দিক্ + জয়ী । দিগ্‌গজ = দিক্ + গজ । চতুর্দোলায় = চতুঃ + দোলায় । প্রেমাবেশে = প্রেম + আবেশে । পরমাগ্রহে = পরম + আগ্রহে । সমুচিত = সম্ + উচিত । চরণাশ্রিত = চরণ + আশ্রিত । গোপদে = গো + পদে (নিপাতনে) । দিগ্‌বিজয়ীর = দিক্ + বিজয়ীর ।

কারক-বিভক্তি ॥ ব্রজধামে—অধিকরণে ‘এ’ বিভক্তি । রণমদে—করণে ‘এ’ বিভক্তি । চতুর্দোলায় অধিকরণে ‘য’ বিভক্তি । ভয়ে—করণে ‘এ’ বিভক্তি । সবে—কর্তায় ‘এ’ বিভক্তি । পুঁথিপত্র—কর্মে শূত্রবিভক্তি । পাণ্ডিত্যের—করণ-সম্বন্ধে ‘এর’ বিভক্তি । প্রেমাবেশে—করণে ‘এ’ বিভক্তি । মোরে—কর্মে ‘রে’ বিভক্তি । কণ্ঠে—অপাদানে ‘এ’ বিভক্তি । শশকে—কর্মে ‘এ’ বিভক্তি । মল্লেরে—কর্মে ‘এরে’ বিভক্তি । প্রশ্রবাণ—কর্মে শূত্রবিভক্তি । জনতায়—কর্তায় ‘য’ বিভক্তি । সনাতনে—কর্মে ‘এ’ বিভক্তি । গায়—অধিকরণে ‘য’ বিভক্তি । অল্পজল—কর্মে শূত্রবিভক্তি । শৃঙ্গাবিষ্টা—কর্মে শূত্রবিভক্তি । তোমা—কর্মে শূত্রবিভক্তি । তায়—করণে ‘য’ বিভক্তি । কোপের কর্ম-সম্বন্ধে ‘এর’ বিভক্তি । তল—কর্মে শূত্রবিভক্তি । চোখে—অপাদানে ‘এ’ বিভক্তি । বসনে—করণে ‘এ’ বিভক্তি । শ্রীজীব—কর্মে ‘এ’ বিভক্তি । উপদেশে—করণে ‘এ’ বিভক্তি । জীব—কর্মে ‘এ’ বিভক্তি । সন্তানে—কর্মে ‘এ’ বিভক্তি । অবিচারে—সম্প্রদানে ‘এ’ বিভক্তি । শিশুর—কর্মপ্রবচনীয়যোগে ‘র’ বিভক্তি । ধারায়—করণে ‘য’ বিভক্তি । পরশে—করণে ‘এ’ বিভক্তি ।

সমাস ॥ ত্রিভু - তিন রত্নের সমাহার—ধিগু । দিগ্‌জয়ী—দিককে জয় করিয়াছেন যিনি—উপপদতৎ । দিগ্‌গজ—দিকরূপ গজ—রূপক-কর্মধা । বীরপণ্ডিত—বীর যে পণ্ডিত—কর্মধা । ব্রজধাম—যাহা ব্রজ, তাহাই ধাম কর্মধা । রণমদে—রণরূপ মদ—রূপক-কর্মধা, তাহাতে । পঙ্কজবনে—পঙ্কে জগ্নে যাহা—উপপদতৎ ; তাহার বন—ষষ্ঠীতৎ । অশ্বমুণ্ডে—অশ্বের মুণ্ড—ষষ্ঠীতৎ ; তাহাতে । চতুর্দোলায়—চারি দোলায় সমাহার—ধিগু । বিজয়মালা—বিজয়-সূচক মালা—মধ্যপ-কর্মধা । জয়নাদ—জয়-সূচক শব্দ—মধ্যপ-কর্মধা । অহুচর—অহু পশ্চাতে চরে যে—উপপদতৎ । পুঁথিপত্র—পুঁথি ও পত্র—বন্দ । সাধনভঞ্জন-রত—সাধন ও ভঞ্জন—বন্দ, তাহাতে রত—সপ্তমীতৎ । বিচারমল্ল—বিচারে মল্ল—সপ্তমীতৎ । প্রেমাবেশে—প্রেমের আবেশ—ষষ্ঠীতৎ, তাহাতে । পরমাগ্রহে—পরম আগ্রহ—কর্মধা, তাহাতে । জয়-ভিখারীর—জয়ের জন্ত ভিখারী—চতুর্থীতৎ, তাহার । বিজয়গর্বে—বিজয়-জনিত গর্ব—মধ্যপ-কর্মধা । ভয়ে-বিস্ময়ে—ভয়ে ও বিস্ময়ে—অলুক বন্দ । সিন্ধবসনে—সিন্ধু যে বসন—কর্মধা, তাহাতে । প্রতিকল—কলের বিপরীত—অব্যয়ীভাব । চরণাশ্রিত—চরণে আশ্রিত—সপ্তমীতৎ । জ্ঞানসাগরের—জ্ঞানরূপ সাগর—রূপক-কর্মধা, তাহার । জয়গৌরবে—জয়ের গৌরব—ষষ্ঠীতৎ, তাহাতে । বণে-আহ্বানবাণী—বণে আহ্বান—অলুকতৎ ; তাহার সূচক বাণী—মধ্যপ-কর্মধা । অট্টহাস্ত—অট্ট যে হাস্ত—কর্মধা ।

গোপ্পদে—গো-র পদ—যষ্টিতৎ, তাহাতে। পুরবাসী—পুরে বাস করে যে—উপপদ-  
তৎ। প্রম্বাণ—প্রম্বরূপ বাণ—রূপক-কর্মধা। অবনতশির—অবনত শির বাহার—  
বহুব্রী। বিতণ্ডাবীর—বিতণ্ডায় বীর—সপ্তমীতৎ। শুভসংবাদ—শুভ যে সংবাদ—  
—কর্মধা। বিজয়-বারতা—বিজয়-সূচক বারতা—মধ্যপ-কর্মধা। অন্নজল—অন্ন ও  
জল—দ্বন্দ্ব। যশ-প্রতিষ্ঠা—যশ ও প্রতিষ্ঠা—দ্বন্দ্ব। মুখদর্শন—মুখকে দর্শন—দ্বিতীয়া  
তৎ। গুরুমর্ধাদা—গুরুর মর্ধাদা—যষ্টিতৎ। জয়গৌরব—জয়ের গৌরব—যষ্টিতৎ।  
কুম্মকোমল—কুম্মের স্তায় কোমল—উপমান-কর্মধারয়। কঙ্কালসার—কঙ্কাল সার  
বাহাতে—বহুব্রী। দিগ্‌বিজয়ীর—দিককে বিজয় করে যে—উপপদতৎ, তাহার।

**প্রকৃতি-প্রত্যয় ॥** পণ্ডিত—পণ্ডা+ইতচ্। মস্ত—মদ্+স্ত [কর্তৃবা]। দস্তী  
—দস্ত+ঐ। পঙ্কজ—পঙ্ক-জন্+ড। চারণ—চব্+ণিচ্+অনট্। ভয়—ভী+  
অল্। সাধন—সাধ্+অনট্। ভঞ্জন—ভজ্+অনট্। রত—রন্+স্ত। পাণ্ডিত্য  
—পণ্ডিত+ক্য। খ্যাতি—খ্যা+ক্তি। অভিযান—অভি-যা+অনট্। আবেশ  
—আ-বিশ্+ঘঞ্। যুদ্ধ—যুধ্+স্ত [ভাববা]। পরম—পর+ম। আগ্রহ—  
আ-গ্রহ্+ঘঞ্। বিজয়—বি-জি+অল্। পত্রী—পত্র+ঐ। ভিখারী—ভিধ্  
+আরী। সূর্য—স্ব+যৎ [কর্তৃবা]। জনতা—জন+তা। বিন্ময়—বি-ম্মি+  
ঘঞ্ [ভাববা]। সিন্ধু—সিচ্+স্ত [কর্মবা]। স্নান—স্না+অনট্। আফালন—  
আ-ফল্+ণিচ্+অনট্ [ভাববা]। সনাতন—সনা+তন। ধৈর্য—ধীর+ক্য।  
আশ্রিত—আ-শ্রি+স্ত। শিষ্য—শাস্+যৎ। সম্মান—সম্-তন্+অনট্। গৌরব  
—গুরু+ব। আহ্বান—আ-হ্বে+অনট্। কেশরী—কেশর+ইন্। শশক—শশ+ক।  
কুতূহলী—কুতূহল+ঐ। পুরবাসী—পুর-বস্+ইন্। শানিত—শাণ+ইতচ্।  
খণ্ডিত—খণ্ড+ইতচ্। দণ্ডিত—দণ্ড+ইতচ্। দান্তিক—দন্ত+কিক। অবনত—  
অব-নম্+স্ত [কর্মবা]। পুলকিত—পুলক+ইচ্ছ। প্রতিষ্ঠা—প্রতি-স্থা+ঘঞ্  
[ভাববা]+আ। অমুনয়—অমু-নী+অল্। হৃদয়—হৃ(+দ্)+অয় [ভাববা]।  
অবিরাম—নঞ্-বি-রম্+ঘঞ্। কাতরতা—কাতর+তা। বৈষ্ণব—বিষ্ণু+ব।  
বিকৃত—বি-কৃ+স্ত [ভাববা]। গুরুতর—গুরু+তর। অপরাধ—অপ-রাধ্+  
ঘঞ্। প্রয়োজন—প্র-যুজ্+অনট্ [ভাববা]। সহিষ্ণু—সহ্+ইষ্ণু। অদৃষ্ট—  
নঞ্-দৃশ্+স্ত। উপদেশ—উপ-দিশ্+ঘঞ্। অভিমান—অভি-মান্+ঘঞ্।  
দীনতা—দীন+তা। অপরাধী—অপ-রাধ্+ইন্। অরুণ—ঋ+উন। ব্রজ—ব্রজ্  
+ঘঞ্।

**লিঙ্গান্তর ॥** ভিখারী—ভিখারিনী। সূর্য—সূর্যা, সূরী। শিষ্য—শিষ্যা। তরুণ  
—তরুণী। পুরবাসী—পুরবাসিনী। শূকরী—শূকর। বৈষ্ণব—বৈষ্ণবী। বালক—  
বালিকা।

**পদ-পরিবর্তন ॥** পণ্ডিত (বিণ)—পাণ্ডিত্য (বি)। মস্ত (বিণ)—মস্ততা  
(বি)। খ্যাতি (বি)—খ্যাতি (বিণ)। যুদ্ধ (বিণ)—যুদ্ধতা (বি)। স্নান (বি)  
—স্নাত (বিণ)। দন্ত (বি)—দান্তিক (বিণ)। আশ্রিত (বিণ)—আশ্রয় (বি)।

গৌরব (বি)—গুরু (বিণ)। তর্ক (বি)—তार्কিক (বিণ)। শানিত (বিণ)—  
শাণ (বি)। ঋণিত (বিণ)—ঋণ (বি)। কুতূহলী (বিণ)—কুতূহল (বি)।  
অবনত (বিণ)—অবনতি (বি)। পাণ্ডুর (বিণ)—পাণ্ডুরতা (বি)। পুলকিত  
(বিণ)—পুলক (বি)। গ্রহর (বি)—গ্রাহরিক (বিণ)। ব্যাধা (বি)—ব্যাধিত  
(বিণ)। কাতর (বিণ)—কাতরতা (বি)। বিরূপ (বিণ)—বিরূপতা (বি)।  
অপরাধ (বি)—অপরাধী (বিণ)। প্রয়োজন (বি)—প্রয়োজনীয় (বিণ)।  
বর্জন (বি)—বর্জিত (বিণ)। উপদেশ (বি)—উপদেষ্ট (বিণ)। শিক্ষা  
(বি)—শিক্ষিত (বিণ)। অভিমান (বি)—অভিমানী (বিণ)। দয়া (বি)  
—দয়ালু (বিণ)। মুঢ় (বিণ)—মুঢ়তা (বি)। দেহ (বি)—দৈহিক (বিণ)।  
শিশু (বিণ)—শৈশব (বি)। শুচি (বিণ)—শুচিতা (বি)।

গন্তরূপ ॥ উড়ায়—উড়াইয়া। গলে—গলায়। পাছে—পিছনে। আগায়  
—অগ্রসর হয়। মজি—মজিয়া। দোহে—দুইজনে। তব—তোমার। মোরে—  
আমাকে। জিনি—জয় করিয়া। কভু—কখনও। বধে—বধ করে। সেথা—  
সেখানে। হানিতে—আঘাত করিতে। বারতা—বার্তা। পিছে—পিছনে। তোমা  
—তোমাকে। ঠাই—স্থান। তায়—তাহাতে। ত্যজিলে—ত্যাগ করিলে। গরব—  
গর্ব। জিনিবারে—জয় করিতে। ত্যজিব—ত্যাগ করিব। তোমার—তোমাকে।  
চমকি—চমকিত হইয়া। হেনেছি—আঘাত করিয়াছি। তারে—তাহাকে। যাতনা  
—কষ্ট হইয়া। তিতিল—ভিজিল।

## । হাট ।

জিহ্বা । নির্জন = নিঃ + জন + জীঃ । নঃ + রব ।

কারক-বিভক্তি ॥ সেথা—অধিকরণে শূন্যবিভক্তি। সবে—কর্তার 'এ' বিভক্তি।  
মাঠ—কর্মে শূন্যবিভক্তি। হেথা—অধিকরণে শূন্যবিভক্তি। ওপায়ের, এপায়ের—  
বিশেষণ-সম্বন্ধে 'এর' বিভক্তি। শত হাতে—অপাদানে 'এ' বিভক্তি।

সমাস ॥ বেচা-কেনা—বেচা ও কেনা—দ্বন্দ্ব। শ্রেণীহারী—শ্রেণী হারাইয়াছে  
যে—উপপদতৎ। দোচালা—দুই চালার সমাহার—ধিগু। বিজ্ঞপ-বীশি—বিজ্ঞপস্থচক  
বীশি—মধ্যপ-কর্মধা। চেনা-অচেনার—চেনা ও অচেনা—দ্বন্দ্ব; তাহার। চরণ-চিহ্ন—  
চরণের চিহ্ন—বগীতৎ। চেনাচিনি, জানাজানি, টানাটানি, হানাহানি—ব্যঞ্জিহার  
বহরী। কানাকড়ি—কানা যে কড়ি—কর্মধা। শিশিরবিমল—বিগত মল বাহা হইতে  
—বহরী; শিশিরের মত বিমল—উপমান-কর্মধা। ক্রেতা-বিক্রেতা—ক্রেতা ও  
বিক্রেতা—দ্বন্দ্ব। দিবসরাত্রি—দিবস ও রাত্রি—দ্বন্দ্ব। চিরকাল—চির ব্যাপিয়া কাল  
—বিতীয়াতৎ।

**প্রকৃতি-প্রত্যয়** ॥ প্রভাত—প্র-ভা+জ (ভাববা)। ক্লান্ত—ক্ল+জ (কর্তৃবা)। আহ্বান—আ-হ্বে+অনট্ (ভাববা)। জীর্ণ—জ+জ (কর্তৃবা)। একক—এক+ক। ছিন্ন—ছিদ্+জ (কর্মবা)। ক্রেতা—ক্রী+তৃচ্। বিক্রেতা—বি-ক্রী+তৃচ্। নূতন—নু (<নব)+তন্।

**পদ-পরিবর্তন** ॥ হাট (বি)—হেটো (বিণ)। সন্ধ্যা (বি)—সান্ধ্য (বিণ)। মাঠ (বি)—মেঠো (বিণ)। নিশা (বি)—নৈশ (বিণ)। আহ্বান (বি)—আহূত (বিণ)। জীর্ণ (বিণ)—জীর্ণতা (বি)। ছিন্ন (বিণ)—ছেদ (বি)। নীরব (বিণ)—নীরবতা (বি)। ব্যথা (বি)—ব্যথিত (বিণ)। নূতন (বিণ)—নূতনত্ব (বি)। উদার (বিণ)—উদারতা, ঔদার্য (বি)।

**গন্তরূপ** ॥ মৃদিল—মৃদিত করিল। নয়ান—নয়ন। সেখা—সেখানে। ঠাই—স্থান। হেথা—এখানে। সহি—সহ্য করিয়া। পরশের—পরীক্ষার।

দশম শ্রেণী

॥ পান্ড্যাংশ ॥

। হিমালয়-স্রমণ ॥

**সন্ধি** ॥ হিমালয়—হিম+আলয়। বয়স্ক—বয়ঃ+ক। দাবানলে—দাব+অনলে। দুর্দশাগ্রস্ত—দুঃ+দশাগ্রস্ত। বানারোহণে—বান+আরোহণে। হরিদ্বর্ষ—হরিৎ+বর্ষ। পল্লবাবৃত—পল্লব+আবৃত। কদাকার—ক্ (কদ্)+আকার। নিকলক—নিঃ+কলক। বনাস্তরে—বন+অস্তরে। উচ্চৈঃস্বরে—উচ্চৈঃ+স্বরে। সায়াংকালে—সায়ম্+কালে। পরম্পর=পরঃ+পর। মহোচ্চতার=মহা+উচ্চতার। আচ্ছন্ন—আ+চ্ছন্ন। অপেক্ষা—অপ+ঈক্ষা। পত্রাবৃত—পত্র+আবৃত। আশ্চর্য—আ+চর্য। সম্ভাবনা—সম্+ভাবনা। বনম্পতি—বনঃ+পতি। তথাপি—তথা+অপি। পুনর্বার—পুনঃ+বার। প্রত্যাশায়—প্রতি+আশায়। সন্নিকট—সম্+নিকট। তরুণ—তৎ+রূপ। অপরাহ্নে—অপর+অহ্নে। শ্রোতস্বতী—শ্রোতঃ+বতী। বোধান্বিতা—বোধ+অন্ব+ইতা। সমাগমে—সম্+আগমে। পরিষ্কার=পরি+কার। পরিচ্ছন্ন=পরি+চ্ছন্ন। রাজ্যগনে—রাজ+আগনে। দুর্লভ—দুঃ+লভ। নির্গত—নিঃ+গত। দীপালোকের=দীপ+আলোকের। তুষারাবৃত=তুষার+আবৃত। মনোহর=মনঃ+হর। প্রত্যাবর্তন=প্রতি+আবর্তন। নির্বিঘ্নে=নিঃ+বিঘ্নে।

**কারক-বিভক্তি** ॥ দাবানলে—করণে 'এ' বিভক্তি। পক্ষীতেও—কর্তায় 'এ' বিভক্তি। বিবিধপ্রকারের—বিশেষণ সম্বন্ধে 'এর' বিভক্তি। হস্তের—করণে 'এর' বিভক্তি। গন্ধে—করণে 'এ' বিভক্তি। স্বর্ণবর্ণে—করণে 'এ' বিভক্তি। সূর্য-কিরণে

—করণে সপ্তমী। কাহাকেও—অপাদানে 'কে' বিভক্তি। বুকের—অপাদানে বিভক্তি। ইহাতে—অপাদানে 'তে' বিভক্তি। বুকের—সম্প্রদানে 'এর' বিভক্তি। জীবের—সম্প্রদানে 'এর' বিভক্তি। প্রস্তরখণ্ডে—করণে 'এ' বিভক্তি। সমুদ্র-সমাগমে—নিমিত্তে 'এ' বিভক্তি। দাবানলের—কর্ম-সম্বন্ধে 'এর' বিভক্তি।

**সমাজ।** পদত্রয়েই—পদের দ্বারা ত্রয়—তৃতীয়াতং; তাহাতেই। তরুণবয়স্—তরুণ বয়স বাহার—বহুব্রী। দাবানলে—দাবের অনল—যষ্ঠীতং, তাহাতে। দুর্দশাগ্রস্ত—দুঃ দশা—কর্মধা, তাহার দ্বারা গ্রস্ত—তৃতীয়াতং। যানারোহণ—যানে আরোহণ—সপ্তমীতং। দৃষ্টিপাত—দৃষ্টির পাত—যষ্ঠীতং। হরিষর্ষ—হরিৎ বর্ষ বাহার—বহুব্রী। ঘন-পল্লবাবৃত—ঘন পল্লব—কর্মধা; তাহার দ্বারা আবৃত—তৃতীয়াতং। কদাকার—ক্ [ কদ্ ] আকার—কর্মধা। বনান্তরে—অন্ত বন—নিত্য সমাস। অবিলম্বাতার—নয় ঝিল—নঞ-তং; তাহার মাতা—যষ্ঠীতং; তাহার। আপাদমস্তক—পাদ হইতে মস্তক পর্যন্ত—অব্যয়ীভাব। গোধূমক্ষেত্র—গোধূমের ক্ষেত্র—যষ্ঠীতং। তৃণশূন্ত—তৃণের দ্বারা শূন্ত—তৃতীয়াতং। নিকটস্থ—নিকটে থাকে যে—উপপদতং। বনাকীর্ণ—বনের দ্বারা আকীর্ণ—তৃতীয়াতং। মহোচ্চতায়—মহৎ উচ্চতা—কর্মধা; তাহার। সশক্তিত [ অন্তঃ ]—শক্তির সহিত বর্তমান—[ সশক্ বা শক্তি—শব্দরূপ ] বহুব্রী। মনুষ্যবসতি—মনুষ্যপূর্ণ বসতি—মধ্যপ-কর্মধা। পত্রাবৃত—পত্রের দ্বারা আবৃত—তৃতীয়াতং। সতেজ—তেজের সহিত বর্তমান—যষ্ঠীতং। শ্রেণীবদ্ধ—শ্রেণীর দ্বারা বদ্ধ—তৃতীয়াতং। বিনীতভাবে—বিনীত ভাব—কর্মধা; তাহাতে। মনুষ্যকৃত—মনুষ্যের দ্বারা কৃত—তৃতীয়াতং। বনস্পতি—বনের পতি—যষ্ঠীতং। ভূবার-পরিণত—ভূবারে পরিণত—সপ্তমীতং। প্রসন্নমনে—প্রসন্ন মন—কর্মধা; তাহাতে। রৌপ্যপত্রের—রৌপ্যের পত্র—যষ্ঠীতং বা রৌপ্য-নির্মিত পত্র—মধ্যপ-কর্মধা; তাহাতে। নিয়গামী—নিয়মে গমন করে যে—উপপদতং। পঞ্চবিংশতি—পঞ্চ-অধিক বিংশতি—মধ্যপ-কর্মধা। অপরাহ্নে—নয় পর—নঞ-তং; অহনের অপর—একদেশী সমাস; তাহাতে। রোষাষিতা—রোষের দ্বারা অধ্বিত—তৃতীয়াতং ( স্ত্রী )। সর্বনিয়ন্তা—সর্ব নিয়ন্ত্রণ করে যে—উপপদতং। সমুদ্র-সমাগমে—সমুদ্রে সমাগম—সপ্তমীতং, তাহাতে। উপত্যকাভূমি—যাহা উপত্যকা, তাহাই ভূমি—অব্যয়ীভাব। সংকটস্থান—সংকটপূর্ণ স্থান—মধ্যপ-কর্মধা। দৌড়াদৌড়ি—দৌড়িয়া দৌড়িয়া যে খেলা—ব্যতিহার-বহুব্রী। রাজাসনে—রাজার নিমিত্ত আসন—চতুর্থীতং। অগ্নিবাণের—অগ্নিময় বাণ—মধ্যপ-কর্মধা। দূরস্থ—দূরে থাকে যে—উপপদতং। উৎসব-রজনী—উৎসবপূর্ণ রজনী—মধ্যপ-কর্মধা। সর্বভূক্ত—সর্ব ভক্ষণ করে যে—উপপদতং। দুপ্রহরের—দুই প্রহরের সমাহার—দ্বিগু। ভূবারাবৃত—ভূবারের দ্বারা আবৃত—তৃতীয়াতং। মহন্তর—মহৎ ভয় বাহা হইতে—বহুব্রী। ভূবারজীর্ণ—ভূবারের দ্বারা জীর্ণ—তৃতীয়াতং। মনোহর—মনকে হরণ করে যে—উপপদতং।

**প্রকৃতি-প্রত্যয়।** হৃৎ—হৃ+ক্ত ( কর্তৃবা )। পান—পা+অনট্ ( ভাববা )। রৌত্র—রূ+ত্র ( ভাববা )। ভগ্ন—ভনজ্+ক্ত ( কর্মবা )। দীপ্তি—দীপ্+ক্তি ( ভাববা )। ভূমিষ্ট—ভূমি-স্থ+ক। প্রণত—প্র+নম্+ক্ত ( কর্তৃবা )। বহু—বহু+

ক (কর্মবা)। আবৃত—আ-বৃ+ক্ত (কর্মবা)। দৃষ্ট—দৃশ্+ক্ত (কর্মবা)।  
 আহরি—আ-হৃ+ঘঞ্ (ভাববা)। সহজ—সহ-জন্+ড। নয়ন—নী+অনট্  
 (ভাববা)। আকর্ষণ+আ-কৃষ্+অনট্ (ভাববা)। সৌন্দর্য—সুন্দর+ক্য। লাবণ্য—  
 লবণ+ক্য। পবিত্রতা—পু+ইত্ৰ+তা। পরম—পর+ম্। বর্তমান—বৃৎ+শানচ্।  
 স্নেহ—স্নিহ্+ঘঞ্ (ভাববা)। সিক্ত—সিচ্+ক্ত (কর্মবা)। নিমগ্ন—নি-মস্জ্  
 +ক্ত (কর্তৃবা)। উপস্থিত—উপ-স্থা+ক্ত (কর্তৃবা)। আবাস—আ-বস্+ঘঞ্  
 (ভাববা)। ব্যবধান—বি-অব-ধা+অনট্ (ভাববা)। নিকটস্থ—নিকট স্থা+ক।  
 আকীর্ণ—আ-কৃ+ক্ত (কর্মবা)। শোভা—শুভ্+ঘঞ্ (ভাববা)+আ। বর্ধন—  
 বৃধ্+অনট্ (ভাববা)। গরিমা—গুরু+ইমন্+আ। পথিক্—পথিন্+ক। তৃত্য—  
 তৃ+যৎ। সূর্য—সূর+য বা সূ+য (কর্তৃবা)। অন্তর্মিত—অন্ত-মন্+ইত। মাহুয—  
 ময়ু (+য)+ফ। অবরোহণ—অব-রহ্ অনট্ (ভাববা)। জীর্ণ—জৃ+ক্ত (কর্তৃবা)।  
 শীর্ণ—শৃ+ক্ত (কর্তৃবা)। পরিত্যাগ—পরি-ত্যাগ্+ঘঞ্ (ভাববা)। আশ্চর্য—  
 আ-চরু+যৎ (কর্মবা)। দণ্ডায়মান—দণ্ডায়+শানচ্ (কর্তৃবা)। দৃশ্য—দৃশ্+যৎ  
 (কর্তৃবা)। মহত্ব—মহৎ+ত্ব। নিকৃষ্ট—নি-কৃষ্+ক্ত (কর্তৃবা)। ন্তন—ন্  
 (<নব)+তন। উপাসনা—উপ-আস্+অনট্ (ভাববা)+আ। কল্পণাময়—  
 কল্পণা+ময়ট্। পঙ্ক—পচ্+ক্ত (কর্তৃবা)। প্রহুট—প্র-হৃষ্+ক্ত (কর্তৃবা)।  
 কর্ণ—কৃষ্+অনট্ (ভাববা)। উপস্থিত—উপ-স্থা+ক্ত (কর্তৃবা)। প্রশস্ত—  
 প্র শস্+ক্ত (কর্তৃবা)। বহমানা—বহ্+শানচ্+আ (জী)। ক্রমিক—ক্রম+ইক।  
 স্বীয়—স্ব+ঈয়। আঘাত—আ-হন্+অ (ভাববা)। বোষাধিতা—বোষ-অহু-ই+ক্ত  
 (কর্তৃবা)+আ (জী)। গভীর—গম্+ঈর (অধিকরণবা)। সর্বনিয়ন্তা—সর্ধ-নি-  
 যম্+তৃচ্ (কর্তৃবা)। সমুদ্র—সম্-উন্+র (কর্তৃবা)। সমাগম—সম্-আ-গম্+  
 ঘঞ্ (ভাববা)। পরিষ্কার—পরি-কৃ+ঘঞ্ (ভাববা)। পরিচ্ছন্ন—পরি-চ্ছদ্+ক্ত  
 (কর্তৃবা)। বিশ্রাম—বি-শ্রম্+ঘঞ্ (ভাববা)। শয়ন—শী+অনট্ (ভাববা)।  
 মোহিত—মুহ্+গিচ্+ক্ত (কর্মবা)। বহিমান্—বহি+মতুপ্। অবসান—অব-সো+  
 অনট্ (ভাববা)। ব্যাপ্ত—বি-আপ্+ক্ত (কর্তৃবা)। আক্রমণ—আ-ক্রম্+অনট্  
 (ভাববা)। প্রস্থান—প্র-স্থা+অনট্ (ভাববা)। দেবতা—দেব+তা (স্বাধিক)।  
 মহিমা—মহৎ+ইমন্+আ। নিবৃত্তি—নি-বৃত্+ক্তি (ভাববা)। আহ্লাদ—আ-  
 হ্লাদ্+ঘঞ্ (ভাববা)। প্রভাত—প্র-ভা+ক্ত (কর্তৃবা)। লোলুপ—লুপ্+  
 যঙ্লুক্+অ (কর্তৃবা)। স্নান—স্নে+ক্ত (কর্তৃবা)। মনোহর—মনস্-হৃ+ঘঞ্  
 (ভাববা)। ধারণ—ধৃ+অনট্ (ভাববা)। প্রত্যাবর্তন—প্রতি-আ-বৃত্+অনট্  
 (ভাববা)। প্রসাদ—প্র-সদ্+ঘঞ্ (ভাববা)।

**পদ-পরিবর্তন।** প্রাতঃকাল (বি)—প্রাতঃকালীন (বিণ)। নিবিড় (বিণ)।  
 —নিবিড়তা (বি)। ভগ্ন (বিণ)—ভঙ্গ (বি)। শোভা (বি)—শোভাময় (বিণ)।  
 মূল (বি)—মৌল, মৌলিক (বিণ)। দৃষ্ট (বিণ)—দৃশন (বি)। আরোহণ (বি)  
 —আরোহ (বিণ)। পর্বত (বি)—পার্বত, পার্বত্য (বিণ)। চমৎকার (বি)

—চমৎকৃত (বিণ)। নৌদীর্ঘ (বি)।—ব্রহ্ম (বিণ)। বিকশিত (বিণ)।—বিকশিত (বি)।  
(বি)। মেহ (বি)।—বিহ (বিণ)। পরম্পর (বি)।—পারস্পরিক (বি)।  
নিবিড় (বিণ)।—নিবিড়তা (বি)। বন (বি)।—বন্ত (বিণ)। অর্থ (বি)।—গৌর  
(বিণ)। ভূষিত (বিণ)।—ভূষণ (বি)। ক্ষু (বিণ)।—ক্ষুতা, আর্ষণ (বিণ)।  
কৈবল (বিণ)।—কৈবল্য (বি)। উচিত (বিণ)।—উচিত্য (বি)। পরিত্যাগ (বি)  
—পরিত্যক্ত (বিণ)। বিনীত (বিণ)।—বিনয় (বি)। মহত্ব (বি)।—মহৎ (বি)।  
ব্রহ্ম (বি)।—ব্রাহ্ম (বিণ)। পবিত্র (বিণ)।—পবিত্রতা (বি)। প্রসন্ন (বিণ)।  
প্রসাদ (বি)। কর্ণ (বি)।—কর্ণিত (বিণ)। গম্ভীর (বিণ)।—গাম্ভীর্য (বি)। বিরল  
(বিণ)।—বিরলতা (বি)। শয়ন (বি)।—শয়ান, শায়িত (বিণ)। আসন (বি)।  
আসীন (বিণ)। মোহিত (বিণ)।—মোহ (বি)। ধারণ (বি)।—ধৃত (বিণ)।  
আক্রমণ (বি)।—আক্রান্ত (বিণ)। চিহ্ন (বি)।—চিহ্নিত (বিণ)। প্রজলিত  
(বিণ)।—প্রজলন (বি)। উৎপত্তি (বি)।—উৎপন্ন (বিণ)। ব্যাপ্তি (বি)।—ব্যাপ্ত  
(বিণ)। উন্নতি (বি)।—উন্নত (বিণ)। নিবৃত্তি (বি)।—নিবৃত্ত (বিণ)।

সার্থক বাক্য-রচনা ॥ প্রাতঃকালে—পরদিন প্রাতঃকালে আমরা উত্তি  
নদীর উৎস দেখিতে যাত্রা করিলাম। পঙ্কজেরে—কোন যানবাহন না পাইলে আমরা  
পঙ্কজেরেই যাইব। ভুরুণবয়স্ক—সে ভুরুণবয়স্ক, তাহার পক্ষে আমাকে একথা  
বলা আদৌ যুক্তিসঙ্গত হয় নাই। উচ্চৈঃস্বরে—নির্জন অরণ্যমধ্যে পথ হারাইয়া সে  
উচ্চৈঃস্বরে কাদিতে লাগিল। দুর্দশাগ্রস্ত—আত্মীয়-স্বজন ও অস্তিত্ব সহায়-সম্মল  
হারাইয়া সে অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। কদাকার—উট একটি  
কদাকার প্রাণী। বহমানা—আমাদের বাসভবনের সম্মুখেই প্রসন্ন-সলিলা ভাগীরথী  
বহমানা। বনান্তরে—সেই বনে শিকার না পাইয়া তাহার বনান্তরে গমন করিল।  
আপাদমস্তক—তাহার অঙ্গভঙ্গী দেখিয়া আমার আপাদমস্তক জলিয়া গেল।  
প্রসন্নমনে—বৃদ্ধ দাওয়ায় বসিয়া প্রসন্নমনে তামাক টানিতেছিলেন। বয়স্ক—  
বালকটির বয়স্ক্রম ষাট বৎসর হইবে। নক্ষত্রবেগে—অগ্নিস্থলিদগুনি নক্ষত্রবেগে  
ছুটিতে লাগিল। নির্বিঘ্নে—ওভকার্ণ নির্বিঘ্নে সমাধা হইয়া গেল।

## । সাগরসন্ধ্যা নবকুমার ।

সন্ধি ॥ সন্ধ্যা—সন্ধ্যা+গম। প্রত্যাগমন—প্রতি+আগমন। অস্তিত্ব—অস্ত+  
অস্ত। নাবিক—নৌ+ইক। নৌকারোহীরা—নৌকা+আরোহীরা। কুণ্ডিকা—  
কুণ্ড+কাটিকা। দিগন্ত—দিগ্+অন্ত। দিগ্‌নিরূপণ—দিগ্+নিরূপণ। কথোপকথন  
—কথা+উপকথন। বারেক—বার+এক। ইত্যন্ততঃ—ইতঃ+ততঃ। তির্যকার—  
তিরঃ+কার। মহাশয়—মহা+আশয়। অগ্নীধর—অগ্নি+ধর। সন্ধ্যাসং-  
সন্ধ্যা+বৎসর। পশ্চাদাগত—পশ্চাৎ+আগত। অগ্ন্যস্তর—অগ্নি+অস্তর



দূরাদয়চক্রনিভস্ত = দূরাৎ + অয়ঃ + চক্রনিভস্ত । লবণাদুরাশেখীরা = লবণ + অদুরাশেঃ + খীরা । চতুর্দিক = চতুঃ + দিক । দিগ্ভ্রম = দিক্ + ভ্রম । প্রতীক্ষা = প্রতি + দ্বেক্ষা । সূৰ্যোদয় = সূর্য + উদয় । কঠাগতপ্রাণ = কঠ + আগতপ্রাণ । তরলান্নোলনকম্প = তরল + আন্নোলনকম্প । দিগ্ মণ্ডল = দিক্ + মণ্ডল । জলোচ্ছাস = জল + উৎ + খাস । প্রান্তক = প্রাক্ + উক্ত । উপহাসাম্পদ = উপহাস + আম্পদ । আত্মোপকারী = আত্ম + উপকারী । পুনরীকর = পুনঃ + বার । কাঠাহরণ = কাঠ + আহরণ ।

**কারক-বিভক্তি** ॥ একদিন—অধিকরণে শূত্রবিভক্তি । নাবিক দহ্মাদিগের—অপাদানে 'এ' বিভক্তি । অনেকেই—কর্তায় 'এ' বিভক্তি । পণ্ডিতে—কর্তায় 'এ' বিভক্তি । ছেলেলিপে—কর্তায় শূত্রবিভক্তি । সযৎসর—ক্রিয়াবিশেষণে শূত্রবিভক্তি । সংবাদ—কর্মে শূত্রবিভক্তি । মুখে—অপাদানে 'এ' বিভক্তি । মহাশয়ের—ভাববাচ্যের কর্তায় 'এ' বিভক্তি । তীর্থদর্শনে—করণে 'এ' বিভক্তি । শ্রোতে—করণে 'এ' বিভক্তি । পশ্চাৎ—ক্রিয়াবিশেষণে শূত্রবিভক্তি । ভয়ে—ক্রিয়াবিশেষণে 'এ' বিভক্তি । ছেলে—কর্মে শূত্রবিভক্তি । সকলেই—কর্তায় 'এ' বিভক্তি । কুঠারহস্তে—ক্রিয়াবিশেষণে 'এ' বিভক্তি । কাঠাহরণে—নিমিত্তে 'এ' বিভক্তি । তাহাতে—অপাদানে 'তে' বিভক্তি । ব্যাঘ্রে—কর্তায় 'এ' বিভক্তি । 'শিয়ালে'—কর্তায় 'এ' বিভক্তি । ললাটে—অপাদানে 'এ' বিভক্তি । তাহা—কর্মে শূত্রবিভক্তি । ছোয়ারের—নিমিত্তে 'এ' বিভক্তি । কাঠাহরণে—নিমিত্তে 'এ' বিভক্তি ।

**সমাস** ॥ নাবিকদহ্মাদিগের—বাহারা নাবিক, তাহারাই দহ্মা—কর্মধা ; তাহাদিগের । দলবন্ধ—দলে বন্ধ—সপ্তমীতৎ । নৌকারোহীরা—নৌকায় আরোহণ করে বাহার—উপপদতৎ । সন্ধিহীন—সন্ধী দ্বারা হীন—তৃতীয়াতৎ । জগদীশ্বরের—জগতের ঈশ্বর—ষষ্ঠীতৎ ; তাহার । পশ্চাদাগত—পশ্চাৎ আগত—তৃতীয়াতৎ । একতান-মন—এক যে তান—কর্মধা ; একতান মন বাহার—বহুব্রী । বার-দরিয়ায়—বার (বাহির) যে দরিয়া কর্মধা ; তাহাতে । ভয়কাতর—ভয়ের হেতু কাতর—পঞ্চমীতৎ । সশঙ্কচিত্তে—শঙ্কার সহিত বর্তমান—বহুব্রী ; সশঙ্ক এমন চিত্ত—কর্মধা ; তাহাতে । দিগ্ভ্রম—দিকের ভ্রম—ষষ্ঠীতৎ । নিশ্চেষ্ট—নাই চেষ্টা বাহার—বহুব্রী । প্রহরাতীত—প্রহরকে অতীত—দ্বিতীয়াতৎ । সর্দঙ্গ—কদমের সহিত বর্তমান—বহুব্রী । দূর—দূরে থাকে বাহা—উপপদতৎ । নীলপ্রভ—নীল প্রভা বাহার—বহুব্রী । উপকূল—কূলের সমীপ—অব্যয়ভাব । অনতিদূরে—নয় অতিদূরে—নঞতৎ । মন্দগামী—মন্দ গমন করে বাহা—উপপদতৎ । তীরলগ্ন—তীরে লগ্ন—সপ্তমীতৎ । প্রাতঃকৃত্য-সম্পাদনে—প্রাতঃকালীন কৃত্য—মধ্যপ-কর্মধা ; তাহার সম্পাদন—ষষ্ঠীতৎ ; তাহাতে । ছেদনযোগ্য—ছেদনের যোগ্য—ষষ্ঠীতৎ । তরলভিঘাত—তরলের অভিঘাত—ষষ্ঠীতৎ । গুঠাগত—গুঠকে আগত—দ্বিতীয়াতৎ । নিরাহারে—নাই আহার বাহাতে—বহুব্রী ; তাহাতে । উপবাসনিবারণার্থ—উপবাসের নিবারণ—ষষ্ঠীতৎ ; তাহার নিমিত্ত—নিত্যসমাস । আত্মোপকারীকে—আত্মার উপকারী—ষষ্ঠীতৎ ; তাহাকে । কাঠাহরণ—কাঠকে আহরণ—দ্বিতীয়াতৎ ।

**প্রকৃতি-প্রত্যয় ॥** নোকা—নৌ+ক+আ। গঙ্গা—গম্+গা+আ। সাগর—সগর+ঞ্চ। প্রত্যাগমন—প্রতি+আ+গম্+অনট্ (ভাববা)। নাবিক—নৌ+ইক। হীন—হা+ক্ত (কর্মবা)। ঘোরতর—ঘোর+তর। ব্যাঘ্র—বি+আপ্+ক্ত (কর্মবা)। নিরুপণ—নি-রুপ্+শিচ্+অনট্ (ভাববা)। প্রাচীন—প্রাচ্+ঐন। জাগ্রৎ—জাগৃ+শত্ (কর্তৃবা)। জিজ্ঞাসা—জ্ঞা+সন্+আ। ব্যস্ত—বিঅস্+ক্ত। উপনীত—উপ-নী+ক্ত। শাস্ত্র—শাস্+ষ্ট্রণ (করণবাচ্য)। গাঢ়—গাহ্+ক্ত (কর্তৃবা)। স্বর্ধ—স্ব+য (কর্তৃবা)। উদয়—উৎ-ই+অ (ভাববা)। রোদ্র—রুদ্র+ঞ্চ। বিভ্রাস—বি-নি-অস্+ঘঞ্ (ভাববা)। উৎস্রব্য—উৎস্র+ঘ্য। নিবারণ—নি-বারি+অনট্ (ভাববা)। আবরণ—আ-বৃ+অনট্ (করণবাচ্য)। প্রস্তাব—প্র-স্ত+ঘঞ্ (ভাববা)। উচ্চাস—উৎ-স্ব+ঘঞ্ (ভাববা)। অবতরণ—অব-তৃ+অনট্ (ভাববা)। কৃত্য—কৃ+ক্যপ্ (কর্মবা)। উদ্ভিদ—উৎ-ভিদ্+ক্লিপ্ (কর্তৃবা)। আরোহণ—আ+রুহ্+অনট্ (ভাববা)। আহরণ—আ-হৃ+অনট্ (ভাববা)। সম্ভাব্য—সম্-ভৃ+ণ্যৎ (কর্মবা)। মন্দীভূত—মন্দ+অভূততভাবে চি্+ভৃ+ক্ত (কর্তৃবা)। ব্যাঘ্র—বি-আ-ভ্রা+ক (কর্তৃবা)। হত্যা—হন্+ক্যপ্ (ভাববা)। প্রতিজ্ঞা—প্রতি-জ্ঞা+অ (ভাববা)+আ। উপবাস—উপ-বস্+অ (ভাববা)। উপকারী—উপকার+ইন্।

**পদ-পরিবর্তন ॥** প্রত্যাগমন (বি)—প্রত্যাগত (বিণ)। ব্যাঘ্র (বিণ)—ব্যাগ্ধি (বি)। ক্রুদ্ধ (বিণ)—ক্রোধ (বি)। কাতর (বিণ)—কাতরতা (বি)। আশঙ্ক (বি)—আশঙ্কিত (বিণ)। বিভ্রাস (বি)—বিভ্রস্ত (বিণ)। বিসর্জন (বি)—বিসর্জিত (বিণ)। কীর্তিত (বিণ)—কীর্তন (বি)। সমাপ্ত (বিণ)—সমাপ্তি (বি)। অবতরণ (বি)—অবতীর্ণ (বিণ)। প্রবৃত্ত (বিণ)—প্রবৃত্তি (বি)। আহরণ (বি)—আহৃত (বিণ)। উদ্বিগ্ন (বিণ)—উদ্বেগ (বি)। উখিত (বিণ)—উত্থান (বি)। বনবাস (বি)—বনবাসিত (বিণ)।

**বিপরীতার্থক শব্দ ॥** প্রাচীন—আধুনিক। সুবা—বৃদ্ধ। তিরস্কার—পুরস্কার। পরকাল—ইহকাল। জন্ম—মৃত্যু। প্রবৃত্ত—নিবৃত্ত। দরিদ্র—ধানিক। বন্ধন—মোচন। আরোহণ—অবরোহণ। বিসর্জন—আবাহন। অধম—উত্তম।

**সার্থক বাক্য-সুচনা ॥** পশ্চাদাগত—পশ্চাদাগত সৈন্তদল যত সৈন্তদের স্থান পূরণ করিল। পূর্ববৎ—শিঙটি পূর্ববৎ কামিতে লাগিল। অপেক্ষাকৃত—তিনি বর্তমানে অপেক্ষাকৃত স্বস্থ। কর্তাগতপ্রাণ—ডাকাতদিগের ভয়ে পথিকরা কর্তাগতপ্রাণ। ইত্যবসরে—আমরা গল্প করিতেছিলাম, ইত্যবসরে সেখানে তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

**উক্তি-পরিবর্তন ॥** সুবা কহিলেন, “যদি শাস্ত্র বুঝিয়া থাকি...সেইমতই আসিয়াছি।” (প্রত্যক্ষ উক্তি)>সুবা কহিলেন যে, যদি তিনি শাস্ত্র বুঝিয়া থাকেন তবে তীর্থদর্শনে বেক্রপ পরকালের কর্ম হয়, বাটী বসিয়াও সেক্রপ হইতে পারে। বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তবে তিনি গিয়াছিলেন কেন। সুবা উত্তর করিলেন যে, তিনি  
ব. বি. (২য়)—১৫

আপসেই ভাষা বলিয়াছেন। সমুদ্র দেখিবেন বড়ো সাধ ছিল, সেই জন্তই শিখাইলেন। (পরোক্ষ উক্তি)।

**বাচ্য-পরিবর্তন** ॥ মহাশয়ের আসা ভালো হয় নাই (ভাববাচ্য)। মহাশয় আসিয়া ভালো করেন নাই (কর্তৃবাচ্য)। তাকে শিখালে খাইয়াছে (কর্তৃবাচ্য)। সে শিখাল কর্তৃক খাদিত হইয়াছে (কর্মবাচ্য)।

### ॥ আশ্রমের রূপ ও বিকাশ ॥

**সন্ধি** ॥ সংকল্প = সম্ + কল্প। ইতস্তত = ইতঃ + তত। নিরলংকৃত = নিঃ + অলম্ + কৃত। দিগন্ত = দিক্ + অন্ত। সংলগ্ন = সম্ + লগ্ন। তন্ত্ব = তৎ + ত্ব। গ্রন্থাগার = গ্রন্থ + আগার। চলচল = চল + অচল। নীরব = নিঃ + রব। নিভঙ্ক = নিঃ + ভঙ্ক। ভবন = ভো + অন। বিপেত্রনাথ = বিপ + ইন্দ্রনাথ। উপাধ্যায়ের = উপ + অধ্যায়ের। বিভাগয়ের = বিভা + আলয়ের। তপোবনে = তপঃ + বনে। চতুষ্পাঠীর = চতুঃ + পাঠীর। পরীক্ষিত = পরি + ঐক্ষিত। সন্ন্যাসী = সম্ + ত্যাসী। অধ্যাপনার = অধি + আপনার। সর্বাপেক্ষা = সর্ব + অপ + ঐক্ষা। অল্পজ্ঞ = অন্ + উৎ + জ্ঞ। প্রচ্ছন্ন = প্র + ছন্ন। নিঃসন্ধি = নিঃ + সম্ + দিহ। পরীক্ষা = পরি + ঐক্ষা। সত্যীশ = সত্যী + ঐশ। নিরন্ত = নিঃ + অন্ত। সঙ্করণ = সম্ + চরণ। সন্তোষের = সম্ + ভোগের। সংকীর্ণ = সম্ + কীর্ণ। অত্যাবশ্যকের = অতি + আবশ্যকের। জগদানন্দ = জগৎ + আনন্দ। সর্বতোভাবে = সর্বতঃ + ভাবে। নির্মমতা = নিঃ + মমতা। অন্তর্গত = অন্তঃ + গত। যথার্থ = যথা + অর্থ। প্রত্যক্ষ = প্রতি + অক্ষ। অকৃতার্থ = অকৃত + অর্থ। অমনোযোগী = অমনঃ + যোগী। নিবিচারে = নিঃ + বিচারে। সঙ্কয় = সম্ + চয়। আত্মোৎসর্গপরায়ণ = আত্ম + উৎসর্গপরায়ণ। সংশ্লিষ্ট = সম্ + শ্লিষ্ট। যথেষ্ট = যথা + ইষ্ট। কিঞ্চিৎ = কিম্ + চিৎ। পরীক্ষক = পরি + ঐক্ষক। একাত্মতা = এক + আত্মতা। আশ্চর্য = আ + চর্য। সম্পূর্ণতা = সম্ + পূর্ণতা। সংগতি = সম্ + গতি।

**কারক-বিভক্তি** ॥ সাহিত্য-চর্চা—কর্মে শূত্রবিভক্তি। সৌমানস—অধিকরণে ‘স’ বিভক্তি। মার্বেলপাথরে—করণে ‘এ’ বিভক্তি। চাষ—কর্তায় শূত্রবিভক্তি। গ্রন্থাগার—কর্মবাচ্যের কর্তায় শূত্রবিভক্তি। জলে—করণে ‘এ’ বিভক্তি। আশ্রম থেকে—অপাদানে ‘থেকে’ বিভক্তি। ছেলে—কর্মে শূত্রবিভক্তি। ছেলেদের কাছে—অপাদানে ‘এ’ বিভক্তি। বহু দুঃখে—করণে ‘এ’ বিভক্তি। তাঁদের—কর্ম-প্রবচনীয়বোগে ‘এর’ বিভক্তি। বয়সের—অধিকরণে ‘এ’ বিভক্তি। কিছুতে—কর্তায় ‘তে’ বিভক্তি। বেতন—কর্মে শূত্রবিভক্তি। ছাত্রদের (সেবার)—কর্ম-সম্বন্ধে ‘এর’ বিভক্তি। খ্যাতি-প্রতিপত্তি—কর্মে শূত্রবিভক্তি। রোগে, শোকে, অভাবে—অধিকরণে ‘এ’ বিভক্তি।

সমাল। পদ্মাতীরে—পদ্মার তীর—বগীতং; তাহাতে। সাহিত্যচর্চা—সাহিত্যের চর্চা—বগীতং। শান্তিনিকেতনের—শান্তি-পূর্ণ নিকেতন—মধ্যপ-কর্মধা। সারবাধা—সার দিয়ে বাধা—তৃতীয়াতং। মাধবীলতা-বিতানে—মাধবীর লতা—বগীতং; তাহার বিতান—বগীতং; তাহাতে। নিরলংকৃত—নয় অলংকৃত—নঞ-তং। রান্নাবাড়ি—রান্নার নিমিত্ত বাড়ি—চতুর্থীতং। একতলা—এক তল বাহার—বহরী। তত্ত্ববোধিনী—তত্ত্বের বোধ করায় যে (স্ত্রী)—উপপদতং। গ্রন্থাগার—গ্রন্থের নিমিত্ত আগার—চতুর্থীতং। ছায়াশূন্ত—ছায়ার দ্বারা শূন্ত—তৃতীয়াতং। রাজমাটি—রাঙা যে মাটি—কর্মধা, তাহার লোক-চলাচল—লোকের চলাচল—বগীতং। নীরব—নাই রব বাহার—নঞ-বহরী। নিঃস্বক—নিঃস্বরভাবে স্বক বাহা—নঞ-বহরী। প্রাণসার—প্রাণই সার বাহার—বহরী। দম্যবৃত্তির—দম্যর বৃত্তি, তাহার—বগীতং। অতিথি-ভবনের—অতিথিদের নিমিত্ত ভবন—চতুর্থীতং, তাহার। সতীক—স্ত্রীর সহিত বর্তমান—বহরী। দ্বিপেন্দ্রনাথ—দুইভাবে পান করে যে—উপপদতং; তাহাদের ইন্দ্র বগীতং, তাহার নাথ—বগীতং। জনবিরল—জন বিরল যেখানে—বহরী। তপোবনে—তপের নিমিত্ত বন—চতুর্থীতং, তাহাতে। চতুষ্পাণীর—চারি পাঠের সমাহার—দ্বিগু। নিত্যপ্রবাহিত—নিত্য ব্যাপিয়া প্রবাহিত—দ্বিতীয়াতং। দান-দক্ষিণা—দান ও দক্ষিণা। দেনা-পাওনার—দেনা ও পাওনা, তাহার। কর্মকর্তার—কর্মের কর্তা—বগীতং, তাহার। আত্মরক্ষা—আত্মকে রক্ষা—দ্বিতীয়াতং। অসাধ্য—নয় সাধ্য—নঞ-তং। জোড়াসাঁকো—জোড়া সাঁকো যেখানে—বহরী। অহুজ্জল—নয় উজ্জল—নঞ-তং। অসহিষ্ণু—নয় সহিষ্ণু—নঞ-তং। বিশ্ববিদ্যালয়ের—বিশ্ব (সকল) বিদ্যা—কর্মধা, তাহার আলয়—বগীতং, তাহার। আশ্বাসবাণী—আশ্বাসময়ী বাণী—মধ্যপ-কর্মধা। আত্মীয়স্বজনের—স্ব-র জন—বগীতং; আত্মীয় ও স্বজন—দ্বন্দ্ব, তাহার। সংসারযাত্রার—সংসারের যাত্রা বগীতং। ভাবরাজ্যে—ভাবরূপ রাজ্য—রূপক-কর্মধা, তাহাতে। প্রতিক্ষেপে—ক্ষেপে ক্ষেপে—অব্যয়ীভাব। রসভাণ্ডার—রসপূর্ণ ভাণ্ডার—মধ্যপ কর্মধা। আত্মভোলা—আত্মকে ভোলে যে—উপপদতং। সাহিত্য-সম্ভোগের—সাহিত্যকে সম্ভোগ দ্বিতীয়াতং, তাহার। অর্বাচীন—নয় প্রাচীন—নঞ-তং। গোপানশ্রেণীর—গোপানের শ্রেণী—বগীতং, তাহার। রসজ্ঞ—রসকে জ্ঞানেন যিনি—উপপদতং। অবগাহন-স্নান—অবগাহন যে স্নান—কর্মধা। দণ্ডবিধান—দণ্ডের বিধান—বগীতং। শাসনবিধি—শাসনের বিধি—বগীতং। অঙ্গুষ্ঠ—অঙ্গুরকে গত—দ্বিতীয়াতং। স্বার্থ—অর্থকে অতিক্রম না করিয়া—অব্যয়ীভাব। আত্মমর্দনা—আত্মার মর্দনা—বগীতং। প্রত্যক্ষ—অন্ধির সমীপে—অব্যয়ীভাব। অকৃতার্থ—নয় কৃতার্থ—নঞ-তং। অক্লান্ত—নঞ-ক্লান্ত—নঞ-তং। অমনোযোগী—নয় মনোযোগী—নঞ-তং। ভয়-জনক—ভয়কে জন্ম দেয় বাহা—উপপদতং। ধ্যাতি-প্রতিপত্তি—ধ্যাতি ও প্রতিপত্তি—দ্বন্দ্ব। স্বভাবসংগত—স্ব-র ভাব—বগীতং; সম্যকরূপে গত দ্বিতীয়াতং; স্বভাবকে সংগত দ্বিতীয়াতং। যথেষ্ট—ইষ্টকে অতিক্রম না করিয়া—অব্যয়ীভাব। কৃতার্থ—কৃত অর্থ বাহার—বহরী। প্রতিদিন—

দিন দিন—অব্যয়ীভাব। সাধনাক্ষেত্র—সাধনার ক্ষেত্র—ষষ্ঠীতৎ। প্রতিভাসম্পন্ন—  
প্রতিভার দ্বারা সম্পন্ন—তৃতীয়াতৎ। শিল্পশিক্ষা—শিল্পকে শিক্ষা—ষিথীয়াতৎ।  
অনুভূতি—বৃত্তির পশ্চাৎ—অব্যয়ীভাব।

**প্রকৃতি-প্রত্যয়।** আশ্রম—আ-শ্রম্ + ঘঞ্ [অধিকরণ বা]। বিকাশ—বি-  
কাশ্ + ঘঞ্ + ভাববা [ভাববা]। সৃষ্টি—সৃজ্ + ক্তি [ভাববা]। সংকল্প—সম্-কপ্ +  
ঘঞ্ [ভাববা]। পরিধি—পরি-ধা + ই [কর্মধা]। দক্ষিণ—দক্ষ্ + ইন।  
মাধবী—মধু + ষ + ঙৈ [স্ত্রী]। বিতান—বি-তন্ + ঘঞ্ [কর্মধা]। প্রবেশ—প্র-  
বিশ্ + ঘঞ্ [ভাববা]। প্রাচীন—প্রাচ্ + ঙৈন। ছাতিম—ছাতি + ম [সাদৃশ্যে]।  
নিরলংকৃত—নিঃ-অলম্-কৃ + ক্ত [কর্মধা]। আড়াল—আড় + আল। সংলগ্ন—  
সম্-লস্ + ক্ত [কর্মধা]। তত্ত্ববোধিনী—তৎ + ব্ + বুধ্ + অনট্ + ইনী [স্ত্রী]।  
বর্তমান—বৃৎ + শানচ্। মলিনতা—মলিন + তা। আহাৰ্ঘ—আহার + ষ্য।  
বিস্তার—বি-স্তৃ + ঘঞ্ [ভাববা]। আরম্ভ—আ-রম্ভ্ + ঘঞ্ [ভাববা]। বিরাজ—  
বি-রজ্ + ঘঞ্ [ভাববা]। নিস্তক্ক—নিঃ-স্তনুভ + ক্ত [কর্তৃবা]। বৃষ্টি—  
বৃৎ + ক্তি [ভাববা]। নিদর্শন—নি-দৃশ্ + অনট্ [ভাববা]। আশ্রয়—  
আ-শ্রি + ঘঞ্ [অধিকরণবা]। প্রয়োজন—প্র-যুজ্ + অনট্ [ভাববা]। আধুনিক—  
অধুনা + ষিক। অবলম্বন—অব-লম্ব্ + অনট্ [করণ বা]। সামাজিক—  
সমাজ + ষিক। দক্ষিণা—দক্ষিণ + আ। অস্তিত্ব—অস্তি + ত্ব। কীর্ণ—কি + অনট্।  
আর্থিক—অর্থ + ষিক। নির্ভর—নিবৃ-ভৃ + ঘঞ্ [করণবা]। প্রচলিত—প্র-চল্ +  
ক্ত [কর্মধা]। পরীক্ষিত—পরি-ঈক্ষ্ + ক্ত [কর্মধা]। সম্যাসী—সম্যাস + ইন।  
অধ্যাপনা—অধি-ই + গিচ্ + অনট্ + আ। তরুণ—তৃ + উন। আসন্ন—আ-সদ্ + ক্ত।  
বিস্তারিত—বি-স্তৃ + গিচ্ + ক্ত [কর্মধা]। বিশ্লেষণ—বি-ল্লি + অনট্ [কর্মধা]।  
প্রবৃত্ত—প্র-বৃৎ + ক্ত [কর্মধা]। অসামান্যতা—অসামান্য + তা। প্রচ্ছন্ন—প্র-চ্ছদ্ + ক্ত  
[কর্মধা]। নিঃসন্ধি—নিঃ-সম্ + দিহৃ + ক্ত [কর্মধা]। অসহিষ্ণু—নঞ-সহ্ + ইষ্ণু।  
সৌম্য—সোম + ষ্য। স্বীকার—স্ব-অভূততন্ভাবে চি + কৃ + ঘঞ্। প্রসন্ন—  
প্র-সদ্ + ক্ত [কর্তৃবা]। মুখর—মুখ + র। ভবিষ্যৎ—ভৃ + স্তৃহৃ [কর্তৃবা]।  
উজ্জল—উৎ-জল্ + ঘঞ্ [ভাববা]। দীপ্তি—দীপ্ + ক্তি [ভাববা]। আশ্রান  
—আ-হ্রৈ + অনট্ [ভাববা]। জীবিকা—জীব্ + ক + আ। বোগ—যুজ্ +  
ঘঞ্। পরীক্ষা—পরি-ঈক্ষ্ + ঘঞ্ + আ। নিরস্ত—নিঃ-অস্ + ক্ত। দারিদ্র্য—  
দরিদ্র + ষ্য। অবহেলা—অব-হেড়্ + ঘঞ্ + আ। মাসিক—মাস + ষিক।  
পরিধেয়তা—পরিধেয় + তা। জীর্ণ—জৃ + ক্ত। রাজ্য—রাজন্ + ষ্য। সঞ্চার—  
সম্-চর + অনট্ [ভাববা]। ভাণ্ডার—ভাণ্ড + আর। মাহুয—মহু (+ য) + ষ।  
সাহিত্য—সহিত + ষ্য। সন্তোগ—সম্-ভুজ্ + ঘঞ্। আবাদন—আ-বদ্ + অনট্।  
অভিনিবেশ—অভি-নি-বিশ্ + ঘঞ্। অর্ধাচীন—নঞ-প্রাচ্ + ঙৈন। কোজো—  
কাজ + ও [ < উয়া]। নৈপুণ্য—নিপুণ + ষ্য। মাল্টারি—মাল্টার + ই। সাধক—  
সাধ + অক। খাণ্ড—খাদ্ + যৎ। অবগাহন—অব-গাহ্ + অনট্ [ভাববা]।  
গভীরতা—গভীর + তা। অনিবার্হ—নঞ-নি-বারি + যৎ। শাসন—শাস্ + অনট্।

অতিক্রম—অতি-ক্রম্ + ঘঞ্। উদার—উৎ-আ-ধ + ঘঞ্ (কর্তৃবা)। মুক্তি—মুচ্ + ক্তি। মৃত্যু—মৃ + ত্যা (ভাববা)। বেদনা—বিদ্ + অনট্ (ভাববা) + আ। পরিচয়—পরি-চি-ঘঞ্ (ভাববা)। প্রেরিত—প্র-ঈব্ + শিচ্ + ক্ত (কর্মবা)। বৈজ্ঞানিক—বিজ্ঞান + ষিক। প্রবন্ধ—প্র-বন্ধ্ + ঘঞ্। প্রাঞ্জল—প্র-অনজ্ + অল। প্রদ্বা—প্রৎ + ধা + অ (ভাববা) + আ। আকৃষ্ট—আ-কৃষ্ + ক্ত (কর্মবা)। সাংসারিক—সংসার + ষিক। জমিদারি—জমিদার + ই। নিযুক্ত—নি-যুক্ত্ + ক্ত (কর্মবা)। কুপণতা—কুপণ + তা। আমন্ত্রণ—আ-মন্ত্র + অনট্ (ভাববা)। পরিমাণ—পরি-মা + অনট্ (ভাববা)। উপলক্ষ—উপ-লক্ষ্ + ঘঞ্। নির্মমতা—নিঃ-মম + তা। নিষ্ঠুরতা—নিষ্ঠুর + তা। অকার্পণ্য—অকুপণ + য্য। স্বাতন্ত্র্য—স্বতন্ত্র + য্য। আঘাত—আ-হন্ + ঘঞ্। অমনোযোগী—অমনোযোগ + ইন্। ভর্ৎসনা—ভর্ৎস + অনট্ + আ। প্রতিবাদ—প্রতি-বদ্ + ঘঞ্। উৎসর্গ—উৎ-সর্জ্ + ঘঞ্। যোগ্যতা—যোগ্য + তা। ঔদাসীন্য—ঔদাসীন + য্য। স্থপতি—স্থা + গিচ্ + তি। পারমার্থিক—পরমার্থ + ষিক। আশ্চর্য—আ-চর্ + যৎ। বিশিষ্টতা—বিশিষ্ট + তা। উপকরণ—উপ-কৃ + অনট্। সামঞ্জস্য—সমঞ্জস্ + য্য। পুণ্ড্রতন—পুন্ + তন। পরিবর্তমান—পরি-বৃৎ + শানচ্। সম্পূর্ণতা—সম্পূর্ণ + তা। আক্ষেপ—আ-ক্ষিপ্ + ঘঞ্।

লিঙ্গান্তর ॥ মাধবী—মাধব। রক্ষী—রক্ষিণী। বৃদ্ধ—বৃদ্ধা। সর্দার—সর্দারী। অহুচর—অহুচরী। পরিচর—পরিচারিকা। প্রাচীন—প্রাচীনা। গুরু—গুরী। গুরুপত্নী। শিষ্য—শিষ্যা। খৃষ্টান—খৃষ্টানী। সন্ন্যাসী—সন্ন্যাসিনী। তরুণ—তরুণী। যুবক—যুবতী। কবি—মহিলা-কবি। মাহুষ—মাহুষী। ছেলে—মেয়ে। শিক্ষক—শিক্ষিকা। সাধক—সাধিকা। ছাত্র—ছাত্রী। অগ্রগণ্য—অগ্রগণ্যা। নিপুণ—নিপুণা। পরীক্ষক—পরীক্ষিকা।

পদ-পরিবর্তন ॥ আশ্রম (বি)—আশ্রমিক (বিণ)। স্রষ্টি (বি)—স্রষ্ট (বিণ)। দীর্ঘ (বিণ)—দৈর্ঘ্য, দীর্ঘতা (বিণ)। প্রাচীন (বিণ)—প্রাচীনতা (বি)। মাঠ (বি)—মেঠো (বিণ)। সংগ্রহ (বি)—সংগৃহীত (বিণ)। প্রশস্ত (বিণ)—প্রশস্ততা (বি)। স্থাপিত (বিণ)—স্থাপন (বি)। বিদ্বত (বিণ)—বিস্তর, বিদ্বতি (বি)। শহর (বি)—শহরে (বিণ)। মলিনতা (বি)—মলিন (বিণ)। নীরব (বিণ)—নীরবতা, (বি)। নিস্তরু (বি)—নিস্তরুতা (বিণ)। ঋজু (বিণ)—ঋজুতা, আর্জব (বিণ)। দেহ (বি)—দৈহিক (বিণ)। ছেলে (বিণ)—ছেলেমি (বিণ)। অতিথি (বিণ) আতিথ্য (বি)। আশ্রয় (বি)—আশ্রিত (বিণ)। শাস্ত (বিণ)—শাস্তি (বি)। জনবিরল (বিণ)—জনবিরলতা (বি)। আরম্ভ (বি)—আরম্ভ (বিণ)। প্রয়োজন (বি)—প্রয়োজনীয় (বিণ)। সামাজিক (বি)—সামাজিকতা (বি)। ক্ষীণ (বিণ)—ক্ষীণতা (বি)। নির্ভর (বিণ)—নির্ভরতা (বি)। দুঃখ (বি)—দুঃখী, দুঃখিত (বিণ)। পরীক্ষিত (বিণ)—পরীক্ষা (বি)। শিষ্য (বিণ)—শিষ্যত্ব (বি)। সন্ন্যাসী (বিণ)—সন্ন্যাস (বি)। তরুণ (বিণ)—তারুণ্য (বি)। অহুকূল (বিণ)—আহুকূল্য (বি)। প্রবৃত্ত (বিণ)—প্রবৃত্তি (বি)।

অসামান্যতা (বি)—অসামান্য (বিণ)। প্রচ্ছন্ন (বিণ)—প্রচ্ছন্নতা (বি)।  
 নিঃসন্ধি (বিণ)—নিঃসন্দেহ (বি)। অসহিষ্ণু (বিণ)—অসহিষ্ণুতা (বি)।  
 প্রসন্ন (বিণ)—প্রসন্নতা (বি)। মুগ্ধ (বিণ)—মুগ্ধতা (বি)। উজ্জ্বল (বিণ)  
 উজ্জ্বলতা, উজ্জ্বল্য (বি)। আহ্বান (বি)—আহূত (বিণ)। নিরস্ত (বিণ)—  
 নিরসন (বি)। দারিদ্র্য (বি)—দরিদ্র (বিণ)। অবহেলা (বি)—অবহেলিত  
 (বিণ)। অস্বীকার (বি)—অস্বীকৃত (বিণ)। সঞ্চরণ (বি)—সঞ্চারিত (বিণ)।  
 আশ্বাদন (বি)—আশ্বাদিত (বিণ)। অভিনিবেশ (বি)—অভিনিবিষ্ট (বিণ)।  
 নৈপুণ্য (বি)—নিপুণ (বিণ)। অবগাহন (বি)—অবগাঢ় (বিণ)। স্নান (বি)—  
 স্নাত (বিণ)। অতিক্রম (বি)—অতিক্রান্ত (বিণ)। পরিচয় (বি)—পরিচিত (বিণ)।  
 প্রাঞ্জল (বিণ)—প্রাঞ্জলতা (বি)। বৈজ্ঞানিক (বিণ)—বিজ্ঞান (বি)। শ্রদ্ধা (বি)  
 —শ্রদ্ধেয় (বিণ)। আকৃষ্ট (বিণ)—আকর্ষণ (বি)। সাংসারিক (বিণ)—সংসার  
 (বি)। নিযুক্ত (বিণ)—নিয়োগ (বি)। আমন্ত্রণ (বি)—আমন্ত্রিত (বিণ)।  
 পরিমাণ (বি)—পরিমিত (বিণ)। স্বভাব (বি)—স্বাভাবিক (বিণ)। কুপণতা  
 (বি)—কুপণ (বিণ)। নির্মমতা (বি)—নির্মম (বিণ)। নিষ্ঠুরতা (বি)—নিষ্ঠুর  
 (বিণ)। বর্ষণ (বি)—বর্ষিত (বিণ)। অকার্পণ্য (বি)—অকুপণ (বিণ)।  
 পরিচয় (বি)—পরিচিত (বিণ)। স্বাতন্ত্র্য (বি)—স্বতন্ত্র (বিণ)। অকৃতার্থ (বিণ)  
 —অকৃতার্থতা (বি)। আঘাত (বি)—আহত (বিণ)। অমনোযোগী (বিণ)—  
 অমনোযোগিতা (বি)। অতিশয় (বিণ)—আতিশয়া (বি)। ভৎসনা (বি)—  
 ভৎসিত (বিণ)। অধিকার (বি)—অধিকৃত (বিণ)। সাহিত্য (বি)—সাহিত্যিক  
 (বিণ)। দর্শন (বি)—দার্শনিক (বিণ)। নির্লিপ্ত (বিণ)—নির্লিপ্তি (বি)।  
 সংকীর্ণ (বিণ)—সংকীর্ণতা (বি)। উদাসীন (বি)—উদাসীন (বিণ)। স্বীকার  
 (বি)—স্বীকৃত (বিণ)। নিপুণ (বিণ)—নিপুণতা, নৈপুণ্য (বি)। সন্দেহ (বি)—  
 সন্ধি (বিণ)। সংগত (বিণ)—সংগতি (বি)। সমাপ্ত (বিণ)—সমাপ্তি (বি)।  
 পারমার্থিক (বিণ)—পরমার্থ (বি)। একান্ততা (বি)—একান্ত (বিণ)। বদান্ততা  
 (বি)—বদান্ত (বিণ)। বিচিত্র (বিণ)—বৈচিত্র্য (বি)। প্রেরণা (বি)—  
 প্রেরিত (বিণ)। সমর্থ (বিণ)—সামর্থ্য (বি)। পরিবর্তমান (বিণ)—  
 পরিবর্তমানতা (বি)।

সার্থক বাক্যরচনা। সাহিত্যচর্চা—শৈশবে আমরা কয় বন্ধুতে মিলে  
 সাহিত্যচর্চা করতুম। সারবীধা—আমাদের বাড়ির সামনে ছিল সারবীধা দীর্ঘ  
 স্থপারির গাছ। মাধবীলতা বিতানে—বসন্ত সমাগমে মাধবীলতা বিতানে  
 মৌমাছদের আনাগোনা শুরু হইয়া গেল। চতুষ্পাঠী গ্রামে ছিল সংস্কৃত শিক্ষার  
 একটা চতুষ্পাঠী। অনুজ্ঞালভাবে—যেহা অ'কাশ হইতে ধুবই অনুজ্ঞালভাবে আলো  
 আসিয়া মাটিতে পড়িয়াছিল। স্বভাব-সংগত—সকলকে বিশ্বাস করাই ছিল তাহার  
 স্বভাব-সংগত বৈশিষ্ট্য। পারমার্থিক—ভারতবর্ষ চিরকাল পারমার্থিক কল্যাণকে সব  
 • কিছুই উপরে স্থান দিয়াছে। বস্তুত—বস্তুত, বিদ্যাশাগর ছিলেন উদার মানবপ্রেমিক।

## । বাগ্মাদিতা ।

সন্ধি ॥ দাবানলের = দাব + অনলের । নির্জন = নিঃ + জন । দ্রবন্ত = দ্রঃ + অন্ত । পুরোহিত = পুরঃ + হিত । নিশ্চিন্ত = নিঃ + চিন্ত । নগেন্দ্র = নগ + ইন্দ্র । বৃগাস্ত্রের = যুগ + অন্ত্রের । মহর্ষি = মহা + ঋষি । তেজোময় = তেজঃ + ময় । আশীর্বাদ = আশিস্ + বাদ । পবিত্র = পু + ইত্র । উজ্জল = উৎ + জল । মনোহর = মনঃ + হর । নির্ভয়ে = নিঃ + ভয়ে । আশ্চর্য = আ + চর্য । অভ্যর্থনা = অভি + অর্থনা । বজ্রাহতের = বজ্র + আহতের । ষড়যন্ত্র = ষট্ + যন্ত্র । রাজচ্ছত্র = রাজ + ছত্র । সিংহাসন = সিংহ + আসন । নির্দোষ = নিঃ + দোষ । জন্মাবধি = জন্ম + অবধি । দিগ্বিজয়ী = দিব্ + বিজয়ী । রাজ্যোৎসব = রাজ্য + উৎসব । সরোবর = সরঃ + বর ।

কারক-বিভক্তি ॥ শিকারে—নিমিত্তে ‘এ’ বিভক্তি । বজ্রমের—করণে ‘এ’ বিভক্তি । খোঁচায়—করণে ‘য’ বিভক্তি । ভাগ্য-পোষে—হেতুর্থে ‘এ’ বিভক্তি । ধৈর্যের—অভেদ-সম্বন্ধে ‘এর’ বিভক্তি । প্রাণ-ভয়ে—অপাদানে ‘এ’ বিভক্তি । বজ্রমহাতে—উপলক্ষণে ‘এ’ বিভক্তি । সোনার (চাবি)—উপাদান-সম্বন্ধে ‘র’ বিভক্তি । পাথরে—করণে ‘এ’ বিভক্তি । রক্তের—করণে ‘এর’ বিভক্তি । বাগ্মাকে (ভয়)—অপাদানে ‘কে’ বিভক্তি । বাঁশি—কর্মে শূত্রবিভক্তি । সকলে—কর্তায় ‘এ’ বিভক্তি । হীরের—উপাদান-সম্বন্ধে ‘এর’ বিভক্তি । পাথরের—উপাদান-সম্বন্ধে ‘এর’ বিভক্তি । সোনার (রোদে)—অভেদ-সম্বন্ধে ‘র’ বিভক্তি । গ্রাম, দেশ, শীত—কর্মে শূত্রবিভক্তি । মাটির (দেয়াল)—উপাদান-সম্বন্ধে ‘র’ বিভক্তি । লোকে—কর্তায় ‘এ’ বিভক্তি । হিংসার—অভেদ-সম্বন্ধে ‘র’ বিভক্তি । আগুনে—করণে ‘এ’ বিভক্তি । দুই চক্ষে—অপাদানে ‘এ’ বিভক্তি । অত্যাচারে—হেতুর্থে ‘এ’ বিভক্তি । আমার—অপাদান-সম্বন্ধে ‘র’ বিভক্তি । স্ত্রোতায়—করণে ‘য’ বিভক্তি । মহাবিশ্বয়ে—ক্রিয়াবিশেষণে ‘এ’ বিভক্তি । আলোয়—করণে ‘য’ বিভক্তি । চিতোর—অধিকরণে শূত্রবিভক্তি ।

সমাস ॥ রাজপুত—রাজার পুত—বগীতং । পাহাড়ে পাহাড়ে, বনে-বনে—অলুকৃতং । দাবানলের—দাবের (অরণ্যের) অনল—বগীতং ; তাহার । রক্তপাত—রক্তকে পাত—দ্বিতীয়াতং । দুর্ভিক্ষের—ভিক্ষার অভাব—অব্যয়ীভাব ; তাহার । আশ্রয়হীন—আশ্রয়ের দ্বারা হীন—তৃতীয়াতং । ভিল-প্রজা—যে ভিল, সেই প্রজা—কর্মধা । কাপুুষ—কু যে পুুষ—কর্মধা । মহারাজা—মহৎ যে রাজা—কর্মধা ( শুদ্ধ—মহারাজ ) । রাজহতী—হতীমের রাজা—বগীতং । রাজমহিষী—রাজার মহিষী—বগীতং । মহারানী—মহতী যে রানী—কর্মধা । স্বর্ঘদেব—যিনি স্বর্ঘ, তিনিই দেব—কর্মধা । মহাবিপদে—মহৎ যে বিপদ—কর্মধা ; তাহাতে । রাজপুরোহিতেন্দ্র—রাজার পুরোহিত—বগীতং ; তাঁহার । পূর্বপুুষ—পূর্ব যে পুুষ—কর্মধা । মা হারান্না—মা হারাইয়াছে যে—উপপদতং । ত্রিকূট—ত্রি কূটের সমাহার—কিঙ । আগাপোড়া—আগা হইতে গোড়া পর্যন্ত—অব্যয়ীভাব । প্রতিদিন—দিন দিন—অব্যয়ীভাব । সারারাত্রি—সারা যে রাত্রি—কর্মধা । হরিণ ছানা-হরণ করে যে—উপপদতং ;



তাহার ছানা—যগীতং। সজল—জলের সহিত বর্তমান—বহরী। ঝুলন-পূর্ণিমা—ঝুলনের অন্ত পূর্ণিমা—চতুর্থীতং। যুগান্তরের—অন্ত যুগ—নিত্যসমাস; তাহার। রাখাল-বাজা—যে রাখাল, সেই রাজা কর্মধা। সমান—মানের সহিত বর্তমান—বহরী। মহর্ষি—মহৎ ঋষি- কর্মধা। আশীর্বাদ—আশিস্ মিশ্রিত বাদ—মধ্যপ-কর্মধা। দীর্ঘজীবী—দীর্ঘ জীবিত থাকে যে—উপপদতং। মহাপ্রস্থানের—মহৎ যে প্রস্থান—কর্মধা; তাহার। গুপ্তচর—গুপ্তভাবে চরে যে—উপপদতং। রাজ-সিংহাসন—সিংহ চিহ্নিত আসন—মধ্যপ-কর্মধা; রাজার সিংহাসন—যগীতং। গোন্ধর গাড়িতে—গোন্ধর গাড়ি—অনুকৃতং; তাহাতে। চির-বিশ্বাসী—চির ব্যাপিয়া বিশ্বাসী—দ্বিতীয়াতং। শুভক্লেণে—শুভ যে ক্লেণ—কর্মধা; তাহাতে। যুদ্ধক্ষেত্রে—যুদ্ধের নিমিত্ত ক্ষেত্র—চতুর্থীতং; তাহাতে। বাসস্থান—বাসের নিমিত্ত স্থান—চতুর্থীতং। জন্মাবধি—জন্ম হইতে—অব্যয়ীভাব। মহাবিশ্বয়ে—মহৎ বিশ্বর—কর্মধা; তাহাতে। প্রাণহন্তা—প্রাণকে হত্যা করিয়াছে যে—উপপদতং। পিতৃহত্যা—পিতাকে হত্যা দ্বিতীয়াতং। জলশূন্য—জলের দ্বারা শূন্য—তৃতীয়াতং। সূর্যকুণ্ড—সূর্যের নিমিত্ত কুণ্ড—চতুর্থীতং। সূর্যপূজা—সূর্যকে পূজা—চতুর্থীতং। শয়ন-মন্দিরে—শয়নের নিমিত্ত মন্দিরে—চতুর্থীতং। ঝুলন-গান—ঝুলনের নিমিত্ত গান—চতুর্থীতং। দোয়া লেখা—দোয়া লেখা বাহাতে—বহরী। ইহলোকে—ইহ যে লোক—কর্মধা; তাহাতে।

**প্রকৃতি-প্রত্যয়।** সাহস—সাহস + অ (ভাববা)। সহ—সহ + যৎ (কর্মবা)। আশ্রয়—আ-শ্রি + অ (ভাববা)। বৎসর—বস্-স্র + অ (অধিকরণবা)। ঘাতক—হন্ + অক (কর্তৃবা)। অপমান—অপ-মা + অনট্ (ভাববা)। আরম্ভ—আ-রভ্ + অ (ভাববা)। সম্ভট—সম্-ভৃ + ক্ত (কর্তৃবা)। ধৈর্য—ধীর + ঋ (ভাববা)। সামান্য—সমান + ঋ (ভাব)। নিষ্ঠুর—নি-স্থ + উর (কর্তৃবা)। নৃত্য—নৃত্ + যৎ (ভাব)। শিখর—শিখা + র। হরিশ্চন্দ্র—হ্র + ইন (কর্তৃবা)। সিংহ—হিন্ + অ (কর্তৃবা)। নগর—নগ + র। হস্তী—হস্ত + ইন্ (অস্ত্যার্থে)। প্রকাণ্ড—প্র-কম্ + পিচ্ + ড (কর্মবা)। অঙ্ককার—অঙ্ক-কৃ + অ। সমুদ্র—সম্-উন্ + র (কর্তৃবা)। সন্ধ্যা—সন্-ধৈ + অ + আ। সুন্দর—সুন্ + অর (কর্তৃবা)। অস্ত্র—অস্ + ত্র (কর্মবা)। সূর্য—সুর + যৎ (কর্তৃবা)। অস্ত—অস্ + ক্ত (অধিকরণবা)। রাজি—রা + ঞ্জি (কর্তৃবা)। ভয়ানক—ভী + আনক। ব্যস্ত—বি-অস্ + ক্ত (ভাববা)। মানব—মহ্ + ঋ (অপত্যার্থে)। জিজ্ঞাসা—জ্ঞা + সন্ + অ (ভাববা) + আ। ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মণ্ + অ। পুত্র—পুং-ত্রে + অ (কর্তৃবা)। বিদ্রোহী—বি-দ্রহ্ + অ (ভাববা) + ইন্। রাজস্ব—রাজন্ + স্ব। অরণ্য—ঋ + অন্ত। রাখাল—রাখ্ + আল (জীবিকার্থে)। লড়াই—লড়্ + আই। শ্রাবণ—শ্রাবণী + অ। ঘাস—ঘস্ (> ঘন্) + অ (ভাববা)। পূর্ণিমা—পূর্ণিমা + অ (কর্তৃবা) + আ। বিদ্যুৎ—বি-দ্যুৎ + ক্টিপ্ (কর্তৃবা)। তেজোময়—তেজঃ + ময়ট্ (উপাদান অর্থে)। ধ্যান—ধৈ + অনট্ (ভাববা)। স্থির—স্থা + ইর (কর্তৃবা)। গাঢ়—গাহ্ + ক্ত (কর্তৃবা)। প্রণাম—প্র-ণম্ + অ (ভাববা)। অঞ্জলি—অন্জন্ + অলি (করণবা)। পান—পা + অনট্ (ভাববা)। আশীর্বাদ—

আশিস্-বদ্ + অ (ভাববা)। দীর্ঘজীবী—দীর্ঘ (দ্রাঘ্ + অ) + জীব্ + ইন্। পৃথিবী—  
পৃথু + ঙ্ (কর্তৃবা)। পবিত্র—পু + ইত্ৰ (কর্তৃবা)। প্রস্তুত—প্র-স্তু + ত্ত (কর্তৃবা)।  
পালক—পাল্ + অক (কর্তৃবা)। মনোহর মনস্-হ + অ (কর্তৃবা)। রাজধানী—  
রাজন্-ধা + অনট্ (অধিকরণবা) + ঙ্। শস্ত্র—শস্ + ত্র (করণবা)। সৈন্ত—সেনা +  
স্ত্য। মন্দির—মন্দ্ + ইর (অধিকরণবা)। আশ্চর্য—আ-শ্চ-চব্ + য্ (কর্মবা)।  
ভিখারী—ভিখ্ + আরী। বীরত্ব—বীর + ত্ব (ভাবার্থে)। নিষ্ঠুর—নি-স্থা + উর  
(কর্তৃবা)। মুর্ছিত—মূচ্ + ত্ত (কর্তৃবা)। সাহস—সহস্ + অ। বিশ্বয়—বি-শ্বি +  
অ (ভাববা)। সীমা—সি + ইমন্ (কর্তৃবা)। প্রজা—প্র-জন্ + অ (কর্তৃবা)। ক্ষুদ্র—  
ক্ষদ্ + ত্ত (কর্মবা)। শত্রুতা—শত্রু + তা (ভাবার্থে)। ভীষণ—ভী + শিচ্ + অনট্  
(কর্তৃবা)। পরামর্শ—পর্য-ম্শ্ + অ (ভাববা)। দুষ্ট—দুষ্ + ত্ত (কর্তৃবা)। দীন  
—দী + ত্ত (কর্তৃবা)। হীন—হা + ত্ত (কর্মবা)। প্রচলিত—প্র-চল্ + ইত। পণ্ডিত  
—পণ্ড + ইতচ্। অভ্যাস—অভি-অস্ + অ (ভাববা)। গম্ভীর—গম্ + ঙ্গৈর  
(অধিকরণবা)। জ্যোৎস্না—জ্যোতিস্ + ন + অ। পিতৃ-হস্তা—পিতৃ-হন্ + ত্ (কর্তৃবা)।  
উপযুক্ত—উপ-যুক্ত্ + ত্ত (কর্মবা)। পিতৃহত্যা—পিতৃ-হন্ + কাপ্ (ভাববা) + আপ্।  
আত্মীয়—আত্মন্ + ঙ্গৈয়। বর্ধ—হন্ + অ (ভাববা)। ব্রত—বৃ + অত (কর্মবা)।  
শ্রান্ত—শ্রম্ + ত্ত (কর্তৃবা)। নিস্তব্ধ—নি-স্তন্ড্ + ত্ত (কর্তৃবা)। প্রাসাদ—প্র-অ-  
সদ্ + অ (অধিকরণবা)। শয়ন—শী + অনট্ (ভাববা)। বিশ্রাম—বি-শ্রম্ + অ  
(ভাববা)। দক্ষিণ—দক্ষ + ইন (কর্তৃবা)। ঐশ্বর—ঐশ্ + বর (কর্তৃবা)। নিঃশাস  
—নিঃ-শস্ + অ (ভাববা)। রাজ্য—রাজন্ + ক্ষ্য। স্তব—স্তব্ + অ (ভাববা)।

**লিঙ্গান্তর** ॥ রাজা—রানী। মহারাজ—মহারানী। দুঃখী—দুঃখিনী। দাস—  
দাসী। ভিল—ভিলনী। হস্তী—হস্তিনী। মহিষী (প্রধানা রানী)—নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ।  
রাজকুমার—রাজকুমারী। রাজপুত্র—রাজকন্যা। রাজপুত—রাজপুতানী। ভগবান—  
ভগবতী। বিধবা—নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ। ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণী। সখা—সখী। রাজনন্দন—  
রাজনন্দিনী। নবাব—বেগম। ভব ভবানী। মুসলমান—মুসলমানী। সর্দার—  
সর্দারনী। বিদ্রোহী—বিদ্রোহিনী। ভিখারী—ভিখারিণী। নবাবজাদা—নবাবজাদী।  
সন্ন্যাসী—সন্ন্যাসিনী।

**পদ-পরিবর্তন** ॥ স্বন্দর (বিণ)—সৌন্দর্য (বি)। অত্যাচার (বি)—অত্যাচারী  
(বিণ)। বিশ্বাসঘাতক (বিণ)—বিশ্বাসঘাতকতা (বি)। পরিপূর্ণ (বিণ)—  
পরিপূর্ণতা (বি)। সন্তুষ্ট (বিণ)—সন্তোষ (বি)। ধৈর্য—(বি)—ধীর (বিণ)।  
ব্যস্ত (বিণ)—ব্যস্ততা (বি)। বিদ্যুৎ (বি)—বৈদ্যুতিক (বিণ)। ঋষি (বি)—  
আর্ষ (বিণ)। স্থির (বিণ)—স্থিরতা, স্থৈর্য (বি)। মলিন (বিণ)—মলিনতা,  
মালিন্য (বি)। বিদেশ (বি)—বিদেশী, বৈদেশিক (বিণ)। উপস্থিত (বিণ)—  
উপস্থিতি (বি)। প্রস্তুত (বিণ)—প্রস্তুতি (বি)। পুরোহিত (বিণ)—পৌরোহিত্য  
(বি)। উজ্জল (বিণ)—উজ্জল্য (বি)। শীত (বিণ)—শৈত্য (বি)। শরীর  
(বি)—শারীরিক (বিণ)। বিশ্বয় (বি)—বিশ্বিত (বিণ)। সীমা (বি)—

সীমিত (বিণ)। কৃতজ্ঞতা (বি)—কৃতজ্ঞ (বিণ)। নিষ্ঠুর (বিণ)—নিষ্ঠুরতা (বি)।  
পণ্ডিত (বিণ)—পাণ্ডিত্য (বি)। বৃদ্ধ (বিণ)—বার্ধক্য (বি)। সন্ধ্যা (বি)—  
সান্ধ্য (বিণ)। প্রফুল্ল (বিণ)—প্রফুল্লতা (বি)। পৃথিবী (বি)—পাথিব (বিণ)।  
দক্ষিণ (বিণ)—দাক্ষিণ্য (বি)।

**সার্থক বাক্য-রচনা ॥ দাবানল—**সংবাদটি দেশময় দাবানলের মতো ছড়াইয়া পড়িল। **কর্ণপাত—**আপনি আমার কথায় কর্ণপাত করিলে এই দুর্ঘটনা এড়ানো যাইত। **মহাবিপদে—**তোমার কথা না শুনিয়া আমি মহাবিপদে পড়িয়াছিলাম। **ভেজোময়—**সেই ভেজোময় গিরিশৃঙ্গকে ধ্যানমগ্ন ঋষি বলিয়া ভ্রম হইতেছিল। **দীর্ঘজীবী—**গুরু শিষ্যকে আশীর্বাদ করিলেন, “দীর্ঘজীবী হও”। **জয়জয়কার—**সে জাতীয় প্রক্কার পাইয়াছে; এখন তো তাহার জয়জয়কার। **বজ্রাহত—**দুঃসংবাদটি শুনিয়া তিনি বজ্রাহতের মতো দাঁড়াইয়া রহিলেন।

**সাধুভাষায় পরিবর্তন ॥** ১. ‘তুষের আগুন যেমন প্রথমে...জলে উঠল’। ১১০ পৃ.—তুযানল যেমন প্রথমে ধিকিধিকি, শেষে সহসা ধুধু করিয়া জলিয়া উঠে তেমনই গোহের পর হইতে রাজপুতদিগের উপর ভিলদিগের ক্রোধ ক্রমে অল্পে অল্পে বৃদ্ধি পাইতে পাইতে একদিন দাউ দাউ করিয়া পর্বতে পর্বতে, অরণ্যে অরণ্যে দাবানলের মতো জলিয়া উঠিল। ২. ‘তখন ভোর হয়েছে, মেলা-শেষে মলিন মূখে যে যার ঘরে ফিরছে, বাপ্পা সেই যাত্রীদের সঙ্গে ফিরলেন।’ ১২৪ পৃ.—তখন প্রভাত হইয়াছে, মেলাক্ষে মলিন বদনে যে যাহার গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেছে, বাপ্পা সেই যাত্রীদের সহিত গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ৩. ‘কিছুদিন পরেই বাপ্পাকে... উপস্থিত হলেন।’ ১২৪ পৃ.—কিছু দিবস পরেই বাপ্পাকে নগেন্দ্রনগর পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইল। ঝুলন-পুণিমায় ক্রীড়াচ্ছলে উভয়ের বিবাহ হইবার পর বিদেশ হইতে রাজকুমারীর বিবাহের সন্ধান লইয়া অনেক ব্রাহ্মণ রাজসভায় উপস্থিত হইলেন।

**উক্তি-পরিবর্তন ॥** ‘অনেক কাদাকাটার পর ভিলনীদিদি...কেমন-কেমন করে যে।’ ১২৫ পৃ.—(প্রত্যক্ষ উক্তি)—অনেক কাদাকাটার পর বাপ্পাকে কল্প স্বরে বললেন যে, সে যদি যাবেই তবে সে যেন তার ছই ভাই—বালিয় ও দেবকে সাথে নেয়। তিনি কাতরকণ্ঠে আরো বললেন যে, তাকে একা ছেড়ে দিতে তার প্রাণ কেমন-কেমন করে।

## ॥ ভারতবর্ষ ॥

**সন্ধি ॥** উজ্জল = উৎ + জল। অবশুস্তাবী = অবশুস্ত + ভাবী। ব্যস্ত = বি + অস্ত।

**কারক-বিভক্তি ॥** আমাদের (যাওয়া-আসা)—ভাববাচ্যের কর্তায় ‘এর’ বিভক্তি। চাঁদির—উপাদান-সম্বন্ধে ‘র’ বিভক্তি। বয়সের—বিশেষণ-সম্বন্ধে ‘এর’ বিভক্তি। তাহাদের—কর্ম-সম্বন্ধে ‘এর’ বিভক্তি। উৎসাহে—হেতুর্থে করণকারকে ‘এ’ বিভক্তি। পথ দিয়ে—অধিকরণে ‘দিয়ে’ বিভক্তি। দৃষ্টিতে—করণে ‘তে’ বিভক্তি। ইচ্ছায়—হেতুর্থে ‘র’ বিভক্তি।

**সমাস** ॥ বিপুলকায়—বিপুল কায় বাহার—বহুব্রী। সাপ-খেলানো—সাপকে খেলানো—দ্বিতীয়াতৎ। ঋশ্ৰগুন্দশ্ৰু—ঋশ্ৰ ও গুন্দ—দ্বন্দ্ব; তাহার দ্বারা শ্ৰু—তৃতীয়াতৎ। কশিসেনা—যে কশি সেই সেনা—কর্মধা। লকাবীপ—বাহা লকা তাহাই বীপ—কর্মধা; দ্বি (দুই দিকে) অপ্ বাহার—বহুব্রী। সন্তান-সন্ততি—সন্তান ও সন্ততি—দ্বন্দ্ব। মধ্যবয়স্ক—মধ্য বয়স বাহার—বহুব্রী। মায়ামন্ত্রবলে—মায়াময় মন্ত্র—মধ্যপ-কর্মধা; তাহার বল—ষষ্ঠীতৎ; তাহাতে। সেতুবন্ধনের—সেতুর দ্বারা বন্ধন—তৃতীয়াতৎ। আপাদমস্তক—পাদ হইতে মস্তক পর্যন্ত—অব্যয়ীভাব। স্বামী-পুত্র—স্বামী ও পুত্র—দ্বন্দ্ব। কুস্তিবাস—কুস্তি বাস বাহার—বহুব্রী। ঠাকুরদাদা—যিনি ঠাকুর তিনিই দাদা—কর্মধা।

**প্রকৃতি-প্রত্যয়** ॥ ভারত—ভরত + ষ। বর্ষ—বৃষ্ + অ। গম্ভীর—গম্ + ঈর (অধিকরণবা)। মাঝারি—মাঝ + আরি। কৌতূহল—কুতূহল + ষ। সমুদ্র—সম্-উন্ + র (কর্তৃবা)। তন্নয়—তৎ + ময়ট্। সন্তান—সম্-তন্ + ঘঞ্ (ভাববা)। —অস্তি + ত্ব। দেব—দেব + ষ। অবশ্রম্ভাবী—অবশ্রম্-ভূ + ঘঞ্ (ভাববা) + ঙ্। দীর্ঘ—দ্রাঘ্ + অ (ভাববা)। ব্যস্ত—বি-অস্ + ক্ত। স্বর্গীয়—স্বর্গ + ঈয়। শ্মিত—শ্মি + ক্ত (কর্মবা)। কুস্তিবাস—কুস্তি-বস্ + ঘঞ্ (কর্তৃবা)। রামায়ণ—রাম + ঞায়ণ।

**পদ পরিবর্তন** ॥ বৃদ্ধ (বিণ)—বার্ধক্য (বি)। গম্ভীর (বিণ)—গাম্ভীর্ষ (বি)। বিজ্ঞ (বিণ)—বিজ্ঞতা (বি)। বিশেষ (বিণ)—বৈশিষ্ট্য (বি)। উপভোগ (বি)—উপভোগ্য (বিণ)। মধ্যবয়স্ক (বিণ)—মধ্যবয়স (বি)। পরিবর্তন (বি)—পরিবর্তিত, পরিবর্তনশীল (বিণ)। বিশ্বয় (বি)—বিশ্বিত (বিণ)। স্বর্গীয় (বিণ)—স্বর্গ (বি)।

**সার্থক বাক্য-রচনা** ॥ দৈবক্রমে—বহু বৎসর পরে সেদিন দৈবক্রমে তাহার সহিত একটি সভায় সাক্ষাৎ হইয়া গেল। মায়ামন্ত্রবলে—যেন কোন মায়ামন্ত্রবলে আকাশের কোণে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ জমিতে লাগিল। আপাদমস্তক—আমি লোকটাকে আপাদমস্তক একবার দেখে নিলুম।

**সাধু বাংলায় রূপান্তর** ॥ ‘ভারপর বিশ্বয়ের স্বরে বললে আমার ঐ ছেলের সন্তান।’ [চলিত বাংলা]

তাহার পর বিশ্বয়ের স্বরে বলিল, ‘পঞ্চবিংশ পূর্বে আপনি এ স্থান দিয়া গমন করিয়াছিলেন?’ আমি বলিলাম, ‘আজ্ঞে হাঁ’। বৃদ্ধ বলিল, ‘তাহা হইলে আপনি আমার স্বর্গীয় শিশু মহাশয়কে এই রামায়ণ পাঠ করিতে দেখিয়াছেন। আমার পূর্জ-কন্ডার তাহার নিকটে বসিয়া পাঠ শ্রবণ করিত। পুত্রটি বর্তমানে ঐ বড়ো হইয়াছে। উহার বয়ঃক্রম আপনার মতোই হইবে। কন্ডার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। ঈশ্বরের অভিপ্রায়ে তাহার স্বামীপুত্র লইয়া গৃহকর্ম করিতেছে। এই বালকটি আমার পৌত্র এবং এই বালিকাও আমার পৌত্রী—আমার ঐ পুত্রের সন্তান।’ [সাধু বাংলা]

## ॥ দূৰ্বোধনের প্রতি ধৃতরাষ্ট্র ॥

**সন্ধি** । দূৰ্বোধনের = হৃঃ + বোধনের । হিংসা = হিন্ + অ । প্রশংসা = প্রশন্ + আ । যজ্ঞ = যজ্ + ন । ততোধিক = ততঃ + অধিক । সংসার = সম্ + সার । সম্ভোষিত = সম্ + তোষিত । উদযোগ = উৎ + যোগ । সংহতি = সম্ + হতি । সংহার = সম্ + হার । নিষ্কটকে = নিঃ + কটকে । যুধিষ্ঠিরে = যুধি + স্থিরে ।

**কারক-বিভক্তি** ॥ জনের—অপাদানে ‘এর’ বিভক্তি । পাণ্ডবের—কর্মে ‘এর’ বিভক্তি । আমারে—কর্মে ‘রে’ বিভক্তি । ধনে জনে—কর্মে ‘এ’ বিভক্তি । দানবে—কর্মে ‘এ’ বিভক্তি । তরুণ—কর্মে শূন্তবিভক্তি । দূৰ্বোধনে—কর্মে ‘এ’ বিভক্তি । বিদুরে, যুধিষ্ঠিরে—কর্মে ‘এ’ বিভক্তি । রথে—কর্মে ‘এ’ বিভক্তি ।

**সমাস** ॥ দূৰ্বোধনের—হৃঃ ( হৃঃসাধা ) যুদ্ধ যাহার সহিত—বহুব্রী, তাহার । ধৃতরাষ্ট্র—ধৃত রাষ্ট্র যাহার দ্বারা—বহুব্রী । অহিংসক—নাই হিংসা যাহার—নঞ্ বহুব্রী । নৃপবর—নৃদের পালন করেন যিনি—উপপদতৎ ; নৃপদের বর—যষ্টিতৎ । পরদ্রব্য—পরের দ্রব্য—যষ্টিতৎ । স্বধর্ম্মেতে—স্ব-র ধর্ম্ম—যষ্টিতৎ, তাহাতে । স্বকর্ম্মে—স্ব-র কর্ম্ম—যষ্টিতৎ ; তাহাতে । পর-উপকারী—পরের উপকারী—যষ্টিতৎ । সদাকাল—সদা ব্যাপিরা কাল—দ্বিতীয়াতৎ । দ্বেষভাব—দ্বেষের ভাব—যষ্টিতৎ । শাস্ত্র-অনুসারে—সারের ( সরণের ) সদৃশ—অব্যয়ীভাব ; শাস্ত্রের অনুসারে যষ্টিতৎ । সহস্র-লোচন—সহস্র লোচন যাহার—বহুব্রী । নমুচি-সংহতি—নমুচির সহিত সংহতি—তৃতীয়াতৎ । নিষ্কটকে—নাই কটক যাহাতে—বহুব্রী ; তাহাতে । অদিতিকুমার—অদিতির কুমার—যষ্টিতৎ । মূলস্থ—মূলে থাকে যে—উপপদতৎ । দৈবগতি—দৈবের গতি—যষ্টিতৎ । কুলনাশ—কুলের নাশ—যষ্টিতৎ । দৈববশ—দৈবের বশ—যষ্টিতৎ ।

**প্রকৃতি-প্রত্যয়** ॥ দূৰ্বোধন—দুর্-যুধ্ + অনট্ ( কর্ম্মবা ) । পুত্র—পুং-ত্রৈ + অ ( কর্তৃবা ) । হিংসা—হিন্ + অ ( ভাববা ) + আ । হিংসক—হিন্ + অক ( কর্ম্মবা ) । পাণ্ডব—পাণ্ড + ষ ( অপত্যার্থে ) । শাস্ত্র—শন্ + ক্ত ( কর্তৃবা ) । প্রশংসা—প্র-শন্ + অ ( ভাববা ) + আ । যজ্ঞ—যজ্ + ন । নিমজ্জণ—নি-মজ্জ্ + অনট্ ( ভাববা ) । গৌরব—গুরু + ষ । বিস্তর—বি-স্তৃ + অ ( কর্ম্মবা ) । বিচার—বি-চর + অ ( ভাববা ) । মার্গ—মৃজ্ + অ ( কর্ম্মবা ) । দূষিবে—দুষ্ + ইবে ( বাং ) । সংসার—সম্-স্র + অ ( ভাববা ) । দ্রব্য—জ্র + যৎ ( কর্ম্মবা ) । স্বধর্ম্মেতে—স্ব-ধৃ + য ( কর্তৃবা ) + এতে ( বাং ) । সম্ভোষিত—সম্-ভুষ্ + শিচ্ + ক্ত ( কর্ম্মবা ) । উদযোগ—উৎ-যুক্ত + ষ্ণ ( ভাববা ) । উপকারী—উপ-কৃ + ইন্ ( ভাববা ) । নন্দন—নন্ + অনট্ ( কর্তৃবা ) । দ্বেষ—দ্বিষ্ + অ ( ভাববা ) । ভাব—ভৃ + অ ( ভাববা ) । প্রজ্ঞাবান—[ প্র-জ্ঞা + অ ( ভাববা ) + আ = ] প্রজ্ঞা + বজ্জণ্ । শাস্ত্র—শাস্ + জ

(করণবা)। বিবাদ—বি-বদ্ + অ (ভাববা)। অহুসার—অহু-স্ + অ (ভাববা)। শাস্তি—শম্ + ক্তি (ভাববা)। বিশাস—বি-শস্ + ঘঞ্ (ভাববা)। দানব—দহ্ + ষ (অপত্যার্থে)। উৎপত্তি—উৎ-পদ্ + ক্তি (ভাববা)। প্রীতি—প্রী + ক্তি (ভাববা)। সংহতি—সম্-হন্ + ক্তি (ভাববা)। ভোগ—ভূজ্ + ঘঞ্ (ভাববা)। নাশ—নশ্ + ঘঞ্ (ভাববা)। কারণ—কৃ + গিচ্ + অনট্ (ভাববা)। মূলস্থ—মূল-স্থ + ক। বন্ধন—বন্ধ্ + অনট্। নিশ্চয়—নিশ্চ-চি + অ (ভাববা)। নিধন—নি-ধা + অনট্ (ভাববা)। মধুর—মধু + র। বচন—বচ্ + অনট্। ডাকাইল—ডাক্ + গিচ্ (আ) + ইল। যুধিষ্ঠির—যুধি-স্থ + ইর (কর্তৃবা)। আজ্ঞা—আ-জ্ঞা + অ + আ। শ্রেয়—প্রশস্ত্য > শ্ + ঙ্গেয়স্। নাশ—নশ্ + ঘঞ্ (ভাববা)। ব্যাধা—ব্যাথ্ + অ (ভাববা) + আ। অঙ্ক—অঙ্ + গিচ্ + অ। নারিল—না + ইল। হেলন—হেড়্ + অনট্ (ভাববা)। ইন্দ্রপ্রস্থ—ইন্দ্র-প্র-স্থ + ক।

গন্তরূপ ॥ আমায়ে—আমাকে। করহ—করো। দূষিবে—দোষ দিবে। বঞ্চে—বাচে। করিহ—করিও। নহিল—হইল না। কদাচন—কখনও। সবার—সকলের। গ্রাসে—গ্রাস করে। নিবারিতে—নিবারণ করিতে। আনিহু—আনিলাম। চাহ—চাও। বলিহ—বলিও। নারিল—পারিল না।

সার্থক বাক্য-রচনা ॥ অহিংসক—পান্ডীকীর অহিংসক নীতির কথা সর্বজন-বিদিত। ততোহধিক—অমিদারবাবু তাহাকে তিরস্কার করিলেন; কিন্তু অমিদার-বাবুর নায়েব তাহাকে তিরস্কার করিলেন ততোহধিক। দূষিবে—ভ্রাতাকে বকনা করিলে সকলেই তোমাকে দূষিবে। দ্বেষভাব—দ্বেষভাব পরিহার করিয়া আজ ভারত ও পাকিস্তানের মিত্র-মূলভ আচরণ করিতে হইবে। নিকৃষ্টকে—আমাকে প্রভারিত করিয়া সে এখন নিকৃষ্টকে বিষয়-স্বধ ভোগ করিতেছে।

## ॥ ইন্দ্রজিতের যজ্ঞগৃহে লক্ষণ ॥

সক্তি ॥ কুশাসনে = কুশ + আসনে। যোগীন্দ্র = যোগী + ইন্দ্র। স্মৃধাতুর = স্মৃধা + আতুর। দেবালয়ে = দেব + আলয়ে। সম্মুখে = সম্ + মুখে। দেবাকৃতি = দেব + আকৃতি। মধ্যাহ্নে = মধ্য + অহ্নে। সাষ্টাঙ্গে = স + অষ্ট + অঙ্গে। কৃতান্তিলিপুটে = কৃত + অঙ্গলিপুটে। ফণীঘরে = ফণী + ঙ্গ + ঘরে। উত্তাপে = উৎ + তাপে। রামানুজ = রাম + অনুজ। রক্ষোবাকপুরে = রক্ষঃ + বাকপুরে। দেবকুলোদ্ভবে = দেবকুল + উৎ + ভবে। রক্ষোবৃন্দে = রক্ষঃ + বৃন্দে। নিরাকার = নিঃ + আকার। ভগ্নোত্তম = ভগ্ন + উৎ + যম। দেবাকৃতি = দেব + আকৃতি। দুর্মতি = দুঃ + মতি। দেবাদেশে = দেব + আদেশে। কালানল = কাল + অনল। মহাহবে = মহা + আহবে। রক্ষোবিগ্ন = রক্ষঃ + বিগ্ন। তপ্তলৌহাকৃতি = তপ্তলৌহ + আকৃতি। নির্লজ্জ = নিঃ + লজ্জ। তদ্বয় = তৎ + বয়। নিরস্ত = নিঃ + অস্ত। কাকোদয় = কাক + উদয়। দুর্মতি = দুঃ + মতি। শূরেন্দ্র = শূর + ইন্দ্র।

**কায়ক-বিভক্তি** । ইষ্টদেবে—সম্প্রদানে 'এ' বিভক্তি । অধীনে—কর্মে 'এ' বিভক্তি । যযুজল—অপাদানে 'এ' বিভক্তি । কপীধরে—কর্মে 'এ' বিভক্তি । উত্তাপে—কর্মণে 'এ' বিভক্তি । মিহিরে—কর্মে 'এ' বিভক্তি । অম্বুনাথে—কর্মে 'এ' বিভক্তি । নগর-দ্বার—কর্মে শূভবিভক্তি । রণে—অপাদানে 'এ' বিভক্তি । রক্ষোবৃক্ষে—কর্মে 'এ' বিভক্তি । দাসে—কর্মে 'এ' বিভক্তি । কিঙ্করে—সম্প্রদানে 'এ' বিভক্তি । দ্বাখকে—কর্মে 'এ' বিভক্তি । কিঙ্কিহ্যা-অধিপে—কর্মে 'এ' বিভক্তি । বিজীষণে—কর্মে 'এ' বিভক্তি । রণরঙ্গে—অপাদানে 'এ' বিভক্তি ।

**সমাস** । কুশাসনে—কুশ নির্মিত আসন—মধ্যপ-কর্মধা ; তাহাতে । ইন্দ্রজিৎ—ইন্দ্রকে অয় করিয়াছে যে—উপপদতৎ । ইষ্টদেবে—যিনি ইষ্ট, তিনিই দেব—কর্মধা ; তাহাতে । কুলমালা—কুলের মালা—বগীতৎ । ধূপদান—ধূপের নিমিত্ত দান—চতুর্থীতৎ । স্বতরসে—স্বতের রস—বগীতৎ ; তাহাতে । কলুষনাশিনী—কলুষ নাশ করে যে (স্ত্রী)—উপপদতৎ । হেম-ঘটা—হেম নির্মিত ঘটা—মধ্যপ-কর্মধা । হেমপাত্রে—হেম নির্মিত পাত্র—মধ্যপ-কর্মধা ; তাহাতে । রথীন্দ্র—রথীগণের ইন্দ্র—বগীতৎ । চন্দ্রচূড়—চন্দ্র চূড়ায় ধাহার—বহত্ৰী । বোগীন্দ্র—বোগীদের ইন্দ্র—বগীতৎ । ক্ষুধাতুর—ক্ষুধার দ্বারা আতুর—তৃতীয়াতৎ । গোষ্ঠগৃহে—গো থাকে যেখানে—উপপদতৎ ; গোষ্ঠের নিমিত্ত গৃহ—চতুর্থীতৎ । ভীম-বাহু—ভীম (ভয়ঙ্কর) বাহু যাহার—বহত্ৰী । দেবালয়ে—দেবের উদ্দেশে আলয়—চতুর্থীতৎ ; তাহাতে । বীরপদভরে—বীরের পদ—বগীতৎ ; তাহার ভর—বগীতৎ ; তাহাতে । দেবাকৃতি—দেবের আকৃতি—বগীতৎ । মধ্যাহ্নে—অহনের মধ্য—বগীতৎ ; তাহাতে । অংশুমালী—অংশু মালা যাহার—বহত্ৰী । সাষ্টাঙ্গে—অষ্ট অঙ্গের সমাহার—দ্বিগু ; অষ্টাঙ্গের সহিত বর্তমান—বহত্ৰী । কুতাল্লিপুটে—কুত অঙ্গলিপুট যাহার—বহত্ৰী ; তাহাতে । বিভানস্—বিভায় বস্ যাহার—বহত্ৰী । রক্ষঃকুলরিপু—রক্ষের কুল—বগীতৎ ; তাহার রিপু—বগীতৎ । ভূতলে—ভূ-র তল—বগীতৎ ; তাহাতে । বীরসিংহ—বীর যে সিংহ—কর্মধা । উর্ধ্বক্ষণা—উর্ধ্ব ক্ষণা যাহার—বহত্ৰী । ফণীশ্বর—ফণীদের ঈশ্বর—বগীতৎ । হীনপতি—হীন গতি যাহার—বহত্ৰী । ভয়শূন্ত—ভয়ের দ্বারা শূন্ত—তৃতীয়াতৎ । অম্বুনাথ—অম্বুর নাথ—বগীতৎ ; তাহাতে । রামানুজ—অম্বুতে জগিয়াছে যে—উপপদতৎ ; রামের অম্বুজ—বগীতৎ । রক্ষোব্রাহ্মপুত্র—রক্ষদের ব্রাহ্মা—বগীতৎ ; তাহার পুত্র—বগীতৎ ; তাহাতে । যক্ষপতিব্রাহ্ম—যক্ষদের পতি—বগীতৎ ; তাহার ব্রাহ্ম—বগীতৎ । অস্ত্রপাণি—অস্ত্র পাণিতে যাহার—বহত্ৰী । শূদ্ধধরসম—শুদ্ধ ধারণ করে যে—উপপদতৎ ; তাহার সম—বগীতৎ । পুর-প্রাচীর—পুরের প্রাচীর—বগীতৎ । ক্রাবলীক্লেপে—চক্রের আবলী—বগীতৎ ; তাহার রূপ—বগীতৎ ; তাহাতে । মানবকুল-সম্ভব—মানবের কুল—বগীতৎ ; তাহা হইতে সম্ভব—পঞ্চমীতৎ । দেবকুলোদ্ভব—দেবের কুল—বগীতৎ ; তাহা হইতে উদ্ভব যাহার—বহত্ৰী । সর্বভূক—সর্ব ভোজন করে যে—উপপদতৎ ; নিরাকার—নাই আকার যাহার—বহত্ৰী । নিঃশব্দা—নাই শব্দা—নঞতৎ । কিঙ্কিহ্যা-অধিপে—অধি পালন করেন যিনি—উপপদতৎ ; কিঙ্কিহ্যার

## ইঙ্গিতের বঙ্গভাষে লক্ষণ

অখিল—বঙ্গীতঃ ; তাহাতে। স্বাক্ষর—স্বাক্ষর—বঙ্গীতঃ ; তাহাতে। রা—  
—রাজাকে বোঝ করে যে—উপপদতঃ। শূন্যমিগ্রাম—শূন্যের নাম করে যে—  
উপপদতঃ ; তাহাদের গ্রাম (সমূহ)—বঙ্গীতঃ। ভয়োত্তম—ভয় উত্তম বঙ্গীর—  
বহুব্রী। রক্ষঃচক্—রক্ষকের চক্—বঙ্গীতঃ। কৃতান্ত—কৃত অন্ত বাহার—বহুব্রী।  
আবুহীন—আবুর দ্বারা হীন—তৃতীয়াতঃ। দুর্গতি—দুঃখ বতি বাহার—বহুব্রী।  
কালানল-ভেজ—কালরূপ অনল—রূপক-কর্মধা ; তাহার ভেজ—বঙ্গীতঃ ; তাহাতে  
কৃপাণবর—কৃপাণদের বর—বঙ্গীতঃ। মহাহবে—মহৎ আহব—কর্মধা ; তাহাতে  
শূরশ্রেষ্ঠ—শূরের শ্রেষ্ঠ—বঙ্গীতঃ। রক্ষোবিপু—রক্ষকের বিপু—বঙ্গীতঃ। বীরনাথে  
—বীরের সাজ—বঙ্গীতঃ, তাহাতে। নিরস্ত—নাই অস্ত বাহার—বহুব্রী। রথীকুল-  
প্রথা—রথীদের কুল—বঙ্গীতঃ ; তাহাদের প্রথা—বঙ্গীতঃ। বীরবর—বীরদের বর—  
বঙ্গীতঃ। অবিদিত—নয় বিদিত—নঞ-তঃ। জলদ-প্রতিম—জল দান করে যে—  
উপপদতঃ ; তাহার প্রতিম—বঙ্গীতঃ। বাসবজ্ঞতা—বাসবকে জিতিগাছে যে—  
উপপদতঃ। ক্ষত্রকুগ্ৰামি—ক্ষত্রের কুগ্—বঙ্গীতঃ ; তাহার গ্রামি—বঙ্গীতঃ। নির্জঙ্ঘ-  
নাই লঙ্ঘা বাহার—বহুব্রী। কাকোদর—কাকের ডায় উদর বাহার—বহুব্রী। তরুসাজ-  
তরুদের রাজা—বঙ্গীতঃ। রুধির-ধারা—রুধিরের ধারা—বঙ্গীতঃ। শুণ্ডধর—শুণ্ড ধরে  
যে—উপপদতঃ। শূন্যধরশূন্য—শূন্য ধরে যে—উপপদতঃ ; তাহার শূন্য—বঙ্গীতঃ  
তাহাতে। শূরেন্দ্র—শূরের ইন্দ্র—বঙ্গীতঃ। সচকিতে চকিতের সহিত বর্তমান—  
বহুব্রী, তাহাতে। ধূমকেতুসম—ধূম কেতু বাহার—বহুব্রী ; তাহার সম—বঙ্গীতঃ।

**প্রকৃতি-প্রত্যয় ॥** ইঙ্গ-জিৎ—ইঙ্গ-জি + কিপ্। নিভূত—নি-ভূ + ক্ত (কর্মবা)  
কৌষিক—কৌষ + ষিক। বস্ত্র—বস্ + ত্র (করণবা)। পুত—পু + ক্ত (কর্মবা)  
জাহ্নবী—জহ্ + ষ (জাতার্থে) + ট্র (স্ত্রী)। উপহার—উপ-হৃ + ষণ্ (ভাববা)  
কৃদ্ধ—কৃধ্ + ক্ত (কর্মবা)। নিমগ্ন—নি-মস্জ্ + ক্ত (কর্তৃবা)। ব্যাভ্র—বি-আ +  
ভ্রা + অ (কর্তৃবা)। গোষ্ঠি—গো-স্থ + ক। পিধান—অপি-ধা + অনট্ (ভাববা)  
কসক—ফল + ক। মন্দির—মন্ + ইর (অধিকরণবা)। মুদিত—মুদ্ + ই  
(কর্মধা)। রাবণি—রাবণ + ষি (অপত্যার্থে)। তেজস্বী—তেজ + শ্বিন্  
অংশুমালী—অংশু-মাল + ইন্। পবিত্রিলা পবিত্র (পু + ইত্) + ইলা (নামধাতু)  
অর্পণে—অপি + অনট্ (ভাববা) + এ। প্রভাময়—প্রভা (প্র-ভা + অ + আ) + ময়ট্  
বলী—বল + ইন্। উত্তরিল্লা—উত্তর + ইলা (নামধাতু)। রৌদ্র-রুদ্র + ষ (ভা  
অর্থে)। দাশরথি—দশরথ + ষি (অপত্যার্থে)। সংগ্রাম—সংগ্রাম্ + অ (ভাববা)  
আগমন—আ-গম্ + অনট্ (ভাববা)। সহসা—সহ-সো + আ (কর্তৃবা)। জাস-  
জস্ + ষণ্ (ভাববা)। পথিক—পথিন্ + ক। প্রচণ্ড—প্র-চণ্ড্ + অ। উত্তাপ-  
উৎ-তপ্ + অ (ভাববা)। গ্রাসিল—গ্রাস (গ্রাস্ + অ) + ইন্ (নামধাতু)। রাহ-  
রহ্ + উ (কর্তৃবা)। অঁধারি—অঁধার (অঁধকার) + ই (অলমাপিকা)  
নিদাঘ—নি-দহ্ + অ (ভাববা)। শুবিল—শুব্ + ইল। পশিল—পশ্ (প্রেক্ষ  
—ইল (নামধাতু)। কোশল—কুশল (কুশ-লা + অ) + ষ (ভাববা)। বি



—বি-জি + অ (ভাববা)। নগর—নগ + র। বোধ—বুধ্ + অ (ভাববা)। মানব—মন্ + অ (অপত্যার্থে)। সম্ভব—সম্-ভূ + অন্ (ভাববা)। দেব—দিব্ + অ (কর্তৃক)। উত্তর—উৎ-ত্ + অ (কর্তৃবা)। প্রপঞ্চ—প্র-পন্ + অ। বকাইছ—বক্ + পিচ্ + ইছ। কোতুক—কুতুক্ + অ। কোতুকী—কোতুক + ইন্। নিরাকার—নিব্-আ-ক্ + অ। সৌমিত্রি—সুমিত্রা + ষি (অপত্যার্থে)। বর—বৃ + অ। প্রভূ—প্র-ভূ + উ (কর্তৃবা)। কিংকর—কিম্-ক্ + অ (কর্তৃবা)। নিঃশঙ্কা—নিঃ-শন্ক্ + অ (ভাববা) + আ। রাঘব—রঘু + ষ (অপত্যার্থে)। অধিপ—অধি-পা + অ (কর্তৃবা)। বিভীষণ—বি-ভী + পিচ্ + অনট্ (ভাববা)। রাজদ্রোহী—রাজ-দ্রোহ্ + অ (ভাববা) + ইন্। নাদিছে—নাদ + ইছে (নামধাতু)। ভগ্নোত্তম—(ভন্ + ক্ত) উৎ-ষম্ + অ (ভাববা)। কেশরী—কেশর + ইন্। কৃতান্ত—কৃত (ক্ + ক্ত) + অম্ + ক্ত। অবহেলা—অব-হেড়্ + অ (ভাববা) + অ। মৃঢ়—মূহ্ + ক্ত (কর্তৃবা)। উলঙ্গিলা—উলঙ্গ + ইলা (নামধাতু)। ভৈরব—ভীক্ + ষ। ইরশ্বদময়—ইরা + মদ্ + অ (কর্তৃবা) + ময়ট্। রামাশুজ—রাম-অশু-জন্ + ড। আহব—আ-হ্বে + অ (অধিকরণবা)। বিরত—বি-রম্ + ক্ত (কর্তৃবা)। রণরজ—রণ-রন্জ্ + অ (ভাববা)। আতিথেয়—অতিথি + ষ্বেয়। সেবা—সেব্ + অ (ভাববা) + আ। তিষ্ঠি—তিষ্ঠ্ (<স্থ) + ই (অসমাপিকা)। প্রথা—প্রথ্ + অ (ভাববা) + আ। অবিদিত—নঞ্-বিদ্ + ক্ত (কর্মবা)। জলদ—জল-দা + ক। প্রতিম—প্রতি-মা + অ (কর্তৃবা)। জন্ম—জন্ + মন্ (ভাববা)। অভিমন্যু—অভি-মন্ + উ। ক্ষত্রিয়—ক্ষত্র + ইয়। সমাজ—সম্-অজ্ + অ (অধিকরণবা)। শ্রবণ—শ্র + অনট্ (ভাববা)। নিরন্ত—নিব্-অন্ + ক্ত (কর্মবা)। নিমিষ—নি-মিষ্ + অ। নিক্ষেপিলা—নি-ক্ষিপ্ + অ (ভাববা) + ইলা (নামধাতু)। ঘোর—ঘূরু + অ (কর্তৃবা)। নাদ—নদ্ + অ (ভাববা)। প্রহরণ—প্র-হ্র + অনট্ (ভাববা)। প্রভঙ্গন—প্র-ভন্জ্ + অনট্ (ভাববা)। অস্ত্র—অস্ + ত্র (কর্মবা)। ভূকম্পন—ভূ-কম্প্ + অনট্ (ভাববা)। কধির—কধ্ + ইর (কর্তৃবা)। সত্তর—সহ + ত্তর। কোপ—কূপ্ + ঘঞ্ (ভাববা)। সাধন—সাধ্ + অনট্ (ভাববা)। জগৎ—গম্ + ঙ্গিপ্। অভিমান—অভি-মান্ + ঘঞ্ (ভাববা)। মানী—মান্ + ইন্।

গন্তরূপ ॥ জলিছে—জলিতেছে। চৌদিকে—চারিদিকে। পশে—প্রবেশ করে। পশিলা—প্রবেশ করিল। বন্বনিলা—বন্বন্ করিল। ধনিলা—ধনিত হইল। চমকি—চমকিয়া। মেলিলা—মেলিল। দেখিলা—দেখিল। প্রণমি—প্রণাম করিয়া। কহিলা—কহিল। পূজিলা—পূজা করিল। তোমারে—তোমাকে। তেই—তাই। পবিত্রিলা—পবিত্র করিল। আইলা—আসিল। প্রসাদিতে—প্রসাদ দিতে। অধীনে—অধীনকে। তব—তোমার। নমিলা—নমস্কার করিল। উত্তরিলা—উত্তর করিল। নিরখিলা—নিরীক্ষণ করিয়া। সংহারিতে—সংহার করিতে। তোমার—তোমাকে। হেথা—এখানে। মম—আমার। দেহ—দাও। মোরে—আমাকে। হেঁদিলে—দেখিলে। চাহিলা—চাহিল। হিয়া—হৃদয়। আসিলা—আস করিল।

মিহিরে—মিহিরকে। অঁধারি—অঁধার করিয়া। শুবিল—শোষণ করিল। রক্ষিছে—রক্ষা করিতেছে। ভ্রমিছে—ভ্রমণ করিতেছে। বিমুখয়ে—বিমুখ করে। বঞ্চাইছ—বঞ্চিত করিতেছ। দাসেরে—দাসকে। বধিয়া—বধ করিয়া। রাঘবে—রাঘবকে। বাঁধি আনি—বাঁধিয়া আনিয়া। নাদিছে—নাদ করিতেছে। বিলম্বিলে—বিলম্ব করিলে। দংশে—দংশন করে। জনে—জনকে। আহানি—আহ্বান করি। উলঙ্গিলা—উলঙ্গ করিল। ভাতিল—শোভা পাইল। এবে—এখন। আঘাতিতে—আঘাত দিতে। তারে—তাকে। বধিব—বধ করিব। পালিব—পালন করিব। হেরি—দেখিয়া। রোধিব—রোধ করিব। পশিলি—প্রবেশ করিলি। শান্তিয়া—শান্তি দিয়া। নিক্ষেপিলা—নিক্ষেপ করিল। পড়িলা—পড়িল। নারিলা—পারিল না। কর্ঘিলা—আকর্ষণ করিল। সাপটিলা—জড়াইয়া রাখিল।

সার্থক বাক্য-রচনা ॥ কলুষনাশিনী—নিম্নে কলুষনাশিনী গলা জগতের সমস্ত পাপ ধৌত করিয়া অনাশ্রিত রবে বহিয়া চলিয়াছে। মায়্যাবলে—বাহুকর মায়্যাবলে একটি হস্তিকে অদৃশ করিয়া দিলেন। সর্বভুক—সর্বভুক অগ্নি সমস্তই গ্রাস করিল। ভগ্নোত্তম—সেনাপতির মৃত্যুতে ভগ্নোত্তম সেনাবাহিনী একেবারে ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। অবিলম্বে—তাহাকে অবিলম্বে স্বদেশে পাঠাইয়া দাও। সচকিতে—সচকিতে চাহিয়া দেখিলাম, ঈশান কোণে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছে।

## ॥ ধূল্যামন্দির ॥

সজ্জি । ভজন=ভজ্+অন। পূজন=পূজ্+অন। সাধন=সাধ্+অন। দেবালয়ের=দেব+আলয়ের। সংগোপনে=সম্+গোপনে। নয়ন=নে+অন।

কারক-বিভক্তি ॥ কাহারে—সম্প্রদানে ‘রে’ বিভক্তি। যেথায়—অধিকরণে ‘র’ বিভক্তি। মাটি, পাথর—কর্মে শূন্যবিভক্তি। সবার—কর্মপ্রবচনীয়-যোগে ‘র’ বিভক্তি। কর্মযোগে—করণে ‘এ’ বিভক্তি।

সমাস ॥ ধূল্যামন্দির—ধূলা নির্মিত মন্দির বা ধূল্যাময় মন্দির—মধ্যপ-কর্মধা। ঋদ্ধহারে—ঋদ্ধ যে হার—কর্মধা; তাহাতে। দেবালয়ের—দেবের নিমিত্ত আলয়—চতুর্থীতৎ, তাহার। সৃষ্টিবীধন—সৃষ্টিরূপ বীধন—রূপক-কর্মধা। ধূল্যাবালি—ধূলা ও বালি—দ্বন্দ্ব। কর্মযোগে—কর্মের যোগ—বধীতৎ, তাহাতে।

প্রাকৃতি-প্রত্যয় ॥ মন্দির—মন্+ইর (অধিকরণবা)। ভজন—ভজ্+অনট্ (ভাববা)। পূজন—পূজ্+অনট্ (ভাববা)। সাধন—সাধ্+অনট্ (ভাববা)। আরাধনা—আ-রাধ্+অনট্ (ভাববা)+আ। সংগোপন—সম্+গপ্+অনট্ (ভাববা)। নয়ন—নী+অনট্ (করণবা)। দেবতা—দেব+তা (ব্যবিক)। চাবা—চাষ+আ। রোক্ত—রক্ত+ক্ (ভাববা)। শুটি—শুচ্+ই (কর্তৃবা)।

বসন—বস্ + অন। মুক্তি—মুক্ত্ + ক্তি (ভাববা)। সৃষ্টি—সৃজ্ + ক্তি (ভাববা)।  
বীধন—বীধ্ + অন। বস্ত্র—বস্ + ব্ৰ্ণ (কর্মবা)। কর্ম—কৃ + মন্ (কর্মবা)।

গন্তরূপ ॥ কাহারে—কাহাকে। যেথায়—যেখানে। সবার—সকলের।

পদ-পরিবর্তন ॥ পূজন (বি)—পূজিত (বিণ)। সাধন (বি)—সাধিত (বিণ)। আরাধনা (বি)—আরাধ্য, আরাধনীয় (বিণ)। রুদ্ধ (বিণ)—রোধ (বি)। নয়ন (বি)—নীত (বিণ)। মাটি (বি)—মেটে (বিণ)। পাথর (বি)—পাথুরে (বিণ)। পথ (বি)—পথ্য, পাথের (বিণ)। গুটি (বিণ)—শোচ, গুচিতা (বি)। মুক্তি (বি)—মুক্ত (বিণ)। সৃষ্টি (বি)—সৃষ্ট (বিণ)। ধ্যান (বি)—ধ্যানী, ধ্যেয় (বিণ)। যোগ (বি)—যোগী (বিণ)।

সার্থক বাক্য-রচনা ॥ রুদ্ধদ্বারে—ক্লান্ত পথিক আসিয়া রুদ্ধদ্বারে করাঘাত করিল। সংগোপনে—দুই বন্ধুতে বসিয়া সংগোপনে বহু শলাগরামর্শ করিল। কর্মযোগে—কর্মযোগে আমরা পৃথিবীর সকল মাহুষের সহিত যুক্ত।

## ॥ কাল-বৈশাখী ॥

সজ্জি ॥ বনস্পতি = বন + পতি [নিপাতনে]। নিস্পন্দ = নিঃ + স্পন্দ। রশ্মিচ্ছটা = রশ্মি + ছটা [বিকল্প রূপ—রশ্মিচ্ছটা]। দিগ্‌বারণেরা = দিক্ + বারণেরা। ছালোকের = দিব্ + লোকের। নিচ্চিহ্ন = নিঃ + চিহ্ন। উচ্ছ্বাসে = উৎ + শ্বাসে।

কারক-বিভক্তি ॥ আজিকে—অধিকরণে ‘কে’ বিভক্তি। নিস্পন্দ—ক্রিয়াবিশেষণে শূন্তবিভক্তি। মিহিরে—কর্মে ‘এ’ বিভক্তি। উল্লাসে—হেতুর্থে ‘এ’ বিভক্তি। পিনাকে—অপাদানে ‘এ’ বিভক্তি। নববিধানের—কর্মে ‘এর’ বিভক্তি।

সমাস ॥ কাল-বৈশাখী—কাল [মৃত্যু]-রূপ বৈশাখী—রূপক-কর্মধা। মরুৎ-পাথারে—মরুৎ-রূপ পাথারে—রূপক-কর্মধা। বজ্রঘোষণ—বজ্রের ঘোষণ—বগীতৎ। আকাশকটাছে—আকাশ-রূপ কটাছে—রূপক-কর্মধা। রশ্মিচ্ছটা—রশ্মির ছটা—বগীতৎ। ধূলিধূসরিত—ধূলির দ্বারা ধূসরিত—তৃতীয়াতৎ। বেদনা-অধীর—নঞ্‌ ধীর—নঞ্‌ তৎ; বেদনার দ্বারা অধীর—তৃতীয়াতৎ। মেঘ-কজ্জল—মেঘ কজ্জলের দ্বারা—উপমিত কর্মধা। বিজয়-শম্ভ—বিজয়সূচক শম্ভ—মধ্যপ-কর্মধা। কালপুরুষ—কাল [ভয়ঙ্কর] যে পুরুষ—কর্মধা। নীল-অঞ্জন-গিরি-নিভ—নীল যে অঞ্জন—কর্মধা; নীল-অঞ্জন যে গিরি—কর্মধা; তাহার নিভ [সদৃশ]—বগীতৎ। নিলীথ-নীরব—নিঃ [নাই] রব বাহাতে—বহুব্রী; নিলীথের মতো নীরব—উপমান-কর্মধা। ঘনঘোর—ঘনের [মেঘের] মতো ঘোর—উপমান-কর্মধা।

প্রকৃতি-প্রত্যয় ॥ বৈশাখী—বিশাখা + ঋ (সম্বন্ধ অর্থে) + ঙী (স্ত্রী)। নিবাস—নি-বস্ + ণ্ণ (ভাববা)। নির্দোষ—নিব্‌-ঘৃণ্ + ণ্ণ (ভাববা)। সন্ধ্যা—স্ব-ধৈ + অঙ্ (অধিকরণবা) + আ (স্ত্রী)। স্নান—স্না + ক্ত (কর্তৃবা)। উচ্ছ্বাস—

উৎ-স্ + স্বঞ্ (ভাববা)। উল্লাস—উৎ-লস্ + স্বঞ্ (ভাববা)। আশাস—আ-  
শস্ + স্বঞ্ (ভাববা)। চৈত্র—চিট্রা + ষ (সম্বন্ধ)। ভীষণ—ভী + শিচ্ + অনট্  
(কর্তৃবা)। পরামর্শ—পর-ম্শ্ + স্বঞ্ (ভাববা)। দুর্ধর্ষ—দুর্-ধৃষ্ + থল্ (কর্মবা)।

পদ-পরিবর্তন ॥ রক্ত (বি)—রক্তিম (বিণ)। পাতুর (বিণ)—পাতুরতা  
(বি)। তদ্রা (বি)—তদ্রান্ (বিণ)। জটা (বি)—জটিল (বিণ)। উদ্ভাদ  
(বিণ)—উদ্ভাদনা (বি)। নীল (বিণ)—নীলিমা (বি)। নির্মল (বিণ)—  
নির্মলতা (বি)। পঙ্ক (বি)—পঙ্কিল (বিণ)। উচ্ছাস (বি)—উচ্ছসিত (বিণ)।  
বাসর (বি)—বাসরীয় (বিণ)। আশাস (বি)—আশস্ত (বিণ)। রস (বি)—  
রসাল (বিণ)। মধু (বি)—মধুর (বিণ)। হর্ষ (বি)—হৃষ্ট (বিণ)। গিরি  
(বি)—গৈরিক (বিণ)।

গন্তরূপ ॥ ব্যাকুলি—ব্যাকুলিত করিয়া। পশিয়াছে—প্রবেশ করিয়াছে। হেরি  
—দেখি। ধাইছে—ধাবিত হইতেছে। গ্রাসিতে—গ্রাস করিতে। বিদরিছে—  
বিদীর্ণ করিতেছে। যুঝিতেছে—যুদ্ধ করিতেছে।

অলংকারগত টীকা ॥ ‘আলয়ে কুলায়ে তদ্রা ভুলায়ে’—অনুপ্রাস। ‘হেরি বে  
হোখায়...মেঘের ঘটা’—অনুপ্রাস ও রূপক। ‘সে যেন কাহার...ভীমকুণ্ডল জটা’—  
অনুপ্রাস ও উৎপ্রেক্ষা। ‘দিগ্‌বারণেরা...নভ দন্তে’—অনুপ্রাস ও উৎপ্রেক্ষা। আলো-  
ঝলমল...নিশাস নিঃশব্দ’—অনুপ্রাস।

বিপরীত শব্দ ॥ নিশাস—প্রশাস। বহিম—ঋজু। আলোক—অন্ধকার। নির্মল  
—মলিন। শুভ—অশুভ। জয়—পরাজয়। হর্ষ—বিষাদ। কায়া—ছায়া।

## ॥ কাপ্তারী হ'শিয়ায় ॥

সন্ধি ॥ দুর্গম—দুর্ + গম। হস্তর—হুঃ + তর। যুগান্ত—যুগ + অন্ত। পুনবার  
—পুনঃ + বার। পরীক্ষা—পরি + ঙ্গেক্ষা।

কারক-বিভক্তি ॥ তরী—কর্মে শূভ্রবিভক্তি। পার—অধিকরণে শূভ্রবিভক্তি।  
পথমায়—অধিকরণে শূভ্রবিভক্তি। ঝুনে—করণে ‘এ’ বিভক্তি। জাতের—কর্মে ‘এর’  
বিভক্তি।

সমাস ॥ দুর্গম—হুঃ (হুঃসাধ্য) গমন করা যেখানে—উপপদতৎ। হস্তর—  
হুঃ (হুঃসাধ্য) তরণ করা যাহা—উপপদতৎ। রাত্রি-নিশীথে—রাত্রির নিশীথে—  
যঞ্জীতৎ; তাহাতে। তিমিররাত্রি—তিমিরময়ী রাত্রি—মধ্যপ-কর্মধা। মাতৃ-মন্ত্রী—  
মাতার মন্ত্র—যঞ্জীতৎ; তাহা আছে যাহার—উপপদতৎ; তাহাদের। যুগ-যুগান্ত-  
সন্ধিত—যুগের অন্ত—যঞ্জীতৎ; যুগ ও যুগান্ত—দ্বন্দ্ব; তাহা ব্যাপিয়া সন্ধিত—দ্বিতীয়া-  
তৎ। মাতৃমুক্তিপণ—মাতার মুক্তি—যঞ্জীতৎ; তাহার জন্ত পণ—চতুর্থীতৎ। গিরি-  
সংকট—গিরির সংকট—যঞ্জীতৎ। পশ্চাৎ-পথ-যাত্রীর—পশ্চাৎ বে পথ—কর্মধা; ॥

তাহাতে যাত্রী—সপ্তমীতৎ; তাহার। হানাহানি—হানিয়া হানিয়া যে বৃদ্ধ—ব্যতিহার বহুত্ব। মহাভার—মহৎ ভার—কর্মধা। দিবাকর—দিবা করে যে—উপপদতৎ।

**প্রকৃতি-প্রত্যয়** ॥ দুর্গম—দুর্-গম্+খল্ (কর্মধা)। হস্তর—হস্-ত্+খল্ (কর্মধা)। পারাবার—পার-আ-বৃ+ঘঞ্ (ভাববা)। ভবিষ্যৎ—ভূ+ভূত্ (কর্তৃবা)। অভিমান—অভি-যা+অনট্ (কর্তৃবা)। অধিকার—অধি-কৃ+ঘঞ্ (ভাববা)। সম্ভরণ—সম্-তৃ+অনট্ (ভাববা)। জিজ্ঞাসে—জ্ঞা+সন্+আ (নামধাতু)+এ। মাহুষ—মহু (+য)+ষ (অপত্যার্থে)। সন্দেহ—সম্-দিহ্+ঘঞ্ (ভাববা)। দিবাকর—দিবা-কৃ+খচ্ (কর্তৃবা)। পরীক্ষা—পরি-ঈক্+অঙ্ (ভাববা)+আ (স্ত্রী)। ত্রাণ—ত্রৈ+অনট্ (ভাববা)।

**পদ-পরিবর্তন** ॥ দুর্গম (বিণ)—দুর্গমতা (বি)। গিরি (বি)—গৈরিক (বিণ)। নিশীথ (বিণ)—নিশা (বি)। যাত্রী (বি)—যাত্রা (বি)। ব্যাধা (বি)—ব্যথিত (বিণ)। বঞ্চিত (বিণ)—বঞ্চনা (বি)। অভিমান (বি)—অভিযাত্রী (বিণ)। অভিমান (বি)—অভিমানী (বিণ)। ভীকৃ (বিণ)—ভীকৃত (বি)। গুরু (বিণ)—গৌরব (বি)। সন্দেহ (বি)—সন্দিগ্ধ (বিণ)। খুন (বি)—খুনী (বিণ)। গন্ধা (বি)—গান্ধেয় (বিণ)। পরীক্ষা (বি)—পরীক্ষিত (বিণ)। হঁশিয়ার (বিণ)—হঁশিয়ারি (বি)।

**গুণরূপ** ॥ লজ্বিতে—লজ্বন করিতে। ঘোষিয়াছে—ঘোষণা করিয়াছে। ইকিছে—ইক দিতেছে। গরজায়—গর্জন করে। উদিবে—উদিত হইবে। রাঙিয়া—রঞ্জিত হইয়া।

**ব্যাকরণগত টীকা** ॥ রাত্রি-নিশীথে—নিশীথ অর্থাৎ মধ্যরাত্রি। এখানে ‘রাত্রি’ শব্দটি অতিরিক্ত দোষে দুষ্ট। হঁশিয়ার, হিম্মৎ, জোয়ান, তুফান, খুন—বিদেশী শব্দ (ফার্সী)। আগুয়ান—আগ (<অগ্র)+উ+আন। পাড়ি—পাড় (দেশী শব্দ)+ই (ভাবার্থে)। গরজায়<গর্জায়--স্বরভক্তি বা বিধকর্ষ।

# রচনা বিচিন্তা

৮.

বঙ্গানুবাদ

## প্রস্তাবনা

অনুবাদ আমরা সবাই করিয়া থাকি। যখন মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষায় কোন কথা শুনি বা বই পড়ি, এবং সে ভাষা যদি আমাদের জানা থাকে, তবে তখন আমরা মনে মনে বক্তব্যটুকু মাতৃভাষায় অনুবাদ করিয়া তারপর তাহাকে আমাদের উপলব্ধির দ্বারা পাঠাইয়া দিই। ইহা অনুবাদের নীরব প্রক্রিয়া। বলা যায়, নীরব অনুবাদ। আবার, যখন ইংরেজিতে কথা বলি বা ইংরেজিতে লিখি, তখন আমরা প্রথমে ভাবি বাংলায় এবং তারপর মনে মনে ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়া লই। এই প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে চলে। তাই ধরা যায় না। তবে কাগজে-কলমে অনুবাদ করিবার সময় এত বিহ্বলতা কেন?

অনুবাদকের কাছে আমাদের দাবি দুইটি : প্রথমতঃ, অনুবাদ যথাসম্ভব আক্ষরিক [ literal ] হওয়া উচিত। ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দের উপযুক্ত প্রতিশব্দ অনুদিত অংশে যথাযথরূপে ব্যবহার করা চাই। দ্বিতীয়তঃ, অনুদিত অংশের সাবলীলতা রক্ষিত হওয়াও দরকার। অর্থাৎ, প্রাথমিক প্রয়াসে আক্ষরিক অনুবাদ করিয়া যদি দেখা যায় যে, বক্তব্য অস্পষ্ট থাকিয়া যাইতেছে, ভাব খোঁড়াইয়া চলিতেছে, তবে সাবলীলতা আনিবার জন্য ভাবানুবাদের দিকে একটু মন দিতে হইবে। আক্ষরিক অনুবাদ ও ভাবানুবাদের মিশ্র-পদ্ধতিই অনুবাদ-শিল্পের শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি।

তবে স্মরণীয় যে, ইংরেজি ও বাংলা—এই দুই ভাষার রূপ-রীতি ও বিভাগ-প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। কাজেই, উভয় ভাষার স্বতন্ত্র রূপ-রীতি ও বাগ্‌ধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়া চাই। দ্বিতীয়তঃ, একের বৈশিষ্ট্য অন্যের বৈশিষ্ট্যে রূপান্তরিত হওয়া চাই।

কোন প্রবন্ধ বা কোন অনুচ্ছেদের আছে দুইটি দিক : ভাব এবং ভাষা। অনুবাদ-কর্ম হইল, ভাবকে অটুট রাখিয়া ভাষান্তরীকরণ। তবু এক ভাষার আবেগ ও উত্তাপ অন্য ভাষায় সঞ্চারিত হওয়াও প্রয়োজন। অনুবাদ-কর্মে সাক্ষ্য ধরা পড়ে সেইখানেই। অর্থাৎ, মূল অংশে ভঙ্গী যদি সরস হয়, অনুদিত অংশের ভঙ্গীও হইবে সরস। আর, মূল অংশে ভঙ্গী যদি ধীরোদাত্ত হয়, অনুদিত অংশেও তাহা হইবে ধীরোদাত্ত।

অনুবাদ-কর্মে হাত দিবার আগে ছাত্রদের নিজ নিজ শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিতে হইবে। যাহার শব্দভাণ্ডার যত সমৃদ্ধ, অনুবাদ-কর্মে সে ততই সিদ্ধহস্ত। আবার, শুধু প্রচুর শব্দের অধিকারী হইলেই ভালো অনুবাদ করা যায় না। সেগুলি যথাযথভাবে ব্যবহার করিতে পারা চাই। মূল বাক্যে যে শব্দ ও বাক্যাংশে গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে, অনুদিত অংশেও যেন তাহার প্রতিশব্দগুলিতে ঠিক সেই গুরুত্ব আরোপিত হয়।

সবশেষে একটি কথা, ইংরেজি হইতে বাংলায় অনুবাদকালে সাধু বা চলিত ভাষা কে কোন একটি রীতি অনুসরণীয়। যে রীতিই অনুসরণ করা হউক না কেন, আশঙ্ক্য সেই এক রীতিই অনুসরণ করিতে হইবে। তাছাড়া, একদিনে অনুবাদ-কার্যে দক্ষতা অর্জন করা যায় না। তাহার জন্য চাই নিয়মিত অনুবাদ-চর্চা। সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রথম অংশে হাতে-কলমে অনুবাদ শিক্ষা, দ্বিতীয় অংশে আদর্শ অনুবাদ এবং তৃতীয় অংশে পরীক্ষার জন্য পঞ্চাশ সংকেতসহ অনুচ্ছেদ প্রদত্ত হইয়াছে।

ক.

### বাক্যের ভিত্তিতে অনুবাদ

প্রথমেই প্রদত্ত বাক্যটিকে বিশ্লেষণ করিয়া লইতে হইবে। বাক্য-বিশ্লেষণের সহজ পদ্ধতিটি হইল : বাক্যের মধ্যস্থিত সব কয়টি সমাপিকা ক্রিয়াকে [ finite verb ] প্রথমে নিয়ন্ত্রে রাখিত করিয়া লইতে হইবে। যতগুলি সমাপিকা ক্রিয়া আছে, ততগুলি বাক্যাংশ [ clause ] আছে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। যদি একটিমাত্র সমাপিকা ক্রিয়া থাকে, তবে বুঝিতে হইবে, ইহা একটি সরল বাক্য [ simple sentence ]।

### Simple Sentence-এর বঙ্গানুবাদ :

প্রথমে বাক্যটির finite verb-টিকে ধরো। তাহাকে who বা what দিয়া প্রশ্ন করিয়া কোন্ পদটি কর্তা [ nominative ] বুঝিয়া নাও। তারপর finite verb-কে whom বা what দিয়া প্রশ্ন করিলে কোন্ পদটি কর্ম [ object ] বাহির হইয়া আসিবে। এইবার কর্তা, সমাপিকা ক্রিয়া এবং কর্মপদের বাংলা প্রতিশব্দ বসাইয়া নাও। এখন আগে কর্তা, তারপর কর্ম এবং সর্বশেষে ক্রিয়াপদ—বাংলা বাক্যের এই ক্রম-অনুসারে সাজাইয়া নাও। এবার কর্তার যদি বিশেষণ থাকে, কর্তার আগে এবং কর্মের যদি বিশেষণ থাকে, কর্মের আগে বসো। আর, ক্রিয়াবিশেষণ যদি থাকে, তবে তাহাকে সমাপিকা ক্রিয়ার আগে বসাইয়া নাও। বাংলার সাধারণ পদ-বিন্যাস-পদ্ধতি [ syntax ] এই রকম। কিন্তু স্টাইলের খাতিরে কখনও কখনও এই পদ-বিন্যাস রীতির সামান্য বিপর্যয় ঘটানো যাইতে পারে।

দ্বিতীয়, এক. মূল বাক্যটির যে বাচ্য এবং যে উক্তি, অনুদিত বাক্যটিরও সেই বাচ্য এবং সেই উক্তি রক্ষিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। দুই. প্রশ্নাত্মক ও বিষয়বোধক বাক্যের অনুবাদ মূলানুসারী হইবে। তিন. মূল বাক্যটিতে ক্রিয়ার যে কাল [ tense ],

অনুদিত বাক্যটিতে ক্রিয়ার সেই কাল হইবে। চার, মূল রচনার অল্পচ্ছেদ ভাগ থাকিলে অনুদিত অংশেও অল্পচ্ছেদ ভাগ থাকা উচিত। পাচ, ই ও ঙ্গ-কার; উ ও উ-কার; খ ও ক; ন ও ণ; শ, ষ ও স এবং র ও ড—এইগুলির ক্ষেত্রে বানানের ভুল প্রায়ই হইয়া থাকে; ছাত্র-ছাত্রীরা এইগুলির ক্ষেত্রে সতর্ক থাকিবে।

## অনুশীলনী

● A great king lived in the city of Baghdad. প্রথমে finite verb-টি ধর—'Lived', এবং প্রশ্ন কর—Who lived? King—ইহাই কর্তা; object নাই। 'King lived'—ইহার বাংলা প্রতিশব্দ বসাইলে দাঁড়ায় 'রাজা বাস করিতেন।' কি রকম রাজা? A great king—'এক মহান রাজা।' কোথায় বাস করিতেন—'In the city of Baghdad'—'বাগদাদ শহরে।'

অনুদিত বাক্য : 'বাগদাদ শহরে এক মহান রাজা বাস করিতেন।'

● The name of Thomas Edison is well-known. Finite verb—'is': প্রশ্ন—What is? উত্তর—The name is—'নাম [হয়]'। কাহার নাম?—The name of Thomas Edison—'টমাস এডিসনের নাম'। Well-known—'সুপরিচিত, সুবিধিত'।

অনুদিত বাক্য : টমাস এডিসনের নাম সুপরিচিত।

● A thirsty crow saw a pitcher of water.

একটি তৃষ্ণাক্ত কাক দেখিয়াছিল একটি জলের কলসী।

অনুদিত বাক্য : একটি তৃষ্ণাক্ত কাক একটি জলের কলসী দেখিয়াছিল।

● Some boys were at play by the side of a tank.

কয়েকটি বালক খেলা করিতেছিল একটি পুকুরের ধারে।

অনুদিত বাক্য : কয়েকটি বালক একটি পুকুরের ধারে খেলা করিতেছিল।

● The prize-giving ceremony of our school came off yesterday.

পুরস্কার-বিতরণী উৎসব আমাদের বিদ্যালয়ের হইয়া গেল গতকাল।

অনুদিত বাক্য : আমাদের বিদ্যালয়ের পুরস্কার-বিতরণী উৎসব কাল হইয়া গেল।

● Vidyasagar had great regard for his mother.

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ছিল অসীম ভক্তি তাঁহার মায়ের প্রতি।

অনুদিত বাক্য : বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তাঁহার মায়ের প্রতি ছিল অসীম ভক্তি।

● For the last three weeks our village has been in a state of excitement.

গত তিন সপ্তাহ ধরিয়া আমাদের গ্রাম রহিয়াছে একটি উত্তেজনার অবস্থায়।

অনুদিত বাক্য : গত তিন সপ্তাহ ধরিয়া আমাদের গ্রাম একটি উত্তেজনার অবস্থায় রহিয়াছে।

● The postman is considered to be an important public servant.

ডাকশিষ্যকে মনে করা হয় বলিয়া একজন গুরুত্বপূর্ণ গণ-সেবক।

অনুদিত বাক্য : ডাকশিষ্যকে একজন গুরুত্বপূর্ণ গণ-সেবক বলিয়া মনে করা হয়।

● Coal is an inflammable mineral substance.

কয়লা [হয়] একটি দাহ্য খনিজ পদার্থ।

অনুদিত বাক্য : কয়লা একটি দাহ্য খনিজ পদার্থ।

● From his very childhood Gautama had a religious bent of mind.

অতি শৈশব হইতেই গৌতমের ছিল ধর্মীয় প্রবণতা মনের।

অনুদিত বাক্য : অতি শৈশব হইতেই গৌতমের মনে ধর্মীয় প্রবণতা ছিল বা অতি শৈশব হইতেই গৌতমের মনে ছিল ধর্মীয় প্রবণতা।



### Complex Sentence-এর বলাশুবাদ :

প্রদত্ত বাক্যটিতে যদি একাধিক finite verb থাকে, তবে উহাতে একাধিক বাক্যাংশ [ clause ] থাকিবে। যদি বাক্যাংশগুলির একটি স্বাধীন বাক্যাংশ [ independent clause ] এবং এক বা একাধিক অধীন বাক্যাংশ [ dependent clause ] হয়, তবে উহা অবশ্যই একটি Complex Sentence. স্বাধীন বাক্যাংশটি Principal Clause ; এবং অধীন বাক্যাংশ বা বাক্যাংশগুলি Subordinate Clause.

প্রথমে Principal Clause-টিকে Simple Sentence-এর মতো অনুবাদ করিয়া লইতে হইবে। তারপর Subordinate Clause বা Clause-গুলিকে অনুব্রূপভাবে অনুবাদ করিয়া শেষে সর্বনাম বা অব্যয়ের সাহায্যে যোগ করিয়া দেওয়াই বিধেয়।

### লনী

● One day, when I was cutting down some brushwood, I came upon a peculiar insect. Principal clause—One day I came upon...insect.—একদিন আমি একটি অদ্ভুত কীট দেখিতে পাইলাম। Subordinate clause—when...brushwood.—যখন আমি ছোট ছোট ঝোপ কাটিতেছিলাম।

**অনুবৃত্ত বাক্য :** একদিন যখন আমি ছোট ছোট ঝোপ কাটিতেছিলাম, তখন আমি একটি অদ্ভুত কীট দেখিতে পাইলাম।

● The world always will be the same as long as men are men.

The world...the same.—পৃথিবী সর্বদা একই প্রকার থাকিবে।

As long as...men —যতদিন মানুষ মানুষ থাকিবে।

**অনুবৃত্ত বাক্য :** যতদিন মানুষ মানুষ থাকিবে, [ ততদিন ] পৃথিবী সর্বদা একই প্রকার থাকিবে।

● The appearance of the island when I came on deck next morning was altogether changed.

The appearance of the island was altogether changed.—দ্বীপটির রূপ সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া গিয়াছিল।

When I came on deck next morning.—পরের দিন সকালে যখন আমি জাহাজের পাটাতনের উপর আসিলাম।

**অনুবৃত্ত বাক্য :** পরের দিন সকালে যখন আমি জাহাজের পাটাতনের উপর আসিলাম, তখন দ্বীপটির রূপ সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া গিয়াছিল।

● It is said that Gladstone, the British Prime Minister, used to relax after hard work by cutting wood.

It is said—কথিত আছে। that—যে।

Gladstone...cutting wood —ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী গ্লাডস্টোন চিত্তবিনোদন করিতেন কঠিন পরিশ্রমের পর গাছ কাটিয়া।

**অনুবৃত্ত বাক্য :** কথিত আছে যে, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী গ্লাডস্টোন কঠিন পরিশ্রমের পর গাছ কাটিয়া চিত্তবিনোদন করিতেন।

● The merchant, before he left, gave a costly watch to the poor man as a reward.

The merchant gave a costly...a reward—বণিকটি বরিত্র লোকটিকে পুরস্কার হিসাবে একটি মূল্যবান বস্তু দিরাছিলেন।

before he left—ত্যাগ করিবার পূর্বে ; অর্থাৎ বিদায়ের পূর্বে।

**অনুবৃত্তি বাক্য :** বিদায়ের পূর্বে বণিকটি বরিত্র লোকটিকে পুরস্কার হিসাবে একটি মূল্যবান বস্তু দিরাছিলেন।

● The man who perpetually hesitates which of the two things he will do first, will do neither.

The man will do neither.—ব্যক্তিটি কোনটিই করিবে না।

Who perpetually hesitates—যে চিরকাল ইতস্ততঃ করে।

Which of the two things he will do first—সে দুইটির মধ্যে কোনটি আগে করিবে।

**অনুবৃত্তি বাক্য :** যে ব্যক্তি [ কাজ ] দুইটির মধ্যে কোনটি আগে করিবে [ ভাবিয়া ] চিরকাল ইতস্ততঃ করে, সে কোনটিই করিবে না।

● A poor woman once came to Buddha to ask him whether he could give her any medicine to restore her dead child to life.

A poor woman ..to ask him—একদিন এক বরিত্র স্ত্রীলোক বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিতে তাঁহার কাছে আসিয়াছিল।

Whether he could give her...child to life—তাঁহার মৃত সন্তানকে বাঁচাইয়া তোলার জন্য তাহাকে তিনি কোন ঔষধ দিতে পারেন কিনা।

**অনুবৃত্তি বাক্য :** একদিন এক বরিত্র স্ত্রীলোক তাঁহার মৃত সন্তানকে বাঁচাইয়া তোলার জন্য তাহাকে কোন ঔষধ দিতে পারেন কিনা জিজ্ঞাসা করিতে বুদ্ধের কাছে আসিয়াছিল।

● Sir Walter Scott was a man who was honest to the core of his nature.

Sir Walter Scott was a man—স্বার ওয়াটসন স্বতঃ ব্যক্তি ছিলেন। Who was honest...his nature—বিনি তাঁহার স্বভাবের অন্তঃকরণ পর্যন্ত সৎ ছিলেন।

**অনুবৃত্তি বাক্য :** স্বার ওয়াটসন স্বতঃ তাঁহার স্বভাবের অন্তঃকরণ পর্যন্ত সৎ ব্যক্তি ছিলেন।

● The mystery of Napoleon's career was this ; that under all difficulties and disadvantages he pressed on.

The mystery of Napoleon's career was this—নেপোলিয়নের জীবনের রহস্য ছিল এই। That under all...pressed on—যে, সমস্ত কষ্ট ও অসুবিধার মধ্যে তিনি অগ্রসর হইয়া চলিতেন।

**অনুবৃত্তি বাক্য :** নেপোলিয়নের জীবনের রহস্য ছিল এই যে, তিনি সমস্ত কষ্ট ও অসুবিধার মধ্যে অগ্রসর হইয়া চলিতেন।

● It happened one day that, going towards my boat, I [ Robinson Crusoe ] was exceedingly surprised with the print of a man's naked foot on the shore, which was very plain to be seen in the sand.

It happened one day—একদিন ঘটিল ; that, going...on the shore—যে, আমার নৌকার দিকে বাইতে বাইতে আমি [ রবিনসন ক্রুসো ] তীরের উপর মানুষের খালি পায়ের চিহ্ন দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া গেলাম ; which was...in the sand—যাহা ছিল বালিতে সহজে চোখে পড়ার মতো।

**অনুবৃত্তি বাক্য :** একদিন এমন ঘটিল যে, আমার নৌকার দিকে বাইতে বাইতে তীরের উপর বালিতে সহজে চোখে পড়ার মতো মানুষের খালি পায়ের চিহ্ন দেখিয়া আমি [ রবিনসন ক্রুসো ] অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া গেলাম।

## Compound Sentence-এর বঙ্গানুবাদ :

প্রদত্ত বাক্যে একাধিক finite verb থাকিলে একাধিক বাক্যাংশ থাকিবে এবং বাক্যটি simple sentence না হইয়া complex অথবা compound হইবে। কিন্তু যদি দেখা যায় বাক্যাংশগুলির সব কয়টিই স্বাধীন বাক্যাংশ, তবে উহা অবশ্যই compound sentence হইবে।

প্রথমে compound sentence-এর স্বাধীন বাক্যগুলিকে পৃথক পৃথকভাবে simple sentence-এর মতো বঙ্গানুবাদ করিয়া লইবে; তারপর প্রদত্ত বাক্যানুযায়ী সংযোজক অব্যয় [ও, এবং, আর ইত্যাদি] বা বিয়োজক অব্যয় [অথবা, কিংবা, বা ইত্যাদি] যোগ করিয়া লইলে অনুদিত বাক্যটির পূর্ণরূপ পাওয়া যাইবে।

### অপুন্দ্রলন।

- God made the country and man made the town.

God made the country—ঈশ্বর দেশ সৃষ্টি করিয়াছেন।

Man made the town—মানুষ শহর তৈয়ারী করিয়াছে। And—এবং।

**অনুদিত বাক্য :** ঈশ্বর দেশ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং মানুষ তৈয়ারী করিয়াছে শহর। [ক্রিয়াপদটিকে কর্তার পূর্বে বসানো হইয়াছে।]

● 'Vidyasagar' literally means 'the ocean of learning', but Iswar Chandra, in spite of his vast scholarship was perhaps more an ocean of kindness than of learning.

'Vidyasagar'...of learning—'বিদ্যাসাগর'র আক্ষরিক অর্থ 'বিদ্যার সাগর'। Iswar Chandra...than of learning—ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও সম্ভবতঃ বিদ্যার অপেক্ষা দয়ার সাগরই ছিলেন বেশী। but—কিন্তু।

**অনুদিত বাক্য :** 'বিদ্যাসাগর'র আক্ষরিক অর্থ 'বিদ্যার সাগর'; কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও সম্ভবতঃ বিদ্যার অপেক্ষা দয়ার সাগরই ছিলেন বেশী।

● In Japan Netaji Subhas Chandra Basu organised his Azad Hind Army from among Indian war-prisoners, crossed South-East Asia and finally planted the Indian flag of independence on the eastern frontiers of India.

In Japan Netaji Subhas Chandra Basu...war-prisoners—জাপানে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বহু ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের লইয়া তাঁহার আজাদ হিন্দ ফৌজ সংগঠিত করেন। [He] crossed South-East Asia—[তিনি] দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পার হইলেন। [He] finally planted...frontiers of India—[তিনি] অবশেষে ভারতের পূর্ব-সীমান্তে ভারতের স্বাধীনতার নিশান প্রোথিত করিয়া দিলেন। And—এবং।

**অনুদিত বাক্য :** জাপানে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বহু ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের লইয়া তাঁহার আজাদ হিন্দ ফৌজ সংগঠিত করিলেন এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পার হইয়া অবশেষে ভারতের পূর্ব-সীমান্তে ভারতের স্বাধীনতার নিশান প্রোথিত করিয়া দিলেন।

● The old gardener came from the next village and planted some mango and apple trees in the side border of my uncle's garden.

The old gardener...village—কুড়া গ্রামীণ পাশের গ্রাম হইতে আসিল। [He] planted some mango...uncle's garden—[সে] আমার কাকার বাগানের সীমানার ধারে কয়েকটা আম এবং আপেল গাছ পুতিয়া দিল। And—এবং।

**অনুবৃত্তি বাক্য :** বৃদ্ধা মালী পানের গ্রাম হইতে আসিয়া আমার কাকার বাগানের গীমানার' ধারে কয়েকটা আম এবং আপেল গাছ পুতিয়া দিল।

● After a long battle Napoleon's troop were eager to return home and refused to advance further.

After a long battle...to return home—দুর্বার্ষ যুদ্ধের পর নেপোলিয়নের সৈন্তবল গৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। [They] refused...further—[তাহারা] আর অগ্রসর হইতে অস্বীকার করিল। and—এবং।

**অনুবৃত্তি বাক্য :** নেপোলিয়নের সৈন্তবল গৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল এবং আর অগ্রসর হইতে অস্বীকার করিল।

● The princess went to the garden next morning and saw the handsome prince there, but he could not recognise her.

The princess went...morning—রাজকন্যা পরদিন সকালে বাগানে গেল। [She] saw...there—সেখানে সে হৃন্দর রাজপুত্রকে দেখিতে পাইল। He could not...her—সে তাহাকে চিনিতে পারিল না। And—এবং, but—কিন্তু।

**অনুবৃত্তি বাক্য :** পরদিন সকালে রাজকন্যা বাগানে গিয়া সেই হৃন্দর রাজপুত্রকে দেখিতে পাইল : কিন্তু তাহাকে সে চিনিতে পারিল না।

● Instantly the figure reappeared, and, making a wide circuit, began to head me off.

Instantly the figure reappeared—তৎক্ষণাৎ সেই কলেবরটি পুনরায় উপস্থিত হইল। [He] making a wide.. me off—[সে] বিশাল বৃত্ত রচনা করিয়া আমাকে স্তম্ভিত হইতে লাগিল। And—এবং।

**অনুবৃত্তি বাক্য :** তৎক্ষণাৎ সেই কলেবরটি পুনরায় উপস্থিত হইল এবং বিশাল বৃত্ত রচনা করিয়া আমাকে স্তম্ভিত হইতে লাগিল।

● He was concealed by this time behind another tree trunk ; but he must have been watching me closely, for as soon as I began to move in his direction he reappeared and took a step to meet me.

He was concealed...tree trunk—এইবার সে অন্ত্র একটি গাছের কাণ্ডের আড়ালে লুকাইয়া পড়িল। He must have been...me closely—সে আমাকে নিশ্চয়ই তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য করিতেছিল। [He] took a step to meet me—আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে এক পা আগাইয়া আসিল। As soon as I...direction—যেইমাত্র আমি তাহার দিকে অগ্রসর হইতে শুরু করি। He reappeared—সে পুনরায় উপস্থিত হইল। But—কিন্তু, for—কারণ, and—এবং।

**অনুবৃত্তি বাক্য :** এইবার সে অন্ত্র একটি গাছের কাণ্ডের আড়ালে লুকাইয়া পড়িল ; কিন্তু সে আমাকে নিশ্চয়ই তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য করিতেছিল, কারণ, যেইমাত্র আমি তাহার দিকে অগ্রসর হইতে শুরু করিলাম, অমনি সে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আগাইয়া আসিল।

● The old lady pulled her spectacles down and looked over them about the room ; then she put them up and looked out under them.

The old lady...down—বৃদ্ধা মহিলাটি তাহার চশমা নীচে নামাইয়া দিলেন। [She] looked...the room—তাহার উপর দিয়া ঘরের চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন। She put them up—তিনি উহা উপরে তুলিয়া দিলেন। [She] looked out under them—[তিনি] তাহার নীচ দিয়া তাকাইতে লাগিলেন। And—এবং, then—তারপর।

**অনুবৃত্তি বাক্য :** বৃদ্ধা মহিলাটি তাহার চশমা নীচে নামাইয়া তাহার উপর দিয়া ঘরের চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন ; তারপর উহা উপরে তুলিয়া তাহার নীচ দিয়া তাকাইতে লাগিলেন।

পারে এবং আরও পরে বিদায় লইতে পারে। বছরের মধ্যে এই ঋতুতেই সামান্য সাধারণতঃ প্রচুর বৃষ্টি পাইয়া থাকি।

৪. The post of a clerk fell vacant in an office. Among those who applied for the post was a youngman who was a bit hard of hearing. He had heard that the employer ordinarily put three questions to those candidates whom he granted an interview. First he would ask, 'How old are you?' Then he would ask, 'How long are you in this line?' Lastly, he would say, 'Are you fond of study or games?'

Being called for an interview, the youngman appeared before the employer.

'How long are you in this line?' he was asked.

'Eighteen years, sir.'

'Eighteen years! Well, how old are you, then?'

'Only six months, sir?'

'Are you a fool, or a scoundrel?'

'Both', was the prompt reply.

কোন অফিসে একটি কেরানীর পদ খালি হইয়াছিল। পদটির জন্য আবেদনকারীদের মধ্যে ছিল একটি যুবক; সে কানে একটু কম শুনিত। সে শুনিয়াছিল যে, বাহাদের সাক্ষাৎকার মঞ্জুর করা হইয়াছে, মালিক তাহাদের সাধারণতঃ তিনটি প্রশ্ন করেন। প্রথমে তিনি প্রশ্ন করেন, 'তোমার বয়স কত?' তারপর তিনি প্রশ্ন করেন, 'তুমি কতদিন এই কাজে আছ?' সবশেষে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'লেখাপড়া অথবা খেলাধুলায় কোনটা তোমার প্রিয়?'

সাক্ষাৎকারে আমন্ত্রিত হইয়া যুবকটি মালিকের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

তাহাকে প্রশ্ন করা হইল, 'কতদিন তুমি এ কাজে আছ?'

'আঠার বছর, মহাশয়।'

'আঠার বছর! বেশ, তাহলে তোমার বয়স কত?'

'মাত্র ছয় মাস, মহাশয়।'

'তুমি নিবোধ, না দুর্বৃত্ত?'

চটপট উত্তর আসিল—'দুই-ই।'

৫. A traveller hired an ass to carry him to a distant place. The day being intensely hot, the traveller stopped to rest under the shadow of the ass. As this afforded protection only for one and both the traveller and the owner of the ass claimed it, a violent dispute arose between them as to which of them had the

right to it. The traveller said that he had, with the hire of the ass, hired the shadow also. The owner maintained that he had let the ass only, and not the shadow. The quarrel proceeded from words to blows, and while the men were fighting, the ass galloped off.

কোন পথিক একটি দূরবর্তী স্থানে তাহাকে বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য একটি গাধা ভাড়া করিয়াছিল। প্রথম উত্তম দিন ছিল বলিয়া পথিকটি গাধার ছায়ায় বিশ্রাম করিবার জন্য থামিল। উহা কেবলমাত্র একজনকেই আশ্রয় দিতে পারিত এবং পথিক ও গাধার মালিক উভয়েই উহা দাবি করায় তাহাদের মধ্যে কে উহা পাইবার অধিকারী—তাহা লইয়া প্রচণ্ড বিবাদ উপস্থিত হইল। পথিকটি বলিল, গাধাটি ভাড়া করার সঙ্গে সঙ্গে সে তাহার ছায়াটিও ভাড়া করিয়াছে। মালিক বলিল যে, সে শুধু গাধাটাই ভাড়া দিয়াছে, ছায়া নয়। বিবাদটা কথা কাটাকাটি হইতে হাতাহাতিতে পরিণত হইল, এবং লোক দুইটি যখন মারামারি করিতেছিল, গাধাটি সেই অবসরে চম্পট দিল।

৬. Once a wood-cutter was cutting a tree on the bank of a river. Suddenly, his axe fell into the water of the river. The wood-cutter was very much aggrieved. He bewailed and bemoaned over the loss of his axe. In no time, a stranger appeared before him with a golden axe. The stranger asked him, if that axe was his. The wood-cutter replied that it was not his. The stranger again appeared with a silver axe. But the wood-cutter again refused. The stranger vanished and reappeared with the iron axe. On seeing his own axe, the wood-cutter was beside himself with joy. He exclaimed, 'Oh, generous-hearted God, this axe is mine!' The God of water was very much impressed and pleased at the honesty of the poor wood-cutter. He gave all the three axes to him as a reward for his honesty and truthfulness.

একদিন এক কাঠুরিয়া নদীর ধারে একটি পাছ কাটিতেছিল। হঠাৎ তাহার কুড়লটি নদীর জলে পড়িয়া গেল। কাঠুরিয়া মনে মনে খুবই দুঃখিত হইল। কুড়ল হারাইয়া সে কান্নিতে ও উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিল। অবিলম্বে তাহার সম্মুখে এক অজ্ঞাত ব্যক্তি একটি সোনার কুড়ল লইয়া উপনীত হইলেন। আগন্তক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐ কুড়লটি তাহার কিনা। কাঠুরিয়া উত্তর করিল যে, উহা তাহার নয়। আগন্তক একটি রূপার কুড়ল লইয়া পুনরায় আবির্ভূত হইলেন। কিন্তু কাঠুরিয়া পুনরায় অস্বীকার করিল। আগন্তক অদৃশ্য হইলেন এবং সোনার কুড়লটি লইয়া পুনরায় আবির্ভূত হইলেন। নিজের কুড়লটি দেখিয়া কাঠুরিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিল। সে চিৎকার করিয়া বলিল, 'হে দয়ালু ঈশ্বর! এই

কুড়ুলটাই আমার।' জলদেবতা কারুরিয়ার এই সততায় গভীরভাবে মুগ্ধ ও সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি তাহাকে তাহার সততা ও সত্যপরায়ণতার জন্য পুরস্কার হিসাবে তিনটি কুড়ুলই দান করিলেন।

৭. Once a greedy dog managed to secure a big piece of meat from a shop in a town. As he was very selfish, he decided to run away with the piece of meat from the town and eat it all alone. On the way, he was crossing a river by a bridge. The water under it was deep and crystal clear. The dog, while passing over the bridge saw his own reflection in the water. He contended that there must be another dog in the stream with a big piece of meat in his mouth. He wanted to get that piece also. Without wasting any time, he opened his teeth to bark at the dog in water. At once his own piece of meat dropped from his mouth and was carried away by the current of the river.

একদিন একটি লোভী কুকুর শহরের কোন একটি দোকান হইতে বড় এক টুকরো মাংস সংগ্রহ করিয়াছিল। সে ছিল স্বার্থপর, তাই সে স্থির করিয়াছিল, মাংসের টুকরোটি লইয়া শহর হইতে পলাইবে এবং একাই উহা ভক্ষণ করিবে। পথিমধ্যে সে সেতু দিয়া একটি নদী পার হইতেছিল। উহার নীচে জল ছিল গভীর এবং স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ। কুকুরটি সেতুর উপর দিয়া পার হইবার সময় জলে তাহার নিজের ছায়া দেখিতে পাইল। সে মনে করিল যে, বিরাট একটুকরো মাংস মুখে লইয়া অন্য একটি কুকুর নদীতে রহিয়াছে। ঐ মাংসের টুকরোটিও পাইতে তাহার বাসনা হইল। বিলম্ব না করিয়া সে জলের ভিতরের কুকুরটার দিকে চিংকার করিতে দাঁত ফাঁক করিল। তৎক্ষণাৎ তাহার নিজের মাংস টুকরোটি তাহার মুখ হইতে খসিয়া পড়িল এবং নদীর স্রোতে ভাসিয়া গেল।

৮. Once a thirsty crow was flying hither and thither in search of water. It was the month of June. All the tanks and ponds of the locality had dried up. At length, after a long labour, a pitcher came in his sight. He flew to the pitcher and found that the water was just at the bottom of it. He tried his level best to reach the water with his beak but could not succeed.

He strained his nerves to hit out a plan to quench his thirst with the water of the pitcher. He saw some pebbles lying nearby. He took the pebbles with his beak and dropped them into the pitcher one by one. The level of the water rose slowly to the mouth and the crow was able to quench his thirst with the water.

একদিন একটি তৃষ্ণার্ত কাক জলের অন্বেষণে ইতস্ততঃ উড়িতেছিল। জুন মাস। হানীরা সর কয়টি দীর্ঘ ও পুরুদেহী গুকাইয়া গিয়াছিল। অবশেষে দীর্ঘ পরিশ্রমের পর একটি কলসী তাহার চোখে পড়িল। সে কলসীটির কাছে উড়িয়া গেল এবং দেখিল যে, কলসীটির তলদেশে জল রহিয়াছে। সে তাহার ঠোট দিয়া জলের নাগাল পাইতে বখাসাধা চেষ্টা করিল, কিন্তু সফল হইতে পারিল না।

কলসীর জলে তৃষ্ণা দূর করিবার জন্য সে অনেক চিন্তা করিয়া একটি কন্দি বাহির করিল। সে দেখিতে পাইল, কাছেই কতকগুলি পাথরের হুড়ি পড়িয়া আছে। পাথরের হুড়িগুলিকে সে ঠোটে করিয়া একটি একটি করিয়া কলসীতে কেলিতে লাগিল। জলের স্তর ধীরে ধীরে হুথের কাছে উঠিয়া আসিল এবং কাকটি ঐ জলে তাহার তৃষ্ণা দূর করিতে সক্ষম হইল।

২. The human race is spread all over the world, from the polar regions to the tropics. The people eat different kinds of food, partly according to the climate in which they live, and partly according to the kind of food which their country produces. Thus in India, the people live chiefly on different kinds of grain, eggs, milk, or sometimes fish and meat. In Europe, people eat more flesh and less grain. In the Arctic regions where no grain and fruits are produced, the Eskimo and other races live almost entirely on flesh, especially fat.

মানবজাতি মেরু-অঞ্চল হইতে ক্রান্তি-অঞ্চল পর্যন্ত পৃথিবীর সর্বত্র বিস্তৃত। মানুষ বিভিন্ন ধরনের খাদ্য গ্রহণ করে—অংশতঃ যে জলবায়ুতে তাহারা বাস করে, তদনুসারে এবং অংশতঃ তাহাদের দেশ যে জাতীয় খাদ্য উৎপাদন করে, তদনুসারে। এইভাবে ভারতে মানুষ প্রধানতঃ শস্য, ডিম, দুধ অথবা কখনও কখনও মাছ এবং মাংস খাইয়া জীবন ধারণ করে। যুরোপে মানুষ অধিকতর মাংস এবং স্বল্পতর শস্য গ্রহণ করে। হুমের অঞ্চলে, যেখানে শস্য বা ফল কিছুই উৎপন্ন হয় না, সেখানে এক্ষিমো এবং অন্যান্য জাতিরা পুরোপুরি প্রায় মাংস, বিশেষতঃ চর্বি খাইয়াই বাচিয়া থাকে।

১০. The giraffe is a very strange-looking animal. What you would notice first about it is its very long neck, so long that its head is often twenty feet from the ground. It has a small head of a deer, with a beautiful large brown eyes and two small blunt horns. Its back slopes down from the shoulders so steeply that it would be very hard to ride on it without slipping off over its tail. Its legs are thin like those of a deer. Its skin is covered with large brown spots. When giraffes were first brought from Africa, which is their home, to Rome in the old days, the Roman people who



মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে বহু শতাব্দী ধরিয়া উজ্জয়িনী নগরীর মতো কোন নগরীই তত বিখ্যাত ছিল না। জনের পীঠস্থান হিসাবে ইহা এসিদ্ধ ছিল। হোমার, দায় ও শেক্সপীয়ারের সহিত একসঙ্গে উচ্চারিত হইবার যোগ্য বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবিদের একজন—কবি কালিদাস একদা এখানে বাস করিতেন। রাজ দেউশক্ত বৎসর আগে জনৈক মহান ভারতীয় রাজা তদানীন্তন কালের শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষি—জয়পুরের রাজা জয়সিংহ এখানে আসিয়াছিলেন এবং কাজ করিয়াছিলেন। কাজেই, বাহারা ভারত-প্রেমিক, জাহারা প্রাচীন উজ্জয়িনী নগরীর প্রতি কি গভীর ভালোবাসা পোষণ করেন, তাহা যে কেহ দেখিতে পাইবেন। কিন্তু আমি বাহারের নামের উল্লেখ করিয়াছি, তদপেক্ষা প্রিয়তর যে নাম ভারতীয় জনগণের অন্তরের অন্তর্ভুক্ত সংরক্ষিত আছে, তাহা হইল বিক্রমাদিত্যের নাম; কথিত আছে, তিনি খ্রীষ্টাব্দের ৫৭ বৎসর পূর্বে মালবের রাজা হইয়াছিলেন। তাহা কত, কত বৎসর আগের কথা।

১৪. It was not long before his grandmother and all the neighbourhood knew what Isaac had been about. He had constructed a model of the windmill, though not so large, I suppose, as one of the box-traps which boys set to catch squirrels, yet every part of the mill and its machinery was complete. Its little sails were neatly made of linen, and whirled round very swiftly when the mill was placed in a draught of air. Even a puff of wind from Isaac's mouth or from a pair of bellows was sufficient to set the sails in motion. And, what was most curious, if a handful of grains of wheat were put into the little hopper, they would soon be converted into snow-white flour.

Isaac's playmates were enchanted with his new windmill. They thought that nothing so pretty and so wonderful had ever been seen in the world.

আইজাক কি হইবেন, তাহা জানিতে জাহার পিতামহী এবং প্রতিবেশী সকলের বেশী দেরী হয় নাই। তিনি একটি নকল বায়ুকল তৈয়ারী করিয়াছিলেন—খুব একটা বড় নয়, মনে হয়, কাঠবিড়ালী ধরিবার জন্ত পাতিবার ইঁদুরকলের মতো; কিন্তু কলটি এবং উহার যন্ত্রপাতির প্রতিটি অংশ ছিল সম্পূর্ণ। ইহার ছোট দাঁড়গুলি পরিচ্ছন্নভাবে পট্টবস্ত্রে নির্মিত ছিল এবং ইহা এক দমক বাতাসের মধ্যে রাখিয়া দিলে দ্রুত ঘুরিতে থাকিত। এমন-কি, আইজাকের মূণ-নিঃসৃত অথবা ঈগর-নিঃসৃত একটি ফুঁ-ই দাঁড়গুলিকে গতি দান করিবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। এবং, সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় ছিল, যদি এক মুঠো গমের দানা ইহার ছোট মুলটিতে দেওয়া হইত, তাহারা অবিলম্বে চুবার-ধবল ময়দার রূপান্তরিত হইত।

আইজাকের খেলার সঙ্গীরা জাহার নূতন বায়ুকল মুগ্ধ হইয়া দেখিত। জাহারা জ্ঞানিত যে, এত সুন্দর ও বিস্ময়কর কোন জিনিস পৃথিবীতে কখনও দেখা যায় নাই।

১. Man is the architect of his own fate. If he makes a proper division of his time and does his duties accordingly, he is sure to improve and prosper in life; but if he does otherwise, he is sure to repent when it is too late, and he will have to drag a miserable existence from day to day. To kill time is as culpable as to commit suicide, for our life is nothing but the sum-total of hours, days and years. Youth is the seed-time of life. In youth, the mind is pliable and soft and can be moulded in any form, we like. If we lose the morning hours of life, we shall have to repent afterwards.

মাহুযই তাহার নিজের ভাগ্যের স্থপতি। যদি সে তাহার সময়কে ঠিকমতো ভাগ করিয়া তদনুযায়ী তাহার কর্তব্য সম্পাদন করে, তবে সে জীবনে নিশ্চয়ই উন্নতি এবং সমৃদ্ধি লাভ করিবে। কিন্তু যদি সে তাহা না করে [অন্তরূপ করে], যখন দেয়ী হইয়া বাইবে, তখন তাহাকে অহুশোচনা করিতে হইবে, এবং তাহাকে দিনের পর দিন এক শোচনীয় জীবন বাপন করিতে হইবে। সময় অপচয় করা আত্মহত্যার মতো নিন্দনীয়, কারণ আমাদের জীবন ঘণ্টা, দিন ও বছরের যোগফল ছাড়া অস্ত্র কিছুই নয়। শৈশব জীবনের বীজবপনের সময়। শৈশবে মন নরম ও নমনীয় থাকে এবং আমাদের ইচ্ছামত ছাঁচে তাহাকে গঠন করা যায়। জীবনের প্রভাতকাল যদি আমরা নষ্ট করি, আমাদেরিগকে ভবিষ্যতে অহুশোচনা করিতে হইবে।

প।

অনুবোদ্ধ

সংকেত-সহ

১. Honesty is a great virtue. If you do not tell a lie, if you do not deceive others, if you are strictly just and fair in your dealings with others, you are an honest man.

Honesty is the best policy. An honest man is respected by all. Everyone trusts an honest man. No one can prosper in his life, if he is not honest. A shop-keeper who is honest, is liked very much by his customers. All men go to visit his shop and buy things from him. They take him in their confidence. His credit grows and his business flourishes.

সংকেত : Virtue : গুণ। Dealings : ব্যবসার। Prosper : উন্নতি করা। Customers : ক্রেতাপণ। Confidence : বিশ্বাস। Credit : খ্যাতি।

২. A real friend is he who remains true to us, as long as he lives. He will share our sorrows as well as our joys. He will stand by us in our hard times and is always ready to help us. He will risk

everything, even his very life for the sake of his friend. How fortunate is the man who has such a friend.

A friendship may last throughout the whole of life, if it is between equals. A rich man can hardly understand the sorrows of a poor man. On the other hand, a poor man can not freely open his heart to a rich friend. Similarly, a youngman and an old man can not be friends with each other.

লংকেত : Fortunate : ভাগবান্ । May last : হারী হইতে পারে । Similarly : অনুরূপ-ভাবে ।

৩. 'I am seriously ill', moaned Buddhu to his wife. 'Yesterday a headache laid me low, and today I am struck down with a cold I shall be dead if you do not fetch me a doctor.'

When the doctor arrived, he felt Buddhu's pulse and examined his chest. After he had finished, he wrote a prescription on a piece of paper and handed it over to Buddhu. 'Take this before going to bed to-night,' he said.

Before he fell asleep that night, Buddhu swallowed the paper ; and when he rose next morning, he was completely cured

লংকেত : Seriously : সা বাত্বিকভাবে । Moaned : গোঙাইতে গোঙাইতে বলিল । Fetch : আনা । Pulse : নাড়ী । Chest : বুক । Prescription : ব্যবস্থাপত্র ।

৪. A man was begging in the crowded streets of a big city. He was wearing a label with the word 'Blind' on it. A gentleman passing his way dropped a coin into his hand, but the coin fell on the ground and rolled into the gutter. To the astonishment of the gentleman, the beggar quickly stepped into the gutter and picked up the coin 'I thought you were blind', said the man who had been moved to pity at the thought of the beggar's loss of sight. 'Blind!' said the beggar. 'Why, they must have put the wrong label on me. I am deaf and dumb.'

লংকেত : Crowded : জনবহুল । Label : লেবেল । Gutter : নর্দমা, পয়োনালী ।

৫. It is wonderful how a rumour grows. A traveller, while walking along a road at night, noticed a glow-worm shining in a hedge near a haystack. Soon after, he met a man and told him what he had seen, adding that at first he thought the light was a burning match. The man told another that a traveller had seen a burning match near a haystack, and that there was danger of the haystack getting on fire. When the next report of the incident

danger of the farm-house catching fire too. Finally, the story was that the farm-house was burnt down with all the inmates of it. And all this arose out of the traveller's simple remark that a glow-worm's light looked like a burning match.

লংকেড : Rumour : ভাষ্য। Glow-worm : জোনাফি। Hedge : বোপ। Haystack : খড়ের গাঁহ। Report : বিবরণ। Farm-house : খামারবাড়ী।

✓ ৬. One day, Emperor Akbar asked Birbal, 'How many crows are there in the city of Delhi?' What a strange question this was! But Birbal was ever ready with his wit. Without losing a moment he replied, 'At the present moment, O King, there are in this city exactly ninety-nine thousand, nine hundred and ninety-nine crows.' 'How do you know that?' asked the king. 'If your Majesty doubts my word,' said Birbal to the king, 'please order someone to count them. If there are fewer than the number I have told, please remember that some of them may have gone to visit their friends and relations round about this city. If there are more, some of their near relations and friends may have come to see them.' No doubt, Emperor Akbar was highly pleased with Birbal's clever answer.

লংকেড : Strange : অদ্ভুত। Exactly : ঠিক। Your Majesty : জাহাঙ্গীর [এখানে]। Relations : আত্মীয়গণ।

✓ ৭. I do not know whence I got the notion that good hand-writing was not a necessary part of education, but I retained it until I went to England. When later, especially in South Africa, I saw beautiful hand-writing of lawyers and youngmen born and educated in South Africa, I was ashamed of myself and repented of my neglect. I saw that bad hand-writing should be regarded as a sign of imperfect education. I tried later to improve mine but it was too late. Let every man and woman be warned by my example, and understand that a good hand-writing is necessary part of education.

লংকেড : Whence : কোথা হইতে। Hand-writing : হস্তাক্ষর। Education : শিক্ষা। Late : পরে। Especially : বিশেষতঃ। Lawyers : উকিল। Ashamed : লজিত।

✓ ৮ The Swallow passed by the castle where the rich were making themselves merry. He passed by the rivers and saw all the ships ready to sail away. He passed over the crowded shops, and saw the people buying and selling. At last, he came to the poor

house and looked in. The boy was lying ill on his bed, and the mother had fallen asleep, as she was very tired. In he flew, and laid the great ruby on the table beside the woman's hand. Then he flew round in bed, cooling the boy's head with his wings. 'How cool I feel,' said the boy, 'I must be getting better,' and he went to sleep.

সংক্ষেপ : Castle : প্রাসাদ। Merry : স্ফুর্তি। Ruby : রূবি।

২. In civilized countries, when two individuals have a quarrel that they can not settle among themselves, they go before the judge. The judge, by his decision, settles the quarrel. It might be expected that a similar course would be followed by civilized nations in quarrels among nations; and some progress has been made in this matter, in recent times, by the employment of arbitration to settle quarrels between nation and nation. But, in spite of this, war is still generally regarded as the only ultimate way of settling national quarrels; the armies of great nations are larger than they ever were before in the history of the world, and there seems little hope of the peace of the world, without the need of war.

সংক্ষেপ : Civilized : সভ্য। Individuals : ব্যক্তি। Settle : সৌহার্দ্য করা। Decision : সিদ্ধান্ত। Arbitration : মালিমাতি।

১০. One winter morning the Selfish Giant looked out of his window as he was dressing. He did not hate the winters now, for he knew that it was merely the spring asleep, and that the flowers were resting.

Suddenly he rubbed his eyes in wonder, and looked and looked. It certainly was a marvellous sight. In the farthest corner of the garden was a tree quite covered with lovely white blossoms. Its branches were golden, and silver fruits hung down from them, and underneath it stood the little boy he had loved.

সংক্ষেপ : Rubbed : রগড়াইল। Wonder : বিস্ময়। Marvellous : বিস্ময়কর, অবিবাক্য। Blossoms : ফুল।

১১. I was trembling, as I handed the confession to my father. He was then lying on a sick-bed. His bedstead was a plain wooden plank. I handed him the note and awaited my doom.

He read it through, and pearl-drops trickled down his cheeks, wetting the paper. For a moment he closed his eyes in thought, and then tore up the note. He had sat up to read it. He lay down. I wept with him. I could see my father's agony. If I

were a painter, I could draw a picture of the whole scene today, it is still so vivid in my mind.

These pearl-drops of love cleared my mind, and washed my sin away. Only he who has experienced such love can know what it is.

লংকেষ্ট : Confession : স্বীকারোক্তি। Slek-bed : বেগশয্যা। Bedstead : খাট। Plank : তক্তা। Doom : শাস্তি। Pearl-drops : মুক্তাবিন্দু। Agony : মানসিক যন্ত্রণা। Has experienced : অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে।

১২. Next moment we were both groping downstairs, leaving the candle by the empty chest; and the next we had opened the door and were in full retreat. We had not started a moment too soon, the fog was rapidly dispersing; already the moon shone quite clear on the high ground on either side; and it was only in the exact bottom of the dell and round the tavern door that a thin veil still hung unbroken to conceal the first steps of our escape. For less than half-away to the hamlet, very little beyond the bottom of the hill, we must come forth into the moonlight. Nor was this all; for the sound of several footsteps running came already to our ears, as we looked back in their direction, a light tossing to and fro, and still rapidly advancing, showed that one of the newcomers carried a lantern.

লংকেষ্ট : Were groping : হাতড়াইতেছিলাম। Chest : সিন্দুক। Retreat : পিছু হটা। Was...dispersing : অদৃশ হইতেছিল। Ground : ভূমি। Dell : উপত্যকা। Tavern : মদ্যখানা। Hamlet : ক্ষুদ্র গ্রাম।

১৩. The face of the earth is constantly changing. Places which were once dry land are now at the bottom of the sea. The soil that was formerly on the surface is now buried deep down in the earth. Where there were trees and plants, now there are rocks and sand.

Long long ago, dead leaves and branches of trees were buried underground. Areas bearing trees often sank down as a result of an earthquake. The waves of the sea sometimes flowed up to those areas and washed the trees away. The trees were taken down to the bottom of the sea where they lay for a long time. In course of time the sea moved away leaving the trees on dry land. The wind blew dust over them. Pieces of rock fell and covered the soil. The trees were thus buried deep down in the earth.

In the bosom of the earth the dead leaves and branches of these

trees were changed first into peat, and then into something hard and black, which we call coal.

**অংকত:** Constantly: অববরত। Formerly: পূর্বে। Is buried: ডুলাইয়া গিয়াছে। Underground: ভূগর্ভে। Earthquakes: ভূমিকম্প। In course of time: কাল

১৪. Once a philosopher was going to a village. On the way he came across a villager who was also proceeding to the same village. The villager enquired of the philosopher, how much time he would take to reach the village. The philosopher only replied, 'Go on.' The villager thought that the philosopher had not understood his question. He repeated his question, but got the same reply. Now he became sure that the philosopher was a mad man. He went ahead. He hardly covered fifty yards when the philosopher called out to him to come back. 'Well', said the philosopher, 'it will take you one hour and a half to reach the village.' 'God', said the villager, 'but why did not you tell it to me before?' 'O fool!' replied the philosopher, 'how could I tell you anything, when I did not know the speed at which you walk?' The villager felt ashamed and took his way.

**অংকত:** Philosopher: দার্শনিক। Repeated: পুনরাবৃত্তি করিল। Speed: গতিবেগ। Ashamed: লজ্জিত।

১৫. The men and women who lived a few thousand years ago are generally described today as savages or barbarians. They create in our minds a picture of particularly cruel people. On the other hand, there are a few people who look with longing to the earliest periods of human history which they describe as the 'Golden Age', when men were pure and unspoilt, and lived a simple, open-air life in peace and equality. A reading of history does not justify either of these opposite ideas. The Golden Age only looks attractive because we are so far away from it. Distance, as you know, lends enchantment to the view. It is true, there was an equality in those days. But it was an equality of ignorance and poverty, not of knowledge and wealth.

**অংকত:** Savages: অসভ্য। Barbarians: বর্বর। Particularly: বিশেষভাবে। On the other hand: অপরপক্ষে। Longing: আকাঙ্ক্ষা। Golden Age: স্বর্ণযুগ। Unspoilt: নিকলঙ্ক। Open-air: মুক্তবায়ু। Enchantment: মোহ। Ignorance: অজ্ঞতা।

১৬. When the cold, sullen morning dawned, and my people began to load the camels, I always felt loath to give back to the waste this little spot of ground that had glowed for a while with the cheerfulness of a human dwelling. One by one the cloaks, the

saddles, the baggage, the hundred things that strewed the ground and made it look so familiar—all these were taken away, and laid upon the camels.

My tent was spared to the last, but when all else was ready for the start, then came its fall, the pegs were drawn, the canvas shivered, and in less than a minute there was nothing that remained of my genial home but only a pole and a bundle.

A few days' journey in the loneliness of the desert will become frightfully oppressive to anyone. Upon my poor fellows also the access of melancholy came heavy. They bent their necks, and bore it as best as they could ; but their joy was great on the fifth day, when we came to an Oasis, where we found encamped a caravan from Cairo.

সংক্ষেপ : Sullen : বিষী। Loath : অনিচ্ছুক। Waste : খু খু ভুগণ্ড। Strewed : ছড়ানো। Genial : অমায়িক। Oppressive : দুঃখদায়ক। Melancholy : বিষাদ। Oasis : বরগান।

১৭. At the Bose Institute in Calcutta, the great experimenter himself was our guide. Through all an afternoon we followed him from marvel to marvel. We watched the growth of a plant being traced out automatically by a needle on a sheet of smoked glass ; we saw its sudden, suddering reaction to an electric shock. We watched a plant feeding ; in the process it was exhaling minute quantities of oxygen. Each time the accumulation of exhaled oxygen reached a certain amount, a little bell, like the bell that warns you when you are nearly at the end of your line of type-writing, automatically rang. When the sun shone on the plant, the bell rang often and regularly. Shaded, the plant stopped feeding ; the bell rang only at long intervals, or not at all.

সংক্ষেপ : The Bose Institute : বহু বিজ্ঞান-মন্দির। Experimenter : পরীক্ষক। Guide : পথ-প্রদর্শক। Marvel : বিস্ময়। Automatically : আপনা-আপনি। Electric shock : বৈদ্যুতিক অভিঘাত। Was exhaling : নিঃশ্বাস ছাড়িতেছিল। Accumulation : সঞ্চয়। Type-writing : মুদ্রিত্বন।

১৮. The Taj Mahal is a tomb, and we cannot help feeling a certain religious atmosphere as we approach it.

The great gateway to the garden is built of red sandstone, inlaid with ornaments and inscriptions from the Koran in white marble, and surmounted by twenty-six white marble minarets. On entering the gateway, we are surprised at its height and size ;



it is like a very spacious hall. At night the scene is much more impressive. The interior is illuminated by the soft light from a huge brass lamp, which hangs from the centre of the ceiling.

Through the ever-open gateway we see at the far end of the long garden, the beautiful white Taj Mahal itself. No man can remain unmoved at this sight.

অনুবাদ : Religious atmosphere : ধর্মীয় আবহাওয়া। Sandstone : বেলপাথর। Inlaid the Koran : অলংকরণ ও কোরান হইতে উদ্ধৃত শিলালিপিসিঁচিত। Surmounted : উপর হৃদি। Minarets : মিনার। Spacious : চওড়া, প্রশস্ত। Illuminated : আলোকিত।

১২. To be properly enjoyed, a walking tour should be gone upon alone. If you go in a company, or even in pairs, it is no longer a walking tour in anything but name, it is something else, and more to the nature of a picnic. A walking tour should be gone upon alone, because freedom is of the essence; because you should be able to stop and go on, and follow this way or that as the freak takes you; and because you must have your own pace, and not trot alongside as a champion walker. And then you must be open to all impressions and let your thoughts take colour from what you see. You should be as a pipe for any wind to play upon.

অনুবাদ : Walking tour : হাঁটিয়া ভ্রমণ। Picnic : চড়ুইভাতি, বনভোজন। On the essence : অপরিহার্য। Freak : খেয়াল। Champion walker : ইন্টন প্রতিযোগিতার বিকসী। Pipe : বাঁশ।

২০. In village India this is a time of expectancy. Will the monsoon keep its appointment on the normal date? Will it bring plentiful rain properly spread over the season? How will rivers behave? These are questions momentous for the countryside, and anyone gifted with the eye of imagination can see thirsty fields watching the heavens for the answer. The last fortnight before monsoon is a testing time for living creatures. The ploughman goes more slowly to the field, the village artificer prolongs his mid-day rest taken on the floor of his place of work or under a V-shaped roof of straw.

অনুবাদ : Village India : গ্রাম-ভারত। Expectancy : প্রত্যাশা। Appointment : আগমন-দৃঢ়। Normal : স্বাভাবিক। Plentiful : পর্যাপ্ত। Momentous : গুরুত্বপূর্ণ। Testing time : পরীক্ষার সময়। Artificer : কারিগর। V-shaped roof : ঘোচাল।

## ভাবার্থ রচনা ও ভাব-সম্প্রসারণ

কবিতা বা কাব্য-ধর্মী রচনার ভাবেরই কারবার। ভাবই ঐ সকল রচনার প্রাণ। নিত্য-ব্যবহারিক জীবনের ভাষাই কাব্য-কবিতায় ভাবের গৌরবে অনবদ্য হইয়া উঠে। ভাবের সেই সমৃদ্ধ জগতে উত্তরণই কাব্য বা সাহিত্য-পাঠের মূল লক্ষ্য। শব্দের সিঁড়ি বাহিয়া, ভাষার নানা স্তর অতিক্রম করিয়া ভাব-লোকে উত্তীর্ণ হওয়াই বড়ো কথা। সেই ভাবটিকে প্রকাশ করিবার জন্য কত আয়োজন! ছন্দ, অলংকার, শব্দ-বিভ্রাস—সবই ভাবের সৌন্দর্য ও চমৎকারিত্ব সৃষ্টির জন্য। ভাবের স্বর্গলোকে পৌঁছিতে হইলে শব্দ-বিভ্রাসের সেই আবরণ ভেদ করিতে হইবে; ছন্দ ও অলংকারের প্রসাধনে বিভ্রান্ত হইলে চলিবে না; উহাদের একপাশে সরাইয়া রাখিয়া ভাবের মর্মলোকে প্রবেশ করিতে পারিলে কাব্য-সাহিত্য পাঠ সার্থক হইবে।

### ● ভাবার্থ-রচনা ( Substance-writing )

ভাবার্থ-রচনার উদ্ধৃতাংশের মধ্যে যে মূল ভাবটি সংগৃহ্য থাকে, তাহাকে আবিষ্কার করিয়া নিজের ভাষায় পরিস্ফুট করিতে হয়। ভাবার্থ-রচনা উদ্ধৃতাংশের অন্তর্নিহিত মৌল ভাবের পরিস্ফুটন হইলেও শিল্প-সৌষ্ঠব-বর্জিত নয়। ভাবার্থ-রচনার আয়তনও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অর্থাৎ, সংক্ষেপে অথচ শিল্প-সৌকর্যময় ভাষায় ভাবার্থ রচনা করিতে হইবে। ইহার আয়তন সম্পর্কে স্মরণীয় যে, ইহা সব সময় উদ্ধৃতাংশ অপেক্ষা ক্ষুদ্রাকার হইবে, তেমন কোন ধরাবাঁধা নির্দেশ নাই। তবে প্রথমত্রে আয়তন সম্পর্কে কোন সীমা-নির্দেশ থাকিলে তাহা অবশ্যই পালনীয়। নতুবা ভাবার্থ রচনা উদ্ধৃতাংশ অপেক্ষা বড় কিংবা ক্ষুদ্র হইতে পারে অথবা সমান-সমানও হইতে পারে।

আসল কথা, অলংকার ও শব্দ-বিভ্রাসের মধ্য হইতে ভাব-বস্তুটিকে আবিষ্কার করিয়া সহজ সরল ও নিরলংকারভাবে প্রকাশ করিতে হইবে। তাহার জন্য যেটুকু পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়, তাহা অবশ্যই অহুমোদনযোগ্য। ভাষা সহজ, সরল হইলেই শিল্প-সৌষ্ঠববর্জিত হয় না। বরং সরল পদ্ধতিই শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি। সেখানে বাচন-ভঙ্গি এমন হয় এবং হ্রস্বপূর্ণ হইবে, তাহা অন্তরঙ্গপূর্ণ হইয়া উঠিতে পারে। ভাষা বথাসম্ভব জীবন্ত হইলে তবেই উহা সম্ভব হইবে। এবং মূল ভাবটিকে আবিষ্কার করিতে পারিলেই ভাষাও স্বাভাবিক কারণেই জীবন্ত হইয়া উঠিবে।

ভাবার্থ-রচনা সম্পর্কে কয়েকটি পালনীয় নির্দেশ : ১. প্রদত্ত অংশটি কয়েকবার পাঠ করিতে হইবে এবং প্রতিবারেই অর্থোপলব্ধির চেষ্টা করিতে হইবে। ২. উদ্ধৃতাংশে প্রতিটি শব্দের প্রয়োগ-সার্থকতার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ৩. তারপর মূল অর্থটিকে নিজের ভাষায় প্রকাশের জন্য অগ্রসর হইতে হইবে। ৪. প্রারম্ভিক বাক্যটিতে স্তম্ভিত আকারে ভাবটি পরিবেশিত হইবে। ৫. প্রদত্ত অংশে উক্তি-প্রত্যাশিত থাকিলে তাহাকে নিজের বিবৃতিতে প্রকাশ করিতে হইবে। ৬. প্রদত্ত অংশে কোন উদ্ধৃতি থাকিলে তাহার সার-সংকলন করিয়া দিতে হইবে। ৭. রূপক, উপমা ইত্যাদি অলংকার বর্ণন করিতে হইবে। প্রদত্ত অংশে যে কথার উল্লেখ নাই, তাহা লেখা উচিত নয়।

### ● ভাব-সম্প্রসারণ [ Amplification ]

সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশিত কোন ভাবকে শিল্প-সৌকর্যময় ভাষায় সাহায্যে পল্লবিত করিয়া তুলিবার নাম ভাব-সম্প্রসারণ। কবিতার দুই-একটি ছন্দে কিংবা গানের দুই-একটি বাক্যে—অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে—বিশাল সমৃদ্ধ ভাব বীজাকারে অন্তর্নিহিত থাকে। ইংগিতে সেখানে অনেক কথা বলা হয়, ব্যঞ্জনার অনেক ভাব রূপলাভ করে। ব্যঞ্জনার কিংবা ইংগিতে ব্যক্ত সেই সব অকথিত কথাকে নিজের কথার বিকশিত করিয়া তুলিবার নাম ভাব-সম্প্রসারণ। যে ভাব সংকুচিত কিংবা কুণ্ডিত অবস্থায় মূল অংশে রহিয়াছে, তাহার বিস্তার বা সম্প্রসারণই ভাব-সম্প্রসারণের লক্ষ্য। অর্থাৎ, উদ্ধৃতাংশে অন্তর্নিহিত ভাবটিকে আশ্রয় করিয়া নিজের চিন্তা বা কল্পনার পথে পাড়ি জমাইতে হইবে। সাধারণতঃ মহৎ কোন ভাব বা মহৎ কোন আদর্শের কথা উদ্ধৃতাংশের মধ্যে নিহিত থাকে। তাহাকে অলম্বন করিয়া কবি বা লেখকের চিন্তা ও কল্পনার অহুসরণে সেই ভাবাদর্শের জগতে বিচরণ করিতে হইবে।

ভাব-সম্প্রসারণ সম্পর্কে কতকগুলি পালনীয় কর্তব্য : ১. প্রদত্ত বাক্যাংশ বা গদ্যাংশটি প্রথমেই কয়েকবার পাঠ করিয়া অন্তর্নিহিত ভাব-সত্যটির মর্মোদ্ধার করিতে হইবে। ২. বাক্যাংশে প্রযুক্ত শব্দসমূহের প্রয়োগ-সার্থকতা অনুধাবন করিতে হইবে। ৩. মূল ভাব-বস্তুর প্রকাশে বিভিন্ন শব্দ কিভাবে সাহায্য করিতেছে, লক্ষ্য করিতে হইবে। ৪. প্রারম্ভিক বাক্যটি স্বরচিত, দৃঢ়পিনক এবং ক্রিয়াপদ-বর্জিত হইলে ভাব-সম্প্রসারণটি আকর্ষণীয় হয়। ৫. প্রযুক্ত বিভিন্ন শব্দ মূল ভাবের সহিত যে ভাবানুবাদ সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাকে সম্প্রসারিত করিতে হইবে। ৬. সম্প্রসারণ-এসঙ্গে কোন ক্ষুদ্র কথিকা কিংবা সুভাষিত বাণীমঞ্জরীর দুই-একটি উদ্ধৃত করা যায়। তবে লক্ষণীয় যে, উদ্ধৃতিটি যেন মূল ভাব-পরিষ্কৃতির সহায়ক হয়। ৭. ভাব-সম্প্রসারণের আরতন প্রবন্ধের দ্বারা বিশাল কিংবা সার-সংক্ষেপের দ্বারা ক্ষুদ্র হইবে না। ৮. ‘কবি বলিতেছেন’ কিংবা ‘এখানে কবির বক্তব্য হইল’ এই ধরনের মন্তব্য ভাব-সম্প্রসারণে নিম্নরোজন।

১. মরিতে চাহি না আমি হৃদয় ভুবনে,  
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই ।  
এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে  
জীবন্ত হৃদয়-মাঝে যদি স্থান পাই !  
ধরায় প্রাণের খেলা চিরতরঙ্গিত,  
বিরহ মিলন কত হাসি-অশ্রু-ময়—  
মানবের সূখে দুঃখে গাঁথিয়া সংগীত  
যদি গো রচিত পানি অমর-আলয় ।  
তা যদি না পারি, তবে বাঁচি যত কাল  
তোমাদের মাঝখানে লভি যেন ঠাই,  
তোমরা তুলিবে বলে সকাল বিকাল  
নব নব সংগীতের কুসুম ফুটাই ।  
হাসিমুখে নিয়ো ফুল, তারপরে হাস  
ফেলে দিয়ো ফুল, যদি সে ফুল শুকায় ।

হৃদয় এই পৃথিবী । হৃদয় এই পৃথিবীর মাহুয । তাই এই রূপরসগন্ধময়  
পৃথিবী সৌন্দর্য-প্রেমিক কবির অতি প্রিয় স্থান । এখানে স্ব-দুঃখ-আনন্দ-বেগনার  
মধ্যে তিনি বাঁচিতে চান । তিনি এই পৃথিবীর মাহুযের স্ব-দুঃখ-বিরহ-মিলনের সংগীত  
রচনা করিয়া মাহুযকে উপহার দিয়া বাইবেন । প্রয়োজনমতো পৃথিবীর মাহুয সেই সব  
সংগীতের রস গ্রহণ করিবে । প্রয়োজন হুইলে তাহারা সেগুলি বিশ্বত হইলেও কবির  
কোন ক্ষোভ নাই ॥

২. কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক ।  
কে বলে তা বহুদূর ।  
মাহুযের মাঝে স্বর্গ নরক—  
মাহুযেতে সুরাসুর ।  
রিপুর তাড়নে যখনি মোদের  
বিবেক পায় গো লয়,  
আত্মপ্রাণির নরক-অনলে  
তখনি পুড়িতে হয় ।

ঐতি ও প্রেমের সুখ্য বীজনে  
যবে মিলি পরস্পরে,  
বর্গ আসিয়া কাঁড়ায় তখন  
আমাদেরি হৃদয়ে ঘরে ।

বর্গ ও নরক মাহুকের অসীম কল্পনা। ইহার অস্তিত্ব কোন হৃদয়লোকে নাই। মাহুকের হৃদয়েই বর্গ ও নরকের অবস্থান। বর্গস-মাহুকের হৃদয় হইতে প্রেম-ঐতি-বরা-কমা ইত্যাদি শুভবোধগুলি নৃত্য হইয়া সেখানে কাম-ক্রোধ-হিংসা-মেষ ইত্যাদি অশুভ বোধগুলির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই তো তাহা নরক। আর, যখন অশুভ বোধগুলি মুছিয়া গিয়া মাহুকের মনে শুভবোধ আগ্রত হয়, তখনই পৃথিবী পরিণত হয় বর্গার্থ বর্গভূমিতে ।

৩. কমা যেথা কীণ দুর্বলতা,  
হে রুদ্র, নির্ভর যেন হ'তে পারি তথা  
তোমার আদেশে, যেন রসনায় মম  
সত্য বাক্য বলি' উঠে খর খড়াসম  
তোমার ইজিতে, যেন রাখি তব মান  
তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজ স্থান ।  
অন্তায় বে করে, আর অন্তায় বে সহে  
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে ।

সকল মাহুকের বিবেক-বুদ্ধিই মাহুকের প্রকৃত জ্ঞান বিচারক। মাহুকের সকল ক্ষেত্রেই তাহার সেই বিবেক-বুদ্ধির প্রয়োগ করিয়া মাহুকের সকল কাজের বিচার করিবে—ইহাই কাম্য। যদি সে তাহা না করে, তবে তাহাতে মাহুকের অন্তরস্থিত জ্ঞানধর্মের অবমাননা করা হয়। সেই বিচারে কমা একটি মহৎ গুণ হইলেও যেখানে উহা দুর্বলতার প্রকাশরূপে উপহাসিত হয়, সেখানে কঠোরতা অবলম্বনও সমর্থনযোগ্য। কারণ, অন্তারকারী ও অন্তায়ের প্রশ্রয়দাতা উভয়েই সমান অপরাধী, সমানভাবে দণ্ডনীয় ।

৪. হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন,—  
তা সবে ( অবোধ আমি ) অবহেলা করি,  
পর-ধন-লোভে মত্ত করিছ ভ্রমণ  
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষেণে আচরি'  
কাটাইছ বহুদিন সুখ পরিহারি'  
অনিজায়, অনাহারে সঁপি কান্দ-মন,

মজিল্লু বিকল ভূপে অবশেষে ব্যস্ত—  
 কেলিল্লু শৈবালে তুলি' কমল-কানন,  
 স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী ক'রে দিলা পণে ;—  
 'ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি,  
 এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি ?  
 বা কিরি অজ্ঞান তুই, ধারে কিরে ঘরে ।'  
 পালিলাম আজ্ঞা স্নেহে পাইলাম কালে  
 মাতৃভাষারূপ ধনি, পূর্ণ মণিভালে ।

বঙ্গভাষা বিবিধ ঐশ্বৰ্যে পরিপূর্ণ। তাহার সম্ভাবনাও সুবিপুল। বাহ্যরা তাহার  
 সন্ধান পায় না, তাহার কেবল বিদেশী ভাষার পশ্চাতে ছুটিয়া মরে। তাহাতে দুঃখ  
 পায়, পায় মানসিক যন্ত্রণা। কিন্তু একদিন তাহাদের এই ভ্রান্তির অবসান ঘটে।  
 বিদেশী ভাষার অসচ্ছলতা ও মাতৃভাষার প্রাচুর্য তাহাদের নিকট ধরা পড়ে। তখনই  
 তাহারা পরভাষা-চর্চা হইতে বিরত হইয়া মাতৃভাষা চর্চায় আত্মনিয়োগ করে। এবং  
 তখনই তাহারা মাতৃভাষার ঐশ্বৰ্য আবিষ্কার করিয়া বিশ্বয়ে হতবাক হইয়া যায় ॥

৫. বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয় ।  
 অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহা-নন্দময়  
 লভিব মুক্তির স্বাদ । এই বসুন্ধার  
 মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি' বারংবার  
 তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত  
 নানা বর্ণগন্ধময় । প্রদীপের মতো  
 সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্তিকায়  
 জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়  
 তোমার মন্দির-মাঝে । ইন্দ্রিয়ের দ্বার  
 রুদ্ধ করি যোগাসন ; সে নহে আমার ;  
 যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে  
 তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে ।  
 মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জলিয়া  
 প্রেম মোর ভাস্করূপে রহিবে কলিয়া ।

বন্ধনের মধ্যেই রহিয়াছে মুক্তির অনিশ্চিত ঠিকানা। এই বন্ধনময় সংসারকে ত্যাগ  
 করিয়া অনণ্যে বৈরাগ্য-সাধনায় মুক্তি লাভ ঘটে না। সংসারের মেঘ-প্রেম-দয়া-দয়ার  
 সকল বন্ধনের মধ্যেই আছে মুক্তির সন্ধান। বিশ্বসংসারই ঈশ্বরের বাস-মন্দির। এই  
 র. বি. (২২) - ১৮

পৃথিবীর জল, বন, শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধের মধ্যেই তাহার প্রকাশ। এই বিশ্বের মধ্যেই বিবেচকের আসন পাতা, এই জীবনের মধ্যেই জীবনেশ্বরের প্রতিষ্ঠা। কাজেই, এই সংসারে, বন্ধনের মধ্যেই, সাংসারিক সকল অল্পভূতির মধ্যেই লাভ করা বাইবে মানুষের আশিত্য মুক্তি।

৬. আঘাত-সংঘাত মাঝে দাঁড়াইছ আসি।  
অল্পদ কুণ্ডল কপ্পি অলংকাররাশি  
খুলিয়া কেলেছি দূরে। দাও হস্তে তুলি  
নিজ হাতে তোমার অক্ষয় শরণগুলি,  
তোমার অক্ষয় তুল। অস্ত্রে দাঁকা দেহো  
রণগুরু। তোমার প্রবল পিতৃশ্রদ্ধে  
ধনিয়া উঠুক আজি কঠিন আদেশে।  
করো মোরে সম্মানিত নব-বীরবেশে,  
দুঃসহ কর্তব্যভারে, দুঃসহ কঠোর  
বেদনায়। পরাইয়া দাও অঙ্গে মোর  
ক্ষতচিহ্ন-অলংকার। ধন্য করো দাসে  
সকল চেষ্টায় আর নিঃফল প্রয়াসে।  
ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি বিলীন  
কর্মক্ষেত্রে করি দাও সক্ষম স্বাধীন।

আঘাত-সংঘাতের মধ্যেই মানুষের শক্তি ও সামর্থ্যের প্রকৃত প্রকাশ। বিলাস-জীবন ত্যাগ করিয়া এই কর্মময় পৃথিবীতে কঠিন কর্তব্য উদ্‌ঘাপনের মধ্য দিয়া মানুষের মহত্ব প্রকাশিত হয়। তাহাতে আঘাত আসে আহত, ব্যাঘাত আসে আহত; বুক পাতিয়া সেই সব দুঃখ আঘাত গ্রহণ করিয়া জীবন-সংগ্রামের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। তাহাতে আছে সাফল্য, আছে ব্যর্থতা। কিন্তু তাহাই শেষ কথা নয়। বিলাস-জীবন অপেক্ষা কর্মময় জীবনই মানুষের কাছে সমধিক গৌরবের।

৭. ছাখ্‌ মানুষের কষ্ট থাকে না, হয় যদি লোক খাঁটি,  
সোনার কসল কলায় যখন পায়ের তলার মাটি  
মাটির-ই যদি না এ-হেন মূল্য মানুষের দাম নাই ?  
এই সংসারে এই সোজা কথা সব আগে বোঝা চাই।  
বিশ্বপিতার মহাকারবার এই দিন-ছনিয়াটা,  
মানুষই তাঁহার মহামূল্যবান কর্ম তাহার খাটা ;

তারি দায় দিয়ে থাকিবে এর জন্য,   
 বিধাতার সেই সাজা বাজা কখনো পড়ে না।   
 তবে যে হেথায় দেখিবারে পাই পরিষের ছর্গতি,   
 অর্থ তাহার—চেনে না সে তার শক্তির সহজি।

মাহুব অসীম শক্তিমান। সে তাহার সেই শক্তির সন্ধান রাখে না। তাই সে   
 জীবনে অশেষ দুঃখ পায়। এই পৃথিবীর মাটিতে এবং মাহুবের মধ্যে অসুস্থ সন্ধান   
 নিহিত রহিয়াছে। বিশ্ববিখ্যাত পৃথিবী এবং তাহার মাহুবকে অসীম সন্ধানের পূর্ণ   
 করিয়া দিয়াছেন। মাহুব তাহার পরিভ্রম দিয়া সেই সকল সন্ধানকে সকল করিয়া   
 তুলিবে। তাহাতে মাহুবের দুঃখ হুচিবে, সকল ছর্গতির অবসান হইবে। কাজেই, এই   
 পৃথিবীতে কাহারও অতুল থাকিবার কথা নয়, দীন-দুখী থাকিবার কথা নয়। তবু   
 মাহুব দুঃখ পায়, অতুল থাকে। তাহার কারণ, সে তাহার শক্তির সন্ধান জানে না,   
 এক্যশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হইতে জানে না।

৮.            নিত্য অভাবের কুণ্ড জ্বালাইয়া বৃকে  
 সাধিতেছে মৃত্যুযজ্ঞ পৈশাচিক সুখে।  
 লক্ষ্মীর কিরীট ধরি' ফেলিতেছে টানি,  
 ধূলিতলে, রুদ্ধ রোষে করাঘাত হানি'।  
 ওরে মোর সর্বনাশা দারিদ্র্য অসহ।—  
 পুত্র হ'য়ে জায়া হ'য়ে কাঁদো অহরহ  
 আমার ছয়ার ধরি'। কে বাজাবে বাঁশী ?  
 কোথা পাব আনন্দিত স্তম্ভের হাসি ?  
 আজো শুনি আগমনী গাহিছে সানাই,  
 ও যেন কাঁদিছে শুধু—নাই, কিছু নাই।

দারিদ্র্য সকল দুঃখের মূল। মাহুবকে নিত্য-অভাবের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া   
 দারিদ্র্য প্রতিনিয়ত তাহার মৃত্যুর চক্রান্ত করিতে থাকে। পরিবার-পরিজনকে   
 হাহাকাড়ের মধ্য দিয়া দারিদ্র্য তাহার কুৎসিত ভয়াল রূপ মেলিয়া ধরে। অসুস্থ এবং   
 অকল্যাণ সেখানে বাঁধে স্থায়ী বাস। কোথাও আর আনন্দের আশাস থাকে না।   
 দারিদ্র্য মাহুবের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষাকে নিমূল করিয়া জীবনকে নিয়ানন্দ করিয়া   
 তোলে।

৯.            সৃষ্টিকার নীচে অনেক দিন বীজ লুকাইয়া আছে। মাসের পর   
 মাস এইরূপে কাটিয়া গেল। শীতের পর বসন্ত আসিল। এখন আর



লুকাইয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই; বাহির হইতে কে যেন শিশুকে ডাকিয়া বলিতেছে, “আর ঘুমাইও না, উপরে উঠিয়া আইস, সূর্যের আলো দেখিবে।” আস্তে আস্তে বীজের ঢাকনাটি খসিয়া পড়িয়া, দুইটি ক্রোমল পাতার মধ্য হইতে অঙ্কুর বাহির হইল। অঙ্কুরের এক অংশ নীচের দিকে গিয়া মাটি খরিয়া রহিল, আর এক অংশ মাটি ভেদ করিয়া উপরে উঠিল। মনে হয়, শিশুটি যেন ছোট মাথা তুলিয়া আশ্চর্যের সহিত নতুন দেশ দেখিতেছে।

প্রকৃতির মধ্যে জীবনের খেলা নিত্য চলিতেছে। মাটির মধ্যে বীজ লুকাইয়া থাকে। তারপর ঋতু-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বীজের মধ্যে স্তম্ভ তরুশিশুটি বাহিরে আত্মপ্রকাশ করে অঙ্কুররূপে। সেই অঙ্কুরের একটি অংশ মাটিকে ঝাঁকড়াইয়া রাখে, অন্য অংশটি মাটি ভেদ করিয়া উপরে উঠিতে থাকে। এইভাবে প্রকৃতি তাহার জীবনের খেলা খেলিয়া চলে ॥

১০. দেশ সম্বন্ধে একটি কথা খুব স্পষ্ট করে বুঝতে হবে—দেশটা কেবল মাটি দিয়ে গড়া নয়, মানুষ দিয়েও গড়া। দেশকে ভালবাসতে হলে সর্বাগ্রে দেশের মানুষকে ভালবাসতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, দেশের সব চাইতে বড় সম্পত্তি হল দেশের মানুষ, দেশের জনবল একটা মস্ত বড়ো বল। ভারতবর্ষ আকারে কত বৃহৎ, তা তোমাদের জানা আছে। জনসংখ্যার দিক থেকেও ভারতবর্ষ পৃথিবীর বৃহত্তম দেশগুলির অন্ততম। তোমরা বোধ হয় জান, এদেশে প্রায় পঞ্চাশ কোটি লোকের বাস। সারা পৃথিবীর লোকসংখ্যা ধরলে দেখা যায়, তার প্রায় এক-বর্ষ্ঠাংশ বাস করে ভারতবর্ষে। অর্থাৎ প্রতি ছ’জন মানুষের মধ্যে একজন ভারতবাসী। গর্ব করবার মতো কথা বটে, কিন্তু শুধু সংখ্যাতেই সব সময় কাজ দেয় না। দেখছ তো মাত্র পাঁচ কোটি ইংরেজ চল্লিশ কোটি ভারতবাসীর উপর কত বৎসর রাজত্ব করে গেল। এর একমাত্র কারণ আমাদের নিজেদের মধ্যে মিল ছিল না।

দেশ কেবল মাটি দিয়া তৈয়ারী নয়, মানুষ দিয়াও তৈয়ারী। দেশকে ভালো-বাসিতে হইলে দেশের মানুষকে ভালোবাসিতে হইবে। মানুষই দেশের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদ। ভারতবর্ষ বিশাল দেশ, তাহার জনসংখ্যাও বিশাল। পৃথিবীর জনসংখ্যার এক-বর্ষ্ঠাংশ ভারতীয়। ইহা নিঃসন্দেহে গর্বের বিষয়। কিন্তু বিশাল জনসংখ্যা হইলেই দেশ বড় হয় না। মাত্র পাঁচ কোটি ইংরেজ চল্লিশ কোটি ভারতবাসীকে পদানত রাখিয়াছিল। তার মূলে ছিল ভারতবাসীদের একের অভাব ॥

## ভাবার্থ-রচনা

### । অনুসরণী ।

#### ভাবার্থ লিখ :

০

১. পুণ্যে পাশে দুঃখে স্থখে পতনে উত্থানে  
মাহুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে  
হে স্নেহাৰ্ত বন্ধুত্ব—তব গৃহকোড়ে  
চিরশিশু ক’রে আর রাখিয়ো না ধরে ।  
দেশদেশান্তর-মাঝে যার যেথা স্থান  
খুঁজিয়া লইতে দাও করিয়া সন্ধান ।  
পদে পদে ছোটো ছোটো নিষেধের ভোরে  
বঁধে বঁধে রাখিয়ো না ভালো ছেলে ক’রে ।  
প্রাণ দিয়ে, দুঃখ স’য়ে আপনার হাতে  
সংগ্রাম করিতে দাও ভালোমন্দ-সাথে ।  
শীর্ণ শাস্ত সাধু তব পুত্রদের ধ’রে  
দাও সবে গৃহছাড়া লক্ষীছাড়া ক’রে ।  
সাত কোটি সন্তানে, হে মুক্ত জননী,  
রেখেছ বাঙালি করে—মাহুষ কর নি ।

২. চিন্তা যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,  
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর  
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশরীরী  
বহুধারে রাখে নাই ঋণ ক্ষুদ্র করি,  
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে  
উচ্ছসিয়া উঠে, যেথা নিবাসিত শ্রোতে  
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়  
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়,  
যেথা তুচ্ছ আচারের মকবালুরাশি  
বিচারের শ্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি—  
পৌরুষে করেনি শতধা, নিত্য যেথা  
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা,  
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি, পিতঃ,  
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো ভাগরিত ।

৩. অন্ধ মোহবন্ধ তব দাও মুক্ত করি ।  
যেখোনা বসায়ো যারে জাগ্রত প্রহরী,

হে জননী, আপনার স্নেহকারাগারে  
 সম্ভানেয়ে চিরজন্ম বন্দী রাখিবারে ।  
 বেঁটন করিয়া তারে আগ্রহপরশে,  
 জীর্ণ করি দিয়া তারে লালনের রসে,  
 মনুষ্য-স্বাধীনতা করিয়া শোষণ  
 আপন ক্ষুধিত চিত্ত করিবে পোষণ ?  
 দীর্ঘ গর্ভবাস হতে জন্ম দিলে যার  
 স্নেহগর্ভে গ্রাসিয়া কি রাখিবে আবার ?  
 চলিবে সে এ সংসারে তব পিছু পিছু ?  
 সে কি তব অংশ তবে, আর নহে কিছু ?  
 নিজের সে, বিশ্বের সে, বিশ্বদেবতার—  
 সম্ভান নহে গো মাতঃ, সম্পত্তি তোমার ।

৪. বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা—  
 বিপদে আমি না যেন করি ভয় ।  
 দুঃখতাপে-ব্যথিত চিতে নাই-বা দিলে সাহসন',  
 দুঃখে যেন করিতে পারি জয় ।  
 সহায় মোর না যদি জুটে নিজের বল না যেন টুটে—  
 সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি, লভিলে শুধু বঞ্চনা,  
 নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয় ॥  
 আমারে তুমি করিবে জ্ঞান, এ নহে মোর প্রার্থনা—  
 তরিতে পারি শক্তি যেন রয় ।  
 আমার ভার লাঘব করি নাই বা দিলে সাহসন',  
 বহিতে পারি এমনি যেন হয় ।  
 নশ্বশিরে স্থখের দিনে তোমারি মুখ লইব চিনে—  
 দুখের রাতে নিখিল ধরা বেদিন করে বঞ্চনা  
 তোমারে যেন না করি সংশয় ॥

৫. যৌবরাজ্যে বসিয়ে দে, মা, লক্ষীছাড়ার সিংহাসনে ।  
 ভাঙা কুলোয় কলক পাখা তোমার বত ভূত্যাগণে ।  
 দম্ভভালে প্রসন্নশিখা দিও, মা, একে তোমার টীকা—  
 পরাও সজ্জা সজ্জাহারা জীর্ণকন্যা ছিন্নবাস ।  
 হস্তমুখে অদৃষ্টের করব মোরা পরিহাস ॥

লুকোক তোমার ডক। শুনে কপট সখার শূন্য হানি  
 পালাক ছুটে পুচ্ছ তুলে মিথ্যে চাটু মক্কা-কানী ।

আত্মপরের প্রভেদ-ভোলা জীর্ণ ছুরের নিত্য খোলা—  
থাকবে ভূমি, থাকব আমি সমানভাবে বারো মাস  
হাস্তমুখে অদৃষ্টের করব ঘোরা পরিহাস ॥

জীবনে বত পূজা হল না সারা  
জানি হে, জানি তাও হয়নি হারা ।  
যে ফুল না-ফুটিতে রয়েছে ধরণীতে  
যে নদী মরুপথে হারালো ধারা ।  
জানি হে, জানি তাও হয়নি হারা ॥

জীবনে আজও বাহা রয়েছে পিছে,  
জানি হে, জানি তাও হয়নি মিছে ।  
আমার অনাগত আমার অনাহত  
তোমার বীণাতারে বাজিছে তারা—  
জানি হে, জানি তাও হয়নি হারা ।

১. ‘মুক্তি চাস্? মোক্ষ চাস্? চাস্ চির-স্বর্গবাস ?  
শত পুত্র চাস্ যদি পাবি  
পরমায়ু বর্ষ-শত রাজ্য ধনরত্ন বত,  
কিবা চাস্—বল, পুনঃ ভাবি ।’  
জোড় হাতে নেয়ে কয়, ‘মরিতে করি না ভয়,  
মোক্ষ ? মুক্তি ?—কাজ নাই তা’তে ।  
রাজ্যধন নেব কেন ? আমার সন্তান যেন  
চিরদিন থাকে হুধে-ভাতে ।’  
অন্নপূর্ণা ক’ন, ‘নেয়ে, সোনা ফেলে এলি খেয়ে,  
যে সোনা এসেছি নায়ে রাখি,  
সে সোনা সামান্ত নয়, বাবে তাতে দৈন্ত-ভয়—’  
নেয়ে কয় ছলছল আশি—  
‘সোনা নিয়ে কি মা হবে ? জমিদার কেড়ে লবে,  
লুটে লবে চোরে বা ডাকাতে ।  
বর দাও মোরে হেন, আমার সন্তান যেন  
চিরদিন থাকে হুধে-ভাতে ।’

৮. ভারতবর্ষে রামমোহন রায়ের বাঁরা পূর্ববর্তী ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম, কবীর, নিজেই বলেছিলেন ভারতপথিক । ভারতকে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন মহাপথরূপে । এই পথে ইতিহাসের আদিকাল থেকে চলমান মানবের ধারা প্রবাহিত । এই পথে স্রবণাতীত কালে এসেছিল বারা, তাদের চিহ্ন ছুগর্তে । এই পথে এসেছিল

হোমায়ি বহন করে আর্ঘজাতি। এই পথে একদা এসেছিল মুক্তিভবের আশার চীনদেশ থেকে তীর্থযাত্রী। আবার কেউ এসেছে সাম্রাজ্যের লোভে, কেউ এল অর্থকামনার। সবাই পেরেছে আতিথ্য। এ ভারতে পথের সাধনা, পৃথিবীর সকল দেশের সঙ্গে বাণিজ্য-আদ্বার নেওয়া-দেওয়ার সম্বন্ধ, এখানে সকলের সঙ্গে মেলবার সমস্তা সমাধান করতে হবে। এই সমস্তার সমাধান বতর্কণ না হয়েছে ততর্কণ আমাদের দুঃখের অন্ত নাই। এই মিলনের সত্য সমস্ত মানুষের চরম সত্য, এই সত্যকে আমাদের ইতিহাসে অঙ্গীভূত করতে হবে। রামমোহন রায় ভারতের এই পথের চৌমাথায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন, ভারতের বা সর্বশ্রেষ্ঠ দান তা নিয়ে।

২. আমরা সাধারণত প্রবল সাহেবি অথবা প্রচুর নবাবি দেখাইয়া সম্মানলাভের চেষ্টা করিয়া থাকি। কিন্তু আড়ম্বরের চাপল্য বিজ্ঞানাগরের উন্নত-কঠোর আশ্রয়-সম্মানকে কখনো স্পর্শ করিতে পারিত না। ভূষণহীন সারল্যই তাঁহার রাজভূষণ ছিল। দৈবরচনায় যখন কলিকাতার অধ্যয়ন করিতেন তখন তাঁহার দয়িত্ব জননীদেবী চরকা-সূতা কাটিয়া পুত্রঘরের বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া কলিকাতার পাঠাইতেন। সেই মোটা কাপড়, সেই মাড়ুলেহমণ্ডিত দারিদ্র্য তিনি চিরকাল সর্গোরবে সর্বদা ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বন্ধু তদানীন্তন লেক্টেন্যান্ট গবর্নর হালিডে সাহেব তাঁহাকে রাজসাক্ষাতের উপযুক্ত সাজ পরিয়া আসিতে অহুরোধ করেন। বন্ধুর অহুরোধে বিজ্ঞানাগর কেবল দুই একদিন চোগা-চাপকান পরিয়া সাহেবের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু সে লজ্জা আর সহ্য করিতে পারিলেন না। বলিলেন, ‘আমাকে যদি এই বেশে আসিতে হয় তবে এখানে আর আমি আসিতে পারিব না।’ হালিডে তাঁহাকে তাঁহার অভ্যস্ত-বেশে আসিতে অনুমতি দিলেন।

১০. বস্তুতঃ বাহুবল অপেক্ষা বাক্যবল সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ। এ পর্যন্ত বাহুবলে পৃথিবীর কেবল অবনতিই সাধন করিয়াছে—যাহা কিছু উন্নতি ঘটয়াছে, তাহা বাক্যবলে। সভ্যতার যাহা কিছু উন্নতি ঘটয়াছে, তাহা বাক্যবলে। সমাজনীতি রাজনীতি ধর্মনীতি সাহিত্য বিজ্ঞান শিল্প—যাহারই উন্নতি ঘটয়াছে, তাহা বাক্যবলে। যিনি বক্তা, যিনি কবি, যিনি লেখক—দার্শনিক বৈজ্ঞানিক নীতিবেত্তা ধর্মবেত্তা ব্যবস্থাবেত্তা সকলেই বাক্যবলে বলী।

ইহা কেহ মনে না করেন যে, কেবল বাহুবলের প্রয়োগ নিবারণই বাক্যবলের পরিণাম বা তদর্থেই বাক্যবল প্রযুক্ত হয়। মহত্ত্ব কতকদূর পশ্চরিজ পরিচ্যাপ্ত করিয়া উন্নতাবস্থার দাঁড়াইয়াছে। অনেক সময়ে মহত্ত্ব ভয়ে ভীত না হইয়াও সংকর্মান্বর্ত্তানে প্রবৃত্ত। যদি সমগ্র সমাজের কখনও এককালে কোনো বিশেষ সদহর্ত্তানে প্রবৃতি জন্মে তবে সে সংকার্ষ অবশ্য অহুগ্নিত হয়। এই সংপথে জনসাধারণের প্রবৃতি কখনও কখনও জ্ঞানীর উপদেশ ব্যতীত ঘটে না।

১১. সৃষ্টিকর্তা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি দিয়াছেন। একদল স্বভাৱে গুণিত বুদ্ধিতে পারিবে না, সাহিত্য রসগান করিতে পারিবে। অপর কেহ বা

সাত-কাণ্ড রামায়ণ শুনিয়া অগ্নানমুখে বলিবে, 'ইহাতে তো কিছুই উপপত্তি হইল না।' কেহ হয়ত একখানি চিত্র দেখিয়া মোহিত হইবে, সঙ্গীতের মনোহর তান বিরক্তিকর ভাবিবে। কেহ বা স্বরময় চিত্রপট অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করিয়া গীত-সাগরে নিমগ্ন হইবে। কেহ প্রকৃত কুসুমোদ্ভান পরিভাষণ করিয়া বিজন বন্য শৈলময় প্রদেশ ভালোবাসিবে; কেহ বা তরুণতাপশূন্য বন্ধুর গিরি কষ্টকর বোধ করিয়া প্রহরণপরিপূরিত বজ্ররীপলববিভূষিত নিকুঞ্জে মনস্তুষ্ট সাধনার্থ আশ্রয় লইবে। কেহ চিন্তাশীল কার্বে অগতু; কেহ বা কার্ঘ্যদক্ষ, চিন্তায় অগতু। এইরূপ স্বাভাবিক শক্তিবৈভব যে প্রতিভার মূল, তাহাতে সন্দেহ নাই। নতুবা, আমি, তুমি, সকলেই কালিদাস বা আর্বভট্ট, সেক্ষপিয়র বা নিউটন হইতে পরিতাম।

১২. আমি জানি, কোনো গুণধনসত্ত্বে এক বিলাতি ডাক্তার ছিলেন। তার কাছে এক বৃদ্ধ এসে করুণ শ্রমে যেমনি বলেছে 'জর' অমনি তিনি ব্যস্ত হয়ে তখনি তাকে একটা অত্যন্ত তিতো জরদ্র রস গিলিয়ে দিলেন; সে লোকটা ইংলিয়ে উঠল, কিন্তু আপত্তি করবার সময় মাত্র পেল না। সেই সংকটের সময় আমি যদি ডাক্তারকে বাধা দিয়ে বলতুম, জর গুর নয়, জর গুর মেয়ের, তাহলে কি ডাক্তার যোগে আমাকে বলতে পারতেন যে, 'তবে তুমিই চিকিৎসা করো-না; আমি তো তবু বা হয় একটা কোনো গুণ্ড যাকে হয় একজনকে খাইয়েছি, তুমি তো কেবল ফাঁকা সমালোচনাই করলে?' আমার এইটুকু মাত্র বলবার কথা যে, আসল সমস্যাটা হচ্ছে, বাপের জর নয়, মেয়ের জর; অতএব বাপকে গুণ্ড খাওয়ালে এ সমস্যার সমাধান হবে না।

১৩. ওহে দেব! ভেঙে দাও ভীতির শৃঙ্খল

ছিঁড়ে দাও লাজের বন্ধন;  
সমুদ্র আপনারে দিই একেবারে,  
জগতের পায়ে বিসর্জন।  
স্বামীন, নির্দেশ তব হৃদয়ে ধরিয়া,  
তোমারি নির্দিষ্ট করি কাজ,  
ছোট হোক, বড় হোক, পরের নয়নে  
পড়ুক বা না পড়ুক তাহে কেন লাজ?  
তুমি জীবনের প্রভু, তব ভৃত্য হয়ে  
বিলাইব বিভব'তোমার,  
আমার কি লাজ, আমি ততটুকু দিব,  
তুমি দেছ যেটুকু ভার।

১৪.

দণ্ডিতের সাথে

দণ্ডদাতা কাঁধে যবে সমান আঘাতে  
সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার। যার তরে প্রাণ

কেনো ব্যথা নাহি পায়, তারে দণ্ড দান  
 প্রথলের অভ্যাচার । যে দণ্ডবেদনা  
 পুঞ্জেরে পায় না দিতে, সে কারে দিও না ।  
 যে তোমার পুত্র নহে, তারো শিষ্টা আছে ;  
 মহা অপরাধী হবে তুমি তার কাছে,  
 বিচারক । গুনিয়াছি, বিশ্ববিধাতার  
 সবাই সন্তান মোরা, পুঞ্জের বিচার  
 নিয়ত করেন তিনি আপনার হাতে  
 নারায়ণ ; ব্যথা দেন, ব্যথা পান সাথে,  
 নতুবা বিচারে তাঁর নাহি অধিকার ॥

১৫.

গুরা চিরকাল

টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল ;

গুরা মাঠে মাঠে

বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে—

গুরা কাজ করে

নগরে প্রান্তরে ।

রাজহুজ ডেঙে পড়ে ; রণডকা শব্দ নাহি তোলে ;

অরুণমুখ মূঢ়সম অর্থ তার ভোলে ;

রক্তমাখা অস্ত্র হাতে যত রক্ত আঁখি

শিশুপাঠা কাহিনীতে থাকে মুখ ঢাকি ।

গুরা কাজ করে

দেশে দেশান্তরে

অজ বন্ধ কলিঙ্গের সমুদ্র-নদীর ঘাটে ঘাটে

পঞ্জাবে বোম্বাই গুজরাটে ।

## ■ সংকেত ।

১. বাঙ্গালী জাতি শুধুমাত্র বাঙ্গালী নয়, সে বিশ্বেরও মানুষ ।
২. সকল সংস্কার ও কুসৃতার উর্ধ্বে, সকল কল্যাণভোগের মধ্যে ওঁরতের স্বাধীন ও নির্ভীক আত্মপ্রকাশ কার্য ।
৩. সন্তানের উপর জননীর অধিকার যতখানি, তাহার উপর বিশ্বেরও অধিকার ততখানি ।
৪. ভগবানের কৃপা অপেক্ষা ব-শক্তিভেৎ বিপদ-উত্তরণ অনেক বেশী গৌরবময় ।
৫. বিশ্বের লক্ষ্মীছাড়ার হল বিপদ, দারিদ্র্য, বকনা ও আত্মপরের তেহাতের ভুলিয়া অসুটকে উপহাস করির যায় ।
৬. পৃথিবীর কিছুই হারার না, কোন কিছুই বার্থ নয় । ঈশ্বরের পদতলেই পূর্ণতা ও সকলতা ।
৭. বাঙ্গালী জাতি শব্দে ভুলে । দীর্ঘানু, ঐশ্বর্য বা মুক্তি কোনকালেই সে চায় নাই, সে চাহিয়াছে তাহার সন্তান-সন্ততিদের শান্ত বিরতির জীবন ।

১০. বিভিন্ন শাসন-সম্প্রদায়ের মধ্যে একেবারে সাধারণই ভারতের সাধনা; রামমোহন তাহার প্রতীক।
১১. হারিডা ছিল বিভাগস্বরের রাজ-ভূষণ এবং উন্নত-কঠোর আত্মসম্মান ছিল তাঁহার চরিত্রের মূল ভিত্তি।
১২. বাহুবল পশু বল অপেক্ষা সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ।
১৩. পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি ও প্রবণতা।
১৪. বাহা আসল সমতা, তাহার সমাধানই প্রকৃত সমাধান।
১৫. নক্ষত্রতো সাধারণতো নির্ভৌক কর্তব্য সম্পাদনেই জীবনের সাংগত্য।
১৬. সঙ্ঘর এবং সংবেদনশীল বক্তাবেশই অপর্যায়ের দ্বৈত শক্তি।
১৭. সাম্রাজ্যের সহস্র উত্থান-পতনে কখনোও অস্তিত্বের সময় চিরকাল দেশ-বিশ্বে মানা কর্তব্য।

## ভাব-সম্প্রসারণ

- ✓ ১. ধনিটিরে প্রতিধনি সদা ব্যঙ্গ করে,  
ধনি-কাছে ধনী সে যে পাছে ধরা পড়ে ॥

বিপন্ন মানুষ মানুষের দ্বারে আসিয়া আতঁকঠে সাহায্য প্রার্থনা করে। তাহার সাহায্য প্রার্থনায় মানুষের লাভও পাওয়া যায়। বিপন্নকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য মানুষ নিজের জীবন তুচ্ছ করিয়া ঝাঁপাইয়া পড়ে, বিপন্নকে উদ্ধার করিয়া অন্তরে লাভ করে পরম পরিতৃপ্তি। বাহারা প্রকৃত পরোপকারী, তাহারা তাহাদের এই সাহায্য দানের জন্য কোন প্রতিদানের প্রত্যাশা রাখে না। কিন্তু মানব-চরিত্র বড় বিচিত্র। যে উপকারীর উপকারের সাহায্যে বিপন্ন ব্যক্তির বিপদ-উত্তরণ ঘটে, তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকারে কোথায় যেন তাহার বাধে! সে উপকারীর উপকার তো স্বীকার করেই না, উপরন্তু তাহাকে বিদ্বেষ করিয়া তাহার স্বাভাবিক মহত্বকে করে উপহাস। উপকারীর উপকার স্বীকারে যে অমূলক আত্মগ্লানি তাহার অন্তরে, জ্বলিয়া উঠে, তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভের সহজতম উপায় হইল উপকারী ব্যক্তিকে উপহাস করা। এইরূপে এই পৃথিবীর অমল আলোক-শিখাগুলিকে গলা টিপিয়া হত্যা করিবার জন্য কৃতঘ্নেরা থাকে সদা-সক্রিয়। কিন্তু তাই বলিয়া পৃথিবীর সেই আলোক-শিখাগুলি কোনদিন নির্ধাপিত হইবে না। জগতের কৃতঘ্নদের শত কৃতঘ্নতা উপেক্ষা করিয়া তাহার জীবন বিপন্ন করিয়া অনাবিল আলোক দান করিবেন। এই কলুষিত বিবাক্ত পৃথিবীতে তাহারাই তো একমাত্র আশা-ভরসা ॥

- ✓২. জগতে দরিদ্ররূপে ফিরি দয়াতরে,  
গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে।

মানবতার সেবাই প্রকৃত মুক্তির পথ। ঈশ্বরকে আমরা দেখি না, আমরা <sup>ক</sup>দেখি মাল্লবকে। মাল্লবই আমাদের আগ্রহ দেবতা। তাহাদের দুঃখ-দুর্দশা মোচন।



আমাদের প্রকৃত ঈশ্বর-সেবা। কারণ মানবতার সেবাই ঈশ্বর-সেবার শ্রেষ্ঠ পন্থা। পার্থিব দুঃখ-দুর্দশার রাহুগ্রাসে নিপতিত হইয়া মানুষ বড় অসহায়ভাবে আর্তনাদ করিয়া উঠে। সেই আর্ত, পীড়িতের দুঃখ-মোচনের জন্য যদি মানুষের হৃদয়-দুর্গ অর্গলমুক্ত না হয়, তবে এই পৃথিবীতে মানুষ কাহার দ্বারে গিয়া দাঁড়াইবে? সমাজের একশ্রেণীর মানুষ আছেন, যাঁহারা জগতের দুঃখী হতভাগ্য মানুষগুলিকে দূরে বিতাড়িত করিয়া, তথাকথিত পবিত্রতা-রক্ষার নামে তাহাদের স্পর্শকে দূরে ঠেকাইয়া মন্দিরের পাবাণ-প্রাচীরের মধ্যে খোঁজেন ঈশ্বরকে। কিন্তু ঈশ্বরের অধিষ্ঠান তো কেবল মন্দিরের পাবাণ-বেদীতেই নয়। তাঁহার আবির্ভাব যে মানুষের অন্তরে অন্তরে। জগতের লাহিত-উৎপীড়িতের মধ্যে যে তাঁহার আসন পাতা, তাহার উপস্থিতি যে 'সবার পিছে সবার নিচে সবহারাদের মাঝে।' কাজেই, জগতের দম্বিত-নারায়ণের সেবার মধ্য দিয়াই লাভ করা যাইবে ঈশ্বরের অব্যবহিত স্পর্শ। 'মানবতার সাধনাই শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর-সাধনা ॥

✓ ৩.

নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস,  
ওপারেতে সর্ব সুখ আমার বিশ্বাস।  
নদীর ওপার বসি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে,  
কহে, বাহা কিছু সুখ সকলি ওপারে ॥

মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা অন্তহীন। সেই তৃপ্তিহীন আশা-আকাঙ্ক্ষার পশ্চাতে মানুষ ছুটিয়া মরে। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার যেমন শেষ নাই, তাহার ছুটিয়া চলারও তেমনি অন্ত নাই। মানুষের আকাঙ্ক্ষা করিবার ক্ষমতা অসীম, কিন্তু তাহাকে রূপদানের ক্ষমতা তাহার সীমিত। তাই সে আকাঙ্ক্ষা করে প্রচুর, কিন্তু পায় অল্প। ইহাই তাহার চিরন্তন অতৃপ্তির কারণ। তাই সে বাহা পায়, তাহাতে তাহার চিন্তের স্খা মিটে না। সে চায় আরো, আরো বেশী। আসল কথা, মানুষ কি চায়, তাহা সে জানে না। তাই সে অনাদি অনন্ত আকাঙ্ক্ষার অন্তহীন আকর্ষণে উদ্বিগ্নভাবে এক দিগন্ত হইতে অন্য দিগন্তে ধাবিত হয়। কিন্তু তাহার আকাঙ্ক্ষা তো কোনদিনই পূর্ণ হইবার নয়। কলে, নৈরাত্তের এক সূচীভেদে অন্ধকারে সে অবশেষে নিশ্চিন্ত হয়। কবি তাই গভীর মনস্তাপে উচ্চারণ করেন—'বা চাই তা তুল করে চাই, বা পাই তা চাই না।' এইভাবে ক্লান্ত পার্থিব হৃদয়ের অধেষণে মানুষ অসন্তোষের পায়ে মাথা ছুটিয়া মরে ॥

✓ ৪.

কহিল ভিকার কুলি টাকার থলিরে,  
'আমরা কুটুম্ব দোহে ভুলে গেলি কিরে?'  
থলি বলে, 'কুটুম্বিতা তুমিও ভুলিতে  
আমার বা আছে গেলে তোমার কুলিতে।'

অর্থই সকল অনর্থের মূল। মানুষ জাগতিক সুখের আশায় অর্থ কামনা করে। সে অর্থ পায়, কিন্তু সুখ পায় না। অর্থ একবার লাভ করিলে মানুষকে অর্থ-লালসায় পাইয়া বসে। তখন সে চায় আরো, আরো। দিনে দিনে তাহার অর্থ-ভাণ্ডার পূর্ণ হইয়া উঠে। কিন্তু অর্থের সঙ্গে থাকে অর্থের অহংকার। সেই অহংকারে মানুষ ক্ষীণ হইয়া উঠে। তখন সে তাহার চারিদিকের মানুষকে মানুষ বলিয়া মনে করে না। ফলে, বন্ধু-বিচ্ছেদ, আত্মীয়-বিচ্ছেদ এবং প্রিয়জন-বিচ্ছেদ অনিবার্য হইয়া দেখা দেয়। দুই হাতে অর্থভাণ্ডার আঁকড়িয়া ধরিয়া সে ধনকুবের সাজে বটে; কিন্তু সকলকে হারাইয়া সে এক নিঃসঙ্গ নির্জনতায় হয় নির্ধাসিত। অন্যদিকে, তাহার হৃদয় অর্থচিন্তায় সারাক্ষণ থাকে ভারাক্রান্ত। সেখানে স্নেহ-প্রীতি, দয়া-দাক্ষিণ্য থাকিবার আর স্থান সংকুলান হয় না। তাই অর্থবান্ ব্যক্তিরা স্নেহ-প্রীতিহীন অন্তঃসারশূন্য হইয়া উঠে। সেই শূন্যতা পূরণ করিবার জন্য অনিবার্যরূপে দেখা দেয় ঐশ্বর্যের অহংকার। মৃত্যু-রাক্ষস এইভাবে মানুষের হৃদয়ের সমস্ত স্বাভাবিক সরসতা শোষণ করিয়া তাহাকে একটি দয়াহীন, মল্লভূমিতে পরিণত করে ॥

৫. বসুমতী, কেন তুমি এতই কুপণা ?  
কত খোঁড়াখুঁড়ি করি পাই শস্যকণা।  
দিতে যদি হয় দে, মা, প্রসন্ন সহাস।  
কেন এ মাথার ঘাম পায়েতে বহাস ?  
বিনা চাষে শস্য দিলে কী তাহাতে ক্ষতি ?  
শুনিয়া ঈষৎ হাসি কন বসুমতী,  
‘আমার গৌরব তাহে সামান্যই বাড়ে,  
তোমার গৌরব তাহে নিতান্তই ছাড়ে।’

বিশ্বের অকর্মণ্যের দল বিনা পরিশ্রমেই জীবনে সফলতা কামনা করে। কিন্তু পায় না। বিশ্বে সাক্ষ্যের পথ দুঃখ-বেদনা-কষ্টকিত। যে কোন কর্মে সাক্ষ্যই পরিশ্রমসাধ্য। এই পৃথিবী সংগ্রাম-ক্ষেত্র। বাঁচার জন্য সকল মানুষকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হয়। নিজ নিজ শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী মানুষ পরিশ্রম করিবে, পরিশ্রমকে হাতিয়ার করিয়া সে জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিবে—ইহাই কাম্য। পৃথিবীতে বাহারা পরিশ্রমী, বাহারা উद्यোগী, তাহারাই সৌভাগ্য-সম্পন্ন হাত হইতে বিজয়-মালা ছিনাইয়া আনে। আর, বাহারা অলস, কর্ম-বিমুখ, তাহারাই অসাধ্য কর্মহীনতার শ্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া চির-পরাজিতদের দলে স্থান করিয়া নেয়। অবশেষে বাঁচুর তাগিদে তাহার ডিঙ্কাপাজ হাতে তুলিয়া লইয়া দ্বার হইতে দ্বারে ক্ষুধার অন্ন ডিঙ্কা করিয়া বেড়ায়। কিন্তু ডিঙ্কার দ্বারা কোনদিন দারিদ্র্য মোচন হয় না—‘ডিঙ্কার দ্বারা নৈব নৈব চ।’ আর, ডিঙ্কাবৃত্তির মাধ্যমে জীবন-ধারণের অবমাননার হাত হইতে নিষ্কৃতিই বা কোথায়? কাজেই, বিশ্বের কর্মজীক প্রম-পলাতকের দল, বাহারা

পরিশ্রমকে কাকি দিয়া স্বপ্নের স্বর্গে পৌঁছিতে চায়, তাহাদের স্থান হয় চির-দুঃখের নরকভূমি।



কেরোসিন শিখা বলে মাটির প্রদীপে,  
‘ভাই বলে ডাক যদি দেব গলা টিপে।’  
হেনকালে আকাশেতে উঠিলেন চাঁদা ;  
কেরোসিন বলি উঠে, ‘এসো মোর দাদা।’

ভ্রান্ত আভিজাত্যের গর্বে মানুষ মানুষকে করে ঘৃণা, মানুষের স্পর্শকে দূরে ঠেকাইয়া রাখিয়া বিশেষ স্বাতন্ত্র্য আহির করে। কিন্তু তাহাতে সে প্রকারান্তরে মানুষের জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এক স্বেচ্ছা-নির্ধারিত জীবন যাপন করে। স্মরণীয় যে, এই পৃথিবীর সকল মানুষই ঈশ্বরের সৃষ্টি—সকলেই সমান। ‘জগৎ জুড়িয়া একজাতি শুধু সে জাতির নাম মানুষ জাতি।’ একই রক্তমাংসের উপাদানে তাহাদের শরীর গড়া, একই চেতনার উপকরণে গড়া তাহাদের অস্থিভূতি। এই পৃথিবীর একই স্বর্ষের কিরণে, একই জল-হাওয়ায় তাহাদের জীবন সম্ভব হইয়াছে। অথচ কতিপয় ভ্রান্ত অন্ধ মানুষ মানুষ-মানুষে ভেদ-বৈষম্যের লোহ-প্রাচীর সৃষ্টি করিয়া তাহার উপরে স্বাতন্ত্র্যের গর্বাঙ্ক নিশান উড়াইয়া দেয়। ইহাতে নাকি তাহাদের আভিজাত্যের জাতি-রক্ষা হয়। তাহারা নির্বোধ ; তাই তাহারা জাতি লইয়া এই বজ্রাতির বড়াই করে। কিন্তু ইহাতে ঘৃণা দিয়া মানুষকে দূরে সরাইয়া মানুষ দুর্বল, পঙ্গু ও শক্তিহীন হইয়া পড়ে। ভারতে বর্ণ-হিন্দুদের এই মানসিকতায় তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মানুষদের বৃকে ‘পুঞ্জিত অভিমান’ ক্ষীণ হইয়া উঠিয়াছিল। আজ বিশেষ বৈতনিকদের নিলজ্জ কালো আচরণে অশেষ-কায়দের জীবন দুর্বিষহ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ইতিহাস-দেবতা ইহা বেশীদিন ক্ষমা করিবেন না। একদিন না একদিন তাহার হাতের রক্ত-বীণা বাজিয়া উঠিবে। সেদিন সকলেই ‘মৃত্যুমাঝে হবে তবে চিত্তাভঙ্গে সবার সমান।’



৭. রথযাত্রা, লোকারণ্য মহা ধুমধাম,  
ভক্তেরা লুটায় পথে করিছে প্রণাম।  
পথ ভাবে ‘আমি দেব’, রথ ভাবে ‘আমি’,  
মূর্তি ভাবে ‘আমি দেব’, হাসে অন্তর্ধামী।

দেবতার নামে এই পৃথিবীতে যে কত অপদেবতার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। মানুষ তাহার স্বাভাবিক ঈশ্বর-প্রীতির প্রেরণায় যুগে যুগে দেবতার উদ্দেশ্যে রচনা করিয়াছে পূজার অর্থ। কিন্তু সেই অর্থ দেবতার কাছে পৌঁছায় নাই। পৃথিবীতে তাহা লোভী, ভণ্ড অপদেবতাদের হাতে গিয়া পড়িয়াছে। এইভাবে বিশ্বের সমস্ত সমস্ত মানুষগুলিকে প্রতারণা করিয়া সেই অপদেবতার দল নিজেরাই মর্ত্যের দেবতার আসন গ্রহণ করিবার অস্ত্র লিপ্ত হয় নানা নিলজ্জ চক্রান্তে। দেবতার নামে

উৎসর্গীকৃত শ্রদ্ধাভক্তির নৈবেদ্য সেই ধর্মবোধের দল মধ্যপথ হইতে ছিনাইয়া লইয়া আত্মসাৎ করে। কলে, একদিকে ভক্তের ভক্তির অর্ঘ্য দেবতার পদতলে পৌঁছাইয়া দিবার প্রতিশ্রুতি ভুল করিয়া তাহার। বিশ্বের সহজ সরল মানুষগুলির সহিত করে প্রতারণা ; অন্যদিকে, দেবতার ধন নিজেরাই আত্মসাৎ করিয়া তাহার। আশাতিরিক্ত-ভাবে ধনী ও বিত্তশালী হইয়া উঠে। এইভাবেই পৃথিবীর ইতিহাসে স্বাধিক-শক্তির আবির্ভাব। কিন্তু একদিন মানুষের জ্ঞানচক্ৰ উন্মেষ হইবে। সেদিন দেবতার সম্মুখের অপদেবতাদের কদর্ঘ ছায়ামূর্তিগুলি অপসারিত হইবে। সত্যের উজ্জল আলোর উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে ঈশ্বরের জ্যোতির্ময় প্রকাশ ॥

৮. 'কে লইবে মোর কার্য ?' কহে সন্ধ্যারবি,  
 শুনিয়া জগৎ রহে নিরুত্তর ছবি।  
 মাটির প্রদীপ ছিল, সে কহিল, 'স্বামী,  
 আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি।'

প্রত্যেক মানুষেরই জীবনে আসে মহৎ কর্মের আহ্বান। জীবনের সার্থকতা সেই মহৎ কর্মের উদ্ঘাপনের মধ্যেই নিহিত। পৃথিবীতে সকলের শক্তি সমান নয়। বাহার যেটুকু শক্তি আছে, তাহা লইয়া বিশাল কর্মাক্ষুঠানে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তির সমবায়ে রচিত হয় যে বিশাল শক্তি-সংঘ, তাহা দিয়া অসাধ্য সাধনও করা যায়। কিন্তু প্রত্যেক মহৎ কর্মাক্ষুঠানের মধ্যে আছে দুঃখ, আছে কষ্ট, আছে ত্যাগ-স্বীকার। মহাপুরুষেরা অসীম ত্যাগ স্বীকার করিয়া, অকণ্ঠ্য দুঃখকষ্ট স্বীকার করিয়া পৃথিবীর দুঃখ-কষ্ট দূর করিবার জন্ত করেন জীবনপণ প্রয়াস। যে মহান্ আদর্শে উদ্ভূত হইয়া তাঁহার। পৃথিবীর কালিয়া-মোচনে আত্মনিয়োগ করেন, সাধারণ স্বার্থ-সন্ধানী মানুষেরা সেই আদর্শ উপলব্ধি করিতে পারে না। তাহার। স্বার্থ-চিন্তা ও ব্যক্তিগত লাভক্ষতির হিসাব-নিকাশের অঙ্ক করিয়া হতাশ হয় এবং আদর্শ উদ্ঘাপনের মহান্ ব্রত হইতে নিজেদের দূরে সরাইয়া রাখে। আর, ঝাঁহার। বিশ্বপ্রেমিক, মানবপ্রেমিক, ঝাঁহার। অন্ধকার পৃথিবীতে আলো আনিবার জন্ত জীবনপণ করেন, পৃথিবীর মানুষকে অন্ধকারে পথ দেখাইবার জন্য ঝাঁহার। বুকের পাঁজর জ্বলাইয়া নিজেদের নিঃশেষে খাৎ করেন, তাঁহাদের আদর্শের অম্লসরণে কেহ আর অগ্রসর হইয়া আসে না। কিন্তু পৃথিবীর আলো কখনও নিঃশেষে মুছিয়া যাইতে পারে না। পরবর্তীকালের আদর্শনিষ্ঠ সেবা-ব্রতীরা ছুটিয়া আসে। কমতা তাহাদের বতই সীমিত হউক, তাহা লইয়াই তাহার। বিশ্বের ব্রত উদ্ঘাপনে ঝাঁপাইয়া পড়ে ॥

৯. যে নদী হারান্নে স্রোত চলিতে না পারে  
 সহস্র শৈবালদামে বাঁধে আসি তারে,  
 যে জাতি জীবনহারি অচল অসাড়  
 পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকাচার।

চলমানতাই জীবন, নিশ্চলতাই মৃত্যু। সেই চলমানতার স্রোতে জীবন সহজ ও স্বচ্ছন্দ গতিতে রূপ-রূপান্তরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া চলে। কিন্তু কখনও কোন কারণে যদি তাহার সেই গতিচন্দ্র ব্যাহত হয়, জীবন যদি তাহার স্বাভাবিক অগ্রসরণের পথে বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সে তাহার স্বন্দর স্বাভাবিক বিকাশ হারাইয়া বিকৃত রূপ পরিগ্রহ করে। তখন তাহার মধ্যে বিকার এবং নানা কদর্ভতার ঘটে প্রাচুর্য। নানা পাপ ও পঙ্কিতার আবর্তে জীবন হাঁপাইয়া মরে। ইহা যেমন ব্যক্তির জীবনে সত্য, তেমনি সত্য জাতির জীবনেও। সকল জাতিরই থাকে একটি স্বাভাবিক গতির চন্দ্র। সেই চন্দ্রের মধ্যেই জাতির বিকাশ, জাতির মর্মের সঠিক পরিচয় পাওয়া যায়। সেই চন্দ্রে অগ্রসর হইয়া সেই জাতি চরম সাফল্য লাভ করে। কিন্তু কোনদিন যদি সেই জাতি তাহার গতিশীলতা হারাইয়া ফেলে, তবে তাহার জাতীয় জীবনের দিকে দিকে দেখা দেয় অবাস্তিত জড়তা ও নৈর্দ্ব্য। এই জড়তা ও নৈর্দ্ব্যই জাতীয় জীবনের প্রধান শত্রু। কালক্রমে উহা হইতে জন্ম নেয় নানা বিকৃতি ও পচন। সঙ্গে সঙ্গে নানা ঘোঁচাচার ও লোকাচারের আবর্জনা-স্থূপ তাহার জীবনধারা পঙ্কু ও নিশ্চল করিয়া দেয়। তখনই জাতির ভাগ্যাকাশে দুর্ভোগের মেঘ ঘনাইয়া আসে। তখনই জাতির হাতে-পায়ে পড়ে নানা বিধি-নিষেধের বেড়ী, নিষ্ঠুরভাবে বাঞ্জিতে থাকে পরাধীনতার শৃঙ্খল।

০.

বলো, মিথ্যা আপনার সুখ,  
মিথ্যা আপনার দুঃখ! স্বার্থমগ্ন বেজ্ঞন বিমুখ  
বৃহৎ জগৎ হতে, সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে।

সুবিশাল এই পৃথিবী। সুবিশাল তাহার মানবগোষ্ঠী। অস্তুহীন তাহাদের দুঃখ-বেদনা। মাহুঘের কত ব্যথা, কত কান্না পৃথিবীর বুকে পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। বলদপূর্ণ অত্যাচারে দিনের পর দিন অত্যাচারিত হইতেছে কত অসহায় জনগোষ্ঠী। কত বীরের রক্তশ্রোত, কত মাতার অশ্রুধারা ব্যর্থ হইয়া যায়। তবু মাহুঘের ভাগ্যে ঘটে না নূতন সূর্যোদয়, অবসান ঘটে না মাহুঘের দুঃখ-লাহনার। আর, অভ্যদিকে পৃথিবীর স্বার্থমগ্ন মাহুঘ সেই বিশাল জগৎ হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিজেকে স্বার্থপরতার স্বরচিত কারাগারে বন্দী করিয়া রাখে। পাছে জগতের আর্ড-পীড়িতের ক্রন্দনধ্বনি তাহার স্বখ-সন্তোষের জীবনকে স্পর্শ করে, সেইজন্য সে তাহার আত্ম-সর্বস্বতার সকল দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাহার মধ্যে বাস করে। কিন্তু ইহা জীবন নয়। আত্মস্বখসর্বস্বতার জীবন যে মিথ্যা, ভ্রান্ত এবং নিফল—ইহা সে একদিন বুঝিতে পারে। তখন স্বার্থপরতার পাবাণ-প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়ে, ভোগ-স্বখ-সর্বস্বতার অলীক দুর্গ ধ্বংসাং হয়। নূতন জীবনের মন্ড্রে দীক্ষা লইয়া সে বাহিরের বিশ্বের অবাধ আকাশের নীচে আসিয়া পিড়ায়। তখন সে মহাবিশ্ব-জীবনের চন্দ্রের সঙ্গে, জগতের স্বখ-দুঃখের সঙ্গে নিজের জীবনকে যুক্ত করিয়া লাভ করে জীবনের পরিপূর্ণ খাদ, খুঁজিয়া পাই জীবনের চরম এবং পরম সার্থকতা।

। অনুসরণী ।

ভাব-সম্প্রসারণ কর :

১. পথের প্রান্তে আমার তীর্থ নয়,  
পথের দুধারে আছে মোর দেবালয় ।  
শৈবাল দিঘিরে বলে উচ্চ করি শির,  
লিখে রেখো এক ফোটা দিলেম শিশির ।
৩. ঘর বন্ধ করে দিয়ে ভ্রমটারে রুখি ।  
সত্য বলে, 'আমি তবে কোথা দিয়ে চুকি ?'
৪. পুষ্প আপনার জন্ত ফুটে না ।
৫. বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাডি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
৬. ভাল কহে, 'পক্ষ আমি উঠাব না আর ।'  
জেলে কহে, 'মাছ তবে পাওয়া হবে ভার ।'
৭. হাউই কহিল, 'মোর কী সাহস ভাই,  
তারকার মুখে আমি দিয়ে আসি ছাই ।'  
কবি কহে, 'তার গায়ে লাগে নাকো কিছু,  
সে ছাই ফিরিয়া আসে তোমি পিছু পিছু ।'
৮. এ জগতে ধাহারাই বড় হইয়াছেন, তাঁহারা আরামে পালিত লক্ষ্মীর ক্রীতদাস  
নহেন ।
৯. ঔত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধর্মের সাথে,  
তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে ।
১০. হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান্ ।  
তুমি মোরে দানিয়াছ ঐশ্বরের সম্মান  
কণ্টক-মুকুট শোভা ।
১১. পেঁচা রাষ্ট্র করি দেয় পেলে কোনো ছুতা,  
'জ্ঞান না ? আমার সাথে স্বর্ষের শক্ততা ।'  
প্রাচীরের ছিদ্রে এক নামগোজহীন  
ফুটিয়াছে ছোটো ফুল অতিশয় দীন ।  
'ধিক্ ধিক্' করে তারে কাননে সবাই—  
স্বর্ধ উঠি বলে তারে, 'ভালো আছ ভাই ?'
১৩. টিকি মুণ্ডে চড়ি উঠি কহে ডগা নাড়ি,  
'হাত পা প্রত্যেক কাজে তুল করে ভারি ।'  
হাত পা কহিল হাসি, 'হে অভ্রান্ত চুল,  
কাজ করি আমরা যে, তাই করি তুল ।'

১৪. অজ্ঞায় যে করে আর অজ্ঞায় যে সহে  
তব ঘৃণা যেন তারে তৃপ্তময় দহে ।
১৫. তুমিত গর্গভ গেল সরোবর-তীরে  
'ছি ছি কালো জল !' বলি চলে এল কিরে ।  
কহে জল, 'জল কালো জানে সব গাথা,  
যে জন অধিক জানে বলে জল সাদা ।'
১৬. অগ্নিলে মরিতে হবে  
অমর কে কোথা কবে  
চিরস্থির কবে নীর হায়রে, জীবন-নদে ?

### সংকেত ৷

১. জীবনে শ্রেষ্ঠ পূজা প্রেম, প্রকৃতি ও সৌন্দর্য উপভোগের মধ্যেই নিহিত ।
২. স্বার্থ-কলুষযুক্ত প্রচারবিহীন নীরব দানই প্রকৃত দান ।
৩. উদার মুক্ত মনই সত্যের বিহার-ভূমি ।
৪. বিশ্ব-মানবের কল্যাণের জন্যই জীবন ।
৫. মানুষই জীবন্ত ঈশ্বর ; মানব-সেবাই ঈশ্বর-সেবা ।
৬. নিক্রিয়তাই সত্য ও সাক্ষ্য লাভের পথে প্রবল অন্তরায় ।
৭. নীচ ব্যক্তির জগতের মহৎ ব্যক্তির গারে কালিমা লেপন করিবার চেষ্টা করে ; কিন্তু তাহাতে নিজেরাই কালিমালিপ্ত হয় ।
৮. দারিদ্র্যই মহাপুরুষগণের লালন-ভূমি ।
৯. জগতের মধ্যপন্থীরা সামাজিক স্বন্দ-সংঘাত হইতে সর্বদা দূর থাকে ।
১০. দারিদ্র্য প্রতিভার জননী এবং মহাপুরুষগণের অঙ্গের ভূষণ ।
১১. নীচ ব্যক্তির নিজেরা কিছুই করে না ; কিন্তু মহাপুরুষগণের কর্মের নিষ্ফল সদা মুগ্ধ ।
১২. মহাপুরুষের সনাভের অবাঞ্ছিত ও পতিতদের আশ্রয় আশ্রয় ।
১৩. জগতের কর্মীর কাজ করে, ভুলও করে ; আর নির্দয়ার দল ভুলের ভয়ে কোন কাজ করে না ।
১৪. অজ্ঞারকারী ও অজ্ঞাদের প্রশংসাত 'উভয়ই সমান অপরাধী ।
১৫. নির্বোধ ব্যক্তির কোনটা সত্য, কোনটা মিথ্যা বুঝিতে পারে না ।
১৬. জ্ঞাত ব্যক্তির মৃত্যু অবগতাবী ।

**প্রবন্ধ-ছত্র :** রচনা। বাংলার সমাজের  
কলঙ্কিত চিত্র ও শরৎচন্দ্র। সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের  
আবির্ভাব। শরৎ-সাহিত্যের চরম জিজ্ঞাসা।  
শরৎচন্দ্র বস্তুবাদী নন, আদর্শবাদী। শরৎচন্দ্রের  
প্রকৃত প্রতিষ্ঠা। জন্মশতবার্ষিকীর প্রেক্ষাপটে  
শরৎচন্দ্র ও শরৎ-সাহিত্য। উপসংহার।

৫৪.

## শরৎচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী

শরৎচন্দ্র বাংলার প্রাণের শিল্পী, বাঙ্গালীর বেদনার কাব্যকার। বাংলার সাহিত্য-  
গগনে যখন বঙ্কিম-প্রতিভা অন্তর্মিত এবং রবীন্দ্রনাথ পূর্ণ দীপ্তিতে ভাস্বর, তখনই  
শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব। তিনি শুনাইলেন সমাজের চির-বঙ্কিত,  
শূন্য  
চির-পতিত, চির-অবহেলিতদের জীবন-কাহিনী, অশ্রুর অন্ধরে  
রচনা করিলেন সেই হতভাগ্যদের জীবন-কাব্য।

বাংলার রক্ষণশীল সমাজে নারীর স্থান ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ। তাহার উপর  
কৌলিষ্ঠ-প্রথা সমাজে সৃষ্টি করিয়াছিল এক ছরপনৈয় ক্ষত। রামমোহনের সতীদাহ-  
নিবারণ এবং বিজ্ঞানাগরের বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন বাংলাদেশে নারী-নিগ্রহের কিছুটা  
উপশম ঘটাইলেও লোকচক্ষুর অন্তরালে নারী-সমাজের পচন ও অবক্ষয়ের নিত্য-নূতন  
করণ কাহিনী রচিত হইতেছিল। অতীতকে, কৃত্রিম জাতিভেদকে হাতিয়ার করিয়া  
ব্রাহ্মণ-সমাজ নিম্নশ্রেণীর মানুষগুলির উপর গুরু করিয়াছিল  
বাংলার সমাজের  
কলঙ্কিত চিত্র ও শরৎচন্দ্র  
হৃদয়হীন লাঞ্ছনা ও অপমান। তার উপর, লর্ড কর্নওয়ালিশ-প্রবর্তিত  
জমিদারী-প্রথা  
ক্ষমতাবান জমিদার-শ্রেণী অকথ্য অত্যাচারে  
তাহাদের জীবন করিয়া তুলিয়াছিল দুর্বিষহ। বাংলার সমাজে সেদিন ‘প্রতিকারহীন  
শক্তির অপরাধে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃত’ কাঁদিতেছিল। শরৎচন্দ্র বাংলার সেই  
ব্যথাধারী বেদনার উপর সমবেদনার করম্পর্শ বুলাইয়া দিলেন, ত্যায় বিচারের আশায়  
সেই নিপীড়িত, বঙ্কিত, হতভাগ্যদের করণ কাহিনীর অন্তরালে আঁজি পেশ করিলেন  
মানবতার বিচারশালায়।

১৮৭৬ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর। স্থান : হুগলি জেলার দেবানন্দপুর। এখানেই  
এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পরিবারে শরৎচন্দ্রের জন্ম। পিতার নাম মতিলাল চট্টোপাধ্যায়,  
মাতার নাম ভুবনমোহিনী দেবী। শৈশবে প্যারী পণ্ডিতের পাঠশালায় এবং সিদ্ধেশ্বর  
মাস্টারের বাংলা স্কুলে গুরু হয় তাঁহার শিক্ষা-জীবন। কিন্তু অল্পকাল পরেই তিনি  
ভাগলপুরে মাতুলালয়ে চলিয়া যান। সেখানে তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজের



হাই স্কুল হইতে দ্বিতীয় বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু পরীক্ষার ফী সংগ্রহ করিতে না পারায় এক. এ. পরীক্ষা দেওয়া তাঁহার ভাগ্যে ছোটো নাই। তারপর কোন অজ্ঞাত কারণে তিনি চলিয়া যান ভারতের বাহিরে — স্বদূর রেঙ্গুনে। কৈশোরে রচিত তাঁহার ‘কালীনাথ’ গল্পটিকে সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের বাদ দিলে কুস্তলীন-পুরস্কার-প্রাপ্ত ‘মন্দির’ গল্পটিই তাঁহার আবির্ভাব সম্ভবতঃ প্রথম রচনা। দীর্ঘকাল নিরুদ্ধেশের পর হঠাৎ একদিন কলিকাতার ‘ভারতী’ পত্রিকায় বাহির হইল শরৎচন্দ্রের ‘বড়দিদি’ নামে বড় গল্পটি। এই গল্পটির আবেদনে শরৎচন্দ্র একদিনেই বাঙালীর হৃদয় হরণ করিয়া লইলেন। এ যে সম্পূর্ণ নূতন স্বাদ! কাহিনী, চরিত্র ও বক্তব্য সমাজের নিরুদ্ধ বেদনা হইতে সংগৃহীত।

শরৎ-সাহিত্য তাই যুগ-যজ্ঞণায় কাতর, সামাজিক ব্যথা-বেদনায় অশ্রুসিক্ত। শরৎচন্দ্রের কৃতিত্ব সেইখানেই। তাঁহার দেবদাস, অরক্ষণীয়া, শরৎ-সাহিত্যের চরম লিঙ্গাসা, বামুনের মেয়ে, বিপ্রদাস, চন্দ্রনাথ, গৃহদাহ, চরিত্রহীন, দেনাপাওনা, দস্তা, শ্রীকান্ত, শেষ প্রশ্ন, পৃথের দাবী ইত্যাদি ‘বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। তাঁহার চন্দ্রমুখী, সাবিত্রী, কিরণময়ী, রাজলক্ষ্মী, অন্নদাদিদি একদিন বাঙালীর সমাজ-চেতনায় এক বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল।

নারী-চরিত্র অঙ্কনে শরৎচন্দ্রের কৃতিত্ব সর্বাধিক। বাঙালী নারীর বাণীহার্য বেদনা শরৎ-সাহিত্যে প্রকাশের প্রকৃত ভাষা পাইয়াছে। সমাজ-জীবনের রূঢ় বাস্তবতাকে তিনি স্বীকার করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাকে শরৎচন্দ্র বস্তববাদী নন, আদর্শবাদী। ‘রিয়ালিস্ট’ বলা কখনই উচিত হইবে না। এক স্থলে তিনি বলিয়াছেন, ‘যারা শুধু দিলে, বিনিময়ে পেলে না কিছুই, তারাই আমাকে পাঠালে মাহুঘের দরবারে নালিশ জানাতে।’ তাঁহার সাহিত্যে তিনি রূঢ় বাস্তবকে রূপ দিয়া অসুন্দরের মধ্যে সুন্দরকে খুঁজিয়াছেন। সেদিক দিয়া শরৎচন্দ্র অবশ্যই আদর্শবাদী।

শরৎ-সাহিত্যে আমরা দেখি আমাদের সমাজের বহু-কলঙ্কিত মুখ, শুনি আমাদের আত্মার ক্রন্দন। কিন্তু মানবাত্মা সামাজিক পচন ও অবক্ষয়ের মধ্যেও থাকে নিষ্কলঙ্ক। শরৎচন্দ্র সেই নিষ্কলঙ্ক মানবাত্মার জয়গান করিয়াছেন। তাঁহার শরৎচন্দ্রের প্রকৃত প্রতিষ্ঠা ‘মহেশ’, ‘অভাগীর স্বর্ণ’, ‘একাদশী বৈরাগী’—ছোটগল্পগুলি শুধু বাংলা সাহিত্যেই নয়, বিশ্ব-সাহিত্যেও বিশিষ্ট মর্যাদা দাবী করে।

আজ শরৎচন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকীর প্রেক্ষাপটে শরৎচন্দ্রকে নূতন করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, তাঁহার সাহিত্যের নূতন মূল্য রিচার করিতে হইবে। উক্ত আধুনিকতায় শরৎ-সাহিত্যকে দূরে সরাইয়া রাখিলে চলিবে না। বথার্থ সংবেদনশীল পাঠকের মতো শরৎ-সাহিত্যের পূর্ণ মূল্য উপলব্ধি করিতে হইবে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শরৎ-সাহিত্য বহু পূর্ব হইতেই প্রায় সকল ভারতীয় ভাষাতেই অনূদিত হইয়া ভারতীয় পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে। আজ জন্মশতবার্ষিকীর আলোকে শরৎ-সাহিত্যকে

নুতন করিয়া উপলব্ধি করিবার প্রয়াস সূচিত হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন স্থানে শরৎচন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী কমিটি গঠিত হইয়াছে। সভা-সমিতির মধ্য দিয়া শরৎ-সাহিত্যের বিভিন্ন দিক-দিশে বিষয়ে আলোচনা, শরৎচন্দ্রের কাহিনীর নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করিবার ব্যবস্থা ইত্যাদি জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের প্রধান অঙ্গ। এই উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকার শরৎচন্দ্রের একটি প্রামাণ্য জীবন-চিত্র উপহার দিয়াছেন এবং শরৎচন্দ্রের রচিত দুইটি কাহিনী চলচ্চিত্রে রূপায়িত করিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। সেই সঙ্গে শরৎ-সাহিত্য স্থলভে প্রকাশের ব্যবস্থা করিলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার জনগণের ধন্যবাদার্থ হইবেন।

বঙ্গালী জাতি শরৎচন্দ্রের নিকট বহুভাবে ঋণী। কেবল বঙ্গালী জাতিই নয়, সমগ্র ভারতবর্ষই, এমন-কি স্বাধীন বাংলাদেশও শরৎচন্দ্রের নিকট অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ। আজ সেই মরদী, মরমী, প্রিয় কথাশিল্পীর জন্মশতবার্ষিকী। আজ তাঁহার নিকট আমাদের ঋণ-শোধের দিন। হৃদয়ের শ্রদ্ধাভক্তি ভালোবাসা উজ্জাড় করিয়া আমরা আজ তাঁহার জন্মশতবর্ষকে ঐশ্বর্য্য মর্যাদার সহিত পালন করিব এবং নিজেদের গৌরবান্বিত করিব। তাহার মধ্য দিয়া শরৎচন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী সার্থক হইয়া উঠিবে ॥

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- বাংলা সাহিত্য ও শরৎচন্দ্র
- বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের স্থান
- মরদী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র

প্রবন্ধ-ভূমি : দুচনা। ভারতে জরুরী  
অবস্থা। গণতন্ত্রের প্রয়োজনে। বাক্-স্বাধীনতা।  
অর্থনৈতিক প্রয়োজনে : দুর্নীতি-দমন। বিশদকা  
কর্মহুচী। কলাকল। উপসংহার।

৫৫.

## বর্তমান ভারতে জরুরী অবস্থা

স্বাধীনতা-লাভের আটশ বছর পরে ভারতে এমন এক অভূত পরিস্থিতির  
উদ্ভব হয়, যখন দিকে দিকে আইন ও শৃঙ্খলা ভেঙে পড়তে থাকে। গণতান্ত্রিক উপায়ে  
নির্বাচিত সরকারকে অপসারিত করবার জন্য সরকারী কর্মচারী, পুলিশ, এমনকি  
সেনাবাহিনীকেও আইন অমান্য করবার জন্য উস্কানি দেওয়া  
হচ্ছিল। ফলে, সরকার যে সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচীর রূপায়ণে অগ্রসর  
হচ্ছিলেন, তাকে বাধা দান করে দেশময় একটা হতাশার ভাব ছড়িয়ে দেবার অপচেষ্টা  
সূচিত হয়েছিল। তখন ১৯৭৫ সালের ২৬শে জুন পরিস্থিতির মোকাবিলায় জল্পে  
জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়।

জরুরী অবস্থা ভারতে নতুন ঘটনা নয়। ইতিপূর্বে দু'দবার ভারতে জরুরী অবস্থা  
ঘোষিত হয়। ১৯৭১ সালে পাক-ভারত সংঘর্ষের সময় যে জরুরী অবস্থা ঘোষিত  
হয়েছিল, তা এখনো বহাল আছে। তার ওপর আবার নতুন করে  
জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে হলো। শান্তির সময়ে আভ্যন্তরীণ  
আইন-শৃঙ্খলার প্রয়োজনে এবং দুর্নীতি-দমনে জরুরী অবস্থার ঘোষণা এই প্রথম।

বর্তমান জরুরী অবস্থার বলে হিংসার রাজনীতিতে বিশ্বাসী চারটি রাজনৈতিক  
দলকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। দলগুলি হলো রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ, আনন্দ মার্গ,  
জমাত-এ-ইসলামী এবং সি. পি. আই. [এম. এল.]। কোন ব্যক্তি যদি এইসব দল  
পরিচালনা করেন বা পরিচালনায় সাহায্য করেন, তাঁদের বিরুদ্ধে  
গণতন্ত্রের প্রয়োজনে  
নতুন 'মিসা' আইন প্রয়োগ করা হবে। নতুন 'মিসা' আইনে  
জামিন, মুচলেকা বা অন্য কোন প্রকার মুক্তিদান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এইভাবে  
হিংসার রাজনীতি থেকে দেশকে, দেশের গণতন্ত্রকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বাক্-স্বাধীনতা ভারতীয় সংবিধানেও একটি পবিত্র অধিকার। কিন্তু অধিকার  
মানে তো আর বেচ্ছাচারিতা নয়। দেখা গেছে, 'বাক্-স্বাধীনতা দেশের কয়েকটি  
সংবাদপত্র দারুণভাবে অপপ্রয়োগ করেছে।' তাই সরকারকে  
বাক্-স্বাধীনতা

সব সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে 'সেন্সার'-পদ্ধতি চালু করতে হয়।  
বর্তমানে ভিত্তিহীন গুজব, কিংবা সরকারী কর্মচারী এবং সশস্ত্র বাহিনীতে অসন্তোষ ও  
বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে, এমন কোন সংবাদ বা মন্তব্য প্রকাশ বে-আইনী।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জরুরী অবস্থার প্রয়োগ খুবই ব্যাপক। আগেকার 'মিসা'  
আইনে অনেক অর্থনৈতিক অপরাধী বেকহর খালাস পেয়ে নতুন উজ্জমে চোরাই  
কারবার, কর-ফাঁকি ইত্যাদি সমাজ-বিরোধী কাজে লিপ্ত হতো। কিন্তু নতুন 'মিসা'

আইনে কাউকে গ্রেপ্তারের কারণ দেখাতে হবে না, জামিনে মুক্তি লাভেরও উপায় নেই। সরকার নতুন 'মিলা' আইনে এক হাজারেরও বেশী অর্থনৈতিক অপরাধীকে আটক করেন। বারো পলাতক, তাদের সম্পত্তি পর্যন্ত অর্থনৈতিক প্রয়োজনে : বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সেই সঙ্গে 'কালো টাকা' উদ্ধারের দ্রুত-নিষেধ অভিযান জোরদার করা হয়। অন্তর্দিকে, নিত্য-প্রয়োজনীয়, জরুরি উৎপাদন ও যোগান অব্যাহত রাখার জন্তে জরুরী নির্দেশ দেওয়া হয়। সমস্ত দোকানে দ্রব্যের মূল্য ও মজুতের হিসাব টাঙিয়ে রাখতে হবে।

সেই সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচীর রূপায়ণে জরুরী অবস্থা প্রয়োগ করা হয়েছে। সেজন্তে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী বিশদফা কর্মসূচী জরুরী ভিত্তিতে রূপদানের জন্তে সরকারের হাতে তুলে দিয়েছেন। এই কর্মসূচীর লক্ষ্য হলো শোষিত জনশ্রেণীকে বিশদফা কর্মসূচী শোষণের হাত থেকে রক্ষা করে এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করে স্বার্থ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। ভূমি-সংস্কার সফল করে, কর-ফাঁকি বন্ধ করে, পণ্যমূল্য হ্রাস করে, নিয়ম আয়ের মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে করের আওতার বাইরে রেখে, বেকার সমস্যার সমাধান করে এবং ছাত্রদের স্বল্পভেদে বইপত্র ও অত্যাবশ্যক জরুরি যোগান দিয়ে সরকার নতুন এক অর্থনৈতিক সংগ্রামের সূচনা করেছেন।

জরুরী অবস্থার কতকগুলি জরুরী কল পাওয়া গেছে : এক. পণ্যের যোগান অব্যাহত আছে। দুই. পণ্যমূল্য কমতির দিকে। তিন. জিনিসপত্রের দাম কমে যাওয়ায় এবং ঋণশোধ সুগত রাখার গ্রামের কৃষক ও কারিগরেরা স্বস্তি পেয়েছে। চার. আট হাজার টাকা পর্যন্ত আয়কর মুক্ত হওয়ায় স্বস্তি পেয়েছে মধ্যবিত্ত শ্রেণীও। পাঁচ. ভূমিহীন কৃষকেরা বাসগৃহ তৈরীর জন্তে জমি পেয়েছে। কলাকল ছয়. সংবাদপত্রে 'সেন্সার' প্রথা চালু হওয়ায় সরকার সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচীর রূপায়ণে পুরোপুরি মনোযোগ দিতে পারছেন। সাত. কালো টাকাকে জব্দ করা সম্ভব হচ্ছে। আট. চোরাই চালানোর বহর কমেছে। নয়. উদ্ভূত জমির সংগ্রহ ও বণ্টন সহজ হয়েছে। এবং দশ. বেকার-সমস্যার আংশিক সমাধানে ধীরে ধীরে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে।

স্বাধীনতালাভের পর কাজ যত না হয়েছে, বাগ্‌বিস্তার হয়েছে অনেক বেশী। এবার আর বাগ্‌বিস্তার নয়, কাজের কাজ করার পালা। জরুরী অবস্থা সেই সুযোগ সরকারের হাতে এনে দিয়েছে। আমরা আশাকরি, সরকার তার উপসংহার পূর্ণ সদ্যবহার করে দেশে গরিবী, অসাম্য, বিশৃঙ্খলা, বেকারত্ব ও অনিশ্চয় দূর করে স্বন্দর একটি সমাজ-ব্যবস্থা জনগণের হাতে তুলে দিতে পারবেন।

এই প্রবন্ধের অন্তিমংশে লেখা যায় :

- জরুরী অবস্থা কি ও কেন
- জরুরী অবস্থার ফল

প্রবন্ধ : স্বতন্ত্রতা : রচনা। বিশদক। কর্মসূচী  
রচনা। বিশদক। কর্মসূচীর খুঁটিনাটি। উপসংহার।

## প্রধানমন্ত্রীর বিশদক। কর্মসূচী ও তাহার রূপায়ণ

স্বাধীনতা-লাভের পর দীর্ঘ আটশ বছর কেটে গেছে। ইংরেজ জাতির দুশো বছরের শাসনে ও শোষণে ভারতের অর্থনীতি এক সর্বস্বান্ত অবস্থায় পৌঁচেছিল। স্বল্পতম কৃষি-উৎপাদন, অপরিবর্তিত কিছু কলকারখানা, অল্পাভাব, পণ্যাভাব, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য, বেকার-সমস্যা, খন-বৈষম্য ইত্যাদি উপহার দিয়ে ইংরেজ জাতি এদেশ থেকে বিদায় গ্রহণ করে। স্বাধীনতা-লাভের পর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করবার জন্তে দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছিল। দিকে দিকে

নানা কর্মকাণ্ড শুরু হয়ে যায়। তারপর গৃহীত হলো সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী। কিন্তু দেশের বিস্তারিত সম্প্রদায় নানাভাবে সেই কর্মসূচীকে বানচাল করে দেবার চক্রান্ত করতে থাকে। অবশেষে ১৯৭৫ সালের ২৬শে জুন দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে সরকার জরুরী ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচীর রূপায়ণে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে এলেন। বিশদক। কর্মসূচী হলো সেই অর্থনৈতিক প্রগতির প্রতীক।

এই কর্মসূচীর রচয়িতা হলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। তিনি উপলব্ধি করেছেন, অথবা বাগ্‌বিস্তারে বহু বছর কেটে গিয়েছে। নানা চক্রান্তে সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচীর রূপায়ণ বানচাল অথবা বিলম্বিত হয়েছে। দেশের দরিদ্র এবং অল্পস্বত সম্প্রদায় যে ভিমে, সেই ভিমিরে পড়ে আছে। কাজেই, অথবা বাগ্‌বিস্তারের সময় আর নেই। বিস্তারিতদের চক্রান্ত বানচাল করে এখনই বিশদক। কর্মসূচী রচনা

সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচীর রূপায়ণে কাজের কাজ শুরু করা চাই। নইলে, ভারতের অর্থনৈতিক পুনর্জাগরণ নেই। এক বলিষ্ঠ ভারত-গঠনই শ্রীমতী গান্ধীর স্বপ্ন। সেই স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দেবার জন্তে তিনি প্রণয়ন করলেন বিশদক। কর্মসূচী এবং সরকার ও জনগণকে নিষ্ঠার সঙ্গে তার রূপায়ণে করলেন অল্পপ্রাণিত।

কর্মসূচীগুলি হলো : এক. নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলির দাম কমানোর জন্তে সেগুলির উৎপাদন, সংগ্রহ ও বন্টন-ব্যবস্থাকে সুষ্ঠুতর করতে হবে। সেক্ষেত্রে সরকারী ব্যয়-বাহুল্য হ্রাস করতে হবে। দুই. যে সব জমি চাষের যোগ্য, বিশদক। কর্মসূচীর খুঁটিনাটি তাদের মালিকদের হাতে কত পরিমাণ জমি থাকবে, তা বেঁধে দেওয়া হয়েছে ; তাকে কার্যকর করে উৎকৃষ্ট জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টন করতে হবে। তিন. ভূমিহীন ও অল্পস্বত শ্রেণীর মানুষদের গৃহ-নির্মাণের জন্তে কত জমির ব্যবস্থা করে দিতে হবে। চার. বেগার-প্রথা বা পারিশ্রমিক ছাড়া বাধ্যতামূলক শ্রমিক-প্রথাকে অবৈধ ঘোষণা করা হবে। পাঁচ. গ্রামের ভূমিহীন

কৃষক, ছোট চাষী এবং হস্তশিল্পের কারিগরদের স্বর্ণ শোধ স্থগিত রাখা হবে। ছয়. কৃষি-শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরী আইনের পর্যালোচনা করা হবে। সাত. আরো পঞ্চাশ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচের সুবিধা সম্প্রসারিত করা হবে। এবং ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহার করবার জন্তে একটি জাতীয় কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে। আট. বিদ্যুৎ-উৎপাদনের কর্মসূচীকে দ্রুত রূপায়িত করতে হবে এবং সমস্ত তাপবিদ্যুৎ-কেন্দ্রগুলিকে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে আনা হবে। নয়. হস্তচালিত তাঁতশিল্পের উন্নয়ন-প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। দশ. সাধারণের ব্যবহারযোগ্য কাপড়ের মান ও সরবরাহের ব্যবস্থা উন্নত করা হবে। এগারো. শহরে খালি জমির মালিকানা ও বসতবাড়ির উর্ধ্বসীমা বেঁধে দেওয়া হবে। বারো. শহরের বড় বড় বাড়িগুলির মূল্য নির্ধারণ করা হবে ও কর-ফাঁকি বন্ধ করবার জন্তে বিশেষ বাহিনী গঠা হবে। তেরো. অর্থনৈতিক অপরাধীদের সরাসরি বিচার ও কঠোর শাস্তিদানের ব্যবস্থা করা হবে। চৌদ্দ. চোরাই-চালানদারদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করবার জন্তে বিশেষ আইন রচনা করা হবে। পনেরো. বিনিয়োগপদ্ধতি সহজ করে আমদানি লাইসেন্সের অপব্যবহার বন্ধ করা হবে। ষোলো. কলকারখানায় কর্মী-সমিতির জন্তে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। সতেরো. সড়ক-পরিবহণের জন্তে জাতীয় পারমিটের ব্যবস্থা করা হবে। আঠারো. মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্ষেত্রে আট হাজার টাকা পর্যন্ত আয়কর ধরা হবে না। উনিশ. ছাত্রদের জন্তে স্থলভ মূল্যে নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং বইপত্র সরবরাহ করা হবে। কুড়ি. কর্ম-সংস্থান ও প্রশিক্ষণ-ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করা হবে এবং এ ব্যাপারে সমাজের অগ্রদূত সম্প্রদায়ের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হবে।

এইভাবে বিশদকা কর্মসূচীর দ্বারা সমাজের সকল অংশকে স্পর্শ করা হয়েছে। কি দরিদ্র কৃষক, কি ক্ষুদ্র চাষী, কি অগ্রদূত সম্প্রদায়, কি মধ্যবিত্ত শ্রেণী—সকলেই এই বিশদকা কর্মসূচীর দ্বারা উপকৃত হবে। আর, যারা চোরাই উপসংহার কারবারী, যারা কর-ফাঁকি দেয়, তারা এর দ্বারা ক্ষুব্ধ হবে। কাজেই, এবার আর অর্থনৈতিক উন্নয়নের সফল ধনীদের প্রাসাদে প্রবাহিত হয়ে যাবে না, যাবে দরিদ্রের পূর্ণকুটির—সকল মানুষের ঘরে—সমানভাবে। ফলে, বলিষ্ঠ ও সুখী সমাজ স্থাপনের স্বপ্ন সফল হবে।

এই প্রবন্ধের অন্তিমরণে লেখা যায় :

- বিশদকা কর্মসূচীর গুরুত্ব
- সমাজতন্ত্র ও বিশদকা কর্মসূচী
- বিশদকা কর্মসূচীর সাহায্যে পরিবি হটাৎ

প্রবন্ধ-সূত্র : সূচনা। আর্ঘভট্ট। জন্মকাল  
ও জন্মকাল। পৃথিবীর আক্ষিক-গতি আবিষ্কার।  
'আর্ঘভট্টীয়'। সমালোচনা। কৃত্রিম উপগ্রহ—  
আর্ঘভট্ট। কার্যকারিতা ও দ্বিতীয় উপগ্রহ—রোহিণী।  
উপসংহার।

৫৭.

## ভারতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ : আর্ঘভট্ট

প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান-সাধনার ধারাকে ধ্বংস করে কুটকূলী ইংরেজ জাতি  
প্রচার করেছিল যে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এদেশ চিরকালই অমূর্ত ; আধুনিক যুগে  
বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতের যেটুকু উন্নতি তা ইংরেজ জাতির সঙ্গে  
সুচনা  
যোগাযোগের প্রত্যক্ষ স্বকল। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, ভারত  
অতি প্রাচীনকাল থেকেই বিজ্ঞান-সাধনার আত্মনিয়োগ করেছিল ; তাঁর আর্ঘভট্ট,  
ভাস্করাচার্য, নাগার্জুন প্রমুখ বিজ্ঞানীরা বিশ্ব-বিজ্ঞানকে তাঁদের গবেষণা ও আবিষ্কার  
দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন।

সে কথা স্বীকার করতে আধুনিক যুরোপের আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হতে পারে। কিন্তু  
মহাবিশ্ববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারত সেদিন যে পৃথিবীর অন্ততাত্ত্ব দেশকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল,  
তা আজ প্রমাণিত হয়ে গেছে। আর আশ্চর্যের বিষয়, ভারতই পৃথিবীতে প্রথম প্রমাণ  
কবে যে, সূর্য নয়, পৃথিবীই নিজের মেরুরেখার ওপর ভর দিয়ে  
আর্ঘভট্ট  
পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিকে ঘুরছে। ভারত একথা প্রমাণিত  
করবার প্রায় হাজার বছর পরে যুরোপের পোল্যান্ডের অধিবাসী নিকোলাস  
কোপারনিকাস বৈজ্ঞানিক তথ্যের সাহায্যে প্রমাণ করলেন ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের  
আবিষ্কৃত সত্যটিকে। যে ভারতীয় বৈজ্ঞানিক পৃথিবীর আবর্তনের সত্যটিকে প্রতিষ্ঠিত  
করেছিলেন, তাঁর নাম আর্ঘভট্ট।

তখন ভারতে গুপ্ত সম্রাটদের শাসনকাল। ভারতের ইতিহাসে ঐ সময়টি 'স্বর্ণযুগ'  
নামে চিহ্নিত। সেই স্বর্ণযুগে ৪৭৬ খ্রিস্টাব্দে পৃথিবীর একটি অদ্ভুত ঘটনা সত্যকে  
উদ্ঘাটিত করবার জন্তে মগধ রাজ্যের কুম্ভমপুরে জন্মগ্রহণ  
জন্মকাল ও জন্মকাল  
করেন আর্ঘভট্ট। মগধের রাজধানী পাটলিপুত্রের অদূরে  
অবস্থিত ছিল কুম্ভমপুর। বর্তমানে স্থানটি উত্তর বিহারের অন্তর্গত।

অতি শৈশব থেকেই আর্ঘভট্ট মহাকাশের গ্রহনক্ষত্র এবং অক্ষশাস্ত্রের প্রতি ছিলেন  
বিশেষ অক্লান্ত। প্রথম যৌবনেই তিনি এই দুটি বিষয়ে গবেষণা চালিয়ে সাক্ষ্য  
লাভ করেন। জ্যোতির্বিজ্ঞান ও অক্ষশাস্ত্র—এই দুটি বিষয়  
পৃথিবীর আক্ষিক-গতি  
আবিষ্কার  
পরম্পর-বিরোধী নয়; বরং তারা পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল।  
আর্ঘভট্ট তাই প্রথম থেকেই একসঙ্গে দুটি বিষয়ের গবেষণা শুরু  
করেন। তার কল-পরিণাম হলো, পৃথিবীর আক্ষিক-গতির আবিষ্কার। তিনিই প্রথম  
আবিষ্কার করলেন, পৃথিবী প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় নিজের মেরুদণ্ডের ওপর পশ্চিম  
থেকে পূর্বে একবার আবর্তন করে। তার ফলে দিনরাত্রি হয় এবং তার ফলে মনে

হয়, সূর্য পূর্বদিকে উদিত হয় ও পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। আসলে, সূর্যের উদয়ান্ত বলে কিছু নেই। আন্থিক-গতির কালে পৃথিবীর আবর্তনের জন্তে ওটা মাহুষের দৃষ্টিগ্রম মাত্র।

সুধু আন্থিক-গতি আবিষ্কারই নয়, অক্ষশাস্ত্রেও আর্ধভট্ট বহু সূক্ষ্ম বিষয়ের আবিষ্কার। অনেকের মতে, তাঁর শ্রেষ্ঠগ্রন্থ ‘আর্ধভট্টীয়’ মাত্র তেইশ বছর বয়সে লেখা হয়। এতেই পৃথিবীর আন্থিক-গতির কথা প্রথম লিপিবদ্ধ হয়। তাছাড়া, এতে আছে অক্ষশাস্ত্রের বহু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়। ‘আর্ধভট্টীয়’ মাত্র ১২৩টি শ্লোকের সংকলন। শ্লোকগুলি চারটি ভাগে বিভক্ত। দশগীতিকা, কালক্রিয়া, গোলপাদ এবং গণিতপাদ। দশ-গীতিকা, কালক্রিয়া এবং গোলপাদে পৃথিবীর এবং অন্তান্ত্র গ্রহনক্ষত্রের কথা আলোচিত হয়েছে। আর, গণিতপাদে অক্ষশাস্ত্রের বর্গমূল, ঘনমূল, সমীকরণ, ত্রৈরাশিক ইত্যাদি বিষয় নিয়ে এবং অক্ষশাস্ত্রের অন্তান্ত্র রীতিপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তিনি যেভাবে সময়ের অতি-বিশাল ও অতি-সূক্ষ্ম হিসাব দেখিয়েছেন, তা আধুনিক বৈজ্ঞানিকদেরও বিস্ময় উদ্ভেক করে। তিনি মিনিট-সেকেন্ডের চেয়েও সূক্ষ্মতর কাল-বিভাগ দেখিয়েছেন; তেমনি এক মহাযুগে অর্থাৎ ৪,৩২০,০০০ বছরে পৃথিবী কতবার আবর্তিত হবে, তাও হিসেব করে লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর গ্রন্থেই প্রথম শূন্যের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। অক্ষশাস্ত্রে তিনিই শূন্যের প্রথম আবিষ্কার।

কতচ আর্ধভট্টের আবিষ্কার প্রচলিত ধারণার সঙ্গে না মেলায় অচিরে তা প্রবল সমালোচনার সম্মুখীন হয়। ভাস্কর্য্যার্থ তাঁর কঠিন সমালোচনা করে মাটিতে একটি দণ্ড পুঁতে দিয়ে এবং তার মাথার একধানা নিশান উড়িয়ে দিয়ে সমালোচন

সর্বসমক্ষে দেখালেন, আর্ধভট্টের আবিষ্কার ভুল; কারণ, নিশানের মুখ বরাবর পশ্চিম দিকে না হয়ে হাওয়ার গতি যখন বৈদিক, সেদিকেই হতে লাগলো। কাজেই, পৃথিবী যে গোলাকার এবং তার যে আন্থিক-গতি আছে, তা অস্বীকৃত হলো। এইভাবে এক ভুল প্রমাণের দ্বারা আর্ধভট্ট বাতিল হয়ে যান

কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান বিশ্বয়ের সঙ্গে স্বীকার করেছে, আর্ধভট্টই নির্ভুল। তাই আধুনিক ভারত প্রাচীন ভারতের সেই স্মহান বৈজ্ঞানিকের অবিস্মরণীয় নামটিকে মহাকাশের পাতায় আলোকের অক্ষরে লিপিবদ্ধ করবার জন্তে ১৯৭৫ সালের ১৯শে এপ্রিল অর্থাৎ আর্ধভট্টের জন্মের ঠিক দেড় হাজার বছর পরে মহাকাশে তার প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহটি স্থাপিত করে এবং তার নামকিত করে ‘আর্ধভট্ট’। এই কৃত্রিম উপগ্রহ—‘আর্ধভট্ট’ ‘আর্ধভট্টের’ পরিকল্পনা, নির্মাণ-কৌশল এবং তার কার্যকারিতা—সমস্তই ভারতীয় বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদদেরই একনিষ্ঠ সাধনার ফল। তাকে ভারত কক্ষপথে স্থাপন করেছে যে শক্তিশালী রকেট, তাতেও রয়েছে ভারতীয় কৃত্তিমের স্বাক্ষর। উপগ্রহ ‘আর্ধভট্ট’ ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থাকে মহাকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের নানা খুঁটিনাটি তথ্য সরবরাহ করবে এবং আবহমণ্ডলের নানা সংবাদ জানিচ্ছে মাহুষের অনাগত বিপদ-আপদ সম্বন্ধে পূর্বাঙ্কেই সতর্ক করে দেবে।



আর্ঘভট্ট এখন প্রতি মিনিটে পাঁচবার পাক খাচ্ছে এবং কক্ষপথে তার গতি সেকেন্ডে প্রায় আট কিলোমিটার। আর্ঘভট্ট টেলিভিশনযোগে তার গ্রাউণ্ড স্টেশনে যে তথ্য সরবরাহ করে চলেছে, তাতে আবহবিজ্ঞান, জলবিজ্ঞান এবং মহাসমুদ্র-বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্ভব হচ্ছে। এর দ্বারা এই সব বিজ্ঞানকে অধিকতর কার্যকরভাবে মানুষের সেবার লাগানো যাবে। তাছাড়া, গণ-শিক্ষায়ও আর্ঘভট্টকে কাজে লাগানো যায়। সুদূর গ্রামাঞ্চলে যেখানে আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পরিধি ব্যাপ্ত হয়নি,

সেখানে কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কার্যকারিতা ও দ্বিতীয় উপগ্রহ—রোহিণী সেবা পৌঁছিয়ে দেওয়া যায়। মোট কথা, আর্ঘভট্টের সাফল্য আজ ভারতের প্রযুক্তি-বিজ্ঞানীদের সামনে বহু পথ খুলে দিয়েছে।

মহাকাশে আর্ঘভট্টের আবু আর মাত্র এক বছর। ইতিমধ্যে সে প্রায় ৫৫ হাজার বার তার পৃথিবী-পরিক্রমা সমাপ্ত করেছে। দু'বছর কাল মহাকাশে সফল পরিক্রমণের শেষে আর্ঘভট্টের কার্যকারিতা সমাপ্ত হবে। তারপর ধ্বংস হবার আগে সে প্রায় আট বছর মহাকাশে থাকবে। কিন্তু তার আগেই : ১৭৮ সালে ভারত তার দ্বিতীয় কৃত্রিম উপগ্রহ রোহিণীকে মহাকাশে পাঠাবে। চল্লিশ কিলোগ্রাম ওজনের রোহিণীকে তার কক্ষপথে স্থাপন করবে ভারতের প্রথম নিজস্ব তৈরী রকেট—এস. এল. ডি—৩।

বর্তমান ভারত তার স্মহান্ বৈজ্ঞানিক আর্ঘভট্টের মূল্যবান উত্তরাধিকার গ্রহণ করেছে এবং মহাকাশ গবেষণায় আর্ঘভট্টের প্রদর্শিত পথে নতুন যুগের সূচনা করেছে।

ভারতের এই সাধনা সফল হোক। বর্তমান ভারত মহাকাশের উপসংহার রহস্য ভেদ করবার অস্ত্র যে নতুন সিংহদ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে, তা-ই হবে আগামীকালের মহাকাশ গবেষণার প্রবেশ পথ এবং সেই সিংহদ্বারের নাম অস্ত্র কিছু নয়—‘আর্ঘভট্ট’ ॥

এই প্রবন্ধের অন্তঃসরণে লেখা যায় :

- ভারতের মহাকাশ গবেষণা
- প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান-সাধনা
- ‘আর্ঘভট্ট’ কি ও কেন ?

৫৩.

### পরীক্ষার পূর্বরাত্রি

**সূচনা** ॥ পরীক্ষার পূর্বরাত্রির কথা ভোলা যায় না। **ভয়ানকতা** ॥ মনের মধ্যে একটা ভয়ের চলাফেরা। **অনিশ্চয়তা** ॥ কি হবে, প্রশ্ন সহজ না কঠিন হবে, প্রশ্ন আমার জ্ঞানায় মধ্যে না অজ্ঞান, আমি কেমন উত্তর করতে পারবো—এমনি অসংখ্য অনিশ্চয়তা আমাকে বিহ্বল করে তুলেছিল। **স্বৃতিশক্তির প্রতি অবিশ্বাস** ॥ মনে হয়, স্বৃতিশক্তি যেন প্রতারণা করছে। কিছুই মনে থাকছে না। যা পড়ছি, সব ভুলে যাচ্ছি। যা মনে আছে, তাও যদি পরীক্ষা-মন্দিরে মনে না পড়ে—এমনি নানা অবিশ্বাসে মন থাকে দোহলায়মান। **পরীক্ষা-মন্দিরের ভীতি** ॥ পরীক্ষা-মন্দিরের অবধায়ক বা প্রহরীরা কেমন হবেন? তাঁদের আচরণই বা কেমন হবে—দেখর জানেন। **রাত্রিতে দুঃস্বপ্ন** ॥ এইসব ভয়, অনিশ্চয়তা ও অবিশ্বাস পরীক্ষার পূর্বরাত্রিতে দুঃস্বপ্নের আকারে দেখা দেয়। **উপসংহার** ॥ সকাল হয়। দুঃস্বপ্নের অবসান হয়। বুক টিপটিপ করতে থাকে। কি জানি, কি হবে? অবশেষে একটা প্রাণহীন যন্ত্রের মতো পরীক্ষা-মন্দিরে যাবার ভক্তে প্রস্তুত হতে থাকি ॥

৫৪.

### পরীক্ষা-কক্ষের বর্ণনা

**সূচনা** ॥ একটা ঋষথমে ভয় এবং প্রবল উৎকর্ষা নিয়ে পরীক্ষা-কক্ষে প্রবেশ করি। **পরীক্ষা-আরম্ভের পূর্বে** ॥ সবাই বইখাতা নিয়ে তাতে দ্রুত শেষবারের মতো চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে। শিক্ষক বা অভিভাবকেরা শেষবারের মতো বুঝিয়ে দিয়ে যাচ্ছেন ‘অত্যন্ত প্রয়োজনীয়’ প্রশ্নটা। ছাত্রের গলা শুকিয়ে আসছে। সে ঘন ঘন জল খায়। **পরীক্ষা-আরম্ভ** ॥ পরীক্ষা-আরম্ভের সংকেত-ঘণ্টা বেজে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক-অভিভাবকেরা বাইরে চলে যান। পরীক্ষার্থীরা বইখাতা তুলে দেয় পরীক্ষা-অবধায়কদের হাতে। পরীক্ষার খাতা আসে, আসে প্রশ্নপত্র। বকের স্পন্দন বাড়তে থাকে। **কক্ষের বর্ণনা** ॥ যে যার আসনে মাথা নীচু করে উত্তর লেখায়

ব্যস্ত। চারদিকে খসখস শব্দ। তাছাড়া এক গভীর নিস্তব্ধতা। তার মধ্যে পরীক্ষা-অবধায়কদের মসমস জুতোর শব্দে, কেউ পরীক্ষার নিয়মভঙ্গ করলে তার প্রতি নিশ্চিন্ত হয় তাঁদের কঠোর নিষেধ-বাক্যে—জংকম্প উপস্থিত হয়। কোন পরীক্ষার্থীর অতিরিক্ত কাগজ বা তুষার জল প্রার্থনা। উপসংহার ॥ ঘণ্টার পর ঘণ্টা বেজে চলে। সমাপ্তির সময় নিকটবর্তী হয়। কতগুলি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে বা দেওয়া যায়নি, তার হিসেব মিলিয়ে কেউ হয় আনন্দিত, কেউ বা নিরানন্দ ॥

৫৫.

### একটি ক্রিকেট ম্যাচ

সূচনা ॥ কলকাতার ইডেন গার্ডেনে ভারত ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচের স্মৃতি আমি কোনদিন ভুলতে পারব না। মাঠে প্রবেশ ॥ অতি কষ্টে একখানি টিকিট সংগ্রহ। মাঠে প্রবেশ করে আসন সংগ্রহ। চারদিকে ক্রিকেট-উৎসাহী মাহুষ, বিজ্ঞাপন, ব্যানার, হই-চই। সবার মনেই জিজ্ঞাসা—কে টেসে জিতবে? খেলা-আরম্ভ ॥ ভারত টেসে জিতল। গাভাস্কার ও ইন্ডিনিয়ার ইনিংসের সূচনা করতে এলো। বিপর্যয় ॥ মাত্র বত্রিশ রানে ভারতের তিনটি উইকেটের পতন। মাঠে হতাশা ও বিষন্নতা। কিন্তু ভারত শেষ পর্যন্ত প্রথম ইনিংস ৩২৫ রানে শেষ করল। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৩৬২। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারত ৪১০। কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজ মাত্র ১৫৩। ভারতের জয় ২২০ রানে। উপসংহার ॥ পাঁচদিনই মাঠে গিয়েছি। মাঝখানে একদিন বিরতি। ক্রিকেটের গৌরবময় অনিশ্চয়তা প্রতি মুহূর্তে অনুভব করেছি ॥

৫৬.

### একটি দুর্ঘটনা

সূচনা ॥ দুর্ঘটনামাত্রই আকস্মিক এবং ভয়াবহ। কিন্তু কোন কোন দুর্ঘটনা সব আকস্মিকতা ও ভয়াবহতাকে ছাড়িয়ে যায়। দুর্ঘটনার বিবরণ ॥ আমি স্কুলের পথে। লোহার পাত নিয়ে একটা লরী। পেছন থেকে একটি মোটর সাইকেলের স্তাকে অতিক্রম করার চেষ্টা। হঠাৎ একটি লোহার পাত পড়লো মোটর সাইকেল আরোহীর ঘাড়ে। আরোহীটি ছিলেন একজন পাঞ্জাবী ভক্তলোক। মুহূর্ত-মধ্যে তাঁর শিরশ্ছেদ। কিন্তু মুণ্ডহীন শরীর মোটর সাইকেলটি চালিয়ে নিয়ে চলেছে। তা দেখে পথচারীদের ভয়ে দৌড়। রাস্তায়, দোকানে, বাড়ির ঝুলবারান্দায় দাক্ষণ্য প্রতিক্রিয়া। শেষে একটি বাতিস্তম্ভে ধাক্কা খেয়ে মোটর সাইকেলের ভগ্নদশা।

**উপসংহার** ॥ পরদিন খবরের কাগজে সংবাদ। ছবি? ভয়ে কেউ ছবি তুলতে পারেনি। দুজন ফটোগ্রাফার ছবি তুলতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে যায় ॥

৫৭.

### বর্ষায় পল্লীগ্রাম

**সূচনা** ॥ পল্লী-অঞ্চলই প্রকৃতির বিহার-ভূমি। বর্ষা-সমাগম ॥ প্রথম গ্রীষ্মের পর বর্ষা আসে, পল্লীগ্রামের দিগন্তজোড়া আকাশে তার অপরূপ রূপের বিস্তার। **সৌন্দর্য** ॥ মেঘ-গর্জন, বিদ্যুৎ-বিকাশ এবং বাতাসের হাহাকাবের মধ্যে বৃষ্টি নামে। মাঠ, ঘাট, নদীনালা, খালবিল, দীঘি-পুকুরিণী সব জলময়। গাছপালার রং গাঢ় সবুজ, মাঠের রং কচি ধানের চারাগাছে সবুজ। মাঠে মাঠে কৃষকদের গলায় গান। ধাত্ত-রোপণ, বৃক্ষ-রোপণ। আকাশে বকের সারি। বনে বনে পাখীর কুজন। **অনুবিধা** ॥ পথঘাট কর্দমান্ত, নোংরা, পিচ্ছিল। কলেরা, আমাশয়, টাইফয়েড ইত্যাদি রোগের প্রাদুর্ভাব। বৃষ্টির জন্ত হাটবাজার বসে না। কৃষি-শ্রমিকেরা বেকার। ঘরে ঘরে অভাব, দৈন্ত, দুর্দশা। সাপের উৎপাত। **উপসংহার** ॥ সব জিনিসেরই ভালো এবং মন্দ দুটি দিক আছে। পল্লী-গ্রামের বর্ষার দুটি দিক প্রায় সমান-সমান ॥

৫৮.

### বন্যপ্রাণী-সংরক্ষণ

**সূচনা** ॥ ভারতের বন্যপ্রাণীগুলির বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। **ভারতের বন্য-প্রাণীর বৈশিষ্ট্য** ॥ ভারতের রেওয়্যার সাদা বাঘ, হুম্মরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগার আর চিতা-হরিণ, কুমায়ূনের মানবখেকো বাঘ, জালদাপাড়ার গণ্ডার এবং আসামের হাতীর বিশ্ব-মর্যাদা আছে। ব্রিটিশ আমলে সংরক্ষণের অভাব ॥ ব্রিটিশ আমলে এই প্রাণীগুলিকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে। স্বাধীন ভারতে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ॥ স্বাধীন ভারতে এইসব বন্যপ্রাণীর হত্যার বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে এবং একটি কেন্দ্রীয় স্থগঠিত সরকারী বিভাগের হাতে তাদের সংরক্ষণের দায়িত্ব স্তম্ব হয়েছে। শুধু তাই নয়, ভারতের বিভিন্ন স্থানে 'অভয়-অরণ্য' স্থাপন করে তাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। **সংরক্ষণের সুবিধা** ॥ পশুশালায় কৃত্রিম পরিবেশের চেয়ে 'অভয়-অরণ্য'র প্রাকৃতিক পরিবেশে বন্য পশুরা স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দভাবে বিচরণ করতে পারে। এইসব পশুদের দেখিয়ে ভ্রমণার্থীদের কাছ থেকে বিদেশী মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। **উপসংহার** ॥ বন্যপশু-হননের অর্থ প্রকৃতিকে হনন। বন্যপশু-সংরক্ষণের অর্থ প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সংরক্ষণ ॥

৫৯.

## পক্ষীর আলয়

**সূচনা** ॥ ‘পক্ষীর আলয়’ কথাটির অর্থ প্রাকৃতিক পরিবেশে পক্ষী-নিবাস। **পক্ষীর আলয়** ॥ প্রকৃতির কোন কোন নিরালা পরিবেশ পাখীদের অত্যন্ত প্রিয়। লোকবসতি থেকে দূরে—শান্ত বনভূমি, জলের সান্নিধ্য—এসব পাখীদের খুবই পছন্দ। তাই তারা সেক্ষেপ জায়গায় দল বেঁধে বাস করে। **বিচিত্র সব পাখী** ॥ নানা জাতের পাখী সে সব জায়গায় ভিড় করে। তাদের কলকাকলিতে স্থানটি পরিপূর্ণ থাকে। **দেশী-বিদেশী পাখী** ॥ শুধু দেশী পাখীরাই সেখানে ভিড় করে না, বহু বিদেশী পাখীও সেখানে বাতায়ত করে। হাজার হাজার মাইল দূর থেকে দল বেঁধে তারা বছরের নির্দিষ্ট সময়ে এখানে উড়ে আসে। আবার, নির্দিষ্ট সময় অস্তে তারা ফিরে যায়। টিকিট কাটতে হয় না, বাস গোছাতে হয় না। এরা সব বিনে-পয়সার ভ্রমণকারী। **ব্রিটিশ আমলে পক্ষী-সংরক্ষণ** ॥ ব্রিটিশ আমলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতীক এই পাখীদের নিবিচারে হত্যা করা হয়েছে। স্বাধীন ভারতে পক্ষীর আলয় ॥ স্বাধীন ভারতে এদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ‘পক্ষীর আলয়’ তার নিদর্শন। ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রাকৃতিক পরিবেশে ‘পক্ষীর আলয়’ আছে। **উপসংহার** ॥ ‘পক্ষীর আলয়’ মানুষের প্রকৃতি-প্রীতির প্রতীক ॥

৬০.

## বাংলার যে-কোন একটি উৎসব

**সূচনা** ॥ দুর্গোৎসব বাংলার জাতীয় উৎসব। **সময়** ॥ বর্ষার পর শরৎকালেই এই উৎসব অমুষ্ঠিত হয়। **প্রাকৃতিক পরিবেশ** ॥ মেঘমুক্ত সুনীল আকাশে উজ্জ্বল সূর্যকিরণ। ভোরে শিশিরপাত এবং শিউলি ফুলের সমারোহ। **প্রস্তুতি** ॥ মাসাধিক কাল থেকে প্রতিমা প্রস্তুত হতে থাকে। ঘরে ঘরে উৎসবের পোশাক-পরিচ্ছদ কেনার ধুম। শহরের রাস্তায় রাস্তায় পূজার বিজ্ঞাপন। **শুরু** ॥ যদিও শারদ শুক্লা-সপ্তমী থেকে দশমী এই উৎসবের কাল, তবু মহালয়ার পর থেকেই উৎসব শুরু হয়ে যায়। স্বসজ্জিত মণ্ডপে প্রতিমা আনয়ন। পূজা, অঞ্জলি, ঢাক, মাইক, প্রতিদিন নতুন নতুন পোশাকে সাজসজ্জা। ঘরে ঘরে নানা স্থানোদ্ভূত আয়োজন, মণ্ডপে মণ্ডপে প্রসাদ-বিতরণ, প্রতিমা-দর্শনার্থীদের ভিড়, ভিড়-নিয়ন্ত্রণে উদ্যোক্তাদের হযরানি। **সমাপ্তি** ॥ দশমী সন্ধ্যায় প্রতিমা বিসর্জন। ভাসানের মিছিল। বিবাহ। **উপসংহার** ॥ দুর্গোৎসবের মতো কোন উৎসবই বাঙালীর হৃদয় ভরে আসে না, এতখানি শূন্য করে দিয়ে কোন উৎসব চলে যায় না ॥

৬১.

### বিলাত দেশী ভাষা মিটে কি আশা ?

**সূচনা** ॥ মাতৃভাষাতেই আমাদের প্রাণের মুক্তি, হৃদয়ের আনন্দ। **মাতৃভাষার মূল্য** ॥ সন্তানের কাছে মাতৃভাষার মূল্য অপরিণীম। এই ভাষাতেই মায়ের কোলে তার মুখের বুলি প্রথম ফুটেছিল। এই ভাষাতেই সে কত ছড়া, রূপকথা-উপকথার গল্প শুনেছে। **বাংলাভাষার গৌরব** ॥ বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। এই ভাষার মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, জীবনানন্দ তাঁদের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ সম্পদ উজাড় করে দিয়ে গেছেন। **মাতৃভাষার দুঃসময়** ॥ ব্রিটিশ শাসনে ইংরেজির দাপটে আমাদের মাতৃভাষার অস্তিত্ব দশা উপস্থিত হয়েছিল। অনেক আন্দোলনের পর মাতৃভাষার মাধ্যমে পঠনপাঠন শুরু হয়েছে। কিন্তু দুঃসময় ঘনীভূত হয়েছিল তখনই, যখন মাতৃভাষার সন্তানেরা মাতৃভাষা ত্যাগ করে বিদেশী ভাষাকে গ্রহণ করতে শুরু করেছিল। **উপসংহার** ॥ স্বাধীন বাংলাদেশ মাতৃভাষাকে সরকারী ভাষারূপে বরণ করেছে। আমরা কথায় তা করলেও কার্যতঃ এখনো তা করে উঠতে পারিনি—এ লজ্জা রাখবো কোথায় ?

৬২.

### মহাভারতের তোমার ভালো-লাগা একটি চরিত্র

**সূচনা** ॥ মহাভারতে নানা চরিত্র নানা জনের ভালো লাগে। কারো ভালো লাগে যুধিষ্ঠিরকে, কারো ভালো লাগে অর্জুনকে, কারো ভালো লাগে ভীষ্মকে, কারো ভালো লাগে মহাবীর কর্ণকে। **আমার ভালো-লাগা** ॥ আমার কিন্তু ভালো লাগে হলধর বলরামকে। **চরিত্রের বর্ণনা** ॥ এই হলধর বলরাম হলেন শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ। মহাভারতে যখন সবাই হিংসা, ঈর্ষা, কপটতা, স্বার্থ-বিদ্বেষ ও জাতি-কলহে লিপ্ত, তখন বলরাম নিরাসক্ত। সত্য ও ত্রায়ের পূজারী। **কেন ভালো লাগে ?** ॥ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সবাই যখন যুদ্ধলিপ্ত, বলরাম তখন সারা ভারতে তীর্থ-ভ্রমণের যাত্রী। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরও অর্ধসত্য বলেছেন, নিরপেক্ষ শ্রীকৃষ্ণ পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু বলরামই মহাভারতের একমাত্র নিষ্কলঙ্ক চরিত্র। বৈষ্ণব-স্বদের তীরে ভীম-দুর্যোধনের গদাযুদ্ধের সময় ভীমের অস্ত্রায়-যুদ্ধকে তিনি তাঁর অকপট ঘৃণা জানাতে বিধা করেননি। **উপসংহার** ॥ মহাভারতে এমন আদর্শ, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র বিরল ॥

৬৩.

### দেশের সমৃদ্ধিতে বিজ্ঞানের দার

**সূচনা** ॥ আজ পৃথিবীতে যে সব দেশ বড় হয়েছে, তাদের উন্নতির মূলে রয়েছে বিজ্ঞানের অবদান। **বিজ্ঞান কি ?** ॥ বিজ্ঞান হলো কোন বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান।

সেই জ্ঞান আহরণ করে মানুষ প্রকৃতিকে আজ জয় করেছে এবং তাকে মানুষের সেবার দ্বারি করেছে। **কৃষিক্ষেত্রে বিজ্ঞান**। বিজ্ঞান আজ কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধিতে হাত লাগিয়েছে। ট্রাক্টর, পাম্প, উৎকৃষ্ট বীজ, সার, ফসল-কাটা ও বাড়াই-মাড়াইর যন্ত্র বিজ্ঞানের অবদান। **শিল্পক্ষেত্রে বিজ্ঞান**। বিজ্ঞান আজ নানা যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করে কলকারখানা স্থাপন করেছে। **পথ ও পরিবহণ**। বিজ্ঞানের প্রসাদে আজ পথ ও পরিবহণের নানা উন্নতি হয়েছে। **স্বাস্থ্য ও শিক্ষা**। বিজ্ঞানের অগ্রগতি মানুষের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার জগতে নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করেছে। মানুষ অকাল-মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে, তেমনি অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে আলোর জগতে উত্তীর্ণ হয়েছে। **উপসংহার**। বিজ্ঞানই দেশের সমৃদ্ধির গোপন চাবিকাঠি।

৬৪.

### বর্তমান ভারতে যুব-সমাজের কর্তব্য

**সূচনা**। যুব-সমাজই সকল দেশের নতুন আশা ও ভরসার প্রতীক। ভারতে যুব-সমাজের দায়িত্ব। দীর্ঘদিনের পরাধীনতার অবসানে রাষ্ট্র-নেতৃত্ব যখন আমাদের দেশবাসীর হাতে এসে পড়লো, তখন সেই নেতৃত্ব স্বাধীনতার দীর্ঘ সংগ্রামে ক্লান্ত এবং বার্ধক্যের ভারে অবসন্ন। রাষ্ট্র-নেতৃত্বে এখন যুবশক্তিকে বড়ো প্রয়োজন। দেশগঠনের ক্ষেত্রে এখন চাই সবুজ, সতেজ, প্রাণবন্ত যুব-সমাজকে। **ভারতে যুব-সমাজের কর্তব্য**। গ্রামে, শহরে, কৃষিতে, শিল্পে—সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বত্র যুব-সমাজের রয়েছে অসীম কর্তব্য। **উপসংহার**। দেশের জড়তা ও বার্ধক্যকে তারাই ঘুচাতে পারে। কিন্তু শৃঙ্খলাহীনতা দেশের নানা বিপদ ডেকে আনতে পারে। সজাগ যুব-সমাজের সর্বাত্মক শৃঙ্খলা ও সতর্কতা প্রয়োজন।

৬৫.

### সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণে ছাত্রদের ভূমিকা

**সূচনা**। ছাত্র-সমাজই দেশের প্রগতির প্রতীক, অগ্রগতির অগ্রদূত। সামাজিক কুসংস্কার ও ছাত্র-সমাজ। যুগে যুগে সমাজ নানা কুসংস্কারে তার অগ্রগতির পথ হারিয়ে বেলে। কিন্তু নবযুগের নতুন শিক্ষায়-দীক্ষায় ছাত্র-সমাজেরই প্রথম ঘুম ভাঙে। সারা সমাজ যখন কুসংস্কারের বোঝা বৃকে নিয়ে অজগর-নিজায় কাল কাটায়, তখন ছাত্র-সমাজের মনে আসে প্রথম জাগরণ, আসে কর্মের আহ্বান। **ভারতের ছাত্র-সমাজ**। সনাতনপন্থী ভারত চিরকাল মাদ্ধাতার আমলের নানা কুসংস্কার নিয়ে অগ্রগতি থেকে পিছিয়ে পড়েছে। কিন্তু ভারতের ছাত্র-সমাজ বিশ্বের শিক্ষা-জগৎ থেকে শক্তি সঞ্চয় করে কুসংস্কারের ওপর আঘাত হেনেছে। **উপসংহার**। ভারতের

ছাত্র-সমাজের ঐতিহ্য অত্যন্ত গৌরবময়। তারাই সমাজকে অতীতের নানা সামাজিক নাগণাশ থেকে মুক্ত করে অগ্রগতির পথ দেখিয়েছে এবং ভবিষ্যতেও দেখাবে ॥

৬৬.

## বিদ্যালয়ে শেষদিন

**সূচনা ॥** আমাদের জীবনে বিদ্যালয়ের শেষদিনটি অশ্রুসিক্ত, বেদনায় বিধূর। কেন অশ্রুসিক্ত ? ॥ এই বিদ্যালয়ে আমার জীবনের মধুর শৈশব পড়ে আছে। এর প্রতিটি কক্ষের সঙ্গে, প্রতিটি আসনের সঙ্গে আমার পরিচয়। আমার জীবনের কত আনন্দ-বিষাদের স্মৃতি এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে মিশে আছে। কত বন্ধুর বন্ধুত্ব, কত শিক্ষকের স্নেহ-শাসন-উপদেশ এখানে পেয়েছি। আজ সব পেছনে পড়ে রইলো। মিলনের মেলা ভেঙে গেল। সব ত্যাগ করে আমাকে চলে যেতে হচ্ছে—এক অজানা ভবিষ্যতে দিকে। **অনুষ্ঠান ॥** আমরা এ বছরের বিদায়ী শ্রেণীর ছাত্র। আমাদের বিদায় জানাবার জন্যে আমাদের শিক্ষক ও অঙ্কেরা একটি বিদায়-অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ছাত্র-বন্ধুদের বিদায়-সম্ভাষণ, শিক্ষক মহাশয়দের আশীর্বাদ, ফুল এবং বিদায়-সংগীতে আমাদের জীবনের মধুরতম অধ্যায়ের ওপর যবনিকা নেমে এলো। **উপসংহার ॥** বিদ্যালয়-জীবনের স্মৃতি আমাদের জীবনে চির-অক্ষয় হয়ে থাকবে ॥



## রচনা বিচিন্তা

### অনুবাদ

১. The value of man's life is measured not by the number of years he had lived, but by the number of good deeds he has done. A man may live a longer life without doing any great or noble work that may benefit the world. Such a life is useless and man is forgotten as soon as he dies. But a man who does noble works for the benefit of mankind lives in the memory of the people even long after his death, though he may live a short life here. The great men like Jesus Christ, Sankaracharyya and Vivekananda died young, but they are still remembered with great reverence on account of their noble deeds.

সংক্ষেপ : The value of...measured : মানুষের জীবনের মূল্যের বিচার করা হয়। That may...the world : ভগবতের ভালোর জন্তে। Useless : বার্থ, নিরর্থক। As soon...dies : তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই। For the benefit of mankind : মানুষের ভালোর জন্তে। Lives in...his death : তাঁর মৃত্যুর পরেও দীর্ঘদিন মানুষ তাঁকে মনে করে রাখে। They are still...deeds : তাঁদের মহৎ কর্মের জন্তে আজও তাঁদের গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়।

২. When he was quite young, George Washington once desired to go to sea. Everything had been done for his departure. Then he went to take leave of his revered mother. As he approached her, he saw tears bursting from her affectionate eyes. Washington was quite able to understand the reason of the tears in his mother's eyes. He stood silent for a moment and then threw himself into her arms saying, "I will never go away to break my mother's heart."

At this his mother said to him, "George, God has promised to bless those children that honour their parents and I believe, He will bless you."

সংক্ষেপ : Desired : সংকল্প করেছিলেন। Departure to take leave...mother : তাঁর আশ্রয় মায়ের কাছে বিদায় নিতে। Approached : কাছে গেলেন। Tears...eyes : তাঁর মেহাৰ্ত্ত চোখ থেকে জল বরতে। Was quite...eyes : তাঁর মায়ের চোখের অশ্রুসোচনের কারণ বুঝতে পারলেন। Threw himself...arms : মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। To break...heart : আবার মায়ের গ্রাণে কষ্ট দিতে। Honour : ভক্তি করে। Will bless : আশীর্বাদ করবেন।

৩. The most pressing problem of India today, which requires immediate solution, is the problem of poverty. Millions of people in India are half-fed and ill-clad. The tillers of the soil live in the most appalling condition; they cannot reap the fruit of their labour. The people working in mills and factories live in grovelling poverty. They live huddled together in unclean huts, eat inedible food and die soon. Others who are a little higher in rank are much poorer than ordinary people in other countries. Progress of India means the betterment of the condition of those who form the vast majority of the population. The government is now trying to improve their conditions by implementing the 20-item scheme.

**অংকেষু :** The most pressing problem : সবচেয়ে গুরুতর সমস্যা। That requires... solution : যার জরুরী সমাধান চাই। Poverty : দারিদ্র্য। Millions : লক্ষ লক্ষ। Half-fed : অর্ধভুক্ত। Ill-clad : সামান্য বস্ত্রাবৃত। The most appalling : সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। Grovelling : বীনহীন। Huddled : গাথাগাথিভাবে। Inedible : অখাদ্য। In rank : সমাজে। Betterment : উন্নতি। The vast...population : জন-সংখ্যার বৃহৎ অংশ। To improve : উন্নতি করতে। By implementing ..scheme : বিশদ্বকা কর্তৃহটীকে রূপান্তরিত করে।

৪. When Napoleon Bonaparte after his defeat at Waterloo by the British and Prussians was sent off to St. Helena, not many people were sorry. Even the French people, who had admired Napoleon and was proud of the glory he had conferred on France, were tired of constant war; and so they were inclined to say, 'Well, he was a great man, but he turned the world upside down too much.'

The kings, statesmen and nobles of Europe, of course, was very glad to get rid of Napoleon. They regarded the French Revolution of 1789 as a kind of wild outburst of anarchy and Napoleon's exploits as the natural result of the Revolution. After Napoleon's fall, for first time, they felt secure.

**অংকেষু :** After his ..Prussians : ওয়াটার্লু যুদ্ধে ইংরেজ ও প্রাশিয়ানদের হাতে তাঁর পরাজয়ের পর। Was sent...Helena : সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত হয়েছিলেন। Had admired : প্রশংসা করতেন। Were proud...France : প্রিন ক্রাঙ্ককে যে গৌরবে মণ্ডিত করেছিলেন, তাতে গর্বিত। Tired of ..war : ক্রমাগত যুদ্ধে অবসন্ন। Were inclined...say : বলতে চাইতেন। Upside down : ওলটপালট। Statesmen : রাজনীতিবিদদের। Anarchy : অরাজকতা। Exploits : কৃতিত্ব। Natural result : স্বাভাবিক ফল। Felt secure : নিরাপত্তা বোধ করলেন।

৫. Soon her eye fell on a little glass box that was lying under the table. She opened it and found in it a very small cake, on which the words 'EAT ME' were beautifully marked in currants. 'Well, I'll eat it,' said Alice, 'And if it makes me grow larger, I can reach the key; and if it makes the smaller, I can

under the door ; so either way I'll get into the garden, and I don't care what happens."

লংকেড : Glass box : কাঁচের বাক্স। Lying...table : টেবিলের নীচে। Cake : পিঠা (গির্জা)। Were...currants : কিশমিশ দিয়ে হৃদয়ভাবে লেখা ছিল। Makes me...larger : আমাকে বড় করে তোলে। I can...key : আমি চাবির নাগাল পাবো। I can...door : দরজার নীচ দিয়ে গলে যেতে পারবো। Either way : হুট করে কোন উপায়েই। Get into : ঢুকতে পারা। I don't care : ভাবি না।

৬. It is well-known how violent the King's prejudices were against the queen, and how skilfully these prejudices were kept up by the Cardinal, who, in affairs of intrigue, mistrusted women much more than men. One of the principal clauses of the prejudice was the friendship of Anne of Austria for Madame de Chevreuse. These two women gave him more uneasiness than the war with Spain, the quarrel with England, or the embarrassment of the finances

লংকেড : Well-known : সুবিদিত। Violent : সংঘাতিক। Prejudices : সংস্কার, মন্দ ধারণা। Skilfully : দক্ষতারে। Kept up : চালু রাখা হয়েছিল। Cardinal : ধর্মবাহক। In affairs of intrigue : চক্রান্তে। Mistrusted : অবিশ্বাস করতেন। Principal clauses : প্রধান অংশ। Uneasiness : অস্বস্তি। The embarrassment...finances : অর্থনৈতিক সংকট।

৭. My name is Robinson Crusoe ; I was born in the city of York. When quite a boy I wanted to be a sailor, but my parents said I was foolish to choose such a dangerous life, and begged me to stay at home. So for a time, I tried to be content.

But it was useless ; I longed to see the great world and could not settle at home.

লংকেড : When quite a boy : খুব অল্প বয়সেই। I was foolish : আমি বোকাশি করেছি। To choose...life : এরূপ বিপজ্জনক জীবিকা নির্বাচন করে। Begged : অনুগ্রহ করলেন। To be content : খুশী থাকতে। It was useless : তা বার্থ হলো। I longed...world : বিশাল পৃথিবীকে দেখবার জন্য আমার বাসনা হলো। Could not settle : স্থির হয়ে থাকতে পারলাম না।

৮. Men in general do not know the true meaning of the word justice. Justice may be defined to be that virtue which impels us to give to every person what is his due. In this large sense of the word, it comprehends the practice of every virtue which reason prescribes, or society should expect. Our duty to our Maker, to each other, and to ourselves, is fully answered, if we give them what we owe them. Thus justice, properly speaking is the only virtue, and all the rest have their origin in it.

লংকেড : In general : সাধারণতঃ। Justice : ভায়া। Justice may be defined : ভায়ায় সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে। Virtue : গুণ। Impels : অনুপ্রাণিত করে। His due : তার

প্রাণ। Large sense : ব্যাপক অর্থ। It comprehends...expect : এর দ্বারা বুঝান হয় ও সমাজের প্রত্যাশিত প্রত্যেক গুণের অঙ্গীকার বোঝায়। Maker : স্রষ্টা। If fully answered : পুরোপুরি পালন করা হয়। If we...then : তাহের কাছে আমাদের যে কণ আছে, তা শোধ করা হয়। Properly speaking : ঠিকমতো বলতে গেলে বলতে হয়। All the rest...in it : বাকিগুলি অন্যর তাৎপর্য।

২. My next work was to discover the best place to store my goods. There was a steep hill near. I took one of my guns, climbed to the top of the hill, and saw I was on an island—with not a house or person in sight. I spent the rest of the day unloading the cargo.

অর্থকথন : To discover : খুঁজে বের করা। Steep : খাড়া। With not a...in sight : (কিন্তু তাতে) কোন বাড়ির বা মানুষ চোখে পড়লো না। I spent.. the cargo : কাছাকাছি থেকে মাল নামাতেই দিনের বাকি অংশটা আমার কেটে গেল।

১০. The world is like a looking glass ; if you smile, it smiles ; if you frown, it frowns back. If you look at it through a red glass, all seems red and rosy ; if through a blue, all blue ; if through a smoked one, all dull and dirty. Always try then to look at the bright side of things. Almost everything in the world has bright side. There are some persons whose smile, the sound of whose voice, whose very presence seem like a ray of sunshine and brighten a whole room. Greet everybody with a bright smile, kind words and a pleasant welcome.

অর্থকথন : A looking glass : আয়না। Frown : ক্রকট করা। It frowns back : উত্তর ক্রকট করবে। Through a red glass : লাল কাঁচের ভেতর দিয়ে। Rosy : গোলাপী। Through a blue : নীল কাঁচের ভেতর দিয়ে। A smoked one : জুলো মাখানো কাঁচ। All dull and dirty : সব বিকী এবং নোংরা দেখাবে। The bright side of things : সব জিনিসের উজ্জ্বল দিক। Seem like a ray of sunshine : সূর্যের রশ্মির মতো মনে হয়। Brighten : আলোকিত করে তোলে। Greet : প্রীতি জানাও। Kind words : মিষ্টি কথা। A pleasant welcome : মধুর অভ্যর্থনা (সম্ভাষণ)।

১১. Just fancy an English boy learning his Physics or Geography through Russian. He cannot but feel stupid. A good deal of the energy of a Bengalee boy is wasted in learning a foreign medium. And in most cases, he learns it very imperfectly. He gets the haziest impression about the things he is required to learn through English, so he is forced very often to mug up things without understanding a word of all he reads. This makes a farce of our education. The foreign medium of English has still a tight hold on our education system in a number of ways.

**সংক্ষেপ :** Just fancy : কল্পনা কর। An English boy : একজন ইংরেজ বালককে। Learning...Russian : রুশ ভাষার তার পদার্থ-বিজ্ঞান বা ভূগোল পড়তে। He cannot...stupid : নিজেকে তার বোকা মনে হবে। A good deal . medium : একটি বিশেষী ভাষা ( মাধ্যম ) শিখতে একটি বাঙালী বালকের প্রচুর শক্তি হয় হয়ে যায়। In most cases : অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। Very imperfectly : অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণভাবে। Haziest impression : অস্পষ্ট ধারণা। Very often : প্রায়ই। To mug up : খুব কষ্ট করে শিখতে। Without understanding : না বুঝে। Farce : প্রহসন। The foreign...ways : ইংরেজির বিশেষী মাধ্যম এখনো নানাতাবে আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি কব্জা করে রেখেছে।

১২. By this time Gulliver felt very hungry, for he had not eaten anything for many hours. He could not speak the strange language of the little folk, so he kept putting his finger to his mouth as a sign that he wanted food. How glad he was, when they showed that they understood what he wanted ! They placed a ladder against his sides, and over a hundred of the little people, carrying baskets of food, climbed up and walked over his body towards his mouth.

**সংক্ষেপ :** By this time : ততক্ষণে। He could not . little folk : সে সেই ক্ষুদ্র মানুষের ভাষার কথা বলতে জানতো না। Kept putting . sign : ইংগিত হিসেবে মুখে আঙুল পুরে রাখলো। When they showed that : যখন তারা জানালো যে। Placed . sides : তার পাশে মই লাগালো। Carrying...food : খাবারের বৃদ্ধি নিয়ে। Climbed up .mouth : তার শরীরের ওপর উঠে তার মুখের দিকে হেঁটে যেতে লাগলো।

১৩. The neighbours were good to her ; occasionally some had the children into meals, occasionally some would do the downstairs work for her, one would mind the baby for a day. But it was a great drag, nevertheless. It was not everyday the neighbours helped. Then she had nursing of baby and husband, cleaning and cooking, everything to do. She was quite worn out, but she did what she wanted of her.

**সংক্ষেপ :** The neighbours...her : প্রতিবেশীর তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতো। Occasionally...meals : কখনো কখনো কেউ কেউ ছেলেমেয়েদের খাওয়াতো। Occasionally...for her : কখনো কখনো কেউ কেউ একতলার কাজকর্ম করে দিত। One would...day : কেউ একদিনের জন্যে বাচ্চাটাকে দেখতো। Great drag, nevertheless : তবু ভীষণ হেঁচড়ে চলা। Worn out : হতা।

১৪. Rabindranath was fascinated by the description in Indian literature of the ancient Indian university of Nalanda. He felt keenly that modern India had a great need for such a truly national university, something which should be a natural expression of all

that was best in Indian thought, art, and civilization. He saw in the existing modern universities of India nothing but copies of institutions which had grown naturally in the west, but which were foreign to this country.

সংক্ষেপ : Was fascinated...Nalanda : ভারতীয় সাহিত্যে নালন্দার প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ণনা গড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। Keenly : গভীরভাবে। Had a great...university : এরূপ একটি সত্যিকারের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ আয়োজন আছে। Something which...civilization : তা সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় চিন্তা, শিল্প ও সভ্যতার স্বাভাবিক প্রকাশ হবে। Existing modern : বর্তমান আধুনিক। Copies...the west : পশ্চাত্য দেশগুলিতে স্বাভাবিকভাবে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠানগুলির অনুরূপ। Foreign : অপরচিত।

১৫. I used to be haunted by the fear of thieves, ghosts and serpents. I did not dare to stir out of doors at night. Darkness was a terror to me. It was almost impossible for me to sleep in the dark, as I would imagine ghosts coming from one direction, thieves from another and serpents from the third. ...My friend knew all these weaknesses of mine. He would tell me that he could hold in his hand live serpents, could defy thieves and had no belief in ghosts, and all this was, of course, the result of eating meat. It began to grow on me that meat-eating was good, that it could make me strong and daring, and that if the whole country took to meat-eating, the English could be overcome.

সংক্ষেপ : I used...serpents : আমার মনে চোর, ভূত আর সাপের ভয় শুঁড়ি ঘেঁরে হাঁটতো। To stir out of doors : ঘরের বাইরে যেতে। A terror : আতঙ্ক। As I would...the third : কারণ আমি কল্পনা করতাম, ভূতেরা আসছে একদিক থেকে, চোরেরা আসছে অশ্রুদিক থেকে আর তৃতীয় দিক থেকে আসছে সাপেরা। Live serpent : জীবন্ত সাপ। Could defy thieves : চোরদের সঙ্গে লড়ায়ে পারে। The result of meat-eating : মাংস খাওয়ার ফল। Took to meat-eating : মাংস খাওয়া ধরে।

১৬. What, then, causes disease? The first idea that occurred to early man was that disease was brought about by an evil spirit entering into a person's body. Some primitive people still try to cure a disease by causing pain to the person who has it or by making a lot of noise. They think that such treatment will scare the evil spirit away and will make the person well again. Another early idea was that disease was punishment either of something the sick person had done or for something his father or ancestors had done. Other theories about what made a person ill had an origin in belief in magic, and the power of witches. These wild

superstitions prevailed so long as men lacked the means of finding out the truth.

অর্থ : What, then,...disease : কি থেকে তাহলে রোগ উৎপন্ন হয়। The first idea... man : আদিম মানুষের মনে প্রথম যে ধারণা হয়েছিল। Was that...person's body : তাহলে এই যে, কোন অশুভ শক্তি মানুষের শরীরে প্রবেশ করলে রোগ উৎপন্ন হয়। Some primitive people : কোন কোন আদিবাসী জাতি। To cure a disease : রোগ সারাতে। By causing...it : রোগীকে কষ্ট দিয়ে। By making ..noise : প্রচুর গোলমাল করে। Such treatment...away : এরূপ চিকিৎসার অশুভ শক্তিকে তাড়ানো যাবে। Another early idea : অপর একটি প্রাচীন ধারণা। Punishment . had done : হয় সে করেছিল অথবা তার বাবা বা পূর্বপুরুষেরা করেছিল, এমন কোন কাজের শাস্তি। Other theories : অন্যান্য ধারণা। An origin...in mag'ic : যাদুবিদ্যার বিশ্বাস থেকে উৎপত্তি। Witches : ডাইনি। Will superstitions : ইতর সংস্কারগুলি। Prevailed : বিরাজ করেছে। Lacked ..truth : সত্য আবিষ্কারের উপায় সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিল।

## ভাবার্থ-রচনা

১. মহাভারতের মধ্যে ঢুকেছেন কীট,  
কেটেফুটে ফুঁড়েছেন এপিঠ ওপিঠ।  
পণ্ডিত থলিয়া দেখি হস্ত হানে শিরে ;  
বলে, 'ওরে কীট, তুই একী করিলি রে।  
তোর মস্তে শান দেয়, তোর পেট ভরে  
হেন খাওয়া কত আছে ধুলির উপরে।'  
কীট বলে, 'হয়েছে কী ! কেন এত রাগ !  
ওর মধ্যে ছিল কী বা, শুধু কালো মাগ।  
আমি যেটা নাহি বুঝি সেটা জানি ছার,  
আগাগোড়া কেটেফুটে করি ছারখার।'

পৃথিবীতে যারা নিলুক, তারা গুণী ও মানী ব্যক্তিদের বশকে অকারণে নিম্নিত করে, কালিমালিগু করে।  
এটা তাদের স্বভাব-বশ। কারণ, গুণী ও মানী ব্যক্তিদের যশের বিশেষত্ব উপলব্ধি করার মতো শক্তি  
তাদের নেই।

২. ছাতা বলে, 'ধিক্ ধিক্, মাথা মহাশয়,  
এ অত্যাচারিণী আমারে না সয়।  
তুমি যাবে হাটে বাটে দিব্য অকাতরে,  
রৌদ্র রুষ্টি যত-কিছু সব আমা-'পরে।  
তুমি যদি ছাতা হতে কী করিতে দাদা ?'  
মাথা কর, 'বুঝিতাম মাথার মর্যাদা।  
বুঝিতাম তার গুণে পরিপূর্ণ ধরা,  
মোর একমাত্র গুণ তারে রক্ষা করা।'

জগৎ বার বা কাল, তার তাই করা উচিত। সবই জগতের কাজ। .সেই কাজের জন্তে কাউকে করতে  
হয় দৈহিক পরিশ্রম, কাউকে করতে হয় মানসিক পরিশ্রম। কিন্তু প্রত্যেকেরই প্রত্যেকের প্রতি সমান  
অঙ্গাঙ্গীল হওয়া প্রয়োজন।

৩. শুক তৃণগন্ধ বহি ধেয়ে আসে ছুটে  
তপ্ত সমীরণ—চলে যায় বহুদূর।  
থেকে থেকে ডেকে ওঠে গ্রামের কুকুর  
কলহে মাতিয়া। কত শাস্ত হাওয়ায়,  
কত শালিকের ডাক, কখনো মর্মর  
জীব অশবের কত দর শব্দ 'পরে



চিলের স্বভাব ধনি, কত বায়ুভরে  
আর্ত শব্দ বাঁধা ভরণীর—মধ্যাহ্নের  
অব্যক্ত করুণ একতান, অরণ্যের  
স্নিগ্ধছায়া, গ্রামের স্বপ্ন শান্তিরানি,  
মাঝখানে বসে আছি আমি পরবাসী ।

নীরব নিম্ন মধ্যাহ্ন । কিন্তু সেই নিম্নতার মধ্যেও প্রকৃতির রূপ, রস ও শব্দের কী বিচিত্র আরোহণ !  
সৌন্দর্যের কী সমতার একাশ ! কিন্তু মানুষ প্রকৃতির সেই সৌন্দর্য-পুণীতে প্রবেশ করতে পারে না । সে  
অবাসী অভিধির মতো বসে থাকে বাইরে ।

৪. পৃথিবীতে কত দৃশ্য, কত সর্বনাশ,  
নূতন নূতন কত গড়ে ইতিহাস—  
রক্তপ্রবাহের মাঝে কেনাইয়া উঠে  
সোনার মুকুট কত ফুটে আর টুটে !  
সভ্যতার নব নব কত তৃষ্ণা ক্ষুধা—  
উঠে কত হলাহল, উঠে কত সূধা !  
দৌহা-পানে চেয়ে আছে দুইখানি গ্রাম ।  
এই খেয়া চিরদিন চলে নদী শ্রোতে—  
কেহ যায় ঘরে, কেহ আসে ঘর হতে ।

পৃথিবীর ইতিহাসে প্রতিদিন ঘটছে কত উপান-পতন, কত রাজ্য-ভাঙাভাঙি । মানুষের সভ্যতার  
ইতিহাসে ঘটে গেছে কত রক্তপাত । যুদ্ধের শেষে শান্তি স্থাপিত হয়েছে কতবার । কিন্তু বাংলার নদীর  
ছ' তীরের দুখানি গ্রাম পরশুরের মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে অনাধি অনন্তকাল । যুদ্ধ বা রক্তপাত  
তাদের নীরবতা ভঙ্গ করতে পারেনি । গ্রামের নির্ধিকার মানুষগুলি খেয়া-বৌকায় এগার-গুপার করে ।

৫. একদিন দেখিলাম উলঙ্গ সে ছেলে  
ধূলি 'পরে বসে আছে পা দুখানি মেলে ।  
ঘাটে বসি মাটি ঢেলা লইয়া কুড়িয়ে  
দিদি মাজিতেছে ঘটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ।  
অদূরে কোমললোম ছাগবৎস দীরে—  
ফিরিয়া চলিতেছিল সেই নদীতীরে ।  
সহসা সে কাছে আসি থাকিয়া থাকিয়া  
বালকের মুখ চেয়ে উঠিল ভাকিয়া ।  
বালক চমকি কাঁপি কঁদে ওঠে ত্রাসে,  
দিদি ঘাটে ঘটি ফেলি ছুটি চলে আসে ।  
এক কক্ষে ভাই লয়ে, অত্র কক্ষে ছাগ,  
দুজননের বাঁটি দিল সমান সোহাগ ।

শিশু আর পশু প্রকৃতির খুব কাছের অধিবাসী । তাদের মধ্যে পার্থক্য অতি সামান্য । অনুভূতিপ্রবণ  
মানুষ উভয়কেই প্রীতির মধ্যে গ্রহণ করতে পারে । ওভাবেই সে তার জীবনের ভাগ্যবাসী শিশু ও পশুকে  
সমানভাবে বস্তু করে দিতে পারে ।

৬. পর্দা উঠিযামাত্র ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রথমাকাই আমরা আর্ধ-অনার্ধের প্রচণ্ড জাতিসংঘাত দেখিতে পাই। সেই সংঘাতের প্রথম প্রবল বেগে অনার্ধের প্রতি আর্ধের যে বিবেচ্য আগিয়াছিল তাহারই ধাক্কার আর্ধেরা নিজের মধ্যে নিজে সংহত হইতে পারিল।

এইরূপ সংহত হইবার অপেক্ষা ছিল। কারণ, ভারতবর্ষে আর্ধরা কালে কালে ও দলে দলে প্রবেশ করিতেছিলেন। তাঁহাদের সকলেরই গোত্র দেবতা ও মন্ত্র যে একই ছিল তাহা নহে। বাহির হইতে যদি একটা প্রবল আঘাত তাঁহাদিগকে বাধা না দিত, তবে এই আর্ধ-উপনিবেশ দেখিতে দেখিতে নানা শাখা-প্রশাখায় সম্পূর্ণ বিভক্ত হইয়া বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইত। তাহারি আপনাদিগকে এক বলিয়া জানিতে পারিত না।

বাইরের আঘাতে বা প্রতিরোধে অনৈক্য দূর হয়ে জাতীয় একা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। ভারতের ইতিহাসের প্রথম পর্বে আর্ধরা বিচ্ছিন্নভাবে নানা দলে ভারতে প্রবেশ করে অনার্ধদের প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। তাতে আর্ধদের বিভিন্ন গোষ্ঠী একাবদ্ধ হতে বাধ্য হয়। তা নইলে কখনই তাদের মধ্যে একা স্থাপিত হত না।

৭. একজন সৈন্তাধ্যক্ষ তাঁর অমুচরদের ডেকে বলছিলেন, নিজেরদের চেয়ে শত্রুপক্ষের সৈন্তকে ভাল করে চিনে রেখো, যুদ্ধজয়ের অর্ধেক সেখানেই। যে চিকিৎসক ব্যাধির সঙ্গে সংগ্রামে চলেছেন, তাঁকে এই কথাটা ভাল করে মনে রাখতে হবে। মানুষের সকল শত্রুর বড় শত্রু হল ওই সব জীবাণু, তারা চোখের আড়ালে থাকে, অনেক তোড়জোড় করে তাদের খুঁজে বের করতে হয়, তাদের রীতিনীতির পরিচয় পেতে হয়, তাদের ধ্বংসের উপায় ঠিক করতে হয়।

যুদ্ধজয়ের প্রধান উপায় হলো, শত্রুপক্ষ সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত হওয়া। তেমনি রোগজয়ের ক্ষেত্রে চিকিৎসককে বিভিন্ন রোগ-বীজাণু সম্পর্কে খুঁটিনাটি জ্ঞান লাভ করতে হয় এবং তাদের ধ্বংসের উপায় আবিষ্কার করতে হয়।

৮. দেশের মঙ্গল? দেশের মঙ্গল, কাহার মঙ্গল? তোমার আমার মঙ্গল দেখিতেছি, কিন্তু তুমি আমি কি দেশ? তুমি আমি দেশের কয়জন? আর এই কৃষিজীবী কয়জন? তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশে কয়জন থাকে? হিসাব করিলে তাহারাই দেশ—দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। তোমা হইতে আমি হইতে কোন্ কাজ হইতে পারে? কিন্তু সকল কৃষিজীবী ক্ষেপিলে কে কোথায় থাকিবে? কি না হইবে? যেখানে তাহাদের মঙ্গল নাই, সেখানে দেশের কোন মঙ্গল নাই।

দেশের অধিকাংশ মানুষই হলো কৃষিজীবী। কাজেই, দেশের উন্নতি করতে হলে তাদের উন্নতি আগে করতে হবে। দেশের অবস্থা কৃষিজীবীকে বঞ্চিত রেখে মুন্সিবেশ শিক্তি ব্যক্তির উন্নতিতে দেশের প্রকৃত উন্নতি নেই।

৯. বীরসিংহ গ্রাম থেকে পায়ে হেঁটে কলকাতায় আসছেন বিভাসাগর। মাঠের মাঝে দেখতে পেলেন এক বুদ্ধ কৃষককে। তার মাথায় একটা বোঝা। একে বয়স হয়েছে, তার ওপর বেশ ভারি বোঝা। বেচারার চলবার শক্তি নেই। তার বাড়ি আবার কাছে নয়, দু'তিন কোশ দূরে। বুদ্ধের এই অবস্থা দেখে বিভাসাগর ছুটে

দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া  
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া

একটি ধানের শিষের উপরে  
একটি শিশির-বিন্দু।

১১. ১২. অর্থব্যয় করে, বহু কষ্ট স্বীকার করে দূর-দূরান্তরে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করতে যায়। কিন্তু তার বাড়ির পাশে প্রকৃতি যে অনবদ্য সৌন্দর্যের ডালি নিয়ে বসে আছে, তা তার দেখা হয় না। প্রকৃতি কি দূর-দূরান্তরের সমুদ্র-গর্ভতেই আছে? আশাবাদের ঘরের পাশে ধানের শিষের উপর পতনোন্মুখ শিশির-বিন্দুতে কি প্রকৃতি নেই?

১৩. দেবতা-মন্দির-মাঝে ভক্ত প্রবীণ  
অপিতেছে জপমালা বসি নিশিদিন।  
হেনকালে সন্ধ্যাবেলা ধূলিমাখা দেহে  
বস্ত্রহীন, অর্ধদীন পশিল সে গেহে।  
কহিল কাতরকণ্ঠে—“গৃহ মোর নাই,  
একপাশে দয়া করে দেহ মোরে ঠাঁই।”  
সসঙ্কোচে ভক্তবর কহিলেন তারে,  
‘আরে আরে অপবিত্র, দূর হয়ে যা রে!’  
সে কহিল, “চলিলাম।” চক্ষুর নিমেষে  
ভিখারী ধরিল মূর্তি দেবতার বেশে।  
ভক্ত কহে, “প্রভু মোরে কি ছল ছলিলে?”  
দেবতা কহিল, “মোরে দূর করি দিলে।  
জগতে দরিদ্ররূপে ফিরি দয়াভরে,  
গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে।”

ঈশ্বরের বাস কি কেবল মন্দির-মসজিদে? মানুষকে দূরে সরিয়ে দিবে মন্দির বা মসজিদের শুচিতা রক্ষার চেষ্টা মূঢ়তার নামান্তর মাত্র। ঈশ্বর আছেন মানুষের অন্তরে। তিনি দীনদরিদ্ররূপে ঘুরে ঘুরে বেড়ান মানুষের দ্বারে দ্বারে। তারাই তো জাগ্রত ভগবান। শুচিতার আশ্রয় ধারণার বশে তাদের দূরে তাড়িয়ে দেওয়ার অর্থ ঈশ্বরকে ঘৃণায় বিতাড়িত করা।

ভাব-সম্প্রসারণ

১. জোটে যদি মোটে একটি পয়সা  
খাত্ত কিনিও ক্ষুধার লাগি ;  
ছটি যদি জোটে তবে অর্ধেক  
ফুল কিনে নিও, হে অমুরাগী ।  
বাজারে বিকায় ফল-তুণ্ড  
সে শুধু মিটায় দেহের ক্ষুধা,  
প্রাণের, মনের ক্ষুধা নাশে ফুল  
ছনিয়ার মাঝে সেই তো স্নুধা ।

দেহ ও মন—এই নিয়ে মানুষ, এই নিয়ে তার জীবন । দেহের যেমন ক্ষুধা আছে, তেমনি আছে মনের ক্ষুধা । পৃথিবীতে বাচতে হলে দু'রকম ক্ষুধারই পরিতৃপ্তি চাই : পেটের ক্ষুধার নিরুত্তির জন্তে মানুষকে খাত্ত সংগ্রহ করতে হয় । সেজন্তে মানুষ খাটে, দিনরাত পরিশ্রম করে । দিনরাতের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের মজুরী হিসেবে সে যা পায়, তা যত সামান্যই হোক, তা দিয়ে শুধু পেটের অন্ন সংগ্রহ করলে তার চলে না । এইখানেই সে পশু থেকে পৃথক্ । পশুর শুধু উন্নয়-পূর্তি হলে চলে যায়, কিন্তু মানুষের চলে না । মানুষের উন্নয়ের অতিরিক্ত আছে তার মন । উন্নয়-পূর্তির সঙ্গে চাই তার মানসিক ক্ষুধার পরিতৃপ্তি । উন্নয়-পূর্তির পর যা তার হাতে থাকে, তা দিয়ে সে কেনে ফুল কিংবা ছবি কিংবা বই কিংবা কোন শিল্প-সামগ্রী ; অথবা সে পান শোনে, অভিনয় দেখে । তার সেই মানসিক ক্ষুধার পরিতৃপ্তির জন্তে শিল্পের সৃষ্টি ; শিল্পকলার নব নব আয়োজন । মানুষ তাই উন্নয়-সর্বস্ব হয়ে বাচতে পারে না, সে তাই স্বন্দরেরও পূজারী ।

✓

মেঘ দেখে কেউ করিস নে ভয়  
আড়ালে তার সূর্য হাসে,  
হারাশরীর হারা হাসি  
অন্ধকারেই ফিরে আসে ।

মানুষের জীবন হলো স্বপ্ন এবং দুঃখে দিয়ে গীথা এক বিচিত্র মালার মতো । নিরবচ্ছিন্ন স্বপ্ন কিংবা নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ কোন মানুষ পায় না । তার জীবনে আছে  
র. বি. (২য়)—২১

দুঃখের অমারাজি, দুঃখ-বেদনা তখন অসহ্য বোধ হয় ; মনে হয়, সেই দুঃখ-রজনীর সুবিধা শেষ নাই। কিন্তু তার দুঃখ-বেদনার সেই অমারাজির অবসান হয়। পৃথিবীকে উদিত হয় স্বর্ষের সূর্য। কিন্তু সেই স্বর্ষও তার ভাগ্যে চিরস্থায়ী হতে পারে না। নদীর জোয়ারভাটার মতো তার জীবনে আবার আসবে দুঃখ, দুঃখের পর স্বর্ষ।

কখনো কখনো আবার মাহুকের জীবনের আকাশে দুঃখ এবং বিপদ-আপদের ষোর কালো মেঘ ঘনিয়ে আসে। মাথার ওপরে ভেঙে পড়ে বড়-ঝড়-বজ্রপাত। অসহায় মাহুকে সেই ষোর বিপদের কালো মেঘ দেখে ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু সেই ঝড়কা-সংকুল রাতের অন্ধকারের আড়ালে লুকিয়ে আছে তার স্বর্ষের সূর্য। অচিরে সেই কৃষ্ণকুটিল কালো মেঘ কেটে গিয়ে স্বর্ষের মুখ দেখা যাবে। বিপদ-বাধা কেটে গিয়ে দেখা দেবে নতুন দিনের সূর্যোদয়। কাজেই, দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-বাধা সাময়িক। তা দেখে মাহুকের ভয় পাওয়া বা বেদনার ভেঙে পড়া উচিত নয় ॥

✓ ৩. এ জগতে হায় সেই বেশী চায় আছে যার ভুরি ভুরি,  
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।

পৃথিবীতে যারা প্রচুর সম্পদের মালিক, যাদের প্রচুর আছে, তাদের সম্পদ-ভূষণ কোনদিন পরিতৃপ্ত হয় না। তারা বত পায়, তত চায়। এইভাবে তারা নিজেদের মোটা পেট আরো মোটা করে তোলে। তাদের সেই নির্বিচার সম্পদ সংগ্রহের কলে গরীবের কানাকড়িতে হাত পড়ে। পৃথিবীর দুঃখী মাহুকেরা তাদের সামান্য পুজিপাটা নিয়ে করে জীবনযাপন। ধনিকের ঐশ্বর্ষের প্রতি তাদের লোভ নেই, রাজার বিলাস-বৈভবের প্রতি তারা উদাসীন। ‘শুধু ছুটি অন্ন খুঁটি কোন মতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ’ বাঁচিয়ে রাখে। কিন্তু ধনিকের অপরিসীম ধনতৃষ্ণা ক্রমাগত স্ফীত হতে হতে একদিন গরীবের পূর্ণকুটিরকে স্পর্শ করে। নানা ছলে, নানা কৌশলে কিংবা বল প্রয়োগ করে তারা হরিষের সর্বশেষ সঞ্চয়—তাদের সামান্য কানাকড়িটুকু ছিনিয়ে এনে ধনিকেরা নিজেদের সম্পদ-ভূষণের আঙনে আহুতি দেয়। এইভাবে পৃথিবীর দরিদ্রেরা তাদের সব কিছু হারিয়ে ভিটেমাটি ছেড়ে সাজে পথের ডিক্কুক, অন্নের কাঙাল। কেউ তাদের হিসেব রাখে না, কেউ তাদের ধবর রাখে না ॥

৪.

দণ্ডিতের সাথে

দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে

সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার।

জাহের স্তম্ভ পাবাণ-বেদীর ওপর বিচারকের আসন পাতা। নিরপেক্ষভাবে অপরাধী নির্ণয় করে তাকে শাস্তি দান করাই বিচারকের কাজ। এই কাজ বড় সুকঠিন। কিন্তু অপরাধীকে দণ্ডদানের ব্যাপারে বিচারককে সংবেদনশীল হতে হবে, অহুত্বপ্রবণ হতে হবে। তা না হলে তিনি যদি অপরাধীকে নির্মমভাবে দণ্ডদান করেন, দণ্ডিত অপরাধীর বেদনার তাঁর হৃদয়ে বসি করণার উদ্রেক না হয়, তবে তিনি

বিচারক পদের অধোদ্য। কারণ যে দাত্ত, বাক্যে তান দণ্ড বিধান করলেন, সেও কোন হতভাগ্য পিতামাতার সন্তান। সন্তানের ব্যথা-বেদনায় তাঁরাও ব্যথিত হবেন। তাছাড়া, যে কোন শাস্তিই কষ্টদায়ক। অপরাধীকে সেই কষ্ট ভোগ করতে হয়। বিচারক যদি তার এবং তার পিতামাতার ব্যথা-বেদনার কথা চিন্তা করে ব্যথিত না হন, তাহলে তাঁর শাস্তিদান হবে নিষ্ঠুরতার নামাস্তর। কাজেই, দণ্ডিতের প্রতি বিচারককে সমব্যথী হতে হবে। সমব্যথী বিচারকের বিচারই সর্বশ্রেষ্ঠ বিচার এবং তিনি যে শাস্তিদান করেন, তাই-ই সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্তি।

৫. বন্ধু, তোমার বুকভরা লোভ, ছুচোখে স্বার্থঠুলি  
নতুবা দেখিতে তোমারে সেবিতো দেবতা হয়েছে 'কুলি'।

এই পৃথিবীতে মানুষ মানুষকে ভালোবাসে, তার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে। মানুষের এই বন্ধুত্বের কোন তুলনাই হয় না। মানুষ বন্ধুত্বের আকর্ষণে মানুষের জন্তে সর্বস্ব ত্যাগ করে, জীবন পর্যন্ত দান করে মনুষ্যত্বের উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। কিন্তু বন্ধুর জন্তে মানুষের এই যে ত্যাগ-স্বীকার বা জীবন-দান, তা অনেক সময় নিঃস্বার্থ হয় না। স্বার্থের কারণেই মানুষ মানুষের বন্ধুত্ব প্রার্থনা করে, বন্ধুর উপকার করার চেষ্টা করে। এইভাবে তার পবিত্র বন্ধুত্বকে স্বার্থের কলুষ স্পর্শ করে। এই স্বার্থ-কলুষের স্পর্শে বন্ধুর ভালোবাসা কলঙ্কিত হয়। তা নইলে তার পবিত্র বন্ধুত্বের উজ্জল দীপ্তির পাশে স্বর্গের দেবতাদের দেবত্বও ম্লান হয়ে যায়। এই ধূলিময় পৃথিবীতে বন্ধুত্বই মানুষের সবচেয়ে বড়ো আশা-ভরসা এবং মানুষের বন্ধুত্বই স্বর্গীয় সৌন্দর্যের অমলিন প্রকাশ। পৃথিবীতে স্বর্গীয় সৌন্দর্য যদি কোথাও থেকে থাকে, তবে তা হলো মানুষের বন্ধুত্ব। তার আকর্ষণে স্বর্গের দেবতাও মর্ত্যের মানুষ হবার জন্তে পৃথিবীতে অবগ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পৃথিবীর কোন বন্ধুত্বই স্বার্থমুক্ত নয়, নিষ্কলুষ নয়।

৬. অন্ডায় যে করে আর অন্ডায় যে সহে,  
তব ঘৃণা যেন তারে তৃপ্তসম দহে।

প্রত্যেক মানুষেরই অন্তরে হায়বোধের প্রকাশ। তার বিবেকের গুহ্র বেলীতে হায়ের আগুন পাতা। জগতের সব কাজেই তার অন্তরের বিবেক থেকে আসে অমোঘ নির্দেশ। মানুষকে সেই নির্দেশ পালন করতে হয়। কিন্তু ভীতি ও দুর্বলতার কারণে অনেক সময় মানুষ হায়ের সেই অমোঘ নির্দেশ পালনে পশ্চাৎপদ হয়, সেই পবিত্র দায়িত্ব পালনে কুণ্ঠিত হয়। হায়ের নির্দেশ পালনে এই অক্ষমতার অর্থ অন্তারকে প্রশ্রয় দান। তেমনি অন্তারকে ক্রমা করা বা উপেক্ষা করাও অন্তারকে প্রশ্রয় দান। তার ফলে অন্তারকারীরা আরো অন্তার করার জন্তে সাহস পায় এবং তাতে পৃথিবী থেকে হায়বোধ ধীরে ধীরে তিরোহিত হয়। কাজেই, অন্তারকারী এবং যে অন্তার সৃষ্টি করে, তারা উভয়েই দোষী, উভয়েই শাস্তির যোগ্য। অন্তারের আচরণে কেউ কেউ নীরব উদাসীন দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। তাতে প্রশ্রয় পেয়ে অন্তারকারী ক্ষীণ ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। কিন্তু রক্তদেবতা বেশীদিন তা সহ্য করবেন না।

কল্পভেদে একদিন না একদিন অভাবকারী এবং অভাবের প্রত্নরাজ্য উভয়কেই কঠিন শাস্তি লাভ করিতে হবে ।

৭. লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু ।

সংকেত : লোভের শেষ নেই । লোভের জন্তে মানুষ নানা পাপকর্ম করে । লোভের তাড়নায় দিনের পর দিন সে পাপকর্ম করে চলে । অবশেষে মৃত্যুভেদে তার পরিসমাপ্তি ঘটে ।

৮. ইচ্ছা থাকিলেই উপায় হয় ।

সংকেত : যে কোন কাজের জন্তে চাই আগ্রহ । মানুষের অদম্য আগ্রহই তাকে সাকল্যের দ্বারে পৌঁছিয়ে দেয় ।

৯. যে জন দিবসে মনের হরষে  
জালায় মোমের বাতি ।  
আশু গৃহে তার জলিবে না আর  
নিশিতে প্রদীপ ভাতি ।

সংকেত : অমিতব্যয়ীরা অচিরেই অভাবের মধ্যে নিপতিত হয় । কাজেই, আর বুঝে ব্যয় করা উচিত । স্বখ ও সচ্ছলতার দিনেই দুঃসময়ের জন্তে সঞ্চয় করা বুদ্ধিমানের কাজ ।

১০. কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে,  
দুঃখ বিনা সুখলাভ হয় কি মহীতে ?

সংকেত : পরিশ্রম বা দুঃখকষ্টের ভয়ে কর্ম থেকে বিরত হওয়া অহুচিত । পৃথিবীর যে কোন কাজই পরিশ্রম-সাধ্য । পৃথিবীতে দুঃখ ছাড়া সুখ লাভ করা যায় না ।

১১. চিরস্থায়ী জন ভ্রমে কি কখন  
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে ?  
কি যাতনা বিধে বুঝিবে সে কিসে  
কভু আশীবিধে দংশেনি যারে ?

সংকেত : স্থায়ী ব্যক্তির দুঃখ উপলব্ধি করতে পারে না । ধনীরা পারে না পরীবের দুঃখ উপলব্ধি করতে । যে কখনো উপবাস করেনি, সে ক্ষুধার্তের দুঃখ বুঝতে পারবে না ।

১২. নর কহে, 'ধূলিকণা, তোর জন্ম মিছে,  
চিরকাল পড়ে র'লি চরণের নীচে।'  
ধূলিকণা কহে, 'ভাই, কেন কর ঘৃণা  
তোমার দেহের আমি পরিণাম কিনা ?'

সংকেত : কোন মানুষকে ঘৃণা করা উচিত নয়। অবস্থার পরিবর্তনে মানুষে  
অবস্থারও পরিবর্তন ঘটতে পারে ॥

১৩. আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে  
আসে নাই কেহ অবনৌ 'পরে,  
সকলের তরে' সকলে আমরা  
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে

সংকেত : মানুষ পরস্পরের সহযোগিতার দ্বারা বাঁচে। পরস্পর পরস্পরকে  
সাহায্য করলে পৃথিবীতে মানব-জীবন সুখের হয় ॥

১৪. সে কহে বিস্তর মিছা, যে কহে বিস্তর।

সংকেত : যারা বেশি কথা বলে, তারা অনেক মিথ্যা কথা বলে। বাচালতা  
মিথ্যা কথার মূল ॥

১৫. যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে,  
যে নদী মরুপথে হারালো ধারা।  
জানি হে, জানি তাও হয়নি হারা ॥

সংকেত : পৃথিবীতে কোন কিছুই ধ্বংস নেই, বিনাশ নেই। আপাতদৃষ্টিতে  
যা ধ্বংস, বিনাশ বা মৃত্যু, তা প্রকৃতপক্ষে রূপান্তর মাত্র। কোন ব্যর্থতাও ব্যর্থতা নয়।  
পরিশেষে সফলতা আছে ॥

১৬. এই পৃথিবীতে যে একা, সে-ই স্কুল, সে সামান্য।

সংকেত : একতাই বল। একক মানুষের শক্তি সীমিত। তার দ্বারা কোন  
বৃহৎ কাজ সম্পন্ন হয় না। পৃথিবীর বৃহৎ কাজগুলি একাবদ্ধ মানুষই সম্পন্ন করেছে ॥

১৭. বিরাম কাজের অঙ্গ, একসাথে গাঁথা—  
নয়নের অংশ যেন নয়নের পাতা।

সংকেত : কাজের ছুটিও কাজের অঙ্গ। এই ছুটি বিশ্রামের দ্বারা মানুষকে  
নতুন উদ্ভব ও নতুন শক্তি দান করে, তা হয় আগামী কর্মের প্রেরণা ॥



১৮. মহাজ্ঞানী মহাজননে পথে করে গমন  
হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়,  
৬ সেই পথ লক্ষ্য করে স্বীয় কীর্তি-ধ্বজা ধরে  
আমরাও হব বরণীয়।

সংকেত : মহাপুরুষগণ যে পথে কীর্তিলাভ করেছেন, সেই পথে পরবর্তীকালের মানুষেরাও কীর্তি লাভ করতে পারে। মহাপুরুষগণের জীবনই হবে তাদের প্রেরণার উৎস।

১৯. সুসময়ে অনেকেই বন্ধু বটে হয়,  
অসময়ে হায় হায় কেহ কারো নয়।

সংকেত : সুসময়ের বন্ধুই প্রকৃত বন্ধু। সঙ্কলতার দিনে অনেক বন্ধু এসে ডিঙ করে। কিন্তু অভাবের দিনে সকলেই উধাও হয়ে যায়। প্রকৃত বন্ধুই শুধু থাকে।

২০. তুমি অধম, তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন ?

সংকেত : যে মানুষ সৎ এবং মহৎ, তিনি পরোপকারে নিজের জীবন বিসর্জন দেন। অস্তান্ন মানুষ অকৃতজ্ঞ কিংবা কৃত্রিম হতে পারে। তাতে সৎ ব্যক্তি পরোপকার থেকে নিরস্ত হন না।

২১. কুকুরের কাজ কুকুরে করেছে  
কামড় দিয়েছে পায়,  
তা বলে কুকুরে কামড়ান কিরে  
মানুষের শোভা পায় ?

সংকেত : যে নীচ, সে নীচ কর্ম করে। কিন্তু যিনি মহৎ, তাঁর পক্ষে কখনো নীচকর্ম করা সম্ভব নয়।

২২. মস্তকের সাধন কিংবা শরীর পাতন।

সংকেত : লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্যে মানুষকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। ব্রত পালনের সাহায্যে মৃত্যুবরণ করেছেন কত মহাপুরুষ। একনিষ্ঠ সাধনার দ্বারা মানুষের সংকল্প সফল হয়।

২৩. সমুদ্রের পার আছে তল আছে তার,  
অতল অপার মাতৃস্নেহ পারাবার।

সংকেত : মাতৃস্নেহের তুলনা নেই। মায়ের স্নেহ সীমাহীন—সর্বগ। সন্তানের ওপর মায়ের স্নেহ অব্যাহত ধারায় করে পড়ে।

২৪. বোলতা কহিল, 'এ যে ক্ষুদ্র মউচাক,  
এরি তরে মধুকর এত করে জাঁক !'  
মধুকর কহে তারে, 'তুমি এসো ভাই,  
আরো ক্ষুদ্র মউচাক রচো, দেখে যাই।'

সংকেত : পরস্পরিক মাহুষেরা অতি হীন। তারা যশস্বী ব্যক্তিদের যশকে  
লুপ্ত করতে পারে না। তাকে হেয় প্রতিপন্ন করবার জন্যে তারা সদা সচেষ্ট।

২৫. আমার এ ধূপ না পোড়ালে  
গন্ধ কিছুই নাহি চালে,  
আমার এ দীপ না জ্বালালে  
দেয় না কিছুই আলো।

সংকেত : দুঃখই মাহুষের হৃদয়কে সোনা করে, মাহুষের প্রতিভার প্রকাশকে  
সম্বল করে তোলে।

## মধ্যশিক্ষা পর্যন্তের পরীক্ষার

প্রশ্ন-সম্ভার

[ উত্তর-সহ ]

১৯৭৬

### প্রথম পত্র

১. স্বচ্ছন্দভাবে বাংলার অর্থবাহক কর :

With that age-long village plough Manik can be seen tilling the ground. But he is not making much headway. Look at him. Floods of perspirations are pouring in streams down his cheeks as he holds the plough by both his hands and scolds the bullocks at the top of his voice. The bullocks do not appear to like the idea of working. Every now and then they stand still. Manik catches the tails of the oxen, twists them with all his might and abuses the poor animals.

উত্তর : সেই মাঝাতার আমলের গ্রাম্য লাদল দিয়ে মানিককে জমি চাষ করতে দেখা যায়। ওর কাজ খুব একটা এগোচ্ছে না। ওর দিকে তাকাও। দুহাত দিয়ে হাল চেপে ধরে চড়া গলার বলদগুলোকে বকতে গিয়ে ওর দু'গাল বেয়ে ঘন ঘামের বজ্রা ছুটছে। বলদগুলোকে দেখে মনে হয়, ওদের কাজ করার ইচ্ছে নেই। মাঝে মাঝে তারা স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে পড়ছে। মানিক বলদগুলোর লেজ ধরে প্রাণপণে মূচড়ে দিচ্ছে আর হতভাগ্য পশুগুলোকে গালমন্দ পাড়ছে ॥

৫. অন্ততঃ দশটি বাক্য সহযোগে নিম্নলিখিত অংশের ভাবার্থ বিস্তার কর :

আমি ভয় করব না, ভয় করব না।

ছ'বেলা মরার আগে মরব না ভাই, মরব না।

তরীখানা বাইতে গেলে

মাঝে মাঝে তুফান মেলে।

তাই বলে হাল ছেড়ে দিয়ে কান্নাকাটি করব না।

উত্তর : কর্মময় এই পৃথিবী। এখানে জীবন-ধারণের জন্যে প্রতিটি মানুষকে কোন-না-কোন কাজ করতে হয়। কিন্তু যে কোন কাজেই আছে বাধা, আছে

প্রাতবদ্ধকতা। পারশ্রম করে, দুঃখ-বেদনা সহ করে সেই সব বাধা জয় করতে হয়। তবেই জীবনে সাফল্য লাভ করা যায়। কিন্তু দুঃখ-কষ্ট-পরিশ্রমের ভয়ে কেউ যদি পৃথিবীর কাজ থেকে বিরত হয়, তবে প্রার্থিত সাফল্য জীবনেও লাভ করা যায় না। তেমনি যে কোন মহৎ কর্ম উদ্‌ঘাপনে দুঃখ আছে, কষ্ট আছে, আছে পরিশ্রমসাধ্য সংগ্রাম। দুঃখ-কষ্ট এবং পরিশ্রমের ভয়ে যদি কেউ সেই মহৎ কর্ম-উদ্‌ঘাপনের ব্রত থেকে নিরস্ত হয়, তাহলে কোনদিনই পৃথিবীতে কোন আদর্শের রূপায়ণ সম্ভব নয় সেই ব্যর্থ, পরাজিত, নিষ্ফল জীবন নিজের কাছেই বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই, ভয়ের গুহায় আত্মগোপন নয়, নিষ্ফলের ব্যর্থ ক্রন্দন নয়, চাই সংগ্রাম, কঠোর পরিশ্রম এবং সফল কর্মোত্তোগ—‘উত্তীর্ণত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত’ ৷

৬. প্রদত্ত সংকেতের সহায়তায় যে কোনো একটি বিষয় অবলম্বনে একটি প্রবন্ধ রচনা কর :

[ক] তোমার দেখা একটি মেলা ও ঐরূপ মেলার উপযোগিতা।

[মেলাটি শহরে, না গ্রামাঞ্চলে—কিরূপ পরিবেশ—মেলার দোকানপাট, প্রদর্শনী, বাজাগান, সভাসমিতি, প্রচার, প্রভৃতির বর্ণনা—উহার বিশেষ আনন্দদানের দিক—স্থলকলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা কোন্ কোন্ বিষয়ে উহাতে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল—উহার জনকল্যাণের দিক—লোকসমাগমের বর্ণনা। ঐরূপ মেলার প্রয়োজনীয়তা।]

[প্রবন্ধ-সংকেত অংশে একটি গ্রাম্য মেলা দ্রষ্টব্য।]

[খ] কারিক শ্রমের গৌরব ও তোমাদের কর্তব্য।

[সভ্যতা গঠনে মানসিক ও দৈহিক শ্রম উভয়েরই সমান গুরুত্ব—আমাদের কারিক শ্রম-বিমুখতা, উহার প্রতি ঘৃণা ও তাহার বিষময় ফল—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্র—গান্ধীজীর বাস্তব আদর্শ—শ্রমজীবীদের মহিমা কীভাবে স্বামী বিবেকানন্দ—কারিক শ্রমে উৎপাদনের আনন্দ—ছাত্রজীবন হইতেই কারিক শ্রমে অভ্যাস।]

[প্রবন্ধ-অংশে ‘পরিশ্রমের মর্যাদা’ দ্রষ্টব্য।]

[গ] একটি বিতর্ক-সভা ও উহা হইতে তোমার শিক্ষা।

[অহুষ্ঠানের স্থান ও সময়—বিতর্কের বিষয়—যোগদাতাদের পরিচয়—বিতর্ক আরম্ভ হওয়ার পূর্বকায় ব্যবস্থাপনা—এক এক বক্তার যুক্তি অন্ত কতৃক শ্রবণের সময় তোমাদের আনন্দ—বিতর্কের ফলাফল। সভাপ্রবেশে—তোমার শিক্ষা ও অহুপ্রেরণা।]

[প্রবন্ধ-সংকেত অংশে ‘বিতর্ক-সভা’ দ্রষ্টব্য।]

## দ্বিতীয় পত্র

৪. প্রদত্ত নির্দেশ অনুযায়ী পাঠ্যগত ব্যাকরণ অংশের উত্তর দাও :

[যে কোন পাঁচটি] :

৫ × ২ = ১০

[ক] নিম্নরেখ অংশের পদ-পরিচয় দাও :

(অ) পাঠ্যকা সৃষ্টির উদ্দেশ্য পদে পদে ব্যর্থ হইয়া উঠে।

(ব) বাজি বসিয়াও সেরূপ হইতে পারে।

**উত্তর :** (অ) পদে পদে—বিশেষ্য পদ, বহুবচন, ক্রীবলিঙ্গ, প্রথম পুরুষ, অধিকরণ কারকে 'এ' বিভক্তি।

(ব) বাটী—বিশেষ্য পদ, এক বচন, ক্রীবলিঙ্গ, প্রথম পুরুষ, অধিকরণ কারকে শূন্যবিভক্তি।

[খ] নিম্নে প্রদত্ত শব্দগুলির মধ্যে কোন্ দুইটি 'বিদেশী' তাহা জানাও :  
দেউড়ী, ইম্পাত, খতমত, মরীয়া, তাজা।

**উত্তর :** ইম্পাত—বিদেশী শব্দ [পতু'গীজ শব্দ]।  
তাজা—বিদেশী শব্দ [ফারসী শব্দ]।

[গ] 'বাক্য দুইটিকে আরও সংক্ষেপে প্রকাশ কর :

(অ) পানার্থে জল প্রার্থনা করিলেন।

(ব) কোথাও তাহাদের কোন বাধা নাই।

**উত্তর :** (অ) পানীয় প্রার্থনা করিলেন।  
(ব) তাহারা অবাধ।

[ঘ] সাধুরীতিতে রূপান্তরিত কর :

সেই দুপুর একটা অবধি বসে থাকতে হবে। চল আসবার দিন দেখাব।

**উত্তর :** সেই ত্রিপ্রহর এক ঘটিকা অবধি বসিয়া থাকিতে হইবে। চল, আসিবার দিবস দেখাইব।

[ঙ] এ—বিভক্তি-চিহ্ন প্রয়োগ করিয়া কী অর্থ বোঝানো হইয়াছে?

(অ) অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাহার পরিচয় দিলেন।

(ব) নির্বিঘ্নে দুইবেলা আহার ও ইংরাজী পড়া চলিতে লাগিল।

**উত্তর :** (অ) অশ্রুপূর্ণ নয়নের দ্বারা তাহার পরিচয় দিলেন।

(ব) নির্বিঘ্নভাবে দুইবেলা আহার ও ইংরেজী পড়া চলিতে লাগিল।

[চ] সমাসগুলি ভাঙ্গিয়া বাক্যটির পুনর্লিখন কর :

চঞ্চল রবিরশ্মিমালা প্রদীপ্ত হইয়া গগনপ্রান্তে মিশিয়াছে।

**উত্তর :** রবির চঞ্চল রশ্মির মালা প্রদীপ্ত হইয়া গগনের প্রান্তে মিশিয়াছে।

[ছ] প্রদত্ত দুইটি বাক্যে 'না' পদ দুইটির পার্থক্য নির্দেশ কর :

(অ) সেদিন দেখলেন না?

(ব) হজুরের হুকুম হলে আমি না বলতে পারি না।

**উত্তর :** (অ) না—বাক্যাঙ্ককার অব্যয়।

(ব) না—বিশেষ্য পদ। না—নঞর্থক অব্যয়।

৫. যে কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

৫ × ৫ = ২৫

[ক] নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে কোন্ কোন্ সমাস হইয়াছে তাহা লিখ :

বাচস্পতি, অবিধেয়, দুঃসহ, বেসরকারী, নাড়িভুঁড়ি।

উত্তর : বাচস্পতি—বাচঃ [ বাক্যের ] পতি—যজ্ঞীতং পুরুষ ।

অবিধেয়—নয় বিধেয়—নঞ্তংপুরুষ ।

দুঃসহ—দুঃসাধ্য সহন ব্যার—বহুব্রীহি ।

বেসরকারি—নয় সরকারি—নঞ্তংপুরুষ ।

নাড়ীতুঁড়ি—নাড়ী ও তুঁড়ি—বন্দ্য ।

[খ] প্রতিটি শব্দের যে যে বর্ণে সন্ধ হইয়াছে, কেবল সেই বর্ণ '+' চিহ্ন দিয়া :

লিখ : দেবর্ষি, প্রত্যাশিত, সংগত, মনোহর, মাঘোৎসব

উত্তর : দেবর্ষি—অ + ঋ ; প্রত্যাশিত—ই + আ ; সংগত—ম্ + গ ,

মনোহর—ঃ + হ ; মাঘোৎসব—অ + উ ।

[গ] ইংরেজি শব্দগুলি বাংলা লিপিতে লিখ :

Translation, Tradition, Steamer, Station, Machine.

উত্তর : ট্রান্সলেশন, ট্র্যাডিশন, স্টীমার, স্টেশন, মেশিন ।

[ঘ] নিম্নলিখিত বিষয়গুলির দৃষ্টান্ত দাও : সংযুক্ত ক্রিয়াপদ, অনুসর্গ, বিধেয় বিশেষণ, অল্পজ্ঞা বুঝাইতে ভবিষ্যতের রূপ কৃতপ্রত্যয় ।

উত্তর : সংযুক্ত ক্রিয়াপদ—‘চলে যায়’ মরি হার, বসন্তের দিন ।

অনুসর্গ—ব্যথা যোর উঠবে জলে উল্লস-পানে ।

বিধেয় বিশেষণ—‘হে কালী, করীশ দলে তুমি পুণ্যবান্ ।’

অল্পজ্ঞা বুঝাইতে ভবিষ্যতের রূপ—‘নিত্য বাহা পড়িবে নিত্য তাহা অভ্যাস করিবে ।

কৃত প্রত্যয়—‘আমি ভীম ভালমান মাইন ।’

[ঙ] প্রদত্ত শব্দ-যুগ্মগুলির অর্থের পার্থক্য নির্দেশ কর :

রবীন্দ্র, রবীন্দ্রু ; প্রকৃত, প্রাকৃত ; কাঁদনে, কাঁদানে ; দশরথী, দাশরথি ; অবমান, উপমান ।

উত্তর : রবীন্দ্র [ রবি + ইন্দ্র ]—শ্রেষ্ঠ সূর্য ।

রবীন্দ্রু [ রবি + ইন্দ্রু ]—সূর্য ও চন্দ্র ।

প্রাকৃত—স্বার্থ ।

প্রাকৃত—প্রাকৃতিক, লৌকিক ।

কাঁদনে—যে কাঁদে । [ যেমন—‘কাঁদনে ছেলে’ ]

কাঁদানে—বা কাঁদায় [ যেমন—‘কাঁদানে গ্যাস’ ]

দশরথী—দশজন রথী ।

দাশরথি—দশরথের পুত্র ।

অবমান—অপমান ।

উপমান—তুলনা ।

[চ] বাচ্য পরিবর্তন কর :

(ক) আমি বাইব, (খ) তুমি কখন এলে ? (গ) আহ্নন, বহ্নন, (ঘ) তিনি ইহুলে ছেলেদের পুরস্কার দিতেন। (ঙ) আর কি কোথাও ফিরে পাব সে জীবন ?

আমি বাইব—কর্তৃবাচ্য।

আমার যাওয়া হইবে—ভাববাচ্য।

তুমি কখন এলে ?—কর্তৃবাচ্য।

তোমার কখন আসা হলো ?—ভাববাচ্য।

আহ্নন, বহ্নন—কর্তৃবাচ্য।

[ আপনার ] আসা হউক, বসা হউক—ভাববাচ্য।

তিনি ইহুলের ছেলেদের পুরস্কার দিতেন—কর্তৃবাচ্য।

তঁাহার কর্তৃক ইহুলের ছেলেরা পুরস্কৃত হইত—কর্মবাচ্য।

আর কি কোথাও ফিরে পাব সে জীবন ?—কর্তৃবাচ্য।

আর কি কোথাও ফিরে পাওয়া যাবে সে জীবন ?—ভাববাচ্য।

[ছ] 'এ, তে, দেব, রা, কে'—এই বিভক্তিগুলির প্রয়োগ দেখাইয়া পাঁচটি বাক্য রচনা কর।

উত্তর : এ—'আকাশে বাতাসে আমন্ত্রণ।'

তে—'বুলবুলিতে ধান খেয়েছে।'

দেব—'আমাদের শান্তিনিকেতন আমাদের সব হতে আপন।'

রা—'বহুরা বনে সন্ধ্যা, শিশুরা মাতৃকোড়ে।'

কে—'মদীকে প্রশ্ন করিলাম।'











